তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রয়োবিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

১৮৫৩ শক

কলিকাতা

৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড

আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৮। খৃঃ ১৯৩২। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী।

ত্রয়োবিংশ কল্প, প্রথম ভাগ।

১৮৫৩ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২।

ওঁ তৎসৎ

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

নববর্ষে অভিবাদন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই সংখ্যায় ঊন-নবতিতম বৎসরে পদার্পণ করিল। যাঁহার কৃপায় পত্রিকা সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই সুদীর্ঘ কাল দেশের মঙ্গলসাধনে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সেই ভগবানের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি যে, ইহা আরও সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনরূপ উপাসনার ব্রতউদ্‌যাপনে দেশ-বাসীগণের সহায় হউক। পত্রিকার গ্রাহক, পাঠক ও হিতৈষীগণকে আমাদের সাদর অভিবাদন ও অভিভাষণ জানাইয়া পত্রিকার প্রতি তাঁহাদেরও সহৃদয় প্রীতিদৃষ্টি ও কল্যাণকামনা প্রার্থনা করি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ।

যিনি প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি, অমৃতের নেতা, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্ব্ব-প্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক-মেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহা প্রযত্নে পালন করিবার পক্ষে তিনি তোমাদের সহায় হউন। সেই সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বর তোমাদের সদ্ভাব, সাধুভাব পোষণ করুন; জ্ঞানধর্ম্মে তোমাদিগকে উন্নত করুন; তোমাদের কুল-মর্য্যাদা, মান, সম্ভ্রম, যশঃ-কীর্ত্তি অক্ষত রাখুন এবং এখানে তোমা-দিগকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিয়া, লোক-লোকান্তরে স্বর্গ হইতে স্বর্গলোকে উন্নত করিয়া অবশেষে আপনার অমৃতানন্দ ক্রোড়ে স্থান দিয়া মোক্ষপদ প্রদান করুন। এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ।

তোমাদের স্বস্তি হউক, শান্তি হউক,
ব্রহ্মপদ লাভ হউক।

৩।২।১৮২১ শক।

ধর্ম্ম কি ?*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গত বৎসরের কথা।

ভগবানের দয়ায় নবশতাব্দীর একটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুখদুঃখের ভিতর দিয়া, আশা-নিরাশার ভিতর দিয়া, একমাত্র তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছায় একবৎসর আমরা নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া আসিলাম। গত বৎসরের প্রথম অবধি চারিদিকে যে প্রকার নিরাশা ও নিরানন্দের কারণ-সমূহ নয়নের সম্মুখে সুবৃহৎ আকারে সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা এতটুকু আশা করিতে পারি নাই যে, নবশতাব্দীর প্রথম মাঘোৎসব সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়, এই মন্ত্রের উপর সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া উৎসবসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সকল বাধা-বিঘ্ন আশ্চর্য্যরূপে প্রতিহত করিয়া দিলেন।

গত মাঘোৎসবের বাণী।

বিগত উৎসবে আমরা যে বাণী লাভ করিয়াছি, তাহা এই—অন্যোন্যসাহচর্য্যে পরস্পরের স্কন্ধে স্কন্ধ দিয়া পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া আমাদিগকে মঙ্গলের পথে, উন্নতির পথে, সাধনের পথে, সিদ্ধির পথে—এক কথায় সত্যধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। অগ্রসর হইলেই জীবনলাভ, পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেই মৃত্যু সুনিশ্চিত।

প্রকৃত ধর্ম্ম জীবনের কেন্দ্র।

বর্ত্তমানে দেশবাসীগণ রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। দেশের যেরূপ দুর্দ্দিন আসিয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে অন্নবস্ত্রের সমস্যামূলক যেরূপ হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে, এবং রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির উপর সেই সকল সমস্যার নিরাকরণ যে প্রকার নির্ভর করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, দেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা ঐ সকল বিষয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেও বুঝি নিতান্ত অন্যায় হইবে না। কিন্তু ঐ সকল বিষয়ই মানুষের সমস্ত নয়। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি প্রভৃতি মানুষকে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গলের পথে তুলিয়া ধরিতে পারে না। সেই সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের পথে যাহা ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি মানবজীবনের একএক অংশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্ম মানবজীবনের সমস্তটা পরিপূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। কাজেই রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি বা মানবজীবনের কোন এক অংশে বিধৃত যে কোন নীতিই বল না কেন, তাহা মানুষকে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বা মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারে না; একমাত্র ধর্ম্মই তাহা পারে, কারণ ধর্ম্মের ভিতরেই সকল নীতির সমাবেশ আছে, এবং সকল নীতির ভিতরেই ধর্ম্মেরও সমাবেশ আছে। বলিতে গেলে, ঐ সকল নীতির এক-একটী মানবজীবনের একএকটী পরিধিমাত্র এবং ধর্ম্মই উহাদের সকলেরই অনন্যকেন্দ্র। কাজেই আমরা যে নীতিরই আলোচনায় হস্তক্ষেপ করি না কেন, আমাদের দেখিতে হইবে যে, তাহার ফলে কতটুকু সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল সাধিত হইবে; এক কথায়, কতটুকু প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হইবে। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির সাধনা করিতে গেলে তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আসা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। আমি এখানে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বা মাত্র দেশাচারমূলক ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না; আমি এখানে প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই আমার বক্তব্য বলিয়া আসিলাম—যে ধর্ম্মের সাধনা মানুষকে কি শারীরিক (material), কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে ঠেলিয়া লইয়া চলে।

ধর্ম্ম জড়জগতেরও কেন্দ্র।

মানুষ তাহার দেহ মন ও আত্মা লইয়াই সংগঠিত। তাহার দেহ মন ও আত্মা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তাই মানুষের ধর্ম্ম, যাহা প্রকৃত সত্যধর্ম্ম, তাহার দৃষ্টি শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকলের উপর সমানভাবে, অর্থাৎ সকলের সামঞ্জস্যের উপর থাকিতে হইবে। যে ধর্ম্ম কোন একটীকে ছাড়িয়া কেবলমাত্র অপর একটীকে ধরিয়া থাকিলে চলিবে না।

এই যে জড়-বিজ্ঞান আমাদের শারীরিক (material) উন্নতিবিধানে সহায়তা করিতেছে, ইহার কারণ, যে ধর্ম্ম সমগ্র জগৎকে ধারণ ও পোষণ করে, সেই ধর্ম্মই উহার কেন্দ্রে অবস্থিত। বিজ্ঞান বলিয়া দেয়—কোথায় সূর্য্য, কোথায় চন্দ্র, কোথায় বা অগণিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল, আর কোথায় বা এই পৃথিবী, কোথায় বা এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানবদেহ,—সূর্য্যের মধ্যে তরঙ্গবিক্ষোভ উপস্থিত হইল, আর মানব যে পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে, সেই পৃথিবীতেও নানাবিধ বিক্ষোভ উপস্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষুদ্র মানবেরও দেহে ও মনে বিক্ষোভ আসিল। চন্দ্রমার জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীতে এবং এই পৃথিবীতে অবস্থিত মানবেরও দেহে ও মনে নানাবিধ ইতর-বিশেষ দেখা যাইতে লাগিল। এইরূপে দেখা যায় যে, সমস্ত জড়জগত, মানবদেহ যাহ[illegible] ভুক্ত,

* [illegible] শকের নববর্ষ উপলক্ষে।

একই প্রীতিসূত্রে অবলম্বিত হইয়া আছে—একবিধ নিয়মেরই অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে।

ধর্ম্ম মনোজগতেরও কেন্দ্র।

মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, সমগ্র জগতের—কে বলিতে পারে, লোক-লোকান্তরের নহে—অধিবাসীগণও একই প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ। এস্থলেও দেখা যায় যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মানুষের, বোধ হয় জীবজন্তুরও, মনের ভাব ও চিন্তা প্রভৃতি একবিধ নিয়মেরই অনুসরণ করিয়া চলে। এই কারণে কোথায় হিমতুষারে আচ্ছাদিত সুমেরু-কেন্দ্রের অধিবাসী, আর কোথায় প্রচণ্ড রৌদ্র-সন্তপ্ত এই ভারতের অধিবাসী; কোথায় অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিম অসভ্য অধিবাসী, আর কোথায় সভ্যতার উন্নত শিখরে আরূঢ় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসী, পরস্পর পরস্পরের মনের ভাবসকল বুঝিবার অধিকার রাখে। যে ধর্ম্ম সমস্ত বহিঃপ্রকৃতির কেন্দ্রে অবস্থিত, সেই ধর্ম্মই সমগ্র মানবপ্রকৃতিরও কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। এই কারণেই বহির্জ্জগত এবং এই মানবদেহে অবস্থিত অতীন্দ্রিয় মন, এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতিসম্বন্ধে সংবদ্ধ। মানবদেহের কথা দূরে থাক,—বহির্জ্জগতে বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে মানবেরও মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। ভূমিকম্প হইল, জলপ্লাবন হইল, মানবেরও মনপ্রাণ নানাবিধ ভয়ভাবনায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। আর ইহাও ত পরীক্ষিত সত্য যে, আহারবিহারের সুবিধা ও অসুবিধার উপর, খাদ্যাখাদ্যের আলম্বনের উপর, মানব-মনেরও স্বাস্থ্যঅস্বাস্থ্য নির্ভর করে। এইরূপে দেখা যায় যে, বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগত এক আশ্চর্য্য অঙ্গাঙ্গীযোগে আবদ্ধ, এক অন্তর্নিগূঢ় প্রীতিসূত্রে অবলম্বিত।

এই যোগের, এই প্রীতিসূত্রের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগের উপলব্ধি হয় যে, এই বহির্জ্জগত ও অন্তর্জ্জগতের ভিতর, এক কথায় সমগ্র প্রকৃতির ভিতর এমন এক মহান্ শক্তি অবস্থিত আছে, যাহা কেন্দ্রে থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতিকে সুনিয়মে পরিচালিত করিবার অধিকার ও ক্ষমতা রাখে। সেই শক্তিই ধর্ম্ম।

জীবাত্মা ও তাহার শক্তি।

আমরা প্রকৃতির কার্য্য আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, শক্তি আপনা আপনি আসিতেও পারে না বা নিরবলম্ব হইয়া থাকিতেও পারে না। শক্তি ইচ্ছাময় পুরুষ হইতে নিঃসৃত হয় এবং ইচ্ছাময় পুরুষেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। পুরুষের ইচ্ছা ঐ শক্তির মধ্যে অন্তর্নিগূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিলেও, পুরুষ ঐ শক্তির অতীত ও ঐ শক্তি হইতে পৃথক্। এই পুরুষের ইচ্ছা ও শক্তি আছে বলিয়াই ইহা দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত একটী মহান সত্য। অধ্যাত্মবিজ্ঞানে এই ইচ্ছাময় পুরুষই আত্মা বলিয়া অভিহিত হয়। মানবদেহের অন্তরে যে সসীম ইচ্ছাময় পুরুষ থাকিয়া মানবদেহ ও মানব-মনকে পরিচালিত করে, এবং দর্শন, স্পর্শন, মননাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাই সীমাবদ্ধ মানবাত্মা।

প্রকৃতিতে পরমাত্মা।

যে শক্তি সমগ্র প্রকৃতির অন্তরে থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতিকে অবিচলিত নিয়মসমূহে পরিচালিত করিতেছে, সেই শক্তি তোমার আমার ন্যায় সীমাবদ্ধ পুরুষ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। সেই শক্তি এই সুবিশাল বিশ্বজগতের স্রষ্টা, পাতা ও নির্ব্বাহিতা মহান পুরুষ হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে এবং তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। মানবাত্মা যেরূপ মানবের দেহ ও মনের প্রত্যেক অংশই সমভাবে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা মহান পুরুষও সমগ্র প্রকৃতির অভ্যন্তরে তাহার আত্মারূপে কিন্তু তাহার অতীত ও তাহা হইতে পৃথক্ থাকিয়া তাহার প্রত্যেক অংশই সমভাবে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এই মহান সত্য ভারতের তপোনিষ্ঠ ঋষিরা তাঁহাদের বহু যুগযুগান্তরের সাধনার ফলে উপলব্ধি করিয়া হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে বজ্রনির্ঘোষে বিঘোষিত করিয়াছেন যে—যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ; যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ, তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—এই আকাশে যে এই তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ অবস্থিত আছেন; এই আত্মাতে যে এই তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ অবস্থিত আছেন, সাধক একমাত্র তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য কোন পথ নাই।

পরমাত্মা ও তাঁহার মঙ্গল ভাব।

সেই মহান পুরুষই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং আমাদের উপাস্য দেবতা। এই মহান আত্মাই প্রকৃতির অন্তরে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা ও বিজ্ঞানাত্মারূপে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের মাতা; তিনি কেবল ইচ্ছাময় ও শক্তিময় মহান পুরুষ নহেন, তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্যামী ও মঙ্গলময় বিধাতা। শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে আলোচনা করিলে তাঁহা হইতে নিঃসৃত এক অবিচ্ছিন্ন প্রেমধারা প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত দেখিতে পাইব। বৃক্ষের প্রতি পত্র, বিহগের প্রাত কূজন, পুষ্পের সুগন্ধও

সৌন্দর্য্য জগতে সকলই তাঁহার মঙ্গলভাবে চঞ্চল। আমাদের সুখ-সৌভাগ্য যেমন তাঁহার মঙ্গল নিশ্বাস বহন করিয়া আনে, সেইরূপ দুঃখবিষাদের ঘন অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহারই প্রেম ও মঙ্গলভাবের বিমল জ্যোতিরেখা প্রতিফলিত দেখি।

আত্মাতে পরমাত্মা।

সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে চাহিলে, সেই মহান পুরুষের শক্তির অনুরূপ শক্তিলাভের পথে, এক কথায় ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে চাহিলে, সেই পরম পুরুষ ভগবানেরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে হইবে—তাঁহাকেই সকল হৃদয় দিয়া প্রীতি করিতে হইবে এবং তাঁহারই প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত থাকিতে হইবে। কেবল বহির্জগতে তাঁহার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইলে, অথবা বাহিরের পত্রপুষ্প দিয়া তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলে চলিবে না। প্রত্যেক মানব-আত্মাই তাঁহার শ্রেষ্ঠতম জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসন। আত্মাতেই তিনি স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে নিত্য বিরাজমান। সেই আত্মারই অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিতে হইবে। আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। ইহা শুধু কথার কথা নহে—ইহা প্রত্যেক সাধকেরই অন্তরের পরীক্ষিত সত্য বাণী।

সত্যধর্ম্মের অনুশাসন।

আমাদের চারিদিকে সুখ ও দুঃখের, আশা ও নিরাশার, আনন্দ ও নিরানন্দের চিরন্তন দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। এই সকল দ্বন্দ্বের মধ্য হইতেই সকল দ্বন্দ্বের অতীত, মৃত্যুর অতীত, আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্যামী মঙ্গলময় পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত একাত্মযোগে যুক্ত হইতে হইবে। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মিলাইয়া ফেলিতে হইবে। ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর সূর্য্য যেরূপ তাঁহার কিরণজাল সমভাবে বিস্তার করে, পাপীতাপী, সাধুঅসাধু-নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর যেরূপ মঙ্গলময় ভগবানের কৃপাবারি সমভাবে বর্ষিত হয়, আমাদেরও সেইরূপ মঙ্গলময় ভগবানের প্রীতিসাধনের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তাঁহারই সৃষ্ট জগতের হিতসাধনের নিমিত্ত আমাদের হৃদয়-মনকে সম্প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে —পরের সুখে যেমন সুখী হইতে হইবে, পরের দুঃখেও সেইরূপ দুঃখী হইতে হইবে—সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে; অপরের প্রতি দ্বেষহিংসা পরিত্যাগ করিতে হইবে—অহিংসাসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত সত্যধর্ম্মের অনুশাসন।

ধর্ম্মসাধনেই প্রকৃত মুক্তি।

আমরা যদি আমাদের যথার্থই উন্নতি চাই, যথার্থই মঙ্গল কামনা করি, তবে আজ অবধি সত্য ধর্ম্মের অনুশাসন দৃঢ়তা সহকারে পালন করিতে হইবে। ধর্ম্মসাধন ব্যতীত মানবের প্রকৃত উন্নতি নাই, প্রকৃত মঙ্গল নাই, প্রকৃত স্বাধীনতা নাই, প্রকৃত মুক্তি নাই। ঐ যে মহাত্মা গান্ধী আজ নবতর ভাবে রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রেও জগতকে ধর্ম্মের জয় পদে পদে প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন, ইহার মূল কারণ হইল তাঁহার সত্যধর্ম্মের অনুশাসন অবিচ্ছেদে পালন এবং মঙ্গলময় ভগবানের সহিত সর্ব্বদা একাত্মযোগে যুক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রতি অবিচলিত আস্থা ও নির্ভর সহকারে সকল কর্ম্ম সংসাধন। যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কৃতকার্য্য হইতে চাহিলে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের অধিবাসী ধর্ম্মকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না; ভগবানের পক্ষপুটতলে বিশেষ-ভাবে আশ্রিত এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি তাঁহাকে ছাড়িয়া একপদও চলিতে পারে না।

ধর্ম্মের পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও।

আজ বৎসরের প্রথম দিন। নবজাত শিশুর জন্মদিন যেমন পবিত্র, বৎসরের এই প্রথম দিনও সেইরূপ পবিত্র; তাই আমরা এই শুভ দিবসে মঙ্গলশঙ্খ নিনাদিত করিয়া, মঙ্গল রাগ-রাগিণীতে ভগবানের বন্দনা-গীত গাহিয়া এই নব বৎসরকে সাদরে আবাহন করিতেছি। বৎসরের এই প্রথম দিন অবধিই আমাদিগকে জননীর চরণতলে পৌঁছিবার জন্য সর্ব্ববিধ উদ্যোগআয়োজন করিতেহইবে; বৎসরের এই প্রথম দিন অবধিই আমাদিগকে অমৃতধামের পথে যাত্রা সুরু করিতে হইবে। পরম পিতার সিংহাসন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের যে সুবিস্তৃত ও সরল রাজপথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেই সরল পথ ধরিয়া তাঁহারই নামের জয়ধ্বনি করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হও—পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। ভগবানের প্রতি যাঁহারা একান্ত নির্ভর ও আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহার সহিত যাঁহারা একাত্মযোগে যুক্ত থাকেন, তিনি স্বয়ংই তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের ভার বহন করেন। ভগবান স্বয়ংই দীপ্ত দীপ ধারণ করিয়া এই পথের যাত্রীদিগের অগ্রে অগ্রে চলেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা আমাদিগকে এই সত্যবাণী শুনাইয়াছেন যে, এই সরল পথে আমরা একপদ অগ্রসর হইলে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে দশ পদ আগাইয়া দেন। এই সত্য আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া আমাদের সম্মুখে ভাস্বর আকারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

ভগবানের কৃপাবারিতে সকল ভুলভ্রান্তি ধুইয়া যাইবে—হতাশ হইও না।

অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্য আপনাকে নিরাশার সাগরে নিমগ্ন রাখিয়া মুহ্যমান থাকিও না। আমরা সীমাবদ্ধ মানব; আমাদের পক্ষে ভুলভ্রান্তি তো স্বাভাবিক। ভুলভ্রান্তি যদি একটিও না করিতাম, তবে আমরা প্রত্যেকেই তো ভগবানের আসনে সমাসীন হইতাম। ভগবান যখন আমাদের পিতামাতা, তিনি যখন আমাদের মঙ্গলময় বিধাতা, এই অনন্তস্বরূপ পরম পুরুষের দয়ার যখন আদি নাই, অন্ত নাই, তখন আমাদের কোনপ্রকার বিভীষিকায় ভীত হইবার কোনই কারণ নাই। তাঁহার চরণে যতই কেন অপরাধ করি না, আমরা মোহ বশতঃ আপনাকে পাপে নিমগ্ন রাখিতে চাহি না, সেই অপার করুণাময়ী জননী আমাদের সমস্ত অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন; আমাদের গাত্র হইতে পাপের জ্বালাময় ধূলিকর্দ্দম তাঁহার স্নেহ-হস্তে নিশ্চয়ই মুছিয়া দিবেন। এইজন্যই তো তিনি আমাদের প্রত্যেকের নিকট দয়াময় পিতা এবং করুণাময়ী জননী। যাঁহার প্রসাদে শরীর ও মন, যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি ও বল, যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিতেছি, এস আমরা অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমাদের প্রত্যেকের আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করিবার ব্রত গ্রহণ করি। এস আজ বৎসরের প্রথম দিবস অবধি আমাদের ছোট-বড় সকল কার্য্যে—আমাদের প্রতি নিমেষে, প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, তাঁহারই আসন সর্ব্বোচ্চে স্থাপন করি এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হই। আমাদের সকলের মস্তকে ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

ধর্ম্ম মানবের অন্তর্নিহিত সত্য।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

মানুষ অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, তাহার শক্তিসামার্থ্য সকলই অতি অল্প। কিন্তু মানুষ নিজের অল্পতা লইয়াই পরিতৃপ্ত নহে, সে আপনার বাহিরে যাইতে চায় এবং আপনার অপেক্ষা কোন উচ্চতর শক্তির সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মের মূল কথা। সকল দেশে এবং সকল কালে কি সুসভ্য, কি অসভ্য সকল অবস্থায় লোকই কোন-না-কোন দেবতার পূজা করে। অনেক অসভ্য জাতি এমন সকল দেবতার পূজা করিয়াছে, যাহারা আমাদের দৃষ্টিতে একেবারেই পূজার যোগ্য নহে। কিন্তু প্রত্যেক জাতিই আপনাদের মধ্যে যে সকল গুণের বিশেষ সমাদর করিত, তাহাদের উপাস্য দেবতাতেও সেই সকল গুণ অসীম পরিমাণে আরোপ করিয়াছে। অসভ্য অবস্থাতে আমরা মানবঅন্তরে যে ধর্ম্মভাবের অঙ্কুরমাত্র দেখিতে পাই, ক্রমে সভ্যতার উন্নতিসহকারে সেই ধর্ম্মভাবই ভগবানকে অনন্ত মঙ্গলময় বলিয়া দেখাইয়া দেয়। কিন্তু অসভ্য অবস্থাতে মানুষ যে গাছপালার পশুপক্ষীর ভূতপ্রেতের পূজা করে, তাহা হইতেও আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মভাব মানুষের একটী স্বাভাবিক মনোবৃত্তি এবং মানবজীবনে ইহার স্থান অতি উচ্চ।

মানুষ আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত নহে, কিন্তু আপনার সীমার বাহিরে যাইতে চায়; সাহিত্য ও ইতিবৃত্তেও আমরা এই আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ দেখিতে পাই। প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবিগণ কাব্যে এবং উপন্যাসে যে সকল আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই সকল চরিত্র কল্পিত হইলেও যে মানবসমাজে অমরত্ব লাভ করিয়াছে, সে অমরত্বের মূলে মানুষের ধর্ম্মভাব। ইতিহাসবর্ণিত মহাপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ অসামান্য জ্ঞানবুদ্ধি ও শৌর্য্যবীর্য্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন; আমরা সে জন্য তাঁহাদিগকে যে সম্ভ্রম ও গৌরব দান করি, এবং কাহারও কাহারও সুদৃঢ় অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রীতি স্মরণ করিয়া আমরা যে ভক্তি ও আনন্দ অনুভব করি—সেই সম্ভ্রম ও গৌরব, সেই ভক্তি ও আনন্দের মূলেও মানুষের ধর্ম্মভাব। মানুষ অনন্তের যাত্রী। যে মহত্ত্ব মানুষের অপ্রাপ্য, তাহার আকাঙ্ক্ষা এবং যে পূর্ণতা মনুষ্যচেষ্টার অতীত, তাহার অনুসরণই ধর্ম্মের প্রাণ। কিন্তু কোন মানুষেই আমরা পূর্ণতার আদর্শ পাই না। ভগবান স্বহস্তে মানবপ্রাণে যে পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা স্থাপন করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহাকে লাভ করিলেই সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি।

পৃথিবীতে অনেক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল ও এখনও আছে। সকল ধর্ম্মই যে সমান সত্য ও সকলগুলিই যে সমানরূপে মুক্তির সহায়, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। অনেক ধর্ম্ম নিজ নিজ উপাস্য দেবতার চরিত্রে নানারূপ জঘন্যতা আরোপ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এই সকল ধর্ম্ম মিথ্যা। যে ধর্ম্ম যে পরিমাণে ভগবানে পূর্ণতা প্রদান করে, সেই ধর্ম্ম সেই পরিমাণে সত্য ও পবিত্র।

মানুষ যাহা কিছু সৃষ্টি করে, যাহা উদ্ভাবনা করে; সকলই অপূর্ণ। শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান সকল বিষয়েই

মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে; ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। মানুষ অদ্যাবধি যে পবিত্রতম ধর্ম্ম উদ্ভাবন করিয়াছে বা ভবিষ্যতে কখনও উদ্ভাবন করিবে, তাহাও অনন্তস্বরূপের পূর্ণমহিমা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা তাঁহাকে যে হৃদয়দর্পণে দর্শন করি, সে দর্পণ কত ক্ষুদ্র ও মলিন! আমরা তাঁহাকে যে বিশ্বে দর্শন করি, সেই বিরাট্ বিশ্বের কত ক্ষুদ্র অংশের সহিত আমরা পরিচিত! আমরা শাস্ত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা পাঠ করি, তাহা ভক্ত বিশ্বাসীগণের আপ্ত-বাক্য হইলেও মানুষের অপূর্ণ ভাষাতেই লিখিত। আমরা তাঁহার যে বাণী অনুপ্রাণনারূপে আমাদের অন্তরে লাভ করি, যাহাতে আমরা সে বাণীকে গ্রহণ করিতে পারি, এজন্য আমাদের ক্ষুদ্র ধারণার উপযোগী করিয়াই তিনি তাহা প্রকাশ করেন। বাল্য-কালে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভগবান সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা থাকে, তাহার মধ্যেও অনেক ছেলেমানুষী থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে যতই আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে থাকে ও বিবেকের উন্মেষ হইতে থাকে, ততই আমরা বুঝি যে তিনি রাগদ্বেষের অধীন নহেন, তিনি অজর অমর নিরাকার ও চিন্ময়, তিনি অনন্ত মঙ্গলময় ও পরিপূর্ণ পবিত্রস্বরূপ। আমরা ক্রমশঃ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, তাঁহার জ্ঞান ক্রমশঃ আমাদের অন্তরে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তথাপি আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা কখনই সেই অনন্তদেবের পূর্ণ মহিমা ধারণা করিতে পারি না, এবং তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের যে উচ্চতম চিন্তা তাহাও নির্ম্মল সত্য নহে, তাহাও মানবীয় ভ্রম ও কুসংস্কারের ছায়া হইতে একান্ত নির্ম্মুক্ত হইবার নহে।

ধর্ম্ম যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ভগবানকে লাভ করাই যে মানুষের পরম গতি ও চরম সার্থকতা, মানবপ্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিলে সে সত্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বুদ্ধি মানবের একটী স্বর্গীয় শক্তি। মানুষ জগতের ঘটনাবলী দেখিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাদের কারণ অনুসন্ধান করে। মানুষ স্বভাবতই জানিতে চায় যে, জগতের এই আশ্চর্য্য নিয়ম ও শৃঙ্খলা কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধি বলে যে, জগতের এক চৈতন্যময় স্রষ্টা বা আদিকারণ আছেন। ধর্ম্মের যাহা মূল সত্য, বুদ্ধি মানুষকে সেই সত্য শিক্ষা দেয়। আবার মানুষ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া মানুষ যখন একএকটা নিয়ম অবধারণ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার কত আনন্দ! বিশেষ, মানুষ যখন এমন কোন নিয়মের সন্ধান পায়, সমগ্র বিশ্ব যে নিয়মের অধীন, তখন তাহার আনন্দ আর ধরে না। বিজ্ঞান এই কথাই ঘোষণা করিতেছে যে, শিশুহস্তনিক্ষিপ্ত এক-খণ্ড প্রস্তর যে শক্তির দ্বারা পরিচালিত, সেই শক্তিই পৃথিবীকে সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বিঘূর্ণিত করিতেছে এবং অনন্ত গগনে নক্ষত্রকে নক্ষত্রের সহিত গ্রথিত করিয়াছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যদি একই নিয়মের দ্বারা শাসিত হয়, তবে কি আমরা বলিব না যে বিশ্বরাজ এক এবং অদ্বিতীয়? তবে কি আমরা বলিব না যে যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে ভক্তগণ বিশ্বাসের আলোকে যে সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির আলোকেও সেই মহাসত্যেই উপনীত হইয়াছি?

ধর্ম্মের মূল যে মানবঅন্তরে নিহিত আছে, মানুষের বিবেক তাহার আর একটী সাক্ষী। জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণে বিবেক আমাদিগকে অতি পরিষ্কার ভাষায় বলে যে "ও পথ নয়, এই পথ; এই পথে ধর্ম্ম আর ঐ পথে অধর্ম্ম।" বিবেকের কথা যখন আমরা অগ্রাহ্য করি তখন আত্মগ্লানি ভোগ করি এবং সুস্পষ্ট অনুভব করি যে, আমাদের উপরে একজন প্রভু ও বিচারক আছেন; বিবেক তাঁহারই বাণী। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন কালে কি সুসভ্য কি অসভ্য প্রায় সকল অব-স্থার লোকই এই সত্য স্বীকার করিয়াছে যে, বিবেক-ব্রহ্মবাণী।

অধর্ম্মকে ঘৃণা করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভা-বিক। মানুষের সহজ বিশ্বাস এই যে ধর্ম্মরাজ ভগবান ধর্ম্মবিধি-অনুসারেই এই জগৎ শাসন ও পালন করিতে-ছেন। যখনই আমরা দেখি যে একটা লোক অত্যাচার ও প্রবঞ্চনা দ্বারা সংসারে অনেক উন্নতি করিতেছে এবং স্ফীতবক্ষে সদর্পে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে। আমরা মনে মনে বলি, "থাক তুমি, যাবে কোথা? তোমার জন্য শাস্তি তোলা আছে!" অনেক সময়ে পাপী ভগবানকে ভুলিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু ভুলিয়া থাকিতে পারে না। তিনি স্বহস্তে মানবঅন্তরে যে ধর্ম্মবিধি লিখিয়া দিয়াছেন, মানুষ তাহা পাপের আবর্জ্জনা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু জীবনের গভীর মুহূর্ত্তে সে লেখা আবার ফুটিয়া উঠে। যে পরিমাণে আমরা বিবেকের অনুবর্ত্তী হই, সেই পরিমাণে ধর্ম্ম আমাদের নিকটে সত্য হয় ও সেই পরিমাণে আমরা ধর্ম্মরাজ ভগবানকে ভক্তি করিতে সমর্থ হই।

মানবঅন্তরে যে সকল সুকোমল বৃত্তি আছে, সেগুলির কথা চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে ধর্ম্ম মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। শিশু সর্ব্বপ্রথমে পিতা-মাতাকেই ভালবাসিতে শিক্ষা করে। এই ভাল-বাসাই ধর্ম্মের বীজ। আমাদের আত্মার স্বর্ণসিংহাসনে

অধিষ্ঠিত পরম পিতা ও স্নেহময়ী পরম জননীকে ভালবাসা ও ভক্তি করা ভিন্ন ধর্ম আর কি? সুতরাং বলিতে হয় যে জীবনের ঊষাকালে মানুষ যে প্রেমের দীক্ষা লাভ করে, সেই প্রেমেই ধর্মের আরম্ভ এবং ধর্ম সেই প্রেমেরই পরিণতি।

ধর্ম যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক তাহা আর একটী কথা চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি। মানবপ্রাণের অন্তরে অনন্তের প্রতি অতি আশ্চর্য্য আকর্ষণ আছে। যাহা কিছু ভূমা, বিরাট, আমাদের ধারণার বহির্ভূত, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, যাহার উপরে অসীমের ছায়া পড়িয়াছে—তাহাই মানুষকে মুগ্ধ করে। এই জন্যই নির্জ্জন অন্ধকার অরণ্য, বিশাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষ, উন্মত্ত গভীরনিনাদী জলপ্রপাত, গগনস্পর্শী তুষারকিরীট পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিয়া আনন্দে আমাদের শরীর কণ্টকিত হয়। এই জন্যই অসাধারণ প্রতিভা, দুর্জ্জয় সাহস, অটল প্রতিজ্ঞা, আত্মহারা প্রেম, জীবনব্যাপী অক্লান্ত সেবা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া যাই। "নাল্পে সুখমস্তি" একথা অতি সত্য। যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু পরিমিত, যাহার সহিত আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, জীবনে যাহা আমরা সদাসর্ব্বদা দেখি, তাহাতে আমাদের তৃপ্তি নাই। মানুষের হৃদয় পূজা করিতে চায়। মানুষ ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। এই ভক্তিবৃত্তি মানবঅন্তরে এত প্রবল যে, যখন মানুষ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে না পায়, তখন অসাধারণ ব্যক্তিগণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে; কিম্বা অসাধারণ শক্তি আরোপ করিয়া নানাপ্রকার দেবদেবীর সৃষ্টি করে। ধর্ম্ম যে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, ভক্তিভাব তাহার প্রমাণ।

আবার মানুষ স্বভাবতই সুন্দরকে ভালবাসে। সৌন্দর্য্যপ্রীতি মানবঅন্তরের একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। এই সৌন্দর্য্য সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত একটী আশ্চর্য্য রহস্য। পাহাড়পর্ব্বত নদনদী বনভূমি ও শস্যক্ষেত্র, প্রভাত ও সূর্য্যাস্তকালের বিচিত্র বর্ণের মেঘমালা, দিবাভাগের স্নিগ্ধ নীল আকাশ, নিশীথ অন্ধকারে স্থিরজ্যোতি নক্ষত্ররাজী—বাস্তবিক জগতে সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য প্রকৃতির অতীত যিনি তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়কে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে। জগতের আশ্চর্য্য কৌশলে যত লোক ভগবানের জ্ঞানলীলার পরিচয় লাভ করেন, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক লোক জগতের শোভাসৌন্দর্য্যে তাঁহার প্রেমলীলা দর্শন করেন।

মানুষের জড় দেহ আছে সত্য, মানুষের কতকগুলি পশুপ্রবৃত্তি আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই; কিন্তু মানুষ শুধু জড় নহে, শুধু পশুও নহে। সমগ্র জড় জগৎ অচ্ছেদ্য নিয়তির অধীন, সমগ্র পশুরাজ্য প্রবৃত্তির দাস; কিন্তু মানুষ স্বাধীন, মানুষ চির মুক্ত। মানুষের এই নৈতিক স্বাধীনতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। মানুষের বিবেক (conscience) অনুজ্ঞারূপী—কেবল যে জীবনের প্রতিক্ষণে কোন্‌টা ধর্ম্মের পথ আর কোন্‌টা অধর্ম্মের পথ বলিয়া দেয় তাহা নহে, কিন্তু অভ্রান্ত ভাষায় আমাদিগকে অধর্ম্মের পথ পরিহার করিতে ও ধর্ম্মের পথে চলিতে আদেশ করে। যখনই আমরা বিবেকের আদেশকে তুচ্ছ করিয়া অধর্ম্মের পথে চলি, অন্তরের তীব্র গ্লানির সহিত কি আমরা স্বীকার করি না যে, ধর্ম্মের পথে যাইবার স্বাধীনতা আমাদের ছিল কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াছি? ইহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। মানুষ যদি শুধু জড় হইত, যদি শুধু পশু হইত, এই অপূর্ব্ব স্বাধীনতা কখনই তাহার থাকিত না। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহারই আদর্শে গঠিত। তাই ঋষিরা তাঁহাকে বলিয়াছেন "পিতা নোঽসি"। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষ লতা গুল্ম সকলই তাঁহার সৃষ্টি, কিন্তু মানবাত্মায় আমরা তাঁহার যে প্রতিবিম্ব দর্শন করি, অন্যত্র তাহার আভাস মাত্র পাই না।

শিশু ও সঙ্গীত।

(সঙ্গীতভারতী ডাঃ শ্রীবাণী দেবী)

ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদসম্মত যে, সঙ্গীত মানব মাত্রেরই মনোভাব প্রকাশ করিবার অন্যতর প্রকৃষ্ট উপায়। বস্তুত ইহাকে একটী ভাষাবিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সঙ্গীত অস্ফুট মনোভাবকে পরিস্ফুট আকার প্রদান করে—ইন্দ্রিয়াতীত ভাবকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া দেয়। সঙ্গীতের পূর্ণ বিকাশে আমরা তাহার ভিতর দিয়া এক বিরাট অচেনা অজানা রহস্যময় রাজ্যের সন্ধান পাই; এবং সেই সঙ্গে এক অনির্ব্বচনীয় অপার আনন্দসাগরে অবগাহন করিয়া আত্মহারা হইয়া যাই। আমাদের মনপ্রাণ তখন এক অপূর্ব্ব রসে অভিষিক্ত হয়। সীমাবদ্ধ মানব ক্ষণেকের জন্য ভগবানের অনন্ত অসীম ভাবে আপনাকে হারাইয়া তৃপ্তিলাভ করে। মানবহৃদয়ে বহুবিধ ভাব আনিয়া দিবার শক্তি

সঙ্গীত ধারণ করে। মানবের মনোভাব ব্যক্ত করিবার পক্ষে সঙ্গীত একটী অপূর্ব্ব পন্থা।

সঙ্গীত সহজেই আমাদের মনপ্রাণ হরণ করে। বিশেষত কোমলমতি শিশু ও বালকদিগের উপর সঙ্গীত আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম, এবং তাহাদের কল্পনাশক্তির উপর ইহা আশ্চর্য্যরূপ ক্রিয়া করে।

সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থির করিয়া বলা দুরূহ, এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ দেখা যায়। ইহা ভাষারই ন্যায় পুরাতন—বোধ হয় ভাষা হইতেও প্রাচীনতর। মনে হয়, সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি সঙ্গীত জন্মলাভ করিয়াছে—নির্ঝরিণীর কুলুকুলু ধ্বনিতে, অরণ্যে বৃক্ষরাজির বিকম্পনে, বিহগদিগের কূজন-কাকলীতে গ্রহতারকার নীরব গতিতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গীত অহর্দিন অনুক্ষণ ধ্বনিত হইতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির এই সঙ্গীতের প্রতি নিবিষ্টচিত্তে প্রণিধান করিলে ইহার অন্তরে ছন্দ, তাল, বা লয়ের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। বোধ হয় সেই কারণে অনেকের মতে ছন্দ, তাল বা লয় হইতেই সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি। আদিম-মানব ছন্দের ভিতরেই সঙ্গীতের ধ্বনি প্রথম শুনিতে পায়। এই ছন্দের রেশ তাহার হৃদয়দুয়ারে যে প্রথম আঘাত করিল ও মনপ্রাণ হরণ করিল, সেই অনুভূতি হইতেই ক্রমশঃ সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকের মতে একই সুরের বা একই তালের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতেই সঙ্গীতের বোধ প্রথম বিকশিত হয়। সভ্যতার আলোক যখন প্রথম উন্মেষ লাভ করিয়াছে, তখন হয় ত আদিম মানব সমুদ্রকূলে বেড়াইতে বেড়াইতে দুইটী শামুকের খোলা কুড়াইয়া ঠোকাঠুকি করিতে করিতে যে ছন্দোময় ধ্বনি প্রাপ্ত হইল, তাহাতে সে অপূর্ব্ব তৃপ্তি-লাভ করিল। ক্রমে সে একদিন তাহার নিজেরই অজ্ঞাতসারে ফাঁকা শামুক বা শূন্যগর্ভ অন্য কিছুর মুখে শুষ্ক চর্ম্ম লাগাইয়া তাহার উপর আঘাতের ফলে যে আওয়াজ শুনিতে পাইল, তাহাতে সে নিজেই অবাক হইয়া গেল। ইহাই বোধ হয় ঢাক-ঢোল প্রভৃতির উৎপত্তির মূল। দন্ত অথবা শুষ্ক হাড় বা কাষ্ঠখণ্ড দুইটির পরস্পরের আঘাতের ফলে যে শব্দ নির্গত হইল তাহা হইতেই ক্রমে তালের সৃষ্টি হইল। ইহারই অনুকরণে দুই কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা তাল দেওয়া আজও নিম্ন-শ্রেণীর মানবদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

ছন্দ বেতালা না হইলে উহা বিনা সুরসংযোগেও আমাদের প্রাণে এক প্রকার উন্মাদনা আনিতে সক্ষম দেখা যায়। কীর্ত্তনে খোলবাদ্য ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয়-স্থল। ইহা তো জানা কথা যে, বাজনার ছন্দোবাদ্যের সহিত এই প্রকার উন্মাদনার কারণেই তালে তালে পা ফেলিয়া চলা কত সহজ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আমাদের কর্ণ যে কেবল সুরের জন্যই উৎকর্ণ থাকে তাহা নহে, আমাদের প্রাণে আনন্দ দান করিতে ছন্দোময় বাদনও যথেষ্ট। সেইরূপ মানুষের সুতান কণ্ঠসঙ্গীতেরও উৎপত্তির মূল বোধ হয় সুকণ্ঠ বিহগদিগের শিশ প্রভৃতি এবং পার্ব্বত্য বাঁশে বায়ুর আঘাতে নির্গত বংশীধ্বনির অনুকরণ।

মানব যতই সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল, ততই তাহার অন্তরে তালমানের এবং সুতান কণ্ঠসঙ্গীতের অনুভূতি অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে সে তাল, লয় ও কণ্ঠসঙ্গীতের মিলনসাধনে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের যথাযুক্ত মিলনের ভিত্তিতেই বর্ত্তমান উন্নত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত। এই উন্নত সঙ্গীতই মানবের মনপ্রাণ হরণ করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সুরের অভাবেও সাঙ্গীতিক মাধুর্য্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। খোল বা মাদলের উপর একই বোল যখন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ক্রমাগত বাজান হয়, তখন তাহা হইতে যে সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠে, তাহার লহরী আমাদের প্রাণে আসিয়া স্পর্শ করে এবং আমাদিগের মনপ্রাণকে স্পন্দিত করিয়া তোলে। আমরা জানিনা যে কোন্ এক অজানা ক্ষণে ছন্দোময় তাল ও সুস্বরলহরীর পরস্পর সমাবেশের ফলে উন্নত সঙ্গীতের জন্ম লাভ হইল। কিন্তু বলা বাহুল্য সঙ্গীতের সেই আদিম কালে তালেরও বিভিন্নতা প্রকাশ পায় নাই এবং স্বরসমাবেশেরও বিভিন্নতা বিশেষ পরিলক্ষিত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে কোল সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গীতের প্রণালী দেখিয়া মনে হয় যে, সেই আদিমকালেও কি তাল, কি সুর, উভয়েতেই একটা একঘেঁয়ে ভাব বিদ্যমান ছিল।

তাল ও সুরের সমাবেশের ফলে মানবহৃদয়ে যে সঙ্গীত বিকশিত হইল, সেই সঙ্গীত অবলম্বনে মানব স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিবার একটি সুন্দর পন্থা আবিষ্কার করিল—সে তাহার উদ্বেলিত ভাবরাশি ব্যক্ত করিবার সুগম পথের সন্ধান পাইয়া বাঁচিয়া গেল। কালে সে মৃতদেহ হইতে প্রাপ্ত নাড়িভুঁড়ি হইতে প্রস্তুত তাঁতের সাহায্যে এবং তাহারও পরে ধাতুনির্ম্মিত তারের সাহায্যে বাদ্যযন্ত্রনির্ম্মাণে প্রয়াস পাইল। তারের নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রে নানাবিধ সুবিধা থাকায় উহারই সমধিক প্রচলন হইল। যথাসময়ে আকারে প্রকারে ও গঠন-প্রণালী প্রভৃতিতে বাদ্যযন্ত্রের বহুল উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল।

দেশ কাল ও অবস্থাবিশেষে সঙ্গীত দুই বিভিন্ন পথ ধরিয়া চলিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইহা রাগ-রাগিণীর আকারে এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে স্বরসংবাদের আকারে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিল। সঙ্গীতের আদিম কালের স্বরসন্ধি বা বিভিন্ন স্বরের সামান্যরূপে একত্র সমাবেশ স্বরসংবাদের উৎপত্তির মূল কারণ হইলেও স্বরসংবাদ সঙ্গীতরাজ্যে যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। এই স্বরসংবাদ সঙ্গীত-ভাণ্ডারের প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, ইহা সঙ্গীত-রাজ্যে নবপ্রেরণা ও নিত্য নব সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া দিল।

পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে, একএকটী জাতির এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরে সঙ্গীতের একএকটী বিশেষ ধারা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমাদের মনে হয়, এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্গীতের অপরাপর ধারাও যে বর্জ্জন করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আমাদের দেশে রাগরাগিণীমূলক সঙ্গীতই সমধিক বিকাশলাভ করিয়াছে। এই কারণে ইহা এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গীতে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবন ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলে আমাদের দেশের শিশুদিগের প্রাণে সঙ্গীতের উন্মেষ অবধি প্রধানত এই রাগরাগিণীমূলক সঙ্গীত অবলম্বনেই সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে শিশু বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠে, তাহার মন পবিত্রতায় সৌন্দর্য্যে সুন্দরভাব ধারণ করে। সঙ্গীত উপলব্ধি করিবার শক্তি প্রত্যেক মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত একটী অমূল্য দান। শিশুর অন্তরে সেই শক্তি বিকশিত করিয়া তোলাই প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য। এই কার্য্য সামান্য নহে, কিন্তু গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ। শিশুর অন্তরে এই শক্তি ধরিতে পারা এবং সময়ে তাহা ফুটাইয়া তোলা অত্যন্ত ধীরতার সহিত সুদীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে ইহার প্রতি অন্তরের অনুরাগ থাকা আবশ্যক।

শিশু যখন হাতে তালি দিয়া তালে-বেতালে নাচিতে থাকে এবং কণ্ঠ হইতে নানাবিধ সুর বাহির করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার ভিতরে শিশুপ্রাণের সঙ্গীত ব্যক্ত করিবার প্রচেষ্টা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অনেক পিতামাতা শিশুর এইরূপ প্রচেষ্টার কারণে বিরক্তিবোধ করেন এবং শিশুকে এরূপ কার্য্য হইতে ভৎসনাদি করিয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এভাবে শিশুর ঐ প্রচেষ্টার কণ্ঠরোধ না করিয়া উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত আকারে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। তবেই উত্তরকালে সংসারে ঐভাবে গঠিত শিশুদিগের দ্বারা সুখশান্তিলাভের আশা সফল হইবে বলিয়া মনে করি। ঐভাবে গঠিত শিশুদিগের ভিতর হইতে তানসেন, আমীর খস্রু প্রভৃতির ন্যায় সুগায়কের আবির্ভাব হইলে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের কারণ হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, যে পরিবারে বংশানুক্রমে সঙ্গীতের চর্চ্চা না থাকে, সেই পরিবারের শিশুদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার চেষ্টা নিরর্থক। ইহা সত্য বটে যে, পুরুষানুক্রমে পরিবারে সঙ্গীতচর্চ্চা থাকিলে শিশুদিগের পক্ষে সঙ্গীতশিক্ষার পথ সুগম হয়। কিন্তু তাই বলিয়া পরিবারে সঙ্গীতচর্চ্চার অভাব থাকিলে যে সেই পরিবারের শিশুদিগের সঙ্গীতসাধনা সফল হইবে না, তাহা মনে করা সঙ্গত নহে। সঙ্গীতসাধনায় সিদ্ধিলাভ বংশানুগত চর্চ্চা অপেক্ষা সঙ্গীতশিক্ষকদিগের উপযুক্ত শিক্ষাদান এবং ছাত্রদিগের উপযুক্ত সাধনার উপর অধিকতর নির্ভর করে।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শিক্ষাবিভাগের মাননীয় ডিরেক্টার মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-তালিকায় সঙ্গীতশিক্ষা অন্যতর বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেই কারণে বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বনিম্নশ্রেণী হইতেই সঙ্গীতশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়েই দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। শিশুগণের প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষাও ইহার ব্যতিক্রম-স্থল নহে, কিন্তু শিশুদিগকে সঙ্গীতশিক্ষাদান অতিশয় ধৈর্য্য ও বহু পরিশ্রমসাপেক্ষ। শৈশবে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে, উত্তরকালে তাহারই ফল দেখা যাইবে—সময়ে তাহার উৎপাটন বা পরিবর্ত্তন দুঃসাধ্য, ইহা স্মরণ রাখিয়া শিশুদের প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষাদানে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাদাতাকে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক যত্নসহকারে বারি সিঞ্চন করিয়া শিশুর কোমল প্রাণে সঙ্গীত অঙ্কুরিত করিতে হইবে ; নচেৎ পরিণামে উত্তরকালে শিশুর অন্তরে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব আসা অসম্ভব নহে। সঙ্গীতের শিক্ষাক্রম ও প্রণালী যাহাতে হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তবেই শিশুর অন্তরে তমসাচ্ছাদিত সঙ্গীতানুরাগ সহজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে এবং যাহার অন্তরে সঙ্গীতপ্রীতি নাও দেখা যায়, তাহারও অন্তরে সঙ্গীতশিক্ষার বাসনা জাগিয়া উঠিবে।

শিশুদিগের অন্তরে সঙ্গীতসাধনার প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে চাহিলে শিক্ষাপ্রণালী কঠোর হইবার পরিবর্ত্তে

কোমল হওয়া আবশ্যক। সঙ্গীতশিক্ষার প্রারম্ভে শিশুকে তাহার ইচ্ছানুরূপ আশ মিটাইয়া গাহিতে দিবে; যখন তাহার নিজস্ব গানের উৎস নিঃশেষিত হইবে, তখন তাহার নিকট দুইএকটি সহজ সুর গাহিয়া শিক্ষকের সুরের সহিত সুর মিলাইতে প্রোৎসাহিত করিবে। ক্রমে তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিশুমনোচিত দুইএকটা সহজ তালনিবদ্ধ সুর শিক্ষা করাইবে। অনেকের মতে প্রথম অবধি সহজ তালের গানের সঙ্গে দুইএকটা ধ্রুপদ শিখাইলেও ভাল হয়।

প্রথম অবধি বেসুরা হইতে "ঠিক" সুরের প্রভেদ ও তারতম্য বুঝাইবার চেষ্টা করা উচিত। শিশুদিগের সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে একটী বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার বিষয় এই যে, তাহাদের শিক্ষণীয় গানগুলি নিতান্ত একঘেঁয়ে বা কাটখোট্টা ধরণের যেন না হয়। শিশুদিগের সঙ্গীতশিক্ষা পদ্ধতিতে গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন না করিয়া যাহাতে উহা তাহাদের রুচিকর ও চিত্তাকর্ষক হয়, সেই-দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সঙ্গীতশিক্ষা শিশুদিগের হৃদয়গ্রাহী হওয়া আবশ্যক। এই কারণে শিশুদিগের মনস্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ শিক্ষকের হস্তে শিশুদিগের সঙ্গীত শিক্ষার ভার সংন্যস্ত করা বিধেয় নহে। এরূপ শিক্ষক শিশুদিগের অন্তরে সঙ্গীতশিক্ষায় বিরাগই উৎপাদন করিবেন মনে হয়। শিশুদিগের সঙ্গীতশিক্ষকের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে ধৈর্য্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম অবধি সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মকানুনের পরিবর্ত্তে সহজ সরস সুরের সহিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

শিশুদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে গিয়া অনেকের মনে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে, কত বয়সে শিশুর অন্তরে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়; এবং তাহার কত বৎসর বয়স অবধি সেই সঙ্গীতানুরাগ ফুটাইয়া তুলিতে আমাদের সহায়তা করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে শিশুসাধারণের জন্য কোন একটী বিশেষ নিয়ম স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সঙ্গত বা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথক্ পৃথক্ সময় নির্দ্দিষ্ট করা উচিত; কারণ বিভিন্ন শিশুর অন্তরে ভগবন্নিহিত সঙ্গীতবৃত্তি বিভিন্ন সময়ে প্রথম বিকশিত হইতে দেখা যায়।

শিশুর অন্তরে সঙ্গীতের প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকিলে তাহা বৎসর তিনচার বয়সের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতে চাহে, দেখা যায়। কি ভারতে কি পাশ্চাত্য দেশে শৈশবেই সঙ্গীতপ্রতিভার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইতে পারে। এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, একটি তিনচার বৎসরের শিশু ওস্তাদের গানের সহিত বাঁয়া-তবলায় সঙ্গত লাগাইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করিতেছে। আমাদের যোড়াসাঁকোর বাটীতে বাপ, জোজো প্রভৃতিদের মধ্যেও তিনচার বৎসর বয়সেই সঙ্গীতানুরাগ বেশ একটু বিকশিত হইতে দেখা গিয়াছে। বিলাতেও আটদশ বৎসরের একটি বালক সুশিক্ষিত ওস্তাদের ন্যায় বেহালা বাজাইয়া হাজার হাজার লোককে মুগ্ধ করিতেছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতানুযায়ী

আকারমাত্রিক স্বরলিপিপদ্ধতি ও চিহ্নের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন। এই সাতটী স্বর একত্রে মিলিত হইয়া একটী সপ্তক গঠিত হয়। এতদ্দেশীয় সঙ্গীতে সাধারণতঃ তিনটী সপ্তকের ব্যবহার আছে; যথা—উদারা (নিম্ন) মুদারা (মধ্যম) তারা (উচ্চ)। উদারা সপ্তকের চিহ্ন,—স্‌, র্‌, গ্‌, ম্‌, প্‌, ধ্‌, ন্‌। মুদারা সপ্তকের চিহ্ন—স, র, গ, ম, প, ধ, ন। তারা সপ্তকের চিহ্ন—র্স, র্র, র্গ, র্ম, র্প, র্ধ, র্ন।

২। উক্ত সাতটী স্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটী স্বরে কোমল ও কড়ি, অর্থাৎ বিকৃত ভাব আছে। যথা—

কোমল র = ঋ; কোমল গ = জ্ঞ; কোমল ধ = দ; কোমল ন = ণ; কড়ি ম = হ্ম।

৩। স্বর উচ্চারণের সময় কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে। গানবিশেষে গতি দ্রুত, মধ্য, কিম্বা বিলম্বিত হইয়া থাকে। এক, দুই, তিন, চার এই কয়টী সংখ্যা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একএকটা করতালি দিয়া মাত্রার গতি স্থির করিয়া লওয়াই সহজ উপায়। ইহাকেই মাত্রার মধ্যগতি বলা যায়।

৪। মাত্রা = া (আকার) যথা :—সা একমাত্রা; সা-া, দুই মাত্রা; সা-া-া তিন মাত্রা ইত্যাদি। দুইটী স্বর এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, দুইটী স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরে আকার বসে, যথা :—সরা, গমা, ইত্যাদি। এরূপ স্থলে প্রতি স্বরটী অর্দ্ধমাত্রা। এইরূপ এক-মাত্রার মধ্যে তিনটী স্বর উচ্চারিত হইলে সরগা; প্রত্যেক স্বর একতৃতীয়াংশ মাত্রা। এক মাত্রার মধ্যে চারিটী স্বর উচ্চারিত হইলে সরগমা প্রত্যেক স্বরটী সিকি মাত্রা। এইরূপ এক মাত্রার মধ্যে যতগুলি স্বরই উচ্চারিত হউক না কেন, যথা সরগমপা, সরগমপধনা, ইত্যাদি; প্রত্যেক স্বর সমান অংশে বিভক্ত ইহাই বুঝিতে হইবে।

৫। অর্দ্ধমাত্রার বিশেষ চিহ্ন = ঃ ; যথা—সাঃ, রাঃ, ইত্যাদি। কিন্তু সাঃ—দেড় মাত্রা, অর্থাৎ আকার এক মাত্রা এবং বিসর্গ অর্দ্ধমাত্রা, উভয়ে মিলিয়া দেড় মাত্রা। সাঃ রাঃ—দুই মাত্রা। অর্থাৎ সাঃ দেড়মাত্রা, এবং রাঃ—অর্দ্ধমাত্রা লইয়া দুই মাত্রা।

৬। যখন কোন আনুসঙ্গিক স্বর কোন প্রধান স্বরকে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র অক্ষরে এইরূপ লিখিতে হয়, যথা—^স^রা, সা^র ইত্যাদি। ইহাকে স্পর্শ-স্বর বলা হয়।

৭। কতকগুলি মাত্রার সমষ্টির নাম তাল। তাল নানাবিধ যথা :—কাওয়ালী, একতালা, আড়াঠেকা, যৎ, ধামার ইত্যাদি। এই সকল তালের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, যে সকল তাল সমভাগে বিভক্ত তাহারা সমপদী যথা :—কাওয়ালী, একতালা, চৌতাল ইত্যাদি। এবং যে সকল তালের ভাগ সমান নহে তাহারা বিষম-পদী যথা :—যৎ, ধামার ইত্যাদি। তালসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২´, ৩, ৪, ০, ইত্যাদি সংখ্যা চিহ্নিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাগেই একটী করিয়া সম এবং এক দুই কিম্বা ততোধিক ফাঁক আছে। "০" চিহ্নিত "ফাঁক" এবং যে সংখ্যার শিরোদেশে রেফ চিহ্ন থাকে তাহাই "সম"। প্রত্যেক তাল-বিভাগেই এমন একটী স্থান আছে যেখানে বিশেষ একটা ঝোঁক পড়ে। যেখানে ঐ ঝোঁকটী পড়ে, সেই স্থানটিকেই "সম" কহে।

৮। প্রতি তাল-বিভাগের পর এইরূপ "।" ছেদ চিহ্ন বসে ; এবং তালের এক আবর্ত্তা অথবা ফের পূর্ণ হইলে "I" স্তম্ভ চিহ্ন বসে।

৯। আস্থায়ীর প্রারম্ভে, যেথান হইতে রীতিমত তাল আরম্ভ হয় সেইখানে ও প্রত্যেক কলির শেষে এইরূপ "II" যুগল স্তম্ভচিহ্ন বসে এবং যেখানে গান ও গৎ এককালীন শেষ হয় সেইখানে এইরূপ "IIII" দুই যোড় স্তম্ভচিহ্ন বসে। আস্থায়ীর আরম্ভে এইরূপ যুগল স্তম্ভ চিহ্নের বাহিরে গান ও গতের যে অংশটুকু লিখিত হয়, তাহা কেবল গান ও গৎ ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিতে হয়, উহা আর দ্বিতীয় বার গাহিতে হয় না। কারণ প্রত্যেক কলির শেষে ঐ অংশটুকু এইরূপ " " কোটেশন চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

১০। { }—পুনরাবৃত্তির চিহ্ন যথা :—{সা রা গা মা} অর্থাৎ এই অংশ দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

১১। ( )—পুনরাবৃত্তি লঙ্ঘনের চিহ্ন। যথা :—
{ সা রা (গা মা) } পা ধা। অর্থাৎ সা রা গা মা এই অংশ দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করিবার সময় (গা মা) এই অংশ লঙ্ঘন করিয়া একেবারে "পা ধা" এই অংশ ধরিতে হইবে।

১২। পুনরাবৃত্তিকালে যে স্থানে স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই স্থানে পরিবর্ত্তিত স্বর পূর্ব্ব স্বরের মাথার উপর এইরূপ [ ] ব্রাকেটের মধ্যে স্থাপিত হয়। যথা :—
[রা গা মা]
সা রা গা। কোন একটী কলি শেষ করিয়া আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার সময় যখন আস্থায়ীর কোন কোন স্বরের পরিবর্ত্তন হয়, তখন পরিবর্ত্তিত স্বর পূর্ব্বোক্তরূপে এইরূপ [ ] ব্রাকেটের মধ্যে লিখিত হয়, এই কলির শেষে যে এইরূপ "II" স্তম্ভ চিহ্ন থাকে, উহার মধ্যেও এইরূপ ব্রাকেট চিহ্ন বসে ; যথা :—"[ ]" ইহাতে এই বুঝায় যে আস্থায়ীতে গিয়াই কোন পরিবর্ত্তিত স্বর গাহিতে হইবে।

১৩। সাধারণতঃ যুক্তস্বরগুলি গড়ানে ভাবেই উচ্চারিত হয় ; যদি কোন স্থানে উহার প্রত্যেক স্বর পৃথক করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল স্বরের শিরোদেশে বিন্দুচিহ্ন দেওয়া থাকে। যথা—
স র গ ম। কোন এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায় তখন স্বরের নীচে এইরূপ ‿ চিহ্ন থাকে, যথা :—ম পা ইহাকে মিড় বলে।

১৪। স্বরবর্ণ অবলম্বনে সুরের টান চলে, তাহাকে "আশ" বলে। আশের চিহ্ন গানাক্ষরগুলির মধ্যে ছোট ছোট কসি অর্থাৎ হাইফেন থাকে। যখন স্বরের নীচে অক্ষর না থাকে তখন স্বরগুলির মধ্যে হাইফেন চিহ্ন বসে ; এবং গানের পংক্তিতে শূন্য (০) চিহ্ন দেওয়া হয় ; যথা :—সা -া -া -া অথবা সা-রা-গা-মা ইত্যাদি।
তু ০ ০ ০ তু ০ ০ ০

১৫। স্বরের ক্ষণিক নিস্তব্ধতার নাম বিরাম। বিরামের চিহ্ন হাইফেন (-) বর্জ্জিত আকার যথা :—
। । । । যেখানে হাইফেন-বর্জ্জিত এইরূপ "।" মাত্রা চিহ্ন যতগুলি থাকিবে, সেই স্থলে সেই কয়মাত্রা থামিয়া আবার তাহার পরবর্ত্তী স্বর অনুসারে গাহিতে হইবে। এরূপ স্থলে স্বরের বিরাম হয় কিন্তু মাত্রার গতির বিরাম হয় না।

১৬। আস্থায়ীর যে পর্য্যন্ত গাহিয়া অপর কোন কলি আরম্ভ করিতে হয়, সেই স্থানের শিরোদেশে "॥" যুগল দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া হয়। যথা :—সা রা গা মা

১৭। একই রকম স্বরের দুই কিম্বা ততোধিক কলি থাকিলে কেবলমাত্র প্রথম কলিতে স্বর, তাল, মাত্রা ইত্যাদি বসাইয়া অপর কলিগুলি তাহার নিম্নে যথাক্রমে লিখিত হইয়া থাকে। এবং উহাতে (১) (২) (৩) ইত্যাদি এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়।

১৮। অন্তরা গাহিবার পর যেরূপ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয়, সঞ্চারী গাহিবার পর আর সেরূপ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয় না ; সঞ্চারীর পরে আভোগ গাহিয়া শেষে আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয়। এইজন্য সঞ্চারীর শেষে আর কোন স্তম্ভচিহ্ন না দিয়া একেবারেই আভোগের শেষে এইরূপ "IIII" দুই যোড় স্তম্ভচিহ্ন দেওয়া হয়।

১৯। ছন্দঘটিত যে কোন শ্লোক অথবা কবিতা হউক না কেন, সকলেরই যেমন চারিটি করিয়া চরণ থাকে তেমনি গানেরও প্রায় চারিটি করিয়া চরণ থাকে অথবা কলি থাকে। প্রথম যে কলিটী থাকে তাহার নাম আস্থায়ী, দ্বিতীয় কলির নাম অন্তরা, তৃতীয় কলির নাম সঞ্চারী, এবং চতুর্থ কলির নাম আভোগ।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

বেহাগ—ঠুংরী।

উজল মধুর চাঁদিনী যামিনী হৃদয় হারিণী
শোভায় ছেয়েছে সারা ধরণী।
দেখিয়া দেখিয়া মধুর গগনে চাহে না ফিরিতে বিঘোর নয়ানে
একি রে আনন্দ ভরেছে ভুবনে।
নারি গো রাখিতে বাঁধি চিত মনের শোভায় ছেয়েছে সারা ধরণী॥
ঝুরু ঝুরু বহে মলয় পবনে শ্রান্তি ক্লান্তি দূরি' আনে জাগরণে
চারিদিকে আজি খেলিছে জীবনে তব প্রেমবাণী বাজে অনুক্ষণে
দুঃখ শোক গাথা পশে না মরমে নমি নত শিরে
হে মোর জননী শোভায় ছেয়েছে সারা ধরণী॥

গান ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১´ • ১´ •
II সা সা গা সা। গা মা পা পা I না পা না না। র্সা র্সা র্সা র্সা I
উ জ ল ম ধু র চাঁ দি নী যা মি নী হৃ দ য় হা

১´ • ১´ •
I -া না ধপা -পা। -া মা পা -া I গা গা -া গা। গা মা পক্ষা পক্ষা I
• রি ণী• • • • • • শো ভা য় ছে য়ে ছে সা• রা•

১´ •
I পগা গমা -মপা মা। গা -া রসা -সা II
•• ধ• •• র ণী • •• •

১´ • ১´ •
II{ পা পা পা পা। না -া না -া I র্সা র্সা র্সা র্সা। র্সা না র্রর্সা -র্সা I
দে খি য়া দে খি • য়া • ম ধু র গ গ • নে• •

১´ • ১´ •
I র্সা র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সর্রা র্সর্সা I না না নধা পক্ষা। পা র্সা না -া } I
চা হে না ফি রি • তে• •• বি ঘো র• ন• য়া • নে •

১´ • ১´ •
I র্সা র্সা র্গা র্গা। র্গা -া র্গর্মা র্পা I র্গা র্পা র্মা র্মা। র্গাঃ র্রঃ র্সা -া I
এ কি রে আ ন • ন্দ• • ভ রে ছে ভু ব • নে •

১´ • ১´ • :
I পা না র্সা না। ধনা -া ধপা -পা I গা মা পা মা। গাঃ রঃ সা -া I
না রি গো রা খি • তে• • বাঁ ধি চি ত ম • নে •

১´ • ১´ •
I মা মা -পা মা। সা সা গা পা I -া গমা -পা মা। গা -া রসা সা II
শো ভা য় ছে য়ে ছে সা রা • ধ• • র ণী • •• •

I { সা সা সা সা | সা -া সরা সন্ | I -ন্ সসা গা মা | পা -হ্মা পা -া I
সু র সু র ব • হে• •• • মন র প ব • নে •

I সা -পা পা পা | -হ্মা পা মা গা I -া গমা পা মা | গাঃ রঃ সা -া } I
শ্রা • ন্তি ক্লা • ন্তি দূ রি • আনে জা গ র • ণে •

I{ পা পা না না | না -া না -া I গা মা পা না | র্সাঃ নঃ র্রর্সা -র্সা I
চা রি দি কে আ • জি • খে লি ছে জী ব • নে• •

I র্সা র্সা র্সা র্সা | না -া ধপা -পা I -া হ্মপা না ধা | র্সা -া না -া } I
ত ব প্রে ম বা • নী• • • বাজে অ নু ক • ণে •

I র্সা র্সা র্গা র্গা | র্গা -া র্গা -া I র্গা র্মা র্পা র্মা | র্গাঃ র্রঃ র্সা -া I
দু খ শো ক গা • থা • প শে না ম র • মে •

I পা পা না র্সা | না -া ধপা পা I গা মা পা মা | গাঃ রঃ সা -া I
ন মি ন ত শি • রে• • হে মো র জ ন • নী •

I গা গা -া গা | গা মা পহ্মা পহ্মা I পগা গমা মপা মা | গা -া রসা সা IIII
শো ভা য়্ ছে য়ে ছে সা• রা • •• ধ • • • র নী • • • •

ইমন কল্যাণ—ঠুংরী।

এস দেবাধি দেব চিদাকাশে এস,
আকুল বসি হেথা মরমে বহি ব্যথা, লহ লহ জননী মোরে কোলে টেনে এস।
সব চলে যায়্ ছেড়ে মৃত্যু লহে যবে কেড়ে,
হতাশ পরাণে ঘেরে অশ্রু ঝরে নয়নে
সহিতে গো আর্ পারিনে মুকতি দাও দাও হে, আঁকড়ি ধরিতে দাও হে।
তোমারি গো চরণে দুঃখী দীন জনে এস॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সা সা II {সা পা পা পা | ধপা হ্মা গা -া I রগা রা গা মা | গা রগা রা সা } I
এ স দে • বা ধি দে • ব • চি • দা কা শে • • এ স

I ন্ রা রা পা | গা গা গা -া I ন্ রা গা হ্মগা | হ্মা ধা পা -া I
আ কু ল ব সি হে থা • ম র মে ব• হি ব্য থা •

I হ্মা ধা না র্সা | না ধা পা হ্মা I গা রা গা মা | গা রা ন্ রা II
ল হ ল হ জ ন নী মো রে • কো লে টে নে এ স

০ ৩ ১´ ২ ০

। মপমা গা -া ণা । দা দা র্সা ণা I র্সা র্সা -া -া । -া -া র্সনা র্সা । নদা -া পা পা ।

• • • • অ ন্য ক • থা ছা ড়ি • • • • দা• • ও • • স

৩ ১´ ২ ০

। দা পণদা দা পা I পা পণা পদা -া । -া পা পদপা দপা । মপমা গা মগা মা II

দা তাঁ• রি • ক • • থা • • ক ও• • • • • • • • "হৃ"

৩ ১´ ২ ০ ৩

II দা । {দা দা র্সা ণা I র্সা র্সা -া -া । -া -া র্সনা র্সা । র্সা -া -া দা । দা না র্সা র্সা I

স বে দে • খ তাঁ রি • • • • হ্ম• • স্না • • ভে বো না • এ

১´ ২ ০ ০ ৩

I র্সা র্ঋা -া -া । -া -া র্সনা র্সা । (নদা -া -া দা)} । নদা -া -া দা । দা দা র্সা না I

স বি • • • • প্রা• • স্না • • স যা • • আ ন ন্দে • রি

১´ ২ ০ ৩

I র্সা র্সা -া -া । -া -া র্সনা র্সা । নদা -া পা পা । দা পণদা দা পা I

ক ণা • • • • হ• • তে • • স্ব জ ন• বি •

১´ ২ ০

I দা -া -া পা । ণা -া দপা দপা । মপমা গা মগা মা II

ন • • • • • স্ব• • • • • • • • "হৃ"

৩ ১´ ২ ০ ৩

II সা । {সা সা -া ঋা I গা -া মা -া । -া -া মপমা মা । -া -া -া মা । মগা মা পা -া I

না যে তাঁ • র উ • চ্ছ • • • সি ম • • • উ ঠু• ক স •

১´ ২ ০ ৩ ১´

I পা দা -া -া । দা মা দা -া । পা -া -া দা । দা দা র্সা না I র্সা র্সা -া -া ।

বা র • • • • হি • মা • • দু খ শো • ক ক র • •

২ ০ ৩ ১´ ২

। -া -া র্সনা র্সা । নদা -া পা পা । দা পণদা দা পা I পদা -া -া পা । ণা -া দপা দপা ।

• • হো• • ক • • দূ র হো ক • ভ • • • • • স্ব• • •

০ ০ ৩ ১´ ২

। (মপমা গঋা সা সা)} । মপমা গা -া দা । {দা দা র্সা না I র্সা র্সা -া -া । -া -া র্সনা র্সা ।

• • • • • না • • • • ক রি তাঁ • র না ম • • • • পা• •

০ ৩ ১´ ২ ০

। র্সা -া -া দা । দা না র্সা র্সা I র্সা র্ঋা -া -া । -া -া র্সনা র্সা । (নদা -া -া দা)} ।

ন • • পূ র্ণ হো • ক স র্ব • • • • কা• • ম • • ক

০ ৩ ১´ ২ ০

। নদা -া -া দা । দা দা র্সা না I র্সা -া -া -া । -া -া র্সনা র্সা । নদা -া পা পা ।

ম • • তাঁ হা র • চ র • • • • ণ ধ• • রি • • হ

৩ ১´ ২ ০

। দা পণদা দা পা I দা -া -া পা । ণা -া দপা দপা । মপমা গা মগা মা II II

ও রে নি • র্ভ • • • • • স্ব• • • • • • • • "হৃ"

আশা—ঠুংরী।

তোমা সম প্রেমময় কে আছে শুভদারী

আজি নব নব ভাবে ভাই বন্ধু মিলে সবে সবে বন্দনা গীত তব গাই।

আনন্দ সঙ্গীত হইয়া ধ্বনিত গগন প্রাঙ্গন ছায়্

তারি সাথে একতানে গাহিব রে শত গানে প্রাণ মন হেন সদা চায়্।

হৃদয়ে হৃদয়ে আছে নাম তব উঠে বাজি সুখ বায়ু বহে সব ঠায়্

শান্তি সাগর তুমি আনন্দ আকর ভূমি মন সদা তোমা পানে ধায়্।

তোমারে না পাই যদি আর নাহি কোন গতি মুক্তির নাহিক উপায়

তোমারি চরণ দাও লইনু শরণ তায়্ রেখো প্রভু রেখো তব পায়্।

আশীষ দাও শিরে ঘরে যেন যাই ফিরে তোমারি হেরি মুখ ভায়্

সংসার মাঝে ছোট বড় কাজে মোদের হইও সহায়।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩ ॥

II সা সা। মা মা। মা মা। মপা মা I জ্ঞাঃ রঃ। জ্ঞা মা। জ্ঞঋা মঋা। সা -া} I

তো মা স ম প্রে ম ম০ য় কে ০ শু ভ দা০ ০ রী

১´

[মপা] ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩ ৩

I মা মা। মগা মা। পা পা। পা পা I দা পা। দা ণা। দা দা। (পা দপা)} I পা পা I

আ জি ন০ ব ন ব ভা বে ভা ই ব ন্ধু মি লে স বে০ স বে

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩

I পদা -া। দা দা। পা দা। পা মা I মপা দপা। মপা মজ্ঞজ্ঞা। -া -া। ঋসা -া II

ব ০ ন্দ না গী ত ত ব গা০ ০০ ০০০০০ ০০ ০০ ই

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩

II{মা -া। মগা মা। পা -া। পা পা I দা পা। দা ণা। দণদা -া। পা পা I

(১) আ ০ ন০ ন্দ স ০ ঙ্গী ত হ ০ ই য়া ধ্ব০০ ০ নি ত

(২) হৃ দ য়ে০ হৃ দ য়ে আ ছে না ম ত ব উ০০ ঠে বা জি

(৩) তো মা রে০ না পা ই য দি আ র না হি কো০০ ন গ তি

(৪) আ ০ শী০ ষ দা ও শি রে ঘ রে যে ন যা০০ ই ফি রে

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩

I দা -া। দা দা। পা দা। পা মা I মপা দপা। মপা -া। -া -া। -া -া} I

(১) গ ০ গ ন প্রা ০ ঙ্গ ন ছা০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ য়্

(২) সু খ বা য়ু ব হে স ব ঠা০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ য়্

(৩) মু ০ ক্তি র না হি ক উ পা০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ য়্

(৪) তো ০ মা রি হে রি মু খ ভা০ ০০ ০ ০ ০০ ০ য়্

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩

I{মগা গা। গা গা। মা মা। মা মা I সা দা। দা দা। পা দা। পা পা} I

(১) তা রি সা থে এ ক তা নে গা হি বা রে শ ত গা নে

(২) শা ০ ন্তি সা গ র তু মি আ ন ন্দ আ ক র ভূ মি

(৩) তো মা রি চ র ণ দা ও ল ই নু শ র ণ তা য়্

(৪) স ং সা র মা ০ ঝে ০ ছো ট ব ড় কা ০ জে ০

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩

I সা দা। দা দা। পা দা। পা মা I মপা দপা। মপা মজ্ঞজ্ঞা। -া -া। ঋসা -া IIII

(১) প্রা ণ ম ন স দা হে ন চা০০০ ০০ ০০০ ০০ ০০ য়্

(২) ম ন স দা তো মা পা নে ধা০০০ ০০ ০০০ ০০ ০০ য়্

(৩) রে খো প্র ভু রে খো ত ব পা০০০ ০০ ০০০ ০০ ০০ য়্

(৪) মো দে র হ ই ও স ০ হা০০০ ০০ ০০০ ০০ ০০ য়্

সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে হিন্দুধর্ম্ম।

(শ্রীসুকুমার হালদার)

১৮৬১।৬২ খৃষ্টাব্দে আমার পিতা লণ্ডনের University Collegeএ আইন (Jurisprudence) শিক্ষা করিতেছিলেন। সে সময়ে ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ অল্প কয়েকজন ব্যতীত বাঙ্গালী কম লোকই বিলাত গিয়াছিলেন। পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহনপ্রচারিত সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মপ্রচারে তিনি যত্নবান্ হইয়াছিলেন। লণ্ডনে তিনি রাজা রামমোহনের বন্ধু William Adamএর সংস্পর্শে আসেন। পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে Mr. Adamএর ভ্রাতুষ্পুত্রী Miss Helen Adam ২০শে মে ১৯০৩ সালে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺নির্ম্মলচন্দ্র হালদারকে যে পত্র লেখেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধার করা গেল :—

"My acquaintance with your father began in this way. My uncle, Mr. Adam, lived for more than 20 years in Calcutta and its neighbourhood and he knew Hodgson Pratt during part of that time. He came to London to live and as he was not in good health I left my home in Scarbro' to come to him to help to nurse him. One day Mr. Pratt called to consult with uncle about a lodging for your father who had come to England with Mr. Dall, Baptist (wrong,—Unitarian) Missionary, and in some way they did not agree; so your father decided to act independently of him and consulted Mr. Pratt who at once thought of Mr. Adam as suitable to advise with, so the result was that your father came to board with uncle and myself, Mr. Pratt finding the necessary money which, as you know, your father repaid. During your father's stay with us he and I were very friendly and he used to talk to me about his home and his father. He went to Notting Hill to give lessons to some one there in Bengali and often returned very tired. He suffered in the cold weather from chilblains and I did all I could do to relieve him. Hence his grateful and brotherly attachment to me. After living with us some time your father became an inmate of University College, Gower St., and we did not see him often after that."

Sir William Bentinckএর আমলে, Mr. William Adam, Commissioner of Vernacular Education in Bengal, Behar and Orissa ছিলেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত হইয়া স্বসঞ্চিত বাংলা-পুস্তকসমূহ University College, লণ্ডনের পুস্তকাগারে প্রদান করেন। আমার পিতা ঐ পুস্তকগুলির ভিতর হইতে রামমোহন রায়-রচিত হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক এক বাংলা পুস্তিকার ইংরাজী অনুবাদ *Cornhill Magazine*এ প্রকাশ করেন। অনুবাদটী নিম্নে দেওয়া গেল :—

RAMMOHUN ROY ON RELIGIOUS WORSHIP.

Sir,—The following translation of a small Bengali tract on Religious Worship, written by Rajah Rammohun Roy, is offered to your readers. The original (printed in 1829) is with the books presented by William Adam, Esq., to the library of University College, London. It contains nothing new or profound, nor is it characterized by the author's usual vigour of reasoning; but its chief merit consists in this—it shews clearly for what form of Religion the Rajah was preparing the minds of his countrymen.

With regard to the translation, it may be mentioned that no verbal rendering has been attempted. I have, besides, omitted the authorities from the Sastras, which Rammohun Roy had quoted in support of his statements.

Faithfully yours,
Rakhal Das Haldar.

University Hall, Gordon Square,
January 18, 1862.

Question. What is worship?

Answer. The attempt to gratify another is called worship; but with regard to the Supreme Being, it is the exercise of our intelligence respecting Him.

Q. Who is the Object of worship?

A. The Creator and Preserver of the universe, which is full of infinite varieties of things and persons, so incomprehensibly arranged, and so well adapted to each other, that nothing whatever is unnecessary; and which consists of the sun, the moon, the planets, and the stars, moving in their appointed paths far more wonderfully then clock-work.

Q. What sort of person is He ?

A. I have told you before that the Object of our worship is the Creator and Preserver of the universe. Neither scripture nor reason is able to affirm anything more about Him.

Q. Is there any means of ascertaining His nature ?

A. Both the Vedas and the Law repeatedly say that His nature trancends our comprehension and description, an affirmation which reason confirms ; for if the nature and extent of the universe, which is within our perception, cannot be known, how can the nature of God be known who is only inferred as the Creator and Preserver of the world ?

Q. Can any one object to this mode of worship ?

A. None can do so consistently, because we worship only the Creator and Preserver of the universe ; and to such a worship there can be no objection. Different sets of worshippers have different gods, but each set worship their peculiar god as the Creator and Preserver of the universe ; and, according to their own belief, they must acknowledge our worship as the worship of their peculiar gods. In this way, those who call time, or nature, or buddha (intelligence), or any object whatever, the Providence of the world, cannot reasonably object of the worship of Providence, simply as such. The various religious worshippers in China, Thibet, Europe and other countries, acknowledge their respective objects of worship as the Creator and Preserver of the universe ; and, according to their own belief, they must acknowledge our worship as the worship of their respective gods.

Q. In some passages of the Vedas, God has been termed imperceptible and incomprehensible ; and in others, cognisable ; how do you reconcile these contradictions ?

A. Where God is said to be imperceptible and incomprehensible, His nature is alluded to ; i. e., His nature cannot be known by any means. And where He is said to be cognisable, His existence is implied ; i. e., the admirable arrangements and laws observable in the universe imply that God exists. The functions of the body argue the existence of the intelligent soul in it ; but the nature of that soul which pervades the whole body and which guides it, i. e., what sort of thing it is, can by no means be known.

Q. Are you opposed and inimical to other worshippers ?

A. Never, whatever object men may worship, they worship, it, as God, or at least as the manifestation of God ; consequently, why should we be opposed and inimical to them.

Q. If you worship the same God as well as they, wherein do you differ from them ?

A. The difference between them and us is of two kinds. First, they ascribe to Him peculiar forms, and acknowledge certain localities as the places where He exists ; whereas we worship the intelligent Cause of the creation, without attributing to the same Cause any form or any particular location. Secondly, we find that the diffrent sets of worshippers of the particular forms of God quarrel with us, as has been said in answer to the fifth question.

Q. How is this worship performed ?

A. To contemplate, according to scripture and reason, that the Creator and Preserver of this perceptible universe is God, is the worship of Him. Self-control and the study of the Vedas &c., are the duties of the worshipper. By self-control, is meant an attempt to apply our mind and the organs of sense and action in such a way as will produce good to ourselves and others, instead of evil ; in fact, the worshipper is required to do to others only what he wishes they should do to him. By the study of the Vedas, is meant that the worshipper should contemplate God by employing words which imply His existence and attributes, as laid down in the Scriptures, since by habit we cannot comprehend meaning without words. Such words also should be used which signify that the benefits we are constantly receiving from fire, wind, the sun, the vegetable world &c, are derived from God ; and such sentiments should be confirmed by the exercise of reason. The Vedas repeatedly say that

truth is the basis of divine knowledge; so truth is to be depended upon, and thereby the worship of God, who is truth, is performed.

Q. According to this mode of worship, what are the rules regarding eating and the ordinary usages of life?

A. Eating and the ordinary usages of life should be regulated by the Scriptures. If any person does whatever he likes, without adopting any one of the recognized Sastras, he may be called a man of impulse. The Scriptures repeatedly forbid one to follow one's own inclinations only. Reason also says that if every one were to follow his own inclinations, and not the authority of the Scriptures, society would soon come to an end. To the followers of inclination, there is no distinction between propriety and impropriety of conduct; their conduct is justified by their inclinations. Now, the inclinations of all men are not of the same kinds; and in the fulfilment of various contrary inclinations disputes must frequently arise, and such frequent disputes may soon destroy society. The truth is, it is unworthy of man to spend his time in judging between the purity and impurity of food, instead of cultivating sciences and the knowledge of God. Whatever we may eat, it is changed within an hour and a half to what is called impure; this again is changed into articles of food, each as again, &c.: so the wise endeavour to purify their minds rather than their bodies.

Q. According to this mode of worship, are there any rules with regard to place, direction and time for worship?

A. Good time and place are desireable, but there is no special rule. Wherever, in whatever direction, or at whatever time, the mind is fixed, worship may be offered to God.

Q. Who is worthy to be instructed in this mode of worship?

A. All men are fit to receive instruction in this mode of worship; but our supreme felicity depends upon the degree of faith derived from purity of heart.*

* ইহা বাঙ্গলা "অনুষ্ঠান পত্রে"র অনুবাদ এবং ইহার রাজা রামমোহন রায়-কৃত ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন উৎসাহী সভ্য ৺রাখালদাস হালদার মহাশয়ের পৃথকভাবে কৃত এই অনুবাদটি বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে সে সময় সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। তং সং

সুরাপানের নিষেধবিধি।

[PROHIBITION.]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। নিষেধবিধির অর্থ কি?

নিষেধবিধি বলিতে ভালমন্দ সকল বিষয়েরই, অন্তত মন্দ যে-কোন বিষয়েরই নিষেধবিধি বুঝাইতে পারে। কাজেই এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে কোন্ বিষয়ের নিষেধবিধি আলোচিত হইতেছে। তাই সর্ব্বপ্রথমেই আমরা বলিয়া রাখিতেছি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে "নিষেধবিধি"র অর্থে সুরাপানের বিরুদ্ধে নিষেধবিধিই বুঝিতে হইবে। অহিফেনের মত সুরাপান-নিবারণসমস্যা সমগ্র জগতে বর্ত্তমানে পয়লা নম্বরের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্যাটী এতই বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, "নিষেধবিধি" বলিতে এখন সর্ব্বত্র সুরাপানেরই বিরুদ্ধে নিষেধবিধি বুঝায়; "prohibition বলিতে এখন prohibition against wine drinkingই বুঝায়। আমরাও সুরাপানের বিরুদ্ধে নিষেধ বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া জনসাধারণের মতানুসারেই সংক্ষেপে "নিষেধবিধি" শব্দই সাধারণত ব্যবহার করিব।

২। ভারত ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ড।

সুরাপানের ফল যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে না গিয়া কিরূপে পোষকতা করেন বা নীরব থাকিতেও পারেন, আমরা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। ভারতবর্ষ চিরকালই মদ্যপানের বিরোধী এবং বহুকাল যাবৎ ভারতবর্ষই এবিষয়ে সমগ্র জগতকে আদর্শ দেখাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজকাল অন্যান্য নানা বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও আদর্শের জন্য, অনুশাসনের জন্য ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য জগতের মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হইতেছে। যাই হউক, পাশ্চাত্যদের বিশেষত যুক্তরাজ্যের নিকট হইতেও অনুশাসনবাণী গ্রহণ করিয়া যদি ভারতবাসী এদেশে নিষেধবিধি ফিরাইয়া আনিতে পারেন, দেশ হইতে সুরাপানকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, তবে খুবই মঙ্গল।

৩। নিষেধবিধির পথে বাধা।

নিষেধবিধি এদেশে ফিরাইয়া আনিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথে সর্ব্বপ্রধান বাধা হইল আমাদের পরাধীনতা। যদি ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন থাকিত, তবে যেদিন দেশবাসী উপলব্ধি করিত যে, সুরাপানের ফলে দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, সেই দিনই তাহারা

একটা আইন করিয়া দেশে নিষেধবিধি প্রবর্ত্তন করিতে পারিত এবং দেশও সুরারাক্ষসীর করাল কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারিত। কিন্তু আমরা স্বাধীন নহি। এই সত্যটীকে ধরিয়া লইয়া এবিষয়ে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সত্যকে দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া এবিষয় আলোচনা করিতে থাকিলে বা এতদ্বিষয়ক কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে চাহিলে বিশেষ কোনই লাভ হইবে না। আমরা স্বাধীন নহি, আমরা বহু-শতাব্দীর পরাধীন জাতি, এবং বর্ত্তমানে আমাদের পদযুগল সেই পরাধীনতার শৃঙ্খলকে দ্বিগুণ চৌগুণ ভারী করিয়া তাহা দ্বারাই বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, ইহা অন্তরে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া, ইহা স্পষ্টাক্ষরে মানিয়া লইয়া দেখিতে হইবে যে, সুরারাক্ষসীর বিরুদ্ধে কি ভাবে সংগ্রাম করিলে আমরা জয়লাভ করিতে পারি। কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভারতবাসী মাত্রেরই ধর্ম্মশাস্ত্র সুরাপানের এরূপ বিরোধী যে, বোধ হয় এ বিষয়ে কাহারও দুই মত হইতে পারে না যে, আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, তবে কাল সুরা-রাক্ষসী লুকাইবার স্থানটুকু পাইবে কি না সন্দেহ।

৪। বর্ত্তমান আইনসভা ও নিষেধবিধি।

বর্ত্তমান ভারতের আইনসভাগুলি যেভাবে সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে আইনের দ্বারা এদেশে নিষেধ-বিধি জারি করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ধরিয়া লইলাম যে, সর্ব্ববাদসম্মত হইবার বর্ত্তমানে কোনই সম্ভাবনা না থাকিলেও, অধিকাংশ সদস্যদিগের মতে সিদ্ধান্ত হইল যে নিষেধবিধি জারি করা হউক। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত বড়লাটের অনুমোদনলাভ না করিলে আইনে পরিণত হইতে পারিবে না, অর্থাৎ জারি করিবার ঔচিত্যসমর্থক সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া থাকিবে। বড়লাট দেশবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হন নাই; তিনি বিলাত হইতে সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া এদেশকে শাসনে রাখিবার জন্য আসিয়াছেন। অর্থ হউক, সম্মান হউক বা অন্য যাহা কিছু হউক, একটা কোন স্বার্থের জন্য, হয় নিজের চেষ্টায় অথবা বিলাতের মন্ত্রীসভার অনুরোধে তিনি মূলত ইংলণ্ডরাজ, কিন্তু প্রসঙ্গত ভারতসম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা স্বাধীন নহি, এই সত্যের সঙ্গে এই দ্বিতীয় সত্যটীও আমাদের স্পষ্টরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, বড়লাট এদেশবাসীর নিযুক্ত নন, তিনি বস্তুত ইংলণ্ড-বাসীর নিযুক্ত কর্ম্মচারী। বড়লাট নিজেও এই সত্য খুব ভালরূপই জানেন। কাজেই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধানতম লক্ষ্য থাকিবে, যাহাতে তাঁহার শাসনকালে ভারতশাসনের ভিতর দিয়া তিনি নিজের দেশবাসীর কল্যাণসাধন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতে পারেন। এদেশের কল্যাণ তাঁহার অন্তরে স্বভাবতই স্বদেশের কল্যাণসাধনের পর স্থানপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে আমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কাহাকেও ঘৃণা করিবারও কিছু নাই, কারণ ইহা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের পাপের দণ্ডস্বরূপেই হউক, অথবা আমাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই হউক, আমরা এখন বিজিত এবং ইংরাজ-জাতি জেতা। সুতরাং জেতা ও বিজিতের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই কতকটা যে খাদ্যখাদকের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ থাকিবেই, তাহা বলা বাহুল্য। তবে, যদি জেতা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া বিজিতের প্রতি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিব।

৫। বড়লাট স্বদেশবাসীর কলকাঠিমাত্র।

বলা বাহুল্য, বড়লাট তাঁহার স্বদেশবাসীর সন্তোষ-সাধন করিতে পারিলে নির্দ্দিষ্ট শাসনকালের পর তাঁহার পদোন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এদেশের মঙ্গল-সাধন করিতে গিয়া যদি কোন বড়লাট এমন কোন ব্যবস্থা করিয়া বসেন, যাহাতে বিলাতের তিলার্দ্ধ অনিষ্ট সাধিত হয়; বিলাতবাসীর পকেটে বর্ত্তমানে যত টাকা গিয়া পৌঁছিতেছে, সেই টাকার বেশী পাইবার পরিবর্ত্তে বিলাতবাসীরা কিছু কম পাইল, তাহা হইলে বিলাতে এতই হৈ-চৈ উঠিবে যে, সে বড়লাট আর এখানে থাকিতে পারেন না; 'উহাঁকে ফিরাইয়া আন' 'এ বড়-লাট বড়ই অকর্ম্মণ্য', এই ভাবের এমন কোলাহল-কলরব উঠিবে যে, মন্ত্রীদের পক্ষে "কাণপাতা" অসম্ভব হইবে—তাঁহারা যতক্ষণ না সেই বড়লাটকে ফিরাইয়া আনেন, ততক্ষণ তাঁহাদের অদৃষ্টে শান্তির কোনই আশা থাকে না। কাজেই তাঁহারাও তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হন, তিনিও বিনা বাক্যব্যয়ে বিনা কাল-বিলম্বে কেবলমাত্র কর্ত্তব্য করিবার শান্তি অন্তরে ধারণ করিয়া ভালমানুষের মত স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন—তাহার প্রতিবাদে সম্রাটেরও সাহসে কুলায় না।

৬। মদ হইতে আয়।

সুতরাং ভারতের প্রকৃত মঙ্গলসাধনে যদি বা কোন বড়লাটের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকে, তথাপি কোনও বড়লাটই সে ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে কিছুতেই সক্ষম হন না। কাজেই নিষেধবিধি জারি করিবার সিদ্ধান্ত আইনসভায় গৃহীত হইলেও উহাতে বড়লাটের মঞ্জুরি পাইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। কারণ নিষেধবিধি জারি হইবার ফলে, এক তো উহা হইতে গবর্ণমেণ্টের আবগারি বিভাগের যে আয় হইত, সেই;

আয় বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা; দ্বিতীয়, মদ্যপান এদেশে সজীব থাকিবার ফলে দেশী মদের সঙ্গে বিলাত হইতে আমদানী মদের যে কাটতি হয়, এবং তাহার ফলে বিলাতের ধনী ও শ্রমিক উভয়েরই পকেটে যে অর্থের সমাগম হয়, নিষেধবিধির আইন জারি হইলে বিলাতের লোকদের সেই আয়ের অনেকটাই বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আসে। আবগারি বিভাগের আয়ও বড় অল্প নহে—ন্যূনাধিক বিশ কোটী টাকা শুধু মদ্যের কারবারে উঠে। * এই প্রকারে আয়ের হ্রাস হইলেই বিলাতের মদ্যবণিকেরা এবং তাঁহাদের সঙ্গে তথাকার শ্রমিকসংঘও একই সুরে এতই আন্দোলন ও চীৎকার করিতে থাকিবেন যে, তাহার তরঙ্গের উপরে উঠিয়া ভারতের প্রতি নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার করা কোনও বড়লাটেরই ক্ষমতায় কুলাইবে না। সুতরাং প্রথম হইতেই আমাদের জানিয়া রাখা ভাল যে, ইহা ষোল আনার উপর সুনিশ্চিত যে, আইনসভায় যতই কেন সিদ্ধান্ত হোক না, কোনও বড়লাটই সম্ভবপর হইলে কখনই নিষেধবিধিকে আইনে পরিণত হইতে দিবেন না।

৭। আইনসভা প্রভৃতির অক্ষমতার দৃষ্টান্ত।

সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে, দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে সাধারণত নিষেধবিধির স্বপক্ষে একটা প্রস্তাব এবং তদনুকূলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের উপর স্থানীয় লোকদিগের ইচ্ছানুযায়ী নিষেধবিধি জারি করিবার অনুরোধমূলক একটী প্রস্তাব দিল্লীর আইনসভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং ৩২ বনাম ৬০ ভোটে গৃহীতও হইয়াছিল। এই ৩২ ভোটের অধিকাংশ ছিল ইংরাজ-সদস্যের এবং সরকারী কর্ম্মচারীর। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশের মত ঐ প্রস্তাবের অনুকূলই ছিল। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া জানি না। বরঞ্চ সার বেসিল ব্লাকেট এই প্রস্তাবসম্বন্ধীয় আলোচনার সময়ে গবর্ণমেণ্টের তরফে বলিয়াছিলেন যে, "যদি কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট local option বা স্থানীয় লোকদিগের ইচ্ছানুরূপ সংকীর্ণ নিষেধবিধি বা পূর্ণ নিষেধবিধির (absolute prohibition) প্রস্তাব আইনে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন, তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট হাত-পা গুটাইয়া তাহা নিশ্চলভাবে দেখিতে পারিবেন না," এক কথায়, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। বঙ্গের আইনসভায় "স্থানীয় অভিপ্রায়" বা local option অনুসারে সংকীর্ণ নিষেধবিধির প্রস্তাব গৃহীত হইলেও বঙ্গের লাট তাহা না-মঞ্জুর করিয়া দিয়াছিলেন। বেশী দিনের কথা নয়, কলিকাতা কর্পোরেশন একবার স্থির করিলেন যে, মদের আড্ডা বা saloonগুলি সমস্তই সহরের সীমার বাহিরে বহিষ্কৃত করা হোক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন না। এই সেদিন মাদ্রাজের আইনসভাও পূর্ণ নিষেধবিধির প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া স্থির করিলেন যে, সেই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মদের দোকানগুলি প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ক্রমশঃ কমাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।*

৮। "স্থানীয় অভিপ্রায়ের" মূল্য আছে।

পূর্ণ নিষেধবিধির না হোক, অন্ততঃ "স্থানীয় অভিপ্রায়" বা local option অনুসারে সংকীর্ণ নিষেধবিধির যে বিশেষ মূল্য আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। অভাবগ্রস্ত সাধু লোকের সম্মুখে ক্রমাগত ধনরত্ন রাখিয়া প্রলোভন দেখাইলে সাধুও অনেক সময়ে অসাধু প্রস্তুত হয়; এবং অসাধুরও সম্মুখ হইতে প্রলোভনের বিষয়সকল দূরে সরাইয়া রাখিলে অসাধুরও সাধু প্রস্তুত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। এ বিষয়ে অনেকেরই হয় তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এদেশে কলকারখানার নিকটবর্ত্তী স্থানে মদের দোকান অবাধে খুলিতে দেওয়া হয় বলিয়াই দেখা যায় যে, তথাকার অধিবাসী শ্রমিকেরা প্রায়ই মাতাল ও দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে; এমন কি, সেখানে ভদ্রলোকদিগের বাস করা কঠিন হয়। বাল্যকালে আমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়ি, তখন বর্ত্তমান কলেজ মার্কেটের স্থানে মদের ও তদানুষঙ্গিক দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের একটা আড্ডা ছিল। সুবিধা থাকিবার কারণেই অনেক ছাত্র সেখানে যাইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিত। একবার এক ভদ্র পণ্ডিতপরিবারের বালক ছাত্র কর্ত্তৃক ঐ স্থানে একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তখন ঐ প্রকার আড্ডা বিদ্যালয়ের নিকটে থাকার কুফল বিবেচক ব্যক্তিগণের চক্ষে আসিয়া ধরা দিল। তখন উহার বিরুদ্ধে তদানীন্তন সমস্ত সংবাদপত্রে ও সকল সভাসমিতিতে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করা হইল। সেই আন্দোলনের ফলে বিদ্যালয়ের নিকট মদের দোকান প্রভৃতি থাকার কুফল গবর্ণমেণ্টেরও হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে সে স্থান হইতে গবর্ণমেণ্ট ঐ মদের দোকান ও বারাঙ্গনা-পল্লী উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই অবধি ছাত্রদের মধ্যে কুপথে চলিবার প্রসার অনেকটা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই একটী দৃষ্টান্ত দিলাম। এমন

* East Bengal Times—August 31, 1929.

* East Bengal Times—31 Aug, 1929.

শত শত দৃষ্টান্ত আমাদের নিত্যই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই স্থানীয় অভিপ্রায়ের গুরুত্ব এবং কলিকাতা কর্পোরেশন, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতির এতদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহের সার্থকতা সহজেই উপলব্ধ হইবে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এক সময়ে কলিকাতার চেয়ারম্যান বা পুলিশ কমিশনর কলিঙ্গা প্রভৃতি পল্লীতে অবস্থিত মদের ও দুশ্চরিত্র বিদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের আড্ডা কড়েয়াতে সরাইয়া দিয়াছিলেন—সে সময়ে বালিগঞ্জের কড়েয়া একটা নগণ্য পল্লীমাত্র ছিল।

৯। শৌণ্ডিকালয়ের পরিপার্শ্বে নৈতিক অবনতি।

ইহা দেখা যায় যে, পল্লীগ্রামের যে সকল অংশে মদের দোকান খোলা হইয়াছে, সেই সকল অংশেরই চতুঃপার্শ্বের অধিবাসী অশিক্ষিত লোকেরাই মদ্যপানরত হয়; এবং সহরের জঘন্য পল্লী(slum)সমূহের বাসিন্দারাও অনেকেই সুরাপানে অভ্যস্ত হয়। সুখের বিষয়, সমাজশাসনের ফলে এখন পর্য্যন্ত সুরাপানের ঢেউ পল্লীগ্রামের অন্তরে গভীর-রূপে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সহরপ্রবাসী পল্লীবাসীদের কল্যাণে ঐ শাসনের মর্য্যাদা ক্রমশই উল্লঙ্ঘিত হইতে চলিয়াছে। বিশেষত যে সকল পল্লীগ্রামে কলকারখানা উঠিয়াছে, তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে মদ্যপানের প্রাবল্য এবং তাহার অপরিহার্য্য সঙ্গী নৈতিক অবনতি প্রত্যক্ষ করিলে অশ্রু সম্বরণ দুরূহ হয়। যাঁহারা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

১০। বাধার সর্ব্বপ্রধান কারণ।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট যে নিষেধবিধির বিরুদ্ধে, সুতরাং প্রকারান্তরে মদ্যপান-প্রসারের সপক্ষে দণ্ডায়মান, তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রত্যক্ষ কারণ হইল—ইহার ফলে আবগারি বিভাগের আয় সহসা হ্রাস পাইবার বা বিলুপ্ত হইবার বিভীষিকা। চিন্তাশীল অনেকেরই ধারণা এই যে, গবর্ণমেণ্টের এই বিভীষিকার বিশেষ সুদৃঢ় কোন ভিত্তি নাই। তাঁহারা বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট অনেক অর্থ তো অপব্যয় করেন; সাম্রাজ্যনীতির দোহাই দিয়া অনেক অনাবশ্যক কার্য্যে, অকারণ অনেক বড় বড় প্রাসাদনির্ম্মাণে এবং নানা বিফল দৃশ্যরচনায় গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ নষ্ট করেন, সে অর্থ ঐ প্রকারে নষ্ট না করিলে গবর্ণমেণ্টকে আবগারির আয় কমিবার বিভীষিকায় ভীত হইতে হইত না। "ইণ্ডিয়ান ডেলি মেল" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র তাঁহাদের এই উক্তি সমর্থন করিয়া বলেন—"গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতির আশঙ্কাপ্রকাশ হাস্যজনক, যখন ঐ টাকার অনেকগুণ বেশী টাকা তাঁহারা এমন সমস্ত কার্য্যের পশ্চাতে ছড়াইয়া দেন, যাহা জনমতও সমর্থন করে না, আর নিষেধবিধির তুলনায় যাহার অন্তর্নিহিত কোনও মূল্যও নাই।"

১১। নিষেধবিধিতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয় কি না?

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অনেক সময়ে এই একটী আপত্তি উপস্থিত করা হয় যে, "নিষেধবিধি নীতিবিগর্হিত, কারণ ইহাতে প্রজাগণের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করা হয়"! একথা মানিয়া লইলে শুধু সমাজসংস্কার কেন, কোনও বিষয়ে কোনও প্রকার সংস্কারকার্য্যেই অগ্রসর হওয়া যায় না। ভারতবাসী এ যুক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম। সমাজ ধ্বংস হইবে, অথচ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই দিয়া দুর্নীতিকে বজায় রাখিতে হইবে, শুধু ভারতবাসী কেন, মানবমাত্রেরই নিকট এরূপ যুক্তির কোনও মূল্য নাই। এই যুক্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করিলে কাহারও কোনও দুষ্কার্য্যেই বাধা দেওয়া উচিত নহে। এই যুক্তি যদি স্বীকার করা যায়, তবে চোরের চৌর্য্যকার্য্য দূরে থাক, খুনীর নরহত্যা-কার্য্যও আইনের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করা সঙ্গত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট এই সকল কার্য্যে যখন সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিতে বিরত হন না, যখন criminal code, penal code প্রভৃতি উঠাইয়া দিতে সম্মত নহেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের ওজরে নিষেধবিধির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো শুধু শূন্যগর্ভ ফাঁকা আওয়াজ নয়, কিন্তু নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপারও বটে।

১২। হেনরি ফোর্ড বলেন—হয় না।

এ সম্বন্ধে হেনরি ফোর্ডের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। আজকাল "Ford car"এর কল্যাণে হেনরি ফোর্ডের নাম জানেন না, শিক্ষিতসমাজে এমন ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তিনি অধিবাসী; সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অতিমাত্র পক্ষপাতী। তিনি নিজেরও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিত্যাগে যেমন সম্মত নন, সেইরূপ যুক্তরাজ্যের অন্য কোনও অধিবাসীরও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাহরণেরও পক্ষপাতী নন। তাঁহার কারখানায় লক্ষাধিক শ্রমিক খাটিয়া অন্নসংস্থান করে। পৃথিবীর মধ্যে এত বড় কারখানা নাকি দ্বিতীয় নাই। এত অধিক শ্রমিক-দিগকে যিনি পরিচালিত করেন, এবিষয়ে তিনি যাহা বলেন, তাহা নিশ্চয়ই অবহেলার যোগ্য নহে। তিনি বলেন—"সুরাসক্তি হইতে জাতির মুক্তিলাভের ফলে

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, নিষেধবিধিকে অধিকারে হস্তক্ষেপ বলা শিশুর প্রলাপোক্তি মাত্র। ধরিয়া লওয়া যাক যে, একজন লোকের মদ খাইয়া আত্মহত্যা করিবার ব্যক্তিগত অধিকার আছে; কিন্তু তাহাকে সেই সুরা সরবরাহ করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অধিকার সমাজের নাই; সমাজের ইহা বলিবার অধিকার নাই যে, যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্টকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ লোকটীর মদ খাওয়া দরকার; সমাজের এই হুকুম জারি করিবার অধিকার নাই যে, লোকটীর সঙ্গে মার্কিন স্ত্রী ও মার্কিন শিশুদের শতকরা এতজন স্বতই ধ্বংসমুখে প্রবেশ করিবে।"*

১৩। নিষেধবিধি ও অবৈধ উপায়ে মদ্য-সংগ্রহের সম্ভাবনা।

আরও একটী কথা সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হয়, এবং সে কথা ইংরাজপরিচালিত সংবাদপত্রসমূহে খুবই জোরের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করা হয় যে, "নিষেধবিধি জারি করিলে লোকে প্রত্যক্ষভাবে মদ্যসংগ্রহে সক্ষম না হইয়া অবৈধ উপায়ে smuggle করিয়া মদ্যসংগ্রহ করিবে; তাহার ফলে মদ্যপান নিশ্চয়ই অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে"। ইহা নিতান্তই বাজে কথা—আলোচনারই অযোগ্য বাতুলোক্তি মাত্র। সুরাপানের প্রতিবিধানকল্পে নিষেধবিধি জারি করিতে অগ্রসর হইলেই যদি সুরাপান-বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা হয়, তবে চুরি করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নরহত্যা করিবে না, এই সমস্ত নীতিগর্ভ উপদেশবাক্য আইনকানুনে বিঘোষিত করা হয় কেন? তখন তো বিচারে এ যুক্তি মোটেই স্থান পায় না যে, ঐ সকল উপদেশ প্রচার করিবার ফলে উহাদের বিরোধী দুর্নীতি-সকল বৃদ্ধি পাইবে? কার্য্যক্ষেত্রেও তো দেখা যায় যে, ঐ প্রকার আইনকানুনের ফলে ঐ সকল দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবার পরিবর্ত্তে হ্রাসপ্রাপ্তই হইয়াছে। নচেৎ আইনকানুনের কোনও সার্থকতাই থাকিতে পারে না।

১৪। ভূতের মুখে রামনাম।

ইংরাজপরিচালিত সংবাদপত্রসমূহে যখন দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ঘোষণা করা হয় যে, নিষেধবিধি জারি করিবার ফলে রুষিয়াতে এবং মার্কিনরাজ্যে মাতলামি বাড়িয়া গিয়াছে, দুর্নীতি বাড়িয়া গিয়াছে, তখন ভারতবাসী আমরা সে কথা কেবল যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি তাহা নহে, সে কথা শুনিয়া আমরা হাসিয়া মরি! জানি না, সে সংবাদ ঐ সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদক মহোদয়গণ রাখেন কিনা। আমরা তাঁহাদিগকে এই খাঁটি সত্য সংবাদ উপহার দিতে পারি যে, ভারতের শিক্ষিত-সম্প্রদায় শুঁড়ির মুখে মদের প্রশংসার মত ঐ সকল স্বার্থান্ধ সম্পাদকগণের মুখে নিষেধবিধির কুফল বর্ণিত হইতে শুনিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া অবিশ্বাসেরই হাসি হাসেন—তাঁহাদের কথা তিলমাত্র বিশ্বাস করেন না। ইহা বলা বাহুল্য, ঘরে বসিয়া নিষেধবিধির কুফল যাঁহারা লেখেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যে দেশে নিষেধবিধি জারি হইয়াছে, সেই দেশের অধিবাসী অথবা সেই দেশে গিয়া যে সকল পর্য্যটক এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কথা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। রুষিয়াতে যে সময়ে vodka মদ্যের নিষেধবিধি জারি হইয়াছিল, তথাকার অধিবাসী এবং ইংরাজ রুষিয়াপর্য্যটকদিগের রুষিয়াসম্বন্ধীয় বিবরণে দেখিয়াছিলাম যে, উক্ত নিষেধবিধির ফলে মাতলামি-সমুদ্ভূত মকদ্দমারাশি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে বলিলেও চলে, এবং প্রত্যেক রুষবাসী শ্রমিক নাকি ব্যাঙ্কেও অল্প-বিস্তর টাকা সঞ্চিত রাখিতে সক্ষম হইতেছে। সেই প্রকার মার্কিনরাজ্যে নিষেধবিধি জারি করিবার অগ্রণী ঐ রাজ্যে উহার ফলাফল যাহা বলিবেন, শত ইংরাজ সংবাদপত্রসম্পাদক স্বার্থান্ধ হইয়া যাহা প্রচার করিবেন, তদপেক্ষা সহস্রগুণে বিশ্বাসযোগ্য নিঃসন্দেহ। তিনি মার্কিনরাজ্যে নিষেধবিধি জারির ফল যাহা হাতে-কলমে facts and figures দ্বারা দেখাইয়াছেন, নিষেধবিরোধী পক্ষ যতই কেন মিথ্যা রটনা করুন না, সেই সকল facts and figures হইতে প্রত্যেক নিরপেক্ষ সুধী ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন যে, নিষেধবিধি জারির ফলে মার্কিন রাজ্যে প্রভূত উপকারই সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইংরাজ সম্পাদকেরা অনেক সময়েই নিষেধবিধির কুফল জোর করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও সময়ে সময়ে ভূতের মুখে রামনামের মত সত্য কথা বাহির হইয়া পড়ে। যে সকল কাগজ নিষেধবিধি জারির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মত গড়িয়া তুলিবার জন্য আড়েহাতে

---

* Personal liberty is so much increased by the nation's emancipation from alcoholic addiction that it is childish wilfulness to talk about infringement of rights. Let us say that a man has a personal right to drink himself to death; we, as society, have no right to go into the business of serving him drink; we have no right to say that his drinking is necessary to the support of the United States Government; we have no right to decree that a certain persentage of American wives and American children shall automatically perish with him. Statesmen—13 10 29.

লাগিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদেরই অনেকে আজ প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "ইহা সর্ব্ববাদসম্মত সত্য যে, সুরাপান রহিত হইলে অধিকাংশ লোকের মঙ্গল হয়।"*

১৫। নিষেধবিধির সমর্থনে হেনরি ফোর্ড।

এ বিষয়ে পুলিস্কুট জনসনের দেশবাসী মার্কিনপ্রবর হেনরি ফোর্ড যাহা বলিয়াছেন, এবং যাঁহার উক্তির বিরুদ্ধে বাহ্বাস্ফোট সহকারে "যুদ্ধং দেহি"র ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া এই সেদিন কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্র পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই হেনরি ফোর্ডের উক্তির কিছু কিছু অংশ আমাদের মতের সমর্থনে উদ্ধৃত করিতেছি।

ফোর্ড বলেন,—"যুক্তরাজ্যে যদি মদ্যপানের ধুয়া ফিরিয়া আসে, তবে আমার কারখানার শেষ হইবে।" "মদের প্রচলন অব্যাহত থাকিতে আমি দুই লক্ষের উপর শ্রমিকদিগের পরিচালনায় স্বীকার করিতাম না। অথবা মাতাল generationএর হাতে মোটর গাড়ী দিবার জন্য আমার কোনই আকাঙ্ক্ষা হইত না।" "মদ বন্ধ হইলে আমরা সপ্তাহে পাঁচ দিন (কম ঘণ্টার) ভাল কাজ পাই; মদ চলিলে সপ্তাহে আসলে মোটে দুইতিন দিন কাজ পাই।" "শ্রমিক যদি সপ্তাহে দুই-তিন দিন (বোধ হয় শনি, রবি ও সোম) ধরিয়া মদ খায়, ১০।১২ ঘণ্টার দিন ধরিয়া সপ্তাহে ছয় দিন, এমন কি সাত দিনও খোলা রাখিতে হয়। মদ না খাইলে, ৮ ঘণ্টার দিনে সপ্তাহে ৫ দিন খাটিলেই চলে।" "কারখানা ভালরকম চালাইতে গেলে সুরাভ্যস্ত লোকদিগকে লইয়া চলিতে পারে না—কর্ত্তাই বল বা শ্রমিক বল, যে কেহ মদ খাইবে, তাহারই মস্তিষ্ক বিকৃত হইবে।" "মদ খাইলে লোকে নিখুঁতভাবে গণনা করিতে পারে না, আর তাহা না পারিলে আমি যে দুই লক্ষ মাইল চলিবার উপযুক্ত মোটর গাড়ী প্রস্তুত করিবার কল্পনা করিতেছি, তাহা প্রস্তুত করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না।" "মানুষ যখন নিজের কাজ ভাল করিয়া করিতে না পারে, তখন আর সে কাজে তাহার তেমন আগ্রহ থাকে না— শ্রমশিল্পের পক্ষে ইহাই বৃহত্তম বিপদ। নিজের জীবনে ও কার্য্যে প্রত্যেক মানুষের যে অনুরাগ থাকে, তাহারই ফলে জগতসংসার চলিতেছে; তাহারই ফলে কাজকর্ম্মকে সফল করিবার উপযুক্ত উৎসাহ প্রকাশ পায় ও সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বিষয় আবিষ্কার করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।" মার্কিনরাজ্যে "নিষেধবিধির মূলে স্ত্রীলোক, যাঁহারা গৃহে সুখশান্তি চাহিতেন। যদি গৃহে স্ত্রীলোকেরা নিষেধবিধির মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তবে অন্যান্য স্থানে যদি ঐ বিধি রক্ষিত না হয়, তবে তাহার জন্য আমাদের কিছুমাত্র চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই— সুরাপান স্বতই অন্তর্হিত হইবে।" একটী কথা তিনি বড়ই মনের দুঃখে বলিয়াছেন—"ধনীদিগের গৃহিণীরা (আমরা বলিব "ধনীরা") যদি জানিতেন যে, তাঁহারা শ্রমিকের স্ত্রীপুত্রদিগের সুখশান্তি সত্যই নষ্ট করিতে চলিয়াছেন, আমার স্থির বিশ্বাস যে, তাহা হইলে তাঁহারা সুরারাক্ষসীকে নিকটে আসিতে দিতেন না—শত হস্ত দূরে রাখিতেন।"

তিনি বলেন—(মার্কিন রাজ্যে) "শতকরা ৯৯ জন নিষেধবিধিকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছে। বাকী শতকরা ১ জন—ধনী, criminal ও abandoned class লইয়া সংগঠিত"। "মার্কিনদিগের উপর নিষেধবিধি জোর করিয়া চাপানো হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।" ফোর্ডের বিশ্বাস যে, আজকাল আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ধনীসম্প্রদায়েরও মধ্যে সুরাপান অভদ্রোচিত বলিয়া গণ্য হইতে চলিয়াছে, কাজেই তাহা উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তিনি বলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে যেখানে সেখানে ভালমন্দ সকল রকমেরই মদ পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে শতকরা ৫০।৬০ ভাল হইয়াছে। * * * সমাজের হাওয়া কোন্ দিকে চলিতেছে, ইহা তাহারই পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে প্রদান করিতেছে।" ফোর্ডের এই সকল উক্তির পরে ইংরাজ সম্পাদকমহোদয়গণের উক্তি বা গবর্ণমেণ্টের উক্তিসকল কি আর বিশ্বাস করা যায়?

১৬। মদ্যপান ও দারিদ্র্য।

মদ্যপানের ফলে যে সকল সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তন্মধ্যে দারিদ্র্য অন্যতম। মদ্যপান দারিদ্র্য আনে, আবার দারিদ্র্যের ফলে মদ্যপানে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। মদ্যপান ও দারিদ্র্যের সম্বন্ধবিষয়ে যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন, সেই সকল বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন যে, শ্রমিকসম্প্রদায় তাহাদের আয়ের প্রায় একচতুর্থ অংশ সুরারাক্ষসীর চরণে সমর্পণ করে। All-India Trade Union Congress (নিখিলভারত-বাণিজ্যসম্মেলন কংগ্রেস) বলেন যে, আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বম্বের কাপড়ের কলওয়ালারা শ্রমিকদিগকে যে বেতনবৃদ্ধি দিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তই মদের দোকানের মালিকদিগের পকেটে গিয়া পড়িয়াছে। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। আমি যখন হাবড়া মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি ছিলাম, তখন দেখিতাম যে, যে কয়েক দিন মেথর প্রভৃতির বেতন পাইবার দিন থাকিত, সেই কয়েক দিন জনকয়েক বাঙ্গালী ও কাবুলী মহাজন মোটা মোটা লাঠি হস্তে বেতন দিবার স্থানে হাজির।

* That most people are better without "booze" is by this time common ground.
—Statesman—8. 10. 29.

ব্যাপার এই যে, শ্রমিকেরা ঐ সকল মহাজনদের নিকট সমস্ত মাস ধরিয়া "চোটা সুদে" (খুব বেশী, এমন কি, শতকরা ৭৫৲ টাকা সুদে বা তাহারও বেশী সুদে) ধার করিয়া মদ খাইয়াছে; এখন তাহারা যাহা কিছু বেতনাদি পাইবে, দুইএক টাকা মাত্র নিজের হাতে রাখিয়া বাকী সমস্ত বেতন—মায় উপরি পাওনা ঐ সমস্ত মহাজনদের হাতে দিবে। কাজেই এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে তাহাদের হাত শূন্য হইয়া যায়। তখন বাকী তিন সপ্তাহ তাহারা আবার মহাজনদিগের নিকট ধার করিয়া ঘরসংসার চালায় আর মদ খায়। ইহার মধ্যে মজাটুকু এই যে, পয়সার অভাব যতই বাড়ে, সেই অভাবের বোধটুকু ভুলিয়া থাকিবার জন্য ততই তাহারা মদ্যপানে বিভোর ও অজ্ঞান হইয়া থাকিতে চায়। এই-রূপে মদ্যপানের ফলে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের ফলে সুরা-সক্তিবৃদ্ধি পাইতে থাকে—চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে—argument in a circle।

১৭। গবর্ণমেন্টের আয়হ্রাসের বিভীষিকা অকারণ।

ইহার প্রতীকারকল্পে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, এ রোগ কেবল বাহিরের রোগ নয় যে, শুধু উপর-উপর ঔষধ লাগাইয়া ইহার প্রতীকার করা সম্ভব হইবে; ইহার প্রতীকার করিতে গেলে মূলে গিয়া ধরিতে হইবে—মদের দোকানগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু সে ক্ষমতা তো গবর্ণমেন্টের হাতে। অনেক বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন যে, শ্রমিকদিগের মধ্যে যে বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন চলিতেছে, তাহার অনেক অংশই খুব স্বাভাবিক নহে—বেশীরভাগই মদের দোকানদার প্রভৃতি ধনীদিগের দ্বারা গড়িয়া তোলা বা engineered। বর্ত্তমানে চারিদিকে শ্রমিকদিগের ক্রমাগত বেতনবৃদ্ধির আন্দোলনের জ্বালায় কি কলকারখানা, কি মিউনিসিপালিটি, আর কি গবর্ণমেন্ট, সকলেই অস্থির হইয়া উঠিতেছেন, তবু কেহই মূলে গিয়া পৌঁছিতে চান না। এ বিষয়ে বলা বাহুল্য, সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব গবর্ণমেন্টের, কিন্তু তাঁহারা মূলে যাইতে চান না—তাঁহাদের ঐ বিভীষিকা, পাছে একটা আয় কমিয়া যায়। কিন্তু মদে টাকা না উড়াইয়া প্রজারা যদি হাতে কিছু টাকা সঞ্চিত করিতে পারে, তবে মদের দোকান উঠাইয়া দিবার কারণে গবর্ণমেন্টের যে টাকা লোকসান হইবে, সে টাকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহাদের নিকট হইতে অনায়াসে পূরণ করা যাইতে পারে, ইহা দেশবাসী সকলেরই বিশ্বাস। আর ইহাও স্থির যে, এভাবে ক্ষতিপূরণের ফলে এখনকার মত অসন্তোষের বীজ দিকবিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না।

১৮। ভুপালের বেগমের সাক্ষ্য।

নিষেধবিধি জারির সুফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমাদিগের দেশ-বিদেশে দূরদূরান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন নাই। হাতের গোড়ায়, ভুপালরাজ্যে নিষেধবিধি জারির কি সুফল ফলিয়াছে, ভুপালের বেগম তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "এই নিষেধবিধি প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি প্রজাদের মধ্যে ভালর দিকে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহার ফলে স্ত্রীলোকেরাই বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। ইহা প্রবর্ত্তিত করিতে ও ইহাকে সফল করিতে বিশেষ কোনই কষ্ট পাইতে হয় নাই। মুসলমান-ধর্ম্ম সুরাপানের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং নিষেধবিধিপ্রবর্ত্তনে উহারই অনুমোদিত পন্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে হিন্দুরাও কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। ইহার ফলে প্রজাদের সুখ ও মঙ্গল যে প্রকার বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় রাজস্বের হ্রাস গণনার মধ্যেই আসে না"। সামান্য ভুপালরাজ্যে যাহা সম্ভব হইল, সুবৃহৎ বৃটিশসাম্রাজ্যে তাহা যে সম্ভব হইতে পারে না, সে কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তিই হয় না।

১৯। হিন্দুশাস্ত্রে নিষেধবিধি।

ভুপালের বেগম মহোদয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে নিষেধবিধিপ্রবর্ত্তনে হিন্দুরা কোনও আপত্তি উত্থাপিত করে নাই। করিবে কেন? সুরাপানের বিরুদ্ধে হিন্দুশাস্ত্রে বড়ই কঠোর বিধান দেখা যায়। হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"সুরাপান মহাপাতকের অন্যতম, এমন কি, সুরাপায়ীর সংসর্গও মহাপাতক"। "দ্বিজ মোহবশত সুরাপান করিলে অগ্নিতপ্ত সুরা পান করিবে; তাহা দ্বারা নিজদেহ নিঃশেষে দগ্ধ হইলে তবে পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। অথবা অত্যুষ্ণ গোমূত্র, জল, দুগ্ধ, ঘৃত বা গোময়রস পান করিয়া মৃত্যুলাভ করিবে। অথবা সুরাপানজনিত পাপমুক্তির জন্য কেশরচিত বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং জটাধারী ও ধ্বজবাহী হইয়া সম্বৎসরকাল ক্ষুদকণা খাইয়া জীবনধারণ করিবে; অথবা রাত্রে একবার মাত্র তিলের খৈল খাইয়া থাকিবে। সুরা অন্নের মল এবং পাপই মলরূপে উক্ত হয়; অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য (এতদ্দুপলক্ষিত সমগ্র মানবজাতি) সুরাপান করিবে না। গুড় পিষ্টকাদি বা মধুসহযোগে প্রস্তুত—সকল মদ্যই এক; কোন প্রকার মদ্যই পান করা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের কর্ত্তব্য নহে। মদ্য, মাংস, সুরা ও আসব, এ সকল যক্ষ রক্ষ ও পিশাচদিগের খাদ্য, উহা ব্রাহ্মণদিগের ভক্ষ্য নহে। ব্রাহ্মণ মদ্যপানে মত্ত হইলে অশুচি স্থানে পড়িবে এবং

নানা অকার্য্য করিবে, অতএব ব্রাহ্মণের মদ্যপান করা উচিত নহে—করিলে তাহার ব্রহ্মণ্য দূর হয় এবং সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়" (মনু, ১১ অধ্যায়)।

বিষ্ণু ঋষিও তাঁহার সংহিতায় বলেন—"সুরাপায়ী ব্যক্তি সকল কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া এক বৎসর কুদকণা খাইয়া জীবনধারণ করিবে" (বিষ্ণু সং. ৫১ অধ্যায়)। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় "German" শব্দ যেমন গালিরূপে ধরা হইত এবং কাহাকে German বলিলে বিচারালয়ে শাস্তি পাইতে হইত, সেইরূপ "সুরাপায়ী" বলিলে তাহার জন্য দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা ছিল (যাজ্ঞ-সং, বা° পা° প্র°)। গৌতম বলেন—"মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ মদ্য নিক্ষেপ করিবে; তাহাতে মৃত্যু হইলে উহার পাপক্ষয় হইবে। যদি সে অজ্ঞান ও অনিচ্ছা সহ মদ্যপান করে, তবে তিন দিন ধরিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত, উদক ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে এবং পুনরায় যথাশাস্ত্র উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইবে" (গৌতম সং, ২৪ অ)। শতাতপ ঋষিও তাঁহার সংহিতায় সুরাপায়ীর জন্য কঠিন দণ্ডবিধান করিয়াছেন (শাতা সং. ৩ অধ্যায়)।

সুরাপান পুরাকালে এতই হেয় দৃষ্টিতে দেখা হইত যে, আমার স্মরণ হইতেছে, মনুসংহিতায় অথবা অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিয়াছিলাম যে, সুরাপায়ীর অন্যতর শাস্তি ছিল তাহার কণ্ঠে তপ্ত সীসক ঢালিয়া প্রাণদণ্ড। শৌণ্ডিকালয় বা মদের দোকান নগরের প্রান্তে মাত্র রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইত, নগরের ভিতরে নহে। কেবল তাহাই নহে, রাজপথের যে ধারে মদের দোকান থাকিত, পথিকদিগকে সে ধারে না চলিয়া তাহার বিপরীত ধারে চলিবার বিধান দেওয়া হইত।

২০। সুরারাক্ষসীর নির্ব্বাসনে আত্মনির্ভর আবশ্যক।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, মদ্যপানের পরিণামে কুফল ব্যতীত সুফল হইতে পারে না; এবং উহা রহিত করিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের নিকটে বিশেষ কোন সাহায্য পাইবার আশা অতি অল্প, বরঞ্চ বাধা পাইবারই সম্ভাবনা সমধিক। অবশ্য একথা বলা অন্যায় হইবে না যে, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সহায় হইলে ভারতে নিষেধবিধি জারি করা সহজ হইবে, কারণ ভারতের অধিবাসীগণ ধর্ম্মে কর্ম্মে ভাবে ভক্তিতে সাধারণতঃ মদ্যপানের বিরোধী। বর্ত্তমানে হিন্দু বা মুসলমান ভারতের অধিবাসী মাত্রেই বুঝিয়াছে যে, দেশকে সুরারাক্ষসীর হাত হইতে বাঁচাইতে চাহিলে অবিলম্বে নিষেধবিধি জারি করা উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট যখন এবিষয়ে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া সুদূরপরাহত, তখন দেশ হইতে মদ্যপান নির্ব্বাসিত করিবার যথার্থ ইচ্ছা থাকিলে দেশবাসীদের নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে, অর্থাৎ নিজেদের চেষ্টায় উহাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে।

২১। ইংরাজ অভ্যুদয়ের সঙ্গে সুরাপানের প্রাদুর্ভাব।

বর্ত্তমান যুগে বলিতে গেলে ভারতে ইংরাজদিগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে, অন্তত ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের সঙ্গে, এদেশে মদ্যপানের কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন এদেশে ইংরাজদিগের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং হিন্দু স্কুল প্রভৃতির ভিতর দিয়া ইংরাজী শিক্ষা বড়ই বিস্তৃতি লাভ করিল, সেই সময়ে তৎকালীন ইংরাজদিগের অনুকরণে মদ্যপান নহে, মদে ডুবিয়া থাকা সভ্যতা ও ভদ্রতার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। সে সময়ে বিদেশীয় "হনুকরণের" ফলে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় মদের স্রোতে কি প্রকার হাবুডুবু খাইতেছিলেন, কি প্রকার "waded through tumblers of beer and wine", তাহা রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ "সেকাল ও একাল" প্রভৃতি গ্রন্থে উত্তরবংশীয়দিগের অবগতির জন্য স্থায়িত্ব-প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা তো বাল্যকালে দেখিয়াছি, মদ্যপান সেকালে fashion হইবার ফলে জ্ঞানে গুণে ধনে মানে দেশের শীর্ষস্থানীয় কত লোক একের পর এক করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিলেন। আমরা কলেজ হইতে বহির্গত হইবার অনেক পরেও এই fashionএর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, ইঙ্গবঙ্গ সমাজে মহিলারা পর্য্যন্ত মদ্য-পরিবেশন করিতেছেন।

২২। ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাধাপ্রদান।

যাই হোক, মদের বন্যায় ভাসিয়া যাওয়া হইতে দেশকে রক্ষা করে ব্রাহ্মসমাজ। সুরাপানের কুফল দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম তাহাতে বাধা প্রদান করে। ইহা জানা কথা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের পর অনতিবিলম্বে তাঁহার বন্ধুবর রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত একযোগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মদ্যপানে সর্ব্বপ্রথম বাধা প্রদান করেন। তাহার পর অবধি মদ্যপানকে সভ্যতার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা রহিত হইয়া গেল, বরঞ্চ তাহা বর্ব্বরতার চিহ্নরূপে গৃহীত হইতে লাগিল। আমরা যখন বিদ্যালয়ে নিম্ন-শ্রেণীতে পড়ি, তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রমুখ-

প্রতাপ। তিনিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পদানুসরণ করিয়া মদ্যপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম, নব্য ও প্রাচীন সকল সম্প্রদায়ের জন্য "আশাদল" বা Band of Hope নাম দিয়া একটী সুরাবিরোধী সংঘ সংগঠিত করিয়াছিলেন। সেই সংঘের প্রতিজ্ঞাপত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করিতেন, আমরা জানি, তাঁহাদের অনেকেই সুরা বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। সেদিন পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি যে, এক মদ্যবহুল নিমন্ত্রণে আহূত এক ব্যক্তি বহুকাল পূর্ব্বে ঐ আশাদলের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রকার মদ্য স্পর্শ করিলেন না। একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম যে, ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার কথা তিনি যেই উল্লেখ করিলেন, অমনি, সর্পের মুখে বিষনাশক প্রস্তর ধরিলে সর্প যেমন নির্বীর্য্য হইয়া যায়, সেইরূপ অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আর কথাটী না বলিয়া তাঁহাকে মদ্যপান হইতে রেহাই দিলেন।

২৩। প্রতীকারের উপায়—মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংঘবন্ধন।

শুনিয়াছি এই আশাদল এখনও নাকি বাঁচিয়া আছে, যদিও আমরা ইহার কোনই চিহ্ন দেখিতে পাই না। চক্ষু খুলিয়া যদি দেখ, তবে দেখিবে, সুরারাক্ষসী এখনও মরে নাই, বুক ফুলাইয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে অশিক্ষিত কুলি-শ্রেণী তো দূরের কথা, ছাত্র প্রভৃতি শিক্ষিতসমাজেও বিচরণ করিতেছে। লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়, ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যখন দেখি যে, অনেক ইঙ্গবঙ্গ পরিবারে মহিলারা পর্য্যন্ত বর্ম্মা চুরুটের ধূমপানে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উঠিয়া যান এবং অভ্যাগতদিগের সম্মুখে স্বহস্তে মদের গেলাস প্রভৃতি হাজির করিয়া অভ্যর্থনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। সুতরাং যদি আমরা নিজেরা বাঁচিতে চাই, যদি সন্তানগণকে সুরা-রাক্ষসীর হাত হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে চাই, তবে আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া ঐ আশা-দলকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া অথবা উহারই অনুরূপ সংঘসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার বিরুদ্ধে দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ না করিয়া সত্যনিষ্ঠার সহিত শিক্ষিত-অশিক্ষিতনির্ব্বিশেষে দেশবাসী সকলের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া ইহার অপকারিতা বিশদরূপে বুঝাইয়া সুরার কবল হইতে দেশবাসীকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

২৪। কথায় ও কাজে মিল চাই।

কেবল বক্তৃতা দ্বারা ইহা সংসাধনের আশা নাই। মাদকনিবারণী সভায় সুরাপানের বিরুদ্ধে সুন্দর বক্তৃতা দিয়া ঘরে আসিয়া বন্ধুবর্গের নিকট আত্মজাহির করিবে, আর পরক্ষণেই খানসামাকে সোডাপানি ও ব্র্যাণ্ডিপানি আনিবার আদেশ দিবে, এরূপ করিলে চলিবে না। এই প্রকার মিথ্যাচারের ফলেই তো আমরা মরিতে বসিয়াছি। এতদিকে আমরা কথায় কথায় সত্যাগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছি, সন্তানদিগকে পদে পদে লেখাপড়া ছাড়াইয়া সত্যাগ্রহে দীক্ষিত করিতে উদ্যত হইতেছি, কিন্তু যদি আমরা মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে শিক্ষা না করি এবং সন্তানগণকে শিক্ষা না দিই, তবে দেশের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত—তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

২৫। ভগবানের উপর একনিষ্ঠ হইয়া কার্য্যে, নিশ্চয় জয়লাভ।

উপসংহারে আমি এইটুকু বলিতে চাই—ভগবানের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, কথায় ও কাজে সর্ব্বথা মিল রাখিয়া, নিজেদের সকল কার্য্য সত্যনিষ্ঠার ভিত্তিতে গাঁথিয়া মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযান কর; কেবল সুরারাক্ষসী নহে, তাহার শতবিধ অনুচর-সহচরের বিরুদ্ধে অভিযান কর; অপ্রতিহতশক্তি ভগবান যদি থাকেন, তবে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে; তবে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা দেশবাসীর হস্তগত হইবে; তবে ভারতে স্বরাজ নিশ্চয়ই অচিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

দণ্ডবিবেক।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

বর্দ্ধমান উপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত "দণ্ডবিবেক" গ্রন্থ সম্প্রতি গুইকবার মহারাজার Oriental institute (প্রাচ্য বিভাগ) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভট্টপল্লীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রাচীন পাঁচখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া পাঠ মিলাইয়া প্রাগুক্ত মহারাজার অর্থসাহায্যে উহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ, পি-এইচ-ডি, যিনি শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র, তিনি বরোদা oriental institute এর director অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ হইতেছেন। উক্ত সভা হইতে ইতিমধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ বাহির হইয়াছে। "দণ্ডবিবেক" অর্থে দণ্ডবিধি আইন (penal code)। হিন্দুরাজার আমলে কি ভাবে দোষীর বিচার ও শাস্তিবিধান হইত, এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। একভাবে বলিতে গেলে গ্রন্থখানির যথেষ্ট মূল্য আছে।

বর্দ্ধমান উপাধ্যায় কবি ভবেশের পুত্র ছিলেন। মিথিলার বিল্বপঞ্চ-বংশে তাঁহার জন্ম। বর্দ্ধমান তীরভুক্তির (বিহারের অন্তর্গত বর্ত্তমান ত্রিহুত) রাজা ভৈরবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। "দ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থ-প্রণেতা বাচস্পতি মিশ্র উক্ত রাজার পত্নী জয়ার কৃপা-ভাজন ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, গণ্ডক মিশ্র বর্দ্ধমানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং শঙ্কর ও মিথিলার বাচস্পতি মিশ্রের নিকট হইতে বর্দ্ধমান শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধাংশে আবির্ভূত হন। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, বর্দ্ধমানও ঐ সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গের স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধাংশে তাঁহার যে নিবন্ধ রচনা করিয়া যান, তাহাতে 'বর্দ্ধমান' নামের উল্লেখ আছে। বর্দ্ধমান অনেকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় রচনা করিয়া-যান, যথা;—দণ্ডবিবেক, দ্বৈতবিবেক, গঙ্গাকৃত্যবিবেক, পরিভাষাবিবেক, স্মৃতিতত্ত্ববিবেক, ধর্ম্মপ্রদীপ, স্মৃতি-পরিভাষা ইত্যাদি। "দ্বৈতবিবেক" গ্রন্থখানি ব্যবহার-শাস্ত্র (civil code) মাত্র; অন্যান্য গ্রন্থগুলি আচার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে। দণ্ডবিবেক গ্রন্থে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, গৌতম, নারদ, কাত্যায়ন, ব্যাস, বিষ্ণু হইতে অনেক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকন্তু মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট, গোবিন্দরাজ, মেধাতিথি ও নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞর টীকা হইতে এবং মিতাক্ষরা নামক যাজ্ঞবল্ক্যের টীকা হইতে ও পুরাণকারগণের বচন হইতে ও অন্যান্য নিবন্ধকারের রচনা হইতে কোন কোন অংশ লওয়া হইয়াছে। চণ্ডেশ্বর ঠাকুর প্রণীত বিবাদ-রত্নাকর হইতেও স্থলবিশেষ লওয়া হইয়াছে। বিবাদরত্নাকর নামের পরিবর্ত্তে উহার শেষ অংশ অর্থাৎ "রত্নাকর" এই নামটুকু তিনি অনেক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন।

আমরা উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম, তাহা মহা-মহোপাধ্যায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ ইংরাজি ভূমিকা হইতে। উক্ত ইংরাজি ভূমিকাসংকলনে তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য্য বি-এল, পিতাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বর্দ্ধমান যে কেবলমাত্র এই দণ্ডবিবেকের প্রণেতা ছিলেন তাহা নহে, গ্রন্থখানির সমাপ্তির পরে লেখা আছে "মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্মাধিকরণিক-শ্রীবর্দ্ধমান-কৃতো দণ্ডবিবেকঃ সমাপ্তঃ"। ইহা হইতে বুঝা যায় তিনি ধর্ম্মাধিকরণিক অর্থাৎ নিজেই বিচারক ছিলেন; অন্ততঃ দণ্ডবিধানকার্য্যে রাজার মন্ত্রণাদাতা ছিলেন।

দণ্ডবিবেক-গ্রন্থে চারিপ্রকার শাস্তির বিধান আছে। গ্রন্থকার বৃহস্পতির বচন উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন যে,

বাগ্‌ ধিক্‌ ধনং বধশ্চৈব চতুর্দ্ধা কথিতো দমঃ।
পুরুষং বিভবং দোষং জ্ঞাত্বা তং পরিকল্পয়েৎ॥

দণ্ড চতুর্ব্বিধ—বাক্‌দণ্ড, ধিক্‌দণ্ড, ধনদণ্ড, কায়দণ্ড দোষীর (সামাজিক) অবস্থা ও তাহার অর্থ, (অন্য-দিকে) দোষের মাত্রা বুঝিয়া তাহাকে দণ্ডবিধান করিবে। বর্দ্ধমান বৃহস্পতির ঐ বচনের উপর নিজের ব্যাখ্যা দিয়াছেন—বাক্‌দণ্ড অর্থে "ন ত্বয়েদং সম্যক্‌ কৃতং" ইত্যাদি নিন্দা; দোষীকে এই কথা বলা হইবে যে "তুমি এটি ভাল কর নাই" এই বলিয়া তাহাকে তাড়না করিবে। ধিক্‌দণ্ড অর্থাৎ "ধিক্‌ ত্বাং পাপীয়াংসম্‌ অকার্য্যকারিণম্‌ ইত্যাদি ভর্ৎসনম্‌"; তুমি পাপী, তুমি অকার্য্যকারী তোমাকে ধিক্‌; ইংরাজীতে যাহাকে বলে warned and let off। ধনদণ্ড—"ধনং দ্বিবিধং ব্যবস্থিতং অব্যবস্থিতং চ। তত্র ব্যবস্থিতং নিয়ত-সংখ্যং সাহসরূপং, তৎ ত্রিবিধং প্রথমং মধ্যমম্ উত্তমম্ ইতি"। ধনদণ্ড প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, একটি স্থির অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট আর একটি অনির্দ্দিষ্ট। নির্দ্দিষ্ট জরিমানা আবার তিন ভাগে বিভক্ত; দোষের পরিমাণ অনুসারে অল্প মধ্যম ও অধিক। 'সাহস' শব্দের অর্থ দোষ বা অপরাধ। বধদণ্ড অর্থাৎ কায়দণ্ড আবার তিন ভাগে বিভক্ত—"পীড়নম্ অঙ্গচ্ছেদঃ প্রমাপণঞ্চ (মারণং)। পীড়নং চতুর্ব্বিধং—তাড়নম্ অবরোধনং বন্ধনং বিড়ম্বনঞ্চ; তাড়নং কশাদি-অভিঘাতঃ, অবরোধনং কারাবাসাদিনা কর্ম্ম-নিরোধঃ, বন্ধনং নিগড়াদিভিঃ অস্বাতন্ত্র্য-উৎপাদনং। বিড়-ম্বনম্ অনেকপ্রকারং—যথা মুণ্ডনং, গর্দ্দভারোহণং, চৌর্য্যাদি-চিহ্নাচরণং, ডিণ্ডিমাদিনা তদপরাধখ্যাপনং পুরনগরভ্রামণম্ ইত্যাদি"; অর্থাৎ কায়দণ্ড অর্থে পীড়ন, অঙ্গচ্ছেদ ও মৃত্যু-দণ্ড। পীড়ন আবার চারি প্রকারের—(১) তাড়ন, (২) কারাবাস, (৩) বন্ধন, (৪) নানাভাবে নির্য্যাতন। তাড়ন অর্থে বেত মারা, অবরোধ—কারাবাসাদি দ্বারা কর্ম্মনিরোধ; বন্ধন অর্থে রজ্জুবন্ধনাদি দ্বারা অপরাধীর স্বাধীনতাবিলোপ; বিড়ম্বন অর্থে মস্তকমুণ্ডন, গাধায় চড়ান, চোর বলিয়া গায়ে তপ্ত লৌহ দ্বারা ছাপ লাগান, নাগ্‌রা অর্থাৎ ঢোল পিটিয়া দোষীর অপরাধ জ্ঞাপন ও তাহাকে নগরের মধ্যে ঘোরান। "অঙ্গচ্ছেদশ্চ ছেদ্যাঙ্গভেদাৎ চতুর্দ্দশবিধ ইতি বৃহস্পতিঃ"। বৃহস্পতির বচন অনুসারে অঙ্গচ্ছেদ ১৪ প্রকারের, যথা;—হস্ত, অঙ্ঘ্রি, লিঙ্গ, চক্ষু, জিহ্বা কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বার অর্দ্ধাংশ, পদের অংশ সংদংশ (পদার্দ্ধ) অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ (অঙ্গুলি) ছেদ, ললাট, ওষ্ঠ • • কটি। প্রমাপণ অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড আবার দ্বিবিধ, খড়্গঘাতাদি দ্বারা মারা, শূলারোপণাদি অর্থাৎ শূলে চড়াইয়া মারা।

ধনদণ্ডের বিধান এইরূপ যে, প্রথম অপরাধের জন্য ২৪ পণ হইতে ৯১ পণ পর্য্যন্ত। মধ্যম সাহস বা অপরাধের জন্য দুই শত হইতে পাঁচ শত পণ পর্য্যন্ত, উত্তম সাহসের জন্য ছয় শত হইতে এক হাজার পণ পর্য্যন্ত। "পণ"শব্দে কোন বিশেষ ওজনের তাম্রমুদ্রা। "মাস" ওজনে পণের বিশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যেখানে মাসশব্দের প্রয়োগ আছে, বুঝিতে হইবে উহা স্বর্ণের; এবং যেখানে মাসকের প্রয়োগ আছে বুঝিতে হইবে উহা রূপার। নিষ্ক স্বর্ণনির্ম্মিত। যেখানে "শতং দণ্ড্যঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে "শতপণং দণ্ড্যঃ"।

যাহা প্রকৃত অপরাধ (crimes proper) তাহাই দণ্ডবিবেকে দণ্ডনীয়। প্রকৃত অপরাধ অর্থে বুঝিতে হইবে, যাহা চরমুখে অর্থাৎ প্রহরীগণ (পুলিশ) কর্ত্তৃক রাজার গোচরীভূত হয়; এবং রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক বিচারের জন্য বিচারকর্ত্তার নিকট আনীত হয় (কোন পক্ষের আবেদন মতে নহে)। টাকা কর্জ্জ লইয়া তাহা সহজে প্রত্যর্পণ না করিলে যে অপরাধ হয়, তাহা দণ্ডবিবেকের অন্তর্গত নহে। কিন্তু কেহ প্রকৃত পক্ষে দেনা লইয়া যদি অস্বীকার করে, তবে মিথ্যাভাষণের জন্য দণ্ডবিবেক অনুসারে সে দণ্ডনীয় ও সাজা পাইবার উপযুক্ত। দ্বৈতবিবেক বা ব্যবহারশাস্ত্র দেওয়ানি আইনের নামান্তর। দেওয়ানি আইনের বিচারালয়ে কাহার কত প্রাপ্য ইত্যাদি বিষয়ের বিচার হইবে। ঐ দ্বৈতবিবেক গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। উহার অনুসন্ধান চলিতেছে।

সামান্য চুরির অপরাধে হৃত দ্রব্যের পাঁচগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ড। ধান্যচুরির অপরাধে নিম্নপক্ষে দণ্ড দশ কুম্ভ। এক কুম্ভের পরিমাণ প্রায় ৬৪ সের। আচার্য্য, পুরোহিত, ব্রহ্মচারী, রাজা, বালক, বৃদ্ধ, ভীষণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আদৌ দণ্ডনীয় নহে। এখানে King can do no wrong রাজা অপরাধ করিতে পারেন না, রাজা কথাটির উল্লেখ থাকাতেই এই কথাটুকু মনে পড়ে। দণ্ডবিবেকে রাজা ছাড়া আরও কয়েকজন দণ্ড পাইবার যোগ্য নহেন, তাঁহারা দণ্ডের অতীত ইহা দেখিতে পাই। ফলত তাঁহাদের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা প্রায় ছিল না।

ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গহানির দণ্ড ছিল না। তাঁহাদের সম্বন্ধে জেল ও অঙ্গে তপ্ত শলাকার সাহায্যে দাগ দিবার ব্যবস্থা ছিল। ভীষণ অপরাধের জন্য তাঁহাদের নির্ব্বাসন-দণ্ডও হইত। চৌর্য্যাদি করিবার চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে দণ্ডের পরিমাণ চতুর্থাংশ মাত্র। যদি কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের দণ্ডের পরিমাণ ব্যক্তিগত অপরাধের দ্বিগুণ। যাহারা অস্পৃশ্য জাতির অন্তর্গত তাহাদের পক্ষে অর্থদণ্ড বিহিত নহে। যাহারা ব্যবসায়ী, কারিকর ও যোদ্ধা, তাহাদিগকে তাহাদের যন্ত্র বা অস্ত্র হইতে ঘরবাড়ী শয্যা অলঙ্কার ও পরিধেয় বস্ত্র হইতে বঞ্চিত করিবার দণ্ডবিবেকে বিধান নাই। সর্ব্বস্ব অপহরণ যে যে অপরাধের শাস্তি, সেখানে রাজা সম্পত্তির কেবলমাত্র তিনচতুর্থ গ্রহণ করিবেন ও অপরাধীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বাকী চতুর্থাংশ ছাড়িয়া দিবেন। যাহারা অপরাধের জন্য দৈহিক শাস্তিতে দণ্ডিত, তাহারা অর্থদণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে, ইহারও বিধান আছে। যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, সে একশত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে। অঙ্গচ্ছেদ যাহার পক্ষে ব্যবস্থা, সে পঞ্চাশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া এবং যে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত সে পঁচিশ স্বর্ণমুদ্রা জরিমানা দিলে মুক্তি পাইত।

মনে রাখিতে হইবে, সে সময়ে এত অধিক পরিমাণ অর্থদণ্ড দেওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। যদি কাহারও উপর অর্থদণ্ড হইত, সে তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে তৎপরিবর্ত্তে জেল খাটিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণদের পক্ষে এইটুকু সুবিধা ছিল যে, তাহারা একেবারে সমস্ত জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে তাহাদের সম্বন্ধে কিস্তিবন্দীতে জরিমানার টাকা আদায় দিবার ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণবধ করিলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি রাজপ্রাপ্ত হইত। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রকে বধ করিলে তাহাদের দণ্ডের পরিমাণ যথাক্রমে এক হাজার গাভী হইতে দশটি গাভী পর্য্যন্ত। অন্যজাতীয়া স্ত্রীবধ বা ইতর পশুহত্যার জন্য শাস্তি শূদ্রবধের তুল্য। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অকারণ প্রাণীহত্যা সে সময় দণ্ডনীয় হইত। যদি কয়েকজন মিলিয়া অপরের সহিত বিবাদ করিতে করিতে একজনের প্রাণসংহার হইত, তবে যাহার হস্তে মৃত্যু ঘটিয়াছে সে বধকারী। সে ত দণ্ড পাইবেই; আর যাহারা তাহার সহকারী তাহাদের প্রত্যেকের দণ্ড বধকারীর দণ্ডের অর্দ্ধেক। বধকারীর দলস্থ লোকের সংজ্ঞা "আরম্ভকৃৎ, সহায়ঃ, আশ্রয়ঃ, দোষভাক্, মার্গানুদেশকঃ, শস্ত্রদাতা, যুদ্ধোপদেশকঃ, অনুমোদকঃ"। ইহাতে বুঝা যায় এখনকার মত aiding and abetting যাহারা করিত, তাহাদেরও নিস্তার ছিল না। অনেকে বলিতে চান যে, হিন্দু আমলে ব্রাহ্মণগণ আদৌ দণ্ডনীয় হইতেন না। দণ্ডবিবেক-পাঠে তাঁহাদের সে ভ্রান্তি ঘুচিবে। দণ্ডবিবেক হইতে দর্শনীয় আরও অনেক আছে এবং চিন্তা করিবারও যথেষ্ট বিষয় আছে।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।

(সমালোচনা—৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

এই গ্রন্থ, এবং ইহার পরে যে গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে, এই দুই গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা একটী আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা সচরাচর বাঙ্গলা গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। তাহাতে লেখকদিগেরও অসুখ, আমাদিগেরও অসুখ। লেখক মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে "আমার প্রণীত গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অনিন্দনীয় এবং রামায়ণ হইতে আজি পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট"। সমালোচক যদি ইহার অন্যথা লেখেন তবেই গ্রন্থকারের বিষম রাগ উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীমধ্যে যত দেশে যত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া লোকপীড়া জন্মাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালি গ্রন্থকার সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। সুতরাং তাঁহাদিগের আমরা প্রশংসা করি না, অপ্রশংসা দেখিয়া লেখকসম্প্রদায় আমাদিগের প্রতি রাগ করেন। সভ্যজাতীয়দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ রাগ হইলে, তিনি সে রাগ গায়ে মারেন; দুই-একজন ব্যাকুল গ্রন্থকার কদাচিৎ সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব সেরূপ নহে। বাঙ্গালী অন্য যে কার্য্যে পরাঙ্মুখ হউন না কেন, কলহে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন। সমালোচনায় অপ্রশংসা দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে—প্রতিবাদ করিতে গেলে এ-সম্প্রদায়ের লেখকদিগের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বর্জ্জনীয়। যে দেশে অল্পকাল হইল, কবির লড়াই ভদ্রলোকের প্রধান আমোদ ছিল—যে দেশে অদ্যাপিও পাঁচালি প্রচলিত, যে দেশের লোক অশ্লীল গালিগালাজ ভিন্ন অন্য গালি জানে না, সে দেশের ক্রুদ্ধ লেখকেরা যে রাগের সময়ে আপনাপন শিক্ষা এবং সংসর্গের স্পষ্ট পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। কখনও কখনও দেখিয়াছি যে মহাসম্ভ্রান্ত দেশমান্য ব্যক্তিও আপনার সম্মানের ত্রুটি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রাগান্ধ হইয়া ইতরের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছেন এবং মাতৃভাষাকে কলুষিত করিয়াছেন। কখনও কখনও দেখিয়াছি, রাগান্ধ লোকেরা সমালোচনার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেও অক্ষম। যদি আমরা কোন পুস্তকান্তর্গত চর্ব্বিতচর্ব্বণকে ব্যঙ্গ করিয়া "নূতন" বলিয়াছি, গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার কথাগুলিকে নূতন বলিয়াছি! যদি কোন গ্রন্থে দুই আর দুই চার হয়, এমত কথা পাঠ করিয়া তাহা "দুজ্ঞের্য়" বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছি, অমনি গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, আমার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সত্য সত্যই দুজ্ঞের্য় বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। সুতরাং তিনি অধীর হইয়া প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন যে তাঁহার কথাগুলি অতি প্রাচীন এবং সকলেরই জ্ঞানগোচরে। কখন কখন দেখিয়াছি, কোন সামান্য অপরিচিত লেখক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, আমরা ঈর্ষ্যাবশতঃই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছি। এসকল রহস্যে বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কতকগুলি ভালমানুষকে যে মনঃপীড়া দিয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হই, ইহা আমাদিগের বড় দুঃখ। অতএব বঙ্গীয় পুস্তক সমালোচনা আমাদিগের বড় অপ্রীতিকর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত। কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা অনিচ্ছুক হইয়াও অপ্রশংসনীয় গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। আমাদের নিতান্ত কামনা যে প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদিগের হাতে পড়ে, আমরা প্রশংসা করিয়া লেখকসমাজকে জানাই যে আমরা বিশ্বনিন্দক নহি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ গ্রন্থ অতি বিরল। অদ্য দুইখানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাই আজি আমাদিগের এত আহ্লাদ। তাহার মধ্যে রাজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থখানি প্রথমেই সমালোচনীয়।

হিন্দুধর্ম্ম যে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, এই কথা প্রতিপন্ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গত ভাদ্রমাসে জাতীয়-সভায় রাজনারায়ণ বাবু উপস্থিত মতে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে তাহা স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতেই এ প্রস্তাবের উৎপত্তি।

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রচার কালে কার্য্যাধ্যক্ষ সাধারণ সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, এই পত্রে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতামতের সমালোচনা হইবে না। আমরা সেই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ, সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন না করিলে আমরা এ প্রবন্ধের উপযুক্ত সমালোচনা করিতে পারি না, কেননা তাহা করিতে গেলে হিন্দুধর্ম্মের দোষগুণ বিচার করিতে হয়। অতএব আমরা ইহার প্রকৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না, ইহা আমাদের দুঃখ রহিল।

কিন্তু সে তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও যদি একজন হিন্দুবংশজ লেখক বলেন, যে আমাদের দেশের ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা একজন সুপণ্ডিত লোকের নিকট শুনিয়া সুখ হইল, তবে বোধ করি, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেও তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন।

আমরা বলিতেছি, একথা শুনিয়া আমাদের সুখ হইল, কিন্তু একথা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি না, বা অযথার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছি না। হিন্দুধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা, তদ্বিষয়ে কোন অভিমত ব্যক্ত না করিয়া, নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

লেখক যাহাকে স্বয়ং হিন্দুধর্ম্ম বলেন, তাহারই শ্রেষ্ঠত্বসংস্থাপনই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহা অবশ্য অনুমেয়। তিনি বলেন যে ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দুধর্ম্ম। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এদেশের সাধারণ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা তিনি বলেন না। যে ধর্ম্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা—সকল ধর্ম্মের অন্তর্গত—সকলেরই সারভাগ।

রাজনারায়ণ বসু নিজপ্রশংসিত ধর্ম্মের মূলস্বরূপ বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূল হিন্দুশাস্ত্রে আছে, ইহা যথার্থ। কিন্তু উহা হিন্দুধর্ম্মের একাংশমাত্র, অতি অল্পাংশ। কোন পদার্থের অংশমাত্রকে

সেই পদার্থ কল্পনা করায় সত্যের বিঘ্ন হয়। অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থেরই প্রশংসা করা যায়। রাজনারায়ণ বাবু যেমন হিন্দুধর্ম্মের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি ঐ ধর্ম্মের অপরাংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল কথাই খণ্ডন করা যাইতে পারে। যেমন অঙ্গুরীয় মধ্যস্থ হীরককে অঙ্গুরীয় বলা যায় না, তেমনি ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় না। যেমন কলিকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় না। উপধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পরিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা কোনকালে একা ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বা আধুনিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিনা, সন্দেহ। যদি একথা যথার্থ হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতাসংস্থাপন লেখকের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। বোধ হয় রাজনারায়ণ বসু একথা অস্বীকার করিবেন না।

ইহাতে আমরা লেখকের অপ্রশংসা করিতেছি না, স্বমতসংস্থাপনে সকলেরই অধিকার আছে। বিশেষ ব্রাহ্ম পরিবর্ত্তে হিন্দু কথাটী ব্যবহারে বিশেষ উপকার আছে। হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের একতা স্বীকার করায় আমাদের বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল। আমি যদি অন্যের সহিত পৃথক হইয়া, একা কোন সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে আমার একারই উপকার, যদি সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে সকলেই তাহার ফলভোগী হইবে। অল্প লোক লইয়া একটী নূতন সম্প্রদায়স্থাপনের অপেক্ষা বহুলোকের সঙ্গে পুরাতন ধর্ম্মের পরিশোধন ভাল। কেননা তাহাতে বহুলোকের ইষ্টসাধন হয়। আমরা হিন্দু, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি; কোন সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে একথা বলিলাম না; হিন্দুজাতির আনুকূল্যেই একথা বলিলাম।

অন্যান্য বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছুক নহি বলিয়া গ্রন্থকারের রচনার প্রশংসা করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। এই প্রবন্ধের রচনাপ্রণালী অতি পরিপাটি। লেখক অতি পরিশুদ্ধ, অথচ সকলের বোধগম্য এবং শ্রুতিসুখদ ভাষায় আপন বক্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। মিথ্যা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কথায় সুচারুরূপে কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহও প্রশংসনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রবন্ধের শেষভাগে সন্নিবেশিত জয়োচ্চারণ আমাদের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। ইহাতে নূতন কথা কিছু নাই, কিন্তু এরূপ পুরাতন কথা যদি হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তবে তাহাতেই আমাদের সুখ। রাজনারায়ণ বাবুর হৃদয় হইতে একথা নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়াই তাহাতে আমাদের সুখ।

"আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির জন্য একস্থানে বলিয়াছেন,—Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible looks; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindlling her undazzled eyes at the full mid-day heaven.

আমি সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির কীর্ত্তি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত-খনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।
রূপবতী সাধ্বী সতী ভারতললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা দময়ন্তী পতিব্রতা
অতুলনা ভারতললনা।
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি।
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগুতপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস
কবিকুল ভারতভূষণ।
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি।
কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়
যতো ধর্ম্মস্ততোজয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি।"

রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক, হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব্ব-পশ্চিমসাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটী ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।*

* ১২৭৯ সালের চৈত্র-সংখ্যা "বঙ্গদর্শন" হইতে উদ্ধৃত।

সংবাদ।

বর্ষশেষে ব্রাহ্মসমাজ। বিগত ৩০শে চৈত্র সোমবার বর্ষশেষ উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যার পরে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ উপাসনান্তে "রামমোহন রায়ের সহজ সাধন" বিষয়ে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। বেদী হইতে আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় "বর্ষচিন্তা" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজে বর্ষশেষ উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পন্ন করেন। বেহালা-ব্রাহ্মসমাজেও ঐদিন শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

নববর্ষে ব্রাহ্মসমাজ। নববর্ষ উপলক্ষে প্রভাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ "নববর্ষের বাণী" বিষয়ে যে উপদেশ বিবৃত করিয়াছিলেন, উহা আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। বেহালাব্রাহ্মসমাজে নববর্ষ উপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ঐদিন সন্ধ্যার পরে আদিব্রাহ্মসমাজে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। তদুপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীগ্রহণ করেন। স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনান্তে ক্ষেমেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতা আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথের "ধর্ম্ম কি?" প্রবন্ধ পাঠ করেন; উক্ত বক্তৃতাটি মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল; উহা পত্রিকায় স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। বেহালা-ব্রাহ্মসমাজে সায়ংকালে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তদুপলক্ষে শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীগ্রহণ করেন এবং শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল নিয়োগ।—আমরা অতীব আনন্দের সহিত অবগত হইলাম যে, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত P-H. D. সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী গুণী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেন্ট খুবই সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন; আমরা শুনিয়াছিলাম, ঐ পদে, একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে বলিয়া অল্পবিস্তর আন্দোলন উপস্থিত করা হইয়াছিল। এরূপ কোন সিদ্ধান্ত হইলে আন্দোলনকারীদিগের বড়ই সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেওয়া হইত এবং গভর্ণমেন্টেরও অবিবেচনার কার্য্য হইত। ইহা জানা কথা যে, মহামান্য কাউয়েল, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়া সংস্কৃত কলেজের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে আমরা কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী নহি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ডাঃ দাসগুপ্ত মহাশয় সংস্কৃত কলেজের বহুবিধ উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

পারিবারিক উপাসনা।—গত ১১ই বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় ৩৮ নং বিডন-রো-নিবাসী শ্রীঅনাথবন্ধু শীল মহাশয়ের গৃহে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উদ্যোগে যে পারিবারিক বিশেষ ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন হইয়াছিল, উহাতে আহূত হইয়া পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ "ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা" বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। উপাসনান্তে অনাথবাবু ছায়াচিত্রে ব্রাহ্মসমাজের পুরাকাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। এইরূপ পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতি গৃহে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ।—গত ৩০শে বৈশাখ বুধবার পূর্ব্বাহ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাৎসরিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষে তদীয় পুত্র শ্রীহৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বকীয় ভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

শোকসংবাদ।

৺সৌদামনী দেবী।—আমরা এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম যে, ভক্তিভাজন রেভারেণ্ড ভাই ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মাহাশয়ের পত্নী চতুরশীতি-বর্ষীয়া সৌদামিনী দেবী আততায়ীর হস্তে গত ১৩ই বৈশাখ রবিবার গভীর রাত্রে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ গত ২০শে বৈশাখ প্রাতে শান্তিকুটীরেই সম্পন্ন হয়। অনেকগুলি ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার সমাগম হইয়াছিল। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু ব্রাহ্মসাধারণের অন্তরে গভীর বিষাদের রেখা অঙ্কিত করিয়াছে। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

৺আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর আচার্য্য আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া গত ১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবারে পরলোকগত হইয়াছেন। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণবিধান করুন।

ওঁ তৎসৎ

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁ তৎসৎ

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬৯। অদর্শনে ও দর্শনে।

মা! ঘুম যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তুমি যদি কাছে থাক, তবে আমি তোমার আরও কাছে যাইতে চেষ্টা করি। আর তুমি যদি কাছে না থাক, তবে আমি ছুটিয়া বাহিরে আসি। যদি বাহিরে দেখিতে পাই, তবে আনন্দে অধীর হই। যদি দেখিতে না পাই, তবে কাঁদিয়া আকুল হই—সে কান্নার আর বিরাম নাই। তখন প্রাণের ভিতর কি যে ঝড় বহিয়া যায়, তাহা আমি জানি আর তুমি জান। তখন মেঘ হইতে ঘন ঘন বাজ পড়িয়া আমাকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা করে এবং তাহার ভীষণ গর্জ্জনে আমার প্রাণে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তখন তুমিই তো তোমার দুই বাহু দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত রাখ আর আমাকে বাঁচাইয়া দাও। শরতের সুনির্ম্মল প্রভাতে কনক তপনের অরুণ জ্যোতির মত তোমার মুখের জ্যোতি তখন আমার প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়া সমস্ত আতঙ্ক বিদূরিত করে—দুঃখ-বিষাদের ঘন অন্ধকার সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়। শেষকালে ঐ একই কথা আমার প্রাণে জাগিয়া উঠে—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার প্রসন্ন মুখে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, আর আমাকে কোলে তুলিয়া বুকে লইয়া আদর কর—তুষ্টিতে পুষ্টিতে আমার সকল অঙ্গ ভরিয়া উঠুক।

৭০। তোমায় ভালবাসি।

মা! আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তোমায় যে কত ভালবাসি, তাহা আমি নিজেই জানি না। শুধুই জানি আর বলিতে পারি যে —এতটা—এতটা ভালবাসি। এত ভালবাসা কোথা হইতে আসিল, কে হৃদয়ে আনিয়া দিল, কিছুই তো জানি না। কেবল জানি—তোমার স্তন্য যতই পান করি, সেই স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে আমারও ভালবাসা নিবিড় হইয়া সকল দিকেই বাড়িয়া চলিতে থাকে, আর জমাট বাঁধিতে থাকে। তোমার স্তন্যেরও শেষ নাই, আমার ভালবাসা বৃদ্ধিরও অন্ত নাই। যখন চাঁদের দিকে চাহিতে চাহিতে আত্মহারা হইয়া যাই, তখন মনে হয়, আমারই মত উহাকেও তুমি স্তন্যপান করাইয়া সুধাধারায় ভরিয়া দিয়াছ, তাই সে আজ অক্ষয় সুধাধারার উৎস হইয়াছে—জগতে সুধাধারা

অফুরন্তভাবে ঢালিতেছে, তবু তাহার বিরাম নাই। যতই তুমি ভালবাসিয়া আমার দিকে হাসি-মুখে চাও, আমারও অন্তরে ততই আনন্দের হাসি জাগিতে থাকে। ততই আমার চারিদিকে সকাল-সন্ধ্যায় বেল যূথি জাতি কতবিধ বিশুভ্র সুবাস ফুলগুলি ফুটিতে থাকে। ঐ ফুলগুলির ভিতরে তোমারই প্রসন্ন মুখের বিমল হাসি দেখিতে দেখিতে এতই অধীর হইয়া উঠি যে, প্রাণের ভিতর আনন্দের এতই ছটফটানি হয় যে, কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারি না—শেষে কাঁদিয়া ফেলি, তবে সেই অধীরতা দূর হয়। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা, তাহার তো শেষ দেখি না। আমার প্রতি তোমার যে ভাল-বাসা, তাহারও তো অন্ত দেখি না, আদিও দেখি না। অনাদি যুগ অবধি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যেন সেই ভালবাসা তোমার আর আমার ভিতরে মাখামাখি হইয়া চলিয়াছে। অথচ তাহাকে হাতড়াইয়া কিছুই ধরিতে পারি না। অনন্ত আকাশের পরতের পর পরতের দিকে যখন আনমনে চাহিয়া থাকি, তখন মনে হয়, বুঝি সেই ভালবাসার একরত্তি আমারই বুকের মাঝে হাত-ড়াইয়া পাইয়াছি—সেই একরত্তিকে পাইয়াই আমি আনন্দে অধীর হই, সেই একরত্তি ভালবাসা আমার প্রাণের অন্তরে যে তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে, বুঝি সাগরের উত্তাল তরঙ্গও তাহার নাগাল পায় না। তোমারই ঐ ভালবাসার উপর আমার সকল আশাভরসাই অবলম্বিত। আমার প্রাণের যাহা কিছু গোপন কথা, সে সমস্তই আমি আমার ভালবাসার কোমলদলে মুড়িয়া তোমার ঐ ভালবাসার মধ্যে রাখিয়া দিলাম। জীবনের শেষ দিনে ভবের খেলা সাঙ্গ হইলে তুমি যখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন সেগুলি তোমার কাছে চাহিয়া লইয়া দেখিব যে, তোমার ভালবাসার উত্তাপে সেগুলি কেমন ফুটিয়া উঠিল।

১১। পূজার ফুল।

মা! আমার বড় ইচ্ছা যে; আমি পূজার ফুল হইয়া ফুটি। তখন হয় তো আমারই মত কোন অধিরপরাণ সেই ফুলটী লইয়া তোমারই চরণে নিবেদন করিত। তুমি যেমন আমার ব্যথা 'নিবা-রণ কর, আমিও সেইরূপ তাহার কাতর প্রাণের ব্যথা নিবারণ করিয়া কত আনন্দ লাভ করিতাম। তুমি আমার সুবাসে আনন্দলাভ করিতে, আমাকে তুলিয়া লইয়া কতই আদর-যত্ন করিতে। আমি তোমার সেই আদর-যত্নের মধ্যে তোমারই হাতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতাম। মরিয়াও সুখী হইতাম, আনন্দে উৎফুল্ল হইতাম।

১২। ক্রোড়ে।

মা! লোকে ভাবে আমি একাজ সেকাজ কত কাজই করিতেছি। কিন্তু আমি তো দেখি না যে, আমি কি কাজ করিতেছি। কেবলই তো দেখি যে তোমারই কোলে ঘুমাইয়া আছি—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ঘুমাইয়া চলিয়াছি। মনে হয়, যেমন অনাদি কাল হইতে ঘুমাইয়া আসিয়াছি, অনন্ত কালও তেমনি ঘুমাইয়া চলিব। আমি তো দেখি, এই প্রকার তোমার কোলে ঘুমাইয়া থাকাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ। কি শান্তি—কি গভীর শান্তি! যে সন্তান মায়ের কোলে নির্ভয়ে শয়ন করিয়া না ঘুমাইয়াছে, এই শান্তির কথা সে কখনই বুঝিতে পারিবে না। মা! তোমার আনন্দাশ্রুতে যখন মধ্যে মধ্যে আমাকে স্নান করাইবার জন্য জাগাইয়া তোল, তখনই যা' আমি জাগিয়া উঠি—জাগিবার অন্য কোন অব-সরই আমার থাকে না—দুই মুহূর্ত্তের জন্য হাত-পা নাড়ি, আবার পরক্ষণে তোমারই কোলে সুখনিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়ি। এই সুখনিদ্রার মাঝে তোমারই স্নেহের স্তন্যপান করিয়া তুষ্টি পুষ্টি সকলই লাভ করি। আবার এই সুখনিদ্রারই মাঝে স্বপ্নে-স্বপ্নে তোমার সঙ্গে কত-না কথা বলি, তুমিও আমার সঙ্গে কত-না কথা কও—আমাদের উভয়ের মধ্যে আনন্দের কি এক আশ্চর্য্য রসধারা বহিয়া যায়। হেথাকার লোকেরা সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা প্রভৃতির জ্যোতির উপর কত-না স্তবস্তুতি কত-না কবিতা রচনা করে। কিন্তু তোমার প্রসন্ন মুখের যে জ্যোতি আমায় অন্তরে বাহিরে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিকট এ সকলের জ্যোতি পৌঁছিতে পারে না। সে জ্যোতি যেমন

এক দিকে শতসূর্য্যের প্রখরতা ধারণ করে, তেমনি তাহা সহস্র চন্দ্রের স্নিগ্ধ কোমলতা বহন করিয়া আনে। আবার সেই জ্যোতিই অযুতকোটি গ্রহতারকা হইতে ঘুমপাড়ানি মন্ত্র আনিয়া আমার চক্ষে বুলাইয়া দিয়া যায়। আমি আর কিছুই চাহি না। কেবল এইটুকু চাহি যে, এখন তোমার কোলে যে প্রকারে ঘুমাইয়া চলিয়াছি, চিরকাল যেন এই প্রকার ঘুমাইয়াই চলিতে পারি। তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও। তোমার চরণ আমার বক্ষে স্থাপন কর। আমি আমার সমস্ত হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া—প্রাণ ভরিয়া তোমার ঐ চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

১০। পথ।

মা! লোকে বলে, তোমার কাছে যাইবার নাকি অনেক পথ আছে! আমি কিন্তু একটী পথ ছাড়া আর কোন পথই তো দেখিতে পাই না। আমার লক্ষ্যও একই তুমি, তোমাতে পৌঁছিবার পথও আমি একটী মাত্রই জানি। তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়াই আমার সেই একমাত্র সরল পথ। দিনের আলো যখন নিভ-নিভ হইয়া আসে, সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর প্রাণ যখন একটুখানি শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, তখন তোমার ঐ কোলে বারেকের জন্য উঠিতে প্রাণের ভিতর কি রকম আকুলি-বাকুলি লাগিয়া যায়। যখন দেখি সন্ধ্যাসমাগমে পাখী-গুলি নিজ নিজ বাসায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আমারও প্রাণ তোমারই কোলে একটুখানি আশ্রয় পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই সন্ধ্যাবেলায় আমার প্রাণে কান্না উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে—তুমি একবার কোলে লইয়া স্নেহচুম্বনে সমস্ত কান্না নিঃশেষ করিয়া দাও। তোমার ঘরে আমাকে লইয়া চল, সেখানে তোমার নামের অফুরন্ত গান আমি শুনিব আর শিখিব। হৃদয় যখন আনন্দে অধীর হইবে, অথবা দুঃখবিষাদে মলিন হইবে, তখন সেই সমস্ত গান আমি গাহিব আর তোমাকে শুনাইব। সংসারের কোলাহল কলরব হইতে আমাকে উদ্ধার কর। জীবনের যাহা কিছু বোঝা তাহা আমার দুর্ব্বল মাথা হইতে তুলিয়া লও। আমার জীবনে এখন কোনই কামনা বাসনা নাই। আকাশে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা যে ছন্দে নৃত্য গীত করিতে করিতে চলিয়াছে, এখানে ধরাপৃষ্ঠে ফুলেরা বাতাসের সঙ্গে তালে তালে যে ছন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, আমি সেই ছন্দে তোমার নাম গাহিতে গাহিতে তোমারই কোলে ঘুমাইয়া পড়িতে চাই। সংসারের এ পারে সে ছন্দ কেহই শিখিতে চাহে না। তাই আমি তোমার কাছে নির্জ্জনে সেই ছন্দ শিখিতে চাই, যাহাতে সেই ছন্দে প্রাণের কথা সংযোজনা করিয়া যথা-সময়ে তোমাকে শুনাইতে পারি, আর তোমার কাছে উৎসাহ পাইতে পারি। মা! আমার এই ভগ্ন জীর্ণ তরীতে পাল তুলিয়া দিয়াছি। তুমি ইহার হালটী ধরিয়া যে কূলে উঠিলে নিত্য তোমার চরণ পূজা করিতে পারি, সেই কূলে উহাকে লইয়া যাও।

নববর্ষের বাণী।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)

এই যে নববর্ষ শ্যাম ও শুভ্ররূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহার একটী বাণী আছে; আমাদিগকে জানাইবার ইহার একটী কথা আছে। অনন্তের দেশ হইতে সমাগত এই অতি-থির সেই বাণী হইতেছে প্রাণের বাণী, নবীনতার বাণী—মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের মাঝে উত্তীর্ণ হইবার বাণী।

"আত্তং বৈ মৃত্যুনা সর্ব্বং" জগতের সকল বস্তুই মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত। কালের স্পর্শ হিম-শীতল মৃত্যুর স্পর্শ। জগতের সকল বস্তুই ইহার স্পর্শে প্রাণ হারায়—পলে পলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়। তাই জগতে যাহারা বাঁচিতে চায়, থাকিতে চায়, তাহাদের এই মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার কৌশলটী অবগত না হইলে চলে না। সেটী হইতেছে পলে পলে জমিয়া ওঠা মৃত্যুবাধাকে প্রাণের স্রোতোবেগে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়া। সৃষ্টির সর্ব্বত্র প্রাণের এই জয়যাত্রা—এই লীলা, মৃত্যুর সহিত জীবনের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম-ধারা চলিয়াছে। যাহার মাঝে প্রাণের এই গতি

থামিয়া আসিতেছে—মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, সেই মৃত্যুগ্রস্ত "গ্রস্তং বৈ মৃত্যুনা"। জগতে তাহার স্থান নাই—সৃষ্টির সে বাধা। ইহাকে যত সত্বর পার বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হও—প্রাণের গতিপথের ঐ শিলাস্তূপ অপসারিত কর, তপস্যা দ্বারা মৃত্যুর আবরণকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের রসে অভিষিক্ত হও। ইহাই প্রাণের ধর্ম্ম—ইহাই নববর্ষের বাণী।

কিন্তু জীবনের পথে প্রাণের এই গতি অব্যাহত রাখা যায় কিরূপে? চলিতে চলিতে প্রাণের সঞ্চয় ফুরাইয়া আসে—ক্লান্তি দেখা দেয়, শ্রান্তিতে শরীর ও মন অবসন্ন হয়; তখন সর্ব্বাঙ্গ মৃত্যুর নখরাঘাতে ক্লিষ্ট হয়—ধীরে ধীরে জরা ও বার্দ্ধক্যের ক্রোড়ে আমরা আত্মসমর্পণ করি। এই মৃত্যুকে আমরা ঠেকাইব কিরূপে? প্রাণের নিত্য ক্ষীয়মাণ এই সঞ্চয়কে বাড়াইব কিরূপে? 'বর্ষার পরে জলের অভাবে পুকুরের সাবধানে-সঞ্চিত জলরাশি দিনে দিনে ফুরাইয়া আসে; কিন্তু নদীর সহিত তাহার মূল উৎস পর্ব্বতের যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকায় উহার নিত্য ব্যয়শীল জলধারা অফুরন্ত থাকে।' উৎসের সহিত যোগ রাখিতে হইবে, তাহা হইলে প্রাণের স্রোতে আর ভাঁটা পড়িবে না।

মানবজীবনে এই উৎস কে? আত্মার অন্তরাত্মা পরম পুরুষই এই উৎস। ইনি মানবের আত্মার অন্তরে নিত্য সন্নিবিষ্ট আছেন "সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"। আমাদের যাহা কিছু, যত কিছু সকলেরই মূল কারণ এই পরম পুরুষ। প্রাণ নিত্য এই অফুরন্ত উৎস হইতেই আপন ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া বাহিরে আসিয়া ব্যয় করে, জীবনের বিচিত্র প্রচেষ্টারূপে অভিব্যক্ত হয়।

উপনিষদে এই তত্ত্ব সুন্দরভাবে বোঝান হইয়াছে। 'লোকে যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, যখন সকলে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলে যে, "এ ব্যক্তি সুষুপ্ত"; তখন সে আপনার হৃদয়-গুহাশায়ী যে পরমাত্মা, তাঁহারই সহিত মিলিত হইয়া একাত্মযোগে যুক্ত হয়; সে তখন পরমাত্মাকে আত্মাতে লাভ করে, পরমাত্মার মধ্যে ডুবিয়া যায়। ......যখন কেহ একটী পাখীকে সূত্রের অগ্রভাগে বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্ত নিজের হাতে ধরিয়া রাখে, তখন যেমন সেই পাখিটী তাহার ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আশায় চারিদিকে নিয়ত উড়িতে থাকে; উড়িতে উড়িতে অবশেষে পরিশ্রান্ত হইলে কোথাও আর অবলম্বন না পাইয়া বিশ্রাম করিবার আশায় আবার সেই ব্যক্তির হাতেই ফিরিয়া আসে; সেইরূপ আমাদের এই জীবাত্মাও স্বপ্নে ও জাগরণে বিপুল বিষয়রাশির মধ্যে নিপতিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পরিশ্রান্ত হইলে, অবশেষে বিশ্রামের আশায় সুষুপ্তিকালে আপনার শাশ্বত প্রতিষ্ঠাভূমি পরমাত্মাতেই ফিরিয়া আসে।' আমাদের আত্মা পরমাত্মার সহিত প্রেমসূত্রে বাঁধা রহিয়াছে।

আমরা এই তত্ত্ব জানিনা বলিয়াই বাহিরকেই অযথা অধিক মূল্য দিয়া বসি। এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময়ী সুন্দরী ধরণী যে আমাদের চিত্তকে দোলা দেয়—আনন্দ-রসধারায় সিক্ত করে, তাহার অনেকখানিই যে আসে আমাদের অন্তর্লোক হইতে। আত্মারই আনন্দ-রস মনের পথে ইন্দ্রিয়ের পথে নামিয়া আসিয়া বাহিরের বস্তুকে সিক্ত ও সরস করিয়া অমৃতপূর্ণ করিয়া তুলে "এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"। তাই তো দেখিতে পাই যাহার মনে আনন্দ আছে, তাহার সকল বস্তুতেই আনন্দ। তাহার নিকট ভাল-মন্দ কিছুই নাই, সবই ভাল; তাহার শত্রু-মিত্র কিছুই, সবই মিত্র। তাহার অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, সে সব পাইয়াছে। তাহার কোন অভাব নাই। তাহার নিকট সুন্দরঅসুন্দর কিছুই নাই—সবই সুন্দর; যে দিকে চায়, সে অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়।

শিশু ও সাধকের অন্তঃকরণ ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। একজন প্রকৃতির প্রেরণায়, অন্যে সাধনার শক্তিতে এই যোগ অক্ষুণ্ণ রাখেন বলিয়াই কোথাও কখনও তাঁহাদের আনন্দের অভাব হয় না। আমরা আপন অহঙ্কারের প্রলেপে স্বার্থ-বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতায় প্রকৃতির নিকট হইতে সহজ প্রাপ্ত এই অমূল্য দান হেলায় হারাইয়া ফেলি। তাই তো আজ আমাদের দৈন্যের আর অন্ত নাই। আমাদের বুভুক্ষা এত তীব্র হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে যে, মনে হইতেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আহুতি

পাইলেও ইহার শান্তি ঘটিবে না। এই নববর্ষ ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত এই শ্যাম-ধরিত্রীর অঙ্গে অঙ্গে তৃপ্তির ও স্নিগ্ধতার যে আলো মাখাইয়া দিয়াছে, মানবসমাজে তাহা কোথায়? আজ নববর্ষের নিকট এই শিক্ষাটী গ্রহণ কর—"তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে" যাহা তুমি কাহাকেও দিলে না—বঞ্চিত করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিলে তাহাই তোমার নষ্ট হইল; শুধু তাহাই নহে প্রাণস্পর্শহীন সেই মৃত অস্থিস্তূপ পাষাণভারে তোমাকেও পাতালের অতল গহ্বরে প্রেরণ করিবে। এই উদ্ভিজ্জগৎ যদি শীতের উত্তরবায়ুতে আপনার দীর্ঘকালের সঞ্চিত পত্র-পুঞ্জকে উড়াইয়া না দিয়া অন্ধমায়ায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিত, তবে আজিকার এ শ্যামশোভা আসিত কোথা হইতে? নদী যদি তাহার বিপুল সঞ্চয়কে দু'বাহু প্রসারিত করিয়া মুক্তি না দিত, তবে নিদাঘে তাহাকেও যে পুকুরের মত রিক্ত ও নিঃস্ব হইয়া শোভাহীন হইতে হইত।

আত্মা প্রকাশধর্ম্মী—তাহার প্রকাশের পথে, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের পথে গণ্ডি টানিও না—বাধা সৃষ্টি করিও না; পরমাত্মা ভিতর হইতে তোমার সমস্ত রিক্ততা নিঃস্বতা ও সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া দিবেন; অনন্ত উৎসের সহিত যে তোমার যোগ রহিয়াছে—ভয় পাও কেন? আমরা সেই অনন্ত আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত একএকটী বিস্ফুলিঙ্গ। তাঁহার "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া" আমাদেরই মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। অহঙ্কারের প্রলেপ, সঙ্কীর্ণতার বুদ্ধির বাধা অপসৃত করিলে উহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সূর্য্য যেমন মেঘে ঢাকা থাকিলে তাহার কিরণ দেখা যায় না, অথচ উহা বিদ্যমান থাকে; আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমও সেইরূপ স্বার্থবুদ্ধির মেঘে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; এই বাধা অপগত হইলে উহারা দিব্য বিভায় আপনিই দীপ্যমান হইয়া উঠিবে। তখন জগতের প্রতি বস্তুই সুন্দর, প্রতি বস্তুই আনন্দপ্রদ প্রাণপ্রদ হইয়া উঠিবে। এক এক বস্তু এক এক ভাবে আনন্দ প্রদান করিবে। এই স্থলে জলে আলো অন্ধকারে ঘেরা বহুরূপী জগৎ বিচিত্র সৌন্দর্য্যে রঞ্জিত। নদীসাগর, পাহাড়-পর্ব্বত, তরুলতা, ফুলপাতা, দিবারাত্রি, আকাশ-অন্ধকার, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র, নরনারীর কমনীয় কান্তি, শিশুর হাসি, মাতার প্রেম, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা—কোন্‌টী না সুন্দর? তবে কেন সকলে সর্ব্বদা ইহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য অনুভব করে না? সেই বাধা—সঙ্কীর্ণতার বাধা। ঊর্দ্ধে আকাশের ঐ প্রগাঢ় নীলিমা, সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় বিকাশ, গাছের কচি কচি পাতার মুহুর্মুহু কম্পন কাহারও হৃদয়ে আনন্দের তুফান তুলিয়া দেয়, কাহারও বা নিকটে ইহা অনাবশ্যক বাধা। পূর্ণি-মার চাঁদ দেখিয়া কেহ আনন্দ পায়, কেহ বা পায় না। যে পায়, বুঝিতে হইবে তাঁহার অন্তরে আনন্দের উৎস নিত্য উৎসারিত রহিয়াছে; যে পায় না তাহার সেই অন্তরের উৎস অহঙ্কারের সঙ্কীর্ণতার চাপে মরিয়া গিয়াছে জানিতে হইবে। এই স্বার্থবুদ্ধির মায়াজাল স্বহস্তে ছেদন করিতে হইবে।

এস দীন, এস সর্ব্বহারা! আজ এই পুণ্যলগ্নে জীবনের অমৃতময় প্রাণরস পান কর—নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হও। ক্ষুদ্রের মত দীনের মত নিঃস্বের মত একধারে সঙ্কুচিত থাকিও না। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—তোমরা উত্থান কর—জাগ্রত হও। তোমরা যে অমৃতের পুত্র—অমৃতের সন্তান, সত্যদর্শী ব্রহ্মবাদী ঋষির এই যে মহতী বাণী, ইহা মিথ্যা নহে—ইহা নিতান্তই সত্য। নয়ন হইতে নিদ্রাজড়িমা পরিহার করিয়া জীবনের জয়যাত্রায় অগ্রসর হও। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ভূমৈব সুখং—ক্ষুদ্রের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া মহান্ পুরুষের চরণে শরণ গ্রহণ কর। এই পৃথিবী তোমার গৃহ, ঐ আকাশ তোমার চন্দ্রাতপ, সূর্য্যচন্দ্র তোমার দীপ; তোমাকে আনন্দ দিবার জন্য গাছে ফুল ফুটে, ফল ধরে; দিকে দিকে নদী অমৃতধারা ক্ষরণ করে, বায়ু মধু বহন করে—তুমি ক্ষুদ্র নও। "যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজো-ময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ" এই আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় দিব্যপুরুষ যুগপৎ সকলকে অনু-ভব করিতেছেন, তিনিই যে তোমার হৃদয়াকাশেও আপন সিংহাসন পাতিয়াছেন। শস্ত্র তোমাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ

করিতে পারে না, জল তোমাকে ক্লিন্ন করিতে পারে না, বায়ু তোমাকে শুষ্ক করিতে পারে না—জরা তোমাকে জীর্ণ করিবে কিরূপে? তুমি তপস্যা কর—তপস্যা কর; ক্ষুদ্রতার আবরণ বিদীর্ণ হউক, মৃত্যু পরাভূত হইয়া মলিন বস্ত্রের ন্যায় পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়ুক। তোমার মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত প্রীতি-প্রেম-শক্তি শতদল-দলের ন্যায় শোভায় ও সৌগন্ধে দিগন্ত আমোদিত করুক।

হে পরমাত্মন্! যে অসীম আকাশে এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমারই সুনিয়মে বিঘূর্ণিত হইতেছে, তুমি সেই আকাশ হইতেও বৃহত্তর, তুমিই আবার আমার হৃদয়গুহায় অবস্থিত। তোমার ভয়ে বায়ু ছুটিতেছে, সূর্য্য জ্বলিতেছে, মেঘ গর্জ্জিতেছে; তুমিই আবার আমার চক্ষুতে দৃষ্টি, শ্রবণে শ্রুতি ও মননে মতি হইয়া প্রকাশ পাইতেছ। তুমি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—মূক আমরা, তোমার মহিমা কি গান করিব? হে আবিঃ, হে স্বপ্রকাশ! আমাদের দেহে-মনে ও আত্মাতে তোমার প্রেম ও পবিত্রতার তোমার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আলো জ্বলিয়া উঠুক। হে অনন্ত স্বরূপ পরম পুরুষ! তোমার অসীমতায় আমাদের সসীম জীবনবিন্দু বিধৃত হইয়া শোভমান হউক।

নববর্ষে চিন্তা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান তোমার হস্তে যাহা কিছু গচ্ছিত রাখিয়াছেন, মনে করিও না যে, সে সমস্ত তোমার একার ভোগের নিমিত্ত। ঐ সকল গচ্ছিত ধনের সাহায্যে তোমার পরিপার্শ্বস্থ মানবগণের, সহচর ও অনুচরগণের, এমন কি, জীবজন্তুরও অভাব ও দুঃখ তোমাকে যথাসাধ্য মোচন করিতে হইবে। এই কারণেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমার অন্তরে করুণাবৃত্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন—পরের দুঃখ দেখিলে তুমি সহজে গলিয়া যাও, তোমার নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া যায়। ঈশ্বরপ্রসাদে তুমি যখন ধনরাশির অধিকারী হও, তখন বৃদ্ধ ও আতুরদিগকেও তোমার স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টানদিগের ন্যায় বৃদ্ধ ও আতুরদিগকে উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে ফেলিয়া দিয়া নিহত করিলে চলিবে না। এরূপ করা ধর্ম্মশাসনের বিরোধী বলিয়া ঐ বর্ব্বরোচিত প্রথা মানুষের সহ্য হইল না; কাজেই উহা ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তুমি চাও যে ভগবান তোমাকে সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখুন। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তুমি একা তাঁহার সন্তান নও; এই ধরাতলে তাঁহার অসংখ্য অসংখ্য সন্তান আছে; তোমার ন্যায় তাহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসার অধিকারী। তাহাদের মধ্যে তুমি যতই ভালবাসা দিতে পারিবে, যতই আপনাকে সম্প্রসারিত করিতে পারিবে, ততই তুমি ঈশ্বরের স্নেহের প্রেমের ও মঙ্গল আশীর্ব্বাদের উত্তরোত্তর অধিক হইতেও অধিকতর অধিকার লাভ করিতে থাকিবে। এই আত্মপ্রসারণের জন্য ধনীর রাজপ্রসাদেও যেমন নির্লিপ্তভাবে—কিন্তু অন্তরে হিতৈষণা-পোষণ করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে, দুঃখীর দুর্গন্ধময় অন্ধকার কুটীরের মধ্যেও তোমাকে সেইরূপ নির্লিপ্তভাবে ও হিতৈষণাপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইবে। তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকেই আপনার হৃদয়ে টানিয়া লইতে হইবে। ভগবান যেমন পাপী তাপী, সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র, কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, তুমিও সেইরূপ তোমার আত্মীয় অনাত্মীয়, মিত্র অমিত্র, কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পার না। কেবল তুমি আপনি সুখভোগে মত্ত থাকিলে চলিবে না। সেরূপ মত্ত থাকা তোমার নিজেরই মৃত্যু ও বিনাশের কারণ হইবে, কারণ তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

অন্তরে কুচিন্তাকে স্থান দিও না। মনপ্রাণকে সর্ব্বদাই শ্রদ্ধা ও ভক্তির সুগন্ধ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া রাখিও। অন্তরের কবাট রুদ্ধ রাখিও না—সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিও, যাহাতে শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণীগণ তথায় আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। মঙ্গলময় বিধাতা তোমার অন্তরে যে বুদ্ধি ও বল দিয়াছেন, তোমার হস্তে যে শক্তি ও সামর্থ দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে তোমার চারিদিকে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বালিত কর। জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার নব নব পন্থা আবিষ্কার কর। জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রসার বিস্তার কর এবং ভগবানের বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া কৃতার্থ হও।

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপক।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। ধর্ম্মসংহারক কাহাকে বলে ?

পূর্ব্বাপর প্রচলিত যে ধর্ম্মসমূহ, তাহা যতই কেন অপ্রীতিকর ও অনিষ্টকর হউক না, তাহার প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ধূলিসাৎ করা হইল ধর্ম্মসংহারকের কার্য্য। অনেকে বলেন বটে যে, যে ধর্ম্ম অনিষ্টকর তাহা সমূলে উৎপাটন করাই বিধিসঙ্গত ও শ্রেয়স্কর। কিন্তু ইহা মূলত যুক্তিসঙ্গত নয়—ইহা তাঁহাদের যশস্পৃহা ও আত্মম্ভরিতার পরিচায়ক। যাঁহারা আপনাদের কথাই সকলের মান্য শিরোধার্য্য ও নিতান্তই গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদেরই মুখে এরূপ কথা শোভা পায় ; ধর্ম্মের মূল যখন ভগবান হইতেই নামিয়া আসিয়াছে, সকল ধর্ম্মেরই কেন্দ্রে যখন ভগবান অধিষ্ঠিত, তখন কোন ধর্ম্মকেই সমূলে উৎপাটন করিবার কথা নিতান্ত দুঃসাহসিক ভিন্ন অপরের মুখে শোভা পায় না—ওরূপ কথা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের নিকট বাতুলের উক্তি বলিয়া উপহাসই লাভ করে। মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদিগের পূজকদিগের সম্মুখে তাহাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাহাদের সেবিত ঐ সকল মূর্ত্তি বিগ্রহ প্রভৃতি বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দেওয়া বা উহাদিগের নিন্দাবাদ প্রচার করা ধর্ম্মসংহারকদিগের অন্যতর কার্য্য।

২। ধর্ম্মসংস্কারক কাহাকে বলে ?

দেশ কাল ও অবস্থা প্রভৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মের একএকটি পরিধি সংরচিত হয়। দেশ কাল ও অবস্থা যখন প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন আমাদের ইহা বোঝা উচিত যে, প্রতি জনের সম্বন্ধে, প্রতি দেশের ও জাতির সম্বন্ধে এবং প্রতি মুহূর্ত্তের সম্বন্ধে ধর্ম্মের এই পরিধিসকল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়া নিত্য নব নব আকার ও প্রকার ধারণ করিতেছে—অন্তত ধারণ করা উচিত। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন, পরিধির আকারে প্রকারে বিভিন্নতা সহজে আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। পরে এই বিভিন্নতা বর্দ্ধিত হইতে হইতে যখন দেশ কাল ও অবস্থার উপযুক্ত সীমা ছাড়াইয়া চলে, তখনই উহা জনসাধারণকে পূর্ব্ব পরিধিতে চলিবার পথে বড়ই বাধাপ্রদান করে। জনসাধারণ তখন কোন্ পথে চলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, এবং কবে এক মহাপুরুষ আসিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত পথ প্রদর্শন করিবেন, তাহারই প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকে। ভগবানের মঙ্গল বিধানে জনগণের হৃদয়ে যখন সেই প্রতীক্ষার অগ্ন্যুৎপাত নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই এক মহাপুরুষ ভগবানের তেজঃকণা অন্তরে ধারণ করিয়া পরিধির সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, দেশ কাল ও অবস্থার সহিত নবতর সামঞ্জস্যের উপর নূতন পরিধি রচনা করিয়া জনসাধারণকে এক নবতর চলাচলের পথ প্রদর্শন করেন ; ইহাই হইল ধর্ম্মসংস্কারকের কার্য্য।

৩। ধর্ম্মসংস্থাপন কাহাকে বলে ?

ধর্ম্মসংস্কারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই ধর্ম্মসংস্থাপনাও স্বভাবতই আসিয়া পড়ে, মূলত ধর্ম্মের কেন্দ্র অবিচলিত থাকিলেও ঐ পরিধিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দৃষ্টিও ধর্ম্মকেন্দ্র হইতে অনেকটা নড়চড় হইয়া যায়—দূরে সরিয়া যায়। তখন লোকদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের জ্ঞান ভিত্তি হইতে নড়চড় হইয়া বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে ; ধর্ম্মবুদ্ধির অভাবে লোকেরা বিপথে কুপথে চলিতে থাকে। তখনই অধর্ম্ম সদর্প পদক্ষেপে ধরাতলে বিচরণ করিতে থাকে। এইরূপ অবস্থাকেই সাধারণত ধর্ম্মের গ্লানি বলা যায়। এইরূপ ধর্ম্মের গ্লানির অবস্থায় লোকদৃষ্টিতে যখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে অভিভূত করিতে উদ্যত দেখা যায়, তখনই ধর্ম্মসংস্কারক এক মহাপুরুষ ধর্ম্মসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের অন্তরে তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি নবতর আকারে প্রকারে জাগ্রত করিয়া তুলিয়া ধর্ম্মকেন্দ্রের অভিমুখে ফিরাইয়া আনে। তখন জনসাধারণের ধর্ম্মবুদ্ধির সূত্রে অবলম্বিত হইয়া নবসংরচিত পরিধি ধর্ম্মকেন্দ্রের উপর দৃঢ়তররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকেই সাধারণত ধর্ম্মসংস্থাপনা বলা যায়।

৪। শ্রীকৃষ্ণ কি ছিলেন ?

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংহারক ছিলেন, অথবা ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্থাপক ছিলেন, ইহা বুঝিবার জন্য আমরা সমগ্র মহাভারত আলোড়ন করিতে ইচ্ছা করি না। যে ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বলিয়া প্রখ্যাত আছে, আমরা তাহারই ভিতর হইতে দেখিবার চেষ্টা করিব যে, শ্রীকৃষ্ণ কি ছিলেন। ঐ যে গীতার সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকে "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই দুইটী চরণ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা হইতেই আমরা বলের সহিত তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্থাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। এখানে তিনি ভগবানের সহিত একাত্মযোগে যুক্ত হইয়া বলিতেছেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত

আমি যুগে যুগে সম্ভূত হই, অর্থাৎ আমার ভিতর দিয়া যা প্রয়োজন হইলেই আমার ন্যায় ভগবানের সহিত একাত্মযোগে যুক্ত মানুষের আত্মার ভিতর দিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। বর্ত্তমান যুগে রাজা রামমোহন রায় যে প্রকার ধর্ম্মসংহার কার্য্যে আপনাকে ব্যাপৃত না করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে ও ধর্ম্মসংস্থাপনে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ ধর্ম্মসংহারকার্য্যে এতটুকু প্রবৃত্ত না হইয়া ধর্ম্মসংস্কারমূলক ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

৫। শ্রীকৃষ্ণের সমসময়ে।

শ্রীকৃষ্ণের সমসময়ে সমাজে ধর্ম্মবিষয়ক কিরূপ অবস্থা ছিল, ভগবদগীতা হইতেই আমরা তাহার ন্যূনাধিক আভাস পাইতে পারি। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব কালে যেরূপ শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে চলিতেছিল, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালেও "সাংখ্য"বাদী ও "যোগ"বাদী এবং অন্যান্য শতবিধ বিভিন্ন মতবাদীদিগের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ববিবাদ খুবই প্রবলভাবে চলিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মহাভারতে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টাতেও এইরূপ দ্বন্দ্ব বিবাদের অস্তিত্ব সম্যক প্রকাশ পায়। কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ হইতে অনুমিত হয় যুদ্ধের প্রারম্ভে ঐ যে অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিতে উদ্যত হইলেন, উহা অজ্ঞানমূলক অতিরিক্ত মায়ার ফলে ভাগ্যের উপর নিতান্ত নির্ভর করার পরিচয় মাত্র। মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের সময়ে একদিকে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের বিরোধের ফলে, অপরদিকে কর্ম্মবাদকে আঁকড়াইয়া ধরিবার ফলে, কেবল ভারতবর্ষ নহে, কিন্তু তৎকালীন সমস্ত সভ্য জগত জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকল যুগের ধর্ম্মসংস্থাপকগণ যেরূপ উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃত সত্যধর্ম্মই সর্ব্ববিধ বিরোধ এবং অযথা নিষ্কর্ম্মিত্ব দূর করিবার শ্রেষ্ঠতম উপায়, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত সত্যধর্ম্ম সংস্থাপনের দ্বারাই অযথা তর্কবহুল ধর্ম্মবিরোধের এবং নিছক তথাকথিত জ্ঞানমূলক কর্ম্মবাদের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান নিষ্কর্ম্মত্বের মূলচ্ছেদ সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ উহা বুঝিয়াই অর্জ্জুনের সহিত কথোপকথনচ্ছলে সত্যধর্ম্ম সংস্থাপনে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৬। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংহারক ছিলেন না।

অনেকেই মনে করেন এবং গীতা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটী বিখণ্ডিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তদানীন্তন প্রচলিত ধর্ম্মমতসমূহের বিরোধী ছিলেন। ইহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। আমরা সমস্ত গীতা অনুসন্ধান করিয়া কোনও স্থানে কোনও ধর্ম্মমতের সহিত বিরোধের আভাস তাঁহার উক্তিতে দেখিতে পাই নাই। প্রকৃত বিরোধ থাকিলে বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি যে প্রকার কঠিন মুষলাঘাত দেওয়া সম্ভব মনে করা যাইতে পারে, আমরা ভগবদ্গীতা তন্ন তন্ন করিয়া সেই প্রকার আঘাতের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। তিনি গীতার কুত্রাপি ধর্ম্মসংহারকের ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। বিরুদ্ধ মতবাদ সম্বন্ধে তিনি যেখানে যখনই কোন কথা বলিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মসংহারকের উপযুক্ত কঠোর কটুক্তি সহকারে নহে, কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্থাপকের উপযুক্ত ভাষায় সেই সকলের অসারাংশ ঝাড়িয়া ফেলিয়া এবং তাহাদের সার সত্য বাহির করিয়া তাহাদিগকে নিজ মতসমর্থনে দাঁড় করাইয়াছেন।

৭। শ্রীকৃষ্ণ ও বেদবাদ।

আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সময়ে তাঁহার বিরোধী কয়েকটী প্রচলিত মতবাদের এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত আলোচনা করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

সর্ব্বপ্রথমেই দেখি, তিনি বেদবাদের বিরুদ্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই "বেদবাদ" যে কি, তাহা গীতায় পরিস্ফুটভাবে বলা হয় নাই। পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিলে মনে হয়, বেদের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তিবাদ অর্থেই বেদবাদ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এখনও যেমন, অনুমান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের সময়েও এমন এক সম্প্রদায় ছিলেন, যাঁহারা বেদের অন্তর্নিগূঢ় জ্ঞানগম্য সত্যকে (spirit) ছাড়িয়া দিয়া তাহার শব্দরাশিরই (letters) মাহাত্ম্য অধিকতর মানিতেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সময়েই বলি কেন, উপনিষদের সময়েও অনুমান হয়, এই ভাবের এক সম্প্রদায়ের লোক বিদ্যমান ছিলেন। এ প্রকার অতিরিক্ত বেদবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াই উপনিষদের এক ঋষি সতেজে বলিয়া উঠিলেন—"ঋক বেদই বল, যজুর্ব্বেদই বল, আর সামবেদ বা অথর্ব্ববেদই বল, এ সমস্তই কিছুই কিছু নয়; ইহাদের অন্তর্নিগূঢ় যে ব্রহ্মবিদ্যা, তাহাই সকলের সার এবং তাহাই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ"—অপরা ঋগ্বেদো-যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ • • • অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ শ্রীকৃষ্ণও বেদের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত ছিলেন—তিনি আপনাকে "বেদবিৎ" বলিয়া উল্লেখও করিয়াছেন। বেদসম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া

তিনি পূর্ব্বোক্ত ঋষিবাণী অনুসরণ করিয়া বলের সহিত বলিলেন যে, 'বেদবাদীগণ বানাইয়া ফেনাইয়া (পুষ্পিত) বেদ সম্বন্ধে নানা কথা বলেন; বেদসকল ত্রৈগুণ্যের সীমা দ্বারা আবদ্ধ; ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে ত্রৈগুণ্যের সুতরাং বেদবাদের অতীত হইতে হইবে। চারিদিক জলে ভরিয়া গেলে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে বেদসকল কোনই প্রয়োজনে আসে না; অর্থাৎ বেদবাক্য অক্ষরস (litarally) অনুসরণ করিয়া বেদবাদী হইবার পরিবর্ত্তে বেদের অন্তর্নিগূঢ় সত্য (spirit) যে ব্রহ্মজ্ঞান; তাহাই মানবের অবলম্বনীয়—

যবানার্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

যে কয়েকটী শ্লোকে বেদবাদের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ধর্ম্মসংহারকের উপযুক্ত বেদের প্রতি অথবা বেদবাদীদিগের প্রতি আন্তরিক ঘৃণার ভাব কোথাও প্রকাশ পায় নাই। ঐ সকল শ্লোকে সংক্ষেপে বেদবাদীদিগের ভ্রান্তি এবং বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার চেষ্টার সার্থকতা বুঝাইবার প্রয়াস প্রকাশ পাইয়াছে।

সেইরূপ "সাংখ্য" "যোগ" প্রভৃতি মতবাদসমূহের তদানীন্তন প্রচলিত অর্থের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া এবং সেই সকলের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়া স্বমতসমর্থনে প্রয়োগ করিয়াছেন। দু'এক স্থলে তিনি বিরুদ্ধমতবাদী-দিগের প্রতি মৃদু উপহাস প্রয়োগ করিলেও তাঁহার সমগ্র উক্তি কোথাও কোনও মতবাদীর প্রাণে আঘাত দিবার মত একটী কথাও প্রয়োগ করেন নাই। বেদবাদীদিগের বাক্যকে "পুষ্পিত" বাক্য বলিয়া এবং "সাংখ্য" ও "যোগের" পার্থক্যবাদীদিগকে "বালক" বা অজ্ঞানী বলিয়াই তাঁহার উপহাস শেষ করিয়াছেন "সাংখ্য—যোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ"।

৮। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ ধর্ম্মের সংস্থাপক।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্কারে অবতীর্ণ হইয়া কোন্ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উপরে বিস্তর বাদানুবাদ চলে এবং চলাও আশ্চর্য্য নহে। তিনি যে ধর্ম্মই কেন সংস্থাপন করুন না, সেই ধর্ম্মের মূলকেন্দ্র যে ব্রহ্মলাভ, সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক "গুহ্যতম" জ্ঞানের প্রচারই যে তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না, এবং করিতে পারেনও না। তিনি সমন্বয়সাধনের (synthesis) দ্বারা বেদবাদীদিগের মতবাদ এবং "সাংখ্য" "যোগ" প্রভৃতি তদানীন্তন প্রচলিত মতবাদ-সমূহের নিরসন করিয়া ঐ সকল মতবাদের ভিতর দিয়াই নিজের একটী স্বতন্ত্র মত অনায়াসেই দাঁড় করাইলেন। সেই ধর্ম্মমত হইতেছে—ব্রহ্মের সহিত একাত্মযোগে যুক্ত হইয়া এবং সংসারের ছোটবড় সকল কার্য্যই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম হৃদয়ে সেই সকলের অনুষ্ঠান করা; এক কথায়, ব্রহ্মকেন্দ্রক নিষ্কাম কর্ম্মসাধনরূপ যোগই হইল শ্রীকৃষ্ণের নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মেরই প্রতিধ্বনি আমরা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পাই—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

৯। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম স্বাধীনতার উৎস।

অধুনাতনকালে নানাবিধভাবে সমগ্র গীতার তাৎপর্য্যের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় গীতাকে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতের সমর্থনে নিয়োগ করিতে উদ্যত হন। ইহারই ফলে গীতায় অনেকে সাম্প্রদায়িকতামূলক পরাধীনতার ছাপ দেখিতে পান। কিন্তু আমাদের মতে সমগ্র গীতার কেন্দ্র স্বাধীনতার উৎস একমাত্র পরব্রহ্ম, এবং ইহা প্রচারের বিষয়,--সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার অনন্য উপায় অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদ; এক কথায়, সমগ্র গীতার প্রাণ হইল, মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া যুদ্ধকালীন গীতোক্ত উপদেশের ভিতর দিয়া স্বাধীনভাবে সাধ্য মুক্তিপ্রদ অধ্যাত্মতত্ত্ব নির্ব্বিচারে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন। "সাংখ্য" "যোগ" প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তৎকালীন পণ্ডিতমাত্রবোধ্য দার্শনিক তত্ত্বসমূহ জনসাধারণের অন্তরে দুর্ব্বোধ্যতাজনিত পরাধীনতার পাষাণ-ভার চাপাইয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল তত্ত্বের সরল ও সহজ এবং প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাভাবিক মর্ম্ম প্রচার করিয়া জনসাধারণকে মানস পরাধীনতা হইতে মুক্তি দান করিলেন। অনুমান হয়, বেদনামের প্রতি অযথা ভক্তির কারণে সে সময়ে আহারবিহার সম্বন্ধেও ব্রাহ্মণ ও স্মৃত্যুক্ত বিধিনিষেধের শতবিধ নাগপাশ জনসাধারণকে পিষিয়া মারিতেছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ শারীর আহারবিহার সম্বন্ধেও জনসাধারণকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া এই ভাবের বাণী ঘোষণা করিলেন যে, যে প্রকার আহার এবং যেভাবে পৃথিবীতে বিচরণ সত্ত্বগুণের উদ্রেক অর্থাৎ মানবের দেহ মন ও আত্মার উন্নতি ও কল্যাণসাধক, সেই প্রকার আহার ও সেইভাবে বিচরণই শ্রেয়স্কর। মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার সুতরাং সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণের বাণী গীতার আদ্যন্তমধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বলিয়া গীতোক্তমূলধর্ম্ম দেশ কাল ও অবস্থানির্ব্বিশেষে সকল মানবেরই অন্তরে ধারণ

করিবার উপযোগী। বর্ত্তমানে দেশের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টার সময়ে দেশবাসীগণ যদি গীতার ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত ধর্ম্মের প্রকৃততত্ব প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করেন, এবং উপলব্ধি করিয়া কায়মনোবাক্যে উহা পালন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে বলা বাহুল্য, সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল এবং তাহারই ফলস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অচিরে দেশবাসীর অধিগত হইবে—সর্ব্ববিধ পরাধীনতার শৃঙ্খলও ঝনুঝন্ করিয়া খসিয়া পড়িবে। তখন ভারতমাতার মুখশ্রী নবতর ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

১০। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের প্রণালী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত তদানীন্তন প্রচলিত কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত বা দার্শনিক বা অন্যবিধ মতবাদের প্রতি এতটুকু উপেক্ষা বা অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করেন নাই। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখি যে, মৃচ্ছিলাদির পূজকদিগের প্রতি অতীব কঠোর অবজ্ঞাসূচক "গোখর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিসমূহের মধ্যে কঠোর অবজ্ঞাসূচক গ্লানিকর এরূপ একটীও বাক্য আমরা খুঁজিয়া পাই না। তিনি তদানীন্তন প্রচলিত প্রধান প্রধান মতসমূহের মধ্যে ব্রহ্মকেন্দ্রক এক আশ্চর্য্য সমন্বয়সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার সে চেষ্টা নিতান্ত বিফল হয় নাই। তিনি বিভিন্ন মতবাদীদিগের কূটতর্কজাল পরিহার করিয়া সকল মতকে স্বাভাবিকভাবের উপর দাড় করাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং তাহারই ভিত্তিতে ঐ সকল মতের নবতর ব্যাখ্যা করিয়া তাহারই সাহায্যে নিজের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে জনসাধারণের হৃদয়ে অটল আসন প্রদানে সক্ষম হইলেন। এই ব্যাখ্যাকার্য্যে তিনি ঐ সকল মতবাদের ব্যবহৃত মূল শব্দসমূহের তৎকালে সর্ব্বজনগৃহীত (accepted) অর্থ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া স্বকৃত অর্থ স্বাভাবিকতার ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এমন বলের সহিত বলিয়া গেলেন যে, জনসাধারণ তাহার বিরুদ্ধে দ্বিরুক্তি করিতে না পারিয়া এই নবতর অর্থই সাদরে গ্রহণ করিল; পূর্ব্বগৃহীত অর্থসকল জনসাধারণের হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দর্শনশাস্ত্রের পুঁথিসমূহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া গেল।

১১। শ্রীকৃষ্ণ আর্য্য বা অনার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বলিয়া উক্ত ভগবদ্গীতায় তদানীন্তন প্রচলিত বেদবাদ এবং বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে মত সন্নিবেশিত হওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক একেশ্বরবাদ সুদৃঢ়রূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় কোন কোন সুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকে অনার্য্য বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের সন্দেহের আরও একটী কারণ এই, শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা বোধ হয় এই যে, নিছক একেশ্বরবাদ ভারতের নিজস্ব নহে, উহা উত্তর এসিয়াখণ্ড হইতে আমদানী করা বস্তু; এবং আর্য্যমাত্রই শ্বেতবর্ণ—কৃষ্ণবর্ণ হইলেই তাহাকে অনার্য্য হইতে হইবে, ইহা যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আমাদের নিকট ইহা নিতান্তই যুক্তিহীন বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিছক একেশ্বরবাদ যে উপনিষদ হইতে গৃহীত, যে উপনিষদের কয়েকটী মন্ত্র পরিবর্ত্তন সহকারে গৃহীত হইয়া গীতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই উপনিষদসমূহও তাহা হইলে ভারতের নিজস্ব বলা চলে না—ভারতের বাহির হইতে প্রাপ্ত বলিতে হয়। বলিতে হয় যে ভারতের ঋষিরা দলে দলে এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গিয়া একেশ্বরবাদ শিক্ষা করিয়া এদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইরূপ কোন প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই; বরঞ্চ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, সে দেশের লোক, এমন কি, যীশুখৃষ্ট এসিয়ার উত্তর-পশ্চিম হইতে এদেশে আসিয়া প্রকৃত একেশ্বরবাদ শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণবর্ণ হইলেই যে অনার্য্য হইতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই। আমার বেশ মনে পড়ে যে, Bridge watter Treatise গুলির একখণ্ডে রাজা রামমোহন রায়ের কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁহার আর্য্যসম্ভূতি একত্র উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে, রাজা রামমোহনের কৃষ্ণবর্ণ ও অনার্য্যত্বের মধ্যে কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই —কৃষ্ণ হইলেই যে মানুষকে অনার্য্য হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; বরঞ্চ অর্জ্জুনের মোহের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক "অনার্য্যজুষ্ট" শব্দের প্রয়োগ হইতেই আমাদের অনুমানের সুদৃঢ় সাক্ষ্য পাই যে, শ্রীকৃষ্ণ অনার্য্য ছিলেন না, আর্য্যই ছিলেন। তবে ইহা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার নবপ্রচারিত ধর্ম্মমত বিভিন্ন আর্য্যজাতির সঙ্গে ভারতে ও তাহার বাহিরে নানা অনার্য্য জাতি কর্ত্তৃকও সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কর্ম্মযোগের প্রতি হৃদয়ের সমধিক প্রবণতাও নাকি তাঁহার অনার্য্যত্বের পরিচায়ক! আমরা ইহা বাতুলের প্রলাপ উক্তি বলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি; ইহার বিপরীতে আমাদের এই অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, নিছক জ্ঞানবাদের উপর সংগঠিত সাংখ্যমতের ফলস্বরূপে প্রসূত নিষ্কর্ম্মত্ব, মরুভূমিবহুল ভারতের উত্তরাংশে অবস্থিত এসিয়াখণ্ডে একটু বিশেষ স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল।

১২। ভারতের বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচার।

আমাদের অনুমান হয়, গীতার ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের নিকট বিশেষভাবে ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই ভারতের বাহিরে উত্তর এশিয়া খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি যে বলিয়াছিলেন যে, 'আমি এই ধর্ম্ম বিবস্বানকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং বিবস্বান উহা মনুকে বলিয়াছেন এবং মনু উহা ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছেন'—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ৪.১.

ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ধর্ম্ম ভারতে প্রচার করিবার বহু পূর্ব্বেই সূর্য্যবংশীয় বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু এই প্রবল রাজত্রয়ের শাসিত যে সকল দেশে সূর্য্যোপাসনা বহুলরূপে প্রচারিত ছিল, সম্ভবতঃ যেগুলি তাৎকালিক পারসীক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই সকল দেশে বহুলরূপে প্রচার করিয়া তদ্দেশবাসীগণকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনুমান হয়, বিবস্বান্ একজন প্রবল রাজা ছিলেন এবং সূর্য্যবংশীয় হইবার কারণে তাঁহার রাজ্যে সূর্য্যোপাসনা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তাহা বংশানুক্রমে সংরক্ষিত হইয়াছিল। আমাদের আরও অনুমান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের একেশ্বরবাদ তথায় প্রচারিত হইলেও সূর্য্যোপাসনা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় নাই। এই কারণে ঐ সকল দেশে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক জয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রকার একেশ্বরবাদের সঙ্গে সূর্য্যোপাসনাও প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা নগরী সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে এই কার্য্য খুবই সহজ হইয়াছিল—তিনি সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া পারস্যের উপকূলে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবে না। আমাদের দেশের খ্যাতিকামী ও স্বমতের বহুল প্রচারকামী ব্যক্তিগণ আজকাল যে নীতি অনুসরণ করিয়া নিজেদের মতামত প্রথমে বিদেশকে শুনাইয়া পরে দেশে ঘুরাইয়া আনিয়া দেশবাসীকে শুনাইতে প্রবৃত্ত হন, সেই নীতির সূক্ষ্মমর্ম্ম অবগত হইয়া বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ধর্ম্মমত ভারতে প্রচার করিবার পূর্ব্বেই ভারতের বাহিরে বহু বিস্তৃতরূপে প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন। বিবস্বান আবার এক মনুকে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই মনু যে কে বা তাঁহার রাজ্য কোথায়,—আমরা এখনও তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। গীতার ভিতরেই মনু চারিজন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, আমাদের অনুমান হয় যে, বিবস্বানের রাজ্যের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান চীন মোগল প্রভৃতি দেশসকল মনুবংশীয়দিগের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মনুবংশীয় রাজগণ সম্ভবত সূর্য্যবংশেরই এক শাখার ছিলেন। আবার সূর্য্যবংশের অপর এক শাখার পূর্ব্ব পুরুষ ইক্ষ্বাকু কোন এক মনুর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যাই হোক, বিষয়টী এতই বিস্তৃত ও এতই গবেষণাসাপেক্ষ যে, আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা অসম্ভব বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। এই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণ যে বহুজন্ম অতীত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, সেই জন্ম-শব্দ বর্ত্তমান কালের সাধারণ প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এ বিষয়ও পরিষ্কার করিতে গেলে বহু গবেষণা ও আলোচনা আবশ্যক, যাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আমি ইঙ্গিত করিলাম মাত্র।

১৩। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচারে সহায় কাহারা?

শ্রীকৃষ্ণের সময়ে ভারতে যে সকল তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ সমুত্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চারিদিকে দৃষ্টিসম্পন্ন সুপণ্ডিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বিতীয় কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার দূরদর্শিতার ফলে তাঁহার নব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায়রূপে তিনি সুপণ্ডিত তদানীন্তন প্রচলিত সর্ব্ববিধ বিদ্যায় বিশেষত সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধকশ্রেষ্ঠ ও সংযমী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিনি ধীর, বিনয়নম্র, জ্ঞানবান পাণ্ডবগণকে এবং তন্মধ্যে বিশেষভাবে ধনঞ্জয় অর্জ্জুনকে তাঁহার একান্ত অনুগত ও ভক্ত সহায়রূপে লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার স্বপক্ষে তৎকালীন রাজন্যবর্গেরও অনেকে ছিলেন—যথা দ্রুপদ, সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা। ইহা ব্যতীত অনুমান হয় যে, ভারতের এবং তাহার বহিঃস্থিত আর্য্য ও অনার্য্য জাতিদিগেরও অনেকে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচালিত পাণ্ডবদিগের সপ্ত অক্ষৌহিণী বাহিনী পূর্ণ করিয়াছিল। তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন প্রধানত ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ পাণ্ডবদিগের জ্ঞাতিগোষ্ঠী দুর্য্যোধনাদি ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা এবং নানাসূত্রে তাঁহাদের অনুগত রাজেন্দ্রবর্গ যথা—দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ প্রভৃতি ইহা ব্যতীত অনুমান হয় যে, শতবিধ দেবতার এবং যক্ষরক্ষাদির ও ভূত-প্রেতাদির পূজনশীল এবং ভোগৈশ্বর্য্যের মোহমদে সমাচ্ছন্ন ভারতের

এবং তাঁহার বহিঃস্থিত অনেক আর্য্য ও অনার্য্য জাতি কৌরবদিগের একাদশ অক্ষৌহিনী বাহিনী পূর্ণ করিয়াছিল। দণ্ডায়মান সেনানীগণের মধ্যে ভীষ্ম প্রভৃতি উপরোক্ত স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সেনানীর তালিকার হইতে আমরা দেখি যে, তৎকালীন রাজন্যবর্গেরও অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অথচ আমরা দেখি পাণ্ডবদিগের অপেক্ষা কৌরবদিগের দলে সাধারণ সৈন্য বড় অল্প সংখ্যক নহে, কিন্তু চার অক্ষৌহিনী অধিক ছিল। এইজন্য আমাদের অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, বহু আড়ম্বরপূর্ণ যাগ যজ্ঞাদি এবং ভোগৈশ্বর্য্য যাহাদের অধিকতর প্রিয় ছিল, এইরূপ অনার্য্যপুষ্ট জনসাধারণের অধিকাংশ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মকথার প্রতি মনোযোগ না দিয়া, কৌরবগণের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। চার অক্ষৌহিনী সেনা অধিক থাকিলেও কৌরবদিগের পরাজয়ের কারণ কি? বোধ হয় যে, কৌরব সেনাদলের অনেকে, বিশেষত ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ তাঁহাদিগের নেতাগণের অধিকাংশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞানমূলক নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ভিত্তি খুবই গভীর ও সুদৃঢ়, এবং সেই কারণে তাঁহার জয়ও সুনিশ্চিত; অপর পক্ষে কৌরবদিগের অবলম্বিত তদানীন্তন প্রচলিত আড়ম্বর বহুল যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য সকল লোক সংগ্রহেরই উপায় মাত্র, তাহাদের ভিত্তির বিশেষ গভীরতা বা দৃঢ়তা ছিল না। এই কারণে তাঁহারা অন্তরে অন্তরে কৌরবদিগের পরাজয় এক-প্রকার নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণাদির অনেক উক্তি ও কার্য্য, বিশেষত পুত্রস্নেহে মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রেরও উক্তি হইতে আমাদের অনুমান অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কৌরব-নেতাগণ তাঁহাদের জয় সম্বন্ধে যে সংশয় দোলায় দোদুল্যমান হইতেছিলেন, সূক্ষ্মদর্শী শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিকে নিশ্চয়ই তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই, এই সংশয়ের ফলেই কৌরবগণের যে পরাজয় হইবে, মনে হয়, ইহারই ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" সংশয়ে যাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত সে নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

১৪। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ মূলত ধর্ম্মসংঘটিত।

কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়াছিল আমাদের অনুমান হয় তাহা মূলতঃ রাষ্ট্রনৈতিক নহে,—কিন্তু ধর্ম্মমূলক। যেমন বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ বস্তুত রাষ্ট্রনৈতিক নহে বা অষ্ট্রীয়ার যুবরাজের হত্যা মূলকও নহে—ঐ হত্যা একটা উপলক্ষ মাত্র—কিন্তু পৃথিবীর বাণিজ্যের উপর হস্ত বিস্তারের অধিকার লইয়া, সেইরূপ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধেরও মূলে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচার ও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সেই মতাবলম্বন। যদি এই যুদ্ধ প্রকৃতই রাষ্ট্রনৈতিক হইত, তবে যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে কৌরব-গণের নিকট পাঁচখানি গ্রাম পাইলেই রাজসিংহাসনের উপর পাণ্ডব গণের সমস্ত স্বামীত্ব ত্যাগ করিবার প্রস্তাব উপস্থিতই হইতে পারিত না। এই যুদ্ধ যে ধর্ম্মসংঘটিত তাহা শ্রীকৃষ্ণের "ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং" (গীতা ২য়, ৩৩) এই উক্তি হইতেই আমরা তাহার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই। এই যুদ্ধ ধর্ম্ম সংঘটিত না হইলে সমগ্র গীতা ধর্ম্মের উপদেশেই পূর্ণ দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ। এই যুদ্ধ প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক বলিয়াই আসন্ন যুদ্ধের বিপদ-সঙ্কুল মুহূর্ত্তেও অর্জ্জুনের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত ধর্ম্মবিষয়ে সংশয়মূলক প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমাধান পূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট স্বমতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে এবং তাঁহার হৃদয় হইতে সংশয় কণ্টক উৎপাটনে যত্নবান হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই ধর্ম্মসংঘটিত যুদ্ধের পরিণতিতে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক আকার ধারণ করিয়াছিল।

মাঝিদের গান।

গুরু বস্তু চিনে নে না।
(ও ভবে) অপারের কাণ্ডারী গুরু—
ওগো তা বিনে কেউ কূল পাবে না।
হেলায় হেলায় দিন ফুরালো
মহাকালে ঘিরে নিলো
গুরু বস্তু চিনে নে না।
আর কবে কি করবি গো বল—
হেলায় হেলায় দিন ফুরালো
মহাকালে ঘিরে নিলো—
(তুই) আর কবে কি করবি গো বল—
ও তোর রঙ্গমহলে পড়ল হানা।
(চেয়ে দেখ) তোর রঙ্গমহলে পড়ল হানা॥
এ'লো বহিছে পবন
হতে পারে কিছু সাধন।
অতি বিনয় করে বলছে গোলালোন
জনম এবার গেলে আর হবে না
মানব জনম এবার গেলে আর হবে না।
হরির নাম ভজবি বলে
এ ভব সংসারে এলে
ঐ তুই কার মায়াতে রইলি ভুলে॥

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের সাধনা।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

ভক্তগণ যে ধর্ম্মের পুরস্কাররূপে ভগবানের নিকট হইতে সাংসারিক ধনমান সুখসৌভাগ্য লাভ করেন, একথা সত্য নয়; বরং অনেক স্থলে ইহার বিপরীত কথাই সত্য। কিন্তু তাঁহারা যে সাংসারিক দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা, এমনকি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিবার অতি আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কত লোক যে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া মহোল্লাসে ঈশ্বরের জয়গান করিয়াছেন; কত লোক যে ঘাতকের কৃপাণকে, সিংহব্যাঘ্রের কবলকে এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করিবে কে? একটীমাত্র মিথ্যা কথা বলিলে যখন ভীষণ যন্ত্রণাময় মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতেন, জীবন-মরণের সেই মহাসন্ধিক্ষণে যে তাঁহারা সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না, সে দুর্জ্জয় শক্তি তাঁহাদিগকে কে দিল? যে শোকের বেদনা কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব, এরূপ তীব্র শোকে ধর্ম্ম যে কত লোকের অন্তরে সান্ত্বনা দান করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কত মুমূর্ষুর প্রাণে যে অন্তিম মুহূর্ত্তে ধর্ম্ম আশা শান্তি ও বল সঞ্চার করিয়াছে, তাহা গণনা করিবে কাহার সাধ্য? মানুষ মানুষকে যতই ভালবাসুক, কিন্তু মানুষ ঈশ্বরপ্রেমে যেরূপ মুগ্ধ হয়, মানুষকে ভালবাসিয়া কখনও সেরূপ মুগ্ধ হয় না। কত লোক যে ঈশ্বরের সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য গৃহপরিবার আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্য ও নিস্তব্ধ গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করিবে কে? তবে কি বলিব না যে ঈশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হইবার জন্যই মনুষ্যহৃদয় গঠিত হইয়াছে? ভগবান ব্যতীত মানবপ্রাণের উচ্ছ্বসিত প্রীতিভক্তি আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি আর কোথাও সম্ভব নহে।

বর্ত্তমান কালে আমরা বাহির লইয়া থাকি। বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা আমরা দিন দিন জড় প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছি। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান যে সকল সুখস্বচ্ছন্দতা সৃষ্টি করিয়াছে, সে-কালে সে সকল কিছুই ছিল না; এই কথা স্মরণ করিয়া আমরা অহঙ্কারে স্ফীত হই এবং সে-কালকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখি। কিন্তু আপনার মনকে সংযত করা, আপনার ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা, ইলেক্ট্রীক লাইট, এরোপ্লেন ও রেডিও অপেক্ষা কি বড় কথা নয়? হৃদয়কে নীচ কামনা ও স্বার্থপরতা হইতে নির্ম্মল রাখা এবং নিষ্কাম প্রেমভক্তির সহিত ভগবানকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা জড়জগতের উপরে প্রভুত্ব-স্থাপন অপেক্ষা কি অনন্ত গুণে বড় কথা নয়? এই মহা সৌভাগ্য আমরা সকলেই লাভ করিতে পারি। যদি আমরা ইহাতে বঞ্চিত হই, তবে জীবনের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হই।

ভক্ত বিশ্বাসীগণের উপদেশ এই যে ধর্ম্মলাভ করা কাহারও পক্ষেই অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার জন্য সুদৃঢ় অধ্যবসায় বা সাধনার প্রয়োজন। মানুষের এই সাধনার উপরে আশীর্ব্বাদরূপে ভগবান চিরদিন তাঁহার কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া থাকেন। কখনও বা ইঙ্গিত ও অনুজ্ঞারূপে, কখনও বা উৎসাহ ও অনুপ্রাণনারূপে, কখনও বা অপরাধের জন্য ভর্ৎসনা ও ধিক্কাররূপে, কখনও বা পুণ্য ও পবিত্রতার জন্য অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষারূপে তিনি আমাদিগকে তাঁহার চরণে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক সে আহ্বান আমরা অবহেলা করি। আমরা প্রায় সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু এই বিশ্বাস নামে মাত্র বিশ্বাস। আমরা তাঁহার যে পূজা ও উপাসনা করি, তাহা অনেক স্থলেই নিয়মরক্ষা মাত্র বা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। আমরা কচিৎ কখন তাঁহার প্রতি একটু কৃতজ্ঞতা অনুভব করি, কিন্তু সে অনুভূতি কত ক্ষীণ! আমরা তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষী বলিয়া মতে মানি বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ মনে করি তিনি বহুদূরে। তাঁহাকে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা বলিয়া দেখি না। তাহা যদি দেখিতাম, জীবন পবিত্র সরস ও মধুময় হইত, পরোপকারের স্পৃহা অনন্ত গুণে বর্দ্ধিত হইত, হৃদয় আনন্দে শান্তিতে প্লাবিত হইয়া যাইত।

প্রশ্ন এই যে, ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার উপায় কি? উত্তরে ভক্ত বিশ্বাসীগণ বলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানকে সমুজ্জ্বল করা আবশ্যক এবং সেজন্য গভীর এবং অবিশ্রান্ত চিন্তার প্রয়োজন। যেমন পরের চক্ষুর দ্বারা দেখা হয় না, সেইরূপ পরের ধ্যানলব্ধ সত্য শুনিয়া ধর্ম্ম হয় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে; কিন্তু এ বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। কারণ সকল শাস্ত্রের মূল্য সমান নহে। মহাপুরুষগণ ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ধর্ম্মলাভের জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের জীবনের মহাভাব—এই তিনটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। তৃতীয় কথা এই যে বহির্জগতে ভগবানকে দর্শন করিতে হইবে, অন্তর্জগতে অর্থাৎ মানবপ্রকৃতিতে তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে, এবং আমাদের নিজ নিজ জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার বিশেষ কৃপা দর্শন করিতে হইবে। ভক্তগণ বলেন যে, প্রত্যেক সাধনার্থীর

প্রয়োজন অনুসারে তাহার মঙ্গলের জন্য ভগবান নানা ঘটনা নানা অবস্থার ভিতর দিয়া বিশেষ বিধান করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কোন অলৌকিক ব্যাপার থাকে না, অথচ এই সকল অবস্থা ও ঘটনার সহিত সাধনার্থীর ধর্ম্মজীবনের সম্বন্ধ অতীব নিগূঢ়।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেই সকল উপায়ের মধ্যে বুদ্ধির আলোকে ভগবান সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান উপার্জ্জন করা খুব বড় কথা নয়। এইটী বাস্তবিক সর্ব্বাপেক্ষা ছোট কথা। যাহা তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া বুঝিব, তাহা যদি পালন না করি, তবে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া কোন ফল নাই। শাস্ত্রপাঠের দ্বারা এবং পণ্ডিত লোকদিগের সহিত বাস করিয়া আমরা বিশুদ্ধ মত শিক্ষা করিতে পারি; কিন্তু বিশুদ্ধ মত ও ধর্ম্মজীবন এক বস্তু নহে। এ দুটীতে বিস্তর প্রভেদ। মত কেবল কথামাত্র। মতকে জ্ঞান বলাই উচিত নহে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার পক্ষে সূর্য্যদর্শন যেমন অসম্ভব; যে ব্যক্তি লোভী স্বার্থপর ইন্দ্রিয়াসক্ত ও অলস, বিবেক যাহার দগ্ধ এবং হৃদয় যাহার কঠিন, তাহার পক্ষেও ঈশ্বরদর্শন সেইরূপ অসম্ভব। যে ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত এবং সংযতচিত্ত নহে, মানবের প্রতি যাহার প্রেম নাই ও বিবেকের অনুজ্ঞাকে যে তুচ্ছ করে—বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে তাহার একপদও ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইবার সাধ্য হইবে না। ভগবান যে পুণ্যময়, একথা আমরা শাস্ত্রে পাঠ করিতে পারি এবং লোকের মুখে শুনিতে পারি; কিন্তু যতদিন সকল প্রকার পাপ ও মলিনতা পরিহার করিতে আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রাণপণে চেষ্টা না করি, ততদিন ভগবান পুণ্যময় এ সত্যটী আমাদের কাছে নিতান্তই কথার কথা থাকে। সেইরূপ যতদিন আমরা লোভ ও স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করিয়া পরোপকারকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ না করি এবং জনসমাজের মঙ্গলসাধনে চেষ্টা না করি, ততদিন ভগবান যে মঙ্গলময়, এ সত্যটীর আভাস পর্য্যন্তও আমরা ধরিতে পারি না। যখন আমাদের আত্মা সত্যে এবং সাধুতাতে সমুন্নত হয়, তখন আমরা আত্মার শক্তি ও সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারি; তখন বুঝিতে পারি যে মানবাত্মা সৃষ্টির ভূষণ; তখন অনুভব করি যে সত্য সত্যই ইহা মৃত্যুহীন; নতুবা অনন্ত জীবন আমাদের কাছে শুধু একটা মত মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বুদ্ধির সহিত বিবেককে না মিলাইলে এবং জ্ঞানের সহিত নীতিকে না মিলাইলে কেবল পরের উপদেশে ব্রহ্মদর্শন হয় না।

তত্ত্ববিশ্বাসীগণের উপদেশ এই যে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হইবে। রিপুকুলের দাসত্ব হইতে এবং কু-অভ্যাসের শৃঙ্খল হইতে মুক্তির জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে। যাহাতে তাঁহার ইচ্ছার অনুগামী হইতে পারি এবং তাঁহাকে হৃদয়ে লাভ করিতে পারি, তাহার জন্য তাঁহার নিকটে বল ভিক্ষা করিতে হইবে। সে প্রার্থনা কখনও বিফল হইবে না। আকাশ হইতে একটী গূঢ় শক্তি আমাদের অন্তরে অবতীর্ণ হইবে। দেবনিঃশ্বাস লাভ করিয়া আত্মা উৎসাহে অগ্নিময় হইবে। দিন দিন ভগবানের সঙ্গে যোগ গভীর হইতে গভীরতর হইবে। পৃথিবীর জীবন ফুরাইলে পরলোকের অনন্ত পথে চলিতে চলিতে ভগবানকে আমরা কিরূপ উজ্জ্বলভাবে দর্শন করিব, তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। সে দর্শনের তুলনায় ইহজীবনের দর্শন অতি অস্পষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহজীবনেই তাঁহার দর্শন এত সরস ও মধুময় হইতে পারে যে, ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে সে সরসতা সে মধুরতা আমরা ভাবিতেও পারি না।

ভগবান স্বহস্তে মানবঅন্তরে ধর্ম্মের বীজ নিহিত করিয়াছেন। আমাদের বুদ্ধির সাহায্যে আমরা তাঁহার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ অবধারণ করিতে পারি, আমাদের হৃদয় দিয়া তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তি করিতে পারি, আমরা ইচ্ছা করিয়া তাঁহার বিধানকে মস্তকে বরণ করিতে পারি। আমাদের আত্মারূপ চক্ষুর দ্বারা আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। এ কি মহা গৌরবের অধিকার! এই অধিকার তুচ্ছ করিয়া আমরা সংসারের মোহে ডুবিয়া থাকি! এই আমরাই তাঁহার মন্দির হইতে পারি। এমন কি তাঁহার মহিমা ও তাঁহার আনন্দস্বরূপের কিঞ্চিৎ আস্বাদনও আমরা লাভ করিতে সমর্থ। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা ধ্যান ও চিন্তা দ্বারা এবং সুদৃঢ় আনুগত্য দ্বারা তাঁহার আলোক ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারি। ইহাই আমাদের পুণ্যময় স্বর্গীয় জীবনের আরম্ভ। সেই পরাৎপর পুরুষের সহিত যোগের যে মত্ততা ও বিহ্বলতা, মানুষের ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম।

THE

BRAHMA SAMAJ

UNDER

DEVENDRANATH THAKUR.

CHAPTER II.

(6)

69. D. N. Tagore's Missionary work.

Devendranath Thakur, ever since his embracing the Brahmic faith, has visited various parts of India, leaving out of account the innumerable places he vesited, in Bengal, preaching and proclaiming the Brahma religion among the people and establishing Samajes. He travelled to Lahore, Multan, and Amritsar, and officiated on more than one occasion as chief minister at the anniversary festivals of the Samaj at those places. He visited many parts of India for this holy purpose and preached his religion to the various races of Hindus, who acknowledge obedience to the Sanskrit and the Vernacular Scriptures, such as the Granths of Guru Nanak of the Panjab. Among other places he visited Bareilly in 1860. He received a regular ovation from the people of that place, both Hindu and Mussalman notables flocking to do him honor and hear his discourse.

70. Lala Hazarilal the first missionary 1765 *Saka*.

As the Mofussil Samajes began to increase, it was found that they required ministers and missionaries. The most competent students, who had been trained up in the Vedic school of the *Tattwabodhini Sabha* in Calcutta, were chosen for the post of minister. The first Brahma missionary on record was Lala Hazarilal, an upcountry Kayastha, and a native of Indore. He was appointed a missionary soon after the institution of the Brahma covenant in 1765 Saka. He was known to be an able and indefatigable preacher, going from house to house with the Brahma covenant in his hand, discussing with all parties on the absurdities of their popular faith, creed, customs and usages, and communicating to them the sacred truths of their original Sastras, the Vedas and Vedantas.

71. Divine Love introduced in discourse by Rajnarain Bose.

It was at this time that the doctrine of *Divine Love* was first preached as an essential element of the *Brahma* religion in sermons delivered by Rajnarain Bose before the *Adi Brahma Samaj*. The discourses of the *Samaj* used hitherto chiefly to dwell upon the power, wisdom, and goodness of the Deity, as exhibited in his works. They did not treat of His love, which wins our hearts to a warm adoration of the Altogether Beautiful. The doctrine of *Divine Love* is inculcated in the Vedanta in the clearest language, "*Raso vai sah,*" "He is all Love;" "*Atmana meva priya mupasita,*" "God should be worshipped with love." The song of songs of the wisest of men is replete with sentiments of love to the "*Best Beloved.*" The highest phase which religion can attain is deep and fervent love of God, but it should not certainly culminate in actual frenzy or madness like that of the Howling Derveshes of Constantinople.

72. The Brahmo Dharma and its contents.

Now that the Samaj had taken a firm hold of the minds of the people, and had gradually extended itself over a good portion of the country, the want of a text-book was much felt by the people of the Mofussil, who had no means of ascertaining all the articles and principles of the Brahma creed, and the modes of its worship. This was undertaken at the suggestion of Rajnarain Bose, made by him immediately after his conversion to Brahmaism in 1846, in a letter addressed to Devendranath Thakur on the subject, and the book, the *Brahma Dharma*, after two years of labour and research, was finished by Devendranath Thakur. It contains the Vedic and other scriptural texts with their Bengali translation, on the existence and attributes of the One True and Living God of the World, and the best and the most rational mode of His adoration. Long analyses of this compilation are given in the extant histories of the church, but I will simply give the substance, for the information of those who are unacquainted with the original. It embodies the Brahmic covenant spoken

of above, with the *Dharma Vija* setting forth the principles of Brahmic faith, and the Brahmic form of divine worship as observed in the Samaj. The first part of the Grantha contains texts from the Upanishads about the existence and attributes of God, and the duty of contemplating and worshiping Him. The second part consists of moral precepts from Menu, Yajnyavalkya, Mahabharata, Maha Nirvana Tantra, and other Hindu Sastras. Both parts are accompanied by a Bengali translation, with an ample commentary and exposition in that language. Devendranath Thakur wrote the exposition of the first part, jointly with Akkhaya Kumar Datt and Rajnarain Bose. The exposition of the second part was written long after by Pandit Ayodhyanatha Pakrasi, a minister of the *Samaj*.*

73. Renunciation of Vedantism and the Infallibility of the Vedas and the Establishment of Pure Theism.

From the publcation of the *Brahma Dharma Grantha* may be reckoned the date of the public renunciation of Vedantism. The principal cause which led to this important step was, the detection of errors and contradictions in the Vedas, which had been hitherto regarded as the revealed word of God. There were conflicts of opinion between Devendranath Thakur and Akshaya Kumar Datt, on the question of Vedic infallibilty, the latter being against the doctrine of such infallibility. Finally truth triumphed. The *Brahma Samaj* abjured the said doctrine and ceased to be a Vedantic Church, although the Brahmas still believe that the truths contained in the Vedas most of which have been brought together in the *Brahma Dharma Grantha* were the results of the inspiration (the word is here used in no miraculous sense) of the Rishis who composed the Vedas. The Vedantic element of Sankara was eliminated from the Brahmic covenant, and the fundamental principles of Theism substituted for it.

74. Brahmo Dharma Bijam.

Four articles of faith entitled Brahma Dharma Vija were drawn up by Devendranath to which future candidates for admission into the *Brahma Samaj* were required to subscribe. Thus Vedantic unitarianism was superseded by Natural Theism and the *Brahma Samaj* became a Theistic Church and the *Brahma Dharma Grantha*, inculcating pure theism only, was proclaimed by the *Brahma Samaj* to contain a complete exposition of the principles of their religious belief. The Vija of the Brahmas, which answers to the Creed of the Christians and the Kulma of the Mahomedans, is composed of the following four articles of belief :—

1. One only God before this was, and nothing else was co-existent with him. He has created whatever there exists.

2. He is eternal, intelligence itself, infinite, all-good, all-apart, without parts, one without a second, all-pervading, governing and supporting everything, omniscient, omnipotent, perfect, immutable, without a likeness.

3. His worship alone ensures all present and future bliss.

4. Love of Him and doing the works he loves, is his worship.

This last article is at once a definition of the best mode of adoration, and an excellent precept for our guidance in leading a religious life. It is, says Rajnarain Bose, superior to the precept of the Bible : "Love thy neighbour as thyself," where self is taken for the standard of our

---

What the *Indian Mirror* says ?

* The *Indian Mirror*, in its issue of the 21st April 1878, speaking of the *Brahmo Dharma Grantha* shays : "It represents the deepest thoughts of a very deep and singular man, the like of whom is not easily met with in this or in any other counory." "It contains his mature reflections on the chosen passages of the Upanishads, the early source of his wonderfull conversion, and still the fresh and full fountain from which his grand spirit drinks truth, inspiration, joy and sanctity, reflects all the light, all the wisdom, which his trained and experienced mind can throw upon them, sets forth short and effective Sermons on all manner of devotional specu tation and practical subjects, which those texts suggest. It opens out a large area of critical and scriptural thought very attractive to the devout and meditative students."

action towards others, and not the disinterested standard of the will of God.

75. First public declaration of Theism —1772 *Saka* (1850 A.D.)

The first public declaration of pure theistic faith was made by Akkhaya Kumar Datt, in an anniversary discourse delivered by him at the Samaj in 1772 Saka (1850 A. D.), wherein he asserts, that the revelation of Nature is the only revelation which the Brahmo can believe, and that, that was the only standard of the faith of Ram Mohun Roy, whom he highly eulogised in that discourse.

76. Characteristics of Brahmoism as enunciated by Rajnarain Bose— 1775 *Saka* (1853-A. D.)

Shortly after the Samaj had publicly renounced the doctrine of Vedic infallibility, Rajnarain Bose, in a sermon delivered in Saka 1775 (1853 A.D.), described the principal characteristics of Brahmaism to be—

1. It admits people of all nations and castes within its folds.
2. There are no fixed and superstitious rules about time and place for Divine worship in this religion.
3. There are no written Scriptures in this religion.
4. There are no hard penances and austerities in this religion. Abstinence from vice is the only austerity.
5. This religion does not say that a man should forsake his family and retire to a forest for the purpose of worshiping God.
6. There are no external rites and ceremonies in this religion.
7. There are no places of pilgrimage in it. The pure heart is the best place of pilgrimage.
8. The only expiation for sin in this religion is heartfelt and sincere repentance and abstinence in future from vice.

77. The T. Patrika's motto changed.

More attention now began to be given to the instruction of youths in the *Brahkma Dharma Grantha* as used formerly to be bestowed on instruction in the Vedas. The motto of the *Tattwabodhini Patrika* was also changed for the celebrated sentence in the Mundaka Upanishad, "The inferior knowledge is the Vedas and the Vedangas, and the superior knowledge is that by which the Undecaying God is known." This is explained as meaning that Divine knowledge is independent of the Scriptures and is to be obtained only from the intuitions of the human soul and the contemplation of external nature.

78. *Nova oryana.*

These three improvements, that is, regular Divine worship, Brahmic Covenant, and *Brahma Dharma Grantha*, emanating from Devendranath were reckoned as the *nova organa* of Brahmaism, and supplied the desiderata left unsupplied by the untimely death of Ram Mohun Roy.

79. Theory of intuition in the Brahmo Somaj.

Shortly after this the theory of intuition was broached in an article headed "Dharma Tatwa Viveka," published in the *Patrika*. It emanated from the pen of Akkhaya Kumar Datt, who derived his first idea on the subject from the Mundak Upanishad which says: "Ekayatmapratyasaram"—the best proof of God's existence is "intuition," and derived much aid in developing it from European works on the philosophy of religion.

This theory has been still more developed by Rajnarain Bose in his treatise named the "Dharma Tatwa Dipika," or the Lamp of Religious Knowledge, being a large work on theism, both doctrinal and practical. It treats of the philosophy of religion in the first few chapters. This book has already become a standard work among the Brahmas. Henceforth Brahmaism was regarded not only as Natural Religion based on conclusions drawn by reasoning from the facts and phenomena of Nature, which, although not perfectly satisfactory, are good so far as they go, but a faith founded on the sure basis of intuitive truths deeply engraven on the minds of man, and which he cannot ignore without ignoring his own existence.

Though intuition and its evidence are denied by many modern metaphysicians, Locke, who acknowledges no innate principle whatever, maintained however the intuitive knowledge of Divine existence in his arguments on the subject. According to some philosophers, the knowledge of God is supposed to be one of those primary notions and common beliefs which form the element of original knowledge prior to all reasoning.

80. Devendranath retired to Himalayas —1778 *Saka* (1856 A.D.)

In 1778 Saka (1856 A. D.), Devendranath Thakur retired to the Himalayas for the sake of solitary contemplation, of which, as remarked before, he was excessively fond. There he read the works of Fichte, Kant, and Cousin, with great attention, and, as a friend informed us, also studied the mystic lyrics of Hafiz in order to acquaint himself with the nature of Sufi poetry and religion. He returned to Calcutta after the Sepoy rebellion was quelled.

81. His celebrated "Byakhyans."

As fruits of his meditation during his Himalayan retirement, we have his celebrated Vyakhyanas or Sermons, which are universally praised by all Brahmas.

82. Devendranath Thakur and Ramaprasad Ray appointed trustees at a meeting.

During his absence in the Himalayas, a business meeting of the Samaj was held presided over by Ramanath Thakur, afterwards Maharaja, at which it was resolved that Rama Prasad Roy and Devendranath Thakur be appointed trustees of the *Samaj* from that day, in the place of Radha Prasad Roy and Vaikantha Nath Roy Chaudhuri, deceased.

83. Widow Marriage and T. Patrika.

At this time the *Tattwabodhini Patrika* was taking an active part in advocating widow marriage, a question which was agitated in a pamphlet by Pandit Iswara Chandra vidyasagar. An Act of Government was passed legalizing the marriage, and Rajnarain Bose, a member of the *Samaj*, was one of the first to introduce it into his own family.

84. Incorporation of T. Sava with the Brahmo Samaj 1781 *Saka* (1859 A. D.)

After the return of Devendranath Thakur from the the Himalayas, a meeting of Brahmas was held in 1781 Saka (1859 A.D.) at which it was resolved that two distinct societies, the *Tattwabodhini Sabha* and the *Brahma Samaj*, were unnecessary for the propagation of the Brahma religion, and that the *Tattwabodhini Sabha* be merged into the *Brahma Samaj*. This led to the final dissolution of the *Tattwabodhini Sabha* mentioned before and its incorporation with the *Brahma Samaj*.

রাজা রামমোহন রায়ের সহজসাধন

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

পাখী জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লাভ করে বাধাবন্ধহীন সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ; সে কখনো প্রভাতসূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত নীল আকাশের নিম্নে বিচিত্র পাখা মেলিয়া ছুটে যায় দূর-দূরান্তরে বন-বনান্তরে ; বনের ফলে নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ সলিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করে দিন দিন পক্ষী-জীবনের আনন্দ-রসধারা পান করে কৃতকৃতার্থ হয়। কিন্তু যদি সে অসীমের যাত্রী পাখীকে সীমার পিঞ্জরে আবদ্ধ করে তার স্বাধীন গতিকে রুদ্ধ করা যায়, তবে সে হারিয়ে ফেলে জীবনের আনন্দ, থেমে যায় তার কণ্ঠের স্বাভাবিক কল-কাকলী। দিনে দিনে সে হয় অন্ধ নিয়মানুবর্ত্তিতার দাস। তখন সে শিখে মানুষের শেখান বুলি ; ক্রমে ক্রমে ভুলে যায় নিজের জন্মগত অধিকারের দাবী। বাহিরে অনন্ত নীল আকাশ তাকে ডাকে—আয় ; বন-বনানী তরুগুল্ম বনস্পতি শাখা-বাহু নেড়ে ডাকে—আয় ; মেঘের ফাঁকে সূর্য্যকিরণ ডাকে—আয় ; উষার লোহিত আভা পূর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করে ডাকে—আয় ; ফুল ডাকে আয় ; অপরাপর স্বচ্ছন্দবিহারী পাখী কল-ঝঙ্কারে ডাকে—আয়। কিন্তু সে তখন তাদের ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের ডাকে তার প্রাণে কোন বেদনার স্পন্দন জাগিয়ে তোলে না। যদি কখনো সে নিজের পূর্ব্বস্বরূপের স্মৃতি ফিরে পায়, তবে তখনই সে মুক্তির

উপায় খোঁজে, তখন সে জন্মগত অধিকার স্বচ্ছন্দ সহজ গতির দাবী স্বীকার ক'রে' মনে বেদনা অনুভব করে, হয় ত সে যোগ পেয়ে পিঞ্জর ছেড়ে মুক্ত নীলাকাশে অসীমের রাজ্যে উড়ে যায়; আর যদি তা না পারে, তবে দিন দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পলে পলে মৃত্যুর কবলে নিপতিত হয়।

মানবের জীবনও পাখীর জীবনের অনুরূপ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানবের জন্মগত ধর্ম্মপ্রবণতা জেগে ওঠে। কিন্তু যতই সংসারের আবিলতা কুটিলতা, হিংসা দ্বেষ ও পিশুনতা মানবকে আপনার বুকে টেনে নেয়, ততই ধর্ম্মবুদ্ধি মলিন হ'তে আরম্ভ করে; অবশেষে মানব নিজের জন্মগত অধিকার বিস্মৃতির অনন্ত অতলে নিক্ষেপ করে, সাংসারিক ভোগসুখে মত্ত হয়।

অমৃতের পুত্র মানব অমৃতময় ব্রহ্মলোক হতে ধরণীর মালিন্য-কালিমার অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করতে থাকে, ততই শাশ্বত সহজ ধর্ম্মপ্রবণতা ম্লান হয়ে আসে; স্বপ্নাত্মক জড়িমা জাগরণের মধ্যে দেখা দেয়, পৃথিবীর ক্ষুদ্র সুখদুঃখ মানবের হৃদয় অধিকার করে। তখন সে তার বিরাট দাবীর কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে। পেচক যেমন সূর্য্যকিরণ সহ্য করতে না পেরে দূরে বৃক্ষকোটরে লুক্কায়িত হয়ে দিনমান যাপন করতঃ নৈশ তিমিরের প্রাদুর্ভাবে জীবজগতে খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হয়, বিস্মৃতিপ্রভাবে লুপ্তদৃষ্টি মানবও অমৃতময় ব্রহ্মের নিকট থেকে দূরে সরে গিয়ে জাগতিক ভোগসুখে আমোদ অনুভব করে। ধাত্রীর স্তন্যপানরত শিশু ধাত্রীর স্নেহে বশীভূত হয়ে পিতামাতাকে অনেক সময় ভুলে যায়; শিশু জানে না ধাত্রী পিতামাতার বেতনভুক্ পরিচারিকা মাত্র,—তার আসল স্নেহের দাবী পিতামাতার শান্তি-সুখময় ক্রোড়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, ধাত্রীও শিশুকে পিতামাতার কথা ভুলিয়ে দিয়ে আপন করে নেবার চেষ্টা করে। মানবের অবস্থাও ঠিক তাই—ধরিত্রী-ধাত্রীর বুকে মানবশিশু সামাজিক ও জাগতিক ব্যসন-বিলাসের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে নিজের শাশ্বত অধিকারের দাবী পরিহার করে।

অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মকে প্রচ্ছন্ন করে, খণ্ডের গণ্ডী আমাদের চারিদিকে গড়ে ওঠে। গুটিপোকা যেমন স্বীয় মুখনিঃসৃত লালার সমবায়ে নিজে চতুর্দ্দিকে গণ্ডী রচনা ক'রে তার মাঝে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু জানেনা ঐ গণ্ডীই তার স্বরচিত শ্মশানশয্যা; মানুষও তেমনি ক্ষুদ্রতার সসীম আবেষ্টনীর মধ্যে যখন নিজেকে বদ্ধ করে রাখে, যখন শাশ্বত ব্রহ্মের বাণী বৈদ্যুতিক প্রবাহনির্ম্মুক্ত বেতার-যন্ত্রে প্রতিহত সঙ্গীতের মত হৃদয়দ্বারে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে যায়, তখন সত্য সত্যই আমরা মরণের দিকে অগ্রসর হই। সৌভাগ্যবশতঃ গুটিপোকার দু'একটি যেমন নিজের আবদ্ধাবস্থা বুঝতে পেরে রেশম-বেষ্টনী ছিন্ন ক'রে বিচিত্র পাখা মেলে অনন্ত নীল গগনে উড়ে যায়, মানুষের মধ্যেও তেমনি দু'একটা পাগল বিস্মৃতির আবরণ উন্মোচন করে নিজের জন্মগত অধিকারলাভের জন্য ছুটে যায়। সামাজিক মানব যখন দেখে, তার গণ্ডীর-সীমা উল্লঙ্ঘন করে একটা লোক ভিন্ন পথে ছুটে যাচ্ছে—কোন্ অজানার আহ্বানে, তখন সে তাকে পাগল বলে উপেক্ষা করতে চায়; কিন্তু পরে দেখতে পায়, যাকে সে পাগল বলেছে, সে পাগল নয়, সে-ই প্রকৃত মানব, শাশ্বত ঐশী শক্তির অধিকারী সহজ সাধনের অগ্রদূত।

কালে কালে দেশে দেশে যখন নিজের স্বরচিত ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী মহামানবতাকে ক্ষুণ্ণ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তখনই দুইএকটা পাগল সেই স্বকৃত গণ্ডী ভেঙ্গে চুরে বেরিয়ে পড়ে—যারা দেখতে পায় মানবের সহজ স্বাধীন পন্থা, যারা দেখতে পায় লোকাতীত জীবনের অসীম রহস্য মানসমুকুরে প্রতিফলিত, যারা ধরিত্রী-ধাত্রীর মায়া ছলনাময় বুঝে, প্রকৃত পিতামাতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, রাজা রামমোহন প্রভৃতি এই শ্রেণীর পাগল।

জাতিস্মর জড়ভরত যেমন পূর্ব্বজন্মে মৃগদেহের কথা দিবারাত্রি স্মরণ করে সংসারের মায়ামোহ থেকে দূরে থাকতেন, এই মহামনীষিগণও তেমনি অমৃতময় ব্রহ্মলোকের কথা সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে বিস্মৃত হন না। তাঁদের মানস-দর্পণে দিনরাত প্রতিবিম্বিত হয় ব্রহ্মজ্যোতিঃ; সেই জ্যোতির অপূর্ব্ব আলোকে তাঁরা দেশকালের গণ্ডী পরিহার করে সীমার মাঝে অসীমের বাণী ঘোষণা করেন; সেই আলোকে তাঁরা মানবের সহজ দাবী মাথা পেতে স্বীকার করে নেন। সেই অপূর্ব্ব আলোকে রুগ্ন, বৃদ্ধ ও মৃতের মধ্যে মহামতি বুদ্ধ মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন; ভক্তবীর চৈতন্য সংসার পরিহার করে হরিনাম বিলোতে বিলোতে নীলাচলের পথে অগ্রসর হলেন। আর, মহাত্মা রামমোহন নিয়ে এলেন ব্রহ্মজ্ঞানের অপূর্ব্ব বাণী ধূলিধূসরিত ভারতের জীর্ণ ভগ্ন-কুটীরের দ্বারে দ্বারে।

রাজা রামমোহন দেখলেন, যে আলোকবর্ত্তিকা তাঁর গভীর অন্তরপ্রদেশ আলোকিত করে সংসারের উপর একটা নূতন ছায়া প্রতিফলিত করেছে, তা'ত নিজে একা একা উপভোগ করলে চলবে না; কৃপণের মত স্পর্শমণি পেয়ে লৌহসিন্দুকে আবদ্ধ করে

রাখলে হবে না—সকলকে আহ্বান করে সে রত্নের ভাগ দিতে হবে; সে উৎসব-ক্ষেত্রে সকলকে নিয়ে যেতে হবে; সকলের হৃদয়মধ্যে সহজ সাধনের ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলতে হবে। যে বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে গেছে নিজের স্বরূপ ভুলে গিয়ে, জন্মগত সাধনের দাবী পরিহার করে যে জাগতিক পঙ্কিলতায় ডুবে আছে, তার ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে, তাকে ধাত্রীর মায়া কাটিয়ে স্বীয় পিতামাতাকে চিনিয়ে দিতে হবে—তবেই সে জন্মগত অধিকারের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে বিশ্বজনসমাজে; তবেই সে ধাত্রীর কোল ছেড়ে পিতামাতার অনন্ত অপরিমেয় স্নেহলাভের জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দেবে।

রামমোহন উদাত্তস্বরে মানবের সহজ সাধনের বাণী উচ্চারণ করলেন—হে অমৃতের পুত্র! ভুলে থেকোনা তোমাদের সহজ সত্বাধিকার মায়া-কুহকিনীর কুহক মায়ায়; ধাত্রীর প্রলোভনে আত্মহারা হয়ে প্রকৃত পিতামাতাকে ভুলে যেয়ো না; ওঠ, জাগ, পরমপিতার অনন্ত অপরিমেয় স্নেহকরুণার অধিকারী হও। কে আছ সুপ্ত, কে আছ নিদ্রিত, কে আছ সংসারগহন-বনে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ পথহারা, কে আছ মহাজলধির অনন্ত অতলে মজ্জমান আত্মহারা, এস, অদূরে মুক্তিপথ ব্রহ্মের করুণালোকে উদ্ভাসিত। সেই পথ ধরে পরম পিতার শান্তিশীতল স্নেহচ্ছায়ায় তাপিত প্রাণ শীতল করবে এস। যে খণ্ডকে আঁকড়ে ধরে জীবনপথে চলেছ, হে মানব, সে খণ্ড তোমাকে অখণ্ডের পথে নিয়ে যেতে সমর্থ হ'বে না। নশ্বরের সেবায় আত্মনিয়োগ করে অবিনশ্বরকে লাভ করতে পারবে না। সত্যকে ছেড়ে দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে ত পরম পদ লাভ করতে সক্ষম হবে না। গুটিপোকার মত নিজেকে স্বরচিত শ্মশানশয্যায় ফেলে রেখোনা—নিজের জন্মগত শাশ্বত অধিকার লাভ কর; সহজ সাধনে আত্মনিয়োগ করে পরম পিতাকে জান; নতুবা নিস্তারের উপায় নেই—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

রামমোহনের অমৃতময়ী বাণী—পরব্রহ্মের উপাসনাই মানবজীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, ব্রহ্মসাধনই মানবের সহজ অধিকার। জগতের যা কিছু এই উপাসনার পরিপোষক, তাই মানবের জীবনযাত্রার সহায়ক; যা উপাসনা ভুলিয়ে দিয়ে মানবকে ভিন্নপথে নিয়ে যায়, তাই অমঙ্গলজনক, তাই পরিত্যাজ্য। বৃত্তের সমস্ত ব্যাসার্দ্ধ যেমন কেন্দ্রবিন্দুতে সম্মিলিত হয়, তেমনি মানবের যা কিছু কাম্য, যা কিছু আকাঙ্ক্ষার বস্তু, অভিলষিত পদার্থ, সমস্তই ব্রহ্মোপাসনায় মিলিত হবে; ব্রহ্মোপাসনাকে কেন্দ্র করে জীবনযাত্রার পরিধি রচিত হবে; তবেই হবে অমৃতের পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য, তবেই হবে শাশ্বত অধিকারের দাবী সার্থক।

ডিরোজিও সম্বন্ধে দু'একটী কথা।

(শ্রীদীপ্তিময় হালদার)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন বঙ্গে কুসংস্কারে জীর্ণ হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করিতেছিলেন, তাহার পরবর্ত্তী সময়ে অন্যদিক হইতে কয়েকজন মহাপুরুষ উচ্চ শিক্ষার দ্বারা বাঙ্গালীর সামাজিক জড়তা দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং কাপ্তেন ডেভিড লিষ্টার রিচার্ডসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায় ত্রিত্ববাদ (Trinity) বর্জ্জিত প্রোটেষ্টান্ট খৃষ্টান ধর্ম্ম অর্থাৎ ইউনিট্যারিয়ানিজম এবং মহম্মদীয় একেশ্বরবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুদের প্রচলিত পৌত্তলিকতা অবহেলার চক্ষে দেখিয়া বেদান্তের ভিত্তিতে সংস্কৃত হিন্দু উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া রামমোহন বাঙ্গালার জাতীয় ধর্ম্মোন্নতিবিষয়ে বহুল পরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন। হিন্দু দেবদেবী পূজা ও অন্যান্য যুক্তিহীন দেশাচার প্রভৃতির উপর বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিয়া স্বাধীন ও স্বাস্থ্যকর চিন্তা দ্বারা বাঙ্গালী ছাত্রজীবনে যুগান্তর আনিয়াছিলেন জ্ঞানবাদী ডিরোজিও। হিন্দুধর্ম্মের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বড় বড় ধর্ম্মযাজকগণ সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাঁহার "Biographical Sketch of David Haro" পুস্তকে ডিরোজিও সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, সত্যের জন্য জীবন পণ করা, সমগ্র সদনুষ্ঠান প্রভৃতিতে যোগদান করা এবং সকল সৎবিষয়ের অনুশীলন করা, কোনও রকম অসৎ কার্য্যে লিপ্ত না থাকা প্রভৃতি বিষয় তিনি ছাত্রদের মনে বদ্ধমূল করাইয়া দিলেন। তিনি প্রাচীন ইতিহাস হইতে সুবিচার, দেশভক্তি, দয়া, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতির উদাহরণ এমনভাবে ছাত্রদের সম্মুখে পাঠ করিতেন যে, তাহাদের মন উত্তেজিত হইয়া উঠিত। বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথ ডিরোজিওর আবির্ভাবের প্রায় সত্তর বৎসর পরে বঙ্গমাতাকে প্রাণময় ছন্দে নিবেদন করিয়াছেন ;—

"পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভাল ছেলে কোরে।"

* * *

সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছো বাঙ্গালী ক'রে মানুষ করোনি।"

রবীন্দ্রনাথ বলেন "ধর্ম্মের নামে আমরা যে নিগড় গড়ি তাহা আধ্যাত্মিক মানুষকে বৈষয়িক বা পার্থিব বন্ধন অপেক্ষা কঠিনভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে।"

সেই স্বাধীন চিন্তার শিক্ষাকল্পে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন কিশোর কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে নিজেদের চারিদিকে প্রাচীর গঠন করিয়া অচলতার আশ্রয়সুখ অনুভব করে। তাহারা ছোট গণ্ডির ভিতর থাকিয়া হৃদয় ও মনের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ সব বিষয় ক্ষুদ্র করিয়া দেখে। তাহারা আসল ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের ক্ষুদ্র মতবাদরূপ পিঞ্জরে থাকিতে চায়। পিঞ্জরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে যাইবার চেষ্টা না করিয়া খালি পিঞ্জরটীকে অলঙ্কৃত করে। উন্মুক্ত স্বাধীনতা ব্যতীত প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না। যাহারা প্রভুর আজ্ঞার আওতায় বাস করে, তাহারা নক্ষত্রখচিত উন্মুক্ত আকাশ দেখিতে পায় না এবং স্বর্গীয় মলয় পবন উপভোগ করিতে পারে না।

অধিক দিন থাকিয়া হিন্দুকলেজের ছাত্রদের বিচারশক্তির স্ফূর্ত্তিসাধন করিতে ডিরোজিও সম্পূর্ণভাবে সুযোগ পান নাই। এই অল্প সময়ের ভিতর তাঁহার জ্ঞানবাদমূলক মত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙ্গালী ছাত্রজীবনে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহার হিন্দুকলেজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগবিষয়ে মনস্বী কিশোরী চাঁদ মিত্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য :—

"হিন্দু কলেজের দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ডিরোজিওর ছাত্রদের মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসন্দর্শনে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। ছাত্রদিগের আচরণ তাঁহাদের নিকট বিসদৃশ ঠেকিল। ধর্ম্মসংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপকতা হইতে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু ডিরোজিও যে জ্ঞানের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহা বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফল অবশ্যম্ভাবী। পাস্কেল বলেন 'পৃথিবীর আবর্ত্তন বিষয়ে গ্যালিলিওর মত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজে কাজেই ভ্রান্ত বলিয়া জেসুইটগণ পোপের আদেশ পাইয়াছিলেন। কিন্তু সবই বৃথা। বাস্তবিকই পৃথিবী যখন ঘুরিতেছে তখন পৃথিবীর সমগ্র লোক একত্র হইয়াও ঐ আবর্ত্তন রুদ্ধ করিতে পারে না এবং পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে না ঘুরিয়া থাকিতে পারে না।' পোপ যেমন আদেশ দিলেও আবর্ত্তন থামে নাই, সেইরূপ হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ ডিরোজিওকে কলেজ হইতে বিদায় করিয়া দিলেও (ডিরোজিও-প্রবর্ত্তিত) নৈতিক আবর্ত্তনও থামে নাই। গঙ্গার বন্যার ন্যায় এই আবর্ত্তন সত্য ও ধর্ম্মে দেশ প্লাবিত করিয়া দিবে। উন্নতি ভগবানের নিয়ম। ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষমতা নাই তাহা রুদ্ধ করে। জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, দৃষ্টান্তসমূহ জমিয়া যায় ; ঐ দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ নিয়ম স্থির হয় ; সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং সন্দেহ হইলেই অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে। প্রথমে সত্যের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। ঐ আভাস পরে মধ্যাহ্নের পূর্ণজ্যোতিতে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরের ন্যায়, হিন্দু কলেজের নবীন ধর্ম্মসংস্কারকদের ক্ষুদ্র দল উষার প্রথম আলোক পাইয়া সকলকে নিবেদন করিয়াছিলেন। আজ ঐ আলোক পর্ব্বতচূড়া হইতে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়াছে এবং আমি আন্তরিক আশা করি, ঐ আলোক গভীর উপত্যকা এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন ধান্যক্ষেত্রে অচিরে প্রবেশলাভ করিবে।" পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ স্বাধীনচিন্তাশীল লোকদের উপর লাঞ্ছনার দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। রোমের প্রধান মহন্ত মহারাজ পোপের শাসনে কাথলিক গির্জ্জায় স্বাধীন চিন্তার দ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ। কোন রোমক চার্চ্চের অন্তর্গত ব্যক্তি কাথলিক গির্জ্জা হইতে নিঃসৃত বাইবেলের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য অর্থ প্রকাশ করিলে তাহার জীবন রক্ষা দায় হইত ; এমন কি, রোমক খ্রীষ্টানদের কাথলিক গির্জ্জায় মতদ্রোহী বা বিভিন্ন মতপূর্ণ সাহিত্যপাঠও বিপদজনক। পোপের কঠিন দণ্ড জ্ঞানবাদী লোকদিগের উপর সর্ব্বদাই উদ্যত রহিয়াছে।

গ্যালিলিওর দুর্গতির বিষয়ে কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্ধৃত অংশে আভাস পাওয়া যাইবে। Cardinal Newman তাঁহার "Apologia"তে Greek Fathers of the Churchদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মতে আত্মরক্ষা, বদান্যতা, ধর্ম্মের সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে অসত্য উক্তি দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। Cardinal Manning বলিয়াছেন যে, পবিত্র প্রেতাত্মার জীবন্ত উক্তি, একমাত্র পবিত্র কাথলিক এবং রোমক গির্জ্জার মতে শিক্ষাদান ও কথন ব্যতীত ইতিহাসের দোহাই দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতার এবং ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য।

প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায় এবিষয়ে রোমকদের তুলনায় অনেক পরিমাণে উদার হইলেও তাহাদের মধ্যেও ঐরূপ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। মহাকবি

Southey অদ্বৈতবাদী এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে অবিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া অক্সফোর্ডের Christ Church কলেজে প্রবেশাধিকার পান নাই। বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ্ বিশপ Colenso, Old Testamentএর গোড়ার পাঁচটী পুস্তকের সমালোচনাপ্রসঙ্গে সেগুলির অনৈতিহাসিকতা স্পষ্ট প্রমাণ করাতে তাঁহার পদচ্যুতি ঘটিয়াছিল। স্বনামধন্য প্রফেসার F. D. Maurice খৃষ্টান ধর্ম্মের অনন্ত নরকভোগের মতবাদে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়া লণ্ডনের Kings Collegeএর অধ্যাপকপদ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। Magdalen Collegeএর বিখ্যাত Fellow, the Rev. J. M. Thompson যীশুর কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ এবং কবর হইতে সশরীরে পুনরুত্থান প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারও উক্তরূপ অবস্থা হইয়াছিল। অনেকে হয় ত জানেন না মহাকবি মিলটনের গদ্যরচনা "Areopagitioa" মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন চিন্তার ঘোষণা করিতেছিল বলিয়া ইংলণ্ডের Puritan Dectator Cromwell তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। Charles Darwinএর "Origin of species" মানবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বাইবেলের বিপরীত মত প্রচারক বলিয়া কেম্ব্রিজের Trinity কলেজের পুস্তকাগারে স্থান পায় নাই। বর্ত্তমান জীবতত্ত্ববিদ্ I. B. S. Haldane পঠদ্দশায় Hackelএর "Riddle of the Universe" নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহাকে Eton হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বার্মিংহামে Unitarian Dr. Priestleyর একটী পুস্তকাগার ছিল। একদিন খৃষ্টধর্ম্মে অনুপ্রাণিত জনমণ্ডলী তাঁহার উপর নাস্তিকতার দোষ আরোপ করিয়া পুস্তকাগারটী ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিল।

Mr. Leonard তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ডিরোজিওর মৃত্যুশয্যায় জ্ঞানবাদমূলক মত প্রত্যাহার এবং খৃষ্টধর্ম্মে পুনরাসক্তি (death-bed recantation) বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। ঐরূপ অলীক ঘটনা খৃষ্টের ভক্তেরা প্রায়ই প্রচার করিয়া থাকেন। Thomas Paineএর নাম আমেরিকার জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। Paine খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাস করিতেন না। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে নাস্তিকতার অপবাদ দিয়া নির্য্যাতন করা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই রটিয়া গেল যে, তিনি মৃত্যুশয্যায় জ্ঞানবাদমূলক মত পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টান মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। চার্লস্ ডারউইন জীবতত্ত্বে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারও মৃত্যুশয্যায় পুনঃ খৃষ্টান হইবার অভিনব গল্প শোনা যায়। বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্, এব্রাহিম লিন্কলন্, মার্ক টোয়েন, লর্ড মর্লে, জর্জ মেরেডিথ্ এবং টমাস হার্ডি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ খ্রীষ্টপন্থী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে খ্রীষ্টান বলিয়া দাবী করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ecclesiastical historian Jean Le Clerc লিখিয়াছেন যে, (খ্রীষ্ট) ধর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি ইতিহাস লিখিবেন তিনি যেন এই অলঙ্ঘনীয় সূত্রটী মনে রাখেন যে, যাহা কিছু বিধর্ম্মীদের (অর্থাৎ যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্ম মানেন না) ভাল তাহা মিথ্যা, যাহা কিছু তাহাদের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারা যায় তাহা সত্য; এবং অন্য দিকে যে সব বিষয় ধার্ম্মিকদের (অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মবিশ্বাসীদের) গৌরবকর তাহা সন্দেহ করিবে না আর যাহাতে ঐরূপ ধার্ম্মিকদের দুর্নাম হইবার সম্ভাবনা তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবে।

যে জ্ঞানবাদমূলক (rationalistic) মত ডিরোজিও প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাহারই বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণমূর্ত্তি এই মতের পৃষ্ঠপোষক, আগেই বলা হইয়াছে। শ্রীমতী অ্যানী বেশান্ত পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের একজন বিশেষ ভক্ত। তাঁহার প্রভাব শিক্ষিত হিন্দুসমাজে বেশ উপলব্ধি করা যায়। Madame Blavatsky কল্পিত হিমালয়ের ভ্রাতৃমণ্ডলীদের (Himaleyan Brothers) প্রতি অ্যানী বেশান্তের প্রগাঢ় ভক্তি। তিনিও জ্ঞানবাদের হাত এড়াইতে না পারিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে কৃষ্ণজী অনেক কিছু সার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু "সব জিনিষ বিচার করিয়া গ্রহণ করিবে" তাঁহার এই উক্তি সব উক্তির সেরা।

সর্ব্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্। Mr. Aldous Huxley একজন বিখ্যাত জ্ঞানবাদী লেখক। তিনি একবার ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে "Jesting Pilate : The diary of a Journey"তে ভারতে আধ্যাত্মিকতার বাহুল্য দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের আদি অভিসম্পাৎ। তিনি এ বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহারই ভাষায় উদ্ধার করা গেল ;—

"A little less spirituality, and the Indians would now be free from foreign dominion and from tyranny of their own prejudices and traditions. There would be less dirt and more food, There would

be fewer Maharajas with Rolls Royces and more schools. The women would be out of prisons, and there would be some kind of polite and conventional life—one of those despised appearances of civilization which are yet the very stuff and essence of civilized existence."

আজ নববর্ষের দিনে জ্ঞানবাদের বহুল প্রচার-মানসে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনায় যোগদান করিয়া বলিতে চাই :—

"যেথা তুচ্ছ আচারের মরু-বালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"

সংস্কৃত ভাষা ও প্রবেশিকাপরীক্ষা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী)

সংস্কৃত ভাষা পুরাকালে ভারতের গৃহে গৃহে আলোচিত হইত। শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি মাত্রেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই ভাষার ব্যাকরণের বন্ধন দৃঢ়তর হইলেও স্বাভাবিক লালিত্যগুণে সকলের নিকট আদরণীয় হইত। ইতিহাস পুরাণ দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ই সংস্কৃত ভাষায় ঋষিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সেই অভ্যুদয়ের সময় সংস্কৃত ভাষা না জানিলে কোনরূপ শিক্ষার সম্ভাবনাই ছিল না। প্রাদেশিকভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতভাষা অধিক সমাদৃত হইত। সংস্কৃত ভাষাই প্রধানতঃ লেখ্য ভাষা ছিল; প্রাদেশিক ভাষায় বিশেষ কিছুই লেখা হইত না। তাহার কারণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিলে ভারতের শিক্ষিত সকল লোকই তাহা বুঝিতে পারিতেন। সংস্কৃতভাষার প্রভাব কেবলমাত্র ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করিয়া ভারতবাসী ব্রাহ্মণগণ নানা বিজ্ঞান দর্শন কৃষি ও কলাশাস্ত্রে এরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতের বাহিরের পণ্ডিতগণও তাঁহাদের নিকট ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য উপস্থিত হইতেন। মনু বলিয়াছেন—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

এই দেশের ব্রাহ্মণদিগের নিকট পৃথিবীর সকল মানব নিজের চরিত্র শিক্ষা করিবে, অর্থাৎ যে সকল বিষয় জানিলে মানবচরিত্রের পূর্ণতা লাভ হয়, সেই বিষয়গুলি বিভিন্ন দেশের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট জানিয়া লইবেন। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ইংরাজি ভাষা না জানিলে শিক্ষার পূর্ণতা হয় না, প্রাচীন কালে সেইরূপ সংস্কৃত ভাষা না জানিলে শিক্ষার পূর্ণতা হইত না। সংস্কৃত ভাষা জানিলে অবশ্য-জ্ঞাতব্য সকল বিষয় জানা যাইত বলিয়া ঐ ভাষা সকলেরই শিক্ষণীয় ছিল। কেবলমাত্র ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোচনাই সংস্কৃত ভাষায় করা হইয়াছে তাহা নহে, সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিদ্যা বিশদরূপে সংস্কৃত শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় কোনও ভাষায় ঐরূপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে অধ্যাত্ম-বিদ্যার আলোচনা হয় নাই। তাই ধর্ম্মপ্রাণ অধ্যাত্ম বিদ্যার জীবনদাতা ভারতবাসীর নিকট সংস্কৃত ভাষা প্রাণ অপেক্ষাও আদরণীয় ছিল। তাঁহারা নিজের নিজের মাতৃভাষা অপেক্ষা ইহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন; সেইজন্যই ইহার নাম ছিল দেবভাষা। ভারতের যাহা কিছু নিজস্ব তাহা ঐ সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই আছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণ, ঊনবিংশ সংহিতা, ষড়্দর্শন, বেদ, বেদাঙ্গ, সকলই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়। এইসকল প্রাচীন শাস্ত্রই একমাত্র ভারতের গৌরব ও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। সংস্কৃত ভাষা না বুঝিলে এবং উক্ত দর্শন-পুরাণাদি শাস্ত্র বর্জ্জন করিলে এদেশের সভ্যতার নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সেইজন্য আমরা বর্ত্তমান শিক্ষার মধ্য দিয়াও যাহাতে বালকবালিকার অন্তরে প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষার ভাব জাগরূক হয়, তাহার পক্ষপাতী। প্রাচীন শিক্ষা, প্রাচীন সভ্যতা বর্ত্তমান শিক্ষার্থী বালকবালিকাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার কিঞ্চিৎ পরিমাণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেবলমাত্র অনুবাদাদির সাহায্যে ঐ সকল গভীর বিষয়ের যথার্থানুভব সম্ভব নহে। সে কারণেই বোধ হয় ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। কয়েকজন প্রখ্যাতনামা ইংরাজ ও দেশীয় পণ্ডিত মিলিত হইয়া যে সময় এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় এদেশীয় ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ জাতিগণ বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে প্রথমত স্বীকৃত হন নাই। তাহার পর নানাবিধ প্রলোভনের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সম্মত

করা হয়। তাঁহাদেরই বংশধরগণ বিদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের আচারব্যবহার ধর্ম্ম পুণ্যস্মৃতি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবার উপক্রম করিতেছেন, ইহাই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্য পাঠ্য তালিকা হইতে উঠাইয়া দিয়া বালকবালিকাগণের শিক্ষার পথ সহজ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহারা এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে কতটা সম্বন্ধ রাখেন তাহা বলিতে পারি না। এদেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন শিক্ষার মেরুদণ্ডস্বরূপ সংস্কৃত ভাষা প্রত্যেক ভারতবাসী হিন্দু বালকবালিকাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষা এরূপ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, সংস্কৃত ভাষা না জানিলে প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। আজকাল অনেক সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার কবল হইতে প্রাদেসিক ভাষাগুলিকে নির্ম্মুক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন; তথাপি সেই বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এবং উহা সর্ব্বসম্মতও নহে। বহু প্রাচীনকাল হইতে লেখ্য সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাদেশিক ভাষাসমূহ এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, সে বন্ধন ছিন্ন করিলে প্রাদেশিক ভাষার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইবে। ইহা ঐ সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? প্রাদেশিক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষা দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ থাকা হেতু এদেশীয় লোকের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করা ভিন্নদেশীয় লোকের অপেক্ষা অনেক সহজ। বাল্যকাল হইতে বালকবালিকাদিগকে কথঞ্চিৎ সুযোগ দিলে পূর্ণবয়সে নিজের চেষ্টায়ও বুদ্ধিমান বালকগণ অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। সংস্কৃত ভাষা না জানিলে এদেশের প্রাচীন ধারা বুঝিতে পারা যায় না। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি পাশ্চাত্যগণ বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেও দর্শন-বিজ্ঞানাদির মূলগ্রন্থগুলি যে ভাষায় ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা না জানিলে উহার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশেরই কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিয়া কেবলমাত্র অনুবাদাদির সাহায্যে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাহার সম্যক্ মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, এইরূপ অভিমান রাখেন। সেই অভিমানবশে নানারূপ গ্রন্থ লিখিয়া দেশীয় ও বিদেশীয়লোকের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের চেষ্টা করেন। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা আধুনিক শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণের প্রণীত গ্রন্থাদির সাহায্যে শাস্ত্রগ্রন্থের নানারূপ বিকৃত সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন।

সংস্কৃত ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষার অবশ্য পাঠ্য-তালিকা হইতে উঠিয়া গেলে উহা কেহই অধ্যয়ন করিবে, মনে হয় না। বাল্যকালে সংস্কৃত শিক্ষার বীজ হৃদয়ে রোপিত না হইলে প্রৌঢ়ে বা বার্দ্ধক্যে ঐ ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ হওয়া অস্বাভাবিক।

সংস্কৃত শিক্ষার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের কোন সুব্যবস্থা নাই বলিয়া প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বংশধরগণও অনেকেই অধুনা জীবিকা অর্জ্জনের উপায়স্বরূপ পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত শিক্ষা ইচ্ছাধীন হইলে অনেকেই ব্যাকরণের ভয়ে সংস্কৃত ভাষাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবে। কাজেই এখনও সামান্যভাবে জীবিকা অর্জ্জনের সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং কাব্যতীর্থ প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন, তাঁহাদের সেই সুযোগও চলিয়া যাইবে। অতএব দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জীবিকার আশা একেবারেই অন্তর্হিত হইবে। প্রায় বিদ্যালয়েই আর সংস্কৃত পণ্ডিত রাখিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

অতএব আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে সংস্কৃত ভাষাকে নির্ব্বাসিত করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষগণ যেন আমাদের এই কথাগুলি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন। যাঁহাদের উপর প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্যনির্ব্বাচন-ভার বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছেন, তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রাচীনতার ধারার মূলচ্ছেদক এই সর্ব্বনাশকর সংকল্প পরিত্যাগ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

হিন্দু আমলে ব্যবহারশাস্ত্র ও বিচার পদ্ধতি।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

আমরা গতবারে বর্দ্ধমান-কৃত "দণ্ডবিবেক" গ্রন্থ হইতে কি ভাবে হিন্দুরাজগণের আমলে ফৌজদারি মোকর্দ্দমার বিচার হইত, তাহার আভাস দিয়েছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেওয়ানি মোকর্দ্দমা কি ভাবে নিষ্পত্তি হইত, তাহার আলোচনা করিব। এই বিষয়সম্পত্তি ঘটিত মোকর্দ্দমা

যাহার অবলম্বনে মীমাংসিত হইত, তাহার অপর নাম ব্যবহার-শাস্ত্র। কাত্যায়ন বলেন, 'বি' উপসর্গের অর্থ বহুতর, 'অব' উপসর্গের অর্থ সন্দেহ এবং 'হৃ' ধাতুর অর্থ দূরীকরণ; যাহা দ্বারা নানা সন্দেহ বিদূরিত হয় তাহার নাম ব্যবহার, এবং সেই শাস্ত্রের নাম ব্যবহারশাস্ত্র। সমাজরক্ষার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ আইনেরই প্রয়োজন। মনু বলিয়াছেন "দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি" মানুষ নিদ্রিত হইলেও রাজদণ্ড জাগ্রত থাকে। অর্থশাস্ত্রই বিবাদের নির্ণয় করিয়া দেয়। ব্যবহারশাস্ত্র বলিলেই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, শুক্রনীতি, কৌটিল্য, ব্যবহার-মাতৃকা, মিতাক্ষরা, বশিষ্ঠ, মনুটীকা, ব্যবহারতত্ত্ব, দিব্যতত্ত্ব, দণ্ডবিবেক, বিবাদরত্নাকর, রামায়ণ, মহাভারত প্রধানতঃ এই কয়েকটিকেই বুঝায়। ইহার মধ্যে মনু সর্ব্বপ্রাচীন। কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে খৃষ্টপূর্ব্ব চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত রচিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। আপস্তম্ব-স্মৃতি খৃষ্টপূর্ব্ব এক হাজার বৎসর সময়ে রচিত। উহার ভাষা বৈদিক ভাষার অনুগত। মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক; কিন্তু কুল্লুক ভট্ট ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। মহাভারত খৃষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার বৎসর অগ্রে; রামায়ণ তাহারও পূর্ব্বে রচিত, ইহাই অনেক পণ্ডিতের মত। উদয়নাচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর।

প্রাচীন কালে অধিকাংশ স্থলে মানুষের চাতুরী ছিল না। লোকে সত্যের অনুগামী ছিল। এরূপ অবস্থায় মামলা-মোকর্দ্দমার সংখ্যা অল্পই ছিল। ইংরাজি আমলের প্রমাণবিষয়ক আইনের (Evidence act) নিদর্শন হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাক্ষ্য সম্বন্ধে উক্তি আছে যে, ব্রাহ্মণ বা উচ্চপদস্থ ব্যবহারবিদের বা সদ্বংশজাত অনিন্দ্যচরিত্রের সাক্ষ্যই গ্রহণীয়। পক্ষদ্বয়ের আত্মীয়, বন্ধু, অবশ্যপ্রতিপাল্য নির্ভরশীল ব্যক্তির বা যাহার সঙ্গে বাধ্যবাধকতা আছে, তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে। মৃত ব্যক্তির জীবিত কালের উক্তি বা লিপি পরবর্ত্তী মামলায় প্রাসঙ্গিক প্রমাণরূপে ব্যবহার হইত। ঐ উক্তি বা লিপি মৃতের স্বার্থের বিরুদ্ধ হইলে এবং সাধারণের উপকারের সহায় হইলে উহা বিশেষ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত। মৃতের পূর্ব্বপ্রদত্ত সাক্ষ্যবাক্য বা এজাহার প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইত। আপস্তম্ব বলিয়াছেন "গ্রামেষু নগরেষু আর্য্যান্ শুচীন্ সত্যশীলান্ প্রজাগুপ্তয়ে নিদধ্যাৎ সর্ব্বতো যোজনং নগরম্ ইতি", অর্থাৎ রাজা গ্রামে নগরে প্রজারক্ষার জন্য সত্যাচারী চরিত্রবান আর্য্য অর্থাৎ পূজ্য লোককে নিযুক্ত করিবেন। মনুও বলিয়াছেন, রাজা প্রতি গ্রামে একজন অধ্যক্ষ রাখিবেন, দশ গ্রামাধ্যক্ষের উপর একজন, শত গ্রামাধ্যক্ষের উপর একজন এবং সহস্র গ্রামাধ্যক্ষের উপর একজন বিশিষ্ট অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। গ্রামের অধ্যক্ষের নিকটে দোষ মীমাংসা না হইলে তিনি দশগ্রামাধ্যক্ষের গোচরে আনিবেন; এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাজার গোচরে আসিবে। ইহা কতকটা আপীলের মত। আপস্তম্ববচনে প্রহরী (police) নিযুক্তির কথা আছে "সর্ব্বতো যোজনং নগরং তস্করেভ্যো রক্ষ্যং কোষো গ্রামেভ্যঃ" অর্থাৎ সর্ব্বত্র গ্রাম-নগরাদিতে চোর হইতে রক্ষার জন্য, এবং গ্রামবাসীর নিকট হইতে ধনাগার বা রাজকোষ রক্ষার জন্য রাজা রক্ষক নিযুক্ত করিবেন। এই রক্ষকগণ প্রায়ই ব্যাধ, চণ্ডাল, শবর ও অরণ্যচরাদির মধ্য হইতে সংগৃহীত (recruited) হইত। প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্রে ইহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, যদি গ্রামের কাহারও বা আগন্তুক বিদেশী বণিকের কোন বস্তু বা অর্থ চুরি যায় ও চোরের সন্ধান না মিলে, গ্রামাধ্যক্ষের অনবধানতাবশতঃ ঘটিলে তিনি নিজ হইতে তাহা পূরণ করিয়া দিবেন; গ্রামাধ্যক্ষ নিঃসম্বল হইলে রাজা নিজ হইতে তাহা দিবেন। কত বড় দায়িত্ব গ্রামাধ্যক্ষের ও রাজার ছিল তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে "চৌরহৃতম্ অবিদ্যমানং স্বদ্রব্যেভ্যো দদ্যাৎ"। বিজ্ঞানেশ্বরধৃত ব্যাসবচনে আছে "স্বকোষাৎ তৎ হি দাতব্যং অশক্তেন মহীক্ষিতা"। চোরাই বস্তু ক্রয় করা বা চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া বা চোরকে গোপন করা, চুরির তুল্য অপরাধ। যাঁহারা মৃচ্ছকটিক নাটক পড়িয়াছেন, তাঁহারা সাবেক আমলের শান্তিরক্ষকের পরিচয় পাইবেন। অনেকের মতে এই মূল নাটকের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০ বৎসরের কাছাকাছি। কালিদাস বহু পরবর্ত্তী সময়ের হইলেও তাঁহার শকুন্তলার ভিতরে নগররক্ষকের পরিচয় মিলে।

সাক্ষীকে কূট প্রশ্ন (cross examination) বা জেরা করিবার ব্যবস্থা বিশেষভাবে দেখা যায় না বটে, কিন্তু দিব্যপরীক্ষা ছিল। দিব্যপরীক্ষার কথা পরে বিবৃত হইবে। পূর্ব্বে উকীল ছিল না। কিন্তু "বাদে-নিযুক্ত" বলিয়া প্রতিনিধির উল্লেখ আছে। বাদী বা বিবাদী পীড়িত হইয়া পড়িলে তাঁহাদের অভিমত প্রতিনিধি বিচারকের সমক্ষে উপস্থিত থাকিতেন এবং এইরূপ প্রতিনিধি প্রায়ই অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভিন্ন হইতেন না। স্ত্রীলোক, বালক, মূর্খ, পাগল ও রোগীর পক্ষে এইরূপ প্রতিনিধিনিয়োগের ব্যবস্থা আছে। ব্যবহারশাস্ত্রে "প্রাড্‌বিবাক" বলিয়া একজনের পরিচয় মিলে। প্রচ্ছ্ ধাতু হইতে প্রাট্ শব্দের উৎপত্তি; বিবাক অর্থে বিবেচক অর্থাৎ যিনি ব্যবহারে প্রশ্নকর্ত্তা ও সত্যের নির্ণয়কারী। ইহার অর্থ বিচারক হওয়াই সম্ভব অর্থাৎ প্রাড়্‌বিবাক অর্থে বিচারকের সহযোগী। বর্ত্তমান কালে উকীলের সাহায্যে বিচারের সুবিধা হইলেও অনেকস্থলে যে বিচারবিভ্রাট ঘটে ও সত্য যে মিথ্যায় পরিণত হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বর্ত্তমান ইংরাজি আইনে কোন লোক ৭ বৎসর পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ থাকিলে তাহার যে মৃত্যু ঘটিয়াছে এরূপ ধরিয়া লওয়া হয়; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু আইনে ১২ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকিলে তবে সে মৃত এইরূপ অনুমিত হইত। "গতস্য ন ভবেৎ বার্ত্তা যাবৎ দ্বাদশ-বার্ষিকী। প্রেতাবধারণং তস্য কর্ত্তব্যং সুতবান্ধবৈঃ।" যমস্মৃতি।

যাহার সাহায্যে তথ্যের নির্ণয় হয়, তাহার নাম প্রমাণ। সন্দিগ্ধবিষয়ে দুইটি মূল প্রমাণ—(১) মানুষ ও (২) দৈবিক। মানুষপ্রমাণ অর্থে যাহা মানবের আয়ত্ত।

উহা আবার তিনভাগে বিভক্ত—(ক) সাক্ষী, (খ) লেখ্য (দলিলাদি document), (গ) ভোগ অর্থাৎ দখল (possession)। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ভোগপ্রমাণই বলবৎ। অশ্ব গবাদি জন্তু অপহৃত হইলে বা বিচারাধীন হইলে ভোগপ্রমাণই স্বতঃপ্রমাণ, অর্থাৎ বিবাদমূলক গবাদিকে ভোক্তার আদেশপালন করিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে ইহা তাহারই পশু। ঐ পশুই ভোগের নীরব সাক্ষী।

চক্ষুর সাহায্যে যে অনুভব হয় তাহার নাম সাক্ষ্য। এই অনুভব যাহার আছে সে-ই সাক্ষী। যিনি প্রত্যক্ষদর্শী বা যিনি প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শুনিয়াছেন, তিনিও সাক্ষী। তাঁহার সাক্ষ্যও প্রমাণরূপে গণ্য। "সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাৎ চৈব সিধ্যতি" (মনু), "শ্রবণাৎ শ্রাবণাৎ চাপি স সাক্ষ্যুত্তরসঞ্জিতঃ" (নারদ)। সাক্ষী আবার পাঁচভাগে বিভক্ত। বাহুল্যবোধে তাহা লিখিত হইল না। দীর্ঘকালেও যাহার বুদ্ধি, স্মৃতি ও শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তিই সাক্ষী হইবার যোগ্য। বাদী বিবাদী ও সাক্ষীর বাক্যগুলি যিনি লিখিয়াছেন এবং বিচারকের সহযোগী সভ্য, তাহাকে অকৃতসাক্ষী বা অনির্দ্দিষ্ট সাক্ষী বলা হইত। রাজাকে কোন পক্ষ সাক্ষী মান্য করিতে পারিত না, শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে; "ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যঃ"। যে সাক্ষী বাদী বা বিবাদীর সজাতি সবর্ণ ও যথাসম্ভব গুণবান তিনিই প্রশস্ত সাক্ষী। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয়, রমণীর পক্ষে রমণী প্রশস্ত সাক্ষী। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় ভিন্নবর্ণ ও ভিন্ন জাতির লোক হইলেও সাক্ষী হইতে পারিত।

প্রতি মামলায় অন্তত তিনজন সাক্ষী হওয়া চাই; তদূর্দ্ধ হইলেও ভাল হয়। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় বাদী ও বিবাদী উভয়ের অভিমত একজন সাক্ষী হইলেও তিনি একাকী সাক্ষী হইতে পারেন। ঋণাদি ঘটিত মামলায় উভয়ের মানিত দুইজন সাক্ষী না থাকিলে বিচার হইত না। যাঁহারা তপোনিষ্ঠ, শ্রোত্রিয়, বৃদ্ধ ও সন্ন্যাসী তাঁহারা সাক্ষী, হইতে পারিতেন না। যাহারা চৌর্য্যাদি অপরাধে দোষী, যাহারা ভেদাধীন (উৎকোচে বশীভূত), যাহাদিগকে সাক্ষী মান্য করা না হইলেও, উপযাচক হইয়া সাক্ষী দেয় এইরূপ লোকের সাক্ষ্য গৃহীত হইত না। এতদ্ব্যতীত স্ত্রালোক, বালক, বৃদ্ধ, ধূর্ত্ত, মাতাল, পাগল, ব্রহ্মহত্যাকারী, নটবৃত্তিজীবী, জালিয়াৎ, ইন্দ্রিয়শক্তিবিহীন, পতিত, পক্ষগণের সহায়ীভূত, চোর, জ্ঞাতিগণের বিদ্বেষভাজন, ইহারাও সাক্ষী হইতে পারিত না। এতভিন্ন চিরদাস, ছলব্যবসায়ী ব্যসনাসক্ত, দীর্ঘপথগামী, সমুদ্রযাত্রী বণিক, ক্লীব, নাস্তিক, পত্নীত্যাগী, একপাত্রে অন্যের সহিত ভোজনকারী, গুপ্তচর, জ্ঞাতি, সহোদর, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, বিষবিক্রেতা, সর্পজীবী, চণ্ডাল ও ভূতাবিষ্ট, পক্ক তৈলপ্রস্তুতকারী, রাজা কর্ত্তৃক বধকর কার্য্যে নিযুক্ত, লোভী, কুসীদজীবী ব্রাহ্মণ, রাজসেবক, নিষিদ্ধ মাংসবিক্রেতা, তোষামোদী, পিতার সঙ্গে বিবাদকারী ইত্যাদি যাহারা, তাহারাও সাক্ষী হইতে পারিত না। তবে নরহত্যা প্রভৃতি বিচারে অন্য সাক্ষী অসম্ভব হইলে স্ত্রীলোক ও বালকের সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইতে পারিত। স্ত্রীলোক ও বালক চপলমতি এই কারণে তাহাদের সাক্ষ্যদান সম্বন্ধে বাধা শাস্ত্রপরায়ণগণ দেখাইয়াছেন। অনেক স্থানে চিহ্নই সাক্ষী। গৃহদাহে অন্য সাক্ষীর অসদ্ভাব হইলে, যাহার হাতে মসাল, সে-ই অগ্নিদাতা ইহা অবধারণ করিতে হইবে। কেননা মসালধারণই তাহার চিহ্ন। কোন লোক আহত হইলে যাহার হস্তে অস্ত্র, অস্ত্রধারণ ঘাতকতার চিহ্ন বলিয়া তাহাকে ঘাতক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। বন কাটা হইতেছে, যাহার হস্তে কুঠার সে-ই দোষী। কাহার দেহে আঘাত দেখা যাইলে যে নিষ্ঠুরভাষণ করিতেছে সে-ই অপরাধী। যদি চুরি হইয়া থাকে, তবে পদচিহ্নের অনুসরণে দোষী স্থির করিতে হইবে। বিচারালয়ে অভিযোগ থাকিলে বিচারক অনুমান দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণ করিবেন। স্বর বর্ণ আকার ইঙ্গিত চক্ষু ও চেষ্টা এই ছয় প্রকার বাহিরের চিহ্ন দ্বারা দোষী নিরূপণ করা যাইতে পারে; যথা, "বাহ্যৈর্বিভাবয়েল্লিঙ্গৈর্ভাবমন্তর্গতং নৃণাম। স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈঃ চক্ষুষা চেষ্টিতেন চ॥" মনু ৮ম. অ।

আজকাল বৃটিশরাজত্বে সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে সাক্ষীকে শপথগ্রহণ করিতে হয়, পূর্ব্বে হিন্দু রাজার আমলে সেরূপ ছিল না। সাক্ষীকে দেবতা বা ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত। সত্যকথনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বেদ ও পুরাণের বচন আবৃত্তি করিয়া মিথ্যাভাষণের দোষ প্রদর্শন করা হইত। তাহাকে বলা হইত, 'জীবদেহের অন্তরে পরম পুরুষই পাপপুণ্যের সাক্ষী আছেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া সেই সর্ব্বোত্তম নিত্য সাক্ষীর অবমাননা করিও না।" আরও বলা হইত "সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে, তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ব্ববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ॥" যদি তুমি মিথ্যা বল, তোমার অর্জ্জিত পুণ্য কুক্কুরে সংক্রমিত হইবে। তুমি মনে করিও না যে তুমি একাকী আছ। ঈশ্বর তোমার পাপপুণ্যের প্রত্যক্ষদর্শী।" ঋষিবিশেষের মতে তাহাকে আরও বলা হইত, "হে ভদ্র! সাগরবক্ষে নৌকার ন্যায় একমাত্র সত্যই জীবের স্বর্গধামের সোপান। তুলাদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সঞ্চিত পুণ্য, অপরদিকে একটিমাত্র সত্য রাখিলে, সত্যটিই গুরুভার হয়," ঈদৃশ শাস্ত্রব্যাখ্যার পরে সাক্ষীর মিথ্যাভাষণের প্রবৃত্তি একেবারেই তিরোহিত হইত।*

ADDITIONS AND CORRECTION TO THE CURRENT HISTORY OF THE BRAHMO SAMAJ.

(DR. V. RAI.)

(1) An Addition.

It is generally known that Rammohon Roy when in Calcutta had social divine service in his own house and also used to attend the unitarian service conducted at his instauce by Mr. Adam whom he had converted from Trinitarianism to unitaria-

---

* ভাটপাড়ানিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

nism. But it is not generally knonwn that he was a regular worshiper in Dr. Bryce's Trinitarian Church. It is also not generally known that Rammohon Roy had a hand in Dr. Duff's coming out to India. The following extract from George Smith's life of Dr. Duff will give authentic information on both the points.

It was Rammohon Roy who was the instrument of the conversion of the first chaplain, Dr. Bryce, from the opinion of the Abbe Dubois that no Hindu could be made a true christian, to the conviction that the past want of success was largely owing to the inaptitude of the means employed. Some nine years after the confession which we have already quoted, we find Dr. Bryce writing "Encouraged by the approbation of Rammohon" I "presented to the General Assembly of 1824 the petition and memorial which first directed the attention of the Church of Scotland to British India as a field for missionary exertions, on the plan that is now so successfully following out, and to which this eminently gifted scholar, himself a Brahman of high caste had specially annexed his sanction....

"Rammohon Roy was himself a hearer in the Scotch Church of Calcutta." To the minute of st Andrew's kirk-session on the subject Rammohon Roy appended this singular testimony on the 8th December, 1823 :

"As I have the honour of being a member of the congregation meeting in St Andrew's Church (although not fully concurring in every article of the Westminster confession of faith), I feel happy to have an opportunity of expressing my opinion that, if the prayer of the memorial is complied with, there is a fair and reasonable prospect of this measure proving conducive to the diffusion of religious and moral knowledge in India." But, in reality, Dr. Bryce's scheme was one for almost everything that Duff's was not. His plan of a "Scottish College" was dictated by sectarian hostility to the Bishop's College of his rival, Dr. Middleton."

পত্রিকাপরিচয়।

রাষ্ট্রবাণী—আমরা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে, "রাষ্ট্রবাণী" পত্রিকাখানি পুনরায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের বিপদসঙ্কুল সময়ে এইরূপ একখানি পত্রিকার খুবই প্রয়োজন আছে। ইহার ছত্রে ছত্রে দুর্নীতির প্রতিকূল এবং দেশের উন্নতি ও কল্যাণের অনুকূল যে সকল বাণী বিঘোষিত হয়, তাহার প্রত্যেকটী বর্ত্তমান সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা দেশবাসীর প্রণিধানযোগ্য। আমরা পবিত্রতা ও সদ্ভাবে মাখা এইরূপ পত্রিকার গৃহে গৃহে প্রচার কামনা করি।

গ্রন্থপরিচয়।

বিজ্ঞানে বিরোধ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ।০ আনা।

আমরা উক্ত পুস্তিকাখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকলেরই স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার আছে। গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার স্পষ্ট ভাষণের জন্য আমরা সন্তুষ্ট। আলোকাদি সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা করিতে হইলে যে সমস্ত গবেষণাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি করা আবশ্যক ; তাহা না হইলে ধন্ধা বিদূরিত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে আলোক, উত্তাপ ও তড়িৎ বড়ই রহস্যাকর। সব রহস্য আজও ভেদ হয় নাই। সে যাহা হউক, লেখকের সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। চি. চ.

শ্রীমতী সরস্বতী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৮১নং কার্ণ রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীমতী সরস্বতী সেন ২৪ পরগণার অন্তর্গত খাঁটুরা-গ্রাম-নিবাসী পরলোকগত কান্তিচন্দ্র পালের কন্যা। এগার বৎসর বয়সে ইনি বিধবা হন। পনের বৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া বামাবোধিনী পত্রিকার "অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার" অধীনে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং বেথুন কলেজেও কিছুদিন শিক্ষা করেন। ক্ষেত্রমোহন দত্তের উপদেশে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে :আসিয়া ইনি কিরূপে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাহা এই জীবনীতে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই পাঠ করা উচিত। ব্র. চ.

সংবাদ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছে। পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "দণ্ডবিবেক" প্রবন্ধটী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "সময়" পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর অ্যাডভোকেট।—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, আদিব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস-সি, বি-এল হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হইয়াছেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যাহা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা হইতে আদিব্রাহ্মসমাজে ৬৲ ছয় টাকা দান করিয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ইঁহার সদ্দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজ-হিতৈষীমাত্রেরই অনুসরণীয়। পরমেশ্বরে ইঁহার মতি চিরকাল দৃঢ়নিবদ্ধ থাকুক। ভগবান ইঁহার উত্তরোত্তর কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি বিধান করুন।

রবীন্দ্রজয়ন্তী।—গত ২৫শে বৈশাখ শুক্রবার পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ সপ্ততিবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে উক্ত দিবস প্রাতঃকালে বোলপুর শান্তিনিকেতনে বেদমন্ত্রপূত এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, কলিকাতায় কবির সম্বর্দ্ধনার্থ একটী আনন্দোৎসবের আয়োজন করিবার জন্য বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্-গৃহে স্থানীয় বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কর্তৃক একটী পরামর্শসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সভায় নির্দ্দেশ অনুসারে আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসুকে সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয়দ্বয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া এক কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। ভগবান রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের সেবায় নিরত রাখুন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ।—গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার পূর্ব্বাহ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী শ্রীমনীষা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺দিবিজ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাৎসরিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান জতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটের স্বকীয় বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাৎসরিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে তদীয় মধ্যম পুত্র আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর স্বকীয় বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতিমতে যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

জন্মতিথি।—গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রপৌত্র শ্রীমান হৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তদীয় ভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ব্রহ্মোপাসনা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শোকসংবাদ।

পণ্ডিত ৺লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়।—আমরা দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিতাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহোদয় গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে কাশীধামে স্বকীয় বাসভবনে অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কারসাধনই ইঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল; এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহারই সংসাধনে ইনি আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে পণ্ডিতসমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরা ইঁহার বর্ষীয়সী দুঃখিনী জননী ও শোকার্ত্ত পুত্রকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবৎকৃপায় ইঁহার লোকান্তরিত আত্মা সাধনোচিত ধাম লাভ করুক।

৺অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি এল।—আমরা ঢাকার "শিক্ষাসমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, ঢাকানিবাসী সুবিদ্বান ও সত্যধর্ম্মানুরাগী অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল মহাশয়ের গত ২৬শে বৈশাখ শনিবার অকালে পরলোকগমন-সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। অবিনাশ বাবুর সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়লাভের সুযোগ না হইলেও "শিক্ষাসমাচারে" তাঁহার উদারতা ও গুণগ্রাহিতার বিশেষ পরিচয় পাইতাম। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে তিনি বিশেষ প্রীতি-দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং ইহা হইতে বহু প্রবন্ধ তাঁহার শিক্ষাসমাচারে উদ্ধৃত হইত। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমরা একটী প্রীতির যোগ অনুভব করিতাম। তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনবর্গকে আমাদের প্রগাঢ় সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার পরলোকপ্রস্থিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় প্রদান করুন।

ঈ, ৩৬৭৫

Tattwabodhini Patrika Reg. No. ৩

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৫৫ ১৮৫৩ শক আষাঢ়

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁ তৎসৎ

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৪। দুঃখের গান।

মা! আমি যখন গান গাহিতে যাই, তখন অন্তরে দুঃখই উদ্বেলিত হইয়া উঠে—সুখের কথা কোন্ সুদূরে পড়িয়া থাকে, মনেই আসে না। গানগুলিও যখন দুঃখে ভরিয়া উঠে, তখনই সেই গানগুলি যেন ভাল করিয়া ফোটে। তোমার দিকে চাহিয়া যখন সেই গানগুলি কাতরকণ্ঠে গাহিয়া তোমাকে শোনাই, তুমি তখন ছুটিয়া আসিয়া আমায় কোলে তুলিয়া কত-না সান্ত্বনার কথা বল, কত-না আদরে স্নেহে আমার চোখের জল মুছিয়া দাও। কিন্তু সুখের সুরে যখন গান রচনা করি, তখন তো তুমি এমন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমায় কোলে তুলিয়া লও না। বরঞ্চ মনে হয়, যখন সুখের গান গাহিতে থাকি, তখন তুমি এক পা এক পা করিয়া দূরে সরিয়াই যাও। তাই ইচ্ছা হয়, আমার সকল কাজ ফেলিয়া দুঃখের সুরেই গান রচনা করি, আর আমার প্রাণের দুঃখের কথায় সেই গানগুলি ভরিয়া দিই। মা! বড় দুঃখ হয়, যখন গাহিতে গিয়া দেখি, আমার কণ্ঠবীণার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ছেলেবেলায় তোমার আশীর্ব্বাদে কি সুকণ্ঠই না পাইয়াছিলাম। সেই কণ্ঠ হইতে যখন গানের সুর আকাশে পরতের পর পরত ভেদ করিয়া উঠিত, তখন তাহা তুমি যেখানেই থাকিতে তোমাকে সেখান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিত। কিন্তু আজ এই কণ্ঠ হইতে আর তেমন জোরে গান বাহির হয় না। গান গাহিব কি—গান গাহিতে গেলেই অক্ষমতার অশ্রু উছলিয়া উঠে। এখন আমার প্রাণের গুণ গুণ তোমার প্রাণে আপনা হইতেই ধাক্কা দেয়, তাই তুমি আপনিই ছুটিয়া আস; তুমি নিজে ধরা না দিলে আমিতো আর ধরিতে পারি না। আমি গান গাহি বা না গাহি, আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে গান বাহির হউক বা না হউক, তুমি দয়া করিয়া আমায় মাঝে মাঝে বারেকের জন্যও কোলে লইয়া আদর করিও, আমার চোখের জল মুছিয়া দিও, আমার মনপ্রাণ সবল করিয়া তুলিও।

১৫। মাতার দৃষ্টি।

মা! তোমার ঐ স্নেহে ভরা চাহনি কি সুন্দর! নিশীথের অন্ধকার যখন ঘুচিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রভাতের আলো তখনও ফুটিয়া উঠে নাই,

সেই উষাকালে আকাশের পানে প্রকৃতি যে দৃষ্টিতে চাহে, একমাত্র তাহারই সঙ্গে তোমার ঐ স্নিগ্ধ-দৃষ্টির তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। দিবসের আলো যখন ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাতের আঁধার তখনও নামিয়া আসে নাই, সেই সন্ধ্যাকালে আকাশের পানে প্রকৃতি যে দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, একমাত্র তাহারই সঙ্গে তোমার ঐ শান্তদৃষ্টির তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। চন্দ্রতারা যে দৃষ্টিতে সারা নিশি জগতের উপর চাহিয়া থাকে, একমাত্র তোমারই অনিমেষ মঙ্গল দৃষ্টিতে তাহার তুলনা পাইয়া মুগ্ধ হই। শতবিধ কর্ম্মের তরঙ্গে পড়িয়া তোমার ঐ দৃষ্টির উপর আমার দৃষ্টি সকল সময়ে স্থির রাখিতে পারি না। কিন্তু সময়ে সময়ে এক-আধবার ঐ শান্তস্নিগ্ধ মঙ্গল দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি পড়ে, তখনই ভবসাগরের ভীষণ তরঙ্গসকল কি আশ্চর্য্য রকমে শান্তভাব ধারণ করে—সমস্ত বিপদআপদ মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। মা! তুমি তোমার ঐ স্নেহদৃষ্টিতে আমাকে তোমার বুকের কাছে টানিয়া কি আশ্চর্য্য-ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাও, আবার কর্ম্ম সারা হইলে কি আশ্চর্য্যভাবে আমাকে তোমার বুকের কাছে টানিয়া আমার শ্রমজনিত সকল দুঃখকষ্ট, সকল জ্বালাযন্ত্রণা নিমেষের মধ্যে ঘুচাইয়া দাও, তাহা তুমিই জান। যদি কখনও আমি তোমা হইতে দূরে সরিয়া যাই, তবে আমার উপর তোমার ঐ স্নেহপূর্ণ মঙ্গল দৃষ্টি ফেলিয়া ফিরাইয়া আনিও। সংসারের বিষকণ্টকে আহত হইয়া যখন জ্বালা-যন্ত্রণায় বড়ই ছটফট করিতে থাকিব, তখন তুমি আমাকে কোলে লইয়া সুনির্ম্মল স্তন্যদানে আমার বল ও পুষ্টিবিধান করিও এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে তোমার স্নেহহস্ত বুলাইয়া জ্বালাযন্ত্রণা নির্ব্বাণ করিয়া দিও।

১৬। জীর্ণ তরী।

মা! আজ প্রভাত হইতে না হইতে টিপি-টিপি জল পড়িতেছে। আমারও প্রাণের উপর কি এক অজানা ঘন বিষাদ চাপিয়া পড়িয়াছে। লোকে বলে, মানুষ যখন ইহলোক ছাড়িয়া পর-লোকে চলিবার পথে দাঁড়ায়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার ইহলোকের সমুদয় ক্রিয়াকলাপ, ভালমন্দ যাহা কিছু সে করিয়াছে, সমুদয় তাহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া ছবির মত দাঁড়ায়। তখন সে ভাল যাহা কিছু করিয়াছে, তাহার জন্য উৎসাহ-পূর্ণ আশাবাণী তাহার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে পরলোকে যাইবার জন্য উৎসাহিত করে; আর, মন্দ যাহা কিছু সে করিয়াছে, তাহা দেখিয়া এবং তাহার ফল আলোচনা করিয়া তাহার অন্তরে যদি অনুশোচনা আসে, তবে সেই অনুশোচনার অশ্রুজলে তাহার সেই সমস্ত বিধৌত হইয়া যায় এবং সে পরলোকে নির্ম্মল হৃদয়ে অগ্রসর হইবার জন্য সহজে প্রস্তুত হয়। আমারও মনের সম্মুখে আজ আমার সারাজীবনের ভালমন্দ সমস্ত কর্ম্মই ছবির আকারে দাঁড়াইয়াছে। ভাল কাজ যাহা কিছু করিয়াছি, সে সমস্তই তুমি জান। মন্দ কাজ যাহা কিছু করিয়াছি, তাহারই ফল আলোচনা করিয়া অনুশোচনায় আমার প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কি সুন্দর দেহ দিয়াছিলে—যেখান দিয়া যাইতাম, চারিদিকে আনন্দের তরঙ্গ উঠাইয়া চলিতাম; কি সুন্দর মন দিয়াছিলে, বারেকের জন্য যাহা কিছু আলোচনা করিতাম তাহাই যেন পুরাতন হইয়া যাইত। কিন্তু এখন—দেহখানি তো শতচ্ছিদ্র জীর্ণতরী হইয়া গিয়াছে; নিজের দেহ দেখিয়া নিজেরই উপর ঘৃণা ও ধিক্কার আসে—ইচ্ছা হয়, নিজের হৃদয় স্বহস্তে উৎকীর্ণ করিয়া তোমার হাতে সমর্পণ করি, আর তোমারই কোলে সমস্ত জ্বালা ভুলিয়া চির-নিদ্রায় ভুলিয়া থাকি। আমার মনে নূতন কোন কিছুই আনন্দ দিতে পারে না—মনপ্রাণ সমস্তই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একমাত্র তোমার নাম, তোমার ধ্যানই আমার হৃদয়ে যেটুকু শান্তি আনে, আনন্দ আনে। অনুশোচনায় প্রাণ যে গেল—দিন-রাত অশ্রু ঝরিতেছে, তবুও তো তাহার অন্ত পাই না। মলয় বাতাস যখন ঝুরুঝুরু বহিতে থাকে, গাছপালা যখন বাতাসের সঙ্গে গ্রীবাভঙ্গ সঙ্গে আনন্দে খেলা করিতে থাকে, তখন আমি তাহাদের সেই আনন্দে যোগ দিতে পারি না বলিয়া অশ্রু বন্যার আকারে উদ্বেলিতবেগে ছুটিতে থাকে। সূর্য্যের আলো, চন্দ্রের আলো, কিছুই সহ্য হয় না। ইচ্ছা হয় তোমার চরণে যত কিছু অপরাধ করিয়াছি

মাটীর উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া দিনরাত কাঁদিতে থাকি আর তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি—যত দিন না তুমি মুখ ফুটিয়া আমাকে বল যে, আমাকে ক্ষমা করিয়াছ। এই রকম কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি মৃত্যুমুখে পড়ি, তাহাই কি তোমার ভাল লাগিবে ? আগে যেমন একটুখানি কাঁদিয়া ডাকিলেই তুমি ছুটিয়া আসিতে, কোথায় ব্যথা লাগিল জিজ্ঞাসা করিতে, এবং তোমার সঞ্জীবন-মন্ত্রে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ব্যথা দূর করিয়া দিতে, আজ তুমি সেই রকম একবার আসিয়া তোমার এই দুঃখকাতর সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও, অশ্রুবারি মুছিয়া দাও, আর এই ভাঙ্গা জীবনে যদি পার তো নবজীবনের এক-আধটু ছিটাফোঁটা দিও।

১১। সন্ধ্যায়।

মা! তুমিই তো আমাকে এই পথের এক-ধারে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছ। এখন আমি ধুলোকাদা লইয়া একটুখানি খেলা করিতেছি বলিয়া আমাকে ভুলিয়া যাইও না। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমার প্রাণে বড়ই আতঙ্ক জাগিয়া উঠিতেছে। আমি পথও চিনি না, আর তুমি ছাড়া আমাকে পথ দেখাইবারও কেহ নাই। জন্ম অবধি তোমারই সঙ্গে ঘুরিয়াছি ফিরিয়াছি। কখনও বা তুমি যেখানে রাখিয়া গিয়াছ, তাহা হইতে দূরে গিয়া কাঁটার বনে গিয়া পড়িয়াছি। কাঁটার আঘাতে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছি, রক্তাক্ত দেহে বাহির হইয়াছি। তখন তুমি আমার কান্না শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার সমস্ত রক্ত মুছিয়া দিয়াছ, আর কি এক যাদুমন্ত্রে সমস্ত ব্যথা দূর করিয়া দিয়াছ। কাঁটার বনে কত ভীষণ শ্বাপদ-সকল আমাকে ভয় দেখাইয়াছে, কতবার তাহাদের নখদন্তের আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু ঐ যে তোমার শান্তস্নিগ্ধ মুখ—উহাই আমার প্রাণে নিত্য জাগ্রত থাকিয়া নিত্য অভয় দান করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের শত বিভীষিকার মধ্যেও তোমার অভয়মূর্ত্তি জাগিয়া আমাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আমি খুব স্পষ্ট জানিতাম যে, উহারা আমাকে যতই কেন আঘাত করুক না, আমাকে প্রাণে মারিবার শক্তি উহাদের নাই। মা! উহারা আমাকে মারিতে না পারিলেও আমি উহাদের আঘাত সহ্য করিতে পারি না। আমি বড়ই দুর্ব্বল। আমাকে তুমি কোলে তুলিয়া বাঁচাও। কোলে না লও, আমাকে তোমার চরণের ধুলো হইয়া ঐ চরণের এক কোণে একটু-খানি দাঁড়াইবার স্থান দিও। তোমাকে যখন সকলে পূজা দিবে, আমিও তখন তাহাদের সেই পূজায় গোপনে যোগ দিয়া অনুপম আনন্দ লাভ করিব। আমার সকল ভালবাসা দিয়া কুসুমরচনা করিব, আর প্রতিমুহূর্ত্তে নিত্য নব পুষ্পে তোমার চরণপূজা করিব—তুমি জান বা নাই জান। যখন তোমার মনে পড়িবে, তখন অন্তত একবার আমায় কোলে লইয়া একটুখানি আদর করিও।

মৃত্যুর পরে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ক) কাল ও মৃত্যু

১। কালের তত্ত্ব দুরবগাহ্য।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়, মাসের পর মাস চলিয়া যায়, এইরূপে একএকটি বৎসরও কাটিয়া যায়। একটি বৎসর যখন কাটিয়া গেল, তখন আমরা জানি ও বলি যে, উহা কাল-পারাবারে বিলীন হইয়া গেল। এই বিলীন হওয়ার অর্থ যে কি, তাহা কথায় ব্যক্ত করা তো দূরে থাক, ভাবিতে গেলেও মাথা ঘুরিয়া যায়; মন তাহা মনন করিতে অসমর্থ হইয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই কাল কোথা হইতে আসিল আর কোথায় বা চলিয়া গেল; কত লক্ষ কোটি যুগযুগান্তর যে কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কে-ই বা তাহা বুঝিতে পারে, আর কেই বা তাহা বুঝাইতে পারে? তাহার জ্ঞান একমাত্র কালের স্রষ্টা, কিন্তু কালের অতীত মহাকাল পরম পুরুষেরই অন্তরে নিহিত আছে।

২। কাল ও স্থানের প্রভেদ।

দার্শনিকদিগের কেহ কেহ বলেন বটে যে, ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা বিভাগসূত্রে আমরা কালকে জানিতে পারি, অনুভব করিতে পারি; কিন্তু কালের অস্তিত্বই না থাকিলে আমরা বিভাগসূত্রেই বা তাহার অস্তিত্ব অনুভবে আনিতে পারি কি প্রকারে? কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক স্থান ও কালের অভেদ, অন্তত

আপেক্ষিক ঐক্য প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই উভয়কে পরস্পরের আপেক্ষিকত্বের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিয়া আপেক্ষিকত্বের ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা সফল হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের প্রকৃত ভেদ আমাদের সহজ বুদ্ধিতে বোধগম্য হয় না। স্থানকে আমরা স্থান-পারাবারে প্রকৃতপক্ষে বিলীন হইতে দেখি না। উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে একই স্থানে আমরা একবার ছাড়িয়া দশবার উপনীত হইতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে যে কাল অতীত হইয়া গেল, তাহাকে সত্যই বিশাল কালসাগরে বিলীন হইতে দেখি—সহস্র চেষ্টাতেও তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি না; সেই অতীত মুহূর্ত্তে কিছুতেই পৌঁছিতে পারি না। যে কাল অতীতে বিলীন হইয়া গেল, বলিতে গেলে সে কাল আমাদের দৃষ্টিতে সত্যই মৃত্যু-মুখে পতিত হইল।

৩। কাল ও মৃত্যু।

আশ্চর্য্য এই যে, এই কালের মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যু বিজড়িত; কালেরও প্রতি মুহূর্ত্ত যেমন অতীত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িতেছে, আমাদেরও জীবনের মুহূর্ত্তগুলিও সেইরূপ একে একে মৃত্যুমুখে পড়িয়া অতীতের গর্ভে বিশ্রাম লাভ করে।

কালের সহিত মৃত্যুর এই সম্বন্ধ অন্য কোন প্রাণী বুঝিতে পারে কিনা জানি না; কিন্তু মানুষ কালের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিলেও, কালের সহিত মৃত্যুর এই সম্বন্ধ যে ভাবে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সে জানে যে, কালের একএক মুহূর্ত্ত অতীতে হইতেছে, আর তাহার জীবনেরও এক এক মুহূর্ত্ত সেই সঙ্গে মৃত্যু-পথের পথিক হইতেছে। এইরূপে একএক মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইতে হইতে যখন তাহার ইহলোকের কার্য্য শেষ হইয়া যায় এবং যখন সে ভগবানের আহ্বানে ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তখনই সেই মৃত্যু-মুহূর্ত্তকেই আমরা সকলে প্রকৃত মৃত্যু বলিয়া অভিহিত করি।

(খ) মৃত্যু অমৃতসোপান

৪। মৃত্যুতে।

মৃত্যুকালে মানুষ ভাবিয়া আকুল হয় যে, সে তাহার প্রিয়জন এবং তাহার হাতে গড়া সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কার্য্য-সকল ফেলিয়া কোন্ অজানা অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়াছে—তাহার অনিচ্ছা সত্বেও কে তাহার দেহ-যন্ত্রখানি থামাইয়া লইতেছে। তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরাও আকুলিতচিত্তে চিন্তা করে যে, এই মুহূর্ত্ত যাহার নিকটে তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর পাইতেছিল, যাহার মুখে ও বাক্যে স্নেহ ও প্রেমের অমল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল, ঠিক পরমুহূর্ত্তে তাহার দেহ-যষ্টিখানি পূর্ব্বেও যেমন ছিল ঠিক তেমনই পড়িয়া রহিল, কিন্তু তাহা হইতে ডাকের আর সাড়া পাওয়া গেল না, শত চেষ্টাতেও পূর্ব্বের ন্যায় তাহার নিকটে স্নেহ-প্রেমের কোনই পরিচয় পাওয়া গেল না। সেই দেহযষ্টির ভিতরে এমন কে একজন ছিল, যাহার অভাবে সংসারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, আত্মীয়স্বজন সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল?

৫। মৃত্যুতে আত্মসন্ধান।

এইরূপে মানুষ যখন তাহার চারিদিকে একএকটি করিয়া অনেকগুলি মৃত্যু সংঘটিত হইতে দেখিল, মানব-হৃদয়ে মানব-জীবনের অসারতা ততই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাহার ফলে ক্রমে মানুষের অন্তরে এই অনুসন্ধান জাগিয়া উঠিল যে, এই দেহের মধ্যে কে অবস্থিতি করিয়া দেখা, স্পর্শ করা, শোনা, মনন করা ও জানা, এ সমস্ত কার্য্য করে, এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পর মুহূর্ত্ত অবধি কাহার অভাব হইল যে, তাহার নিকট হইতে ঐ সকল কার্য্যের একটিরও সাড়া পাওয়া যায়?

৬। মৃত্যুতে পরমাত্মসন্ধান।

মানুষ এই চিন্তা হইতে আরও গভীরতর চিন্তারাজ্যে গিয়া ভাবিতে লাগিল যে, এই দেহের অন্তরে দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতিরূপে যে-ই কেন ছিল হোক না, সে যখন নিজের ইচ্ছাতে এই দেহ অবলম্বনে এই পৃথিবীতে আসেও নাই এবং নিজের ইচ্ছাতে এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেও চাহে নাই, তখন সে কাহার আদেশেই বা আসিয়াছিল, আর কাহার আদেশেই বা চলিয়া গেল? এই প্রকারে মৃত্যুবিষয়ক চিন্তা মানুষকে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কেবলমাত্র আত্মসন্ধানে প্রবৃত্ত করে নাই, কিন্তু আত্মার ভিতর দিয়া পরমাত্মসন্ধানেরও পথ দেখাইয়া দিল।

৭। মৃত্যু অমৃত সোপান।

ইহার ফলে মানুষ অধ্যাত্মরাজ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেল। কেবল অধ্যাত্ম রাজ্যের কথাই বা বলি কেন, এই মৃত্যু এবং তাহার নিবারণের উপায়বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে শারীর বা বহিঃপ্রাকৃতিক এবং মানস বা অন্তঃপ্রাকৃতিক, এই উভয় রাজ্যে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে সে অনেক দূর অগ্রসর হইল। এক কথায়, মৃত্যুর ফলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের রাজ্যে প্রবেশ করিবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল—মানুষ অমরণধর্ম্মা হইবার অধিকারলাভের পথে চলিল। এই কারণে আমরা কবির সহিত এক হৃদয়ে বলিতে পারি "মৃত্যু যে, সে অমৃত-সোপান"। মৃত্যু যে প্রকৃতই অমৃত-সোপান এবং মৃত্যুর ভিতর দিয়া যে, সত্যই জীবন লাভ করা যায়

তাহা কঠোপনিষদের যমনাচিকেত-সংবাদে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

৮। মৃত্যু নিশ্চিততম বস্তু।

মৃত্যুই আমাদিগকে অমরণধর্ম্মা করিবার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান সহায়, এবং সর্ব্ববিধ উন্নতি ও মঙ্গলের কারণ বলিয়াই ভগবানের মঙ্গল বিধানে মৃত্যু জগতে সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিততম বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরা অকারণে এই মৃত্যুরই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠি। মৃত্যু আমাদিগকে চারিদিকেই ঘিরিয়া আছে। আমাদিগের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, আমরা কোন রকমে উহার হাত এড়াইয়া যাইতে পারি। মৃত্যুর পরে অপর কোন লোকে আমাদের জন্মগ্রহণ করিতে হইবে কি না এবং হইলেও কে কোন্ লোকে জন্মগ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ থাকিলেও মৃত্যুর অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; প্রত্যেক প্রাণীকে যে মৃত্যুর কবলে কোন না কোন সময়ে পড়িতে হইবে, ইহা ধ্রুব সত্যরূপে সকলেই জানে।

(গ) ভগবানের রাজ্যে বিনাশ নাই।

৯। মৃত্যু—জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ ও নববস্ত্র পরিধান।

গীতা মৃত্যুর একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন—জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান। অন্য কোন ভাষায়, অন্য কোন দেশের কোন গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বে মৃত্যুর স্বরূপ এমন সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া জানি না। সংজ্ঞাটি খুবই ঠিক। সেই মহাপ্রাণ হইতে এক কণামাত্র প্রাণ লইয়া এই অসংখ্য অসংখ্য মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তন্মধ্যে কে কোন্ লোকের উপযুক্ত আকার ধারণ করিয়া কোন্ লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে বা করিবে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা গীতার সঙ্গে একবাক্যে এইটুকু বলিতে পারি যে, মৃত্যুর পরে আত্মা ইহলোকের জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গিয়া তথায় বিচরণ করিবার উপযুক্ত নবতর দেহ ধারণ করিবে নিঃসন্দেহ। সেখানেও সেই মহাপ্রাণ হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিব না—সকল প্রাণের উৎস সেই মহাপ্রাণের ক্রোড়েই এখানকার ন্যায় সেখানেও বাস করিতে থাকিব।

১০। দেহের বিনাশ হয় কি না?

মৃত্যুতে আমাদের দেহ যে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তাহাও নহে—বিধাতার রাজ্যে বিনাশ বলিয়া কোন কিছু স্থান পাইতে পারে না। এই শরীর ধ্বংস হইল, ইহার পরমাণুসকল বিশ্লিষ্ট হইল, কিন্তু তাহা চিরকালের জন্য নহে। দেখা যায়, রূপান্তরে সেই সকল পরমাণু বিভিন্ন আকারে সংসৃষ্ট ও সংহত হইয়া নবতর কোন কিছুর জন্মদানে প্রবৃত্ত হইল।

১১। আত্মা কি?

ইহা ব্যতীত অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের বিষয় আলোচনা করিয়া যতদূর বোঝা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, মৃত্যুর পরেও মানবদেহের পরমাণুসকলের সূক্ষ্মতত্ত্বসকল সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়া একটা কোন কিছুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে গন্ধ লইয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুকালে পূর্ব্বশরীরের ভাবসকল নবতর অন্য ভাবসমূহের সহিত মিলিত হইয়া এক নবতর শরীরের জন্মদান করে, এবং এই নবতর শরীর একটা কোন কিছুকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে। সেই কোন কিছুই হইল আত্মা।

দেহস্থিত ইন্দ্রিয়সকলের মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নহে। আমরা অন্তরের নিভৃত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব যে, কি বহিরিন্দ্রিয় কি অন্তরিন্দ্রিয় মন, এই সকলকেই পরিচালনা করিবার জন্য আর একটি কিছু আছে, যাহা এই সকলের ভিতর দিয়াই বাহিরের ও ভিতরের সকল কার্য্যই করিয়া থাকে, অথচ সেই সকল কার্য্য হইতে এবং সেই সকল কার্য্য করিবার ইন্দ্রিয়গণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; সেই কোন-কিছুই হইল আত্মা।

১২। আত্মার বিনাশ নাই।

এই শরীরের যখন বিনাশ রহিল না, তখন এই শরীর পরিধিরূপে যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, যে আত্মা ইহার কেন্দ্রস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া ইহাকে মননাদি শতবিধ কার্য্যে নিয়োজিত করে, একমাত্র যাহার ইচ্ছাই ইহাকে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে, এই দেহের বিশ্লেষণমূলক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বা চিরস্থায়ী "আমি"র যে বিলোপ হইতে পারে না, তাহা বোধ হয় নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

১৩। আত্মার অবিনশ্বরত্বের অনুভূতি।

আমাদের শেষ যে কোথায়, ইহলোকে থাকিয়া তাহা তো জানিতে পারি না-ই; মৃত্যুর পরে কখনো যে তাহা জানিতে পারিব, তাহাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমাদের শেষ কোথায় তাহা জানিতে না পারিলেও আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা হইতে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঁচিবার ইচ্ছা হইতে আমাদের আত্মাতে প্রতিভাত হয় যে, মৃত্যুর পরে আত্মার বিনাশ নাই। অনেকে বলেন, আত্মার অবিনশ্বরত্ব উপলব্ধি করা আমাদের শক্তির অতীত। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। মৃত্যুর পরে আত্মা কোন্

আকার গ্রহণ করিবে বা কি অবস্থায় থাকিবে, তাহা আমাদের সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় না হইলেও, পূর্ব্বোক্তরূপ ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিবার কারণে বোধ হয় ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে, দেহ ভস্মীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও ভস্মীভূত হইবে না।

১৪। কার্য্যের কর্ত্তারূপে আত্মার উপলব্ধি।

জগৎ আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করি, মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব শত চেষ্টাতেও হয়তো সে ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব না; কিন্তু যে ভাবে আমাদের আত্মাকে দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্যের, চিন্তা ও মনন প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধি করি, মৃত্যুর পরে সেভাবে অর্থাৎ কার্য্যের কর্ত্তারূপে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখি না।

১৫। প্রকৃতি অবলম্বনে আত্মার উপলব্ধি।

আমরা প্রকৃতি অবলম্বনেই প্রকৃতির যাহা কিছু বিচার-আলোচনা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। প্রকৃতির অতীত হইয়া প্রকৃতির কোন কিছু আলোচনা করিবার অধিকার পাই নাই। ভগবানের মঙ্গল বিধানে আমরা প্রকৃতিতে দেখি যে, ক্ষুধা দূর করিবার জন্য অন্নের ব্যবস্থা আছে, তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য জলের ব্যবস্থা আছে; তখন আমরা ইহা কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি না যে, যে ইচ্ছাশক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদিগকে উন্নতির পথে আকর্ষণ করিতে বিরত হয় না, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে যে অদম্য তীব্র জ্ঞানপিপাসার শেষ হয় না, এবং যে স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার বিরতি হয় না, সেই ইচ্ছাশক্তি, সেই জ্ঞান-পিপাসা, সেই স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি উপযুক্ত পাত্রে ও ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া শান্ত করিবার অবসর ইহ-লোকে যদি বা না পাওয়া যায়, মৃত্যুর পরে লোকান্তরে প্রকৃতির নিয়মেই আমরা সেই অবসর যে প্রাপ্ত হইব, তাহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি; এবং তাহা হইলে, ঐ ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির উৎস আত্মারও মৃত্যুর পরে অস্তিত্ব স্বীকার করা অসঙ্গত নহে। আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে সকল ইচ্ছা, জ্ঞান-পিপাসা, ভক্তি বা প্রেম এ লোকে সার্থক হইবার অবসর পায় নাই, লোক-লোকান্তরে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে, সে সকল কেবল যে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে তাহা নহে, পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিরবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এবং আমাদিগকে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় পরিচালিত করিতে থাকিবে।

(খ) মৃত্যু জীবনের উৎস।

১৬। মৃত্যুর পরে প্রশস্ততর কর্ম্মক্ষেত্র।

আমাদের ক্ষণভঙ্গুর দেহের কারণে আমরা আমাদের প্রত্যেক চিন্তায় ও কার্য্যে সীমার বাধা প্রাপ্ত হই। শক্তির অতিরিক্ত চিন্তা করিতে গেলে মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া যায়, এবং ক্ষমতার অতিরিক্ত ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে গেলে শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত এই প্রকার ইচ্ছা ও চেষ্টার অস্তিত্ব হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, মৃত্যুর পরপারে আমাদের জন্য প্রশস্ততর কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকিবে, এখানকার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সীমার গণ্ডী নিশ্চয় কাটিয়া যাইবে। এই ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিবার কারণেই মৃত্যুর পরে আমরা বিলুপ্ত হইয়া যাইব, আমাদের কোন প্রকার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না, এরূপ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। ভগবানের মঙ্গল বিধানে মৃত্যুই আমাদের জীবনের উৎস। প্রতি মুহূর্ত্তে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে দ্রুত অগ্রসর হইবার জন্য আমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও চেষ্টা জাগ্রত হয়। এ সংসারে বৃথা কালক্ষেপণ করাইবার সহায় অসংযত আমোদ-প্রমোদ হইতে উন্নতি ও মঙ্গলের নিদান প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে মৃত্যুই আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া আনে; হাস্য-পরিহাস ও দ্বন্দ্ব-বিবাদের বৃথা কোলাহল-কলরব হইতে নিবৃত্ত করিয়া মৃত্যু আমাদিগের অন্তরকে গাম্ভীর্য্য ও সাধুভাবে পূর্ণ করিয়া দেয়। আমরা মৃত্যুর দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হই। তাই মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ অবধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শতবিধ আকার-প্রকারে, মানুষের কার্য্যে ও কাব্যে মৃত্যুর কথা এবং মৃত্যু-সোপানে জীবনলাভের কথা অনুদিন ফুটিয়া উঠিতে চাহে।

১৭। মৃত্যুর পরে সংশয় নাশ।

আমরা যদি কোন বিষয় বা বস্তুকে ধ্যান করি, অর্থাৎ নিবিষ্টচিত্তে অনন্যমনে তাহার বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। কারণ তখন তাহাকে যথাসম্ভব তাহার নানাবিধ সীমার সঙ্কীর্ণতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক-রূপে চিন্তা করি। যখন আমরা আমাদের আত্মাকে এই দেহের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক দেখিতে পাইব, মৃত্যুর পরবর্ত্তী সেই অবস্থায় মনে হয় আমাদের অনেক সংশয় মিটিয়া যাইবে, অনেক বিরোধ-বিবাদের অবসান হইবে, সমস্ত প্রকৃতির সহিত এবং প্রকৃতি অধিপতি পরমাত্মার সহিত আত্মার এক আশ্চর্য্য যোগ এবং অনন্তসুখপূর্ণ মিলন নবতরভাবে অনুভূত হইবে।

কি কারণে আমরা জানি না, ইহলোক হইতে পরলোকের প্রতি আমরা সামান্য উঁকিঝুঁকি মারিবার ক্ষমতা রাখি। কিন্তু সময় সময় সাধনের পথে যে সকল সাধু-মহাত্মা অগ্রসর হইয়াছেন, যাঁহাদের দৃষ্টিতে পরলোক হস্তস্থিত পুস্তকের ন্যায় উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নিকট আমরা এই সত্যবাণী প্রাপ্ত হই এবং আমাদের অন্তরও তাহাতে সায় দেয় যে, মৃত্যুর পরে আমাদের সঙ্কীর্ণতার সীমা অনেকটা ঘুচিয়া যাইবে এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্রেম-ভক্তির দিব্য পথ বহুলরূপে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

নিম্ন জাতিগণের প্রতি সুবিচার।

(জনৈক শিক্ষক)

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এখন আমরা সভ্যতার উচ্চ শিখরে দাঁড়াইলেও এক সময়ে আমরা বর্ব্বর জাতিগণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং অসভ্য জাতি হইতেই আমরা সমুদ্ভূত হইয়াছি। পাশ্চাত্য জাতিগণ সাধারণতঃ মনে করে, অবশ্য অহঙ্কারে, তাহারা ব্যতীত অন্য যে কোন দেশে যে কোন জাতি আছে, তাহারা সকলেই কম-বেশী অসভ্য ও তাহাদের নিজেদের তুলনায় নিম্নজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইংরাজেরা যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতবাসীদিগকে অনাবৃতদেহে থাকিতে দেখিয়া এবং অনেক কাঁচা ফলমূল খাইতে দেখিয়া অসভ্য মনে করিত; এমন কি, অনেক ইংরাজ পর্য্যটক তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তেও ভারতবাসীকে "অ সভ্য" অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপের আদিমনিবাসীদিগের সহিত একপর্য্যায়ে ফেলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ক্রমে ভারতের উচ্চতম সভ্যতা দেখিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের সে ধারণা চলিয়া গিয়াছে, সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে কি না বলা যায় না। পাশ্চাত্য জাতিদিগের সাধারণতঃ এই ধারণা ছিল যে, যে সকল জাতির দেহচর্ম্ম তাহাদের মত শ্বেতবর্ণ নহে, তাহারাই মোটের উপর "অসভ্য" বা আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত। তাই তাহারা কথায় কথায় ভারতবাসীদের প্রতি "কেলে" "কৃষ্ণ" "darkie" প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগে নাসিকাকুঞ্চিত করিতে খুবই তৎপর দেখা যায়। এমন কি, ভক্তিভাজন রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বিলাত যান, তখন তাঁহারও পিছনে ইংরাজ বালকেরা "darkie" প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে কেউ ডাকিতে ডাকিতে চলিত—তাঁহার রাস্তায় বাহির হওয়াই মুস্কিল হইয়াছিল।*

দেশবিদেশের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে বোধ হয় পাশ্চাত্য জাতিরা বুঝিয়াছে যে, সাদা চামড়া হইলেই যে সভ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই; আর কাল বা তামাটে রংয়ের চামড়া হইলেই যে অসভ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর আমরা আশা করি, পাশ্চাত্যদিগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া এখনও আমরা এবিষয়ে সুনিশ্চিত হইতে পারি নাই।

নিষ্ঠুরতা দ্বেষ হিংসা, অন্যের সর্ব্বনাশসাধনে অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি যদি বর্ব্বরোচিত অসভ্যতার পরিচায়ক হয়, তবে আমাদের ইহা বলিবার অধিকার আছে যে, পাশ্চাত্য জাতিরা আজ পর্য্যন্ত আদিম মানবের উপযুক্ত বর্ব্বরতা ও অসভ্যতা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে নাই।

আমরা বর্ত্তমানে আপনাদিগকে সভ্যজাতি বলিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেও ইহা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এক সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অসভ্য অবস্থাতেই কাল যাপন করিত—অনাবৃত দেহে পশুহিংসা করিয়া এবং পশুদিগের কাঁচা-মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত। হিংস্র পশুদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহারা কখনও বা গাছের উপরে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত আর কখনও বা রৌদ্র-বৃষ্টির দৌরাত্ম্য এড়াইবার জন্য পর্ব্বতের গুহায় বাস করিত। তাহারা ক্রমশঃ চাষ করিতে আরম্ভ করিল এবং অগ্নি আবিষ্কার করিয়া কাঁচা মাংসের পরিবর্ত্তে মাংস প্রভৃতি অগ্নিপক্ক করিয়া খাইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহারা প্রয়োজন অনুসারে গো, অশ্ব, কুকুর প্রভৃতি পশুদিগকে স্ববশে আনিয়া পোষ মানাইতে লাগিল এবং তাহাদিগকে আপনাদিগের কার্য্যের সহায়রূপে প্রস্তুত করিয়া লইল। তাহারা পর্ব্বতগুহা এবং বৃক্ষের উপরস্থ বাসা পরিত্যাগ করিয়া গৃহাদিনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। তখন নিকটস্থ ও দূরস্থ প্রতিবেশীগণের সঙ্গে কথোপকথন চালাইবার জন্য ভাষা রচনা করিতে বাধ্য হইল। যতদূর জানা যায়, কহিবার ভাষা প্রচলিত হইবার বহু পরে লিখনপ্রণালী আবিষ্কৃত হয়। দেখা যায়, প্রথম প্রথম মানুষ মনের ভাব চিত্রের দ্বারাই ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হইত। তাহাতে নানাবিধ গুরুতর অসুবিধা দৃষ্ট হওয়ায় ক্রমশঃ লিখিবার অক্ষরসমূহ উদ্ভাবিত হইল। বলিবার ও লিখিবার ভাষা যতই ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে

* ইউরোপপ্রবাসীর পত্র।

লাগিল, মানুষও ততই উন্নতির অভিমুখে দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিল।

বিভিন্ন দেশের অধিবাসীগণ যে একই প্রকার ক্ষিপ্রগতিতে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। দেশ কাল ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন জাতি সভ্যতা ও উন্নতির বিভিন্ন সোপানে আরোহণ করিয়াছে। এখনও জগতে অনুন্নত ও অসভ্য অবস্থায় অনেক জাতি আছে দেখা যায়; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে সকলেই নিষ্ঠুর এবং বর্ব্বরাধম, তাহা বলা যায় না। ঐ সকল জাতির মধ্যে এমন কোন কোন জাতি আছে, যাহারা বর্ত্তমানের সভ্যতাভিমানী জাতিসমূহকেও তাহাদের কল্যাণপ্রদ অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারে। আমাদের এই ভারতবর্ষেই আমরা সাঁওতাল প্রভৃতি অনেক জাতিকে অসভ্য বলিয়া থাকি; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, উত্তর ভারতের সাঁওতাল প্রভৃতি এবং দক্ষিণ ভারতের কুরুবর আদি তথাকথিত অসভ্য জাতিগণের মধ্যে প্রতারণা, মিথ্যাকথা প্রভৃতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বরঞ্চ দেখা যায়, সভ্যতার সংস্পর্শে এই সকল পাপ তাহাদের মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছে। রাঁচি প্রভৃতি স্থানে একই অসভ্য জাতি, পূর্ব্বপুরুষাদগের ধারায় চালিত এবং সভ্যতার "আলোকপ্রাপ্ত" এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য দেখিলেই উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।

দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি নানা স্থানের পর্য্যটকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে দেখা যায় যে, তথাকার অধিবাসীগণ দয়া প্রভৃতি নানাবিধ সদ্গুণে বিভূষিত ছিল। সভ্যজাতিগণ যাহাদিগকে অসভ্য বলিয়াছেন, তাহারাই এক সময়ে আফ্রিকাপর্য্যটক লিভিংষ্টোনের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার ফলে হইল কি? সভ্য (?) পাশ্চাত্যজাতি তাহাদিগকে শতবিধ পাশজালে আবদ্ধ করিয়া অত্যাচারপ্রপীড়িত করিয়া তুলিল। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে স্পেনবাসীগণ প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অত্যাচার ও রোগসংক্রমণের দ্বারা নিতান্তই জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় "বুশম্যান" বা গুল্মবাসী বলিয়া এক জাতি আছে। পাশ্চাত্যদিগের মতে এই জাতি অসভ্যতার নিম্নতম সোপানে অধিষ্ঠিত। কিন্তু পর্য্যটকেরা বলেন, তাহারাও নানা সদ্গুণে বিভূষিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং দলবদ্ধ হইয়া শিকারে বহির্গত হয়। যখন আহারের জন্য তাহারা কোন পশু বধ করে, তখন তাহাদের কেহ একাকীই তাহা গ্রহণ না করিয়া দলভুক্ত সকলের সঙ্গে ভাগবণ্টন করিয়া লয়। দলের যদি কেহ কোন কারণে আহত হয়, তবে সকলে মিলিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করে, আহত ব্যক্তিকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য পথের ধারে ফেলিয়া চলিয়া যায় না।

একবার একটী গুল্মবাসী নদীতে ডুবিয়া যাইতেছিল। তাহার সহচরবর্গ তাহাদের চর্ম্মনির্ম্মিত পরিধেয় তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিয়া নদীর বরফগলা শীতল জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং সেই জলমগ্ন সঙ্গীটিকে কূলে উঠাইয়া আনিয়া আগুনের সেক দিতে লাগিল এবং তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিল।

গুল্মবাসী স্ত্রীলোকেরা তাহাদের সন্তানগণের প্রতি এতই স্নেহপ্রবণ যে, সন্তান বিপদের সম্মুখীন হইলে মাতা নিজের বিপদআপদ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। একবার এক ইউরোপীয় কোন গুল্মবাসী বালককে "ক্রীতদাস" করিবার অভিপ্রায়ে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিল। তাহার জননী ধরা পড়িয়া ক্রীতদাস হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও পুত্রের উদ্ধারকামনায় ইউরোপীয়ের সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গুল্মবাসীদিগের অনুরূপ হটেন্‌টড্‌ বলিয়া আর এক জাতি বাস করে। তাহারাও চর্ম্মনির্ম্মিত, গলা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বমান একপ্রকার যে "আলখাল্লা" দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত রাখে, সেই পরিধেয়খানি যতদিন না টুকরা টুকরা হইয়া ছিঁড়িয়া যায়, ততদিন তাহারা উহা পরিত্যাগ করে না।

কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন একটি সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে, যাহার জন্য তাহারা আমাদের সকলেরই নিকট প্রশংসা পাইতে পারে। যদি কোন হটেন্‌টড্‌কে একাকী ভোজন করিতে হয়, তবে সে বড়ই অসোয়াস্তি বোধ করে; তাহার নিকট দিয়া ভোজনের সময় যদি কেহ চলিয়া যায়, অপরিচিত হইলেও সে তাহাকে ডাকিয়া একত্র ভোজন করিতে বসে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসীগণ আর একটি অসভ্য জাতি। শ্বেতাঙ্গগণ তাহাদিগকে "কালা আদমী" বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শন করে। তাহাদের অতি অল্পসংখ্যকই অবশিষ্ট আছে। তাহারা নরভুক্ বটে, কিন্তু তাহারা নিজেদের দলের লোককে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে—দুর্ব্বল ব্যক্তিকে যত্ন করে, বৃদ্ধদিগের সেবা করে, এবং পীড়িতদিগের শুশ্রূষাবিধান করে। ডেভিড কার্নেগী নামক এক ব্যক্তি স্বর্ণখনির সন্ধানে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি বলেন, সেখানে এক আদিমনিবাসীর কুটীরে গিয়া তিনি দেখেন যে, এক

বেচারী শিশু একটী বৃদ্ধকে জাপটাইয়া ধরিয়া আছে। শিশুটীর চক্ষের পাতায় ক্ষত হইয়াছিল এবং তাহাতে মাছি বসিতেছিল। কারনেগী তাঁহার সঙ্গে যে ঔষধপত্র লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটী ঔষধ বাহির করিয়া শিশুর চক্ষু ধুইয়া দিলেন। ফলে চক্ষুটী ভাল হইয়া গেল। বৃদ্ধ ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষ পাইয়াছিল, তাহা নানা ভাবভঙ্গীসহকারে প্রকাশ করিতে লাগিল। কারনেগী তাঁহার পর্য্যটনের শেষে আবার যখন এই কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বৃদ্ধটী একটী "মোট" সহ অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিল এবং তাঁহাকে ঐ মোটটী উপহার দিল। ঐ মোটটির ভিতরে একখানি বৃহৎ কাষ্ঠ ছিল—তাহার দুই পৃষ্ঠেই নানারকমের ছবি খোদাই করা। আদিমনিবাসীগণ ভাবিল যে, ইহা কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের জন্য উপহার দিবার উপযুক্ত একটী মূল্যবান বস্তু। কারনেগী উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইলেন। তাহারা অসভ্য হইলেও কারনেগী-কৃত উপকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।

আমেরিকার উত্তরভাগে সুমেরু-কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে এস্কিমো বলিয়া এক অসভ্য জাতি দেখা যায়। তাহাদের কেহ যদি অনেক টাকাকড়ি পায়, তবে সে তাহা দ্বারা এক-রাশ জিনিসপত্র কিনিয়া নিজেই ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু সকলের সহিত মিলিয়া জুলিয়া ভোগ করিতে চায়। সে একটি সভা আহ্বান করে এবং বড় রকমের একটি ভোজ দেয়। সেই ভোজ উপলক্ষে সমাগত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সে তাহার ধনরত্ন ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া দেয়। উত্তর আমেরিকার উকেরা নদীর তীরে এক ধনী এস্কিমো পরিবার বাস করিত। ঐ পরিবারের কর্ত্তা এই প্রকারে এক ভোজ দিবার পর, এক শতচ্ছিদ্র চর্ম্মবস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার দশটী বন্দুক, দশটী চর্ম্মবস্ত্র, দুইশত স্ফটিকমালা, অনেকগুলি কম্বল, দশটী নেকড়ে বাঘের চামড়া, দুইশত বীবরচর্ম্ম, পাঁচ শত "সেব্‌ল্"-চর্ম্ম, এই সকল বস্তু দান করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এস্কিমোদের পক্ষে উপরোক্ত বস্তুগুলি বহুমূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কর্ত্তাটী এই সকল বিতরণ করিবার সময় উপস্থিত তাহার বন্ধুবর্গকে বলিল যে, "এখন আমি তোমাদের সকলের চেয়ে গরিব হইলাম; কিন্তু তোমাদের যে বন্ধুতা ও ভালবাসা লাভ হইল, ইহাতেই আমি খুসী"।

এস্কিমো প্রচুর পরিমাণে আহার করিতে পারে; এমন কি, কখন কখন একদিনে বারো সের মাংস খাইয়া শেষ করে। শীতের কারণে এইরূপ প্রচুর আহার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তথাপি দেখা গিয়াছে যে, এস্কিমো পিতা তাহার সন্তানের জন্য খাদ্য সঞ্চিত রাখিবার উদ্দেশ্যে একাধিক দিন বিনা আহারে দিনপাত করিয়াছে।

এসিয়া মহাদ্বীপের উত্তরে রাশিয়ার উত্তরভাগে "লেখা" নদীর তীরে "বুরিয়াট্" নামে এক জাতি বাস করে। ইহাদের কেহ যদি তাহার সমস্ত ধন খোয়াইয়া বসে, তবে সে আহারের জন্য এক প্রতিবেশীর গৃহে উপস্থিত হয় এবং সেখানে অগ্নিপার্শ্বে প্রতিবেশীর সঙ্গে একত্র ভোজনে বসিয়া যায়, অনাহূত অতিথি হইলেও তাহাকে কেহ বাধাপ্রদান করে না। এই জাতি বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত—বাপ, ছেলে, নাতি প্রভৃতি লইয়াই এক-একটি পরিবার গঠিত হয়। এক-একটি পরিবারের অধীনে যে সমস্ত ক্ষেত থাকে, সেগুলি পরিবারস্থ সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া ধরা হয়। যদি কোন পরিবারের পশ্বাদি ঝড়ে, রোগে বা অন্য কারণে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ধনী পরিবার সেই পরিবারকে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি দিয়া নূতন করিয়া সংসার গুছাইয়া লইবার অবসর প্রদান করে। কতকগুলি পরিবার লইয়া এক-একটী দল গঠিত হয়। প্রতি বৎসর একবার করিয়া এই দলের একটী সভা আহূত হয়; সেই সভায় আসিবার সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক মাসের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। সমস্ত খাদ্য সাধারণ পাকশালায় রন্ধন করা হয়। এক মাস ধরিয়া সমাগত লোকেরা শিকারে নিযুক্ত থাকে। শিকারে যে যাহা কিছু পায়, সে সমস্তই দলস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

এইরূপে দেখা যায় যে আমরা যাহাদিগকে অসভ্য জাতি বলি, তাহাদেরও মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহারা আপনাদিগকে সভ্য জাতি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে, সেই সকল তথাকথিত সভ্য জাতিদিগের সংস্পর্শে আসিয়া কোথায় তাহারা আরও অনেক সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিবে, না, তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা নিজেদের সদ্‌গুণ তো হারাইয়া বসেই, অধিকন্তু সভ্য (?) জাতিদিগের নানা অসদ্‌গুণ আয়ত্ত করে।

আমি রাঁচিতে গিয়া ইহার যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চলে একই অসভ্যজাতি, পূর্ব্বপুরুষদিগের ধারায় চালিত এবং সভ্যতার "আলোকপ্রাপ্ত" মোটামুটি এই দুইভাগে বিভক্ত দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যজাতির যে সকল পরিবার স্ব-ধর্ম্ম বা পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত

আচার-ব্যবহার রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহারা এখনও সত্যপরায়ণ, অব্যভিচারী, পরস্পরের সাহায্যকারী রহিয়াছে। যে সকল পরিবার সভ্যজাতিদিগের প্রচারিত খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের আচার-ব্যবহারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মিথ্যা-পরায়ণতা ব্যভিচার এবং সকল দোষের প্রধান মূল সুরা-পান যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে খৃষ্টীয় মিশনের কর্তৃপক্ষগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, খৃষ্টধর্ম অবলম্বনের ফলে তাহাদিগের অবনতিই ঘটিয়াছে। ইতিহাসে পড়া যায়, স্পেনবাসী প্রভৃতি সভ্যজাতিদিগের সংস্পর্শেই ভয়াবহ সংক্রামক রোগসমূহ অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে সে সকল রোগ তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাত ছিল। সভ্যজাতিরাই সভ্যতার দোহাই দিয়া চারিদিকেই অসভ্য জাতিদিগের ধন-রত্ন ও ভূমি, গো, অশ্ব প্রভৃতি অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে চৌর্য্যবৃত্তি অনেকাংশে শিখাইয়াছে, ইহা জানা কথা। আবার, অপহরণের প্রতিবাদ করিবার ফলে সভ্যজাতির গোলা-গুলির মুখে শত শত অসভ্য ও তথাকথিত অসভ্য (?) প্রাচীন জাতি-সমূহের বিনাশ ও বিলোপ সাধিত হইয়াছে, ইহাও ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। পাশ্চাত্যগণ কৃতদাসপ্রথা অনেক পরিমাণে উঠাইয়া দিয়াছেন সত্য; কিন্তু এখনও বিভিন্ন স্থানে অধীনস্থ প্রজাদিগের উপর তাহাদিগের যে ভীষণ অত্যাচারকাহিনী শোনা যায়, তাহা কৃতদাসপ্রথার অত্যাচার হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম যে, আফ্রিকার অন্তর্গত কঙ্গোরাজ্যে তথাকার প্রভু বেলজীয়গণ তাহাদের আদেশ অমান্য করিবার কারণে স্থানীয় মজুর প্রভৃতির নাক-কাটা, হাতের আঙ্গুল-কাটা, পা-কাটা প্রভৃতির ভীষণ দণ্ড প্রদান করিয়াছে। এই অমানুষিক পীড়ন-কাহিনী পড়িয়া সভ্যতাভিমানী বেলজীয়দিগকে সভ্য তো দূরে থাক, মানুষ বলিয়া মনে হয় না—নরাধম পশু বলিতে ইচ্ছা হয়।

সভ্যতার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, মনুষ্যমাত্রেরই, সভ্য হউক বা অসভ্য হউক, অন্তরে মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তোলা। অত্যাচার ও পীড়নের দ্বারা সে উদ্দেশ্য কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না। সে উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান উপায় দয়া, মৈত্রী, সত্যপরায়ণতা, অব্যভিচার প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও সাধুভাবের সাধন। আমরা দেখি, সুরা প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য ব্যবহারের ফলে ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়। ইহা দেখিয়াও অনেক পাশ্চাত্যজাতি মাদকদ্রব্য ব্যবহারকে আয়ের উপায়স্বরূপে গণ্য করিয়া তাহাদের অধীনস্থ দেশে ও জাতিসমূহের মধ্যে উহা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইতে দ্বিধা করে নাই। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, ইহা দ্বারা কেবল শাসিত জাতিসমূহের নহে, কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে শাসকদিগেরও ধ্বংসের মূল প্রোথিত করা হয়। এই যে বৌদ্ধধর্ম্ম সময়ে এসিয়ার এক প্রান্ত হইতে আমেরিকার অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং এখনও ইহার প্রভাব সভ্যজগতে সর্ব্বত্র সবল আকারে অনুভূত হইতেছে, ইহার কারণ, ধর্ম্মের অঙ্গরূপে বৌদ্ধদিগের দয়া, মৈত্রী প্রভৃতির সাধন এবং দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতির বর্জ্জন। পাশ্চাত্য সভ্যতা-ভিমানী জাতিগণ যদি অন্যান্য জাতিসমূহের অন্তরে তাঁহাদের সভ্যতা প্রবিষ্ট করাইয়া সত্যই স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিতে চান, তবে মার্কিনদিগের অযথা নিগ্রো-বধের ন্যায় অথবা বেলজীয় কর্ত্তৃক কঙ্গোবাসীদিগের অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতির ন্যায় নিষ্ঠুর রীতিসকল তাঁহাদের সম্যক-প্রকারে বর্জ্জন করিতে হইবে; আবগারীবিভাগের আয়-বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সর্ব্ববিধ মাদক দ্রব্য-ব্যবহারনিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক কথায়, ভগবানের আদর্শকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া অপরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করিয়া অধীনস্থ প্রজাবর্গের সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তিবর্দ্ধনে সহায়তা করিতে হইবে। সমগ্র জগতের যাহাতে উন্নতি ও মঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই বিধানে দৃঢ়প্রযত্নে সচেষ্ট হইতে হইবে।

মানবজীবনে বিধাতার লীলা।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

ভক্তি যে অন্ধ এ কথাটা বুঝি নিতান্ত মিথ্যা নয়। জ্ঞানবুদ্ধি মানুষকে পথ দেখিয়া চলিতে পরামর্শ দেয়; ভক্তি দেখিতে চায় না, মানুষকে নির্ভয়ে অন্ধকারপথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করে। মানুষ জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করিয়া কত না আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে। ভক্তি ভগবানকে বলে, "হে প্রভু, তোমারই হাতে আমার জীবনের ভার সমর্পণ করিলাম, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে সেইখানে লইয়া যাও।" যদি আমরা আমাদের ইচ্ছামত জীবনকে পরিচালিত করিতে পারিতাম, স্বাস্থ্য ও রোগ যদি আমাদের আদেশের অনুবর্ত্তী হইত, মৃত্যু যদি আমাদের আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিত, ধনমান-উপার্জ্জন যদি আমাদের হাতে হইত, মানবের অতীত ইতিহাস আমা-

দের চক্ষে যেমন পরিষ্কার, মানবের ভবিষ্যৎ ইতিহাস যদি সেইরূপ স্বচ্ছ হইত এবং তাহা যদি আমরা আমাদের ইচ্ছানুসারে নিয়মিত করিতে পারিতাম—তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দৃষ্টিতে সমাজের উন্নতির যাহা চরম অবস্থা সেই অবস্থায় আমরা উপনীত হইতাম। কিন্তু পৃথিবীর এরূপ উন্নত যুগে কোথাও কোন দেবমন্দির থাকিত না, তাহার সাহিত্যে কবিতা থকিত না, তাহার ভাষায় অনুতাপ ও প্রার্থনার শব্দ থাকিত না, তাহার সঙ্গীতে বন্দনা ও সঙ্কীর্ত্তন থাকিত না, তাহার সন্ধ্যাকালে আরতির দীপ জ্বলিত না, আর সেই উন্নত যুগের মানুষ অন্তরের নিভৃতে ভগবানের নিঃশব্দ বাণী শুনিবার জন্য শান্ত ও সমাহিতচিত্তে অপেক্ষা করিত না।

যেমন দিবাভাগেও আকাশে নক্ষত্রমালা থাকে বটে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না, আমরা কেবল পৃথিবীর সামগ্রী সকলই দেখিতে পাই; সেইরূপ সেই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত যুগেও অবশ্য ভগবান থাকিতেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না, আমরা কেবল সংসারই দেখিতাম, উর্দ্ধলোক আমাদের অন্তশ্চক্ষুর অতীত হইত।

আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি আমাদিগকে বলে যে, যাহা চক্ষুকর্ণের অগোচর তাহার চিন্তা ও আলোচনা বৃথা। মৃত্যুর পরে কি হইবে তাহা যখন জানিবার উপায় নাই, তখন সেকথা ভাবিয়া কি হইবে? আমরা যে সংসারে আছি সেই সংসারে লোকের অনেক দুঃখকষ্ট আছে, যতদূর পার এই দুঃখকষ্ট মোচন করিবার চেষ্টা কর; যাহাতে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয়, লোকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, অন্যায় ও অত্যাচারের দমন হয়—সেই সকল বিষয়ে মনোযোগ দেও তাহা হইলে সংসারকে খানিকটা উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে পারিবে। কিন্তু যদি পরলোকের পানে চাহিয়া ইহলোকের কর্ত্তব্য অবহেলা কর তবে কি জ্ঞানের অপেক্ষা অজ্ঞানতাকে বড় করা হইবে না এবং সত্যকে তুচ্ছ করিয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে না? আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি বলে যে, ধর্ম্মের সহিত সংসারের কোন সম্বন্ধ নাই এবং ধর্ম্ম মানিলে সংসারের কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটী হয়। অনেক লোক জ্ঞানবুদ্ধির এইরূপ প্রতিবাদ শুনিয়া ধর্ম্মকে জীবন হইতে বিদায় করিয়া দেন।

পরলোকের পানে চাহিয়া ইহলোকের কর্ত্তব্য অবহেলা করা যে মহা ভুল, তাহাতে সন্দেহ কি? যিনি জীবনে তাঁহার কর্ত্তব্য উপযুক্তরূপে পালন করিতে চান, তাঁহাকে সংসারের দিকে চাহিয়াই সে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে হইবে কাহার কি অভাব আছে, তাঁহার কি করিবার সুযোগ আছে এবং কি করিবারই বা তাঁহার নিজের সামর্থ্য আছে। যে কাজ তিনি ভাল করিয়া করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া মনে করা উচিত। অপরের কোন উপকার করিতে হইলে যদি তাঁহাকে নিজের কোন আরাম ও সুবিধা বিসর্জ্জন করিতে হয়, তবে এই ত্যাগই তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সংসারকেই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া ভগবান আমাদের এই বর্ত্তমান জীবন দান করিয়াছেন, কিন্তু যিনি সংসারের কাজকর্ম্মকে ধর্ম্মের বিরোধী মনে করিবেন, নিশ্চয়ই বলিব যে, তাঁহার ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়—কিন্তু কল্পনা, এবং তাঁহার উপদেশ শুনিলে কর্ত্তব্য অবহেলা অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। সংসারের কাজকর্ম্ম ভগবানের বিধান, আমরা ধর্ম্মের নামে কখনই ইহা তুচ্ছ করিতে পারি না।

কিন্তু ধর্ম্মের নামে যেমন আমরা সংসারকে তুচ্ছ করিব না, তেমনি সংসারের দোহাই দিয়াও আমরা ধর্ম্মকে, জলাঞ্জলি দিব না। এ কথা কি সত্য যে ধর্ম্মের সহিত সংসারের বিরোধ আছে? এ কথা কি সত্য যে ভগবানে ও পরলোকে বিশ্বাস করিলে আর সংসারের কাজকর্ম্ম করা চলে না? সত্য কথা এই যে ধর্ম্মবিশ্বাস সাংসারিক উন্নতির অন্তরায় নয় বরং সহায়, এবং যাঁহারা ঈশ্বর ও পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাসী, তাঁহারাই জগতের উন্নতির জন্য মনপ্রাণ উৎসর্গ করেন। যদি পরলোক না থাকে, চিতার আগুনেই যদি মানুষের পরিসমাপ্তি সত্য হয়, তবে মানবজীবন কত তুচ্ছ হইয়া যায়। আর যদি বিশ্বাস করি যে, অনন্ত জীবনে প্রত্যেক মানবাত্মা ক্রমাগত উন্নতি হইতে উন্নতিতে আরোহণ করিবে, তবে মানবজীবন কত গৌরব ও গভীরতা লাভ করে, এবং সেই অমরাত্মার বর্ত্তমান আশ্রয় এই যে রক্তমাংসের দেহ তাহাকেও আমরা সম্মান না করিয়া থাকিতে পারি না।

যদি আমরা পরলোক না মানি এবং ইহকালকেই সর্ব্বস্ব করি, তাহাতে যেমন মানবজীবন তুচ্ছ হইয়া যায়; সেইরূপ যদি আমরা ভগবানকে না মানি এবং মানুষকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া কল্পনা করি, তাহাতেও মানুষকে আমরা অতিশয় তুচ্ছ করিয়া ফেলি। ঈশ্বরের পূজা ও বন্দনা করিবার অধিকার মানুষের আছে এবং তাঁহার সহিত যোগস্থাপন মানুষের পক্ষে সম্ভব বলিয়াই কাহারও নীচ বৃত্তি দেখিলে আমাদের দুঃখ হয়, কাহারও অসংযত চরিত্র দেখিলে আমাদের লজ্জা হয়, এবং কাহাকেও চিন্তাহীন ভাবে কেবল আমোদপ্রমোদে ও

বিলাসসম্ভোগে দিন কাটাইতে দেখিলে আমাদের বিরক্তি লাগে।

যতই আমরা ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দিই এবং কেবল সংসারের দিকে চাহিয়া বর্ত্তমান জীবনকে বড় করি, ততই আমাদের এই বর্ত্তমান জীবন ছোট হইয়া যায়—এ কথাটি সহসা শুনিতে বড় অদ্ভুত লাগে বটে, কিন্তু কথাটা সত্য। আমরা কি লোকের সহিত প্রতারণা করিব না এইজন্য যে, তাহাতে আমাদের কারবারের উন্নতি হইবে? আমরা কি শুদ্ধ ও সংযত চরিত্র হইবার চেষ্টা করিব এই জন্য যে, তাহাতে আমরা সবল সুস্থদেহ ও দীর্ঘজীবী হইতে পারিব? আমরা কি লোকের প্রতি অন্যায় আচরণ হইতে বিরত থাকিব এইজন্য যে, অন্যায় আচরণ করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহাতে আমাদের নিজেরও অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা? আমরা কি দুঃখীকে দয়া করিব এইজন্য যে, সে তাহার দুঃখের কাহিনী বলিয়া এবং সাহায্যের প্রার্থনা করিয়া আমাদের জ্বালাতন করিবে না? যদি এই সকল কথা সত্য হইত তবে কি মানুষ সাধুতার এত আদর করিত, না নির্ম্মল জীবনের জন্য মানুষ এত আকুল হইত, না দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার দেখিয়া এমন আত্মহারা ঘৃণা আসিত, না পরের দুঃখে মানুষের প্রাণ এমন করিয়া বিগলিত হইত? মানুষ শুধু পৃথিবীর জীব নয় কিন্তু তাহার প্রকৃতির মধ্যে স্বর্গের উপাদানও নিহিত আছে। এক-এক জন ভাল লোকের অন্তরে যে স্নেহপ্রেম, যে সাধুতা, যে পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, তাহার সহিত তাঁহাদের সাংসারিক সুবিধার কোন সম্বন্ধই নাই। কখন কখন একজন বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এমন সকল লোকের মধ্যে পড়েন, যাহারা স্বার্থ ও সাংসারিক সুবিধা ভিন্ন আর কিছুই বোঝে না। এরূপ অবস্থায় যদি তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে ধর্ম্ম হইতে সাংসারিক জীবনেও সুবিধা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কি তিনি নিজেই অনুভব করেন না যে, তাঁহার কথায় ধর্ম্মের গৌরব ম্লান হইয়া গেল? আর যাহারা সংসারসর্ব্বস্ব ও বিশ্বাসবিহীন তাহাদিগকে সাংসারিক সুবিধার লোভ দেখাইয়া যদি তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস দান করিবার চেষ্টা করেন, তবে দেখিবেন যে সেরূপ উপদেশে কোন ফল হয় না। স্বার্থের দোহাই দিয়া কখনও বিবেককে জাগ্রত করা যায় না। সাংসারিক সুবিধার লোভ দেখাইয়া কখনও মানুষকে ধার্ম্মিক করা যায় না।

সংসারের উন্নতি ধর্ম্মের লক্ষ্য নয় একথা সত্য, কিন্তু ইহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে সংসারে যত প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সে সকলেরই পশ্চাতে বিশ্বাসী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ উদ্যম প্রযত্ন ও স্বার্থত্যাগ বিদ্যমান। জ্ঞানবুদ্ধির উপদেশ এই যটে যে সংসারের উন্নতি করিতে হইলে সংসারই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু এরূপ করিলে সমাজ পাপ ও অনাচারে পচিয়া গলিয়া পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিত। যাহারা সংসারকেই সর্ব্বস্ব করে তাহারা যে অনেক সময়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে একথা সত্য, কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ অত্যন্ত স্বার্থপর হয় ও তাহাদের দ্বারা সমাজের বড় কিছু উপকার হয় না। বস্তুতঃ যাঁহারা পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাসী ও ভগবানের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন, ভগবান তাঁহাদেরই দ্বারা সংসারের কল্যাণ সাধন করেন। স্বর্গের আলোক দেখিতে হইলে জ্ঞানবুদ্ধির পরামর্শকে তুচ্ছ করিয়া হৃদয়ের অনুসরণ করিতে হইবে, সংসারকে ভুলিতে হইবে—এই তাঁহার বিধান।

একাকী নীরবে লোকচক্ষুর অগোচরে ভগবচ্চরণে মাথা রাখিলে মানুষ যেমন নির্ম্মল ও পবিত্র হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু এইরূপ একাকিত্ব কি মানুষকে অপর সকল লোক হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে? এইরূপ একাকিত্ব হইতে কি স্বার্থপরতা জন্মে এবং সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া যায়? একথা কখনই সত্য নহে। এইরূপ একাকিত্ব হইতে একটা সবল চরিত্রের উদ্ভব হয়; তাহা সমাজকে যেমন দৃঢ়তা দান করে, প্রত্যেক মানুষকে স্বার্থত্যাগের জন্য যেমন অনুপ্রাণিত করে, এমন আর কিছুতেই করে না। যে মানবপ্রেমের মূলে ভগবদ্ভক্তি সে প্রেম যেরূপ গভীর—কি সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলন, কি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কি ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি—এই সকলের জন্য দল বাঁধিয়া বা সভাসমিতিস্থাপন করিয়া সভ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে সেরূপ প্রেম, সেরূপ ভ্রাতৃত্ব কিছুতেই স্থাপন করা যায় না। ভগবান জগতে যে সকল মহাব্যাপার সম্পন্ন করেন তাহাদের সম্বন্ধে একটা বড় বিস্ময়ের কথা আছে, তাহা এই যে তিনি যে সকল লোক ধরিয়া এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন করেন তাহাদের লক্ষ্য থাকে বিপরীত দিকে। যাঁহারা পরলোকের উপরে হৃদয় স্থাপন করেন তাঁহাদিগকে দিয়াই তিনি সংসারের মঙ্গল সাধন করেন; যাঁহারা নির্জ্জনে সঙ্গোপনে তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে ধরিয়াই তিনি সমাজদেহকে দৃঢ় করেন; যাঁহারা তাঁহার চরণে মনপ্রাণ উৎসর্গ করেন, সেই রিক্তহস্ত অকিঞ্চন ব্যক্তিগণকে তিনি অপূর্ব্ব শক্তি দান

করেন ও জনসাধারণ তাঁহাদিগকেই আপনাদের নেতৃত্ব-পদে বরণ করে।

সময়ে সময়ে এক-একটা জাতির ইতিহাসে এক-একটা সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। হয় ত একটা পরাধীন জাতি স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে; হয়ত রাজা ও রাজকর্ম্মচারিদের অত্যাচারে প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠে; হয়ত গরীব লোকেরা বড় মানুষদের বিলাসিতা ও অর্থের অপব্যয়ের সহিত নিজেদের দুর্দ্দশার তুলনা করিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং সমাজে বিপ্লব উপস্থিত করে; হয়ত বা প্রাচীন ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়া লোকে নূতন আলোকের অন্বেষণ করিতে থাকে। এইরূপ সঙ্কটকালে দেখা যায় যে দেশের ও সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিগণ বুদ্ধিবিবেচনা খাটাইয়া ও যুক্তিপরামর্শ আঁটিয়া অধিকাংশের অভিপ্রায় অনুসারে একটা পথ স্থির করিয়া সেই পথে চলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এইরূপ সময়ে সহসা এক-একজন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়, যাঁহারা স্বর্গ হইতে অনুপ্রাণনা লাভ করেন এবং তাঁহাদের অগ্নিময় উৎসাহ সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে অগ্নিময় করিয়া তুলে। তখন সমগ্র দেশ একটা উন্নত স্তরে আরোহণ করে। জাতীয় জীবনের এইরূপ সুগম্ভীর সন্ধিক্ষণে ভগবানের অঙ্গুলিস্পর্শে মানবের হৃদয় হইতে এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে এবং মানবের কণ্ঠ হইতে এক নূতন সঙ্গীত উত্থিত হইতে থাকে। তখন নূতন ছন্দে ইতিহাস রচিত হইতে আরম্ভ হয়। লোকে যাইতে চায় এক পথে কিন্তু বিধাতা তাহাদিগকে অন্য পথে পরিচালিত করেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক সময়ে ভগবান মানুষকে অজ্ঞাত পথ দিয়া লইয়া যান। কাহার অন্তরে তাঁহার আহ্বান কখন্ আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, এবং তোমার অন্তরে এ জীবনে সে আহ্বান আসিবে কিনা তাহাও নিশ্চয় বলা যায় না; কিন্তু ঐ আহ্বানের জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখ এবং উহা আসিলে উহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে তাহা নির্ভয়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হও। যাহা অসত্য এবং কুসংস্কার বলিয়া বুঝিবে, প্রাচীন ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইলেও তাহাকে বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইও না। যে প্রথাকে অন্যায় বলিয়া বুঝিবে, যাহাতে মনুষ্যত্বের অবমাননা দেখিবে, তাহা প্রাচীন সমাজের ভিত্তি হইলেও শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে তাহার সমর্থন করিও না, কিন্তু তাহার উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হও। ভগবানের বাণী যখন অন্তরে আসিবে তখন দক্ষিণে ও বামে চাহিও না, কে এ পথে তোমার সঙ্গী হইল, কে-ই বা হইল না, তাহা গ্রাহ্য করিও না, প্রভু পরমেশ্বরের আহ্বান জানিয়া এই পথে অগ্রসর হও। এতদিন যে পথে চলিতেছিলে বা জীবনে যে পথে চলিবে বলিয়া এবং যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে বলিয়া হয়ত দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রস্তুত হইয়াছ, ভগবানের বাণী হয়ত তোমাকে সে পথ পরিত্যাগ করিতে বলিবে; যে সাধ ও যে আশা বহুদিন ধরিয়া অন্তরে পোষণ করিয়াছ, হয়ত সে আশা ও সে সাধে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, কিন্তু তুমি স্বর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইবে। যে পথে পদার্পণ করিতেছ হয়ত সে পথ আপাততঃ অন্ধকার বলিয়া মনে হইতেছে, হয়ত বুঝিতে পারিতেছ না সে পথ কত দীর্ঘ এবং সে পথ কোন্ দিকে গিয়াছে, কিন্তু ফিরিও না। প্রভু পরমেশ্বর অচিরে তোমার অন্ধকার পথ স্বর্গের আলোকে উজ্জ্বল করিবেন।

উৎসবানন্দ-রামমোহন-রায়-সংবাদের বঙ্গানুবাদ।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী)

(২)

(রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরে মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ)

বহ্নি প্রভৃতি ভূতের গুণ ও রূপ-বিবর্জ্জিত ঐ (পুরুষ) নিখিল দিক্ কাল ও আকাশ যিনি দেখিতেছেন, বিজ্ঞ শুক ও সনাতন কর্ত্তৃক যিনি সর্ব্বদা স্তুত হন, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে এখানে কাহারও নিকট হইতে ভীত হইবার কারণ নাই।

বিষ্ণুর ন্যায় উপাধিতঃ বা স্বরূপতঃ অন্য কেহ আছেন, ইহা যে সকল বিদ্বান্ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য দুর্ব্বার্য মনে করেন, তাঁহাদের বাক্য দ্বারা যাঁহাদের দুঃখ ও হর্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছেন। সচ্চিৎসুখানন্তবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ যাঁহারা সমর্পণ করিয়াছেন, (এরূপ) কোন বৈষ্ণব কোন কালেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করেন না, বরং সকল সদ্গুণরত্নের রত্নাকররূপেই তাঁহাকে বর্ণনা করেন। ইহার প্রমাণও কোন কোন সুকৃতিশালী ব্যক্তিরই কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। যে সকল বৈষ্ণব ক্ষীর-সমুদ্রশায়ী ভগবানের উপাসক, তাঁহারাও গুণাবতার বলিয়াই প্রখ্যাতগুণ বিষ্ণুর নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করেন না। সত্ত্বগুণোপাধির বৈশিষ্ট্য সকল স্থলে অনুবর্ণনীয়; অতএব বৈকুণ্ঠনাথের উপাসকগণ এবং ইলাবৃত প্রভৃতি নয়টি বর্ষে ভবানীনাথ প্রভৃতির চরণসেবী সংকর্ষণাদি

উপাসকগণ সৃষ্টি প্রভৃতির নিমিত্ত দেহধারী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব তিনেরই গুণাবতারত্ব হেতুই ঐকাত্ম্য—কখন স্বরূপতঃ ভেদ নাই (ইহা স্বীকার করেন) ; আরও, "যে চণ্ডাল শিব এই বাক্য বলে, তাহার সহিত বাস করিবে, তাহার সহিত কথা কহিবে, তাহার সহিত ভোজন করিবে"। "অহো, (সেই) চণ্ডাল ইহা (পণ্ডিতাদি) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম আছে; যাহারা তোমার নামকীর্ত্তন করেন, সেই আর্য্যগণই তপস্যা করিয়াছেন, হোম করিয়াছেন, স্নান করিয়াছেন, বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা স্কন্দ ও পদ্ম-পুরাণে নাম-মহিমায় শিব ও বিষ্ণুর নাম-সকলেরও পরম পাবনত্ব কথন হেতু "(উহা) অর্থবাদ মাত্র, এরূপ যাহারা মনে করে, তাহারা নারকী", এই স্মৃতি হেতু নাম ও নামীর অভেদনির্ণয় ও অপ্রাকৃত প্রতিপাদন দ্বারা, তাঁহাদের (বিষ্ণু ও শিবের) কেবল নামসমূহ দ্বারা সকলের সর্ব্বাভিষ্ট-প্রাপ্তি হইবে এরূপ যাহারা জানিতেছেন, তাঁহারাই বিষ্ণু ও শিবের (নাম হইতে) পৃথক্ ঈশ্বরদ্রষ্টা মূঢ়দিগকে নামাপরাধী নারকী বলেন। তাই (বলা হইয়াছে), যে (ব্যক্তি) শিব ও বিষ্ণুর গুণ ও নামাদিসকল বুদ্ধি দ্বারা অভিন্ন দেখিবে, সে হরিনাম দ্বারা (নিজের) সম্যক্ হিতসাধন করে ইত্যাদি। (কারণ) "সর্ব্বাপরাধকারীও হরিকে আশ্রয় করিলে মুক্ত হয়। হরিরও প্রতি যে মানব অপরাধ করে, কখনও নামের আশ্রয় সম্ভব হইলে সে নাম দ্বারা উত্তীর্ণই হয়। কিন্তু সকলের সুহৃৎতুল্য নামের প্রতি অপরাধ হেতু (লোকে) অধঃপতিত হয়। ইত্যাদি ; অতএব তাহাদের (নাম ও নামীর) ভেদ চিন্তা করিলে কাহারও শ্রেয় হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ক বহু শ্রুতিস্মৃতি বিদ্যমান আছে, তাহা পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিগণ শুনিয়াই থাকিবেন। অতএব হরিহর-উপাসকের সহিত কেহ বিবাদ করেন না, তাঁহাদের মতসকল সাধু ব্যক্তিদিগের মনস্তুষ্টিকর।

অনন্তর তিনের (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের) ঐকাত্ম্য হইলেও কোন কোন ভাগবতঅভিজ্ঞ বিষ্ণুর উপাসক সত্ত্বগুণাত্মক বাসুদেব হইতে মানবের শ্রেয়োলাভ হয়, (ইহা বলেন)। ভগবান স্বামীপাদ ভাবার্থদীপিকা দেখিয়া ঐরূপ প্রতিপাদন করেন ; যথা—গুণত্রয়ের মধ্যে তমো-গুণ ভূতের উপাদান হেতু আধিভৌতিক, রজোগুণ ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ বলিয়া আধ্যাত্মিক, সত্ত্বগুণ দেব-সৃষ্টির কারণ বলিয়া আধিদৈবিক নিয়ামক ; সেই (সত্ত্ব-গুণের) উপাধিবিশিষ্ট বিষ্ণুই ঈশ্বর। তাহা (সত্ত্বগুণ) উপাধি হইলে স্বরূপে কোনও ক্ষতি আছে, ইহা (বলিতে পারা যায়) না। (কারণ) তমঃ আবরক, রজঃ বিপরীত জ্ঞানের হেতু ; সত্ত্ব কিন্তু আবরকও নহে, অন্যথাজ্ঞানের হেতুও নহে, উপরন্তু যথার্থ বাঞ্ছিত স্বরূপপ্রকাশের পক্ষপাতীই। অতএব সচ্চিদানন্দানন্তবিগ্রহ বাসুদেব নামক বিষ্ণুই ঈশ্বর। এই হেতু বৃদ্ধ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য "জগতে যাহা কিছু গতিশীল (চঞ্চল), এসমস্তই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদনীয়", এস্থলে উপপদহীন ঈশ-শব্দের সঙ্কোচ ইচ্ছা না করিয়া, ঈশ্বর-পদ ব্যাখ্যাকালে নিয়ন্তৃত্ব হেতু (তিনি) সকলের নিয়ন্তা নিশ্চয় করিয়া "পরমেশ্বর" "পরমাত্মা" এই শব্দদ্বয় দ্বারা "নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণ পরমাত্মা" এই শ্রুতি হেতু বিষ্ণুই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। "'ক' শব্দে প্রজাপতি উক্ত হইয়াছেন, সকল দেহীর আমিই 'ঈশ' ; আমরা দুইজন তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন, এজন্য (তুমি) 'কেশব'-(ক+ঈশ=কেশ+'মত্বর্থীয়' ব) নামধারী" এই শিববচন হেতু তাঁহারই (বিষ্ণুরই) পরমেশ্বরত্ব-নির্ণয় হেতু তিনিই 'আবাস্য' বাস করিবার যোগ্য স্থান অর্থাৎ (বস্তুর) সত্তার স্ফুরণপ্রদানকারী আধার ; অথবা সেই এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু সকল জগতে জগৎ, তাহারই 'আবাস্য' আচ্ছাদন করিবার যোগ্য বা ব্যাপ্য অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনে অনুগত তাহার ধারণকারী স্বপ্নপ্রবঞ্চতুল্য। এস্থলে জগতী-শব্দ পৃথিবীবাচক (হইয়া) সমস্ত ভূত ও ভৌতিক প্রপঞ্চের উপলক্ষণ বা নির্দ্দেশক ; এবং জগৎশব্দ "(যাহা) গমন করিতেছে, (তাহা) জগৎ" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা দেহান্তর্গত প্রবৃত্তিশীল ইন্দ্রিয়াদির উপলক্ষণ বা নির্দ্দেশক ; তাহাদের (উভয়েরই) নিজের নিজের নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনুগত (অধীন) হওয়া উচিত। আধিদৈবিকের দ্যোতক এই 'ঈশ'শব্দ দ্বারা এবং তিনিই সকলের আবাস-স্থল বলায় "যাঁহাতে ভূতসকল বাস করে তিনিই 'বাসু'" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা সকল (বস্তুর) বাসুদেব কর্ত্তৃক নিয়মন ও তাঁহাতে অধিষ্ঠান ধ্বনিত হইতেছে। বাসুদেব প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান হইলে প্রপঞ্চে সেই বাসুদেব-বিগ্রহের প্রতীতি হওয়া উচিত, ইহা বলিতে পার না। শুক্তির "ইদং" (পরি-দৃশ্যমান) অংশের রৌপ্যপ্রতীতি হইলেও (উহার) নীল-পৃষ্ঠাদির যেমন প্রকাশ হয় না, সেইরূপ ; তাই এই ব্যাপক বিগ্রহের অব্যক্ততা ভগবান কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে,—"অব্যক্তমূর্ত্তি আমা কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত ; কিন্তু আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না"। কেহ কেহ আবার তিনের (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের) ঐকাত্ম্য হইলেও "'অথবা যাঁহার পাদনখ হইতে বিগলিত, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক (কমণ্ডলুতে) সংগৃহীত পূত অম্ভঃ (বারি), ঈশান সহ জগৎকে পবিত্র করে।' 'মুকুন্দ ব্যতীত জগতে অন্য কে আর ভগবান আছেন' ?" ইত্যাদি শ্লোকনিচয়ের দ্বারা দুয়ের সেবকত্ব, (আর) একেরই সেব্যত্ব বলেন ; তাঁহারাও কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুয়ের অনীশ্বরত্ব প্রতিপাদন করেন না।

কদাচিৎ ব্রহ্মার যে জীবত্ব সম্ভাবনা কথা হইয়াছে, তাহা কোনও কল্পে কোনও বিশিষ্ট শক্তিশালী জীব উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, এই অভিপ্রায়ে বলিয়া সকলই দোষরহিত হইল।

এখন, অধুনাতন কোন শৈবধর্মাবলম্বী অদ্বৈত পরমানন্দ-তত্ত্ব শিবস্বরূপে চিত্ত সমবধারিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের নিগুর্ণত্ব শ্রবণ করিয়া যে কুপিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাল শোভা পায় নাই; (কারণ) যাঁহারা অদ্বৈত-তত্ত্বের অনুশীলন করেন, একত্বদর্শীর "সেই (একত্বদর্শনে) মোহ কি, শোক কি?" ইত্যাদি শ্রুতি হেতু কোপাদি বিষয়ের নিরূপণ না হওয়ায়। 'কৈবল্যাদি উপনিষদ কি দেখেন নাই এবং ইতিহাস-পুরাণাদিও কি অবলোকন করেন নাই?' তিনি যে এই আপত্তি তুলেন, তাহাও বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অনুকূল নহে। কারণ, বহু গ্রন্থকলার অভ্যাস-বর্জন ভক্তির অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, "বহুগ্রন্থ অভ্যাস করিবে না" এই স্মৃতি হেতু বহু গ্রন্থের কথারূপ কন্থা-রোমন্থন বৃথা; "তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির যত্নপূর্ব্বক কি অনুসন্ধান করা উচিত?—অন্তরস্থ জ্যোতিঃ" ইত্যাদি উক্তি হইতেও (বহু গ্রন্থাভ্যাস বৃথা)। এইরূপ, শিবের অনীশত্ব কোন বৈষ্ণবই প্রতিপাদন করেন নাই। স্বম্-পদার্থেরও বস্তুত খণ্ডণত্ব হইতে পারে না, তৎপদার্থের লক্ষ্য সদানন্দঘন শিবের কথা আর কি বলিব? আর যে, ক্রোধের বশে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির শিব হইতে অভিব্যক্তি উক্ত হইয়াছে, তাহাও তাহাদের (বৈষ্ণবদিগের) বিরোধের কারণ হয় না, (যেহেতু) গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই শিব এবং মৎস্যাদির (অবতারের) অবতারী।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের শিবভক্তত্বপ্রতিপাদক এই শৈবকে কোন পৌরাণিক বৈষ্ণব প্রশ্ন করিতেছেন, নিত্যধামস্থিত নিত্যলীলাযুক্ত অখিল সৌভাগ্যশালী সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর ভগবান কোন কালে শিবের পূজা করিয়াছিলেন কি? অথবা বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগান্তর্গত দ্বাপরে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া (শিবের পূজা করিয়াছিলেন)? প্রথম (পক্ষ) নহে; কারণ তাঁহার (নিত্যধামগত বিষ্ণুর) যথার্থবিহার ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। কোন স্মৃতি বা শ্রুতি কর্ত্তৃক স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত তাঁহার (বিষ্ণুর) অন্যের আরাধনা কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। "তাঁহার প্রকাশ দ্বারা এই সকল প্রকাশিত হইয়াছে", "তাঁহার কার্য্য (শরীর) বা করণ (ইন্দ্রিয়) কিছুই নাই", "(তিনি) বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ", "নিখিল ভূত তাঁহার (এক) পাদ, দ্যুলোকে ইঁহার ত্রিপাদ অমৃতভূত" ইত্যাদি শ্রুতি তাঁহাকেই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষে, "আমি যদি কর্ম্ম না করি, সঙ্করের কর্ত্তা হইয়া পড়িব", এই উক্তি অনুসারে লোকসংগ্রহের নিমিত্ত নানা কর্ম্ম করিয়া দুষ্টবিনাশ ও সাধুসংরক্ষণ দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ স্বয়ং অবতীর্ণ হন। এইজন্যই (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যাস, নারদ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরও চরণবন্দন ও পূজাদি করিয়াছেন। এজন্য "লোকে যেমন (ধনশালী নৃপাদি অনেকে বিনা প্রয়োজনে লীলাবশতঃ আহারবিহারে প্রবৃত্ত হয়), তেমনি (প্রয়োজন ব্যতীতও এই সৃষ্টিকার্য্য ভগবানের) কেবল লীলা" ইত্যাদি (ব্যাসসূত্রে প্রদর্শিত) যুক্তিহেতু (শ্রীকৃষ্ণের) পরমেশ্বরত্বহানি বা তাঁহাদের (ব্যাস-নারদাদির) ভক্তত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না; যেহেতু তাঁহারাও (ব্যাস-নারদ প্রভৃতি) (শ্রীকৃষ্ণকে) পরমেশ্বররূপেই সম্মান করিতেন। আরও, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসাদির ভক্ত ইহা অপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভক্ত ইহা অতি প্রসিদ্ধ। সেইরূপ, শিব গঙ্গাধর বলিয়া বিষ্ণুভক্ত ও ঈশ্বর ইহা প্রকটিত; এবং বিষ্ণু শিবভক্ত হইলেও পরমেশ্বর; অতএব বিবাদের কোন অবসর নাই।

হরিহরের উপাসক যে ব্যক্তি বৈষ্ণব ও শৈব কর্ত্তৃক বিষ্ণু ও শিবপ্রতিপাদক শ্রুতিস্মৃতি বাক্যসকল (পরস্পরের) স্তুতি ও নিন্দাপর ইহা মনে করিয়া বিবাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ সেই সকল বাক্য নিন্দাপর নহে, যথাযথ স্বরূপ-নির্ণায়করূপে অবগতি হেতু স্তুতিপররূপে শ্রবণে বিবাদ উচিত নহে। তিনি (হরিহরোপাসক) স্বয়ংই দুইয়ের (হরিহরের) ঐকাত্ম্যপ্রতিপাদক স্তুতিপর বাক্যসকল পাঠ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে অতি বিস্তৃতির প্রয়োজন নাই। যাহারা চোখে কেবল পক্ষপাত দেখিয়া মোহগ্রস্ত হয়, সেই পরদুঃখে দুঃখিতচিত্ত করুণার সাগর হরিহরউপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহপরবশ প্রত্যক্তত্ত্বজ্ঞ বৈদিক আচার্য্যকর মায়াকার্য্যরূপে একত্বদর্শী নামেমাত্র শৈব ও বৈষ্ণবগণ সত্য আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া অধিষ্ঠান সত্তা দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রকাশমান আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত "নামরূপ" পরিচ্ছিন্ন পদার্থসকলের যথোক্ত শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদন করতঃ নিত্য বিজ্ঞান ও আনন্দ যাঁহার শরীর তিনিই (সকলের) আধার বলিয়া দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত বস্তুর সুখানন্দরূপত্বে যাঁহাদের কোন সন্দেহ উৎপন্ন হয় না, তাঁহারা আনন্দপ্রাপ্ত ও পরম মঙ্গলপরায়ণ হইয়া সুখে বিজয়লাভ করুন। যাঁহাদের চিত্ত বৈরাগ্যযুক্ত, তাঁহাদের কাহারও সেই মত অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার অনুসন্ধান না করিলে রাগ-দ্বেষাদি "ক্লেশে"র অপগম না হওয়ায় আত্মজ্ঞানের

অন্যতম কল্পান্তর বৈরাগ্যাদির অভাব হেতু যাঁহারা কেবল বিতণ্ডা, ছল ও নিগ্রহে আগ্রহরূপ জলচরের দ্বারা গৃহীত তর্কতার্কিক, তাহাদিগেরও "এই বুদ্ধি তর্ক দ্বারা প্রাপ্য নহে", "তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু" এই শ্রুতি ও সূত্র শ্রবণ করিয়া নিজের মত পরিত্যাগ করতঃ অন্যতম (মতের) অনুসন্ধান করাই উচিত, কিন্তু উপেক্ষা কর্ত্তব্য নহে। শর্করাক্ষ-পুত্র (জন) ও অরুণ-নন্দন (উদ্দালক) প্রভৃতি, যাঁহারা (ব্রহ্মের কেবল) উদরগর্ত্তের উপাসক, (ঐ) উদরগর্ত্ত প্রভৃতির উপাসনার চিত্তশুদ্ধির সাধনরূপে অভিধান হেতু তাঁহাদের (অন্যমতানুসন্ধান) তো ভাবী কল্যরূপে আদরণীয়ই। অখণ্ডানন্দস্বরূপ ভগবানের সেবাই চিত্তশুদ্ধির ফল, ইহাও বলা হইয়াছে। অতএব "সেই ঔপনিষদ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি", "তাঁহাকেই জান, অন্য বাক্যসকল পরিত্যাগ কর", "উহা বাক্যসকলের গ্লানিজনক মাত্র", "তাঁহাকেই জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা নাই", "একেকে জানিলে সমস্ত জানা হয়", "একদেব সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা" "এখানে নানা কিছুই নাই", "সজাতীয়-বিজাতীয়দ্বিতীয়রহিত এক ব্রহ্ম", ইত্যাদি শ্রুতির অর্থদর্শী শ্রৌতমার্গে অভিনিবিষ্টচিত্ত একদেশী মুমুক্ষুদিগের তাহাতে বিবাদের অবসর নাই।

যাহারা কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করে নাই, দুষ্ট বাসনায় চিত্ত যাহাদের আসক্ত এবং শুষ্ক কর্ম্মে যাহারা কর্ম্মঠ, তাহাদিগের যাহা ভাল লাগে না, তাহাতে জগতের অনির্ব্বাচ্য জ্ঞানকারণত্ববাদী ব্রহ্মবিদ্গণের কোন ক্ষতি হয় না; যেহেতু সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই অধিকারী। ইহা হইতে অন্য (মতাবলম্বী) ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত দেবতাদি স্থাবর পর্য্যন্ত বস্তুমাত্রদর্শী চিৎশক্তির অধিপতি ভগবানের সুখানন্দস্বরূপে বিবাদকারী ব্যক্তিগণ নামরূপাত্মক বস্তুসকল সত্যরূপে দেখিয়া (ইহলোক ও পরলোকে) পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করতঃ কেবল ক্লেশভাগী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সকল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী "দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনও নাশ হয় না", "চিচ্ছক্তি ভিন্ন বস্তুসকল ক্ষণপরিণামী", "মুক্তগণও লীলাবশতঃ বিগ্রহ (ধারণ) করিয়া ভগবানের ভজনা করেন", এই সকল উক্তি দেখিয়া চিৎশক্তির কার্য্যরূপে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি পরম সত্য বলিয়া অনুভব করেন এবং আধার-সত্তা দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া মায়িক বস্তুসকল মিথ্যা বলিয়া থাকেন, উপনিষদমতাবলম্বী কর্ত্তৃক অনুগৃহীত, ভগবানের সেবাতে অনুকূলচিত্ত, জগজ্জীবের অনুগ্রহপরবশ, ব্রহ্মবিদ্যাভিজ্ঞ যোগভ্রষ্টকল্প, তাঁহারা কৃতার্থ। তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন স্তুতি অভিনন্দন সেবা ও পরিপ্রশ্নাদি দ্বারাও মুমুক্ষুদিগের অত্যন্ত মঙ্গল হইয়া থাকে।

ধর্ম্মসাধনে রামমোহন-নির্দ্দিষ্ট সহজ পন্থা।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

রামমোহন মানবের শাশ্বত সহজ সাধনার বিষয় নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন; কিন্তু সে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হব কেমন করে? বোঝা গেল, পরব্রহ্মের উপাসনাই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য; কিন্তু উপাসনা কেমন করে করব? পন্থা কি? যে পথে অগ্রসর হলে অনন্ত মহাসমুদ্র অতিক্রম করে অভীষ্ট নন্দন-কাননে উপনীত হব; যেখানে গেলে পরমপিতার স্নেহচ্ছায়ায় শুষ্ক তপ্ত জীবনের সমস্ত সন্তাপ দূর হয়ে যাবে শীতল চন্দনপ্রলেপে; যেখানে গেলে দীন কাঙ্গাল অমূল্য পৈত্রিক ধনের সন্ধান পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবে?

মানবের সে সমস্যাও মহামনীষী রামমোহনের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। রামমোহন শুধু বিষয়নির্দ্ধারণ ক'রে, সহজ দাবীর অধিকার প্রতিপন্ন করে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি পথেরও নির্দ্দেশ করেছেন; ব্রহ্মরূপালাভের উপায়ও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই উপায় জন্মগত সাধনাধিকারের মতই সহজ সাধন-পন্থা।

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ পণ্ডিত মহামতি ফ্রোবেল বালকবালিকাগণের শিক্ষায় সহজ সরল কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী উদ্ভাবন করেন। এই শিক্ষার বিশেষত্ব খেলাধুলার মধ্য দিয়ে, স্থূল উদাহরণের ভিতর দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ে শিশুর প্রাণের যোগসাধন; কোনরূপ কষ্ট কল্পনা এই শিক্ষার অঙ্গীভূত নয়; পরন্তু সূক্ষ্ম বিষয়কে স্থূলে রূপান্তরিত করে, শিশুর প্রাণের দ্বারে পৌঁছে দিয়ে শিশুর কৌতূহল বৃদ্ধি করাই এই শিক্ষার একমাত্র কার্য্য।

রামমোহনের সহজ সাধন পন্থাও ফ্রোবেল-নীতির অনুরূপ। তিনি উপলব্ধি করলেন, যে সমস্ত সাধন পন্থা মানবের পুরোভাগে দেখা দিয়েছে, তৎকালপ্রচলিত সমস্ত পন্থাই কঠোর ও জটিল,—আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা সমাধির মধ্য দিয়ে অষ্টাঙ্গযোগের সহায়তায় অভীষ্ট বস্তু অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য; বর্ত্তমানের দুঃখ-দৈন্যনিপীড়িত মানবের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়; আচার্য্য শঙ্করপ্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গের পথও সুগম নয়, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেও তাঁর অনুসন্ধিৎসা সুগম পথ খুঁজে পেলো না; কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকরাচার্য্যের কর্ম্মকাণ্ডের বিপুলতায় তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। অবশেষে ঘনান্ধকারের অবসানে যেমন প্রাচীমূলে ঊষার স্বর্ণকরাঘাত জীবের মোহঘুম অপসারিত করে আনন্দের বাণী বহন করে নিয়ে আসে,

রামমোহনও তেমনি আমাদের সৌভাগ্যসূর্য্যোর অভ্যুদয়ে উপনিষদের রুদ্ধ মন্দিরদ্বারে করাঘাত করে যখন তা' উন্মুক্ত করলেন, তখন দেখতে পেলেন অভিনব সহজ সাধন পথ দেখতে পেলেন, কঠোরতা-বর্জ্জিত সরল উপাসনা-পদ্ধতি ; নিয়ে এলেন সন্তপ্ত জীবকুলের মুক্তিকামনায় জ্ঞানযুক্ত ভক্তিমার্গের অপরূপ দান। উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে, সপ্ত সমুদ্রের বারিরাশি বিলোড়িত করে, হৃদয়ে হৃদয়ে অজানা পুলকস্পন্দন জাগিয়ে দিয়ে রামমোহন গাইলেন—

"অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময় ।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়
আবিরাবীর্ম এধি ॥"

শক্তিহীন আমরা দুর্ব্বল অবশচিত্ত শিশু ; হে পরমাত্মন্, সাধনপ্রভাবে তোমার নিকটে উপনীত হবার, তোমার করুণারসধারা লাভ কর্ব্বার ক্ষমতা আমাদের নেই। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর তুমি। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ তুমি। হে পরম পিতা ! দুর্ব্বল শিশু যেমন পিতামাতার উপর নির্ভর করে স্বচ্ছন্দে বিপদের সম্মুখীন হতেও ইতস্ততঃ করে না, কারণ সে জানে পশ্চাতে পিতামাতা বর্ত্তমান, যাঁরা তাকে বিপদনির্ম্মুক্ত করে রক্ষা কর্ব্বেন, আমরাও তেমনি তোমাকেই আত্মসমর্পণ কর্‌ব। তুমি তোমার মঙ্গলহস্ত সম্প্রসারিত করে আমাদিগকে রক্ষা কর ; আমাদিগকে অসৎ হ'তে সৎস্বরূপে নিয়ে চল।

কায়মনোবাক্যে পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণই রামমোহনের সহজসাধন পন্থা। এই সাধনে বিধিনিষেধের বাহুল্য আমাদিগকে নিপীড়িত করে না ; কর্ম্মকাণ্ডের বিপুলতা মনকে ভারাক্রান্ত করে না ; শুষ্কজ্ঞানের নৈরাশ্য হৃদয়কে উদ্বেলিত করে না ; অষ্টাঙ্গযোগের কঠোরতার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয় না। এই সাধনে সময়ের বিচার নেই ; তিথিনক্ষত্রের বাঁধাধরা গণ্ডী নেই,—আছে সহজ সরলভাবে প্রাণের নিবেদন ; পিতা বলে, মাতা বলে, বন্ধু বলে পরব্রহ্মের সহিত প্রাণের যোগসাধন। যে কোন মুহূর্ত্তে, যে কোন কালে, যে কোন অবস্থায় মানব এই সাধনপথে অগ্রসর হতে পারে। যে কোন ভাষায়, যে কোন বাক্যে মহাপুরুষের চরণে প্রাণের ব্যাকুলতা জানালে, তা তাঁর চরণে উপনীত হবেই হবে।

আর ভয় নেই। আর আতঙ্ক আমাদিগকে বিচলিত করবে না। রামমোহনের জীবনব্যাপী সাধন-বলে, তিনি দিয়ে গেছেন আমাদিগকে সহজ সাধনাধিকারের দাবী, আর সেই অধিকারলাভের সহজ সাধনপন্থা।

নব শতাব্দীর দুর্গম পথে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। কোটি বৎসর কালসাগরে বিলীন হয়ে গেছে। পুরোভাগে কোটী কোটী নবীন বর্ষ, নবীন বাণী নিয়ে অমৃতভাণ্ড করে সমুপস্থিত হবে। সহজ সাধন পন্থা অনুসরণ করে জন্মগত অধিকারলাভে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি, আজ তা দেখবার সময় উপস্থিত। পরব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ সাধিত হয়েছে কি না, তা আমাদিগকে দেখতে হবে এবং তাই দেখে অনাগত ভবিষ্যের বক্ষ থেকে যে শতাব্দী নবীনতার সজীব মূর্ত্তিরূপে উপস্থিত হয়েছে, সেই শতাব্দীর কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করতে হবে।

যদি পর্য্যালোচনা করে দেখি, যে শতাব্দী চলে গেছে অতীতের বুকে, সে শতাব্দীতে আমরা বিশেষ অগ্রসর হ'তে পারিনি—ব্রহ্মের সঙ্গে প্রাণের যোগসূত্রের সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হয় নি ; তাতেই বা আমাদের ভীত বা লজ্জিত হবার কারণ কি ? তবে ভক্ত উপাসকমণ্ডলী সঙ্গে নিয়ে আমাদিগকে নবশতাব্দীর জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে, যেন এই শতাব্দীও গত শতাব্দীর মত ব্যর্থ না হয় ; বর্ত্তমান শতাব্দীতে যেন ব্রহ্মের চরণে আত্মসমর্পণ করে, রামমোহন নির্দ্দিষ্ট সহজ সাধনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।

নববশতাব্দীর মৃদুল দক্ষিণ পবন পুষ্প গন্ধ বহন করে আমাদের প্রাণে ব্রহ্মকৃপা বিতরণ করুক। আকাশের প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তর সংযুক্ত করে, যে অনন্ত নীহারিকাপুঞ্জসমন্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল জ্যোতি বিকীর্ণ করছে, সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডল সাধকমণ্ডলীর হৃদয়ে হৃদয়ে পরব্রহ্মের জ্যোতি ফুটিয়ে তুলুক। রাজা রামমোহন এবং সহজ সাধন পন্থার মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শাশ্বত শান্তির আধার অমৃতময় ব্রহ্মলোক হ'তে ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে এক সহজ সাধনস্পৃহা জাগিয়ে তুলুন।

পশ্চাতে অনন্ত অতীত, পুরোভাগে অনাগত ভবিষ্যৎ, মধ্যভাগে বর্ত্তমানের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আমরা। হে পরমাত্মন্, বর্ত্তমান নবশতাব্দীর প্রারম্ভে তোমার করুণাধারা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত কর, তোমার পুণ্য চরণে আত্মনিবেদন করে কৃত-কৃতার্থ হই।

———

THE

BRAHMA SAMAJ

UNDER

DEVENDRANATH THAKUR.

CHAPTER II.

(7)

85. Brahma Vidyalaya established 1781 *Saka* (1859 A.D.).

In the same year the Brahma Vidyalaya, an institution for the training of Brahmos, was established at Calcutta, according to the suggestion of Keshub Chunder Sen. Devendranath Thakur and Keshub Chunder Sen used to deliver lectures here in Bengali and English respectively on every Sunday. Devendranath's lectures are contained in a book called *Brahma Dharmer Mata O Viswasa, i. e.* the Doctrines, and Principles of Brahmaism. The subjects of the lectures are as follow :—

1. On the Existence and Attributes of God.
2. God in relation to the Universe as its Creator, Preserver, and Destroyer.
3. God is pure felicity.
4. God is truth.
5. Love of God and restrainment of inordinate fondness for wordly objects.
6. Wordly bliss and Divine bliss.
7. Future state.
8. Heaven and Hell.

9 & 10. True Salvation.

Here in this Vidyalaya Keshub Chunder Sen also gave a course of lectures in English, on the Ethics and Theology of Brahmaism to the young collegians of Calcutta, and issued a series of tracts in English chiefly expository of the principles of Brahmaism, for the benefit of his youthful countrymen.

86. Hymns by Satyendranath Thakur.

It was at this time also that the second son of Devendranath Thakur, Satyandranath Thakur, began to compose those immortal hymns which stir the soul to its profoundest depths, and, making it forget the world and all its cares, "lap" it in heavenly bliss.

87. Remodelling of domestic rites.

Although we have thus far endeavoured to show the rapid strides Brahmaism had taken in all directions, we have now to narrate the most important reform of all, and one which had often been deliberated by the *Samaj*—the remodelling the *Grihanusthana*, or domestic rites and ceremonies.

88. Brahmaism was a religion of pure theory before now.

Hitherto Brahmaism with all its improvements had continued to a great extent to be a religion of pure theory and speculation, without advancing any way in adapting itself to actual life and its practical phases. One solitary exception to this is the performance of a *Sraddha* by Devendranath Thakur on monotheistic principles as related above. "The external social life of Brahmas," says Miss Collet, "differed but little from that of their polytheistic countrymen, many of them conforming to all those degrading sacraments of idolatry which are interwoven with ordinary Hindu life. Meetings had occasionally been held at the desire of some zealous young Brahmas, for the purpose of adopting the best means of terminating this unworthy conformity ; but the result of such meetings had always been in favour of the conservatives."

89. First Brahmic marriage.

When this important innovation took place, Devendranath was the first fearlessly to set an example, by marrying his daughter without any idolatrous rites.

90. No legislative act considered necessary to legalise Adi Samaj marriages.

The *Brahmas* of the *Adi Brahma Samaj* had for some time been endeavouring to procure a formal act of legislation to legalize *Brahma* marriages, but on further consideration the attempt was abandoned as useless, because they were of opinion that marriages solemnized according to the form of the *Adi Brahma Samaj* being as much Hindu marriages as those in vogue, were equally as valid as any marriages performed under a legislative act.

91. Non-idolatrous act by Devendranath Thakur.

Besides thus setting the first example of a non-idolatrous mode of solemnizing domestic ceremonies in his own family, Devendranath Thakur showed two other instances of his moral courage, by removing his family idol from his house, and discarding the sacred thread, the distinctive mark of a Brahmin, and the higher castes.

92. *Anusthan-Padhati* on non idolatrous basis—first promulgated by Devendranath Thakur.

But this was not all he did. All Hindu domestic ceremonies, says Rajnarain Bose, were subjected to the scrutiny of the *Samaj* and remodelled by Devendranath now on the Brahmic plan. Only those portions of the old ritual which could be kept consistently with the dictates of conscience were retained, and the others rejected. The following are the principal sacraments called *Sanskaras* in the original which were remodelled :—

1. *Jatakarma* or the ceremonies on child-birth.

2. *Namakarana*, ceremony of giving a name to the child.

3. *Upanayana*, placing of a boy for religious instruction, under a proper tutor, and his investiture in an unidolatrous manner with the sacred thread in the case of a Brahmin, as a symbol of his initiation into the monotheistic Mantra, the Gayatri, observed by the twice-born from earliest antiquity. A Brahma of Brahmin descent may, after putting on the Poita in an unidolatrous way, if he chooses, renounce putting it on his person for ever.

4. *Diksha*, initiation into the Brahma religion by reading out the Brahmic covenant before a Brahmic minister.

5. *Vivaha*, or marriage ceremony. It contains among other remodified rites the *Saptapadigamana*, or walking of seven steps togather by the married couple, as enjoined by Bhavadeva Bhatta with some modifications.

6. *Antyesthi*, or funeral ceremony, which in modern times is found to differ so widely from the ancient rites presented in the Vedas and Grihya Sutras,

7. *Sraddha*, consisting of prayers for the dead and bestowing of alms to the poor, etc., in their memory.

93. Non-idolatrous but national basis.

In all these, the renunciation of the idolatrous parts of the rites is imperative on every Brahma, but conformity to social practices and usages is left wholly to the option of the person himself.

94. Devendranath's voyage to Ceylon—*Saka* 1783 (1860 A.D.)

During the Durga-Puja holidays of 1860 (Saka 1783), Devendranath proceeded on a voyage to Ceylon in company with his second son, Satyandranath Thakur, Keshub Chunder Sen, another friend, and servants for the purpose of recruiting his health. Although his health was not at all good at the time, he did not fail to pay visits to the Buddhist temples in the vicinity of Galle and hold conversations with the priests in whose charge they were placed. An interesting account of these conversations is given in a number of the *Tattwabodhini Patrika* of the time in a description of the trip from the pen of Satyendranath Thakur.

95. Buddhism as found in Ceylon.

It is a curious fact in the history of Brahmaism that Rammohun Roy came in contact with Buddhism in the north of India, and Devendranath Thakur in its south. Of Thibet and Ceylon, the latter, however, affords better opportunities for studying Buddhism than the former. The Bnddhism of Ceylon is represented in the Lalita-Vistara to be coeaval with the life of Sakya Moni himself, and presents an older form of that faith, than is to be found in all its various schisms. The celebrated ediot of Asoka makes mention of the early propagation of Buddhism in this island. more over, the Buddhistic scriptures of Ceylon are written in the dialect of Prakrit Lankeswara, which is near allied to the Pali, and the present Singhalese, which is an Aryan dialect, and are more easily intelligible to a student of Sanskrit than their versions in Tibetan or Burmese. Devendranath and Satyandranath, during their brief stay in the island, did not fail to make inquiries into both the religion and the language of the country. Specimens of the Singhalese language are

given in the number of the *Tattwabodhini Patrika* containing the account of the trip.

96. Keshub Chunder ordained Acharya—*Saka* 1783.

At the end of 1783 Saka, Keshub Chunder Sen was ordained an Acharya or Minister of the Church, by the Pradhan Acharya Devendranath Thakur.

97. Brahmikas first join public service—*Saka* 1787 (1865 A. D.)

At the anniversary service of the *Samaj* in 1787 Saka (1865), some Brahmikas, or female Brahmas, called at the *Adi Brahma Samaj* to join the service. They were acccmmodated with seats behind a screen, and since then a regular private entrance with a staircase has been constructed towards the east of the *Adi Samaj* Hall, to enable the female Brahmas to enter the *Samaj* without being seen, on occasions of public festivals. The practice of women joining with Men in public worship is not uncommon in India. In Upper Hindusthan, Bombay and Madras, and in places of pilgrimage in Bengal, women of rank are seen to mix with men in temples for purpose of such worship.

98. Civil Marriage Act—1872 A. D.

When, in 1872, Government wanted to pass a Brahma marriage law applicable to all Brahmas, requiring parties desirous to marry to appear before a Registrar of Brahma marriages and getting their marriage registered by him, the members of the *Adi Brahma Samaj*, deeming themselves as much Hindu as the rest of the community and not wishing to be "ticketted" to quote the apt expression of a journalist of England in his remarks on their conduct on the occasion, as Brahmas, applied to Government for exemption from the operation of the intended Act, Babu Nobogopal Mitter, Editor of the *National Paper*, rendered great service to the *Samaj* by his indefatigable exersions for procuring such exemptions and getting a separate law, that is, the Civil Marriage Act passed for the benefit of the Brahmas of the Samaj of India, Sceptics and Atheists.

99. Pandit Ajoddhyanath Pakarshi.

On the 29th of August 1872, died Pundit Ajoddhyanath Pakrasi, a Minister of the *Adi Brahma Samaj*, and one of the principal coadjutors in his time of Babu Devendranath Thakur in the : *Brahma Samaj* movement. Born at Malpara in the Hugli district, and educated in a common *tol*, he was at first engaged as a translator of the Mahabharat by Kali Prasanna Sing. Chancing to attened one Wednesday the *Adi Brahma Samaj*, he was much struck with the simplicity of the worship, and the nobleness of the doctrines expounded by the Minister in his sermon. He at once embraced Brahmaism, and became so attached to the religion that he performed the Shraddha of his deceased father in the Brahma way. He latterly acted as a Minister of the *Brahma Samaj* and the Editor of the *Tattwabodhini Patrika*. He was an effective speaker and an able writer. His eloquent sermons attracted overflowing congregations to the *Samaj*. His articles in the *Patrika* and his Brahma Vidyalaya discourses as well as his treatise on the "Purpose of Existence" are written in a simple and beautiful style aud dispaly remarkable ability.

100. Charge of Adi Brahma Samaj made over to Dijendranath Thakur *Saka* 1794 (1872 A.D.).

We have now followed the career of Devendranath Thakur from Saka 1763 (A.D. 1842), to Saka 1794 (A. D. 1872), when he made over charge of the *Samaj* to his son Dijendranath, though still retaining a deep interest in the *Samaj*, and according it his advice and assistance whenever needed.

101. Devendranath Thakur and his work of thirty years—1763-1794 *Saka*. (1842 1872 A. D.).

During this period of 30 years, we have endeavoured to show what reforms and changes were made in the Original *Samaj*, and what extensive dimensions it had assumed under the fostering care of Devendranath Thakur. After a lapse of 30 long years from a small body of disheartened and half-hearted followers we behold it to day,

a mighty organization, possessing the hearts and affections of the majority of the educated Hindus, and extending its branches far and wide into the Mofussil. Gradually, and with calm and patient courage during these 30 years do we behold Devendranath Thakur applying with success the lancet of reform to the festering sores of idolatrous customs and ceremonies, when success appeared impossible. Gradually do we see him purging the *Samaj* of its idolatrous impurities and making it a pure Hindu monotheistic Church.

To those acquainted with the bigotry of the orthodox Hindu, these reforms of social rites and ceremonies exhibit moral courage of the highest order. Success or ruin were the only alternatives, and success was happily achieved because the man who attempted the reforms was unacquainted with failure and was actuated by the most disinterested of motives—the good and regeneration of his countrymen.

Though now grown old and delighting in the silent communion of his own soul with her Maker, the noble example of Devendranath Thakur is not forgot. Though absent, his deeds still animate the followers of the *Samaj*, and though no monument of brass or stone has yet been erected to commemorate the deeds of his noble and pious life, yet we opine that he can wish for no grander monument than the thought, that the thousands who throng the *Samaj* are justly proud of the man who 30 years ago boldly stood between the *Samaj* and ruin, and raised it to its present prosperous condition.

The lives of religious reformers of all ages are generally held up to us for admiration, and as examples for imitation. In the life that we have just attempted to delineate, there is much to admire and to imitate if possible. Born to an immensely wealthy inheritance, backed by the prestige of his talented father's name, and at the same time possessed of exceptionally high talents, Devendranath Thakur might if he chose have aspired to the highest of earthly honors. But to the glorious pinnacle on which his position and talent would have undoubtedly placed him, he preferred the more humble and incomparably the more difficult and glorious task of resuscitating and regenerating his country's ancient religion. Is there no good to be derived from a life and choice such as his, accompanied, as it has been, by the greatest piety and self-denial? Can any earthly treasure be compared to the self satisfaction, the "eternal sun-shine" of the mind, arising form the perfomance of acts like those of Devendranath Thakur? The value of such actions is not properly estimated by men of the world, but it is by a superior tribunal, which awards them their proper reward in heaven, if men like Devendranath act from the hope of any reward earthly or heavenly, and not from purely disinterested motives.

102. Devendranath Thakur, Secretary to the British India Association—1852 A.D.

Devendranath Thakur was appointed Secretary to the British India Association at the time of its first establishment in 1852. Had he still retained connection wilh the said Association, he would, considering his talents, birth, and position, have, no doubt, by this time, been elevated to the rank of Maharaja. But he could not have in that case obtained, as a Brahma remarks, the much nobler title *Maharishi*, or the great *Rishi*, universally accorded to him by all classes of his countymen.*

ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কথা।

বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, বি,এল)

মুরশিদাবাদের সান্নিধ্যে অবস্থিত বহরমপুর একটি বিখ্যাত জনপদ। আদালত ঐখানে অবস্থিত থাকায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় অবস্থান করেন। ঐখানকার বিখ্যাত উকীল শ্রদ্ধেয় দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি সরকারি উকীল ছিলেন এবং মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুরেরও উকীল ছিলেন, তিনিই অপরের সহযোগিতায় বহরমপুরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বহু পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি সুচিন্তিত জীবনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ২২এ মাঘ তারিখে সমারোহের সহিত সাম্বৎসরিক উৎসব হইত। আমার পিতা পরলোকগত

* Navavarshiki, p, 226.

বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উপাসনাকার্য্য সম্পাদন জন্য তথায় প্রতি বৎসর যাইতেন। স্বর্গগত বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রমুখ যাবতীয় উকীলও অনেকে উৎসবে যোগ দিতেন। প্রাতে ও সায়াহ্ন উপাসনা হইত। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, যিনি "আমার মন ভুলাল যে কোথা গেল সে" এইরূপ অমর সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তিনি তখন তথাকার এক বালিকাবিদ্যালয়ে (যতদূর আমার স্মরণ হয়) শিক্ষকতা করিতেন। তিনিই সঙ্গীত করিতেন। বড় বেলের খোলায় নির্ম্মিত তাঁহার একটি এসরাজ ছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীতে উৎসব মধুময় হইত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কয়েকবার বজরা যোগে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যাইলে আমার পিতার সহিত বেদী গ্রহণ করিতেন। এক বৎসর উৎসবের বেদী হইতে উপদেশ দিতে দিতে ভাবাবেশে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া যায়। আমার পিতাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তিনি মহর্ষির উপদেশের শেষাংশ পূর্ণ করিয়া দেন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া সঙ্গীতরচনায় বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয়। আমার পিতার মৃত্যুর পরেও দীননাথ বাবু জীবিত ছিলেন, আমার পিতার প্রতি প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তিনি যে একটি হাতীর দাঁতে বাঁধান বাঁশের বৃন্দাবন লাঠি আমার পিতাকে উপহার দেন, তাহা আজও আমরা সযত্নে রক্ষা করিতেছি। উৎসবে সঙ্গীতের সঙ্গে উক্ত দীন বাবুর এক পুত্র অল্পবয়স্ক হইলেও পাখোয়াজ সুন্দর বাজাইতেন। অতীতের এই সমস্ত সরস স্মৃতি পড়িয়া রহিয়াছে।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে শিবচন্দ্র দেব মহাশয় তাঁহার বিদ্যাবত্তাগুণে ও অমায়িক ব্যবহারে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়কার শিক্ষিতগণের প্রায় সকলেরই ব্রাহ্মসমাজের উপর একটা প্রাণের টান ছিল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র বাবুর আবাসস্থান কোন্নগরে। তিনি ডেপুটী কলেক্টররূপে বিশেষ যোগ্যতার সহিত সরকারি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়া সম্ভবতঃ ১৮৫৮ বা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার আবাস-নিকেতনে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মোৎসব হইত। শিবচন্দ্র বাবুই উহার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার সুন্দর ও সুপরিচ্ছন্ন বাটীর প্রাঙ্গণে যে উৎসব হইত, তাহাতে কোন্নগরের ও পার্শ্বস্থ গ্রামের বহুলোক উপস্থিত হইতেন। আমার পিতাকে ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উৎসবে উপাসনা করিতে দেখিয়াছি। দুই-একবার দেখিয়াছি, প্রসিদ্ধ গায়ক বিহারী বৈষ্ণবকে সঙ্গীত করিতে। তিনি বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবেও আমরণ সঙ্গীত করিতেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। আদিব্রাহ্মসমাজের উৎসবে অন্য গায়কের গানের সহিত তিনি দুইবার সঙ্গীত করেন। "কঠিন দুখ পাই হে মোহান্ধকারে" প্রভৃতি দুই তিনটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতে তিনি সুরসংযোগ করিয়া দেন। উৎসবান্তে শিবচন্দ্র বাবু সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইতেন।

সে সময়কার কোন্নগরে যাহা কিছু উন্নতি হয়, সকলেরই মূল শিবচন্দ্র বাবু। কোন্নগরে রেল ষ্টেশন, ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য্য তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত। সকলেই শিবচন্দ্র বাবুকে ভয় ও সম্ভ্রমের সহিত নিরীক্ষণ করিত। গ্রামের মধ্যে যে কিছু কলহ-বিবাদ হইত, শিবচন্দ্র বাবুর মধ্যস্থতায় সবই মীমাংসা হইয়া যাইত। তিনি চরিত্রে ও ব্যবহারে আদর্শ-পুরুষ ছিলেন। মহর্ষির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কোন্নগরে তাঁহার অসীম সম্ভ্রম ছিল। পরে তিনি সাধারণব্রাহ্মসমাজের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত হন। সাধারণব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইবার কিছু পূর্ব্বে কেশব বাবুর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি কয়েকটি গৃহ্য অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করেন। ঐরূপ ব্যবহারে গ্রামের লোক তাঁহার বৈরী হইয়া উঠে। নিজ সমাজের ভিতরে তাঁহার যে আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহা বিনাশের মুখে দেখিয়া তিনি কোন্নগর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কলিকাতার Creek Row-স্থিত বাটীতে চলিয়া আসেন। শিবচন্দ্র বাবু পরে কোন্নগরে গঙ্গার তটদেশে একটি সুন্দর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। উহার ব্যয়ের সাহায্যকল্পে মহর্ষি ৫০০৲ টাকা দান করেন। শিবচন্দ্র বাবু কোন্নগর ছাড়িয়া দিবার পরে তাঁহার সুশোভন আবাসনিকেতন ভগ্নদশায় উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর হইল, অপরে উহা খরিদ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান অধিস্বামী প্রতিবৎসর উৎসবের সময় শিবচন্দ্র বাবুর বাটীর অংশবিশেষ সাধারণকে ব্যবহার করিতে দেন।

মধ্যে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ অবসন্ন-দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মাসে দুইএকবার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপাসনা করিতে যাইতেন। অনেক মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় বার্ষিক উৎসবের সময় কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে কলিকাতা হইতে অনেকে

উপস্থিত হন। নিম্নে শিবচন্দ্র বাবুর লিখিত একখানি পুরাতন পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমার পিতাকে লিখিতেছেন—

আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যার সময়ে কোন্নগর-ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। অতএব আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক মদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন। ইতি ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮৬ শক।

(স্বাক্ষর) শ্রীশিবচন্দ্র দেব।

পুঃ—এই পত্র দ্বারা তথাকার সমাজস্থ সমস্ত ব্রাহ্ম-মহোদয়গণকে আহ্বান করা হইল, ইতি।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।

এই সময়ে কোন্নগর সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ওঁ নৈনান

২১এ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৫ শক।

প্রিয়দর্শনেষু

আশীষ এই যে, সংসারপারে নির্ব্বিঘ্ন হউক।

বহুদূরের পথ হেতু কোন্নগরে সে দিবস তোমায় পাওয়া ঘটে নাই। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস (প্রসন্নকুমার) ও শীতল (শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ও শ্রীনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়—সকলেই ভবানীপুরের) বাবুরা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তথাকার সমাজে সে দিন উপাসনা করায় বোধ হয় তাঁহারা বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। সেই নূতন দালানে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু (দেব) অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাদের সহিত একহৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং শুভকার্য্যেতে অনুরাগ বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। কোন্নগরে তাঁহার আবাস-স্থানে তাঁহার পিতৃপুরুষের নিকেতনে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করা তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প। তিনি আমাকে সেদিন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়ে বলিলেন যে, কেবল পরব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্তে আমি এই দালান নির্ম্মাণ করিয়াছি। সপরিবারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে তাঁহার অভিলাষপূর্ণ হইল। তিনি অতি শান্ত গম্ভীর ও বিনীতস্বভাব। তাঁহাকে দেখিলে আমি বড় প্রীতি পাই। উদ্যান হইতে সেদিন কোন্নগর যাইতে সমস্ত দিবস গত হইল। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর ঘাটের অনতিদূরে নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল। সে আর এগোতেও পারে না, পিছাতেও পারে না। সেখানে প্রায় আমরা দুই ঘণ্টাকাল বদ্ধ হইয়া রহিলাম। নানা কষ্টে বেলা অবসান হইলে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর আলয়ে উপস্থিত হইলাম। ক্রমে সেই পল্লীগ্রামের শীতল ছায়া হইতে সেদিনকার দশমীর চন্দ্রকিরণ প্রতিভাত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মদিগের হৃদয় হইতে উৎসাহসমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই নূতন উপাসনামণ্ডপ বর্ত্তিকার আলোকে প্রদীপ্ত হইল এবং সাধু ব্রাহ্মদিগের সমাগম দ্বারা তাহা অলঙ্কৃত হইল। বেদীতে আচার্য্যেরা আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু একটি লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলেন এবং তথায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের সংবাদ সকলকে অবগত করিলেন। উদ্বোধনের পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল এবং উৎসাহের অগ্নি উপাসনামণ্ডপের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। উপাসনা কিছু দীর্ঘকাল হইয়াছিল; কিন্তু উৎসাহেতে সে কালের দীর্ঘতা কিছুতেই উপলব্ধি হয় নাই। পরে তত রাত্রিতে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু আমাদিগকে আহার করাইলেন এবং প্যারী বাবুর (সম্ভবতঃ প্যারীচাঁদ মিত্র) সমভিব্যাহারে আমাদের নৌকাতে ফিরিয়া আইলাম। এ উদ্যানে আসিতে প্রভাত হইয়া গেল। আমি একাকী সেই নৌকার ছাদের উপর বসিয়া দশমীর চন্দ্রের অস্তমিত মহিমা দেখিয়া অনন্তের মহিমা অনুভব করিতে ছিলাম।

(স্বাক্ষর) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

ধর্ম্ম ও সাম্যবাদ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পরাধীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া পরাধীনতার মধ্যে লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবার কারণে আমাদের মনোভাব দাসত্বের সহিত এরূপ বিজড়িত হইয়া গিয়াছে যে, বিজ্ঞানের ন্যায় দর্শন, ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধেও স্বাধীন পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কোন্ জাতি নিজেদের দেশে কোন্ প্রণালীর উপযুক্ততা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, আর আমরা বিনা বিচারে ও পরীক্ষায় তাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া একটা মস্ত নূতন কথা পাইয়াছি ভাবিয়া নৃত্য করিতে বসিলাম। মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, রাশিয়া হইতে ধর্ম্ম বিতাড়িত হইয়াছে। আমরা বিচার করিয়া দেখিলাম না যে, ধর্ম্মের

নামে কোন্ পদার্থ নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এবং মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম কোন দেশ হইতে নামেমাত্র নির্ব্বাসিত হইলেও কোন মানবের অন্তর হইতে উহা বস্তুত উন্মূলিত হইতে পারে কি না। এই সকল বিষয় বিচার না করিয়াই সেদিন ভারতের কোন জননেতা ঘোষণা করিতে দ্বিধা করিলেন না যে, ভারত হইতে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত না করিলে প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী যে এই বাক্য কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না ও পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি যদি বলিতেন প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম স্বীকার করিলেই এবং ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক আবরণ পরিত্যাগ করিলেই দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিরোধবিবাদ তিরোহিত হইবে এবং কল্যাণ ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তবেই আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতাম। ঢিলটী ছুড়িলে তাহা কোথায় গিয়া পড়িবে বা কাহাকে আঘাত করিবে, সে সকল বিষয় ছুড়িবার পূর্ব্বেই বিচার করা কর্ত্তব্য। উক্ত জননেতার উক্তির মূল্য আছে, ইহা তাঁহার জানা উচিত ছিল; সুতরাং তাঁহার উক্তি দেশের যুবকগণকে সুনীতি বা দুর্নীতির পথে লইয়া যাইবে, তাহা ধীরভাবে অন্তর্দৃষ্টিতে দূরদর্শিতার সহিত বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল। আমরা শতবার বলিব, তাঁহার উক্তির ফলে দেশের অন্তত কতকগুলি যুবকের বিপথে যাইবার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমরা দুর্নীতির পথে একটীও দেশবাসীর একটী পদও অগ্রসর হওয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।

সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম, জনৈক রুষীয় পর্য্যটক লিখিতেছেন যে, রুষের রাজধানীর ও বড় বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত রাজ্যের অন্যত্র ধর্ম্মের নির্ব্বাসন কথায় মাত্র পর্য্যবসিত—কাজে নয়; তবে সাম্রাজ্যের কালে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নাগপাশ প্রতিজনের আত্মা ও মনকে যেরূপ পিষিয়া মারিতেছিল, বর্ত্তমানে সেই নাগপাশ অনেক পরিমাণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং রাষিয়ার প্রজাগণ মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম ও স্বাধীনতামূলক মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

মাঝে আরও শোনা গিয়াছিল যে, তুরস্ক হইতেও ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইয়াছে; কিন্তু পরে জানা গেল যে রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিলেন যে, ধর্ম্মকে রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করা মানবের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তাই তাঁহারা খাঁটি মুসলমান ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রজাগণকে সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন-জনার সমাবৃত ধর্ম্মকে স্বীকার করা হইতে মুক্তিদান করিলেন এবং স্ব স্ব জ্ঞান ও বুদ্ধি মতে যে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিলেন।

ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ দেখিলাম, আমাদের দাসমনোভাবের কারণে, রাষিয়ার আরও একটি বিষয়ে দুএকটী কথা শুনিয়া তাহা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য এক সম্প্রদায়ের লোক অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠেন; সেটী হইতেছে "সাম্যবাদ"। এই সাম্যবাদের প্রকৃত অর্থ কি? এবং দেশের শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে কি ভাবের সাম্যবাদ কোন্ প্রণালীতে দেশে প্রবর্ত্তিত করা উচিত, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান না। তাঁহারা মনে করেন, সংসারের সর্ব্ববিষয়ক সমস্ত সমুন্নত সৌধগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ধূলিতে পরিণত করাই সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম। আজ শতাব্দী পূর্ব্বে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সে এই প্রকার অপ্রকৃত সাম্যবাদের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং উহা পরীক্ষায় সম্পূর্ণ অপ্রতিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আবার সেদিন রাষিয়াবিপ্লবের সময় ঐ অযথা সাম্যবাদের কথা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাষিয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ একটী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এই যে, রাজ্যের ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীকেই এবং সকল শিল্পীকেই সমান বেতন লইতে হইবে। আজ কয়েক বৎসরের পরীক্ষার পর আমরা সংবাদপত্রে দেখি, রাষিয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিতেছেন যে, ছোট-বড়নির্ব্বিশেষে সকলকে একই বেতন দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়—যাহার যে প্রকার কার্য্য তাহাকে সেই প্রকার বেতন দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

আমাদের দেশের নেতাগণ পাশ্চাত্য দেশের পরীক্ষাসাপেক্ষ মতবাদসমূহের কথায় নাচিয়া না উঠিয়া আমাদের দেশে যুগযুগান্তরের ঘাতপ্রতিঘাতের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে সকল সমাজ ও ধর্ম্মসংক্রান্ত নিয়ম অভিব্যক্ত হইয়া একালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইসকল নিয়ম যদি ভালরূপ আলোচিত হইয়া তাহার দুষ্ট অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাল অংশ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা হয়, তবে আমাদের বিশ্বাস যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, স্বরাজ সংগেই দেশবাসীর অধিগত হইবে, এবং ভারতভূমি পুরাকালের ন্যায় জ্ঞানোজ্জ্বল কর্ম্মোজ্জ্বল ও ধর্ম্মোজ্জ্বল সুখশ্রীতে পুনরায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

নানাকথা।

ঝান্সীর রাণীর স্মৃতিবার্ষিকী—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বিগত ১৯শে জুন তারিখে কাশীধামে ঝান্সীর সুপ্রসিদ্ধ রাণী লক্ষ্মী বাইয়ের স্মৃতি-বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদিন ধরিয়া ভারতে অগ্রগণ্য অনেক পুরুষের স্মৃতিউৎসব সম্পন্ন হইতে-ছিল, কিন্তু এখন মহিয়সী ভারতরমণীদিগের স্মৃতিউৎসব সম্পন্ন হওয়ায় আমরা দিব্য দৃষ্টিতে অনুভব করিতেছি যে, ভারতবাসী রমণীদিগের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিবার গৌরবপূর্ণ পথে অগ্রসর হইতে শিক্ষা করিয়াছে। আমরা ইহাও দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি যে, ভারতের পূর্ণ জাগরণ অদূরবর্ত্তী। বঙ্গদেশেও রাণী ভবানীর ন্যায় সুপ্রসিদ্ধা রমণীগণের এবং অন্যান্য নীরবকর্ম্মী মহিলাগণেরও স্মৃতি-বার্ষিকের অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। এ বিষয়ে কংগ্রেস-নেতাগণ চেষ্টা করিলেই সফলকাম হইতে পারিবেন নিঃসন্দেহ।

জুতাবুরুষের কাজ।—আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গোস্বামী নামক একটী বালক জুতা বুরুষের কাজ হাতে লইয়াছে। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আমরা দেখিতেছি, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উপদেশ যুবকদিগের প্রাণে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জাতিগত ব্যর্থ অন্তঃসারশূন্য সম্মানজ্ঞানের উপরে বসিয়া থাকিবার পরিবর্ত্তে জীবনরক্ষার প্রকৃত সদুপায়-সকল অবলম্বন না করিলে দেশের পরিত্রাণের সম্ভাবনা কোথায়? মনে হয়, বর্ত্তমান যুগের ন্যায় মহাভারতের সময়েও জীবন-মরণের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ জাতিগত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সহিত গুণকর্ম্ম-বিভাগজনিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া জীবনরক্ষার উপায়স্বরূপে নিজ নিজ প্রয়োজনমত কর্ম্ম অবলম্বনে মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ হয়, জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনমত কর্ম্ম অবলম্বন বিষয়ে স্বাধীনতাপ্রদর্শনে এযুগে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী হইয়াছিলেন—ব্রাহ্মসমাজেরই কয়েকটী যুবক শতবিধ উপহাস-পরিহাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া জুতার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। একবার আমার নিকট তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি চাকরীর প্রার্থনা করায় আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, চাকরী করিয়া তাঁহার মত শিক্ষিত ব্যক্তির পরিবার-পোষণের উপযুক্ত বেতন পাওয়া অসম্ভব এবং আমার নিজের ব্যয়ে তাঁহাকে একটী কয়লার দোকান খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু ঐ যে স্বহস্তে দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া কয়লা ওজন করিয়া খদ্দেরকে দিতে হইবে, এই মিথ্যা সম্মানের অভাববোধের কারণে তিনি আমার দান-গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। হায়! তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করিয়া নিতান্ত অল্প বেতনে পাঠশালার পণ্ডিতি গ্রহণ করিয়া জীবননিষ্পেষক দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতে করিতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তথাকথিত শিক্ষার ফলে বৃথা আত্মসম্মানজ্ঞানে ফুলিয়া উঠিয়া জীবনরক্ষার উপায় পরিত্যাগ করিলে ঈশপ-কথিত ভেকের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। আমরা শ্রীমান অমলেন্দুকে কর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতাপ্রদর্শনের অন্যতম পথপ্রদর্শক ও অগ্রণী বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন করিতেছি। ইহাঁর নাম দেশের স্বাধীন-ব্যবসায়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় রাখা উচিত।

জুতা নির্ম্মাণের ব্যবসায়।—১১০নং করপো-রেশন ষ্ট্রীটে কলিকাতা টেক্‌নিক্যাল স্কুল সংলগ্ন ভূমিতে বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট অবস্থিত। তথায় চামড়া পরিষ্কার করা শিক্ষা দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ এই স্কুল পরিচালনা করেন। মিঃ বি, এম, দাস ইহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মিঃ দাসের চেষ্টায় উক্ত স্কুলে সম্প্রতি বুট ও অন্যান্য জুতা তৈয়ারী বিভাগ খোলা হইয়াছে। সেখানে নানা প্রকারের জুতা, সুটকেস, এটাচি কেস প্রভৃতি নির্ম্মাণ-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। মিঃ দাস একজন উৎসাহী ব্যক্তি। তাঁহার চেষ্টায় উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালীর কু-সংস্কার দূর হইয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলে চামড়া পরিষ্কার ও জুতা নির্ম্মাণ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছে। এসময়ে জুতা নির্ম্মাণ দ্বারা কম পক্ষে ২০০০০ হইতে ৩০০০০ লোকের কাজের সংস্থান হইতে পারে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর ৩॥ লক্ষ জোড়া জুতা তৈয়ারী হয়। ইহার দাম ১৪ লক্ষ টাকার কম নহে। তারপর বিদেশ হই-তেও জুতা, সুটকেস, এটাচি কেস প্রভৃতি যথেষ্ট আম-দানী হয়। কলিকাতা ও বাঙ্গালার অন্যান্য সহরে অতি সহজেই এই সমস্ত চামড়ার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

মিঃ দাসের স্কুলে উত্তমরূপে জুতা নির্ম্মাণ শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই বহু ছাত্র তথায় প্রবেশ করি-য়াছে। শিক্ষা শেষ করিয়া যাহারা বাহির হইবে, তাহারা অনায়াসেই স্বাধীনভাবে জুতা, সুটকেস, এটাচিকেস, ক্যাসব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিবে। কুটীরশিল্প হিসাবে জুতানির্ম্মাণ চলিতে পারে। ইহাতে খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন নাই। কয়েক শত টাকাই যথেষ্ট। একটা সেলাই করিবার কল কিনিলেই হাতে জুতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাঙ্গলার শিক্ষিত বেকার যুবকগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সঞ্জীবনী—১১ আষাঢ়, ১৩৩৮।

ADDITIONS AND CORRECTION TO THE CURRENT HISTORY OF THE BRAHMO SAMAJ.

(Dr. V. Rai.)

(2) A Correction.

Rammohon Roy died on the 27th Septembar 1833. On October .5 his secretary Sandford Arnot published in the Atheneum a short sketch of his life purporting to have been written by himself. Miss Mary Carpenter considered it to be genuine and printed it in 1866 in her book "Last days in England of Raja Rammohon Roy."

Miss Collet in her "Life and Letters of the Raja" published in 1900 calls the Sketch to be spurious. We have to examine whose view is correct. Miss Collet's continuator records the following verdict as to Arnot's character : —

"Unless this quondam journalist (Arnot) has been shamefully traduced, he was a low, cunning parasite. Having fastened on a rich and generous patron, whose position in a strange land made him peculiarly dependent on the guidance of British friends, he turned the opportunity without scruple to his own sordid account. In this as in other instances Rammohon showed himself—probably through an excess of good nature—lacking in wise choice of friends."

The autobiographical sketch is very brief. It contained only eighteen statements and three reasons for the last statement. Statements No. 4 and 5 are as follows : —

"When about the age of 16, I composed a manuscript calling in question the validity of the idolatrous system of the Hindus. This, together with my known sentiments on that subject, having produced a coolness between me and my immediate kindred, I proceeded on my travels, and passed through different countries, chiefly within, and some beyond, the bounds of Hindusthan." This statement about leaving home about the age of 16 and because of a coolness between Rammohon and his kindred is demonstrably false.

Dr. Lant Carpenter states "Without disputing the athority of his father, he (Rammohon) often sought from him informations as to the reasons of his faith ; he obtained no satisfaction and he at last determind at the early age of 15 to leave the paternal home, and sojourn for a time in Thibet, that he might see another form of religious faith."

Dr. Carpenter adds in a footnote :— "The statement made in the preceding sentence, I heard from the Raja himself in London, and in Stapleton Grove."

So that Rammohon left home at the age of 15 and not at the age of 16 and the reason was to see anthor form of religious faith and not a coolness between him and his immediate kindred.

Statement No. 13 of the sketch is "I was at last deserted by every person except two or three Scotch friends to whom and the nation to which they belong, I always feel grateful." In Rammohon's letter to Mr. Digby in 1817 Rammohon Roy says—"I however, in the beginning of my pursuits, met with the greatest opposition from their self-interested leaders, the Brahmins, and was deserted by nearest relations ; I consequently felt extremely melancholy ; in that critical situation, the only comfort that I had was the consoling and rational conversation of my European friends, especially those of Scotland and England." One can hardly imagin why Rammohon should in his brief sketch exclude all others besides the Scotch.

Statement No. 16 of the brief sketch is "I now felt a strong wish to visit Europe."

The 'now' would indicate shorty or at any rate only a few years before the time when he sailed (in 1830). But we find that in his letter to Mr. Digby of 1817 Rammohon Roy said "You may depend upon my setting off for England within a short period of time and if you do not return to India before October next you will most probably receive a letter from me informing you of the exact time of my departure for England, and of the name of the vessel on which I shall embark." The statement in the brief sketch and the statement in

the letter to Mr. Digby can not in any way be reconciled.

Lastly, Miss Carpenter considers that the autobiographical sketch was writtin to Mr. Gordon of Calcutta, just before he went to France. But we find that in September 1821, when the Calcutta unitarian committee was originated, Mr. Gordon was one of that committee. Therefore being acquainted with Rammohon from 1821 onwards he had no need of being told the eighteen things that make up the whole of the brief sketch. So we have no hesitation to call the brief autobiography to be an altogether spurious affair.

It is necessary to come to a decision about the genuineness or spuriousness of this autobiographical Sketch, becouse if it is spurious no statement contained in it should be relied on, unless supported by other indopendent reliable testimony.

Such statements are No. 5 "when about the age of 16 I composed a manuscript colling in question the validity of the idolatrous system of the Hindus" and part of the statement No. 6 "I proceeded on my travel • • • with a feeling of great aversion to the establishment of the British power in India."

গ্রন্থপরিচয়।

AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE BHAGABAT-GITA—মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র ন্যায়বাগীশ বি-এ ইং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফয়জাবাদ সাহিত্যসভায় গীতাসম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ইংরাজীতে পাঠ করেন, তাহা ১২৪ পৃষ্ঠায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতা অন্যতম, অপর দুইটি প্রস্থান হইতেছে উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র। প্রকৃত-পক্ষে এই তিন প্রস্থানের সম্যক্ অধ্যয়ন ও আলোচনা ভিন্ন প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান অন্তরে সঞ্জাত হয় না। ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের যে গবেষণা আছে, এই পুস্তিকাতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় মিলে। আমরা অবতারবাদের পক্ষপাতী নহি। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ একেবারে ভগবানে নিমগ্ন হইয়া যোগযুক্ত অবস্থায় গীতার শ্লোকগুলি অর্জ্জুনকে বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমি যোগযুক্ত হইয়া যাহা একবার বলিয়াছি, তাহার আর পুনরুল্লেখ করিতে সমর্থ হইব না "ন চ শক্যা পুনর্ভূয় স্মৃতি মে' সংভবিষ্যতি"। পুস্তিকাখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহাতে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই পুস্তিকায় খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে সমস্ত অমূল্য উক্তি আছে, তাহারও কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন মুসলমান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইস্লাম-শব্দের অর্থ ভগবানে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন। এই আত্মসমর্পণ ভক্তি ভিন্ন অসম্ভব। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম যখন একটি ধর্ম্ম, তখন উহা ঈশ্বরবিহীন হইতে পারে না। বৌদ্ধ দর্শন: যাহা পরে সংরচিত হইয়াছিল, তাহা বুদ্ধদেবের প্রকৃত শিক্ষার ঠিক অনুগত নহে। আমরা এই পুস্তিকাপাঠে আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ ঠিক ভগবান কি না বা পূর্ণ অবতার কি না, সে দিকে জোর না দিয়া গীতার অন্তর্নিহিত নির্ব্বিবাদ খাঁটি সত্য আহরণ করিতে হইবে—"সর্ব্বেভ্যঃ সারম্ আদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যঃ ইব ষট্পদঃ"। মধুকর যেমন পুষ্প হইতে সারভাগ গ্রহণ করে, আমাদিগকেও সর্ব্বশাস্ত্র হইতে তেমনি সারসংগ্রহ করিতে হইবে।

AN EPISTLE TO THE PRINCES OF INDIA By Rai Jadu Nath Majumder Bahadur C,I,E,

যশোহরের যদুনাথ মজুমদার মহাশয় বঙ্গের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ উকীল। কিন্তু কেবলমাত্র ওকালতী তাঁহার অপরিসীম কার্য্য-কুশলতাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি শাস্ত্রদর্শী এবং একখানি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রের (হিন্দুপত্রিকার) সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের বিশাল ব্যবসা আছে। সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় রাজগণ উদ্দেশে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ সুপরামর্শগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত নামে প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরলোকগত (নেপালের) সামসের জং বাহাদুর মহোদয়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তিকায় রাজগণের কল্যাণ-কামনায় যে সমস্ত উপদেশ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই হিতকর ও বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপ-যোগী। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কয়েকটির অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"যে পিতা পুত্রগণের কল্যাণ চান, তিনি নিজে অপবিত্র জীবন যাপন করিতে পারেন না; কেননা

সন্তানগণ প্রায়শঃ পিতার অনুসরণ করে। রাজা কি প্রজাগণের পিতা নন?"

"দেহ মন বাক্যকে পবিত্র রাখ। তুমি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হও না কেন, তোমার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইবে।"

"প্রজাপ্রদত্ত কর রাজার বিলাসবিভ্রমের জন্য নহে, কিন্তু উহা প্রজার কল্যাণবর্দ্ধনের জন্য।"

"দক্ষ ও সাধু লোককে মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োগ কর। চাটুকারকে প্রশ্রয় দান করিও না।"

THE EVIDENCES OF THISM—শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চতুর্ব্বিধ প্রমাণের উল্লেখ আছে। সীতানাথ বাবু একজন দার্শনিক। পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও তিনি ইহাতে তাঁহার সমধিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকখানি সাধারণের পক্ষে সুবোধ্য না হইলেও তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে ইহা যথেষ্ট মূল্যবান। ইহা বঙ্গভাষায় অনূদিত হইলে আরও কল্যাণের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সময়ে ঈদৃশ পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। চি. চ।

বাঙ্গালীর খাদ্য।—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন এল, এ, এম, এস প্রণীত। "আরোগ্য নিকেতন" ২০নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ৷৷০ আনা। 'ডবল ক্রাউন' আকারে ১০৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

উদীয়মান কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন মহাশয় ইতিমধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিকপত্র-পরিচালনায়, প্রবন্ধরচনায় ও গ্রন্থপ্রণয়নে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ ইহাঁর এই "বাঙ্গালীর খাদ্য" যে জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছে, তাহা ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইতেই সুব্যক্ত। পনেরোটী পরিচ্ছেদে নানাদিক দিয়া নানা ভাবে বাঙ্গালীর খাদ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্যে আয়ুর্ব্বেদের মত কি, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু প্রভৃতি খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেশীয় আচার-ব্যবহার ও আয়ুর্ব্বেদীয় মতের সমাবেশে ইহার অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত, গ্রন্থখানির প্রাঞ্জল ভাষা ও অনাড়ম্বর ভঙ্গি ইহাকে বালক ও স্ত্রীলোকদিগেরও প্রিয় করিয়া তুলিবে। পরিশেষে বক্তব্য 'ভাইটামিন' পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আধুনিক অবিষ্কার। ভারতীয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে এই নবাগতটীর কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি না, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছু আলোচনা করিলে সুখী হইতাম।

পথের কথা ও নীতিগাথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রিডার প্রণীত, ডবল ক্রাউন আকারে ।/০+২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৸০ আনা।

গ্রন্থকার দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে সব সুচিন্তা ও সত্য চিন্তা করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত গদ্যে ও পদ্যে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; এইগ্রন্থে সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, এই গ্রন্থে ইংরাজি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় "সুভাষিতগুলি" তাঁহার "স্মারকলিপি" হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে গ্রন্থকারের উদার হৃদয়, উন্নত মস্তিষ্ক ও শোভন রুচির পরিচয়ে আনন্দ দান করে।

আর্য্যপ্রতিভা।—শ্রীসূর্য্যকুমার দে বি-এ অধ্যাপক, আকিয়াব। রয়াল ১৬ পেজী আকারে ৭১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ।/০ আনা।

এদেশে ইউরোপীয় জাতির সমাগমের পূর্ব্বে নানাবিষয়ে আর্য্যজাতির প্রতিভার যেরূপ বিকাশ ঘটিয়াছিল, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে প্রাচীন ভারতের শিল্প, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছে। লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও আলোচনার সহিত পরিচিত হইয়া আমরা উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি। সু. চ. চৌ.।

যোগেন্দ্রস্মৃতি—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় চক্রবর্ত্তী প্রণীত "শোকোচ্ছ্বাস" এবং শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল কুণ্ড মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "যোগেন্দ্রস্মৃতি" নামক দুইখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তিকা দুইখানিতে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হরিপুরের জমীদার স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সৎকার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে এবং তাঁহার বিভিন্ন বয়সের দুইখানি হাফটোন প্রতিকৃতি আছে। সদাশয় যোগেন্দ্র বাবুর সাধু দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

সুদিন বিচার।—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সঙ্কলিত। কাশীধাম মহামণ্ডল প্রেসে শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা।

বিদুষী মহিলা শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রণীত সুদিন-বিচার পড়িয়া সুখী হইলাম। ইহা দিন দেখিবার অতি উপাদেয় গ্রন্থ। জ্যোতিষ হইতে প্রয়োজনীয় বিবরগুলি সংগ্রহ করিয়া অতি সরলভাবে সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাস্তিক্য-

ষাদের যুগে অনেকেই অনেক কিছু মানিতে না চাহিলেও জ্যোতিষ যে আমাদের প্রাচীন উন্নত যুগের ঋষিগণের একটী শ্রেষ্ঠ অবদান, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। হিন্দুদের প্রতি পদক্ষেপে জ্যোতিষের প্রয়োজন থাকা সত্বেও সম্যক আলোচনার অভাবে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের এই অমূল্যরত্নটী জ্যোতিহীন হইয়া পড়িতেছে। শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জ্যোতিষে আগ্রহ দেখিয়া আশা হয় যে, আবার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এবিষয়ে মনোযোগী হইয়া জ্যোতিষের অন্তর্নিগূঢ় তত্ত্বপ্রকাশে সক্ষম হইবেন। উপযুক্ত শিক্ষা ও গবেষণা হইলে আবার জ্যোতিষের পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া আসিতে পারে। জ্ঞা. ব.।

শোকসংবাদ।

মহামহোপাধ্যায় ৺যোগীন্দ্রনাথ সেন বৈদ্যরত্ন।—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গত ১৬ই আষাঢ় বুধবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় বৈদ্যরত্ন কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার ৬২ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। ইনি স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং নিজেও সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। ইহাঁর পিতার উপদেশক্রমে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় বিশেষ কৃতিত্বলাভের উদ্দেশ্যে ইনি মেডিকেল কলেজেও তিন বৎসর পাঠ করিয়াছিলেন। কলেজ ছাড়িয়া তাঁহার পিতার নিকটও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। ইনি আয়ুর্ব্বেদসাম্মিলনের প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃদেবের অধ্যাপক কবিরাজ-কুলতিলক গঙ্গাধর চরকসংহিতার "জল্পকল্পতরু" নামে টীকা প্রণয়ন করেন। কিন্তু সেই টীকা সাংখ্য-বেদান্তাদি ষড়্‌দর্শনের তত্ত্বে পূর্ণ থাকায় সাধারণ ছাত্রের তাহা বোধগম্য হয় নাই। সেই দার্শনিকতা-সম্বলিত চরকসংহিতা এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। সাধারণের বোধগম্য একখানি প্রাঞ্জল টীকা প্রণয়ন করিয়া চরকের এক অভিনব সংস্করণে ইনি হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি উহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। আমরা পরলোকগত আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তিসান্ত্বনা প্রদান করুন।

আদিব্রাহ্মসমাজের

আয় ও ব্যয়।

১৮৫১ শক। ১৩৩৬ সাল।

নেট আয়		৪২৭৮।৶০
জমাখরচী		১০৫৫৷৶৯
মোট আয়		৫৩৩৪৲৯
পূর্ব্ববৎসরের স্থিতি		২৬৮৴০
সমষ্টি		৫৩৬০৮৶৯
নেট ব্যয়	৪৬৫৮৵৬	
জমাখরচী	৫৩৩৮৵০	
মোট ব্যয়		৫১৯২৲৬
স্থিত		১৬৮৮৶৩

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	২৪০০৲
আনুষ্ঠানিক দান	৬৮৲
এককালীন দান	২৫৲
উৎসবের দান	৫৲
বণ্ডেড অয়ার হাউস	১০০৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৬৮৴৩
প্রচার ফণ্ড	৭৯৶০
সমষ্টি	২৬৮৪৲৩

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	১৩৫৷০
হাল	১৪৭৮৶০
অগ্রিম	১৲
নগদ	১৫।০
বিজ্ঞাপন	২৭৭৷০
মাশুল	২১৵০
সমষ্টি	৫৯৮।৴০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রাঙ্কন	৬৫৫৸৯
কাগজের মূল্য	৩০০।৴০
দপ্তরী	৪০৲
সমষ্টি	৯৯৬৴৯
সর্ব্বসমষ্টি	৪২৭৮।৶০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের পাথেয়	১২০৲
গায়ক	৩৮৫৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫০৲

হিঃ রক্ষক	১১০৲
বেহারা	১৩২৲
মেথর	২৭৲
পাথাকুলি	৬৵০
মাশুল	৩৭৸৵৩
ইলেক্‌ট্রিক	৫৬॥৬
আলো মেরামত	৮।৴০
কেরোসিন	৭॥৵৬
বারবরদারী	৬৩৲
অন্যান্য	৪১৻৬
সরঞ্জামী	১৩।০
ট্যাক্স	২৭০৸০
ড্রেণ পরিষ্কার	৫৻৵০
পূর্ত্তকার্য্য	২৭॥৶৬
মেডিকেল মিশন	১৮।৵৬
প্রচার ফণ্ড	৪৬॥৴০
খাজনা	২॥৬
পার্ব্বণী	২।০
মাঘোৎসব	২৯৯।৯
চৈত্র-সংক্রান্তি	৬।৴৬
হাওলাত প্রদান	৬৲
সস্‌পেন্স	৸৵০
কাগজ ক্রয়	২১১৸৴৩
গচ্ছিত	২৯৬.৯
সমষ্টি	২২৫২।৬

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজের মূল্য	১৭৭।০
দপ্তরী	৪৮।৵৬
মাশুল	৭৩৴৩
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫০৲
হিঃ রক্ষক	১০০৲
মূল্য আদায়ের কমিশন	২৪৵০
বিজ্ঞাপন	১৬৲
বিবিধ	১৸০
সমষ্টি	৫৩১৶৯

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	২৯৩৸৶০
কম্পোজিটর	৪৭৪৸৶৩
প্রেসম্যান	২৩৪৻৬
ইঙ্কম্যান	১১১৶৩
কাগজতোলা	৬৭॥৶০
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫০৲
হিঃ রক্ষক	১০০৲
প্রুফ কাগজ	৭॥৶০
ছাপার কাগজ	২৫৫॥৬
কালি	১৫।৬
তৈল	৬৸৴০
তামাক	৪।৵৬
সাজিমাটি	৩৻৬
রুলঢালা	৫॥৶৬
মাশুল	।৶৬
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১২২৵৯
লেই জন্য ময়দা	১৸৴৩
দপ্তরী	৪৭৶০
বিবিধ	৩২॥৴৬
জলপানী	৭৸০
শিরিষ	৩॥৬
ব্রাস	১॥৴৬
দড়ি	৸৬
পিতলের রুল	২॥০
অক্ষর ক্রয়	১৪।৶০
লাইসেন্স	১২৲
সমষ্টি	১৮৭৪॥৵৩
সর্ব্বসমষ্টি	৪৬৫৮৵৬

জমাখরচী।*

ব্রাহ্মসমাজ	আয়	ব্যয়
কোম্পানীর কাগজ বিক্রয়	২৮২॥৶৯	০
ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	২৩৯৲	০
উৎসবের বক্তৃতা মুদ্রণ		৪৮৲
ঐ কাগজের মূল্য		২৭॥০
ঐ দপ্তরী		৩৮।৵০
	৫২১॥৶৯	১১৩৸৵০
যন্ত্রালয়		০
উৎসবের বক্তৃতা	৪৮৲	০
দপ্তরী	৩৮।৵০	০
কাগজের মূল্য	২৭॥০	০
তত্ত্ববোধিনী মুদ্রণ	৪২০৲	০
	৫৩৩৸৵০	
তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাঙ্কন	০	৪২০৲
সমষ্টি	১০৫৫॥৴৯	৫৩৩৸৵০

	আয়	ব্যয়
ব্রাহ্মসমাজ	৩২০৫৸০	২৩৬৬৸৵০ + ৮৩৯॥৴৬
তত্ত্ববোধিনী	৫৯৮৴০	৯৫১৶৯ − ৩৫২৸৵৯
যন্ত্রালয়	১৫২৯৸৶৯	১৮৭৪॥০ − ৩৪৪॥৵৬
সমষ্টি	৫৩৩৪৻৯	৫১৯২৻৬ = + ৮৩৯॥৴৬ − ৬৯৭॥৴৩ = + ১৪২৻৩ + ২৬৸৵ + ১৬৮৸৵৩

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

* জমাখরচী টাকা মাত্র পাল্টাই জমাখরচ প্রকৃত আয় ও ব্যয় নহে।

(৮ম বর্ষ ১৩৩৮)

বাঙ্গলার সঙ্গীত বিষয়ক একমাত্র সচিত্র মাসিক।

বার্ষিক মূল্য ৩৬০। প্রতি সংখ্যা ।৵০ মাত্র।

কেবল মাত্র

সঙ্গীতবিজ্ঞানের গ্রাহকবৃন্দের প্রতি সুবর্ণ সুযোগ !!

=শতকরা ২০৲ কমিশন বাদ=

পত্রিকার পুরাতন এবং যাঁহারা সন ১৩৩৮ সাল হইতে গ্রাহক হইবেন, আমরা তাঁহাদের নিকট নিম্নলিখিত কুপন প্রণালীতে শতকরা ২০৲ কমিশন বাদে সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র বিক্রয় করিব।

১। প্রত্যেক নতুন গ্রহক বার্ষিক চাঁদা দিবার সময় একখানা কুপন পাইবেন।

২। পুরাতন গ্রাহকগণ এক আনার ডাকটিকিটসহ কুপনের জন্য লিখিলে একখানা কুপন পাইবেন।

৩। প্রত্যেকের গ্রাহক থাকা কালীন এক বৎসরের মধ্যে মাত্র একবার এই সুযোগ পাইবেন।

৪। বায়না সহ অর্ডার দিবার সময় ঐ কুপন ফেরৎ দিতে হইবে।

প্রকাশক
আর, বি, দাস।
৮ সি লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

তত্ত্বসংখ্য

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

১৭৬৫ শক ... মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৫৬

১৮৮৫ শক শ্রাবণ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ।/০ আনা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁ তৎসৎ

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৮। দূরে থেকো না।

মা! আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়া থাকিও না। আমাকে পাগল করিও না। তোমার নিশ্বাসের সুবাস যখন আমি কল্পনাতেও অনুভব করি, তখন আমি তো আর আমাতে থাকি না। যখন তোমার স্নেহের ডাক প্রাণের ভিতর প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তোলে, তখন মা মা বলিয়া তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রাণ যে একেবারে উতলা হইয়া ওঠে। প্রভাতে যখন দেখি, কনকভানু আস্তে আস্তে আকাশ ঠেলিয়া উঠিতেছে, তখন তো আর থাকিতে পারি না; তাহার মধ্যে কি জানি কেন তোমারই মুখ দেখিতে পাই, আর তাই ইচ্ছা হয় সমস্ত সূর্য্যখানিকে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করি। পৌর্ণমাসী সন্ধ্যায় যখন দেখি, পূর্ণচন্দ্র আকাশের মাঝখান দিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহা হইতে তো চক্ষু আর ফিরাইতে পারি না—দেখিতে দেখিতে সমস্ত চাঁদ ব্যাপ্ত করিয়া তোমারই স্নেহে ভরা প্রসন্ন মুখ ভাসিয়া ওঠে। যতই দেখি [illegible] আর তৃপ্তি হয় না। শেষে যখন প্রত্যা- [illegible] পড়ে, আর অদৃশ্য হইয়া যায়, আমি তাহা জানিতেও পারি না—তোমারই মুখ অনুক্ষণ আমার নয়নের সম্মুখে জাগ্রত থাকে—আমি আপনাকে তোমারই বক্ষে কখন্ যে হারাইয়া ফেলি, বুঝিতেও পারি না। কখন্ যে তুমি লুকাইয়া আসিয়া আমার চক্ষে ঘুমের ঘোর বুলাইয়া দাও, কিছুই জানিতেও পারি না। আমার প্রতি তোমার স্নেহ যখন তোমাকে বড়ই পীড়া দেয়, তখনই তুমি ছুটিয়া আসিয়া স্নেহপ্রেমের ধারায় আমায় ডুবাইয়া দাও। সংসারের বিপদআপদের ঝঞ্ঝাবাত যখন আমার মাথার উপর দিয়া প্রচণ্ড বেগে বহিতে থাকে, তখন তুমি যে কি আশ্চর্য্য উপায়ে আমাকে তোমার পক্ষপুটের নিম্নে রাখিয়া রক্ষা কর, তাহা কাহাকে বলিব? আমি নিজেই তো তাহা বুঝি না। মা! তুমি মাঝে মাঝে লুকাইয়া থাক, আমার কাছে ধরা দাও না বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি সারা হইয়া গিয়াছি—আমার সমস্ত বল ও শক্তি অশ্রুধারার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। এখন তুমি আসিয়া আমার প্রার্থনাগুলি সফল করিয়া অন্তরে বল ও শক্তি বিধান কর—আমাকে নূতন মানুষ করিয়া গড়িয়া তোল। তোমার নামগানে আমাকে পাগল করিয়া তোল, যাহাতে

আমি মাতৃনাম শুনাইয়া জগতবাসীর প্রত্যেককে আমারই মত পাগল করিয়া তুলিতে পারি।

৭৯। আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি।

মা! আমার হৃদয় যে অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। ঐ আঁধার ঘরে তোমার প্রদীপখানি জ্বালাইয়া রাখ। আমার হৃদয়ে কোথায় কি যে আছে, কিছুই যেন খুঁজিয়া পাই না। তোমার গর্ভে যখন শুইয়াছিলাম, তখন তো সেখানে এতটুকু আলোক প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু সেখানেও তোমার স্নেহদৃষ্টি শত চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতিতে অন্ধকার বিখণ্ডিত করিয়া আমার অন্নপানের যোগাড় করিয়া দিত। আমার বড় ইচ্ছা হয়, এই সমস্ত সংসারের ঝড়ঝাপটা এড়াইয়া গিয়া আবার সেই আগেকার মত তোমার গর্ভের নীরব শান্তির মধ্যে লুকাইয়া পড়ি। চক্ষু চাহিলেই আমি ভয়ে কাঁপিতে থাকি, কখন্ কি ঝড়ঝাপটা আসিয়া আমাকে ধরাশায়ী করে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেই যেন আমি ভাল থাকি—অন্তরে সমস্ত ক্ষণই তোমারই প্রসন্ন মুখখানি জাগিয়া থাকে। অন্ধকারের ভিতর তোমারই হাতে প্রজ্বলিত দীপখানি জ্বলিতে থাকে। তখন দেখি, অন্ধকার বলিয়া যে ভয় পাইতেছিলাম, সে ভয়ের কোন কারণ নাই—তোমারই জ্যোতিতে তো সমস্ত আলোকিত হইয়া আছে। "আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি, দিবারাতি নাই সেখানে"। আশ্চর্য্য এই যে, ইহা আগে আমার চোখে পড়ে নাই। এসো মা! আমার আঁধার ঘরে এসো। কি জানি কেন, আমার প্রাণের ভিতর মাঝে মাঝে ঘন অন্ধকার ছাইয়া ফেলে। আমি জানি, আমি দেখিয়াছি, সেখানে তোমার জ্যোতি দিনরাত প্রকাশ পাইতেছে, তবু কি জানি কেন, অন্ধকারের একটা ঘোর আসিয়া মাঝে মাঝে আমাকে মুহ্যমান করিয়া ফেলে। তোমাকে কাতর প্রাণে ডাকিতেছি। তুমি আসিয়া আমার প্রাণের এই অন্ধকার কাটাইয়া দাও। তোমার এই শিশু-সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও। আমার এই অশান্ত প্রাণ একটু শান্ত হোক। অশান্তির বোঝা বহিবার আর শক্তি নাই। মা! কোলে তুলিয়া লও।

৮০। কোলে লও।

মা! না হয় আমি তোমার নিকট বড়ই অপরাধ করিয়াছি, তাই বলিয়া কি আমাকে মাটীতে এই রকম জোরে ছুড়িয়া ফেলিতে হয়—আমার প্রাণে কি ব্যথা লাগে না? তোমার কাছে আমার কান্না ছাড়া আর তো কোনই বল নাই। যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, শতবার তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু আমি যখন তোমার সন্তান, তখন এ প্রকারে আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পার না। আমাকে যতই দূরে ঠেলিয়া ফেলিবে, আমি ততই জোরে তোমার কোলে উঠিবার জন্য তোমার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইব। এই রকম মাঝে মাঝে আমার দোষের জন্য আমাকে তোমার কোল হইতে নামাইয়া দাও বলিয়া লোকে মনে করে যে তুমি আমাকে ভালবাস না। কিন্তু মা আমি জানি, তুমি আমাকে কত ভালবাস। তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া না লইলে আমার নিদ্রা বিশ্রাম কিছুই থাকিবে না; আমি দিনরাত তোমার ঐ মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিব—আমার গান কথা, এমন কি কান্নাও থামিয়া যাইবে, তখন তো আর আমাকে কোলে না লইয়া থাকিতে পারিবে না! আমি এই তোমার চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিলাম। তোমার চরণ ছাড়া সংসারের আর যাহা কিছু, আমার কাছে সকলই শূন্য—সকলই শূন্য। আমার সমস্ত হৃদয় শূন্য হইয়া গিয়াছে। তুমি আমায় তোমার কোলে লইয়া আমার হৃদয়কে তোমার স্নেহপ্রেমে পূর্ণ করিয়া দাও—আমি একটুখানি প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া শান্তি লাভ করি।

৮১। সংসার-শৃঙ্খল।

মা! সংসারের কাজে ডুবিয়া আছি। তুমি কতই ডাকিতেছ। আমিও তোমার ডাকের সাড়া দিয়া বারে বারে বলিতেছি—যাই—যাই। কিন্তু সংসারের কাজও আর সারা হয় না, তোমার কাছেও আর যাওয়া হয় না। তুমি তোমার স্নেহপ্রেমের স্তন্যদানে আমার অন্তর ভরিয়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছ। আমি যাইতে পারিতেছি না বলিয়া তোমার স্নেহপ্রেম পাইবারও অধিকার পূর্ণভাবে পাইতেছি না। সংসার হইতে

তুমি আমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাও। কাজ করিতে করিতে সংসারের কাছে কতই আঘাত পাইতেছি। কিন্তু এ কোথায় আমাকে ফেলিয়াছ যে, এত আঘাত পাইয়াও এত কষ্টের ভিতর প্রাণের সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমার কোলে উঠিবার অবসরই পাই না। সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বে নদীর ঢেউয়ে ভাসিতে ভাসিতে তোমার নামে কত গান রচনা করিতাম, তোমাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া ফুলের সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে কত না খেলা করিতাম, কত না প্রাণের হাসি হাসিতাম। তুমি যে ঝকঝকে নীল বসন পরিয়া আমার কাছে হাসিতে, আমি সেই বসন ধরিয়া তোমার কোলে উঠিবার কত না চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এ কি কাজের ভার আমার উপর দিয়াছ যে, আমাকে সে খেলা, প্রাণের সেই খোলা হাসি, সমস্তই ভুলিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয়, তোমাকেই বা ভুলিয়া বৃথা কাজেই সময় কাটাইয়া দিই। মা— মা রক্ষা কর সে পাপ হইতে। আমি আর কাহারও কথা শুনিব না—সংসার হইতে আমি সরিবই সরিব—দিনরাত তোমার ঐ চরণতল ধরিয়া আমার জীবনের একতারাতে তোমারই নাম গাহিতে থাকিব। তুমি এসো—তোমার পদধ্বনি শুনিলেই আমার সংসারশৃঙ্খল স্বতই খসিয়া যাইবে। তখন চন্দ্রতারা সকলই আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। তুমিও আনন্দের স্নিগ্ধ হাসি হাসিবে। তোমার সেই প্রসন্ন মুখ দেখিয়া আমি বিভোর হইয়া যাইব।

৮২। নির্জ্জনে।

মা! আমি নির্জ্জনে তোমার সঙ্গে দুটো কথা কহিতে চাই। চারিদিকে যখন লোকজন আত্মীয় স্বজন তোমাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকে, আমি সেখানে চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া থাকি। সেখানে আমার কথা ফুটি ফুটি করিয়াও ফোটে না। তবে যদি তুমি নিজে নিকটে আসিয়া স্নেহে ও প্রেমে ডাক দিয়া আমার সেই মূকত্ব ঘুচাইয়া দাও, তখন আমার প্রাণের কথা নীরবে অশ্রুর আকারে প্রকাশিত হইয়া তোমার চরণে পতিত হয়। তখন তুমি আমার প্রাণের ব্যথা বুঝিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লও—সে আনন্দ তুমি ছাড়া আর কে বুঝিবে? নিশীথের ঘন অন্ধকার যখন চারিদিক ঘিরিয়া ফেলে, যখন সকলেই তোমাকে ছাড়িয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে তোমা হইতে দূরে যায়, তোমার সঙ্গে আমার কথা কহিবার সেই তো প্রশস্ত সময়। সেই সময়ে আবোলতাবোল ভাষায় কত বাজে কথা ব... তোমাকে যে বিরক্ত করি, তাহার ঠিকানাই থাকে না; আমি তো তাহার মধ্যে কোনই শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাই না; কেবল বুঝি যে, আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছি, আর আমার প্রাণ হালকা হইতেছে। যখন প্রাণের বাগানে শিউলি-ফুল ঝরিয়া সুগন্ধে আমাকে আকুল করিয়া তোলে, তখন তোমারই চরণে পূজা দিবার জন্য শিউলি ফুল-গুলি একে একে তুলিতে তুলিতে তোমার সঙ্গে কত-না প্রাণের কথা কই—সে কি আরাম! চিরকাল যেন আমি এই রকম তোমার আঁচলধরা শিশুই থাকি। অনন্তকাল আমি তোমার আঁচল ধরিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিবার ফিরিবার অধিকার পাইলেই সুখী।

অশ্রদ্ধায় বিনাশ, শ্রদ্ধায় জ্ঞানলাভ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। অশ্রদ্ধায় বিনাশ।

ভারতের ঋষিদিগের নিকট হইতে আমরা এই একটী মহান সত্য লাভ করিয়াছি যে, যাহারা ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে এবং ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাবান লোকেরা যে বিনাশের মুখে পতিত হইবে, তাহাতে কোনই ভুল নাই। এই সত্য একটী মস্ত সত্য—ইহার একটী বর্ণও মিথ্যা নহে, মিথ্যা হইতেই পারে না।

২। ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্ম বলিলে আমরা বুঝি, যাহা কিছু জগৎ-সংসারকে ধরিয়া রাখে। ভাল কর্ম্ম, ভাল ভাব, ভাল চিন্তা প্রভৃতি ভাল যাহা কিছু, তাহাই সংসারকে ধরিয়া রাখে। তবেই দাঁড়াইল এই যে, সংসারকে ধরিয়া রাখিবার উপযোগী যাহা কিছু, তাহাই ভাল, তাহাই ধর্ম্ম—এইটুকু আমরা সোজাসুজি বুঝি। সুতরাং

ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া, ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া ধর্ম্ম হইতে, ভাল বিষয় হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিলে আমরা কাহার উপর, কোন্ দৃঢ় ভিত্তির উপর আমাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিব? তাহা হইলে জীবনে দৃঢ় অবলম্বন কোন কিছুই থাকে না। জগৎসংসার আমাদিগকে তখন আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। বাঁধিয়া রাখিবার উপযোগী যাহা দৃঢ় মঙ্গল রজ্জু, তাহা যে স্বহস্তে কাটিয়া দিয়াছি।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন।

কাজেই ধর্ম্ম হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অধর্ম্মের পথে চলিতে থাকিলে কক্ষভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় বিনাশের মুখে, মৃত্যুর মুখে যে পতিত হইব, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন এই যে, কখন ধর্ম্ম নাই এরূপ মনে করিবে না এবং ধার্ম্মিকদিগের প্রতি উপহাস করিবে না। যদি কখন ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আপনাকে প্রকৃতিভ্রষ্ট ও বিপদের সন্নিহিত জানিয়া সাবধান হইবে।

৪। অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিয়ম।

যেমন জড়রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মনিয়ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঈশ্বর যেমন প্রকৃতির নিয়ন্তা, সেইরূপ তিনি অধ্যাত্ম-রাজ্যেরও নিয়ন্তা। এই কারণে কি জড়প্রকৃতি, কি অধ্যাত্মজগত, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুনিয়মসকল অবিচলিতভাবে কার্য্য করিয়া চলিতেছে। সেই সকল নিয়মের মধ্যে কখনই বিশৃঙ্খলা ঘটে না। পাপী অবশ্যই দণ্ড পাইবে, পুণ্যবান অবশ্যই পুরস্কৃত হইবেন।

ধর্ম্মের এই তত্ত্ব, অধ্যাত্মজগতের এই অচলপ্রতিষ্ঠ সত্য নিয়ম, যিনি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অবগত হন, তিনি অশ্রদ্ধার বিনাশকারক পাশজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্তরে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা পোষণ করিবেন।

৫। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"।

শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কি প্রকারের জ্ঞান লাভ করেন? যে জ্ঞানে পরম শান্তি লাভ করা যায়। ভারতের পূর্ব্বতন ঋষিরা বেশী কথা বলিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ফল সারবান অথচ স্বল্পাক্ষর কথায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। আমাদের মত তাঁহারা প্রত্যেক কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে চাহিতেন না। [illegible] এই যে, তাঁহারা শাস্ত্রের মুখে [illegible] [illegible] হইয়াছিলেন।

৬। সাধন ও সংযম।

সাধনের পথে সকল বিষয়ে সংযম আবশ্যক। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আবশ্যক হইতেছে বাক্‌সংযম। মহাসাধক মহামতি ব্যাসদেব ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে সাধকের অভিজ্ঞতালব্ধ একটী মহাসত্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সংযতেন্দ্রিয়, তৎপর ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে পরম শান্তি লাভ করেন এবং অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাবান সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ঋষিরা সাধনার বিষয়ে শ্রদ্ধার উপর বড় বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। তাঁহারা অন্ধ ভক্তিকে বিশেষ আমলে আনেন নাই।

৭। শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

ভক্তিমান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন, তাঁহারা এ কথা না বলিয়া শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন, এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা ভক্তি অপেক্ষা শ্রদ্ধাকে সম্পূর্ণ পৃথক ও উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই পার্থক্য দেখাইবার জন্যই বোধ হয় গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, "যোগিনা-মপি সর্ব্বেষাং, মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

৮। শ্রদ্ধা ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়।

ভগবানকে ভজনা করাই তো ভক্তির কথা—ঈশ্বরে ভক্তি না থাকিলে তাঁহাকে ভজনা করার কোন কথাই আসিতে পারে না। তবে সেই সকল ঈশ্বর-ভজনশীল ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রদ্ধাবানকে যুক্ততম বলা হইল কেন? ভক্তি অন্ধ এবং শ্রদ্ধা চক্ষুষ্মান। আমরা পিতাকে পিতা বলিয়াই ভক্তি করি। তাঁহার দোষগুণ কোন বিষয়ে লক্ষ্য করিতে চাহি না। আমি তাঁহাতে অবশ্য ভক্তিমান হইতে পারি। কিন্তু যদি আমার পিতা সর্ব্বদাই শুভ-কার্য্যে রত থাকেন দেখি, অন্যায়ের প্রতি অধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ দেখি, দেখিয়া যদি তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি অর্পণ করি, তবে সেই ভক্তিই হইল শ্রদ্ধা। ইহা হইতে বুঝিতেছি যে, কাহারও বিষয় জানিয়া, সদ্‌গুণ ও সাধু ভাবসকল উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতি যে ভক্তি অর্পণ করা যায়, তাহাকেই শ্রদ্ধা বলে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধা বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান চাই। শ্রদ্ধাতে ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় সাধিত দেখিতে পাই। শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে আমরা যে প্রকার সাধারণতঃ এক অর্থে বুঝি, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যে উভয়কে সে প্রকার একার্থ বলিয়া দেখিতেন না, তাহার প্রমাণ—শঙ্করাচার্য্য বিবেকচূড়ামণিতে একস্থানে বলিয়াছেন "শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যানযোগান্মুমুক্ষোঃ"।

৯। শ্রদ্ধার বিষয় উচ্চতর আত্মা।

শ্রদ্ধাভাজনকে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রদ্ধার ভিতরে ভক্তি উভয়ই থাকে, জ্ঞানও থাকে,

তেমনি শ্রদ্ধাতে আমা অপেক্ষা উচ্চতর একটী আত্মাও উহ্য থাকে। নিম্নশ্রেণীর পশুপক্ষী যতই কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দেখাক, তাহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার কথাই আসে না। আমা অপেক্ষা বয়সে বা জ্ঞানে বা কোন বিষয়ে ছোট যে মানুষ, তাহারও প্রতি শ্রদ্ধার কথা উঠিতেই পারে না। আমার সহিত সমতুল্য মানবের প্রতি ভালবাসা হইতে পারে, স্নেহ হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধার কথা আসিতে পারে না। আমা অপেক্ষা কোন বিষয়ে উচ্চতর যে আত্মা, তাঁহারই প্রতি আমার শ্রদ্ধা অর্পণ করা সম্ভব। এই বিষয়ে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সমধর্ম্মী। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীর প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে, অন্যান্য গুরু-জনের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে; জ্ঞানে ধর্ম্মে, কর্ম্মে প্রীতিতে আমা অপেক্ষা উন্নততর যে কোন ব্যক্তির প্রতিই আমার শ্রদ্ধা যাইতে পারে।

১০। পরমপুরুষে শ্রদ্ধা।

কিন্তু মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা অর্পিত হইবে, সে শ্রদ্ধা চরম শ্রদ্ধা নহে, তাহা আপেক্ষিক শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার ফলে আমরা পরম শান্তিলাভের অধিকারী হইতে পারি না। একমাত্র সেই পরম পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার ফলেই আমরা প্রকৃত জ্ঞান এবং পরম শান্তি লাভ করিতে পারি। একমাত্র সেই অনন্ত পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার উপলক্ষ করিয়াই গীতাকার বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্‌ধ্বা পরাং শান্তিমচিরে-ণাধিগচ্ছতি"॥

১১। শ্রদ্ধা জ্ঞানলাভের কারণ কেন?

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞানলাভের কারণ কেন? ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করিতে গেলেই তাঁহাকে জানা চাই। তাঁহাকে জানিতে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিদ্যাই যথাসম্ভব অধিগত করিতে হয়। সেই অনন্ত পুরুষকে সত্য সত্য সর্ব্বতোভাবে জানিতে গেলে অনন্ত দিক দিয়া, অনন্ত জ্ঞানের মধ্য দিয়া জানিতে হয়। এক কথায়, আমা-দিগকে একএকটী অনন্ত পুরুষ হইতে হয়, নচেৎ তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারিব না। কিন্তু তাহা তো আর সম্ভব নয়—তবে কি তাঁকে জানিতেই পারিব না? তাহা নয়। ভগবান তাঁহার অপার করুণায় এমন একটি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, মানুষ তাঁহাকে অনেক দিক দিয়া জানিতে পারে। তাঁহাকে জানিতে গেলে শারীর, মানস ও অধ্যাত্ম সত্যনিয়মসমূহের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে জানাই সহজ হয়, এবং এই কারণে তাহাকে জানিতে গেলে যত প্রকার সম্ভব তত প্রকারই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়। তাই ঋষিরা ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন। তাঁহাকে জানার শেষ নাই। যতই দেখিবে, ততই দেখিতে পাইবে তাঁহাকে জানিবার বিষয় সম্মুখে বিস্তৃতভাবে পড়িয়া আছে।

১২। ঈশ্বরে শ্রদ্ধার চরিতার্থতা।

জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিব, তাহা নহে। আমাদের কর্ত্তব্যই এই যে আমাদের সকল জ্ঞানের ভিতর দিয়া তাঁহাকে জানিয়া, তাঁহাকে বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা পাতা ও নির্ব্বহিতারূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করি। কেবল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলে আমাদের শ্রদ্ধা কখনও চরিতার্থ হইবে না। আমরা সেই বিশ্বাত্মার মহাগ্নি হইতে বিনিঃ-সৃত একএকটী বিস্ফুলিঙ্গ। আমরা সেই অনন্তপুরুষ পরমাত্মার সন্তান, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অর্পিত হইলে তবেই তাহা চরিতার্থতা লাভ করিবে। আমাদের যিনি পরম পিতা, তাঁহার নামগানে তাঁহার স্বরূপচিন্তনে, তাঁহার কার্য্যকলাপের আলোচনাতেই সমুদয় বিজ্ঞান, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় দর্শন চরিতার্থ হয়। সেই মহান্ পুরুষের ধ্যানে হৃদয় যে কি পর্য্যন্ত উন্নত হয়, তাহা স্বয়ং না প্রত্যক্ষ করিলে কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না।

১৩। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ফল।

সেই অনন্ত পুরুষ এতই মহান্ যে তদ্‌বিষয়ক চিন্তা তাঁহার অনন্তত্বের তলে হারাইয়া যায়। তিনি এত গভীর যে তাঁহার অনন্তস্বরূপের চিন্তায় আমা-দের সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। যখন এই পৃথিবীর বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আয়ত্ত করি, তখন আমাদের নিজের ক্ষমতার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে এবং নিজের বিদ্যাগর্ব্বে মত্ত হই। কিন্তু যখন ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে যাই, তখন তাহার তলস্পর্শ করিতে না পারিয়া, শত দূরদৃষ্টির ফলেও তাহার শিখরদেশ দেখিতে না পাইয়া আমরা প্রতিনিবৃত্ত হই; তখন আমাদের সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যায়। ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় অন্য কিছুই মানুষকে এত বিনয়নম্র করিতে পারে না। "অন্ত কোথা তাঁর, এই কথা সবে জিজ্ঞাসে হে।" ব্রহ্মবিদ্যা অন্তরে শ্রদ্ধা আনিয়া দেয়। ব্রহ্মবিদ্যা কেবল বিনয় আনে না, আমাদের অন্তরকে কি আশ্চর্য্যরূপে প্রসারিত করে, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব। ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করিলে মানুষের মন উদার ও প্রসারিত না হইয়া যাইতে পারে না। প্রাণীতত্ত্ববিৎ কীটপতঙ্গকে যথাযথ অস্ত্রপ্রয়োগে বিভক্ত করিতে পারেন, ভূতত্ত্ববিৎ পুরাকালের প্রকাণ্ড প্রাণীসমূহের উপর অনেক বক্তৃতা দিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ বিজ্ঞান মনকে উদার ও বিস্তৃত করে—আংশিক পরিমাণে ইহা সত্য বটে। কিন্ত

ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মের স্বরূপ আলোচনার ন্যায় অন্য কিছুই জ্ঞানকে বিস্তৃত করিতে পারে না, মানুষের আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে পারে না।

১৪। শ্রদ্ধাতেই পরম শান্তি।

ব্রহ্মবিদ্যা কেবল জ্ঞানকে বিস্তৃত করে না, কিন্তু পরম শান্তি প্রদান করে। ব্রহ্মবিদ্যার কেন্দ্রে যিনি, সেই পরমাত্মাকে অন্তরে চিন্তা কর, সকল ব্যথা দূর হইবে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই এক প্রশ্ন মানবের অন্তরে সমুত্থিত হইতেছে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? যে জগতের সীমা আমাদের কল্পনাতেও আসিতে পারে না, সেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রথম বিন্দু হইতে শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত একটি মহান্ কাতর-ধ্বনি অহরহঃ উদিত হইতেছে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম —কোন্ দেবতাকে আমাদের হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিব? মানব যখন অবধি অভিব্যক্ত হইল, তখন অবধিই জগতের সেই প্রাণের কথা হৃদয়ের প্রশ্নটী ব্যক্ত আকারে পরিস্ফুট হইতে চাহিতেছিল। অবশেষে বারিবিন্দুসকল যেমন মেঘের আকারে জমাট বাঁধিতে বাঁধিতে যখন আর ভিতরে ধরিয়া রাখিতে পারে না, তখন বারিধারায় নামিয়া জগতের বক্ষ শীতল করিয়া দেয়; তেমনি মানবের অন্তরে ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তিলে তিলে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে যখন জমাট আকার ধারণ করে, তখনই ইহা শ্রদ্ধার আকার ধারণ করিয়া ভগবানের চরণে নামিয়া আসে এবং তাহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া জগৎসংসারে শান্তিধারা ঢালিয়া দেয় ও তাহাকে সুকোমল করিয়া তোলে। এই শ্রদ্ধার ভিতরেই আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি পরিসমাপ্ত হয় ও চরিতার্থতা লাভ করে।

সংসার ও ধর্ম্ম।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন যে "সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ কর, অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সমস্তই সহজে লাভ করিবে।" অর্থাৎ হৃদয়-মনের সমগ্র শক্তি দিয়া ধর্ম্মের অনুসরণ কর; সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার অভাব হইবে না, ঈশ্বর তাহা তোমাকে দিবেন। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন যে "কল্যকার জন্য ভাবিও না, যে ঈশ্বর পাখীদের আহার দেন তিনি তোমারও জীবনরক্ষা করিবেন"—কিন্তু বর্ত্তমান কালে সভ্য সমাজে স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে কাহারও বড় উৎকণ্ঠা দেখা যায় না; লোকে সংসার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত এবং ধর্ম্মকে জীবন হইতে এক প্রকার নির্ব্বাসিত করিয়াছে।

কোন একটা বড় সহরে যাও, দেখিবে রাজপথে ও ষ্টীমার ঘাটে, রেলের ষ্টেশনে, ও কলকারখানায় কি মহা কল্লোল, কি বিপুল ব্যস্ততা, কি উদ্দাম কর্ম্মস্রোত! হয় ত তোমার মনে হইবে যে এ যুগে জীবনসংগ্রাম এত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দেহ-মনের সমুদয় শক্তি সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রয়োগ করাই প্রয়োজন। হয় ত তোমার মনে হইবে যে যীশুর কথা ভক্তির অত্যুক্তি মাত্র, বর্ত্তমান কালের উপযোগী নহে, এখনকার দিনে উহার অনুসরণ অসম্ভব; আপনাপন অভাবমোচনের চেষ্টা না করিলে ভগবান কখনই অলৌকিক উপায়ে অলসকে অন্নবস্ত্র দান করিবেন না। এই উপদেশ অনুসরণ করিলে অচিরেই আমাদিগকে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সপরিবারে পথে দাঁড়াইতে হইবে। অধিকাংশ লোকই মনে করে যে ভাতকাপড়ের শুধু সাংসারিক অভাব মোচন নয় কিন্তু সর্ব্ববিধ ভোগবিলাসের ব্যবস্থাটা আগে করা উচিত। তার উপরে যদি ধর্ম্ম হয় ত ভালই, আর যদি নাই হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সংসারকে ধর্ম্মের প্রতিকূল জানিয়া শান্ত ও সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরের ধ্যানধারণার জন্য লোকালয় হইতে দূরে—অরণ্যে, গিরি-গুহায় বা মঠে আশ্রয় লইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রবৃত্তির ভয়ে বিকম্পিত। তাঁহারা জীবনের সকল বাসনা ও কামনাকে বিসর্জ্জন দিয়া, সকল স্নেহমমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পরিবার বন্ধুবান্ধব সমাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যা ও আত্মনিগ্রহের দ্বারা হৃদয় হইতে সকলপ্রকার প্রবৃত্তিকে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা এক প্রকার আত্মঘাত। এরূপ সন্ন্যাসীর জীবন কিছুতেই মানবের পূর্ণতার আদর্শ নহে। ঈশ্বরের উদ্দেশে তাঁহারা মানুষকে কঠোরভাবে পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে স্বর্গে অবিশ্রান্ত পূজাবন্দনাই চলিতেছে। স্বর্গের কল্পনা হইতে তাঁহারা সকল প্রকার জ্ঞানচর্চ্চা ও কাজকর্ম্ম মুছিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু নিজের পরিত্রাণের জন্য যদি আমরা লোকালয় হইতে পলাইয়া যাই, তবে ত আমাদের দীন দুঃখী ভাই-ভগিনীর জন্য কিছু করার সম্ভাবনাও থাকে না।

একদল লোক বলিতেছেন যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গেলে আর ধর্ম্মসাধন চলে না; আর এক দল লোক বলিতেছেন ধর্ম্মসাধন করিতে গেলে আর সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে না। প্রথম শ্রেণীর লোক যেমন সংসারকে সার ভাবিয়া ধর্ম্মকে জীবন হইতে বিদায় করিয়া

দেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক তেমনি ধর্ম্মকেই সত্য এবং সংসারকে ধর্ম্মের প্রতিকূল জানিয়া সংসার হইতে দূরে পলায়ন করেন। উভয়েই সংসার ও ধর্ম্মের মিলনকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু একথা কি সত্য যে সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মসাধন অসম্ভব? এ কথা কি সত্য যে, সংসার ধর্ম্মের প্রতিকূল?

আমরা অনেকেই মনে করি যে আহারবিহার আমোদপ্রমোদ, অর্থোপার্জ্জন, স্ত্রী-পুত্রপ্রতিপালন, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যের অনুশীলন, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন—এগুলি জীবনের সাংসারিক দিক; আর ধ্যানধারণা, পূজাঅর্চনা, সঙ্গীতসংকীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রপাঠ—এইগুলিই ধর্ম্মসাধন। এই সকল সাধন হইতে যাহা কিছু আমাদিগকে বিচ্যুত করে আমরা তাহাকেই ধর্ম্মের অন্তরায় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণা বশতঃ অনেক ভাল লোকও মনে করেন যে, সংসারযাত্রায় মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ভিন্ন গতি নাই।

কিন্তু বাস্তবিক সংসার শয়তানের রঙ্গভূমি নয় কিন্তু ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট মানবের কর্ম্মক্ষেত্র। সংসার কতকগুলি কাজকর্ম্মের সমষ্টি নয়, এবং ধর্ম্মও অন্যপ্রকারের কতকগুলি কাজকর্ম্মের সমষ্টি নয়। ধর্ম্ম ও সংসারের মধ্যে কোন বিরোধ নাই এবং কোন কর্ম্মবিভাগও নাই। যখন একজন সংসারী লোক ধর্ম্মজীবন লাভ করেন, তখন তাঁহার বাহ্যিক কাজকর্ম্মের বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না; পূর্ব্বেও তিনি যাহা যাহা করিতেন পরেও তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু একটা মহা পরিবর্ত্তন আসে তাঁহার হৃদয়ে একটী দেবভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। যে কাজগুলিকে আমরা সচরাচর সংসারের কাজ বলি, তাহার মধ্যেই তিনি ধর্ম্মসাধনের সুযোগ দর্শন করেন। তিনি স্ত্রী ও পুত্রকন্যার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহেই বাস করিতে পারেন, ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিশিল্পের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু তিনি মানুষকে সন্দেহের দৃষ্টিতে না দেখিয়া বিশ্বাসের চক্ষে দর্শন করেন, লোকের সহিত ব্যবহারে চতুরতা পরিত্যাগ করিয়া সত্য এবং সরলতা অবলম্বন করেন এবং পাছে অন্য কেহ তাঁহাকে ঠকায় এই উদ্বেগের পরিবর্ত্তে তিনি যেন অপরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করেন—তাঁহার এই চিন্তাই প্রবল হয়। মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তাহারই মূলে কুটিলতা স্বার্থপরতা ও প্রবঞ্চনাও থাকিতে পারে, আবার সদ্ভাব ন্যায়পরতা ও সরলতাও থাকিতে পারে। একই কাজ এক ভাবে করিলে আমরা কলুষিত হই, এবং অন্য ভাবে করিলে তাহাতে আমাদের পুণ্য লাভ হয়। ধর্ম্ম ও সংসারের মূলে এই ভাবের ভিন্নতা।

মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে—এইগুলিই কর্ম্মের উৎস। এইগুলি সংখ্যায় পাপী ও সাধুর সমান। পাপীর যে এমন কতকগুলি কুপ্রবৃত্তি আছে যাহা সাধুর নাই, কিম্বা সাধুর যে এমন কতকগুলি সুপ্রবৃত্তি আছে যাহা হইতে পাপী বঞ্চিত, এরূপ নহে। আমাদের বিবেক আমাদিগকে বলিয়া দেয়, কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি ভাল আর কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি মন্দ। বিবেকের মূল অর্থ বিবেচনা ও বিচার। আমরা অনেক সময়ে বিবেকের প্রেরণার কথা বলি বটে কিন্তু ইহা ভুল, ইহা ভাষার অপব্যবহার। বিবেক নিজে একটী প্রবৃত্তি নয়, কিন্তু ইহা একটী স্বর্গীয় আলোক; এই আলোকেই আমরা দেখি যে ভোগবিলাস অপেক্ষা সেবা শ্রেষ্ঠ, প্রবঞ্চনা অপেক্ষা সত্যরক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিহিংসার বহু ঊর্দ্ধে ক্ষমার স্বর্ণ সিংহাসন। অনেকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পশুপক্ষী ও মানবের সমান। কিন্তু ইতর প্রাণীরা প্রবৃত্তির অন্ধ দাস, মানুষ প্রবৃত্তির চক্ষুষ্মান্ প্রভু। কেবল মানুষেরই আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষা করিবার শক্তি আছে। প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টী ভাল আর কোন্ কোন্টীই বা মন্দ, একমাত্র মানুষই তাহার বিচার করিতে সমর্থ। যখন জীবনের এক একটী সন্ধিস্থলে একটী ভাল প্রবৃত্তি এবং একটী মন্দ প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে এক-সঙ্গে উপস্থিত হয়, তখন মন্দটীকে পরিহারপূর্ব্বক ভালটীর অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা একমাত্র মানুষেরই আছে। যদি প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে ভালমন্দ না থাকিত, কিংবা যদি মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা না থাকিত তবে বিবেকের প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত তাহারা ভালকে ভাল জানিয়াও তাহার অনুসরণ করিতে পারে না, এবং মন্দকে মন্দ জানিয়াও তাহার অনুসরণ হইতে বিরত হইতে পারে না। হয় ত দীর্ঘকাল পাপের দাসত্ব করিয়া তাহারা নৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছে। এখানে বিবেকের সঙ্গে ইচ্ছার বিরোধ। এ অবস্থা আমরা সকলেই জানি। যখন বিবেকের আলোকে ভালমন্দ দেখিয়া আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাল যাহা তাহাই গ্রহণ করি, তখনই আমরা ধর্ম্মকে বরণ করি। এক কথায় ধর্ম্মের অর্থ বিবেক ও ইচ্ছার সম্মিলন।

তবে সংসার ও ধর্ম্মে প্রভেদ কোথায়? যে ব্যক্তির কাছে সুখস্বচ্ছন্দতার চিন্তাই সকলের উপরে, এবং তাহার জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিতে যাঁহার

আপত্তি নাই, তিনিই সংসারী; আর যিনি কোন অবস্থাতেই ন্যায় ও সত্য লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত নহেন, তিনিই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছেন। যাঁহার ধ্যান-জ্ঞান চিন্তা উৎসাহ উদ্যম অধ্যবসায় কেবল সম্ভোগের দিকে, যিনি নানা উপায়ে প্রবৃত্তির আগুনে আহুতি দিয়া কামনা ও বাসনাকে উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করেন তিনিই সংসারী; আর যিনি বিবেকের আলোকে প্রবৃত্তিগুলিকে দেখিয়া পশুপ্রবৃত্তিগুলিকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বন্ধনে বশীভূত করিয়াছেন, আমরা বলিতে পারি যে তিনিই ধর্ম্মকে বরণ করিয়াছেন। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটিত না করিলে সন্ন্যাসীর শান্তি নাই, কিন্তু যিনি ধর্ম্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন ও উৎকট পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি কোনও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ভয় বা অবিশ্বাস করেন না। মানবহৃদয়ের উচ্চতর ভাবগুলির বিকাশই তাঁহার লক্ষ্য।

যাঁহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে সুচতুর তাঁহারা বলেন যে "হাঁ, যীশুর উপদেশ বড় সুন্দর বটে কিন্তু উহা কাজের কথা নয়, উহা জীবনে পালন করা অসম্ভব। ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিলে চলে না।" কিন্তু যে উপদেশ পালন করা অসম্ভব, তাহাকে সুন্দর বলাও উচিত নহে। অধ্যাত্ম জগতে সত্য ও সুন্দর এক—যাহা সুন্দর তাহাই সত্য। বহির্জ্জগতে যেমন আলোকের অভাবে সৌন্দর্য্য অসম্ভব অন্তর্জ্জগতে তেমনি সত্যের অভাবে সৌন্দর্য্য অসম্ভব। যে উপদেশ আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝিব, তাহা আমরা পালন করিতে বাধ্য; যে আদর্শের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইব আমাদিগকে সে আদর্শের অনুসরণ করিতেই হইবে। একটী চিত্র দেখিয়া আমরা বলিতে পারি "আহা বেশ ত! আহা বড় সুন্দর!"—উহার ঐখানেই শেষ। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি বাধ্যতামূলক—"ক্ষমা, বড় সুন্দর, ক্ষমা বড় চমৎকার গুণ" একথা বলিলেই তাহা ফুরায় না—যাহা সুন্দর বলিয়া আমরা বুঝিব, তাহা জীবনে আমাদিগকে পালন করিতেই হইবে। হৃদয় যদি বলে কথাটী বেশ, কিন্তু বুদ্ধি যদি সঙ্গে সঙ্গে বলে উহা কাজের কথা নয়, তখন যেন আমরা বুদ্ধির প্রতিবাদকে তুচ্ছ করিয়া হৃদয়ের বাণীকেই মস্তকে বরণ করি।

যীশু যে ভগবানের উপরে নির্ভর করিবার কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ ত আলস্য অবলম্বন নহে—একেবারেই নহে। তিনি যে পাখীদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহারা কি অলস? তাহারা কি আহার অন্বেষণ করে না? করেই ত! নিশ্চয়ই করে! তাহারা কি শাবকদের জন্য [illegible] দিয়া যথাকালে বাসা নির্ম্মাণ করে না? করেই ত! নিশ্চয়ই করে! তাহারা যে মানুষের আলস্যশিক্ষার গুরু, একথা কখনই বলা যায় না। ভগবানই তাহাদিগের দুঃখঅভাবমোচনের জন্য প্রচুর আয়োজন করিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি নিজ হস্তে যাহা সঞ্চিত করিয়া রাখেন, চেষ্টা এবং পরিশ্রমের দ্বারা উহাদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হয়। তবে তাহারা কিসে মানুষের পক্ষে নির্ভরশীলতার আদর্শ হইল? তাহারা যাহা করে তাহাতে যদি কোন দোষ না হয়, তবে মানুষ সেই কর্ম্ম করিলে এত দোষের হইবে কেন?

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে মানুষ এবং ইতর প্রাণীরা যে আপন আপন অভাবমোচনের চেষ্টা করে এই দুই চেষ্টার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। মানুষের চেষ্টা বুদ্ধিমূলক, উহাদের চেষ্টা সংস্কারপ্রসূত। হাঁসের ছানা ডিম হইতে বাহির হইয়াই যে জলের সন্ধানে ধাবিত হয় এবং নদী বা সরোবরে গিয়া সন্তরণ দিতে আরম্ভ করে—এ কাহার ইঙ্গিত? এখানে যখন আমের মুকুল শুকাইয়া যায় তখন কোকিল ঠিক জানে কোথায় কোন্ সুদূরে বসন্ত তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহার না আছে দিগ্দর্শন যন্ত্র, না চেনে সে ধ্রুবতারা, অথচ সে সমুদ্র পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে চলিয়া যায়, এবং যথাকালে আবার ঠিক ফিরিয়া আসে—এই বা কাহার ইঙ্গিত? ইতর প্রাণীরা অন্ধভাবে কার্য্যসিদ্ধির নানা অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে, বিনা শিক্ষায় আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে, বিনা সাধনায় বিচিত্র সৌন্দর্য্য রচনা করে।

ইতর প্রাণীরা কেমন স্বভাবতঃ শান্ত ও নিশ্চিন্ত! ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের উৎকণ্ঠা নাই। কোথায় তাহাদের জন্য কি সঞ্চিত আছে অতি আশ্চর্য্যরূপে উহারা তাহার সন্ধান পায় এবং ঠিক সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। ইহা এক আশ্চর্য্য কৌশল, কিন্তু যেখানে কৌশল তাহারই পশ্চাতে জ্ঞান। পশুপক্ষীরা ত অন্ধভাবে ও অজ্ঞাতসারে কাজ করে, সুতরাং বলিতে হয় যে তাহাদের জীবনযাত্রার পশ্চাতে যে কৌশল সে কৌশল ঈশ্বরের। তাহাদের জীবন ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত একথা না বলিয়া আর কি বলিব? ভগবান স্বহস্তে তাহাদের জীবনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই অদ্ভুত রহস্যের কথা চিন্তা করিলে বাস্তবিক বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

জীবনরক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, পশুপক্ষীরা তাহা বিধাতার হস্ত হইতে লাভ করে বটে, কিন্তু তাহারা ঐ প্রয়োজনকে কখনও অতিক্রম করে না। তাহারা স্বভাবতঃ সংযত ও মিতাচারী; লোভে, তাহাদের

আতিশয্য নাই। মানুষকে প্রতিজ্ঞার বাঁধন দিয়া বাসনাকে খর্ব্ব করিতে হয়, সাধনের দ্বারা ভোগের লালসাকে দমন করিতে হয়। ইতর প্রাণীরা স্বভাবের নিকট যে সংযম শিক্ষা করে, মানুষকে বিবেকের আলোকে সেই সংযম অভ্যাস করিতে হয়। আমরা যদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে পারি, তাহা হইলে যে প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে পশুপক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে, সেই দেবভাবগুলির অবাধ বিকাশের সুবিধা হয়। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান সভ্যসমাজে সংযম কোথা? মানবের ভোগতৃষ্ণার অন্ত কোথা? বাসনাকামনার নিবৃত্তির চেষ্টা দূরে থাকুক, ভোগবিলাসই অধিকাংশ লোকের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। ভোগের লালসা মানুষের স্বভাবতই প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ লোক হৃদয়মনের সমুদয় শক্তি দিয়া সেই প্রবল লালসাকে আরও উদ্দীপ্ত করিতেই চেষ্টা করে।

বিবেক যে আমাদিগকে শুধু সংযম শিক্ষা দেয় তাহা নহে, কিন্তু বিবেকের অনুসরণ করিলে জীবনরক্ষার্থ আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার জন্য আমাদের উদ্বেগও কমিয়া যায়। এ কথাটা শুনিলে সহসা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কারণ পশুপক্ষীরা সংস্কারের প্রেরণায় অন্ধভাবে এবং অজ্ঞাতসারে কাজ করে, কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তাহারই পশ্চাতে চিন্তা থাকে। মানুষের পক্ষে কোন কাজই অন্ধভাবে এবং অজ্ঞাতসারে করা সম্ভব নহে। এ কথা সত্য, তথাপি ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কি শারীরিক কি মানসিক যে সকল কাজ করিতে প্রথম প্রথম বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম লাগে, অভ্যাসবশতঃ সেরূপ সকল কাজই ক্রমে সহজ হইয়া যায়। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে পশুপক্ষীরা প্রকৃতির নিকট হইতে যে সংযম ও নিশ্চিন্তভাব লইয়া জীবন আরম্ভ করে, মানুষকে অভ্যাসের দ্বারা সেইরূপ সংযম ও নিশ্চিন্তভাব অর্জ্জন করিতে হয়।

কিন্তু অভ্যাস মানুষকে ধর্ম্ম দিতে পারে না। কারণ অভ্যাস স্থিতিশীল আর ধর্ম্ম গতিশীল। অভ্যাস পুরাতন লইয়া থাকে, আর ধর্ম্মের লক্ষ্য চির উন্নতি, ধর্ম্মের লক্ষ্য নিত্য নব প্রেমভক্তি, নিত্য নব প্রতিজ্ঞা, নিত্য নব সংগ্রাম। অভ্যাস মানুষকে নীচ বাসনা ও কামনা জয় করিবার বল দিতে পারে বটে এবং খানিকটা উচ্চ ভূমিতে লইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে সংগ্রামের অবসান হয় না। ভগবান স্বহস্তে মানবের ললাটে অনন্তের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন। পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়াই আমাদের নিয়তি। অনন্ত অভ্যুদয়ের সহিত আমাদিগকে ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে হইবে। অনন্তের তীর্থপথে আমরা চিরযাত্রী। এ পথে নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, বিশ্রাম নাই, অবসাদ নাই—অথচ এই যাত্রায় কি আনন্দ, কত সুখ, কি বিপুল মত্ততা!

ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবনের উপায়।

(স্বামী সদানন্দ)

ব্রাহ্মসমাজকে সবল ও সতেজ করিবার জন্য আমাদিগের প্রচারকার্য্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। এ নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ, ব্রাহ্মসমাজের উদার ভাব ও নীতি, সুলভ সংবাদ পত্র ও পুস্তিকাদি দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিয়া বহুলপরিমাণে দেশের নানাস্থানে বিতরণ করা আবশ্যক। পূর্ব্বে খৃষ্টান মিসনরিগণ এইরূপে তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে সকল সমাজের সহায়তার প্রয়োজন।

এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একখানি ইংরাজি ও একখানি বাংলা, নববিধান সমাজের একখানি ইংরাজী ও একখানি বাংলা পত্র, বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের একখানি ইংরাজী ও মহারাষ্ট্র ভাষার পত্রিকা, অন্ধ্রদেশের নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী ও তেলেগু ভাষার পত্র এবং আদি-ব্রাহ্মসমাজের একখানি বাংলা পত্রিকা এবং যুক্তপ্রদেশের ইংরাজী পত্রিকা মেসেঞ্জ—এই কয়েকখানি পত্রিকার বিষয় আমরা অবগত আছি। কিন্তু এই সকল পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা এত অল্প যে, তাহা দ্বারা আমাদের ইচ্ছানুরূপ ফললাভ সম্ভবপর নহে। তদ্ভিন্ন, এই সকল পত্রিকার মধ্যে অধিকাংশই কেবলমাত্র সমাজের সভ্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। আমার ইচ্ছা যে অন্ততঃ এক-লক্ষ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাগুলি বিতরিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাবান লেখক দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করাইয়া নানাভাষায় অনূদিত করিয়া স্থানীয় সমাজগুলির সাহায্যে নানাদেশে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করা যাইতে পারে। ইহাতে খরচ অনেক কম পড়িবে। এইরূপ প্রচারকার্য্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানার আবশ্যক। পুস্তিকাগুলির জন্য প্লেট করাইয়া রাখিলেও ভাল হয়। কারণ তাহা

হইলে অল্প অল্প করিয়া মধ্যে মধ্যে ছাপাইয়া বিলি করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মপরিচালিত একখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী মাসিক পত্রিকা ও একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র আছে। দুই-একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজের মত, বিশ্বাস ও নীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। বিলাতে ও আমেরিকায় এই-রূপ বন্দোবস্ত দ্বারা অনেক সোসাইটি আপনাদের প্রচারকার্য্য করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মসাধারণের উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে আমি এ বিষয়ে অনেকটা সুবিধা করিয়া দিতে পারি, এবং কিছুদিনের জন্য ইহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে পারি। ব্রাহ্ম-সমাজের অর্থাভাব বশতঃ কোন শাখা এই গুরুভার বহন করিতে ইচ্ছুক হইবেন না, তাহা জানি। সেই-জন্য ইহার একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া উচিত। প্রথমে অল্পমাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কার্য্যক্ষেত্র বর্দ্ধিত ও প্রসারিত করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ রাজনীতির বহির্ভূত হইলেও দেশের অনেক মঙ্গলময় কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। স্কুল কলেজের ছাত্রগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। তাহাদের উদীয়মান স্বদেশপ্রেমে বাধা না দিয়া তাহাদিগকে নীতিবন্ধনের বহির্ভূত হইতে না দেওয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। আমাদিগকে এই ছেলেদের মধ্যে ছেলে হইয়া, তাহাদিগকে প্রেমের দ্বারা বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

দরিদ্রদিগের সেবা জগতের একটি মহৎ কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজই এই কার্য্যে প্রথমে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই আমাদের সেই উৎসাহ লোপপ্রাপ্ত হয়। আমাদের এই দৈন্যদশা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নিজ হস্তে এই কার্য্য গ্রহণ করেন। "রামকৃষ্ণ-মিশনের" প্রতিষ্ঠার ইহাই প্রধান কারণ। আমরা যদি ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইতাম, তাহা হইলে এই সফলতা আমরাই লাভ করিতে পারিতাম।

অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধারকার্য্যের জন্য আজ সকল সম্প্রদায়ই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজই এই অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধারকার্য্যের জন্য সর্ব্বপ্রথমে ব্রতী হন। কিন্তু এখন আমরা অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছি। ইহা কাহার দোষ? আমি যখন প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতাম, সে সময়ে প্রতি রবিবারে অস্পৃশ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচার করিতে যাইতাম। তাহাদের সহিত এক চাটাইয়ে বসিয়া ভজন করিতাম ও উপদেশ দিতাম। প্রথম প্রথম অনেকেই এজন্য আমাকে তিরস্কার করিতেন এবং আমার নিন্দাবাদ করিতেন। কিন্তু তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ না হইয়া আরও প্রবল উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতাম। অবশেষে সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রশমিত হইয়া যায় এবং এই সকল অস্পৃশ্যজাতীয় ভ্রাতাগণ আমাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতে আরম্ভ করেন। ইহার অনেক দিন পরে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুত সিন্ধে Depressed Class Mission স্থাপন করেন। কিন্তু এ কার্য্যে তিনি ব্রাহ্মেতর জাতির নিকট হইতেই অধিক সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধারবারে অবস্থানকালে আমি তথায় একটি শাখা Depresed Class Mission খুলি। আমাদের দুইটি দিবা ও একটি নৈশ-বিদ্যালয় ছিল। আমাদের কার্য্য ক্রমে এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিল যে, তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা এই সকল অস্পৃশ্য জাতিকে ফটকের ভিতর আসিতে দিতেন না, তাঁহাদিগকে নিজ বৈঠকখানায় আনিয়া একত্র বসিতে দিতেন।

নারীশিক্ষা সম্বন্ধেও ব্রাহ্মসমাজ সকল সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিল। কিন্তু এক্ষণে আমরা উৎসাহ ও উদ্যমে অপর সম্প্রদায়ের নিকট পরাজিত হইয়াছি। ইহার কারণ কি? আমার বিবেচনায় আমাদের ধর্ম্মের জন্য, সমাজের জন্য, অর্থ ব্যয় করিতে কৃপণতাই ইহার একমাত্র কারণ। একজন সামান্য হিন্দু বিবাহ, পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দেখি, বড় বড় ব্রাহ্ম অগাধ পয়সার উপরে বসিয়াও সমাজের জন্য এক টাকা হইতে দশ টাকার মধ্যে, অতি কাতরে, সমাজকে দান করিয়া থাকেন। ইহা যখন আমাদের সমাজ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন আমি বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হই। আমি নানা দেশের ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিয়া এই কৃপণতার অথবা স্বার্থপরতার যে সকল আদর্শ দেখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া সমাজের হিতসাধন হইতে পারে? যতদিন না আমরা এই কৃপণতার হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইব, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আবৃত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দেশে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। আজ আর লোকে শুধু কথায় ভুলে না। এখন চাই কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য। যে সম্প্রদায় এখন অধিক দেশ ও সমাজহিতকর কার্য্য করিতে পারিবে, সেই সম্প্রদায়ই দেশের অগ্রগণ্য হইতে পারিবে। এখন চাই মিলন; স্বতন্ত্রতার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন চাই প্রেম; দ্বন্দ্বের দিন আর নাই। যৌবন

ব্রাহ্মসমাজ প্রেমের দ্বারা সকল সম্প্রদায়ের লোককে আকৃষ্ট করিতে পারিবে, যেদিন ব্রাহ্মসমাজ ভ্রাতৃপ্রেমে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একসূত্রে গ্রথিত করিতে পারিবে, সকল সমাজের আদর্শকে যেদিন ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ অতিক্রম করিয়া উঠিবে, সেইদিনই ব্রাহ্মসমাজের পুনরুত্থান সম্ভব হইবে, সেই-দিনই ব্রাহ্মসমাজের জয়পতাকা জগতের উচ্চতম শিখরে উড্ডীয়মান হইতে পারিবে। ইহা স্বপ্নের কথা নয়। জাজ্বল্যমান সত্য। প্রকৃত ব্রাহ্মগণ ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমি আজীবন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি।

এজন্য ব্রাহ্মসমাজের নবশতাব্দীর এই প্রারম্ভভাগে আমি প্রত্যেক ব্রাহ্মভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা এই নবযুগে নবপ্রাণ লইয়া আবার নূতন উৎসাহে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ব্রতী হউন। তাঁহাদের উচ্চ আদর্শের দ্বারা জগতকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করুন। যিনি যেখানে আছেন, ব্রাহ্মসমাজের ভেরী নিনাদিত করিয়া চৈতন্যদেবের ন্যায় ভারতের ধূলিকণা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব দ্বারা পুনর্জাগ্রত করিয়া তুলুন। সকল সম্প্রদায়ই এখন ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়া আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। এক্ষণে ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত তাহাদের পার্থক্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে যদি ব্রাহ্মসমাজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ হন, বা আলস্য করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ অচিরে কালের করাল কবলে পতিত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সঙ্গীতচর্চ্চার প্রয়োজন।

(ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী ডি. মিউজ)

১। সঙ্গীতশিক্ষার প্রয়োজন।

সঙ্গীত শিক্ষা ও চর্চ্চা করা কেবল শিশুদিগের নহে, কেবল বালকবালিকার নহে, কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা মানবমাত্রেরই পক্ষে আবশ্যক ও উপকারী। সঙ্গীত মানবের চিন্তা ও জ্ঞানকে পরিমার্জ্জিত করে, এবং মানব-সমাজকে সভ্যতা ও উন্নতির অভিমুখে পরিচালিত করে। সেই কারণেই বোধ হয় সঙ্গীতের উন্নতি সভ্যতার মাপ-কাটি বলিয়া অনেক সময়েই উক্ত হয়। সঙ্গীত মানবের পক্ষে শুধু বাহার দিবার বস্তু বা accomplishment মাত্র নহে। ইহা মানবের জীবনযাত্রারও পথে অনেক বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে এবং অনেক সময়ে মানবকে অবসাদের হস্ত হইতে রক্ষা করে।

২। সঙ্গীতের চরম ফল—পরমাত্মায় আত্মার যোগসাধন।

চিত্রকলা বল, ভাস্কর্য্য বল, কাব্য বল, বা সঙ্গীত বল, কলামাত্রেরই ধর্ম্ম হইল, উহার বিশেষত্ব ও উদ্দেশ্য হইল মানবহৃদয়ে আনন্দবিধানের সঙ্গে মানবকে উন্নতিপথে পরিচালিত করা, তাহার জীবনযাত্রার পথে তাহাকে সহায়তা করা। কলামাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব বিষয়-সমূহের গণ্ডীমাত্রে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না; কিন্তু সেই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সকলের অতীত ও সকলের অন্তর্য্যামী যে অনন্ত মহান পুরুষ আছেন, তাঁহাকেই আমাদের জ্ঞানে ও ধ্যানে ধরিয়া দিতে চায়। আমরাও কলাবিদ্যার সাহায্যে সেই ভূমানন্দকে লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই। সকল কলাবিদ্যাই বিশেষতঃ সঙ্গীত, সেই পূর্ণ আনন্দস্বরূপের সহিত আনন্দের ভিতর দিয়া মানবের একাত্মসাধনে অগ্রসর হয়। পর-মাত্মার সহিত আত্মার মিলনসাধনে সঙ্গীতের ন্যায় দ্বিতীয় কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সেই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দ যেন বিগলিতধারে নামিয়া আসিয়া আমাদের অন্তরে প্রকাশ পাইতে চায়।

৩। সঙ্গীত সর্ব্বজনীন ভাষা—প্রকাশ প্রণালী বিভিন্নমাত্র।

সঙ্গীত প্রকাশ করিবার প্রণালীর মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও বস্তুত সঙ্গীত বিভিন্ন নহে। বলিতে গেলে সঙ্গীত মানবপ্রাণ হইতে সমুদ্ভূত এক সর্ব্বজনীন ভাষা। জননী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে উক্ত হইলেও জননীত্ব বা মাতৃত্ব যেমন সকল দেশেই এক, সেইরূপ সঙ্গীতের ভাব-ভঙ্গী দেশভেদে বা কালভেদে পৃথক হইলেও উহার মূল-গত একত্ব কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। মানুষ জ্ঞানে ভাবে যতই উন্নত হইবে, সঙ্গীতের প্রকাশপ্রণালী-মাত্র ততই আকারে প্রকারে বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবে। কাজেই সঙ্গীতের মূলভাবের ন্যায় ইহার প্রয়োগক্ষেত্রও কোন প্রকার গণ্ডী দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

৪। সঙ্গীত ভগবন্নিহিত বৃত্তি।

ভগবান মানবকে বিভিন্ন শক্তি ও বৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। সে সকল শক্তি ও বৃত্তির অপচয় ও অপ-ব্যবহার করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমাদের

অন্তরের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, ভগবানের ইহাই মঙ্গল ইচ্ছা যে, আমরা আমাদের প্রত্যেক শক্তি ও বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করি এবং সেগুলিকে যথাযথ ব্যবহারে নিয়োগ করিয়া আনন্দ উপভোগ করি ও আপনাদিগকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করি। আমাদের সঙ্গীত-বিষয়ক অন্তর্নিহিত শক্তি ও ইচ্ছা সেই সকল ভগবন্নিহিত বিভিন্ন শক্তি ও বৃত্তির অন্যতর।

৫। সুর ও কর্ণের যোগসাধন।

বীজের সহিত মৃত্তিকার, কর্ণের সহিত শব্দের, এবং চক্ষুর সহিত আলোকের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। গাছ জন্মাইতে গেলে শুধু বীজে হইবে না, মৃত্তিকা চাই; ভগবানের বিধানেই বীজকে ভূমিতে প্রোথিত না করিলে তাহা হইতে বৃক্ষও উদ্গত হইবে না, এবং তাহার ফলভোগের আশাও দুরাশায় পরিণত হইবে। সেইরূপ সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপলব্ধি করা শুধু কর্ণের দ্বারা সম্ভব নহে বা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা শুধু চক্ষুর দ্বারা সম্ভব নহে। সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে গেলে সঙ্গীতের সুরগুলির সহিত কর্ণের যোগসাধন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে—সুরগুলি কানের ভিতর দিয়া মনের ভিতর প্রবেশ করা চাই। এই মনের ভিতর প্রবেশ করার সঙ্গে আমাদের কোন কিছু জানা ও অনুভব করার একটা অবিচ্ছেদ্য ও পরস্পরের উপযোগী সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

৬। সঙ্গীতবৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজন।

এই সকল আলোচনা করিলে ভগবানের এই অভিপ্রায় আমরা উপলব্ধি করি যে, সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগের জন্য কর্ণের ন্যায় আমাদের মনকেও উপযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে, আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতিকেও জাগ্রত রাখিতে হইবে। মনকে যতই উন্নত করিব এবং জ্ঞান ও অনুভূতিকে যতই জাগ্রত করিতে পারিব, ততই সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতাও আমাদের বর্দ্ধিত হইবে। এই সকল হইতে ভগবানের এই অভিপ্রায় আমাদের অন্তরে সূচিত হয় যে, তিনি আমাদের মনে যে সকল শক্তি ও বৃত্তি দিয়াছেন, সেগুলিকে যথাযথ ব্যবহার ও অনুশীলনের দ্বারা সমুন্নত করিয়া তুলি। ভগবান যে সকল নিয়ম জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই সকল নিয়ম হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় সুব্যক্ত হয়। ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ রোপণ করিলেই তাহা হইতে সুফল প্রসূত হইবে। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহার প্রদত্ত শক্তি ও বৃত্তিসমূহের তালরূপ যাচ করিলেই তাহা হইতে আমরা সুফল লাভ করিব, উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইব। তাঁহার সমস্ত নিয়মই মানুষকে তাহার শক্তি ও বৃত্তির অনুশীলনের দিকে পরিচালিত করে।

৭। শব্দ, কর্ণ ও কণ্ঠ মিলনসূত্রে আবদ্ধ।

সঙ্গীতেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। ভগবান যেমন কর্ণকে শুনিবার শক্তি দিয়াছেন, তেমনি তিনি আমাদের কণ্ঠকেও বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আকারে প্রকারে আমাদের মনের ভাবসমূহকে প্রকাশ করিবার শক্তিসামর্থ্য দিয়াছেন। কিন্তু আমরা যাহাতে অনুশীলনের দ্বারা আমাদের সঙ্গীত করিবার শক্তি ও তাহা উপভোগ করিবার বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, তাহারই জন্য যেন শব্দ, কর্ণ ও কণ্ঠ, এ সমুদয়কে এক আশ্চর্য্য ও সুন্দর মিলনের সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন। ইহারা যেন পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে—একের উৎকর্ষসাধনে অপরেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই কারণেই মনে হয়, কর্ণ সুস্বর ধ্বনি হইতে কর্কশ ও বেসুরা ধ্বনির পার্থক্য উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে এবং শ্রুতিমধুর শব্দের ফলে আনন্দ প্রাণে বহন করিবারও বৃত্তি ধারণ করে। এই কারণেই মনে হয়, কণ্ঠ আমাদের মনের নানাবিধ ভাবসমূহকে নানা আকারে প্রকারে ব্যক্ত করিবার যন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বহিঃপ্রকৃতিতেও আমরা শতবিধ সুস্বরের উৎপত্তি ও মিলন-মিশ্রণের ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের আনন্দসাধনের জন্য ভগবান কত না উপায় বিধান করিয়াছেন, ভাবিয়া অবাক হই। সঙ্গীত করিবার যে শক্তি ও বৃত্তি ভগবান আমাদের অন্তরে দিয়াছেন, অনুশীলনের দ্বারা তাহার উৎকর্ষসাধনে কেবল যে আমরা আনন্দ উপভোগ করিব তাহা নহে, তাহাতে ভগবানেরও দান সার্থক হইবে।

সুন্দরবনে কয়েকদিন।

(শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম. এ. পি. আর. এস্)

সে আজ কয়েক বছরের কথা। আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয়শ্রেণীতে পড়ি। মহাত্মা গান্ধিপ্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন তখন সারা দেশকে আলোড়িত করিতেছে। বড়দিনের ছুটীতে আমরা ঠিক করিলাম যে, সুন্দরবনে আমাদের কোনও আত্মীয়ের জমীদারীতে কয়েকদিনের জন্য বেড়াইতে যাইব। প্রত্যেক ছুটীতেই আজকালকার সুপরিচিত স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে বাঙ্গ বার যাইয়া, বেশ একঘেয়ে

অরুচি হইয়া গিয়াছিল। তাই সেবারকার এই অভিনব ভ্রমণের কল্পনায় মন বেশ পুলকিত হইল।

২৫শে ডিসেম্বর, রবিবার রাত্রে আমরা সকলে জিনিস-পত্র গুছাইয়া আর্ম্মেনীয়া ঘাটের দিকে রওনা হইলাম। আমি সঙ্গে লইবার মধ্যে আমার প্রিয় দুটী বাঁশী ও "চয়নিকা" লইয়াছিলাম। আর নামমাত্র একখানা ইকন-মিকস্ এর বইও ছিল; কিন্তু বলা বাহুল্য যে, এক-দিনের জন্যেও সেখানির সদ্ব্যবহার হয় নাই। আমরা যখন ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন জাহাজ ষ্টীম দিয়াছে, আমরা উঠিতেই ছাড়িয়া দিল। জাহাজখানি ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করিয়া সার্চ্চলাইটের সাহায্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা সবাই ডেকের উপর চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম। এত ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল যে, ওভারকোট মুড়ি দিতে বাধ্য হইলাম। দুধারে অন্ধকারের মধ্যে পাটকল ও অন্যান্য অট্টালিকা-শ্রেণীর আলোগুলি অসংখ্য তারার মত আকাশের তলায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। আরও সুদৃশ্য দেখাইতেছিল, বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত পোতশ্রেণী—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। ক্রমে ক্রমে আমরা খিদিরপুর প্রভৃতি ছাড়াইয়া সাগরের দিকে অগ্রসর হইলাম। দূর হইতে সহরের ও কলকারখানার অগণিত আলোর রেখাসমূহ ঘোর তমসাচ্ছন্ন আকাশপ্রান্তে এক জ্যোতির্ম্ময় দ্যুতির রচনা করিতেছিল। ঘনান্ধ-কার কুহেলিকায় নদীর ধারের প্রকাণ্ড বাড়ী-গুলির স্তরে স্তরে সাজান আলোকশ্রেণীও গঙ্গাবক্ষে তাহাদের ছায়ার সহিত মিলিয়া এক অপরূপ রূপলোক সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সব দেখিতে দেখিতে চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়ি-লাম। কতক্ষণ সে চিন্তাসাগরে ডুবিয়াছিলাম, জানিনা —হঠাৎ জাগিয়া দেখি তীরের আর কোনও আলোই দেখা দিতেছে না; চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। আর আমাদের জাহাজখানি দ্রুতবেগে সার্চ্চলাইটের সাহায্যে আপনার গন্তব্য অভিমুখে চলিয়াছে। নীচে এঞ্জিনের শব্দ আর খালাসীর গোলমাল শুনা যাইতেছে। আমার সঙ্গীরা ডেক ছাড়িয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, আমিই কেবল সেই বুককাঁপান তুষারশীতল পাগলহাওয়ায় বসিয়া আছি। আমার চারিপাশে সব নিদ্রিত—তখন রাত প্রায় বারোটা।

আমি উঠিয়া ভিতরে কেবিনে যাইলাম। কিছু খাইয়া, তার পর খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। জাহাজখানি দোতলা এবং প্রকাণ্ড। এতবড় জাহাজে এই আমার প্রথম চড়া—সুতরাং খুব এক নূতন আনন্দ হইতেছিল। জাহাজে আমাদের দুই পরিবার ছাড়া আর কোনও প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিল না, কাজেই আমরা নির্ব্বিবাদে সব ক্যাবিন-গুলিই অধিকার করিয়াছিলাম। ক্যাবিনগুলি খুব সাজান, আর ইলেকট্রিক পাখা ও আলোয় বিভূষিত। স্প্রিংএর খাটগুলি ও তাহার বিছানাগুলিই বা কি নরম —শুইয়া আরাম আছে! বড়ই মজা লাগিতে লাগিল; যেন "I am the master of all I survey"—যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলাম। ডাইনিং রুমে খানসামা সর্ব্বদা হাজির। কিছুতেই আর কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে-ছিল না—কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিতে-ছিল। শেষকালে বাবার ধমকানিতে অগত্যা শয্যার আশ্রয় লইতে হইল। আমি আর আমার এক পিস্‌তুত ভাই একটা কেবিনে শুইলাম—সে কি আরাম! কিছুক্ষণ গল্প চলিল, তার পর আমি কলেজ-ম্যাগাজিন পড়িতে লাগিলাম—বাইরের ঝোড়ো হাওয়া আমাদের দেহমন পুলকিত করিয়া তুলিল। অবশেষে নিশীথের কোন্ প্রহরে, কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি তাহা জানিতে পারি নাই।

জাহাজের ঘণ্টায় হঠাৎ ঘুমটা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন সারেঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম রাত তিনটা। বাহিরে আসিয়া দেখি পাগল হাওয়া মাতামাতি করিতেছে, আমাদের জাহাজখানি এক অকূল বারিধির মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর ছোট ছোট ঢেউগুলি খেলাচ্ছলে সেই ভীষণ অতিকায় অর্ণবযানের গায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া যেন উপহাস করিতেছে। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় তীরের গাছগুলি কোনও রকমে দেখা যাইতেছে মাত্র। এমন সময় বাবা ডাকিয়া বলিলেন, "এখনও রাত রয়েছে, বাহিরে ভয়ানক হাওয়া, এখন শোওগে, যাও"—কিন্তু তখন আর কে শোয়? ঘরে ও বাহিরে কোনও রকমে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলাম, জায়গাটীর নাম আড়কাটী, ভয়ানক বিপজ্জনক স্থান! পাইলট না আসিলে জাহাজ আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিবে না। তারপর অনেকক্ষণ পরে নোঙ্গর তুলিবার শব্দ হইল, আমরা আবার ছাড়িলাম। ওদিকে পূর্ব্বাকাশও ক্রমে সিন্দূর-আভা ধারণ করিতেছিল। অনন্ত জলধির মধ্য হইতে সেই অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবার জন্য সকলে ডেকের উপর আসিয়া বসিল। ক্রমে সারা আকাশ অরুণ রাগে রঞ্জিত করিয়া দীপ্তভানু প্রকাশিত হইল—তাহার সুবর্ণখচিত রেখাগুলি আনন্দস্ফীত ঊর্ম্মি-মালার সহিত নাচিতে লাগিল। সেই অসীম সলিলবক্ষে নবীন ঊষার অপরূপ রূপশ্রী সে এক বাস্তবিক

অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। আমি বিভোর হইয়া বাঁশীতে সুর ধরিলাম। প্রভাতআলোর এই চমৎকার শোভা প্রাণে এক অননুভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা আনিয়া দিল—আমি তন্ময় হইয়া প্রকৃতির মনোহর লীলাখেলা দেখিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল, এই সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে যেন আমার একান্ত আত্মীয়তা আছে। এই উদাস হাওয়া আমারই মর্ম্মবারতা জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক।

ক্রমে ক্রমে আমরা ডায়মণ্ডহারবার ছাড়াইয়া সাগরের দিকে ভাসিয়া চলিলাম। আমার আগে ডায়মণ্ড হারবার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, না জানি কত বড় বন্দর—কত জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে, কত মাল উঠানামা করিতেছে। কিন্তু হায়! কিছুই নয়। সবই ফাঁকা। কেল্লাটীরও বিশেষত্ব কিছুই নাই; তবে গঙ্গার মোহানার কাছে বলিয়া জলপথে কলিকাতা শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। আমরা উপরে সারেঙ্গের কাছে যাইয়া বেশ আলাপ জমাইয়া তুলিলাম। তাহার কাছ থেকে জানিতে পারিলাম যে, আমরা যে ষ্টীমারখানি করিয়া যাইতেছিলাম, সেখানিকে "আসাম ডেস্‌প্যাচ্" বলে। এখানি বরাবর সুন্দরবনের ভিতর দিয়া, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রপথে আসামে যায়। আমাদের জাহাজখানির একতলায় তৃতীয়শ্রেণী, তার অর্দ্ধেক প্রায় কাঠে ভর্ত্তি। এই লাইনে যে সব মাল সরবরাহ হয়, তারমধ্যে কাঠই সব চেয়ে বেশী। উপরে সারেঙ্গের কেবিন হইতে চারিপাশের দৃশ্য আরও সুন্দর দেখা যায়। এখানে গঙ্গা এত প্রশস্ত যে দুইপাশের তীর একরকম অদৃশ্য বলিলেই হয়। ক্রমে আমরা রূপনারায়ণের মোহানার কালো জল,—ইংরাজ ও নবাবের দ্বন্দ্বের লীলাভূমি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হিজলী দ্বীপ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া চলিলাম। বাস্তবিক যখন চোখের সামনে ছায়াচিত্রের মত সেই অনন্ত অসীম কূল-কিনারাহীন জলরাশি, ঢেউগুলির সেই হর্ষপূর্ণ নৃত্য, দূরে সুদূরে চক্রবালরেখায় সেই দুই অনন্ত নীলিমার সম্মিলন দেখিতে লাগিলাম, তখন সত্যসত্যই যেন সেই মহাসিন্ধুর ওপার হইতে কানের কাছে কি মধুর অপূর্ব্ব সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিল। বেলা ১১টার সময় কাকদ্বীপে যাত্রী লইবার জন্য আমাদের জাহাজ থামিল। সেখান থেকে একটী পোষাক পরা, বোধ হয় *P. W. D.র লোক* উঠিলেন। আমাদের কাকদ্বীপেই নামিবার কথা ছিল, তাই সেখানে বাটী হইতে দরোয়ান পিউভরজ একখানি বড় নৌকা লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আমরা স্থির করিলাম আরও কিছুদূর গিয়া নামখানায় নৌকায় উঠিব, তাই নৌকাখানি জাহাজের পিছনে বাঁধা হইল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল এবং অল্পক্ষণ পরে গঙ্গা ছাড়িয়া একটী খালে প্রবেশ করিল। শীঘ্রই আমরা নামখানায় পৌছিয়া নৌকায় চড়িলাম। ষ্টীমারখানি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে শীঘ্রই দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

আমরা আমাদের স্বদেশী নৌকায় হেলিতে দুলিতে, ধীরে সুস্থে চলিতে লাগিলাম। ভীষণ রৌদ্র; কি আর করি, ছইয়ের তলায় শুইয়া শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলাম আর বাঁশী বাজাইতে লাগিলাম। এই আমার প্রথম নৌকায় চড়া—বড়ই আমোদ লাগিতেছিল। যাইতে যাইতে একজায়গায় নৌকা বাঁধা হইল। উহারা সকলে নামিয়া মুখ হাত-পা ধুইতে গেল। আমি কেবল নৌকায় বসিয়া কিছু ভক্ষণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। হালের ওপর পা ঝুলাইয়া দিয়া মনের আনন্দে কয়েকটী সন্দেশ উদরসাৎ করিতেছি, এমন সময় দেখি আমাদের পাশ দিয়া একখানি নৌকা যাইতেছে; তাহার ভিতর একটী ভদ্রলোক বসিয়া কমলালেবু খাইতেছেন। হঠাৎ দেখি তিনি আর কেহই নহেন, আমারই মাতুলসম্পর্কীয় আত্মীয়। এমন জায়গায় আমরা দুই জনেই দুজনকে দেখিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম "এই যে—মামা যে!" তিনিও লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন "আরে, তুমি কোথেকে?" যাহা হউক, তাঁহাকে এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইল। তিনিও তাঁহাদের জমীদারীতে যাইতেছেন; সুতরাং আমরা ধরিয়া বসিলাম, আমাদের সঙ্গে এক নৌকাতেই যাইতে হইবে। তাঁহার হাসি ও গল্পে সময়টা বেশ কাটিতে লাগিল—তিনি খুব আমুদে লোক। ক্রমে আমরা নামখানা ছাড়াইয়া সপ্তমুখীতে আসিয়া পড়িলাম। এখানে সাতটী নদী বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। দিক্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া চারিদিকে অসীম জলরাশি বিস্তৃত, যে দিকেই তাকাই সেই দিকেই জল শুধু জল! কোনও দিকেই কূলের চিহ্নমাত্রও নাই। প্রকৃতির এই অপরূপ বিশালত্বের মধ্যে ক্ষুদ্র মানুষ সত্য সত্যই আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন মনে হয়, হে বিশ্বপতি জগৎস্রষ্টা! "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে"। একান্ত সসীম আমরা, সেই অসীম সত্তার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম; আত্মহারা হইয়া অনন্তের সেই বিরাট রূপ অনুভব করিতে লাগিলাম। বাস্তবিক অতি নীচ ও ক্ষুদ্র মনও এই মহান্ দৃশ্যের স্পর্শে এক উদার উদাস কল্পনায় ভরিয়া

যায়, আমিত্বের সব অহংকার ঘুচিয়া গিয়া, থাকে শুধু এক বিপুল শূন্যতা, যাহা ধীরে ধীরে অনন্তের সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠে।

এই অপার বারিসমুদ্রের মধ্য দিয়া আমাদের নৌকাখানি নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আনন্দে আমার চিত্তবিভোর হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু গুরুজনদিগের মধ্যে একজনের নৌকায় ভয়ানক ভয়, তিনি এই অকূল পাথারে বিশেষ অসোয়াস্তি অনুভব করিতে ছিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অনেকেই খুব আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভাতে ভাত তৈয়ারী হইল—আমরা সকলে মিলিয়া আমোদ করিয়া খাইলাম। এ রকম খাওয়া বোধ হয় আর কখনও জুটিবে না। চাকর, বামন, লোকজনেরও অভাব ছিল না; বিস্তর গিয়াছিল আমাদের সঙ্গে। বিকালবেলা আমরা চন্দনপীড়ি ঘুরিয়া একটী অপেক্ষাকৃত ছোট খালের ভিতর ঢুকিলাম। তাও সে নেহাত ছোট নয়—আমাদের কলিকাতার গঙ্গার দ্বিগুণ। কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে খাল বা নদীর ভিতর দিয়া আসিতেছিলাম, তাহার তুলনায় ছোট। এই সুদূর সুন্দরবনে জলের ওপর বিচিত্ররঙ্গে রঙ্গীন আর একবার মনোরম সূর্য্যাস্ত দেখা গেল, যা চিরকাল চিত্তপটে আঁকা থাকিবে। বাঁশী বাজাইয়া বাজাইয়া ক্লান্ত হইয়া অন্ধকারের সঙ্গে কখন যে আমার চোখদুটী জড়াইয়া আসিয়াছে—তাহা জানিতে পারি নাই। একবার যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দেখি দুধারে ভীষণ অরণ্যানী; ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের নৌকা ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। মাঝিরা উৎসাহিত হইয়া "সাবাস্ সাবাস্" চীৎকার করিতেছে, আর সেই নিবিড় নিশীথের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হরিণের চীৎকার বনস্থলী আলোড়িত করিতেছে। সঙ্গীরা সব বাঘের গল্প করিতে ব্যস্ত। আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন জাগিলাম, তখন দেখি মহা হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে,—মামাকে নামাইয়া দিবার জন্য। তাহার কিছুক্ষণ পরেই আমরাও নামিলাম—তখন রাত প্রায় ১১টা। এই রকম সমস্ত দিন সমস্ত রাত জলপথে কাটাইয়া আমরা আবার ভূমিতে অবতরণ করিলাম। ঘাট থেকে কাছারী বাড়ী খানিক রাস্তা। অস্পষ্ট আলোয় আলের উপর দিয়া হাঁটিয়া কোনও রকমে পৌছান গেল। তারপর কিঞ্চিৎ মুড়ি খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। মাটীর ঘর, বেশ নূতন নূতন লাগিতেছিল। তারপর দিন ভোরবেলা উঠিয়াই, চা খাইয়া ২নং লাটে পুরাণ কাছারীতে নৌকা করিয়া যাওয়া গেল।

হিংসার আগুন।

(স্বামী কেশবানন্দ)

ভারতে পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে। এদেশে ইংরাজ আগমনের প্রথম অবস্থায় ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি একটী পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছিল। সেই সময়ে এদেশের অধিবাসীগণ মুসলমান নবাবদিগের প্রবর্ত্তিত আলস্যবিজড়িত সভ্যতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিদিগের কর্ম্মঠতা দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। পরে যখন ঐ সকল পাশ্চাত্যজাতি জয়ী হইয়া ভারত অধিকার করিল, তখন তাহাদিগের মধ্যে ইংরাজেরাই নানা কারণে এদেশবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিল। কিন্তু সেই জয়ী ইংরাজের বণিকমূর্ত্তি কালের সঙ্গে অধিক হইতে অধিকতর প্রকট হইতে লাগিল এবং তাহার ফলে এদেশবাসীগণ নানাবিধ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। আমরা ইহা বলিলে বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না যে, সেই সময় বণিক ইংরাজেরা যে হিংসার বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন, আজ প্রায় দুইশত বৎসর হইতে চলিল, এই সুদূর ব্যবধানের পর হিংসার প্রতিক্রিয়াস্বরূপে ভারতবাসীর মনে প্রতিহিংসার ভাব নানা আকারে প্রকারে দেখা দিতেছে।

ক্রমে ভারতবাসী বণিক ইংরাজদিগের নির্ম্মম শাসনের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। ইংরাজেরা এদেশবাসীর মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিয়া বণিকবৃত্তির যথাসম্ভব লাঘব করিয়া নবতর শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর এই নবতর শাসনপ্রণালী ভারতের পরিবর্ত্তনের আর একটি যুগ সূচীত করিয়া দিয়াছিল। সেই শাসনপ্রণালীর ভিতরেও যেটুকু বণিকভাব অবশিষ্ট ছিল তাহারও বোঝা বড় কম ছিল না। এদেশে ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর সেই বাকী বণিকভাবের বোঝার উপর আরও বোঝা তিল তিল করিয়া চাপিতে লাগিল; এবং এদেশবাসীর অজ্ঞাতসারে দারিদ্র্য-দুঃখ সোনার ভারতকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া চলিল। এই দারিদ্র্য ভিতরে ভিতরে যে কত বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পর সম্যক প্রকাশ পাইল। আমাদের বিশ্বাস,দেশের এই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী দারিদ্র্যই বর্ত্তমান অশান্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ। এখানেও দেখি, ইংরাজশাসন দেশের যতই কেন মঙ্গলজনক হউক না, তাহারই অন্তর্নিহিত বণিকভাবমূলক হিংসার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপেই বহুবিস্তৃত অশান্তি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার আকারে

মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর আজ প্রায় শত বর্ষ হইতে চলিল, ঐ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রে রাখিয়া নবতর পরিবর্ত্তনের যুগ আবির্ভূত হইয়াছে।

এদেশবাসী প্রত্যেকেরই অন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ন্যূনাধিক জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উপায় লইয়াই দুইটী সম্প্রদায় সমুত্থিত হইয়াছে দেখা যায়। এক সম্প্রদায়ের মত, হিংসাকে হিংসা দ্বারাই বাধা প্রদান করিতে হইবে; অপর সম্প্রদায়ের মত, হিংসাকে অহিংসা দ্বারা জয় করিতে হইবে। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন অহিংসাসিদ্ধ মহাত্মা গান্ধী।

বলা বাহুল্য, আমরাও এই শেষোক্ত প্রণালীরই পক্ষপাতী। হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা পোষণ করিতে আমরা কিছুতেই বলিতে পারি না। হিংসার আঘাত প্রাপ্ত হইলেই প্রতিহিংসা লইবার জন্য আমাদের মন চঞ্চল হইয়া উঠে বটে; কিন্তু সেই প্রতিহিংসা লইতে গিয়া আমরা চারিদিকে যে হিংসার আগুন ছড়াইয়া দিই, তাহার ফল অতীব ভয়াবহ। সেই আগুনে দেশের জাতির ও জনসাধারণের কত যে অনিষ্ট হয়, কতলোক যে পতঙ্গের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। বিগত মহাসমরের পূর্ব্বে আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, আফ্রিকার অন্তর্গত কঙ্গরাজ্যে প্রজাদিগের উপর বণিকভাগের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের প্রভু বেলজীয়গণ উঁহাদিগের উপর হস্তচ্ছেদ, কর্ণচ্ছেদ, পদচ্ছেদ প্রভৃতি কি ভীষণ অত্যাচার করিত। এক ইংরাজ মিশনারী তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে, সেই অত্যাচার এখনও থামে নাই। ঐ অত্যাচাররূপ হিংসার প্রতিক্রিয়ায় কঙ্গবাসীদিগের অন্তরে যে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে বড়ই তীব্রভাব ধারণ করিয়াছে দেখা যায়। এই সেদিন তাহারা ঐ প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া বেলজিয়াম রাজ্যের প্রতিনিধি কমিশনারকে বধ করিয়া তাঁহার মাংসে নিজেদের উদর পূর্ত্তি করিয়া তবে সোয়াস্তি লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রত্যুত্তরে বেলজীয়গণ কঠোরতর শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, কঙ্গোবাসীদিগের মধ্যে অশান্তি দূর হইয়াছে। কিন্তু হায়! কে জানে যে অশান্তি সত্যই দূর হইয়াছে কি না, অথবা ইহার ফল কোথায় গিয়া কি আকার ধারণ করিবে!

অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করিতে অগ্রসর হইলে আপাতত নানাবিধ কষ্ট আসিয়া আমাদিগকে পিষিয়া মারিতে উদ্যত হয় বটে, হিংসার আঘাত প্রবলবেগে আসিয়া অনেক স্থলে মর্ম্মগ্রন্থিসকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয় বটে, কিন্তু তখন ভগবানের সিংহাসন টলমল করিতে থাকে; ভগবান তখন সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া হিংসাকারীদিগের সম্মুখে রুদ্রবেশে বজ্রহস্তে দণ্ডায়মান হন এবং মাতা যেমন কঠিন আঘাতপ্রাপ্ত সন্তানকে বক্ষে তুলিয়া সর্ব্ববিধ উপায়ে সান্ত্বনা ও শান্তি দিতে থাকেন, ভগবানও সেইরূপ তাঁহার আঘাতজর্জ্জরিত অহিংসাপন্থী সন্তানদিগকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিয়া সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করিতে থাকেন।

ইহা জল্পনাকল্পনা নহে—ইহা পরীক্ষিত সত্য। এই যে ভারতবাসী আজ স্বরাজলাভের পথে যেটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত অহিংসার বিশুদ্ধ পথে চলিবারই ফলে। অহিংসাপন্থীগণ যে সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, সেই সংযমই তো তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে দেশবাসীকে স্বভাবতই স্বরাজলাভের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দেয়। ইহার বিপরীতে যাঁহারা প্রতিহিংসার আগুন চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে উদ্যত হন, তাঁহারা প্রকৃত সংযমের মর্ম্ম কতদূর উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। হিংসার প্রতিক্রিয়ায় যেমন প্রতিহিংসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদেরও প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়ায় নবতর হিংসা জন্মলাভ করে। ভারতবাসী বহুযুগের সাধনার অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত অহিংসাসিদ্ধিরই মহাবাণী লাভ করিয়াছে। অহিংসার পথে চলিলে আমরা সদ্য সদ্য তাহার ফল হস্তগত নাও করিতে পারি, কিন্তু তাহার ফল যে সুনিশ্চিত এবং স্থায়ী তাহা আত্মদর্শী চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রই সমর্থন করিবেন নিঃসন্দেহ। এই অহিংসাসিদ্ধিরই বলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচ্য সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী চীন জাপান প্রভৃতি দেশ অবধি, প্রতীচ্য সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত সভ্য ও অসভ্য কত-না রাজ্যে অধিকার করিয়াছিল। আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরে তাহার পরিচয় পাইয়া জগদ্বাসী মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

একদিকে আমরা যেমন হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লওয়া অনুমোদন করি না, সেইরূপ প্রতিহিংসা জাগাইয়া তুলিবার প্রধান উপায় হিংসার আঘাত দেওয়াকেও সমর্থন করি না। আমরা দেশবাসীকে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংযমের পথে চলিয়াই স্বরাজলাভের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি; এবং হিংসা প্রতিহিংসার প্রণালী অবলম্বনে বিরত হইতে উপদেশ দিই। হিংসাপ্রতিহিংসার আগুন চারিদিকে ছড়াইতে থাকিলে তাহা দ্বারা দেশের অনেক মন্দ হয়তো বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে অনেক অধিক ভালও ভস্মীভূত হইবার অধিক সম্ভাবনা।

THE

BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(1)

In the preceding pages we have endeavoured to trace the gradual growth of the *Samaj* from its foundation to the present day. During one period of its development we have spoken of the establishment of branch *Samajes* throughout the country. We have now to sketch the history of the most important and extensive branch *Samaj* founded, and professing ostensibly more liberal and progressive views.

1. Keshub Chander Sen, founder of the Brahma Samaj of India, joined Brahmo Samaj—1859 A.D.

While Devendranath Thakur was cautiously and gradually introducing social and religious reforms among his followers, the *Samaj* was joined in 1859 by an ambitious, enthusiastic and energetic youth possessed of great talents and enthusiasm. His ardour for immediate and universal reform led to differences of opinion, and ultimately culminated in a schism, which resulted in the establishment of a branch church called the *Samaj of India,* to distinguish it from the original *Samaj.* The youth alluded to is Keshub Chunder Sen, and as the history of the schism fomented by him is intimately connected with his life, we shall endeavour before narrating the one to give some account of the other.

2. Birth of Keshub Chander,

Keshub Chunder Sen was born on the 19th November 1832 at Kalutola, in Calcutta, of a well-known family of the Vaidya or medical caste. He was the second son of Pyari Mohun Sen, dewan or chief native manager of the Government Mint at Calcutta, who is reported to have been a man of kind and benevolent disposition and to have died in the prime of life, leaving the infant Keshub to the care of his widow and of his surviving father, Ram Kumal Sen.

3. His grand fathor, Ramkumal Sen.

Ram Kumal Sen, the grand-father of Keshub, was a man of talents and reputation, and held important public offices under Professor H. H. Wilson, then Secretary to the Educational Chuncil of Bengal and Mint Master of Calcutta. He was also the compiler of an Anglo-Vernacular Dictionary, which was then esteemed the best of its kind. He was a Vaishnava in his religion, and a most bigoted idolator, who took as much interest in thwarting the progress of reformation as his grand-son afterwards took in promoting its aim and purposes.

4. Keshub's boyhood.

In his boyhood Keshub Chander was chiefly remarkable for his independence of character, which seemed to foreshadow his future greatness; and his grand-father was not backward, from many traits in the boy's character, to predict his future leadership of men. Born in a family of idolators, he was naturally brought up in the midst of the idolatrous practices and ceremonies of his domestic circle, and his youthful mind was deeply instilled with all the superstitions and prejudices inherent to a Hindu. His obedience to and love of his mother was a predominant feature in his character, and must have been remarkable to have been noticed among a people who are famous for their filial piety and affection. He never took any food but at the bidding of, and from the same dish as his mother, a circumstance to which he owes his habits of self-denial and simplicity in his food, because Hindu widows of respectable families are ever constrained to live upon simple vegetable diet. He early displayed a religious bent of mind, and, accompanied as it was with a gravity of manners, and a purity of conduct, rendered him greatly beloved by every member of his family.

5. His early education.

Of his early education but little is known beyond the fact that he was early initiated in Bengali under a guru mahashoy, who had a private school on the premises,

now, passing under the name of the Albert Hall, and then joined the Hindu College at Calcutta, in the eighth year of his age. He continued his course of English studies up to the first class of the Presidency College, and was all along distinguished as one of the most promising students of that Institution. He was chiefly, in his school-days, noted for the gravity of his manners; and his taciturnity was so great that no one could possibly have presaged his future eloquence.

6. His early display of eloquence.

Although, as stated, he was remarkable for his taciturnity, yet he occasionally displayed the eloquence with which he was gifted, even in his youthful days, to the admiration of his audience. He once personated the part of an Englishman in one of Gilbert's plays, at his country-house, in the presence of several Europeans, who pronounced it a proper and correct delineation, and praised Keshub much for the mode and pronunciation of his delivery. He also availed himself of many oportunities of exhibiting his knowledge of politics in *extempore* speeches, which were so favourably received, that many of his countrymen have declared that had Keshub Chunder followed the profession of the law instead of that of religion, he would have made himself as famous in the former as he has done in the latter.

7. His study of Bible and prayerfulness.

His English education led him to the study of the Bible, a study which, he himself elsewhere states, impressed him with the idea of the unity of God, and there is no doubt that he would have renounced idolatry much sooner than he did, had he had some one to guide and direct him. His religious tendencies were, however, kept alive by prayer. He used to write short hymns and prayers in English, and read them out to his friends in private. His friends and fellow-students, seeing him thus addicted to prayer, thought he had become a Christian, by which title he is still designated by many who do not thoroughly understand the principles of the religion he now professes. For this good custom he suffered much ridicule and annoyance.

8. Keshub considered Christian by his family.

Prayer, though used from the earliest times in India, as we find in the hymns of the Rigveda, and other eulogistic hymns addressed to Hindu deities, fell into disuse under the influence of its philosophical schools, which maintain a theory, somewhat similar to that put forth by Hume, of the immutability of the Divine Nature, and the eternal decrees of God, which are not to be affected, revoked, or altered by the changeable and transient prayers of mortals. It is no wonder then that Bengali youths, who mostly profess a Vedantic or Deistic faith, should ridicule a man given to prayer and that Keshub Chunder's family should consider him a Christian, when he offered up prayers contrary to the custom of Hindu worship, which requires the prayers to be repeated in Sanskrit and the worship to be accompanied with offerings of eatables to the Gods.

9. Result of his prayerfulness.

Notwithstanding the ridicule of his family and friends, Keshub Chunder continued steadfast in his prayers, which he says infused into him a degree of hope, courage, and firmness, which enabled him successfully to withstand the tribulations and persecutions to which he was subsequently exposed. To give the reader an idea of the faith placed by Keshub Chunder in the efficacy of prayer, we will quote his own words on the subject :—

10. Necessity of prayer explaind by Keshub Chunder.

"It is not possible for me sufficiently to explain myself to others why I pray to God every day, and how I came to its practice. Were it possible for me to do without it, I would even from this moment do away with the practice. Had I not felt its necessity, or derived the habit from any reading or preaching, I would not certainly continue in it. I will now relate to you a fact connected with the history of the religious career of my life, at the moment when,

by the grace of God, my eyes were first opened to perceive the light and importance of religion. It was at that very first moment when a series of struggles arose in my heart for paving my way to salvation, that I felt the necessity of prayer. I found my heart was full of darkness, and subject to all worldly ignorance, aspirations, and desires, which had gained their full dominion ever me. I found also that I was a poor sinner, and unable to stand in opposition to innumerable adversaries which had been raging both within and without me. Was it possible for me with a weak body, a lifeless heart, a mind dead in sin, to withstand the formidable train of enemies, which had incessantly threatened to overwhelm me from within and without ? Was it possible for me to remain firm and steadfast against these without some help or support ? In this plight I had no recourse to any book or religious guide for support. I commenced to pray with a soul in deep agony of sin, and derived in secret this enlivening admonition from it, saying to me in the plainest language : 'Pray to God if you would be saved, for none other but God can save the sinner.' This secret and sacred admonition of my inmost soul tended at once to humble my proud heart, and debase my head at the feet of my God, when on a sudden I seemed to behold, amidst a veil of deep darkness, which encompassed me all around, the word '*PRAYER*,' written in golden characters on tho door way to the kingdom of Heaven. This made me believe that there is no other way to the kingdom of God, but through the medium of prayer, and persuaded me at once to cast off all scruples about the necessity of prayer, and betake myself solely to its refuge. This was a day full of bliss to me. Since then I continued praying morning and evening in secrecy, without the help or advice of any human being and lest anybody should deride at my prayer, I kept it quite a secret ; because I well know that no sooner would any one come to know it, he would not only revile at me, but try his best to dissuade me from the practice. As I continued in this habit of praying day after day, I found a flash of heavenly light illumining the deep darkness of my inmost soul, and spreading its benign radiance all about me. O ! how can I give expression to that stream of joyous illumination which pierced the frightful gloom of sin, which had overspread my soul, and seemed to brighten the hemisphere of my heart with lustre more benign than moonbeams ? This infused in me a degree of unspeakable peace and inexpressible delight, compared with which the pleasures of society, and all other joys of the world seemed to be nothing, and which it led me to continue. I really tell you, from the sincerity of my heart, that it was this light which guided me through the succeeding stages of my life, and if it were not for this and the efficacy of prayer, which the Almighty Father vouchsafed of his infinite mercy to show to my perverted soul, there would be no chance of your seeing me preaching to you on this pulpit. Prayer only was the first incentive to my salvation ; it was this which led me to my inquiries after truth. It is by means of prayer only that I came to be acquainted with the holy writings and pious men of my time, and it was through the instrumentality of prayer that I have gained the necessary means of spiritual life from that Heavly Father, who has now sent me so far to you."*

11. First religious school established at Kolutola.

While thus improving himself in spirit in the manner described in the above quotation, Keshub Chunder was not less prompt in communicating the result of his enquries to others. Considering this duty to be intimately connected with self improvement in spiritual knowledge, and without a due discharge of which he believes it to be impossible for a man to be saved, Kesub Chunder had at first instituted an evening religious school at Kolutola, of which he himself was the Secretary. Its annual examinations were conducted by respectable gentlemen, and prizes on one

* This speech was delivered by Babu Keshub Chunder Sen before an audience at Bombay, in his mission to that place.

occasion were distributed to the successful students by the famous speaker, George Thompson, who presided. This school lasted for some three years, and then was abolished owing to the want of funds.

12. The Goodwill fraternity 1858 A. D.

Shortly after this occurrence Keshub Chunder started a small club called "The Good-will Fraternity", in 1858, at his own house, which was attended by his friends and fellow-students, in the hopes of securing to his fellow-brethren the peace and happiness he had himself obtained by prayer. This club was inaugurated for the purpose of religious discussion and prayer. Here Keshub Chunder and his friends used to read discourses from the *Tattwabodhini*, recite portions from the writings of Raja Ram Mohun Roy on divine knowledge, deliver *extempore* sermons in English, read select passages from different books, and consult on the best method of attracting the attention of their countrymen to inquiries after divine truth and their eternal welfare.

নানাকথা।

বাঙ্গালা বাঙ্গালীর জন্য।—একটা কথা উঠিয়াছে যে, বাঙ্গালা বাঙ্গালীর জন্য রাখা উচিত অর্থাৎ বঙ্গদেশে যে সকল চাকরি খালি হইবে, সেই সকল পদে বঙ্গের বাহিরের লোক ভর্ত্তি করা সঙ্গত নহে। একদিক দিয়া দেখিলে ইহা কতকটা অসঙ্গত মনে হয় বটে, কারণ দেশনেতাগণ সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে মিলনসাধনে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখিলে এইভাব আপাত দৃষ্টিতে কতকটা সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হইলেও একটু গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা খুবই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিয়াছি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উচ্চপদে প্রবেশ করা বাঙ্গালীর পক্ষে অসাধ্য না হইলেও খুবই দুঃসাধ্য। এমন কি, আমরা অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি. অন্যান্য প্রদেশে domiciled হইবার পক্ষেও বাঙ্গালীকে যথেষ্ট বাধা পাইতে হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে আসিয়া অন্যান্য প্রদেশবাসীগণ উচ্চ পদ পাওয়া অথবা domicilled হওয়ার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা পাইতে হয় বলিয়া শুনি নাই। আমি জানি একবার কোন উচ্চপদের জন্য একটী বাঙ্গালী এবং একটী পাঞ্জাবী সমতুল্য বিবেচিত হইলেও বাঙ্গালী উপেক্ষিত হইয়া পাঞ্জাবী নিযুক্ত হইলেন। নিজের দেশে যোগ্যতা থাকিলেও বাঙ্গালীর এরূপ উপেক্ষিত হওয়া দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; নতুবা পাঞ্জাবী যখন ভারতবাসী তখন তাঁহার নিযুক্ত হওয়ায় দুঃখের কোনই কারণ ছিল না। বঙ্গদেশের বাঙ্গালী এইরূপ উপেক্ষিত হইবার কারণেই ক্রমশই দুঃখদৈন্যের আবর্ত্তে পড়িয়া যাইতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনাকে রক্ষা করা ধর্ম্মকার্য্য এবং আপনাকে রক্ষা না করিলে যখন আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে রক্ষা করা অসম্ভব হয় তখন স্বাভাবিক নিয়মেই আমরা সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হই। এই প্রকৃতি-সিদ্ধ ভগবন্নিহিত মঙ্গলনীতি অনুসরণ করিয়াই আমরা বলিব যে, আত্মরক্ষার পরেই আত্মীয়স্বজন ও পরিজন-বর্গকে রক্ষা করা উচিত এবং সেই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমরা বলিব, আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীকে রক্ষা করা এবং তৎপরে অন্যান্য ভারতবাসীকে রক্ষা করা এবং তাহারও পরে অন্যান্য জগতবাসীকে রক্ষা করা। আপনাকে রক্ষা না করিয়া আমরা যদি দূর-দূরান্তরের অধিবাসীদিগকে (সংস্র বিপদগ্রস্ত হইলেও) রক্ষা করিতে অগ্রসর হই, তবে আমরা যে তাহাতে সম্পূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ করিব এবং সেই কারণে উপহাসের পাত্র হইব, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না! সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষার পন্থা যদি নীতি-সঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালাকে বাঙ্গালীর জন্য রাখার কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পক্ষপাতের কোন কথাই উঠিতে পারে না। যতদিন অন্য দেশে বাঙ্গালীর প্রবেশের পথ নিরুদ্ধ থাকিবে, ততদিনের জন্যই আমাদিগের উপরোক্ত পরামর্শ। কিন্তু আমাদিগের প্রকৃত মত এই যে ভারতবাসীকে ভারতবাসী বলিয়াই দেখা কর্ত্তব্য এবং ভারতের কোন অংশে কোন ভারতবাসীর প্রবেশ নিরুদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য নহে। সম্প্রতি নিখিল ভারতীয় পদসমূহে বাঙ্গালীর নিয়োগ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উপস্থিত করা হইয়াছিল। তদুত্তরে শোনা গিয়াছে ঐ সকল পদে বাঙ্গালীর নিয়োগের অল্পতার কারণ, বাঙ্গালীর যোগ্যতার অপেক্ষাকৃত অভাব। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী নিজেদের যত্ন ও চেষ্টার ফলে এই অপবাদ নিরাকরণ পূর্ব্বক গৌরবান্বিত পূর্ব্ব-অধিকারলাভে যত্নবান হইবেন।

সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাপরিষদ—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম-এ, পি, এইচ, ডি, মহাশয়, স্কুল ও কলেজের এবং টোলের অধ্যাপকদিগকে লইয়া উপরোক্ত নামে একটি সঙ্গত-সভা খুলিয়াছেন। গত ৯ই আগষ্ট মঙ্গল্য বেদগান করিয়া ইহা খোলা হইয়াছে। দাসগুপ্ত মহাশয় ইহার উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন এবং সর্ব্বশেষে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুন্দর কীর্ত্তন করিয়া ইহার উপসংহার করেন। আমরা এরূপ মঙ্গল অনুষ্ঠান সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করি। ইহার ফলে প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকগণের পরস্পরের মধ্যে শিক্ষার ও সদ্ভাবের আদানপ্রদান হয়। ইহার জন্য হয় তো অনুষ্ঠাতাদিগকে অনেক উপহাস-পরিহাস সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু সে সমস্তই সহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি লইয়া প্রাচীনপন্থীগণ এক সময় কত না উপহাস পরিহাস করিয়াছিলেন এবং উহার পথে কত না বিঘ্নবিরোধ আনিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সে সমস্তই অকাতরে সহ্য করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই বলিয়া আজ আমরা স্ত্রীশিক্ষার এত প্রসার ও গভীরতা দেখিতেছি। ঘোর প্রাচীনপন্থীগণও সাদরে ও সাগ্রহে স্ত্রীশিক্ষা অবলম্বন করিতেছেন দেখি ও সংবাদ পাই। আমাদের একটী পরামর্শ এই যে, ডাঃ দাসগুপ্ত তাঁহার পরিষদের এরূপ ব্যবস্থা করেন যে তিনি সহসা অন্যত্র বদলী হইলেও পরিষদটী যেন অকালে মৃত্যুমুখে না পড়ে।

প্রাণদণ্ডরহিত—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, বর্ত্তমান নেপালরাজের রাজত্বে নেপাল হইতে আপাতত পাঁচ বৎসরের জন্য প্রাণদণ্ড রহিত করা হইয়াছে। ইহা চিরকালের জন্য রহিত হইলে আমরা আরো সুখী হইতাম। একটী প্রাণ নষ্ট হইলে আর একটি প্রাণ নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের আছে বলিয়া মনে করি না। তদ্ব্যতীত, নানা কারণে অনেক ভুলভ্রান্তিতে বিচারেরও ভুলভ্রান্তি হওয়া সম্ভব এবং হইয়াও থাকে। এই ভুল ভ্রান্তির ফলে কত সময়ে নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। এখানে সেই ঈশপের গল্প মনে পড়ে, প্রকৃত অনিষ্টকারী বকগুলির মধ্যে থাকিবার কারণে নির্দ্দোষ সারসও নিহত হইয়াছিল। প্রাণদণ্ড হইলে দোষী বা নির্দ্দোষ কাহারও পুনর্জীবনলাভের সম্ভাবনা থাকে না; বরঞ্চ প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্যবিধ শাস্তি হইলে দোষী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিবার এবং আপনাকে দোষনির্ম্মুক্ত করিবার একটা অবসর পায়। এ বিষয়ে বিলাতে বর্ত্তমানে বিস্তৃত আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের সূত্রপাত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের আরম্ভে হইয়া আজ পর্য্যন্ত বিরত হয় নাই এবং এ বিষয়ে বিস্তৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরাও এ বিষয়ে কিছু পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে তত্ত্ববোধিনীতে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

প্রার্থনাসমাজে শ্রীযুক্ত চিৎনিস—আমরা গত ৮ই আগষ্টের Nabavidhan পত্র হইতে জানিয়া দুঃখিত হইলাম, যে প্রার্থনাসমাজের মুখপত্র সুবোধ পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিৎনিস কমুনিষ্ট শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়কে গৃহে স্থান দিবার জন্য বন্দী হওয়ায় প্রার্থনাসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চিৎনিস পরে জামিনে খালাস পাইয়াছেন। আমরা নববিধান পত্রের লেখক শ্রীযুক্ত এস রায়ের সহিত এক মত যে, প্রার্থনাসমাজের এই কার্য্য যুক্তি বা ন্যায়-সঙ্গত হয় নাই। আইন ভঙ্গের অপরাধে যে কেহ ধৃত হউন বা বিচারে মুক্তিলাভ করুন, আমরা সে বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে, শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন ধর্ম্মসমাজই, রাজনৈতিক অপরাধ ত' দূরের কথা, যে যত বড়ই পাপী হউক বা যতবড় অপরাধে অপরাধী হউক, কোন মানবসন্তানকে উপাসনার অধিকার হইতে বা ধর্ম্মকথা প্রভৃতি শুনিবার অধিকার হইতে বিতাড়িত বা বঞ্চিত করিতে পারে বলিয়া মনে করি না। ভগবান যেমন পাপী-তাপী, সাধুঅসাধুনির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর তাঁহার মঙ্গলকিরণ বর্ষণ করেন, ধর্ম্মসমাজমাত্রই নির্ব্বিশেষে সকল মানব সন্তানেরই উপর স্বীয় মঙ্গলচ্ছায়া বিতরণ করিতে বাধ্য। আমরা জানিনা যে, সমাজে উপাসনাদিতে উপস্থিত হওয়ার অধিকার হইতে প্রার্থনাসমাজ শ্রীযুক্ত চিৎনিসকে বিচ্যুত করিয়াছেন, অথবা সুবোধ পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়াছেন। যদি কেবল সম্পাদকীয় ভার হইতে মুক্তি দিয়া থাকেন, তবে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু যদি তাঁহাকে প্রার্থনাসমাজের উপাসনাদিতে যোগদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়া থাকে, তবে আমরা প্রার্থনা-সমাজের কর্তৃপক্ষদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, যে ধর্ম্মসমাজ পাপীতাপী, সাধুঅসাধুনির্ব্বিশেষে সকলকেই ভগবানের নাম শুনাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কোন নীতি অনুসারে উহা কোন মানব-সন্তানকেই বোধ হয় সেই ভগবানের নাম শুনিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।

দুর্ভিক্ষের হাহাকার ও অসঙ্গত আমোদ।

(শ্রীসত্যকাম শর্ম্মা)

দুর্ভিক্ষের আর্ত্তনাদে আর কর্ণপাত করা যায় না। দেশের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত, উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষের দাবানল দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, নানাবিধ মহামারী, নানাবিধ রোগ, নানা-প্রকার সামাজিক ব্যাধি, সমস্ত মিলিত হইয়া দেশকে এক মহাশ্মশানে পরিণত করিতে চলিয়াছে। কত নর-নারী, কত বালক-বালিকা, কত শিশু যে অনাহারে কঙ্কালসার দেহে প্রাণত্যাগ করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমাদের মধ্যে কত লোক সংবাদ রাখেন যে, বিগত মহাসমরে যত লোক নিহত হইয়াছে, প্রতি বৎসর তদপেক্ষা অনেক বেশী লোক শুধু ম্যালেরিয়ায় ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া প্রাণত্যাগ করে। আমাদের মধ্যে কে কত সন্ধান রাখে, সমাজের অত্যাচারে কত নরনারী স্বামী-পুত্র-কন্যার মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা প্রভৃতি উপায়ে সর্ব্ববিধ জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়াইতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপ যেদিকে দেখি, ভারতের সর্ব্বত্র জীয়ন্তে মৃত মনুষ্যদিগের অস্থিকঙ্কালে পরিপূর্ণ এবং শৃগাল, শার্দ্দূল প্রভৃতি ভীষণ শ্বাপদসমূহে পরিবৃত এক মহাশ্মশানের চিত্র সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতির চিত্র যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের অন্তরে দেশের শ্মশানচিত্র কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কলিকাতা প্রভৃতি সহরে পাকা বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া চাকুরিলব্ধ অর্থে দিনগুজরাণ করিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট পল্লীবাসীদিগের অবস্থা কল্পনায় আনা সহরবাসীদিগের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যে অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—সে চিত্র জীবনে ভুলিতে পারিব না।

বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখে ক্ষোভে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এই শ্মশানক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এই দুর্য্যোগের দিনেও বায়স্কোপ থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে গিয়া এবং মহিলানৃত্য প্রভৃতি দুর্নীতিপ্ররোচক আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানআয়োজন করিয়া আমোদ উপভোগ করিতে পারেন, এমনও দেশবাসী আছেন। স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসারবৃদ্ধি, পর্দা-প্রথা রহিত করা বা নৃত্যকলাকে ঘৃণা হইতে মুক্তিদান করা প্রভৃতি যে কোন অছিলায় হৌক না কেন, যাঁহারা ঐ সকল দুর্নীতির উৎস অনুষ্ঠানাদির আয়োজনে প্রবৃত্ত হন বা উৎসাহ দেন, তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে আমরা অক্ষম। তাঁহাদের হাতে বল আছে বলিয়া তাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষীদের হিতকথা গ্রহণের যোগ্য মনে করেন না। তাঁহারা চান একটা বিরাট হৈ-চৈ এবং কাগজে কলমে নাম জাহির। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের আহ্বানে শত শত লঘু-চিত্ত বালক ও যুবক এবং বালিকা ও মহিলা ঐ অশ্লীল আমোদপ্রমোদের আগুনে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দিবার জন্য উপস্থিত হইবে। এই প্রকারে তাঁহারা দেশবাসী জনসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগকে নেতারূপে দাঁড় করান এবং দেশকে অখাত সলিলে ডুবাইয়া মারিতে উদ্যত হন।

আমরা জানি, তাঁহাদের কার্য্যের এইরূপ প্রতিবাদে বিরক্তিভাজন হইব এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যবর্গের নিকট আমরা নানা বিষয়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিব। তথাপি যতদিন আমাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া না যায়, ততদিন আমরা দেশের ঐ সকল মহা সর্ব্বনাশকর কার্য্যের প্রতিবাদে ক্ষান্ত হইব না। দেশের জন্য যদি তাঁহাদের হৃদয় সত্যই কাঁদিত, তবে তাঁহারা অন্তত দেশের এই করাল দুর্দ্দিনে, যখন রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক প্রভৃতি শতবিধ আকারে দণ্ডায়মান মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা দেশবাসী আত্মবলি দিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হইতেছেন না, বরঞ্চ হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া ভারতের ইতিহাস নবতরভাবে সংরচিত করিতে চলিয়াছেন, সেই এই দুর্দ্দিনে ঐ সকল দুর্নীতিপর অনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তনে বা উহাদের উৎসাহদানে অগ্রসর হওয়া ত দূরে থাক, ঐ সকল বন্ধ করিয়া যে সকল কার্য্যে দেশের ছেলেরা দুই মুঠা অন্ন পাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে, সেই সকল কার্য্যেরই উৎসাহদানে তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে, কত বিদ্যালয়ের ছাত্র অভিভাবক-গণের কষ্টসঞ্চিত অশ্রুদিগ্ধ অর্থ প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয় প্রভৃতির ছুতায় আনাইয়া ঐ সকল আমোদপ্রমোদ দেখিবার জন্য ব্যয় করে এবং সমস্ত পরিবারকে পথে বসাইবার ব্যবস্থা করে। এই দুর্ভিক্ষ-দুর্দ্দিনে তাঁহাদের অপেক্ষা, যে অমলেন্দু গোস্বামী বি-এ জুতাবুরুশের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং যে সকল যুবক ফলমূল ও তরি-তরকারীর বোঝা নিজেদের মাথায় বহন করিয়া হাটে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের অধিকতর নমস্য।

মান যশ ও অর্থলাভ প্রভৃতি স্বার্থের জন্য মানুষ যে কি পর্য্যন্ত নীচে নামিতে পারে, তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা অবাক হইয়াছি। কোন সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক তাঁহার অশ্লীলতামাখা উপন্যাস হইতে

বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন বলিয়া ঐরূপ উপন্যাস-লিখনে বিরত হইতে পারেন না, ইহা তিনি লেখকের এক বন্ধুকে জানাইয়াছেন। এই সকল তথাকথিত নেতা দেখিবার অবসর পান না বা দেখিতে চান না যে, তাঁহারা যে সকল ঢিল ছুড়িতেছেন, সেই সকল ঢিল দেশবাসীর গাত্রে কোথায় লাগিয়া কি প্রকার বিপদ ঘটাইয়া আনিবে।

আমরা দেখিয়াছি, অনেক স্থলে মৃত্যুর ভীষণ দৃশ্য ভুলিবার জন্য শ্মশানের পার্শ্বচর শ্মশানবন্ধুগণ মদ্যপানে আপনাকে বুথাই ভুলাইয়া রাখিতে চায়, সেইরূপ এই সকল তথাকথিত দেশনেতা আপনাদিগের অনুষ্ঠিত অসঙ্গত কার্য্যের ফল ভুলিবার জন্য পরে পরে অনেকগুলি অসঙ্গত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। দেশে মৃত্যু যখন প্রলয়ঙ্কর শিবের ডমরুনাদনের সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময়ে ইহাঁরা যে কি প্রকারে এই সকল অসঙ্গত আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহাতে তাঁহাদের অন্তরের নির্ম্মম বা callous ভাব প্রকাশ পায়, ইহা বলিতে আমরা কিছুতেই দ্বিধা করিব না। ইহাকেই বলে "রোম পুড়িয়া ছাই হইতেছে, নীরো বাঁশী বাজাইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে" "Nero was fiddling while Rome was burning"

আমরা যেন মনে রাখি যে, এইরূপ দুর্নীতির উত্তেজক কার্য্যসমূহের ফলে রোমের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া দুর্নীতিপ্রাণ অধর্ম্ম ও তদনুসঙ্গী মনোবৃত্তি যদি দেশের সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলে তবে ভারত ধ্বংস ও মহা বিনাশের আবর্ত্তে নিশ্চয় পতিত হইবে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই, ধর্ম্মভূমি ভারতভূমির ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীগণ দুর্নীতির পূতিগন্ধময় আমোদ-প্রমোদে মোহজনিত ক্ষণিক উত্তেজনার কারণে দুই-একবার মাতিতে পারেন, কিন্তু বিনাশের করাল কবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ভারতবাসী গাত্র হইতে দুর্নীতি ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার ধর্ম্মের জ্যোতিতে নব-তরভাবে বিভূষিত হইয়া উঠিবেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান ভারতভূমিকে কখনই অধর্ম্মের গভীর কূপে চিরনিমগ্ন থাকিতে দিবেন না। যাঁহারা এই সকল অসঙ্গত আমোদ-প্রমোদ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী, তাঁহারা ক্ষণেকের জন্য কেবল নিজেদেরই অনিষ্ট করিতেছেন না, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দেশের ভবিষ্যত আশার স্থল যুবক-গণকে চিতাগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াইতে প্রবৃত্ত করিতেছেন ইহাই সমধিক পরিতাপের বিষয়।

আমরা ভারতীয় নরনারীর নিকট করযোড়ে এই নিবেদন করি যে,যে ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতা কেবল অতীতকালে নহে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভারতকে জগতের পূজার্হ করিয়া রাখিয়াছে; যে ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতায় ভিতরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আজ মহাত্মা গান্ধি কেবল ভারতশাসকদিগের নহে কিন্তু সমগ্র জগতের শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিতেছেন, তাঁহারা সেই ভারতের অধিবাসী হইয়া ঐ সকল দুর্নীতিপর আমোদপ্রমোদ হইতে ফিরিয়া দাঁড়ান, ঐ সকল আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠানসমূহকে অবজ্ঞার সহিত দূরে অপসারিত করিয়া অধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে বিজয়ী করুন। অসঙ্গত আমোদপ্রমোদের বিরুদ্ধে সবল মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান না হইলে অদূর-ভবিষ্যতে দুর্নীতির ভীষণ ভূকম্পন তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি সহ এই সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবে নিঃসন্দেহ—দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে পড়িতে হইবে।

ঐ সকল অসঙ্গত আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিবার সময় তাঁহাদের কি একবারও মনে হয় না যে, তাঁহাদের গৃহে কত অনাথ ও অনাথা অনশনে অর্দ্ধাশনে জীর্ণবস্ত্রে শীর্ণদেহে কালাতিপাত করিতেছে? তাঁহাদের দুঃখিনী জননীর অশ্রু কি একবারও তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে না? দুর্ভিক্ষ প্রশমিত করিবার জন্য শতবার ভিক্ষা করিলেও যে অর্থ আমরা হাত তুলিয়া দিতে অক্ষম, এই সকল অশ্লীলতা-মাখা উপন্যাস ও অসঙ্গত আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে তাহার দশগুণ বিশগুণ অর্থ ন্যায় বা অন্যায় উপায়ে সংগ্রহ করিয়াও অপচয় করিতে কুণ্ঠিত হই না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থের ঐরূপ অপচয় করার পরিবর্ত্তে উহা সঞ্চিত রাখাও মঙ্গলকর। হাতে অর্থ সঞ্চিত থাকিলে সময়ে তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিবার সম্ভাবনা ও শক্তিসামর্থ্য আসে।

আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে চাই, যাহা যথার্থ চারু-কলা, যাহা সত্য-সুন্দর-মঙ্গল ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া তোলে, আমরা তাহার অনুশীলনের বিরোধী নহি; কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও অশান্তি যখন সমস্ত দেশকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, যখন দুর্ভিক্ষের দাবানল দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশবাসীকে তিলে তিলে পোড়াইয়া মারিতেছে, সে সময়ে চারুকলা অনুশীলনের নামে নৃত্য প্রভৃতি অসঙ্গত আমোদপ্রমোদে গা ভাসাইয়া দেওয়া যে কতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার ও মূঢ়তার পরিচয়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক হইবে না। জীবনপ্রদীপ যখন নির্ব্বাণপ্রায় হয়, মৃত্যু যখন মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন কে আমোদে প্রমোদে বা চারুকলার অনুশীলনে, তাহা যতই কেন ভাল হউক না, গা ভাসাইতে প্রবৃত্ত হয়? বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে চারু-কলার কত অনুশীলন বা আমোদপ্রমোদের কত

অনুষ্ঠান হইয়াছিল ? আমাদেরও দেশে বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের সময়ে বলিতে গেলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে মহা সংগ্রাম লাগিয়াছে। যদি উন্নতি ও শ্রেয় চাও, তবে অধর্ম্ম ও তৎপ্রয়োচক দুর্নীতিপর আমোদপ্রমোদের মস্তক পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ধর্ম্ম ও তৎসহায় সুনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমাদের কল্যাণ ও শ্রেয় তো হইবেই না, প্রত্যুত উত্তরকালে ইহার জন্য আমাদের নামে যে কালিমা লিপ্ত হইবে এবং যে অকীর্ত্তি ঘোষিত হইবে, তাহা কোনকালে যে মুছিয়া যাইবে, তাহা বলা সুকঠিন।

আজ ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন নিজ নিজ দেশের উন্নতিসাধনে এবং দুর্নীতির অপসারণে প্রাণপাত করিতেছেন, সে সময়ে আমরা দুর্নীতিময় আমোদপ্রমোদে নৃত্য করিয়া বাহবাসূচক করতালি লাভ করিবার জন্য লালায়িত! পৃথিবীর সর্ব্বত্র যখন অর্থ সঞ্চিত রাখিবার উপায়সমূহের অনুসন্ধান চলিতেছে এবং শতবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে, দেশের একটী কপর্দ্দকও যখন ব্যয় করিতে হইলে দেশ-নেতাগণ কত-না আলোচনা ও পরামর্শসভার আয়োজন করেন, সেই সময়ে আমাদের মত দুর্ভাগ্য ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশের অধিবাসীগণ পাগলের মত দেশের অর্থ যেখানে সেখানে ছড়াইয়া দিতে বা যে কোন উপায়ে নষ্ট করিতে নিতান্তই ব্যস্ত! মহাবীর আলেকজাণ্ডার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতার একবিন্দু অশ্রুমোচনের জন্য তিনি তাঁহার অধিকৃত সমস্ত রাজ্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। হতভাগ্য আমরা একটু আমোদপ্রমোদ উপ-ভোগের জন্য, একটুকু স্বার্থসিদ্ধির জন্য, একটুকু নাম-যশের জন্য দুঃখিনী জননীর শত সহস্র অশ্রুবিন্দু অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারি—নিজেদের স্বার্থের চরণে দেশের মঙ্গল, জাতির কল্যাণ, সমস্তই সহজে বলিদান করিতে পারি!

গ্রন্থপরিচয়।

প্রশ্নকল্পতরু—শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যানিধি জ্যোতির্ষার্ণব-প্রণীত। ক্রাউন ১৬ পেজী, ২৭৬ পৃষ্ঠা মূল্য ২।০ টাকা। পাষাণময়ী কালীবাড়ী, বরিশাল।

আমরা এই গ্রন্থ একখণ্ড পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে প্রশ্নাদি গণনা করা হয় কিংবা কোষ্ঠী প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়, সেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর খুব যে আস্থা স্থাপন করি, তাহা বলিতে পারি না; আর যে উহা একেবারেই বিশ্বাস করি না, তাহাও বলিতে পারি না। অবিশ্বাসের কারণ এই, অনেক সময়ে জ্যোতিষীগণ প্রশ্নাদির উত্তরে যাহা বলেন, তাহা সফল হইতে দেখা যায় না। ইহা যে অবিশ্বাস করিবার একটী বিজ্ঞানসঙ্গত কারণ, তাহা মনে হয় না। দিয়াশলায়ের কাঠি ঘর্ষণ করিলে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে যদি সেই কাঠি সিক্ত হইবার কারণে শত ঘর্ষণেও আগুন প্রদান না করে, তবে এক নিশ্বাসে সমস্ত দিয়াশলায়ের কাঠিগুলিকে জ্বলিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নহে। সেইরূপ একজন দুইজন দশজন বা শতজন জ্যোতিষীর উত্তর সর্ব্বাংশে বা কোন অংশ সফল হইল না দেখিয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে অবিশ্বাস্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। বিজ্ঞানের উপর চলিতে গেলে আমাদিগের সন্ধান করিতে হইবে যে, কোন্ জ্যোতিষীর গণনায় কোন্ অংশ ভুল হইয়াছে। এইরূপ করিলেই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতিসাধন সম্ভব হইবে।

জ্যোতিষশাস্ত্র যে সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাস্য তাহাও বলিতে পারি না। আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার কোষ্ঠীর সহিত তাঁহার জীবনের খুবই মিল ছিল। আমি জানি যে এই মিলের কারণেই আমার গুরুজনেরা মহর্ষির শেষ অসুস্থতার সময়ে কোষ্ঠী দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথেরই মুখে শুনিয়াছি যে, মহারাজা সার যোতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরেরও কোষ্ঠীর সহিত তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য মিল ছিল। এই আশ্চর্য্য মিলের কারণেই তিনি অনেক সময়ে কোষ্ঠী দেখিয়া শুভকার্য্যাদিতে রত হইতেন। আমিও এক সময়ে আমাদের গৃহ-জ্যোতিষীকে জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য একটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম, উক্ত জ্যোতিষী আমার সম্মুখে সদ্য সদ্য শ্লেট-পেন্সিলের সাহায্যে গণনা করিয়া যে উত্তর দিলেন, তাহা আশ্চর্য্য-রূপে সফল হইতে দেখিলাম। সে সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আমার ঘোর অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অবধি উহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকে বলেন যে জ্যোতিষ শাস্ত্র যদি আমাদের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারে, তবে আমাদের কর্ম্ম করিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না—কর্ম্ম না করিলেও আমাদের জীবনের ভবিতব্য ঘটনাবলী স্বতই ঘটিয়া যাইবে। আমরা এরূপ যুক্তি স্বীকার করিতে অসমর্থ। যদি কোন বৈজ্ঞানিক কোন কোন ঘটনা পর্য্যবেক্ষণের

ফলে বলিয়া দিতেন যে, কয়েকযুগ পরে বেতারবার্ত্তা আত্মপ্রকাশ করিবে, তবে তাহার অর্থে ইহা ধরিলে চলিবে না যে, জগতের বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সকল মানবই হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকুক, আর বেতারবার্ত্তা আপনিই আসিয়া পড়িবে; ইহার বিপরীতে ঐরূপ ভবিষ্যৎবাণী অর্থে আমরা বুঝি যে কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া উক্ত বক্তা বুঝিয়াছিলেন যে, জগতের অন্তত এক সম্প্রদায় ব্যক্তি ঐ বেতারবার্ত্তা আবিষ্কারের অভিমুখে চলিবেন এবং তাঁহাদেরই কার্য্যের ফলে বেতারবার্ত্তা আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। জ্যোতিষ শাস্ত্র সেইরূপ বলে যে, আমাদের ভবিষ্যতে কোনরূপ মন্দ ফলের সম্ভাবনা থাকিলেও আমরা উহা নিজেদের শুভকর্ম্মের ফলে আবার কাটাইয়া উঠিতে পারি। ইহা দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিকত্বের যে কোন প্রকার অপলাপ হইতে পারে, তাহা আমরা মনে করি না। অপলাপের সম্ভাবনা স্বীকার করিলে সকল বিজ্ঞানেরই বৈজ্ঞানিকত্ব অস্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিজ্ঞান হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিবার সহায়তা করিবে বলিয়াই আমরা ইহার প্রকাশে সুখী হইয়াছি। তিনি "প্রশ্নকল্পতরু" নাম দিয়া সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রের সকল বিভাগই অল্পাধিক ছুঁইয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে গ্রন্থকর্ত্তা বিনয়সহকারে সঙ্কলন বলিয়া উল্লেখ করিলেও আমরা ইহাকে জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থের সম্মান দিতে প্রস্তুত আছি। বঙ্গ-ভাষায় জ্যোতিষশাস্ত্রের এরূপ পুস্তক অধিক নাই। গ্রন্থের শেষ ভাগে জ্যোতিষের সাহায্যে রোগাদির নির্ণয়ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন। জানিনা ইহা পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসকদিগের অনুমোদিত হইবে কিনা, কিন্তু পরলোকগত স্বনামধন্য কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, বৈদ্যশ্রেষ্ঠগণ জ্যোতিষের দ্বারা রোগনির্ণয়াদি বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়া থাকেন।

অনুশীলনের অভাবে লুপ্তপ্রায় প্রশ্নগণনা বিষয়ে তিনি যে অধ্যবসায় সহকারে সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আরো বিশেষভাবে বিষয়-গুলিকে স্পষ্ট করিলে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত হইত বলিয়া মনে হয়। যেমন ধাতু জীব বা মূলবিষয়ক প্রশ্ন নির্ণয়প্রণালী ১৩ কি ১৪ রকমের আছে। তাহার মধ্যে প্রণালীভেদে ফলের বৈপরীত্যে কি করা কর্ত্তব্য? এক এক নিয়ম অনুসারে গণনায় যদি পৃথক পৃথক ফল পাওয়া যায়, সেরূপক্ষেত্রে ফলবিচার দুরূহ হইয়া উঠে। সেজন্য জ্যোতিষীর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। গ্রন্থকারের নিজের অভিজ্ঞতা এই সকল বিষয়ে লিখিত থাকিলে ভাল হইত। রাশি ও গ্রহগণের স্বরূপ নিরূপণস্থলে তাহাদের প্রয়োজনীয়তাও লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। গ্রহের বর্ণনির্দ্দেশ আবশ্যক, যেমন লগ্নস্থ বা লগ্নদর্শী বলবান গ্রহের বর্ণ অনুসারে চৌর্য্যাদির বর্ণনিরূপণ করিতে হয়। দুই একটি উদাহরণ দ্বারা চৌর্য্যাদি বা রোগাদি প্রশ্নে জ্ঞাতব্য বিষয়সকল বিচার করিয়া ফলনির্দ্দেশ করিবার পৌর্ব্বাপর্য্য প্রণালী দেখাইয়া দিলে সাধারণের পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইত। তারপর, হয়তো একটা প্রশ্নের উত্তর জানিবার যে প্রণালী লেখা আছে, সেই অনুসারে গ্রহসন্নিবেশ সকলক্ষেত্রে না-ও থাকিতে পারে। মনে করুন, কোন প্রশ্নের উত্তর লগ্নস্থ গ্রহ অনুসারে বলিতে হয়; কিন্তু লগ্নে যদি কোন গ্রহ না থাকে সেক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি? নবাংশোক্ত দ্রব্যনির্ণয়স্থানে একই নবাংশে বহু দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহার মধ্য হইতে একটীকে বাছিয়া লইবার কোন উপায় আছে কি না? গ্রহ-নির্দ্দিষ্ট ব্যাধিনির্ণয় স্থলে একই গ্রহের দ্বারা বহুরকম রোগ জন্মিতে পারে—প্রশ্নকর্ত্তাকে কোন্ রোগের কথা বলিব? আশা করি গ্রন্থকার জ্যোতিষী মহাশয় পরবর্ত্তী সংস্করণে সাধারণের সুখবোধার্থ তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা দান করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। গ্রন্থকর্ত্তা জ্যোতিষা-চার্য্য মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থের অনুরূপ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—৺সারদাচরণ মিত্র প্রণীত। কাপড়ে সুন্দর স্বর্ণরঞ্জিত বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ১৩৩ পৃষ্ঠা। প্রাপ্তিস্থান ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হই-লাম। গ্রন্থখানির নাম হইতেই ইহার বিষয় সহজেই বুঝা যাইতেছে। উৎকলপ্রদেশে শ্রীচৈতন্য কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, তাহারই বর্ণনা ইহাতে লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইহার ভিত্তি হইলেও সারদা বাবুর সিদ্ধহস্তে ইহার লিখিত প্রত্যেক বিষয়টী বড়ই সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠি-য়াছে। স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি গৌরাঙ্গদেবের জীবনীর মধ্যে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। শুধু বৈষ্ণবসমাজে নহে কিন্তু বঙ্গের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট ইহা যে সমাদরে পঠিত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। দুঃখের বিষয়, সারদা বাবু তাঁহার "দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" মৃত্যুর পূর্ব্বে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িবার পর এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানিও পড়িবার

ইচ্ছা আমাদের প্রাণে বড়ই জাগ্রত হইতেছে। তাঁহার পুত্র পৌত্রগণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা ঐ অসম্পূর্ণ গ্রন্থখানিও প্রকাশ করিতে যত্নবান হউন।

কোরাণ-কণিকা।—মীর ফজলু আলী বি-এল প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৬ ফর্ম্মা, মূল্য ১।০ টাকা, প্রাপ্তিস্থান বরিশাল।

এই পুস্তকখানিতে কোরাণের দশটী প্রার্থনা ও ৫টী উপদেশের অংশবিশেষ পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। কোরাণের কাব্যানুবাদ দুরূহ হইলেও গ্রন্থকার সরল ও সহজ পদ্যে ইসলাম ধর্ম্মের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় এবং নিতান্ত নিষ্ফলও হয় নাই। অনুবাদগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ইসলাম ধর্ম্মের সারমর্ম্ম ও মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। ইহাতে কাব্যরসের আস্বাদ না পাইলেও প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু পরম রসের সন্ধান পাইবেন। এই গ্রন্থপাঠে সমগ্র কোরাণপাঠের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্বতই জাগিয়া উঠিবে। আমরা আশা করি ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মপিপাসু মাত্রই ইহা পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তাঁহারা ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পত্রিকাপরিচয়।

পরিচয়—ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ৫নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার—শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৪।০ মাত্র।

আমরা এই সাহিত্যবিষয়ক নূতন ত্রৈমাসিক পত্রের আবির্ভাবে বড়ই আনন্দিত হইলাম। ইংরাজীতে এরূপ ধরণের ত্রৈমাসিকের সংখ্যা খুবই অল্প। বাঙ্গলায় এরূপ একখানিও আছে বলিয়া জানি না। লঘু সাহিত্য ও উপন্যাসই এ যুগে অধিক সমাদর পাইয়া থাকে দেখা যায়; আর তাহাতে অশ্লীলতার স্পর্শ যত বেশী থাকিবে, ততই তাহার সমাদরও অধিকতর হইতে থাকিবে। সাহিত্যের এই দুর্দ্দিনে "পরিচয়ের" ন্যায় একখানি ত্রৈমাসিক পত্র যে বাহির হইতে সাহস করিয়াছে, ইহাতে আমরা অত্যন্ত সুখী, কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়াছি। সর্ব্বপ্রথম স্থান পাইয়াছে বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের—"যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ"। আমরা প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম। প্রবন্ধটী বেদান্তরত্ন মহাশয়ের উপযুক্তই হইয়াছে। গভীর পাণ্ডিত্য ও বৈদিক তথ্যে পূর্ণ হইলেও সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। মূল বিষয়টী তিনি আগামী সংখ্যায় খুলিয়া লিখিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—বৌদ্ধধর্ম্মের দান। বৌদ্ধধর্ম্মের ফলস্বরূপ আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাই সরল ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাকচী মহাশয় ঐ সকল দানের একএকটী লইয়া যদি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন, তবে তাহা বাঙ্গলাসাহিত্যে অমূল্য দান হইবে, নিঃসন্দেহ। আমাদের আর একটু মনে হয় এই যে, বৌদ্ধধর্ম্মের দানস্বরূপে আমরা এতগুলি মঙ্গলসাধক বিষয় পাইলাম কি কারণে? কোন্ বস্তু কোন্ সত্য বৌদ্ধপন্থীদিগকে জগতের হিতসাধক বিভিন্ন বিষয়ের সাধনায় অন্যান্য ধর্ম্মপন্থী অপেক্ষা অধিকতর বল ও প্রেরণা দিয়াছিল, সেই তত্ত্বের সন্ধান করিয়া প্রকাশ করিলে প্রবোধবাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। "কাব্যের মুক্তি" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। লেখক প্রবন্ধে ভাব ভাষা ও ছন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কাব্যের মুক্তির পথপ্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল উপলক্ষ করিয়া তিনি প্রবন্ধে এত points বা সঙ্কেত আলোচনার জন্য উপস্থিত করিয়াছেন যে, সেগুলি সহজে একসঙ্গে হৃদয়ে ধারণ করা দুরূহ হয়। আমাদের মনে হয় যে, ঐ সকল সঙ্কেতগুলি একএকটি লইয়া অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে মুক্তির পথটী দেখা সহজ হইত— পাঠকগণ তাহা হইলে সেই একএকটী খোঁটা ধরিয়া মুক্তির পথ সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। লেখক মোটামুটি এ যুগের কবিতা ধরিয়াই তাঁহার বক্তব্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্য প্রভৃতি ধরিয়া আলোচনা করিলে বোধ হয় তাঁহার পক্ষেও মুক্তির পথপ্রদর্শন এবং পাঠকদের পক্ষেও উহা দেখা অনেক সহজ হইত। ভাবের দিকে আমরা তাঁহার সহিত একমতে বলিতে পারি যে, সমস্ত জ্ঞান যেমন অনন্তস্বরূপে পরিসমাপ্ত হয়, সেইরূপ কাব্যও যতটা সত্য-সুন্দর-মঙ্গল ভাবের উপর দাঁড়াইতে পারিবে, উহার মুক্তির দুয়ারও ততই প্রশস্তভাবে খুলিয়া যাইবে। ভাষার দিকে সংস্কৃতকাব্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে মনে হয়, প্রত্যেক দুই চরণের শেষভাগে আনুপ্রাসিক শব্দমিল অপেক্ষা যাহাতে যতি রাখিবার প্রথার উপর অধিকতর ঝোঁক দেওয়া হয়, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিলে কাব্য মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়া এবিষয়ে মাত্র চতুর্দ্দশপদী কবিতাকেই মুক্তিদান করিয়াছেন; আমরা চাই সকল-পদী কবিতারই এবম্বিধ মুক্তি। "রুষবিপ্লবের পটভূমিকা" প্রবন্ধে লেখক শ্রীসুশোভন সরকার রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস সংক্ষেপে ও সুলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। রাশিয়ার বিপ্লবের আমূল বৃত্তান্ত যদি ধারাবাহিকক্রমে তিনি প্রকাশ করেন, তবে তাহা হইতে দেশ বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষণীয় অনেক বিষয় লাভ করিবে। "বিজ্ঞানের সঙ্কট" প্রবন্ধে লেখক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ক্ষীণ আভাস দিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক মহলে বিজ্ঞানের মূল কথা লইয়াই কিরূপ আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। আমরা বিজ্ঞানের ক-খ পর্য্যন্তও জানি না, অ-আ মাত্র আরম্ভ করিয়াছি; সুতরাং আমরাও যে সেই আন্দোলনে পড়িয়া হাবুডুবু খাইব, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? এত দিন মনে হইত, বুঝি সমস্ত পদার্থ-বিজ্ঞান প্রকম্পনবাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু আজকাল প্রকম্পনবাদের সঙ্গে পরমাণুবাদকেও পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে অল্পে অল্পে স্থান অধিকারে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। লেখক এই সঙ্গে আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রের পদার্থবাদেরও অল্পবিস্তর আলোচনা করিলে ভাল হইত। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "শিরীর ব্যথা" আমাদের বড়ই মিষ্টি লাগিল।

"হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা গান" প্রবন্ধের লেখক শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়ের সহিত আমরা একমত যে, 'জগতের সব গানের মধ্যেই মূলগত একটা ঐক্য পাওয়া যায় এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে উহার প্রকাশের প্রণালী বিভিন্ন মাত্র'। এই বিষয় লইয়া ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদির দ্বারা সঙ্গীতানুরাগী জনসাধারণের অন্তরে এই বিষয়টী মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কারণে হেমেন্দ্রবাবুর ন্যায় তিনিও বলেন, সঙ্গীতে স্থূল ভৌগোলিক বিভাগ পরিকল্পনা করিবার পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও যাহা কিছু ভাল পাওয়া যায় তাহা প্রাচ্য সঙ্গীতেও আনিয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু তাহা প্রাচ্যভাবে সংগঠিত করিয়া। বোধ হয় আমরা বলিতে পারি না যে, পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলা গানের মধ্যে একটা বিভাগসূত্র পরিকল্পিত ছিল না। মনে হয় নিধুবাবুর টপ্পা, রামপ্রসাদী গান, কীর্ত্তন প্রভৃতিতেই বাঙ্গলা গানের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতর দিয়া ব্রহ্মসঙ্গীতের সাহায্যে বাঙ্গলা দেশে ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর বাঙ্গলা গান প্রবর্ত্তিত ও প্রসারিত হইল। তাহার পূর্ব্বে ধ্রুপদ খেয়ালের যে বাঙ্গলা গান ছিল না, তাহা বলি না; কিন্তু সচরাচর হিন্দুস্থানী গানই গাওয়া হইত। আমাদের মতে কোন রাগিণীতে হিন্দুস্থানীগণ যদি শুদ্ধ "নি" এবং উক্ত রাগিণীর প্রাণ বজায় রাখিয়া বাঙ্গালী ওস্তাদগণ যদি কোমল "নি" ব্যবহার করেন, তাহা লইয়া মারামারি করিবার পরিবর্ত্তে কি উপায়ে দেশ-বিদেশে সঙ্গীতের আমদানী রপ্তানী হইয়া বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সঙ্গীত, অবশ্য নিজ নিজ দেশীয়ভাবে গড়িয়া লইয়া, আপনার করিয়া লইতে পারে, তাহার উপায় প্রদর্শন করিলে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ।—গত ১১ই শ্রাবণ সোমবার পূর্ব্বাহ্নে ৺দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাৎসরিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মসজিদ বাড়ীর ষ্ট্রীটের স্বকীয় বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ।—গত ৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীঅমিয়া দেবী তদীয় পিতা ৺সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের চতুর্থাহ শ্রাদ্ধকর্ম্ম স্বকীয় বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বর-বাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

শোকসংবাদ।

রায় বাহাদুর ৺সুরেশচন্দ্র সরকার বিগত ৩১শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সার্দ্ধ দুই ঘটিকার সময় শ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান সুবিমল সরকারের পাটনানগরীর বাসভবনে হৃদ্‌রোগে

হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৬৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। বিহারে দীর্ঘকাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণতাগুণে প্রভূত যশ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক গিরিধিতে নবনির্ম্মিত আশ্রমবাটিকায় সাধকোচিত জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইঁহাকে হারাইয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশেষতঃ বিহার ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহার মনে এমনি একটা অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌম ভাব বিদ্যমান ছিল, যে ব্রাহ্মসমাজের শাখাবিভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পীড়া দিত। গত মাঘোৎসবে তিনশাখার জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়া তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, উহা গত ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে প্রকাশ পাইবে, তাঁহার জীবনের শেষভাগেও তদীয় অন্তরে ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষণা কিরূপ প্রবল আকারে জাগ্রত ছিল। আমরা ইঁহার সুযোগ্য পুত্রদিগকে এই গভীর শোকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় প্রদান করুন।

৺সুরেন্দ্রনাথ রায়। সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গত ৪ঠা শ্রাবণ সোমবার দ্বিপ্রহরে গ্রে ষ্ট্রীটের বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি কিছুকাল ধরিয়া উদরসংক্রান্ত পীড়ায় বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫৭ হইয়াছিল। ইনি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সসম্মানে হাইকোর্টে এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা ইঁহার পত্নী, কন্যা ও পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার আত্মার শান্তি ও সুগতি বিধান করুন।

রায় বাহাদুর ৺রাধাবল্লভ চৌধুরী। গত ১৮ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি একাদশ ঘটিকায় ময়মনসিংহের সেরপুর-টাউনানিবাসী রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। মাসকয়েক পূর্ব্বে ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে ইনি অন্তরে বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পুত্র-পরিজনদিগের এই গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবৎকৃপায় ইনি সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হউন।

পণ্ডিত ৺মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। গত ২৩শে শ্রাবণ শনিবার রাত্রি সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকায় স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় ডবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৯ হইয়াছিল। ইনি যেমন পণ্ডিত, তেমনই একজন সুবক্তা ছিলেন। স্বদেশী যুগে দেশমাতৃকার সেবায় উদ্বুদ্ধপ্রাণ হইয়া ইনি বহুবার কারাবরণ করিয়াছে, এবং বহুক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। ইদানীং ইনি ভাস্কর নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

Tattwabodhini Patrika   Reg. No. C 462

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৫৭   ১৮৫৩ শক ভাদ্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে   চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁতৎসৎ

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮০। জীবনের একতারা।

মা! আকাশে বাতাসে তুমি যে গান ভরিয়া দিয়াছ; প্রতি মুহূর্ত্তে যে গান আকাশে বাতাসে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে; প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে যে গানের ঝঙ্কার আমার মরমের প্রত্যেক পরতে প্রবেশ করিতেছে, সে গান আমি কেবলই অবাক হইয়া শুনি। আমার ক্ষমতা নাই যে, সে গান আমি ধরি আর গাহি। আমার জীবনের এক-তারাতে যে সুর তোমার নামে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, সেই সুরখানিই আমি জানি আর সেই সুরখানিই আমি আপনার মনে গুনগুন করিয়া গান করি। পর্ব্বত হইতে নির্ঝরিণীসকল বাহির হইয়া যে গানের সুধা পান করিতে করিতে সুপুষ্ট নদনদীর আকারে সাগরের সঙ্গে মিশিয়া যায়; মহাসাগর যে গান উদাত্তস্বরে নিরবধি গাহিয়া আসিতেছে, আমার ক্ষমতা নাই যে সে গান আমি ধরি আর শিখি। আমার ঐ একতারাতে যে সুর তোমার নামে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, সেই সুরটুকুই আমি ধরিয়াছি, আর তাহাই আমি নিজের মনে গাহিয়া থাকি। তোমার যে গানে রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গিয়া দিনের আলো ঝকমকিয়া উঠে, সে গান কোথায় আমি পাইব? তোমার যে গানে ধরণীর বক্ষ বিদারিয়া ধনরত্নের অফুরন্ত খনিসকল বাহির হইয়া পড়ে, কোথায় আমি পাইব সে গান? আমি তোমার গানগুলি দিনের পর দিন একমনে শুনিতে থাকি; আর তাহার মধ্যে যে সুরখানি আমার একতারায় ঝঙ্কার দিয়া উঠে, সেই সুরখানিই আমি নানা ভাবে গাহিতে থাকি। তোমার যে গান মায়ের বুকে সন্তানবাৎসল্যের আকারে ঝরিয়া পড়ে, কোথায় পাইব আমি সে গান? আমার জীবনের একতারাতে যে সুরটী ধরা পড়িয়াছে, সেই সুরটীই আমি গুনগুন করিয়া গাহি। অপর কাহারও কাছে আমার সেই একতারা বাজাইয়া গান করিতে বড়ই লজ্জাবোধ হয়। একমাত্র তোমারই কাছে আমি সেই গান গাহি, আর আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া উঠি। আমি আর কিছু চাহি না, এই বর প্রদান কর, যেন সেই একতারাতে তোমারই নাম নিত্যকাল বাজাইতে বাজাইতে আমার জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে পারি।

৮৪। কাজের ভার ফিরাইয়া লও।

মা! আমাকে ভুলিয়া যাইও না। তুমি আমাকে যে সমস্ত কাজের ভার দিয়াছিলে, সমস্ত দিনের শেষে দেখি, সে সমস্তের কিছুই তো করিতে পারি নাই। যে দুই-একটী কাজে হাত লাগাইয়াছি, তাহাও করিতে করিতে অতি বিশ্রীই হইয়া গিয়াছে। এখন বুঝিতেছি, তোমার কাজে যেমন সমস্ত মন দেওয়া উচিত ছিল, সে রকম মন দিই নাই। এইটী যে বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাতেই আমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। তোমার কাজে অবহেলা করিয়া তোমার মনে যে কষ্ট দিয়াছি, তাহাতেই আমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। আর আমাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া বেশী শাস্তি দিও না, আমি তোমার চরণ ধরিয়া বারম্বার ক্ষমা চাহিতেছি। তোমার কথা পদে পদে শুনিতে অবহেলা করি বলিয়াই তো এই দুঃখদারিদ্র্য ভোগ করিতেছি; শতবিধ বিষময় কণ্টকের আঘাতে দেহমন ছিঁড়িয়া গেল। তোমার কথা যেটুকু শুনি, তোমার কাজে যেটুকু মন দিই, তাহাতেই তো দেখি, সুখশান্তিতে প্রাণ ভরিয়া উঠে। দিকে দিকে তোমার নামের মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিতেছে, আমার কানে সে শব্দ ছুঁইয়া মাত্র ভাসিয়া যাইতেছে, প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—আমি নিজের বৃথা কার্য্যেই ডুবিয়া আছি। জগতের সকল স্থানেই সুখশান্তি ছড়ানো আছে, দেখিতেছি, বুঝিতেছি; তবু আমার প্রাণ বিষাদের ঘন অন্ধকারেই যেন নিত্য সমাচ্ছন্ন—আমি নিজের রচিত শতবিধ অন্যায় কার্য্যেই ডুবিয়া মরিতেছি। আমাকে মা এখানে ফেলিয়া রাখিয়া আর বেশী শাস্তি দিও না। তোমার চরণ আমার বুকের উপর পাতিয়া দাও। আমার হাতে যে সমস্ত কাজের ভার দিয়াছিলে, সে সমস্তই ফিরাইয়া লও। আমি তোমার নিতান্ত অকেজো সন্তান। আমি আর কিছু চাহি না—নিত্যকাল তোমার চরণপূজার অধিকারটুকু চাই।

৮৫। হীরকে কলঙ্ক।

মা! তোমার কোলে আমি যখন জন্মগ্রহণ করিলাম, তখন জগতে কি আনন্দধ্বনিই উঠিয়াছিল! এমন সন্তান তোমার কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই তোমাকে লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তোমার মত জননীর গর্ভে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই যে এই প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারিল, সে কথা একটীবারও কেহই ভাবিয়াই দেখিল না। তুমি যে আমার অন্তরে একটা হীরার টুকরো বসাইয়া দিয়াছ, তাহারই জ্যোতিতে যে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া উঠিয়াছিল, আর তাহারই একটুখানি অংশ বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা কেহই একবারও ভাবিয়া দেখিলই না। সংসারে আসিয়া খেলা করিতে করিতে বাড়িয়া চলিলাম, কোথা হইতে একটুকরো কাদা আসিয়া তাহার একদিকটা ঢাকিয়া ফেলিল। কত চেষ্টা করিলাম, সে কাদা সম্পূর্ণ উঠাইতে পারিলাম না; যে স্থানের কাদা উঠাইলাম, কত চেষ্টা করিলাম, সে স্থানেরও দাগটা নির্ম্মূল করিতে পারিলাম না। সংসারের পথে যতই অগ্রসর হই, ততই মাঝে মাঝে কোথা হইতে যে কাদার ঝাপটা আসিয়া পড়ে, বুঝিতে পারি না। এই প্রকারে তিলে তিলে সেই হীরের টুকরোর প্রায় সকল দিকটাই কাদায় গেল ভরিয়া; কেবল মাঝে মাঝে এক আধটু স্থান দৈবাৎ কাদার ছিটা থেকে বাঁচিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে হীরা বলিয়া চেনা যাইতেছে। মা! জীবনের এই শেষভাগে সমস্ত সংসার যখন ঘুরিয়া আসিয়াছি, তখন তোমার চরণে দাঁড়াইয়া যখন সেই হীরাখানি তোমার হস্তে ফিরাইয়া দিতে গেলাম, তখন তাহার এই কর্দ্দমাক্ত অবস্থা দেখিয়া আমি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া গেলাম। দাগগুলি মুছিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না। এখন তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি ছাড়া উহার কলঙ্কচিহ্ন আর কেহই তুলিয়া দিতে পারিবে না। জননী! আমি যাহা ভালভাবে রাখিতে পারিব, তাহাই আমাকে দিও! যাহা দিতে হয় দিও, যাহা না দিবে দিও না, কিন্তু তোমার স্নেহপ্রেম হইতে আমাকে তিলেকের জন্য বিচ্যুত করিও না।

৮৬। দাঁড়াও।

মা! যে মূর্ত্তিতে তুমি আমার নিকট দেখা দিলে, সেই মূর্ত্তিতে কিছুক্ষণ দাঁড়াও—আমি প্রাণ

ভরিয়া দেখিয়া লই। তোমার ঐ শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তি তোমার চক্ষের ঐ মধুর অভয়প্রদ ভাব আমার প্রাণে শ্রদ্ধাভক্তির কি যে তরঙ্গ তুলিয়াছে, তাহা একমাত্র তুমি জান। দাঁড়াও—দাঁড়াও—অনন্তকাল তুমি ঐ মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে দাঁড়াও আর আমি নিরবধি উহারই উপর স্থির দৃষ্টি রাখি। অনন্ত—অনন্তকাল আমার দৃষ্টি যেন তোমার দৃষ্টিতে সন্নিবদ্ধ থাকে। আমিও যেন তোমার ঐ শান্তস্নিগ্ধ ভাবের এতটুকুও লাভ করি। আমার শয়নে স্বপনে, জাগরণে বিহরণে তুমি ঐ মূর্ত্তিতেই আমাকে দেখা দিও। তোমার ঐশ্বর্য্যসমুজ্জ্বল মূর্ত্তি অপেক্ষা ঐ শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তিই আমার বড় ভাল লাগে। আমি এই ক্ষুদ্র কুটীরেই আছি, বেশ আছি। এখানে থাকিয়াই তোমাকে পাইয়াছি, তাই এই কুটীরখানিই আমার বড় প্রিয়। আমি কুটীরখানি সুমার্জ্জিত রাখিব, আর তুমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে আদর করিবে, তোমার মঙ্গলহস্তে আমার মস্তকে সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ দিবে। আমি তোমাকে নমস্কার করিব। ইহাই আমার নিত্যখেলা হইবে। আমার পূজা সাঙ্গ হইলে যখন তুমি তোমার কার্য্যে চলিয়া যাও, তখনই আমার হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিতে থাকে; আশঙ্কা হয়, কি জানি যদি তুমি আমার তুচ্ছ পূজা গ্রহণের জন্য আর ফিরিয়া না আস। জননী! দেখো, আমায় আশীর্ব্বাদ দাও, বল ও শক্তি দাও, যেন তোমার আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ না করি, বিপথে না যাই। আমার সেই ভয়ই বড় ভয়—পাছে ভুল করিয়া বিপথে গিয়া পড়ি। তোমার মত এমন মা কে কবে পাইয়াছে, আর কে পাইতে পারেই বা? তুমি যখন আমার ঘরে আস, তখন চারিদিক হইতে সুগন্ধের মলয় বায়ু বহিয়া আসে। আজ কি জানি কেন, আমার প্রাণটা বড়ই হালকা মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছ; আমি তোমার চরণে যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, মনে হইতেছে, সে সমস্তই ক্ষমা করিয়াছ। মা, আমি তোমাকে আর কি দিব? তোমার চরণে মাথা রাখিয়া মুখ লুকাইয়া দুদণ্ড প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে চাহি, আর সেই অশ্রু দিয়া তোমার ঐ চরণ ধুইয়া দিতে চাহি। সুখ দাও, দুঃখ দাও, আমি তোমাকে আর কিছুই বলিব না। আমি জানি তুমি আমার মঙ্গলবিধান করিবে। জননী! আমার প্রতি চিরকাল সুপ্রসন্ন থাকিও এবং তোমারই প্রদত্ত আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে তোমার স্থান চিরতরে সুনির্দ্দিষ্ট রাখিও।

ভয় ও বিশ্বাস।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

বহির্জ্জগতে যে নানাপ্রকার অমঙ্গল আছে সেই সকল অমঙ্গলকে ভয় করি বটে, কিন্তু ভয় জিনিষটা ত বাহিরের বস্তু নয়, ভয় ত মানুষের অন্তরে। যত রকমের অমঙ্গল আছে সেগুলি বাস্তবিক যত ভয়ানক, আমাদের কাছে সেগুলি তাহার অপেক্ষাও অনেক অধিক ভয়ানক বলিয়া লাগে। যে বিপদ এখনও আসে নাই মনশ্চক্ষে তাহার সম্ভাবনা দেখিয়াই আমরা আকুল হই। যে যন্ত্রণা অতি অল্পকাল-স্থায়ী তাহারই ভয়ে আমরা সারাজীবন কম্পিত হই। ইতর প্রাণীরা মৃত্যুকালে কিছুক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করে সত্য, কিন্তু মানুষের মত সুস্থ অবস্থায় ভবিষ্যতে মৃত্যুর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভয়ে বিহ্বল হয় না। যাহা চাই পাছে তাহা না পাই, পাছে আশায় বঞ্চিত হই, পাছে যাহাদের ভালবাসি তাহাদের কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে, পাছে বা তাহাদের হারাই, এই সকল ভয়ে মানুষ আকুল।

ইতর প্রাণীদের অপেক্ষা মানুষ যে কতগুণে শ্রেষ্ঠ তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতাই মানুষের অধিকাংশ দুঃখকষ্টের কারণ। যদি আমাদের আত্মজ্ঞান ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি না থাকিত তবে আমাদের এত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও থাকিত না। যদি মানবঅন্তরে প্রেম না থাকিত তবে মানবজীবনে শোকও স্থান পাইত না। যদি মানবহৃদয়ে বিবেক না থাকিত তবে মানুষকে লজ্জা ও অনুতাপ ভোগ করিতে হইত না। এই সকল সন্তাপ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গকে স্পর্শও করে না। যে সকল শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে বলিয়া মানুষ ইতর প্রাণীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, সেই সকল শক্তি ও প্রবৃত্তিই মানুষকে নানাপ্রকার সন্তাপের অধীন করিয়াছে। বিধাতা মানুষকে মহোচ্চ অধিকার দান করিয়া তাহারই সহিত বহুবিধ দুঃখকষ্টকে গ্রথিত করিয়াছেন।

তথাপি আমরা এ কথা কিছুতেই বলিতে পারি না যে এই অধিকার না থাকিলেই ভাল হইত। সত্য বটে যে যাহা লইয়া মানুষের শ্রেষ্ঠতা সেই সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তিই মানুষের ভয় ও উদ্বেগ, শোক ও অনুতাপের মূল; কিন্তু আবার সেই সকল শক্তি ও প্রবৃত্তিই মানুষকে স্বর্গীয় শান্তি দান করে। যে জ্ঞানবুদ্ধি আমাদিগকে বলে যে জীবনে সকলই চঞ্চল, সকলই নশ্বর, সকলই মৃত্যুর অভিমুখে ছুটিয়াছে, সেই জ্ঞানবুদ্ধিই যিনি নিত্য ও নির্ব্বিকার তাঁহাকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে। মানবঅন্তরে যে স্নেহপ্রেম আছে বলিয়া আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু এত শোকের ব্যাপার হইয়াছে, সেই স্নেহপ্রেমই আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে দেহের বিনাশে আত্মা বিনষ্ট হয় না এবং পৃথিবীতে যাহাদের হারাইয়াছি তাহাদের চিরদিনের মত হারাই নাই। যখন আমরা কোন ভুক্কর্ম্ম করি, তখন বিবেকের ধিক্কার ভোগ করি বটে, কিন্তু বিবেকই আমাদিগকে বলিয়া দেয়, সে কোন্ আলোক, যাহার অভাবে হৃদয় এরূপ অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। এইরূপে মানুষের যে সকল বিশেষ শক্তি মানুষকে গভীর শোকসন্তাপে নিক্ষেপ করে, সেই সকল শক্তিই পরমাশ্চর্য্যরূপে মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে। এই সকল শক্তি আমাদিগকে শোকসন্তাপের ভিতর দিয়া ভগবচ্চরণে লইয়া যায়। ভয়ের প্রতিকাররূপে ভগবান আমাদিগকে ধর্ম্মবিশ্বাস দান করেন। জীবনের প্রভু যিনি তাঁহার উপরে নির্ভর করিলে মানুষ যেমন নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয় এমন আর কিছুতেই নহে।

যিনি বিশ্বাসী তিনি বাস্তবিক ভয়ের অতীত। কিন্তু মানুষের জীবন সাধারণতঃ যে সকল আপদবিপদের অধীন সে সকল আপদবিপদ যে তাঁহার জীবনে আসিবে না, তিনি এমন আশাও করেন না, কামনাও করেন না। যে মহামারীতে দেশ একেবারে উচ্ছন্ন যাইতেছে, সে মহামারী যেন তাঁহাকে স্পর্শ না করে এমন বর তিনি কামনা করেন না। যে অলক্ষ্য বাণ অন্ধকারে আসিয়া শত সহস্রজনকে ধরাশায়ী করিতেছে, সে বাণ যেন তাঁহার গায়ে না লাগে এমন দুর্ভেদ্য কবচ তিনি প্রার্থনা করেন না। যখন অনাবৃষ্টিতে দেশ জলিয়া যাইতেছে তখন তাঁহার ক্ষেত্রে প্রচুর বৃষ্টিপাত হোক ইহাও তাঁহার কামনার বিষয় নহে। তাঁহার জীবনে যেন কোনরূপ আপদবিপদ দুঃখকষ্ট বা প্রলোভন না আসে, আর যদিই বা আসে ভগবান যেন সেগুলিকে অলৌকিক উপায়ে নিজে দূর করিয়া দেন—এমন প্রার্থনাও তিনি করেন না। ভক্ত মনে করেন যে নিজের জন্য সাংসারিক কোন বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করা লজ্জার কথা, এবং এরূপ কোন বিশেষ সুবিধা লাভ করিবার আশা করিলেও অধর্ম্ম হয়। বিশেষ অধিকার মাত্রেই মানুষকে সর্ব্বসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করে। বিশ্বাসী জানেন যে সমগ্র মানবপরিবার একটী অখণ্ড ভ্রাতৃমণ্ডলী এবং কোনরূপ বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা, কোনরূপ বিশেষ অধিকার যাহা হইতে সাধারণে বঞ্চিত —নিজের জন্য এমন কিছু আকাজ্ক্ষা করিলে এই বিরাট ভ্রাতৃমণ্ডলীর নিকট বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ হয়। পরম পিতা যাহা বিধান করেন তাহাই বিশ্বাসী মঙ্গল বলিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করেন। তিনি সেই পিতার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া সাংসারিক সুখ-সৌভাগ্যরূপ কোন মূল্য প্রার্থনা করেন না। সাধারণ লোকের জীবনে যেমন দুঃখকষ্ট আপদবিপদের সম্ভাবনা বিশ্বাসীর জীবনেও সেইরূপ; সাধারণ লোকের ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকার ও অনিশ্চিত ভক্তের ভবিষ্যতও ঠিক সেইরূপ অন্ধকার ও অনিশ্চিত। কিন্তু তিনি অন্ধকারেই থাকিতে প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ জানিবার জন্যও তিনি উদ্বিগ্ন নহেন। তিনি যে, সকল রহস্য ভেদ করিয়াছেন, সকল সংশয় ছেদন করিয়াছেন, বিশ্বের সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাও নহে; তথাপি তিনি ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাসী এবং সেই বিশ্বাসের বলেই তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। নীরব ধ্যান এবং ব্যাকুল প্রার্থনাই তাঁহার সম্বল। ভগবানের ইচ্ছাকেই তিনি মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়াছেন। সাধারণ লোক হইতে এই তাঁহার মহা প্রভেদ।

বুদ্ধির আলোকে কোন তত্ত্ব নির্ণয় করার নাম জ্ঞান, আর প্রেমের আলোকে কোন তত্ত্বে উপনীত হওয়ার নাম বিশ্বাস। জ্ঞান জগতের একএকটী ঘটনা লইয়া আলোচনা করে, আর যাহা নিত্যসত্য তাহাই বিশ্বাসের অবলম্বন। জ্ঞান যেন প্রকৃতিরূপ মহাকাব্যের একএকটী শ্লোক লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে, আর ঐ মহাকাব্যখানিকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখাই যেন বিশ্বাসের লক্ষ্য। প্রকৃতিকে কত সময়ে নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম বলিয়া লাগে, কত সময়ে প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ভয়ে বিহ্বল হই। প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে যে ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায় আছে তাহা আমরা ধরিতে পারি না, তথাপি জ্ঞান বলে যে, মোটের উপরে জগৎ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। বিশ্বাস বলে, জগতের সকলই মঙ্গল, ভগবানের রাজ্যে অমঙ্গল কিছুই থাকিতে পারে না। এই মঙ্গলভাবের গভীরে ডুবিয়া গিয়া সংসারের দুঃখকষ্টের কথা বিশ্বাসী ভুলিয়া যান।

ঝড় বৃষ্টি মেঘ ও বজ্রবিদ্যুতের উপরে নির্মল আকাশ আছে এবং সেই আকাশে চিরস্থির চিরস্নিগ্ধ নক্ষত্ররাজী ফুটিয়া আছে একথা যেমন সত্য, জীবনের দুঃখকষ্টের পশ্চাতে সৌন্দর্য্য শৃঙ্খলা ও মঙ্গল প্রচ্ছন্ন আছে একথাও তেমনি সত্য। এই অসীম বিশ্বে মানুষ যে কত ক্ষুদ্র এই কথা চিন্তা করিলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি অবসন্ন হইয়া যায় এ কথা যেমন সত্য, অপর দিকে এই ক্ষুদ্রতার জ্ঞানই বিশ্বাসীকে বলে যে তিনি অনন্তস্বরূপের আশ্রিত। বিশ্বাসী যখন বিপদসাগরে ভাসিয়া যান তখন তিনি জানেন যে তিনি নিতান্ত একেলা নহেন। তিনি ঈশ্বরচরণে মাথা রাখিয়া বলেন, "হে প্রভু, তুমিই আমার রক্ষক, তুমিই আমার আশ্রয়!" বিশ্বাসী জানেন যে আকাশের চন্দ্রসূর্য্য মুছিয়া যাইতে পারে, তথাপি ঈশ্বরের প্রেমদৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর হইতে বিচলিত হইবে না। তিনি জানেন যে মৃত্যুর যন্ত্রণা অমৃতধামে জন্মলাভের বেদনা মাত্র। বিপৎকালে বাহ্যিক ধৈর্য্য দেখান খুব কঠিনও নয় খুব বিরলও নয়; কিন্তু ভক্ত বিশ্বাসী ব্যতীত অন্তরে প্রকৃত শান্তি ও নিশ্চিন্তভাব রক্ষা করা অপরের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও হয়। বিপদ ভক্তকে দৃঢ়তর বন্ধনে ভগবচ্চরণে বাঁধিয়া দেয়।

কিন্তু প্রকৃতি যদি গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করিত— "হে দুর্ভাগ্য মানব, ভগবান যে তোমার রক্ষক ও আশ্রয়, এ কেবল তোমার কল্পনা; তুমি নিয়তির খেলার পুতুল মাত্র!" বজ্র যদি বিদ্যুতের অক্ষরে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের বক্ষে লিখিত—"এ জগৎ অরাজক; ঈশ্বর নাই; তাঁহার মঙ্গলবিধান তোমার কুসংস্কার মাত্র; তোমার উপরে কেহ নাই—তুমিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ!" তবে আর ভক্তের দাঁড়াইবার ভূমি থাকিত না, তাহার নিশ্চিন্ত ও নির্ভর ভাব নিরাশায় পরিণত হইত।

ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস থাকিলে মানুষ যেমন প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হয় না, ভগবানের ন্যায়বিধানে বিশ্বাস থাকিলে মানুষ তেমনি পাষণ্ডের ভ্রুকুটীকে তুচ্ছ করিতে পারে। অসত্য এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসী একাকী দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ। দুর্জ্জনের তর্জ্জনগর্জ্জনে তাঁহার প্রসন্ন ললাট মলিন হয় না। অন্যায় আইন এবং অত্যাচারী রাজশক্তি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াও তিনিই জয়লাভ করেন। স্বার্থপর লোকদের দৃঢ়তার পশ্চাতে কেমন একটা স্পর্দ্ধার ভাব থাকে কিন্তু ভক্ত বিশ্বাসীদের যে দৃঢ়তা তাহা কেমন বিনয়ের বর্ণে অনুরঞ্জিত! তাঁহাদের দৃঢ়তার মূলে যেন তাঁহাদের নিজের ইচ্ছা নহে কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা। তাঁহারা প্রভুর আদেশকে মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা নির্ভয় কিন্তু বিনীত। ভয়ের মূলে স্বার্থনাশের সম্ভাবনা, বিশ্বাসের মূলে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান।

তবে মনে হইতে পারে যে একটা বিশেষ স্থল আছে যেখানে ধর্ম্ম মানুষকে নির্ভয় না করিয়া ভয়ে অভিভূত করে—মানুষ পাপ করিয়া ভগবানের নাম করিতে ভয় পায় এবং তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে চাই না, তাঁহার নিকট হইতে পলাইবার চেষ্টা করি না, কিন্তু আমরা আমাদের নিজের নিকট হইতেই পলাইবার বৃথা চেষ্টা করি। তাঁহার নিকটে যাইতে আমাদের লজ্জা করে। তিনি আমাদের ক্ষমা করিতে প্রস্তুত এবং তাঁহার নিকটে গেলে তিনি আমাদের গ্রহণ করিবেন বলিয়া যতই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি, ততই আমরা তাঁহার মুখের দিকে আর তাকাইতে পারি না। মহাত্মা যীশু যে অপব্যয়ী কনিষ্ঠ পুত্রের গল্প বলিয়াছিলেন সেই গল্পটী স্মরণ করুন। সেই উদ্ধত যুবক ধনীর সন্তান; সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেল ও বিদেশে গিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সমুদয় টাকাকড়ি নষ্ট করিয়া ফেলিল; অবশেষে তাহার এমন দুর্দ্দশা হইল যে শূকর চরাইয়া এবং শূকরের উচ্ছিষ্ট খাইয়া অতি কষ্টে সে দিনপাত করিতে লাগিল। কষ্ট যখন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল তখন সে ভগ্নপ্রাণে বৃদ্ধ পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিল। পিতা তাহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া পরম স্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হারাণ সন্তান ফিরিয়া আসিয়াছে, মৃত সন্তান বাঁচিয়া উঠিয়াছে বলিয়া গৃহে মহা উৎসবের আয়োজন করিলেন। তখন অনুতপ্ত যুবক বলিল, "পিতা আমি তোমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য, কিন্তু তোমার ভৃত্যদের সঙ্গে থাকিতে আমাকে একটু স্থান দাও।" কিন্তু যদি সেই হতভাগ্য যুবক গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শুনিত যে তাহার পিতা আর পৃথিবীতে নাই, তবে কি তাহার বড় আনন্দ হইত? সে যে তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিতে পারিল না, সে যে তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে পাইল না—সে দুঃখ তাহার কি ভারী দুঃখ হইত! বুঝি বা সারাজীবন অশ্রুপাত করিয়া সে দুঃখ তাহার ঘুচিত না। যে মহাপাপী ঈশ্বরের মুখের দিকে চক্ষু তুলিতে পারিতেছে না, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর "ভগবান না থাকিলে কি ভাল হইত?" সে নিশ্চয়ই উত্তর করিবে "ও কথা বলিও না!" লজ্জায় যে তাঁহার দিকে চাহিতে পারে না সেও জানে যে তাঁহার থাকার অপেক্ষা না থাকা অনন্ত গুণে অধিক ভয়ানক হইত। ভগবান যে পুণ্যময় এই বিশ্বাস

তাহাকেও রক্ষা করে। যে নিরাশায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে সে-ও ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে তাঁহারই করুণার উপরে দাঁড়াইবার ভূমি পায়। পাপী তাঁহাকে ভয় করে সত্য কিন্তু তিনি ভিন্ন পাপীর ত অন্য গতি নাই। বিশ্বাসেই মুক্তি, বিশ্বাসেই ভয় হইতে পরিত্রাণ। পাপীর রাত্রি যতই দীর্ঘ ও যতই অন্ধকার হউক না কেন, পুণ্যসূর্য্যের উদয়ে সে রাত্রির অবসান হইবেই হইবে। তবে যাহারা ভয়ে ভীত তাহারা সাহস অবলম্বন করুক। পাপে তাপে যাহারা মলিন তাহারা তাঁহারই চরণে আশ্রয় গ্রহণ করুক। তবে আমরা এই কথাই বলি "তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু, তুমিই আমাদের একমাত্র গতি—আমরা তোমাকে ভয় করিব না।"

জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর).

১। জীবনের উদ্দেশ্য কি, ইহাই মূল প্রশ্ন।

জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই পৃথিবীতে আমরা কেন আসিলাম, এবং এই ধরণীপৃষ্ঠে কিছুকাল বাস করিয়া নানাবিধ ছন্দে ভঙ্গে আত্মজীবন প্রকাশ করিয়া কেনই বা অদৃশ্য অজানা ক্ষেত্রে অন্তর্হিত হইয়া যাই—এই প্রশ্ন বোধ হয় আমাদের, প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে সমুদিত হয়। এই জীবনের উদ্দেশ্য কি, প্রত্যেক মানবই তাহার সমাধানে অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু উহার কোনই কূলকিনারা না পাইয়া হতাশহৃদয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

২। মূল প্রশ্নের অন্তর্নিহিত প্রশ্ন—দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় কি ?

মানুষমাত্রেই সুখ চায়, দুঃখ তাহার প্রার্থনীয় নয়। এই কারণে জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্ন করিলেই তাহার ভিতরে অন্তঃপ্রবাহিতরূপে আর একটি প্রশ্ন আসিয়া দেখা দেয়—দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি ? আমাদের দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া কি উপায়ে সুখলাভ হইবে, কোন্ প্রণালী অনুসরণ করিলে আমাদের জীবনের সর্ব্ববিধ অশান্তি বিদূরিত হইয়া শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। মানুষ নিজের কর্ম্মফলে অশান্তি টানিয়া আনিলেও সে অশান্তির মধ্যে বাস করিতে এতটুকুও ভালবাসে না—শান্তিলাভের জন্য সে সর্ব্বদাই হা-হুতাশ করিতে থাকে। এই কারণে জীবনের উদ্দেশ্যবিষয়ক প্রশ্নের মধ্যে আর একটি প্রশ্ন সর্ব্বদাই উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে যে, মানুষের জীবনে অশান্তি ঘুচিয়া গিয়া কি উপায়ে শান্তিরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩। দ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত বাণী।

আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই দেখিতে পাই যে, মানবজীবনের কি অন্তরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই সুখ ও দুঃখের, শান্তি ও অশান্তির, আনন্দ ও নিরানন্দের, আশা ও নিরাশার কঠিন সংঘর্ষমূলক দ্বন্দ্ব অবিরাম চলিতেছে। সমুদ্রের ভিতর হইতে অমৃতদেবতা যেমন মঙ্গল চরুহস্তে আবির্ভূত হন, সেইরূপ দ্বন্দ্বের ভিতর হইতে মঙ্গলময় ভগবান এই মঙ্গলবাণী লইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন যে, দ্বন্দ্বের অতীত হও, তোমার সকল দুঃখ ও সকল দৈন্য অন্তর্হিত হইবে, এবং নিত্য সুখ, নিত্য শান্তি ও নিত্য আনন্দ তোমার করগত হইবে।

৪। দ্বন্দ্ব উন্নতি ও মঙ্গলের কারণ।

দ্বন্দ্ব সমুপস্থিত দেখিলেই আমাদের মনে স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, এই দ্বন্দ্ব কোথা হইতে আসিল ? কেনই বা আসিল ? আর কিরূপেই বা তাহার নিবৃত্তি হইবে ? এই দ্বন্দ্ব কেনই বা আসিল আর কোথা হইতেই বা আসিল, মানবের অন্তরে এই গুরুতর প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত নিরাকরণ মানুষ আজও করিতে পারিয়াছে বলিয়া জানি না এবং কখনও করিতে পারিবে কিনা তাহাও সন্দেহ। নিরাকরণ করিতে না পারিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে, এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই আমরা উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হই। বলিতে কি, দ্বন্দ্বই আমাদিগকে উন্নতি ও কল্যাণের পথে ঠেলিয়া লইয়া চলে।

৫। দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষে নিহিত।

এই দ্বন্দ্ব মানুষ স্বয়ং আনয়ন করে নাই। আমরা জন্মাবধি দ্বন্দ্বময় প্রকৃতির মধ্যে লালিতপালিত হই, পরিবর্দ্ধিত হই। এমন কি, মানুষের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বাবধি তাহার সুখের কারণের ন্যায় দুঃখের কারণও, সুতরাং তাহাদের উভয়ের সংঘর্ষজনিত দ্বন্দ্বেরও কারণ প্রকৃতির মধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। কাজেই মানুষ প্রকৃতির অতীত না হইলে একথা কিছুতেই বলিতে পারে না যে, দ্বন্দ্ব কেন—কি কারণে আসিল ? একমাত্র প্রকৃতির অতীত যিনি, সমস্ত প্রকৃতি যাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া যাঁহা দ্বারা নিঃশ্বসিত হইয়াছে, একমাত্র প্রকৃতির সেই অনাদি কারণ মঙ্গলময় পরম পুরুষই বলিতে পারেন যে কেন, কি কারণে, বা কি উদ্দেশ্যে তিনি মানবের অন্তরে ও বাহিরে সুখ ও দুঃখের, শান্তি ও অশান্তির বিধান করিয়া দ্বন্দ্বের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, দুঃখ-অশান্তি প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া, উহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উহাদের

উপরে উঠিবার ফলে দ্বন্দ্বকে বিনষ্ট করিলে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই আমরা উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার ক্ষমতালাভের অধিকারী হই।

৬। দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভের অনন্য উপায়; ভগবৎচরণে আত্মনিবেদন।

কিন্তু আমাদের সম্মুখে এই সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারে আসিয়া দেখা দেয় যে, এই দ্বন্দ্বের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? এই দ্বন্দ্বকে বিনষ্ট করিবার উপায় কি? কি উপায়ে, কি প্রকার সাধন অবলম্বন করিলে দ্বন্দ্বের হস্ত অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়া উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিব? আমরা যখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন প্রকার দ্বন্দ্বের মধ্যে নামিয়া পড়ি, তখন আমাদিগকে বড় অশান্তি ভোগ করিতে হয়। সেই অশান্তির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠি, এবং তাহার নিবৃত্তির উপায়ের ইঙ্গিত পাইবার জন্য আত্মা ভগবানের চরণে ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়া যায়। তখন সে বুঝিতে পারে যে, শরণাগতবৎসলের চরণে শরণাগত হওয়া এবং সকল উন্নতির ও মঙ্গলের একমাত্র নিদান সেই ভগবানের চরণে সুখ ও দুঃখ, সম্পদ্ ও বিপদ্, শান্তি ও অশান্তি, আশা ও নিরাশা, আনন্দ ও নিরানন্দ, এক কথায় সমস্ত জীবন নিবেদন করিয়া দেওয়াই দ্বন্দ্বের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের অনন্য উপায়।

৭। সীমার মধ্যে জন্মলাভই দ্বন্দ্বের কারণ।

সেই সর্ব্বস্ব নিবেদন করিবার বিনিময়ে আত্মবিশ্লেষণ করিবার উপযোগী যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়, সেই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মানুষ তখন আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পায় যে, সীমাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার কারণেই শতবিধ দ্বন্দ্ব তাহার পার্শ্বচর হইয়া তাহাকে পীড়া দিতে সক্ষম হইতেছে। সীমাবদ্ধ হইবার কারণেই মানুষ সকল সময়ে সকল বিষয়ে খাঁটি সত্যটুকু উপলব্ধি করিতে পারে না; তখন স্বভাবতই তাহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তখন মানুষের জীবনে সত্যের সহিত মিথ্যার সংঘর্ষ-জনিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। মিথ্যা যতই বড় হয়, দ্বন্দ্বের আঘাতের বেগও ততই কঠিন হয়। সুতরাং ইহা সহজেই আমাদের উপলব্ধিতে আসিবে যে, আমাদের জীবনপরিধি সীমার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া যতই প্রসারিত হইতে থাকিবে এবং আমরা যতই সত্য পথের পথিক হইয়া মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব, আমরা ততই দ্বন্দ্বের হাত অতিক্রম করিতে পারিব, এবং দ্বন্দ্বের আঘাতও ততই লঘু হইতে লঘুতর হইতে থাকিবে।

৮। প্রকৃতিতে দ্বন্দ্বের নিত্য খেলা।

খাঁটি সত্যকে ধরিয়া থাকিলে দ্বন্দ্বের কোনই কারণ থাকে না। কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া অনেক সময়ে সেই খাঁটি সত্যকে ধরিতে পারি না বা ধরিয়া রাখিতে পারি না। আমাদের কি অন্তরে কি বাহিরে ঘটনা-পরম্পরা এবং চিন্তা ও ভাবলহরী এতই তড়িৎবেগে আসে আর চলিয়া যায় যে, অনেক সময় তাহার মধ্য হইতে মিথ্যাটুকু বাছিয়া লইয়া পরিহার করা এবং সত্যটুকু বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করা বড়ই দুরূহ হয়। যেমন কোন বস্তুর গভীর প্রদেশে নিবদ্ধ লৌহকে বাহিরে আনিবার জন্য চুম্বকের সাহায্য আবশ্যক হয়, সেইরূপ আমাদের অন্তরের চিন্তা ও ভাবসমূহের এবং বাহিরের ঘটনাপরম্পরার মধ্য হইতে খাঁটি সত্যটুকুকে বাছিয়া লইবার জন্য আমাদের অন্তরে সত্যস্বরূপ ভগবান্ যে সকল সত্য নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল সত্যের সাহায্যগ্রহণ আবশ্যক হয়। আমরা যখন আমাদের চতুর্দ্দিকে নয়ন মেলিয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই যে, আমাদের পরিপার্শ্বে দ্বন্দ্বসমূহের এক মহা খেলা নিত্যই চলিতেছে—সকলই যেন অনিত্য, কিছুরই যেন স্থিরতা নাই—জীবন ও মৃত্যু, ঠেলাঠেলি ও মারামারি, ক্ষণিক সুখ ও দুঃখ-ভোগ সংসারক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে। আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখি যে, নানাবিধ দ্বন্দ্বসমূহের ভয়াবহ আবর্ত্ত আমাদিগকে বিনাশের মুখে ফেলিবার জন্য ভীষণ বলের সহিত আকর্ষণ করিতেছে।

৯। আত্মনিবেদনের ফলে দিব্যদৃষ্টি-লাভ।

এইপ্রকার আবর্ত্তের স্রোতে পড়িয়া যখন মানুষ আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে, যখন সে আত্মরক্ষার আর কোনই উপায় খুঁজিয়া পায় না, তখন তাহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়। সত্যধর্ম্মা পরম পুরুষের সত্য বিধানে তাহার নয়নের সম্মুখে সত্য আসিয়া ধরা দেয়। তখন সে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করে যে, দ্বন্দ্বসমূহের এত পরাক্রম, এত বল, এত শক্তি, এ সমস্তই সত্যের অপ্রতিহত শক্তির নিকটে মিথ্যা মরীচিকা মাত্র। সে তখন তাহার অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করে, এই প্রকৃতির মধ্যে এবং আমাদের আত্মাতে যে সকল বিখণ্ডিত সত্য দেখা যায়, সে সকলেরই মূল একমাত্র নিত্য সত্য ভগবান—যাঁহার অপ্রতিহত শক্তি ও সত্য নিয়মসমূহের দ্বারা এই বিশ্ব-জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে এবং নিজের কর্ম্মচক্র সংরচন করিয়া চলিতেছে। তিনিই একমাত্র সর্ব্ববিধ সীমার অতীত—কোন প্রকার সীমাই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না; কোন প্রকার দ্বন্দ্বই

তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বের অতীত। মানব যদি দ্বন্দ্বের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে চায় এবং নিত্য সুখ শান্তি ও আনন্দলাভের প্রয়াসী হয়, তবে তাহাকে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, মিথ্যা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে। সকল বিষয়ে, কি কথায় কি কাজে, সে যতই সত্যকে ধরিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইবে, ততই তাহার জীবনের পরিধিও সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে, এবং সীমার সঙ্কীর্ণতাও ঘুচিয়া যাইতে থাকিবে; তখন দ্বন্দ্বসমূহও ক্ষীণ হইতে ক্রমশ ক্ষীণতর হইবে এবং উহাদের আঘাতও ক্রমশ লঘু হইতে লঘুতর হইতে থাকিবে।

১০। সত্যের বলে দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভ।

সে তখন সত্যের অমিত বলে বলীয়ান হইয়া এবং মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে নবজীবন লাভ করিয়া সহজেই দ্বন্দ্বসমূহের পাশজাল কাটিয়া মুক্তিলাভ করে ও অন্তরে অনুপম শান্তি প্রাপ্ত হয়। তখন সে বুঝিতে পারে, সত্যেই সুখ, সত্যেই শান্তি। এই কারণে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সাধক সত্যেরই সন্ধানে আপনাকে নিয়োগ করেন। সত্যই একমাত্র চিরস্থায়ী, সত্যেরই বিনাশ নাই।

১১। সত্যলাভের উপায়, সত্যস্বরূপকে জানা।

সত্যকে জানিতে গেলে, আমরা জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই যিনি বিশ্বজগতকে সত্য নিয়মসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং আমাদের জন্মগ্রহণের পরে যিনি আমাদের অন্তরে সত্য নিয়মসমূহকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই জানিতে হইবে। তিনি সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র নিত্যস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; সকল চেতনের মধ্যে তিনিই একমাত্র নিত্য চৈতন্যস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। তিনিই আমাদের শরীরে বল, মনে শুভবুদ্ধি ও জ্ঞান এবং আত্মাতে তাঁহাকে জানিবার অধিকার ও ক্ষমতা নিত্যই প্রদান করিতেছেন। এইপ্রকারে তাঁহাকে বিশ্বজগতের এবং আমাদের আত্মার মঙ্গলময় বিধাতা পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ভিতর দিয়াই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে। অনন্তস্বরূপ পরম পুরুষ ভগবান যে আছেন, এবং সমস্ত প্রকৃতি যে তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতেই পারে না, ইহা জানাই হইল সকল জ্ঞানের সার এবং সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ সত্য।

১২। পরমাত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে প্রীতিযোগ।

প্রত্যেক মানবাত্মা এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি একই পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে আমরা আমাদের আত্মাকেও সম্প্রসারিত করিতে পারি; তখন আমরা দেখিতে পাই যে, কি অন্তর্জগৎ কি বহির্জগৎ সমস্তই এক অনির্ব্বচনীয় অবিচ্ছেদ্য প্রীতিসূত্রে ও সত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তখন সকলের মধ্যে ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মার ভিতর দিয়া প্রবেশ করা খুবই সহজ হয়, তখন আমরা স্বভাবতই আপনাকে হারাইয়া ফেলি এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞান ভুলিয়া যাই। এই কারণে সাধকদিগের উপদেশ এই যে, সত্যকে জানিতে হইলে বিশ্বের আত্মা পরমাত্মার সহিত মানবাত্মাকে বিলীন করিয়া দিতে হইবে; আপনাকে "বিনাশ" করিয়া, আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া পরমাত্মাতে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে।

১৩। সত্যস্বরূপকে জানা দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভের কারণ।

সত্যের বিনাশ নাই। অবিনাশী সত্যকে যিনি উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারই বা বিনাশ কোথায়? তাঁহারও বিনাশ নাই। তাঁহারও মৃত্যু নাই। তিনি জীবনসাগরে নিত্যই বিচরণ করেন। আমরা ইহলোকে দেখি যে, ছোট বড় যত কিছু দুঃখ আছে সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি মৃত্যুতে। সত্য যিনি উপলব্ধি করেন তাঁহার মৃত্যুও নাই এবং দুঃখও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি নিত্য সুখের অধিকারী হন এবং নিত্য শান্তি তাঁহাকে আশ্রয় করে। আমরা যখন আমাদের শাশ্বত প্রতিষ্ঠাভূমি ভগবানকে ভুলিয়া জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুকে, প্রত্যেক মানবাত্মাকে এবং প্রতি নিমেষের প্রত্যেক ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে ও তাঁহা হইতে পৃথকরূপে অবস্থিত দেখিতে প্রয়াস পাই, তখনই আমরা দ্বন্দ্বরাশির মধ্যে প্রবেশ করি এবং সুখশান্তি হারাইয়া বসি।

১৪। আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের উপলব্ধিতেই জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধন-তত্ত্বের উপলব্ধি।

আমাদের আত্মা যেমন আমাদের দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে এবং আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় মনের প্রত্যেক চিন্তার মধ্যে, প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যে ও প্রত্যেক ধ্যানের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত করে, এই বিশ্বের আত্মা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির অতীত হইলেও তাহার প্রত্যেক অংশে এবং তাহার অন্তঃস্থিত মানবাত্মারও প্রত্যেক অংশে সমগ্রভাবে অবস্থিতি করেন। এই আত্মার অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চাহিলে, কূর্ম্ম যে প্রকার তাহার অঙ্গসমূহকে বাহির হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তরে নিবিষ্ট রাখে, সেইরূপ আমাদের

আত্মাকে বহির্বিষয়সমূহ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে। এইরূপে অন্তর্মুখী হইলেই, আত্মা তাহার অন্তরাত্মা পরমাত্মার সহিত আপনাকে একাত্মযোগে যুক্ত করিয়া মিশাইয়া ফেলিলেই তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যসকল সমুদ্ঘাটিত হইবে। আমাদের জন্মাবধি আমাদের আত্মাতে পরমাত্মা যে সকল অবিনশ্বর সত্য অগ্নদক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল সত্যের সাহায্যে আমরা তাঁহার চরণস্পর্শলাভের অধিকার ও ক্ষমতা ধারণ করি, সেই সকল সত্য আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য বলিয়া কথিত হয়। এই সকল সত্যের ভিতর দিয়াই ভগবানের বাণী মানবাত্মার অন্তরে ধ্বনিত হয়। তখন তাহার অন্তরে জীবনের উদ্দেশ্য এবং তৎসাধনসম্বন্ধীয় সকল তত্ত্বই শত সূর্য্যের জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়।

১৫। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে দুঃখনিবৃত্তি।

ভগবানের বাণী যিনি অন্তরে শ্রবণ করেন, তাঁহার নিকট কোনপ্রকার ভেদাভেদ থাকিতে পারে না; তিনি সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন। তিনি সেই বাণী ধরিয়া ভগবানের চরণতলে অগ্রসর হন, এবং তিনি সকল দুঃখ ও সকল অশান্তির হস্ত সহজেই অতিক্রম করেন। কোন প্রকার বিভীষিকাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি বিশ্ব-পিতা ও অখিলমাতার ক্রোড়ে নির্ভয়ে অবস্থিতি করেন। পরমেশ্বর তাঁহার হস্তে সকল কার্য্যের ভার প্রদান করেন; সুখ ও দুখ, লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয়ের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি সমস্ত কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিতে করিতে অগ্রসর হন। ভগবানের মঙ্গল বিধানে ইহাতেই তাঁহার বীরত্ব প্রকাশ পায় এবং তিনি জনসাধারণের হৃদয়ের পূজা প্রাপ্ত হন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

("সমাচার-দর্পণ" হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত)

(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২)

"এতদ্দেশীয় মাজিষ্ট্রেট।—হরকরাপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিষ্ট্রেটীকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন রাজচন্দ্র দাস রাজচন্দ্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজা কালীকৃষ্ণ রসময় দত্ত রাধামাধব বাঁড়ুয্যে রাধাকান্ত দেব রস্তমজি কওয়াসজি।"

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩)

"বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতা।—ইঙ্গলিসমেন পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততাপ্রযুক্ত কলিকাতার নূতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎসরপর্য্যন্ত বার্ষিক তৎসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। বার্ষিক পরীক্ষা সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের যে ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারদিগকে ঐ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। এই দানই মহাদান এবং তাহাতে মহাফল জন্মে। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভাগ্যবন্ত ধনী মহাশয়েরাও তদনুগামী হইবেন। এবং শুনা গেল যে, বাবু রামগোপাল ঘোষজ মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক দান করিয়াছেন তাহাতে এডুকেশন কমিটির সাহেবেরা তাঁহার নিকট অতিবাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

কথিত আছে ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা বা বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটি ঐ টাকাতে মুদ্রা বা চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার যন্ত্র বা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া না দিয়া নগদ পুরস্কার প্রদানার্থ স্থির করিয়াছেন যেহেতুক নগদ টাকা পারিতোষিক প্রদানেতে যে ছাত্রেরদের অর্থাভাবে স্বং বিদ্যাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্ত হওনের আবশ্যক হইত তাঁহারা ঐ পুরস্কারে পুরস্কৃত ও পুলকিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসার্থ থাকিতে পারিবেন।

(১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩)

"টগ সমাজের মুনাফা।—আমাদের ইচ্ছা যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত সমাজের নাম পরিবর্ত্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ যে ফরবিস বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্ম্মে চলিতেছে। ঐ জাহাজ মার্কিণ্টস কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হস্তে পতিতহওন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখঅবধি ৩০ এপ্রিলপর্য্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে অতএব লাভ মাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন। গড়ে ৪,০০০ টাকা লাভ হইত কিন্তু ঐ জাহাজে

দৈবঘটনা হয় তাহাতে ১,৯০০ টাকা ও ৯ দিবস যে হরণ হইয়াছে।"

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

"এতদ্দেশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির অপূর্ব্ব বদান্যতা।—গত সোমবারের ইঙ্গলিসমেন সম্বাদ পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ডিস্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসৈটিকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদের দ্বারা বহুতর দীনহীন ব্যক্তিরদের আহার নির্ব্বাহ হয় এতদর্থ ঐ টাকা সোসৈটিকে উপযুক্ত বন্ধকস্বরূপ ভূমির দ্বারা দত্ত হইয়াছে। ঐ টাকা স্বতন্ত্র জমা থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফণ্ড নামে বিখ্যাত হইবে যেহেতুক এইরূপ যে মহানুভব মহাশয়ব্যক্তি টাকা প্রদান করেন তাঁহার নাম ঐ মহাদানের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হইবে।"

(১৭ মার্চ্চ ১৮৩৮। ৫ চৈত্র ১২৪৪)

"বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার ৺প্রাপ্তি সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাষ্পীয় জাহাজারোহণে শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে প্রতিদিন কলিকাতায় ঐ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে।"

(৩১ মার্চ্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪)

"বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।—শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্বাস্থ্য বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বারাণসী হইতে কলিকাতার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হওনের পূর্ব্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্ব্বক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। গত শুক্রবারে বহুসংখ্যক কাঙ্গালিরদিগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত আছে অনূন ৫০ হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ॥০ এবং অন্যান্য শূদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালিকে ।০ করিয়া দিয়াছেন।" *

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ও আদিব্রাহ্মসমাজ।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চন্দননগর)

[এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এতই অবিশ্বাস্য যে, আমরা উহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতাম না। কিন্তু যখন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোঁমাঁ রোলাঁ এই বিষয়টা তাঁহার গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন; শুনা যায় যে এদেশবাসীগণ উহাতে অনায়াসেই আস্থা স্থাপন করিতেছেন; এমন কি, পরমহংসদেবের এক সম্প্রদায় শিষ্যগণ আলোচ্য বিষয়টি বাদ না দিয়াই ঐ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সেই কারণে বাধ্য হইয়া আমরা এই প্রবন্ধটীকে পত্রিকায় স্থান দিলাম। আমরা আশা করি, উক্ত শিষ্যগণ আলোচ্য বিষয়টী বাদ দিয়া উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন এবং ধর্ম্মসমাজের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বাড়িতে না দিয়া শান্তিবারি বর্ষণ পূর্ব্বক পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনাদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। তঃ সং]

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজ নাকি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের ন্যায় উদারতম ধর্ম্মসমাজের বিরুদ্ধে এরূপ মত পোষণ করা যে নিতান্ত অজ্ঞতামূলক ভ্রান্তমত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি এ বিষয় লইয়া যখন পরমহংসদেবের শিষ্যগণের মধ্যে অল্পস্বল্প আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে, তখন এবিষয়ে আমাদের দু'একটী বক্তব্য বলিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করি না।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোঁমাঁ রোলাঁ তাঁহার লিখিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিতে এই ভ্রান্ত কথার স্থান দিয়াছেন বলিয়াই ঐ সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যিনি রোঁমাঁ রোলাঁর মস্তকে এই অন্যায় ও অসঙ্গত ভাব প্রবেশ করাইয়াছেন, তিনি যে ধর্ম্মানুরাগীর উপযুক্ত কার্য্য করেন নাই, তাহা আমরা বলিতে দ্বিধা করিব না। রোঁমাঁ রোলাঁ উক্ত জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মে রামকৃষ্ণদেব আদিব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া অশ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার পাইয়াছিলেন। কথাটা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা রামকৃষ্ণকথামৃতের চতুর্থ ভাগে বিবৃত বিবরণ হইতেই প্রকাশ পাইবে। প্রকৃত কথা এই যে তিনি কলিকাতা নন্দনবাগানস্থিত ৺কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে উক্ত তারিখে এক উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উৎসবের নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকাপ্রযুক্ত রামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার সঙ্গী শিষ্যগণ যেরূপ আদরআপ্যায়ন পাইবার আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ আদরআপ্যায়ন গৃহকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই। ইহার সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের কোনই যোগ ছিল না—উহা নন্দন-বাগানের গৃহস্বামীদিগের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান। উহার সহিত আদিব্রাহ্মসমাজকে সংযুক্ত করা রোঁমাঁ রোলাঁর পক্ষে নিতান্ত অন্যায় ভ্রম এবং যিনি তাঁহাকে এই বিষয়ের গল্প করিয়া ইহা তাঁহার গ্রন্থে প্রবেশ করাইয়াছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণসম্প্রদায় এবং আদিব্রাহ্মসমাজ উভয়েরই গুরুতর ক্ষতি করিয়াছেন, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করিবেন। রোঁমাঁ রোলাঁ আরও বলিয়াছেন যে, পূজ্যপাদ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, রোলাঁ মহাশয়ের তাঁহার সম্বন্ধে উক্তি ভ্রমপূর্ণ; প্রকৃত তথ্য তিনি ইতিপূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জানাইয়াছেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ উদারতম বীজমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া কোন সাধু মহাত্মারই প্রতি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা কখনও প্রকাশ করেন নাই এবং করিতে পারেনও না। ভারতবর্ষের ঋষিদিগের আদর্শে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক

---

* ভারতবর্ষ—ভাদ্র, ১৩৩৮।

ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার ব্রত। রামকৃষ্ণ দেব একজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ; সুতরাং তাঁহার প্রতি আদিব্রাহ্মসমাজ যে কিছুতেই অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারেন না, তাহা বলা বাহুল্য—এরূপ উক্তি বাতুলেরই উপযুক্ত।

অবশ্য বলা বাহুল্য, আদিব্রাহ্মসমাজ কোন মানবসন্তানকেই প্রচলিত অর্থে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। এবিষয়ে আদিব্রাহ্মসমাজ রোঁলাঁ মহাশয়ের সহিত একমত। আদিব্রাহ্মসমাজ পরমহংসদেবকে প্রচলিত অর্থে অবতার স্বীকার না করিলেও তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন, ইহা আমরা বিশেষরূপেই জানি। একবার যৌবনে রামকৃষ্ণদেব মহর্ষিদেবের পুণ্য নাম শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ সেবক বাবু মথুরানাথ বিশ্বাস হিন্দু কলেজে মহর্ষির সহপাঠী ছিলেন। তিনি পরমহংসদেবকে মহর্ষির নিকটে লইয়া যাইতে সম্মত হইয়া একদিন মহর্ষির যোড়াসাঁকোর ভবনে লইয়া আসিলেন।

প্রথম দর্শনেই এই দুই ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ দেব আপন অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা মহর্ষির ধর্ম্ম প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি এ যুগের জনক; জনকের মত তুমিও সংসারে থেকে ঈশ্বরে ডুবে আছ"। তাহার পর মহর্ষিদেবের নিকটে বেদের ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রীত হন। অন্যপক্ষে মহর্ষিদেবও পরমহংসদেবের দিব্য ভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে মাঘোৎসবে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহা হইতেই তো রামকৃষ্ণদেব ও মহর্ষিদেব উভয়ের পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে। রামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগে উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবকে অসভ্য দেখাইবে বলিয়া বিনা জামা জুতায় তাঁহাকে উৎসবে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা আমরা মহর্ষিদেবকে যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি, এরূপ নিষেধ তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাঁহার সময় মাঘোৎসবে প্রবেশপত্রেরও ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং উৎসবের দর্শনার্থীগণ যিনি যে বেশে পারিতেন তিনি সেই বেশেই আসিতেন। আমরা একদিকে দেখিয়াছি একই উৎসবে লর্ড কাইফ্ ও লর্ড রোজবেরী আসিয়াছেন, আবার বিস্তর ব্রাহ্মণপণ্ডিতও খালি পায়ে ও একখানি কম্বল গায়ে আসিয়াছেন। ইহা সর্ব্ববিদিত যে মাঘোৎসব ১১ই মাঘে অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়ে প্রচণ্ড শীত, সুতরাং কোন প্রকার গরম কাপড় বা জামা না পরিয়া আসার কথা কাহারও মনে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনে এরূপ কথা উদিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই মনে করি, কারণ তিনি বহুদিন যাবৎ উৎসব সম্বন্ধীয় উপাসনা ও সঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যসমূহের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদাসীন ছিলেন। যদি কেহ তাঁহার নাম করিয়া উপরোক্ত ভাবের কোন কথা লিখিয়া থাকেন, তবে আমরা আবার বলিব, তিনি খুবই অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আমরা মূল চিঠিখানি না দেখিলে ইহার অধিক কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

রামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের প্রতি আদিব্রাহ্মসমাজের কিরূপ শ্রদ্ধা, তাহার দুই-একটি পরিচয় নিম্নে দিতেছি। স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি-ই, এফ, আর, এ, এস প্রণীত "স্মৃতিস্মৃতি" নামক একটী পুস্তক আছে। এই পুস্তকে বহু প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা আছে। ঐ পুস্তকের ৭২ পৃষ্ঠায় "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ" নামক আখ্যায়িকায় যাহা লিখিত আছে, তাহার সারমর্ম্ম এই :—

পরমহংস মহাশয়ের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া সালিখার নিকট গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সে সময় তাঁহারা কঠোর তপস্যায় কালযাপন করিতেছিলেন। গঙ্গার উপর মহর্ষির বজরা দেখিয়া স্বামীজী গুরুভাইগণকে লইয়া মহর্ষিকে দেখিতে গেলেন। মহর্ষির প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহাদিগকে মহর্ষির সহিত দেখা করাইয়া দিলে মহর্ষি তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজীর মুখ হইতে পরমহংসদেবের নাম শুনিয়া মহর্ষি আনন্দ ও শ্রদ্ধার সহিত বলিয়া উঠিলেন "তা তিনি কতবড় ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন"। তাহার পর গীতা হইতে "ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ" শ্লোকটী ও হাফেজের একটী বয়েদ আবৃত্তি করিয়া বিবেকানন্দের সহিত নানাপ্রকার আলোচনা করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দকে বলিলেন, ঋষিরাও অনেক স্থানে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন সত্য; কিন্তু আমি তার যাথার্থ্য বুঝি না। ইহার পর বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে মহর্ষি সহর্ষে তাঁহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "তোমরা এই রাজ্যে আরও গভীরভাবে প্রবেশ কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া স্বদেশে

ফিরিয়া আসেন, তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন "স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমাদের (আদিব্রাহ্মসমাজের) পার্থক্য নিতান্ত বাহ্য ও গৌণ—উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। সে উদ্দেশ্য উপনিষদের সত্যসমূহ প্রচার ও সাধন করা। সেই উদ্দেশ্য তিনি সফল করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের নমস্য।"

স্বামীজী প্রথমবার বিলাত হইতে আসিলে মহর্ষি স্বামীজীর সিমুলিয়ার বাটীর ঠিকানায় তাঁহার সাফল্যে প্রীত হইয়া একটী আশীর্ব্বাদপূর্ণ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। মহর্ষিদেবের সহিত স্বামীজীর আজীবন প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে মহর্ষি তাঁহাকে প্রায়ই আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন। মহর্ষি স্বামীজীকে যেমন স্নেহ করিতেন, স্বামীজীও তাঁহার প্রতি সেইরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন।

আদিব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লেখককে বলিয়াছেন "রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের attitude চিরদিনই reverential; তাঁকে আদিব্রাহ্মসমাজ চিরদিনই আদর্শ যোগী পুরুষ ও সিদ্ধ ভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। যাঁরা মনে করেন ও প্রচার করেন আমরা রামকৃষ্ণদেবকে "a saint belonging to lower level" বলি, আমাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত এবং তাঁহাদের ঐ প্রকার উক্তি নিতান্তই অসঙ্গত ও অন্যায়। পরমহংসদেব আমাদের একান্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।"

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম তাহা আলোচনা করিয়া আমরা আশা করি রামকৃষ্ণ দেবের অনুবর্ত্তী ব্যক্তিগণ রোঁম্যাঁ রোলাঁ মহাশয়ের উক্তি ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। ধর্ম্মসম্প্রদায় মাত্রেরই কর্ত্তব্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইবার কারণ থাকিলেও তাহাতে কোন প্রকার ইন্ধন দেওয়া দূরে থাক, বরঞ্চ ঐ বিদ্বেষবাহ্নর উপর শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া উহা নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করা। আমরা শুনিতেছি, রোঁম্যাঁ রোলাঁর যে গ্রন্থে এই বিষয়ে উক্তি আছে, সেই গ্রন্থ উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আমরা আশা করি, অনুবাদক এই অংশ পরিত্যাগ করিয়া অথবা উল্লিখিত উক্তি ভ্রান্ত বলিয়া স্পষ্টরূপে লিখিয়া যেন গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।

ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কথা।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

সুপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মেদিনীপুরের ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি সম্ভবতঃ ইং ১৮৪১ সালে মেদিনীপুর সহরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। লিওনার্ড সাহেবের রচিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে। শিবচন্দ্র বাবু মেদিনীপুর হইতে বদলী হইলে উক্ত ব্রাহ্মসমাজ অবসন্ন-দশা প্রাপ্ত হয়। পরে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরের জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া যাইলে তিনি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজকে ইং ১৮৫২ সালে পুনর্জ্জীবিত করেন। রাজনারায়ণ বাবু মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বলে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী-সংগ্রহকার প্রসিদ্ধ ৺ঈশানচন্দ্র বসু ছাত্ররূপে রাজনারায়ণ বাবুর সহিত পরিচিত হন, এবং পরে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনীভূত হইয়া আইসে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কটকের জমিদারীতে প্রায় প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে পাল্‌কীর ডাকে যাইতেন। তাঁহাকে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়া যাইতে হইত। তখন মেদিনীপুর যাইবার অন্যবিধ সুবিধা ছিল না। মেদিনীপুরে শ্রান্তি দূর করিবারজন্য দুই-চারি দিন অবস্থান করিতেন এবং মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে উপদেশাদি দিতেন। মহর্ষি তথাকার ব্রাহ্মসমাজের গৃহনির্ম্মাণের মোট ব্যয় দুই হাজার টাকার মধ্যে আট শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু যতদিন মেদিনীপুর ছিলেন ততদিন মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবুর জীবনস্মৃতি হইতে দেখিতে পাই যে, মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রথম অবস্থায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাবাটীতে হইত; পরে স্কুলগৃহে স্থানান্তরিত হয় (৭৬ পৃঃ) ও পরে নবনির্ম্মিত গৃহে চলিতে আরম্ভ হয়।

রাজনারায়ণ বাবুর অধিকাংশ বক্তৃতা মেদিনীপুরে হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ইং ১৮৫৩ হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৬ অব্দে শেষ হয়। তাঁহার ব্রহ্মসাধন পুস্তক ঐ স্থানেই রচিত হইয়াছিল। তাঁহার Defence of Brahmaism and Brahma Samaj ঐ স্থানেই প্রণীত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তথাকার গোপগিরিতে যাইয়া উপাসনা হইত। রাজনারায়ণ বাবু মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুরের

সান্নিধ্যে অন্য অন্য স্থানেও উপাসনা ও প্রচার করিতে যাইতেন। তিনি তথায় আসিয়া অনেকগুলি জনহিতকর সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইং ১৮৬৮ সালে তিনি ভগ্নদেহে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পর হইতে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের তেজ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি মেদিনীপুর যাই, ব্রাহ্মসমাজগৃহ ভগ্ন অবস্থায় পরিণত জানিলাম শুনিয়াই পূর্ব্বতন ময়ূরভঞ্জ মহারাজ ব্রাহ্মসমাজগৃহের জন্য তাঁহার জঙ্গল হইতে কয়েকখানি কড়িকাঠ বিনামূল্যে দান করেন। পরে সাধারণের চাঁদায় গৃহসংস্কার হইয়া যায়। এক্ষণে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সে শক্তি নাই। উপাসনা একভাবে বলিতে গেলে বার্ষিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে। ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

কয়েক দিনের জন্য মেদিনীপুর অবস্থান কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮৪ শকের ১১ই ভাদ্র তারিখে মেদিনীপুর হইতে আমার পিতাকে যে পত্র লিখেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

পরমপ্রিয়দর্শনেষু—

অসংখ্যনমস্কারাঃ আশীর্ব্বাদাঃ সন্তু—

তোমার প্রেমপূর্ণ পত্র পাইয়া অবগত হইলাম, এখন অনেকেরই হৃদয় ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইতেছে। অনেকেরই রসনা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্যে উৎসুক হইয়াছে। ইহাতে আমাদের আর আনন্দের সীমা কি। এখন আমাদের নিত্যই মহোৎসব। "সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে, এতে আনন্দের সীমা কি"। মেদিনীপুরেও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির লক্ষণ সর্ব্বত্র আভাস দিতেছে। এখানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি প্রণয়বন্ধন দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর বাবু এইক্ষণ কৃষ্ণনগরে আছেন। * * * তুমি অপরাজিতচিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পালন করিতেছ এবং সুস্নিগ্ধ সরল বিনয়বাক্যে ব্রাহ্মদিগের মানস আকর্ষণ করিতেছ, ইহাতেই তোমার সাধুকামনা সকল সিদ্ধ হইবে ও ঈশ্বরপ্রসাদে তোমার জয়লাভ হইবে। * * * শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বাবু তোমাকে নমস্কার দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের মিলনসাধনের উপায়।

১। উপাসনার একই আদর্শরক্ষা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ (যাহা পরে আদিব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত হইল) হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম পৃথক হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবার পর অবধি আজ বহুকাল ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের শাখাগুলির মধ্যে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও আশা ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে অধুনা বড়ই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের তিনটী শাখার মধ্যেই মিলিতভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা খুবই জাগিয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি রেভারেণ্ড ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় বাগনানস্থিত ব্রহ্মানন্দআশ্রম হইতে এক পত্র লিখিয়া আমরা এই মিলন সাধনের কি উপায় স্থির করিতেছি জানিতে চাহিয়াছেন। আমরাও যে এবিষয়ে নিশ্চিন্ত রহিয়াছি তাহা নহে, আমাদের মতে মিলনসাধনের সর্ব্বপ্রথম উপায় শাখাত্রয়ের উপাসনার আদর্শ একই রক্ষা করা। আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী এক প্রকার; ব্রাহ্মসমাজের অপর দুই শাখা মূলতঃ কেশবচন্দ্রপ্রবর্ত্তিত উপাসনাপ্রণালী অনুসরণ করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রণালী প্রধানতঃ কয়েকটী বৈদিক মন্ত্র অবলম্বনে গঠিত। অপর দুই শাখা সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে সমাধান-মন্ত্র অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্ ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রে "শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধং" মন্ত্রাংশটুকু সংযুক্ত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; এবং প্রার্থনামন্ত্রের (অসতো মা সদগময় ইত্যাদি) বাঙ্গলাটুকু অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, অপর দুই শাখার অনেক সভ্য বলেন যে, আদিসমাজের সমাধান-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একটু বিস্তৃত 'আরাধনা' সংলগ্ন না থাকায় আদিসমাজের উপাসনা তাঁহাদের নিকট অল্পাধিক লঘু বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যখন অপর দুই শাখার উপাসনায় উপস্থিত হন, তখন উপরোক্ত "অসৎ হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও" ইত্যাদি মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরটী পৃথক্‌স্বরে উচ্চারিত হইবার কারণে এবং "সৎস্বরূপে"র স্থানে "সত্যেতে" বলায় যতিভঙ্গের কারণে তাঁহাদের কর্ণে উপাসনাটী বড়ই বিসদৃশ ঠেকে।

ব্রাহ্মসমাজের তিনটী শাখার মিলনের পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা থাকিলে আমার মনে হয়, তিন শাখার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি মিলিত হইয়া উপাসনা-

প্রণালীর একটী সাধারণ আদর্শ সর্ব্বপ্রথম স্থির করা উচিত। আমাদের মনে রাখা উচিত, ব্রাহ্মসমাজের আদি লক্ষ্য হইল ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করা। তাহা যদি সত্য হয় এবং সে বিষয়ে আমরা যদি একমত হই, তবে বোধ হয় ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, সংস্কৃত ভাষাকে আমাদের উপাসনাপ্রণালীর মূল প্রতিষ্ঠাভূমি করিয়া উপাসনাপ্রণালীকে সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার সংমিশ্রণে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতেও আমাদের এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন পাইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত একাধিকবার সাক্ষাতে যখনই এবিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল, তখনই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "সংস্কৃতকে ছাড়িয়া দিয়া আমরা যে কি ভুল করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।" আমরা যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, উপাসনা প্রণালীর সংস্কার সাধন করিতে গেলে আদিসমাজকেও কিছু ছাড়িতে হইবে ও গ্রহণ করিতে হইবে, এবং অপর দুই শাখাকেও কিছু ছাড়িতে হইবে আর কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে উপাসনাপ্রণালীর সংস্কারই হইবে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মিলনসাধনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সোপান। এই বিষয়ে আমরা বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। মিলনসাধনের প্রতি ব্রাহ্মসাধারণের প্রকৃত অনুরাগ দেখিলে আমরা আরও কতকগুলি ইঙ্গিত ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

সুন্দরবনে কয়েকদিন।

(শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, পি, আর, এস)

(২)

২৭শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর এই কয়দিন এক আশ্চর্য্যভাবে কাটিয়াছে। ঘড়ি আমাদের কাছে একটীও ছিল না—কাজে কাজেই সময়ের জ্ঞানটুকু ছিল না। কখন যে কি করা হইয়াছে, তাহারও ঠিক নাই—বেশ একরকম! তারপর, কোন্ দিন, কি বার, তাহার ত ঠিকানা প্রায় ছিল না; বাহির হইতে কোনও-প্রকার খবর আসিবারও কোনও উপায় ছিল না। সাত-আট ক্রোশের মধ্যে একটীও ডাকঘর নাই, ভদ্রলোকের বাসও নাই। আছে কেবল প্রকৃতির অনন্ত উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য, নগ্ন স্বভাবের অকৃত্রিম বিকাশ, দরিদ্র চাষীর পল্লীকুটীরে সোনার ধানের রাশি, সীমাহীন প্রান্তর, নির্ম্মল আকাশ ও অসংখ্য কুমীর। যেন এ কয়দিনের জন্য সভ্যতার আলোকবিহীন আদিম মানবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিলাম। প্রকৃতির মধ্যে আপনাদের ওতঃপ্রোতভাবে মিশাইয়া দিয়া পরমানন্দরসের আস্বাদ পাইয়াছিলাম। সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন, আকর্ষণ এবং সভ্যতার শতকার্য্যে মুক্ত এ রকম জীবন উপভোগ অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে। আমার আগে ধারণা ছিল যে সুন্দরবন না জানি কি ভয়ানক বন। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখি বন ত দূরের কথা, গাছের চিহ্নমাত্র নাই। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানে সব জমি হাসিল হইয়াছে। আগে যেখানে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু স্বচ্ছন্দে নিরাপদে বিচরণ করিত, এখন সেখানে মানুষ নির্ভয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অবশ্য অন্যান্য অনেক জায়গায় ভীষণ অরণ্যানী বর্ত্তমান, কিন্তু সে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে বহুদূরে।

এ কয়দিন কি রকম কাটিয়াছে, তাহার একটু আভাস দিই। আমার দুইজন প্রায় সমবয়স্ক সঙ্গী ছিল। আমরা তিনজনেই ভোরবেলা উঠিতাম; তখন মাঠের উপর ঘন কুহেলিকা স্তরে স্তরে তরঙ্গায়িত; গাছের পাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির-বিন্দু মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। গরম জামা গায় দিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই কুয়াশা ভেদ করিয়া মাঠে, অপথে, কুপথে বনে জঙ্গলে খুব করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম, যতক্ষণ না সূর্য্যের তাপ প্রখর হইত। বাড়ী আসিয়া ভুরি ভোজন করিয়া আবার বাহির হইতাম। কোনও দিন কুঁচফল তুলিতে যাইতাম; কোনও দিন বা খালের মাঝখানে দ্বীপের উপর বাঁশী বাজাইয়া, গান গাহিয়া, গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতাম; কোনওদিন বা দ্বিতীয় কলম্বাস বা পেরীর মত কোনও অনাবিষ্কৃত স্থান আবিষ্কার করিবার জন্য সোৎসাহে অভিযান করিতাম, কোনও দিন বা নিজেরা নৌকা চালাইবার প্রয়াস পাইতাম। আমি থাকিতাম হালে আর ওরা দাঁড় টানিত। তারপর আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সবাই মিলিয়া পুকুরে ঝাঁপ দিতাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক আনন্দের আতিশয্যে ঝাঁপাঝাঁপি মারামারি ও ডুবাডুবি করিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া উপরে উঠিতাম। সে কি মজা! ভাত খাওয়ার পর হইত এদিক-ওদিক বেড়ান, গল্প, লেপমুড়ি দিয়া ঘুমান অথবা কুমীর শীকার। ওদের বন্দুক ছিল, ওরা ছুড়িত। বিকাল হইলেই আবার একবার খাইয়া লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম; বাঁশী লইয়া সারাপথ বাজাইতে বাজাইতে। বাঁশী আমার নিত্যসঙ্গী ছিল, তাহার সঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও হই নাই। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে

আহারে বিহারে সর্ব্বদা আমার বুকের কাছে ঘুমাইয়া থাকিত, ইচ্ছামত তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতাম। এই বিজনে সেই ছিল আমার সুখ, আমার আনন্দ, আমার অন্তরের অন্তরতম। বাঁশীর পঞ্চম তানে প্রকৃতির সুরের সঙ্গে, মর্ম্মের নিভৃত গোপন সুর মিলাইয়া দিয়া, বিশ্বপ্রকৃতি আন্দোলিত করিয়া তুলিতাম। সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার ঘনাইয়া না আসা পর্য্যন্ত আমরা শ্যামল তৃণপ্রান্তরে গান গাহিয়া লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিয়া অথবা নৌকাবিহারে সময় কাটাইয়া দিতাম। সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়া পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইতেন, সেই অনন্ত নীলিমা যখন অজস্র রংএর লীলায় লীলায়িত হইত, আসন্ন নিশার সেই নীরব চিত্রখানিতে তন্ময় হইয়া দেখিতাম, আলো ও ছায়ার অপূর্ব্ব সমাবেশ, বর্ণের বিচিত্র বিকাশ। আবার যখন অনন্ত অসীম প্রান্তরের শেষরেখা হইতে ঊষারাণী তাঁহার প্রভাতআলোর ঘোমটাখানি ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া আপনার ব্রীড়ারক্তিম সৌন্দর্য্য লালিমা প্রকাশ করিতেন, তখনও মুগ্ধ হইতাম, প্রকৃতির সেই অপরূপ ভঙ্গীতে। সেই অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের আবেশে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। সহরের বিষম বন্ধন ও কোলাহল হইতে এই উন্মুক্ত বিজন বিরলে আসিয়া যেন প্রাণটা পিঞ্জরমুক্ত বনের পাখীর মত আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা অনেক দূর বেড়াইয়া আসিয়া মুড়ি, খেজুরের রস প্রভৃতি অপর্য্যাপ্তপরিমাণে উদরসাৎ করা যাইত, তারপর সঙ্গীদের সঙ্গে শুইয়া গল্প হইত, তর্ক হইত, মানবের আদর্শ, উদ্দেশ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি প্রভৃতি লইয়া সমালোচনা হইত। রাত্রে সেই মাটীর কাঁচাঘরে ঘুমাইতে বড়ই আরাম লাগিত।

যাহা হউক, এ কয়দিন কাটিয়াছিল বেশ। শেষে দিনকয়েকের জন্য মামা আসিয়া রহিলেন, তাঁহার সঙ্গে বেশ আমোদে সময় কাটিত। আমি ও আমার দুই পিসতুত ভাই (যাহাদের জমীদারীতে গিয়াছিলাম) আমরা তিনজন ঠিক একপ্রাণ ছিলাম—একসঙ্গে উঠিতাম, বেড়াইতে যাইতাম, গল্প করিতাম, খাইতাম। তাহারা দুইজনেই আমাকে খুব পছন্দ করিত। দুইজনের মন খুব সরল ও কোমল ছিল। কাহারও মনে কোনও গর্ব্ব বা অহঙ্কার ছিল না। তবে তাহাদের মধ্যে যে ছোট, সে ছিল একটু practical, আর বড়টী উদার ও উদাসস্বভাবের। তাহার মন সর্ব্বদাই কোন কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিত, তাহার করুণদৃষ্টি যেন কোন্ অপাওয়ার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত। সে কবি ছিল না বটে, তবুও প্রাণটা তাহার কল্পনায় আঁকা। প্রায়ই দেখিতাম তাহাকে নীরবে নিস্তব্ধে আপন মনে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে। তাহাদের সংসর্গে আমার দিনগুলি খুব আমোদে কাটিয়াছিল, সে স্মৃতি মুছিবার নহে।

একদিকে যেমন সরলহৃদয় চাষীদের দেখিয়া ও তাহাদের রাশি রাশি সোনার ধানভরা মরাই দেখিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব স্পন্দন অনুভব করিয়াছিলাম, অন্যদিকে তেমনি দীন-দুঃখী প্রজাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া চিত্তে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলাম। জমিদার ও প্রজা পরস্পরের সম্বন্ধ এইবার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। আর একটী ব্যাপার আমাদের অত্যন্ত কৌতুহল সৃষ্টি করিয়াছিল। এদেশে কোনও ভদ্রলোকের বাস নাই। সেজন্য এখানকার সবাই, পরিষ্কার কাপড়-জামা পরিহিত ভদ্রবেশধারী আমাদের কয়েকজনকে বাহির হইতে দেখিলেই কোন্ অজানা রাজ্যের লোক ভাবিয়া অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত একদৃষ্টিতে। এমনই আশ্চর্য্যজনক জীব আমরা!

দিনকতক এইভাবে বেশ লাগিয়াছিল, কিন্তু একেবারে সহরে কিনা—যতই নতুনত্বের মোহ কাটিয়া যাইতে লাগিল, ততই বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। চিঠিপত্র ত পাইবার উপায় নাই, কাজেই বাড়ীতে যাহাদের ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহারা সকলে কেমন আছে, সঙ্গীরা কি করিতেছে, কোথায় আছে, এই চিন্তা মাঝে মাঝে মনকে আলোড়িত করিত। তাহাদের প্রত্যেকের কথা একাকী শুইয়া ভাবিতাম; এক একটী চিত্র চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত, আবার ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া যাইত। খবরের কাগজের নামগন্ধ নাই। প্রাণ আরও ব্যাকুল হইত রাজনৈতিক অবস্থা জানিবার জন্য। কলিকাতায় কি হইতেছে, যুবরাজের কি হইল, আইন অমান্যের কি ফল হইল, কংগ্রেস কিরূপ অনুষ্ঠিত হইল, কোন্ পথ নির্দ্দিষ্ট হইল, এই সব খবর জানিবার জন্য উৎকণ্ঠায় মন অস্থির হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্য এই যে এত শান্তি ও নির্জ্জনতার মধ্যে আসিয়াও চঞ্চল স্বভাব, আত্মাকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইতে দিল না। আমার ভায়াদেরও মন বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গুরুজনদের সে ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া ফন্দী আঁটিলাম যে, আমরা তিনজনে মিলিয়া আগেই চলিয়া যাইব। নৌকার দরকার নাই, হাঁটিয়া কুলপী পর্য্যন্ত যাইয়া সেখান হইতে ডায়মণ্ডহারবার পাল্কী করিয়া যাইব। এই মতলব করিয়া আমরা ৩১শে ডিসেম্বর ভোরবেলা বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আগে থেকেই গুরুজনদিগকে এই চক্রান্তের কথা বলা ছিল,

কাজেই দুই ক্রোশ পথ যাইতে না যাইতেই দরোয়ান ছবিরাম আসিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। যাহা হউক আমাদের কার্য্যসিদ্ধ হইল। উপরওয়ালারা তারপর দিন যে করিয়াই হউক আমাদের পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

নানাকথা।

প্রাণদণ্ড হইতে মুক্তি।—আমরা গতবারে নেপাল রাজ্যে প্রাণদণ্ড রহিত বিধান উপলক্ষে বলিয়াছিলাম যে রহিত করার একটী প্রধান যুক্তি এই যে বিচারে ভুলভ্রান্তি হইয়া নির্দ্দোষী ব্যক্তিরও প্রাণদণ্ড হওয়া অসম্ভব নহে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে (বঙ্গবাসী ১৩ ভাদ্র ১৩৩৮) দেখিলাম যে কালু বেহারা নামক এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে খুলনার সেসন জজের নিকট আনীত হয় ও সাতজন জুরী সাহায্যে তাহার বিচার হয়, জুরীগণের মধ্যে ৩ জন তাহাকে দোষী বলেন, একজন সন্দেহের সুযোগ দেন এবং তিনজন নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করেন, কিন্তু সেসন জজ তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পরিবর্ত্তে একেবারেই হত্যাপরাধী স্থির করিয়া হত্যাপরাধী অর্থাৎ প্রাণদণ্ড প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া হাইকোর্টের অনুমোদন প্রার্থনা করেন। হাইকোর্টের বিচারকদ্বয় তাহাকে হত্যাপরাধী স্থির করা তো দূরে থাক, তাহাকে একেবারেই বেকসুর খালাস দিলেন। তাহার যদি সেসনস জজের আদেশ অনুসারে এবং জুরীর সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইলেও সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে যদি তাহার প্রাণদণ্ড হইত তবে সেই নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দায়ীত্ব কিরূপ গুরুতর হইত বলা যায় না। এইরূপ বিচার-বিভ্রাটের কারণেই আমরা প্রাণদণ্ড রহিতের পক্ষপাতী। ইংরাজীতে আইন সম্বন্ধীয় এই প্রবাদটী বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অপেক্ষা দশজন দোষী ব্যক্তির মুক্তিলাভ হওয়া শ্রেয়ঃকল্প।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে।—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে "বঙ্গবাসী" বর্ত্তমান তরুণ সমাজের এক সম্প্রদায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার সবল লেখনী পরিচালনা করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর ন্যায় শক্তিশালী সংবাদপত্র যখন ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তখন আমরা আশা করি বঙ্গীয় সমাজে দুর্নীতির প্রসার অচীরে প্রতিরুদ্ধ হইবে, কিন্তু এক আধবার প্রবন্ধ লিখিয়া ফলাফল অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না—সপ্তাহের পর সপ্তাহে বঙ্গবাসীর লেখনী যতদিন না অসাড় হইয়া পড়ে, ততদিন দুর্নীতির মস্তকে মুষ্টির পর মুষ্টি সজোরে আঘাত করিতে হইবে। এই বিষয়ে বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হন, এবং দেশের জনসাধারণকে আকর্ষণ করেন তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান তাঁহার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদের চেষ্টাকে নিশ্চয়ই সফল করিবেন।

দীর্ঘকালব্যাপী উপদেশ।—আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া কথকতা, পুরাণ পাঠ ও রামায়ণ গীত প্রভৃতি হইয়া থাকে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাহার যখন ইচ্ছা সে তখন আসিয়া মনের তৃপ্তি সাধন পর্য্যন্ত উহা শ্রবণ করে এবং যখন তাহার ইচ্ছা হয় তখন সে চলিয়া যায়। বর্ত্তমানে ঐরূপ দীর্ঘকালব্যাপী কথকতা প্রভৃতি এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। স্বল্পকালস্থায়ী বক্তৃতাদি ঐ সকলের স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে, বক্তৃতাগুলি যতই মিষ্ট হউক আন্দাজ দুই ঘণ্টার বেশী দীর্ঘ হইলে শ্রোতৃবর্গ অধীর হইয়া উঠে এবং নানা উপায়ে তাহাদের বিরক্তি প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়। সুমিষ্ট গীতাদি সম্বলিত হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশগুলি আন্দাজ অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক কালব্যাপী হইলে সাধারণতঃ শ্রোতৃবর্গের বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে, এই কারণে এ বিষয়ে এদেশের ধর্ম্মপ্রচারকগণ বোধ হয় একটু সতর্ক থাকেন। পাশ্চাত্য প্রচারকগণ সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের উপদেশাদি সমস্ত কার্য্যই যাহাতে সান্ধ্য ভোজন সময়ের পূর্ব্বেই শেষ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে সযত্ন থাকেন, কিন্তু সম্প্রতি আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম যে আমেরিকার অন্তর্গত Los. Angelos নগরে এক ধর্ম্মপ্রচারক কুড়ি ঘণ্টাব্যাপী উপদেশ দিয়াছিলেন। অনেকেই অবগত আছেন এই নগরটীর অধিকাংশ অধিবাসী নিগ্রো, উপদেষ্টা তাঁহার উপদেশের মধ্যে মধ্যে বিবিধ ফলের রস খাইয়া উদরের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, এইরূপ ফলের রস পান করিবার ফলে এই দীর্ঘকালব্যাপী উপদেশ প্রদানেও তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ তিনি বেশ সুস্থবোধই করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার ওয়াসিংটন নগরে নিগ্রোদিগের ব্যাপ্টিষ্ট গির্জ্জায় এক ধর্ম্মোপদেষ্টা চৌদ্দ ঘণ্টা ধরিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্ষুধার তাড়না নিবৃত্তি করিবার জন্য নানাবিধ মাংসাদি আহার্য্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত উপদেষ্টাগণের কোন কষ্ট

হয় নাই ধরিয়া লইলেও শ্রোতৃবর্গের যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কেবলমাত্র মনশ্চক্ষে কল্পনা করা যাইতে পারে।

৺যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু ।—গত ৪ঠা আষাঢ় ৺যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। ইঁহার নাম বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় থাকিবে। ইঁহার শ্রেষ্ঠতম অক্ষয় কীর্ত্তি "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। বঙ্গভাষায় অতি অল্প মাত্র বার্ষিক দুই টাকা মূল্যে একখানি সুবৃহৎ সংবাদপত্র স্থায়ীভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, যোগেন্দ্র বাবুই তাহার পথপ্রদর্শক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ আদর্শের সহিত বঙ্গবাসীর আদর্শ পৃথক হইলেও হিন্দু দেশবাসী যাহাতে ঋষিমুনিদিগের প্রচারিত সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে আস্থাবান হন এবং দেশবাসীদিগের মতিগতি পাশ্চাত্য রীতিনীতির দিকে চলিয়া না পড়িয়া শাস্ত্রোক্ত রীতিনীতির দিকে ফিরিয়া আসে, এ বিষয়ে "বঙ্গবাসী" পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির সাহায্যে বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিল এবং সে বিষয়ে যে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। ব্রাহ্মসমাজের মতবাদসমূহকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত বঙ্গবাসীর তৎকালীন প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ পাইত বটে, কিন্তু দেশীয়ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা আনিবার বিষয়ে তাহার মতের সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের মতের যে ঐক্য ছিল না, তাহা বলা যায় না। অনেক সময় তাঁহার অপ্রিয় সত্য কথার ভিতর দিয়া আমরাও অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি, আবার ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক কোন-কোন সত্য বঙ্গবাসীর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন দেখি। এখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন পরস্পরের দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণগ্রহণ করাকেই আমাদের জীবনের ব্রত করিলে দেশের উন্নতি ও মঙ্গল সাধিত হইবে। কেবল সুলভ সংবাদপত্র প্রকাশ নহে, যোগেন্দ্রবাবু সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশ করিয়া প্রত্যেক হিন্দু পরিবারকে শাস্ত্রনিহিত অমূল্য রত্নসকল দেখিবার যে সুযোগ দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় ও তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। অনেকের জানা নাই, বঙ্গবাসীর ন্যায় সুলভে না হউক কাল ও অবস্থা উপযোগী সুলভ মূল্যে আদিব্রাহ্মসমাজ বেদান্ত ভগবদ্গীতা পঞ্চদশী প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থসকল সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়া এবিষয়ে আদিমতম পথপ্রদর্শকের সম্মানলাভের অধিকার পাইয়াছে।

লর্ড আরউইনের ঈশ্বরবিশ্বাস ।—ইউরোপের শিক্ষা ও বিজ্ঞান আমাদের নূতন মনোবৃত্তি দিয়াছে; ধর্ম্ম ও ভগবান্ বস্তুকে প্রয়োজনের বাহিরে রাখার কথা বাজারে অধিক মূল্যেই বিকায়—ইহা যে বিকৃত রুচির পরিচয়, তাহা আমরা চিরদিন বলিয়া আসিতেছি।

ভারতের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা আরউইনের কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস ছিল। তিনি অত্যাধুনিক শিক্ষায় মানুষ হইয়াও ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন নাই। ব্রিটিশ জাতির সর্ব্বোচ্চ আসনে বসিবার অধিকার পাওয়ায় শিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা সংযুক্ত থাকায়, তিনি আকেজো হইয়া পড়েন নাই; ভারতশাসনের শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল, ইহা অস্বীকার করার নয়।

ইউরোপের আদর্শ ও বাহ্য চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ একদল ভুয়ো মানুষ দেশের তরুণ মনে বিষ ছড়াইতেছেন——ধর্ম্মে ও ভগবানে অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া। আমরা লর্ড আরউইনের এই ঘটনাটী এইজন্য পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। ভারতের হিন্দুজাতি অন্তর্য্যামীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়া জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইত, তাহা হইত অব্যর্থ, অমোঘ—ব্যর্থতার আঘাতে হিন্দু নিরাশ হইত না; এই কথা শুনিয়াই সংশয়ী টিপ্পনী করিয়া বলিবেন—তবে আবার এ দুর্দ্দশা কেন! ইহার উত্তর এ ক্ষেত্রে দিব না।

লর্ড হ্যালিফক্স লিখিয়াছেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড আরউইন আসিয়া আমার পরামর্শ চাহেন—ভারতের লাট-পদ তিনি গ্রহণ করিবেন কি না! ইহার উত্তরে আমি বলি, এ বিষয়ের ফলাফল আমাদের হাতের বাহিরে, একমাত্র ভগবান ইহার উত্তর দিবেন, এবং তাহার জন্য আমাদের অনেক প্রার্থনা করিতে হইবে; তাহার পর আমরা দু'জনে ধর্ম্মমন্দিরে যুক্ত করে প্রার্থনা করি; মন্দির হইতে বাহির হইয়া বলি "বোধহয় তোমায় ভারতে যাইতে হইবে।"—লর্ড আরউইন তৎক্ষণাৎ বাষ্পাকুললোচনে বলিলেন—"আমিও এই অনুভূতি পাইয়াছি।"

মানুষের জটিল সমস্যার মীমাংসা বুদ্ধির সাহায্যে কোনদিন সম্ভব হয় নাই; ভগবানের করুণা যে আলো সৃষ্টি করে, তাহাতেই মনের আঁধার দূর হয় এবং অতি দুর্গম অবস্থায় আমরা সমাধান খুঁজিয়া পাই। ইউরোপের আদর্শেও ধর্ম্ম ও ভগবানের পরম স্থান আছে; ভারতের হিন্দুজাতি অনাবশ্যক বোধে এই শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে যেন বঞ্চিত না হয়। —প্রবর্ত্তক, শ্রাবণ ১৩৩৮।

বাঙ্গালী গণিতজ্ঞের অদ্ভুত ক্ষমতা ।—বিক্রমপুর জয়যোগিনী গ্রামের শ্রীযুক্ত যোগেশ বসু মহাশয়ের গণিতশাস্ত্রের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কথা শুনিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আমরাও ইঁহার শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যা

বেলা স্বনামধন্য ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের ভবনে ইঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটী সভা আহূত হইয়াছিল। উক্ত সভায় কলিকাতার অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় অনেকে অনেক গুলি বড় বড় সংখ্যা দিয়া সোমেশ বাবুকে গুণযোগ প্রভৃতি গণিতবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্নকর্ত্তাগণ একটি কাষ্ঠফলকে প্রশ্নগুলি লিখিয়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সোমেশবাবু উত্তরগুলি ঠিক ঠিক বলিয়া গিয়াছিলেন, বোধ হয় এক সেকেণ্ডও বিলম্ব হয় নাই। সভার শেষে তিনি কিরূপে এইরূপ ঠিক উত্তর দেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তিনি ইহার ঠিক উত্তর দিতে পারেন না—প্রশ্নের সংখ্যাগুলি লেখা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার মনে উত্তরের একটা ছাপ আসিয়া পড়ে। মনস্তত্ত্বের যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা প্রকৃতই বিশেষ আলোচনার বিষয়। আমরা বাল্যকালে দুই একজন শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর কলিকাতায় আসিতেন দেখিতাম। বিশ জন ত্রিশ জন লোক পরে পরে কত কি বিভিন্ন ভাষায় কত কি বলিয়া গেলেন, ঘণ্টাবাদন প্রভৃতি কত কি কার্য্য করিয়া গেলেন, আশ্চর্য্য এই যে তাঁহারা ঠিক পরে পরে বলিয়া দিতে পারিতেন যে কাহার পর কোন্ কথা বলা হইয়াছে বা কাহার পর কোন্ কার্য্য করা হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রের একটি কথা এই যে, একই মুহূর্ত্তে মন একাধিক বিষয় মনন করিতে পারে না। এই কথার উপর দার্শনিক অনেক বড় বড় তত্ত্ব দাঁড়াইয়া আছে। সোমেশ বাবু অথবা ঐ সকল স্মৃতিধর বা শ্রুতিধরদিগের কার্য্য আলোচনা করিলে আমাদিগের মনে হয় যে, বুঝি মন একই মুহূর্ত্তে একাধিক বিষয় গ্রহণ ও মনন করিতে সক্ষম। যদি উহা ভ্রান্ত হয়, তবে ঐ একাধিক বিষয় গ্রহণ করিবার মধ্যে সময়ের বিচ্ছেদ কত সূক্ষ্ম! উহা মনন করিতে গিয়া মন প্রতিনিবৃত্ত হয়।

"আট বছর বয়সে ইনি চোদ্দ অঙ্কের রাশি দিয়ে মুখে মুখে গুণ কর্‌তে পার্‌তেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অতি কঠিন কঠিন ভাগ ও অন্যান্য কঠিন অঙ্ক খুব সহজেই কর্‌তে পার্‌তেন। কুড়ি বছর বয়সে যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন তাঁর সহপাঠীরা ঠাট্টা করে বলেছিল যে, আর এক বৎসরের মধ্যে তাঁর সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তাতে তিনি বলেন যে, বিবাহ জিনিষটা দৈহিক মিলন নয়, ইহা আত্মার মিলন। কাজেও দেখিয়াছিলেন তাই। ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের পর তাঁর শক্তি এমন বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি ১০০ অঙ্কের রাশিকে ১০০ অঙ্কের রাশি দিয়া মুখে মুখে গুণ করে দিতে পারতেন এবং বড় বড় ভাগ, ভগ্নাংশ, দশমিক, পৌনঃপুনিক, সমীকরণ ইত্যাদি অঙ্ক (division, fraction, decimals, recurring, equations) আশ্চর্য্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুল ভাবে মুখে মুখে কষে দিতে পারতেন। এখন বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স, কিন্তু সে শক্তি আদৌ কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। আহার মাত্র এক বোতল দুধ, কিন্তু অদ্ভুত দেহের শক্তি। প্রত্যহ ১৫ মাইল পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে হাঁটতে পারেন। উপবাস দিতেও খুব পটু। একবার সাড়ে চব্বিশ দিন নির্জ্জলা উপবাস করিয়াছিলেন। যদিও ওজনে সাত পাউণ্ড কমেছিলেন, তিন দিনের মধ্যেই আবার তাহা পূরণ করে নিয়েছিলেন। আট দিন উপবাসের পরও হেঁটে গিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। সপ্তাহে একটি দিন তিনি কোন কাজ করেন না বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।

১৯২৩ সালে যখন আমেরিকায় যান, তখন একদিন কয়েকটি অধ্যাপক ও ছাত্রদের সাম্‌নে তাঁর পরীক্ষা হচ্ছিল। তিনি মনে মনে ৬০ অঙ্কের রাশিকে ৬০ অঙ্কের রাশি দিয়ে গুণ করে দিলেন। অধ্যাপকেরা কালি-কলম নিয়ে অনেকক্ষণ কষে বল্‌লেন, গুণফল সামান্য ভুল হয়েছে। ইনি মনে মনে আর একবার কষে নিয়ে বল্‌লেন কখনই ভুল হয়নি। পরে অধ্যাপকরা আবার কষে দেখলেন তাঁদেরই ভুল হয়েছিল। ১৯৩০ সালের ২২শে আগষ্ট সন্ধ্যা বেলায় Masonic Pythusen Temple তাঁর এই অদ্ভুত বিদ্যার প্রদর্শন হচ্ছিল। একজন ভদ্রলোক খুব গম্ভীরভাবে হাতের একটা বড় কাগজ থেকে কয়েকটী প্রশ্ন ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে ছিলেন; যথা—

৩১৯৯৩৯১২০৬৯৯১৯১২৩ ইহার ঘন মূল (cube root) কত? তৎক্ষণাৎ উত্তর হল ৬৮৩৯৪৭।

৭৭৩৫২৯৪৭১১৪৫৭৬০২৭৫১৩২০১৮৯৭৩৪২০৫৫৮৬-৬১৭১৩৯২ ইহার সপ্তদশ মূল (seventeenth root) কত? উত্তর ২১২।

প্রত্যেকটী উত্তর দিতে তাঁর এক সেকেণ্ড করে সময় লেগেছিল। আর এক ভদ্রলোক প্রশ্ন কর্‌লেন—

৯৫২৮১২৮ ইহাকে পাঁচ শক্তিতে উন্নত করুন (rise to the 5th degree)।

উত্তর—৭৮৫৩০৪১৮৮৭৯৪৯০৬৫৭৩৯১৭৪২৯১১৬-৩৫৭৮৩৬৮। এই উত্তরটী দিতে ঘড়ি ধরে ৩ মিনিট ৪২ সেকেণ্ড লেগেছিল। এই সবই কাগজ কলমের সাহায্য না নিয়ে মনে মনে কষে ছিলেন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বন্ধু মহাশয়কে যে সব অঙ্ক দেওয়া যায়, তা এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁর অবিকল মনে থাকে। প্রত্যেক অঙ্কের প্রত্যেক খাপটি

তাঁর মনে থাকে এবং ধাপের দক্ষিণ দিকে বা বাম দিক হতে যে কোন সংখ্যা বলে দিতে পারেন। এমনি অদ্ভুত তাঁর স্মৃতিশক্তি।

এ বৎসর ১৮ই এপ্রিল তিনি বিলাত যাত্রার চার দিন আগে তাঁর ঐ শিল্পী বন্ধুর অনুরোধে মনে মনে ১০০ সংখ্যার রাশিকে ১০০ সংখ্যার রাশি দিয়া গুণ করে দেখিয়েছিলেন। তার নমুনা দেখলেই আমরা বোধ হয় মূর্চ্ছা যাব।"

ভাদরে (গান)।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাহার—একতালা।

ভাদরে বাদল নেমেছে ;
দিবানিশি ধরে
বারি ঝরে শত ধারে—
টুপি টাপি ধ্বনিতেছে।
পাখী ভিজে গাছে গাছে
চুপে চাপে বসে আছে—
কাতরে চাহিছে।
বিদ্যুৎ খেলে কালো মেঘে বলাকারাজি ;
নাচে ময়ূর ডাকে ভেক—
বাদল-মাদল বাজিছে॥

THE

BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(2)

13. Keshub Ch. and Rev. J. Long.

It was at this club that Keshub Chunder first distinguished himself in the delivery of *extempore* speeches. On one occasion it is reported that it was proposed at a meeting of this fraternity that the business of the club should be commenced with a prayer to God for its success. This proposal was objected to by the Rev. J. Long on the ground that no prayer could be addressed to the lifeless god of the Hindus. In answer to this Keshub Chuder said that the God to whom he prayed was not a lifeless one, and so eloquently demonstrated the living presence of the living God to his audience, that they unaminously supported the proposal of offering the prayer.

14. Circulation of motto bearing slips.

One of the methods adopted by this club for the conversion of their countrymen was the circulation of slips of paper bearing among others the following mottos: "Attend ye passers by to your future concerns. There is no peace in this transitory world. Think of death and be wise." Such a course, however, failed to afford the result anticipated. The people looked upon it as the handy work of Christian missionaries and passed it by.

15. Attachment of friends to Keshub.

It is said that though some acts of Keshub Chunder were not in accordance with those of the other members of his little club, and though many differed from him in some of their opinions and sentiments concerning religion, yet the young fraternity was so closely attached to him by reason of his amiability and virtue, that they agreed to whatever he said and proposed.

16. He founds a dramatic club.

It may perhaps be interesting to mention here the establishment of a dramatic club in 1856 by Keshub Chunder and some of his friends. During the existence of this club, Keshub Chunder personated with success the rôle of Hamlet. In 1857 he acted parts in the Bengali drama of "Kulina Kula Sarvaswa" at Chinsurah, and subsequently in some other Bengali plays written on the model of Ratnavali, which were produced with great splendour at the Rajbari of Paikpara. His last performance was after he had left college in 1859, when he appeared in a play entitled "Widow Marriage," written by Umesh Chandra Mitra of Bhowanipore.

17. He meets with Rajnarain Bose's Discourses.

Although during these four or five years Keshub Chunder had devoted a portion of his time and attention to theatrical pursuits, he had not neglected more important matters. He was in the meantime earnestly endeavouring to discover the best form of faith for his future guidance. While thus engaged he happened to meet with a volume of Rajnarain Bose's *Brahma Samaj* Discourses, the sentiments expressed which, especially the discourse on the "Principal Traits of Brahmaism," he found to be quite conformable to his own views on the subject.

18. His acquaintance with Devendra Nath and joining the samaj—1858 A. D.

Prior to this, he had had no acquaintance with any member of the *Brahma Samaj* ; but when he found that its doctrines and tenets were perfectly in unison with the dictates of his own conscience, he could not refrain from expressing his convictions to some of the leading members of the *Samaj*, and intimating his desire of joining that institution. This step made him personally acquainted with Devendranath Thakur, who in turn visited Keshub Chunder's little club, and afforded it the best encouragement he could. Thus, at the age of 20, in 1858, Keshub Chunder joined the *Samaj*, and his little fraternity shortly after followed their leader's example. The immediate cause of his acquaintance with Devendrananh Thakur was his anxiety to take his advice about the propriety of taking *mantra* from his family *guru*, who was pressing him at the time to accept it from him. Devendranath, in order to try his firmness, represented to him the social risk of refusing to take *mantra*, but, seeing him resolute, advised him to dispose with that ceremony, considered so essentially necessary by a Hindoo for his future salvation.

19. Keshub Ch. joining office.

When the elder members of Keshub Chunder's family found him, at so early a period of his life, inclined to a religious career, to the detriment of his worldly concerns, they determined if possible to dissuade him from this course. In consequence of their entreaties and persuasions he joined an office as a writer. As he often complained of the duties of a writer being irksome and incongenial to his mind, they naturally did not in any way change or weaken the fixed purpose of his mind, for he devoted a portion of his leisure time, snatched from the toils of business to write tracts on religious subjects.

20. He resigns appointment.

Imbued with the idea that he was created to work in a far different field than the one he was engaged in, and finally believing that he was made to serve his Heavenly Master, and to sow the pure seed of truth and salvation in the benighted minds of his countrymen, he soon resigned his appointment, and determined to dedicate his life to the service of the Church.

21. His strong stand in the face of threatened persecution.

The days when Keshub Chunder embraced Brahmaism were far otherwise than favourable to its proselytes. It was then considered a serious breach of orthodoxy even to enter the *Samaj*. No sooner had Keshub Chunder formed an acquaintance with Devendranath Thakur—an acquaintance which led to his conversion to Brahmaism—than his relations at home began to threaten and persecute him as much as lay in their power. The elders of his family were shocked and disgusted at his unconventional conduct, and refused to tolerate the liberties he took, in defiance of the orthodox religion of his country in which he had been born and brought up. But the greater the opposition and impediments thrown in his way, the stronger grew Keshub Chunder's courage and independence. At this critical period of his life he was fortunate in possessing the entire sympathy and honest affection of Devendranath Thakur, which, coupled with his own intrepid nature, aided him in withstanding the persecutions and annoyances which assailed him.

22. He joins the Bank of Bengal—1859. A.D.

In 1859 Devendranath Thakur proceeded on a voyage to Ceylon, for the sake of his health, accompanied by Keshub Chunder. On the return of the party to Calcutta, Keshub Chunder again entered service, and joined the Bank of Bengal as a writer, on Rs. 25 a month, which was shortly after raised to Rs. 50, owing to the neatness of his handwriting. While employed in the service of the Bank, he put forth a pamphlet entitled "The Young Bengal."

23. He founds the Sangata Sabha—1783 *Saka* (1860 A. D.)

The year 1860 (1783 Saka) is chiefly remarkable for the share Keshub Chunder took in establishing the Sangata Sabha, an institution whose main object was the abolition of the caste system, and the practice of idolatrous rites by Brahmas; as well as the introduction of the practice of widow marriage, and inter-marriage of different castes.

24. His mission to Madras and Bombay—1784 *Saka* (1861 A. D.)

In 1861 the *Samaj* sent out many missionaries to distant parts of India. Keshub Chunder undertook the mission to Madras and Bombay.

25. Keshub Ch. ordained minister of the samaj—1784 *Saka* (1862 A. D.)

On his return in 1862 (1784 Saka) he was ordained as Acharya or minister of the *Samaj*.

26. Keshub brings wife to Devendra Nath's place.

It was about this time on the occasion of a festival he wanted to bring his wife to Devendranath Thakur's house, but was opposed by his entire family, on the ground of Devendranath's heterodoxy. As both sides were equally determined, a serious quarrel was imminent, but the intrepidity of Keshub Chunder prevailed, and his wife and himself were allowed to depart unmolested. This behaviour cost him dear. "For six months," says Miss Collett, * "the heretical couple were exiled from the family house, when at last at the end of that time Keshub Chunder become dangerously ill, his kinsfolk relented, acknowledged his legal rights, and allowed him to return to his place in the family.

27. *Namakarana* ceremony of Keshub Chandra's sons with Brahmic rituals in his house.

This triumph of Keshub Chunder's was quickly followed by a more important one, the introduction of Brahmas and Brahmic ceremonies into his family. This took place on the occasion of the *nama-karan*, or name giving ceremony of Keshub Chunder's first-born son, when an assemblage of Brahmas was called at the family residence to celebrate the ceremony according to Brahmic ritual. This is another instance of the adoption of Brahmic rites in lieu of Brahmanic ones after their introduction by Devendranath Thakur.

28. Keshub secretary of the samaj and Pratap Ch. Mazumder editor of the T. Patrika—1786 *Saka* (1862 A. D.)

In 1862 (1785 Saka), Keshub Chunder was appointed official Secretary of the *Samaj*, and his friend, Pratap Chandra Mazumder, assumed the editorship of the *Tattwabodhini Patrika*.

29. Differences between Devendranath and Keshub Ch. led to the establishment of the *B. S.* of India,

Up to this time Keshub Chunder and Devendranath Thakur had worked in unison for the good of the *Samaj*. But from this time differences arose between them, which led to disunion, and the subsequent establishment of the *Samaj* of India

* Miss Collett has mistaken this ceremony for the Sacrament of Jata-Karma, or birth festival, when she says: "He still preserved his independence of action, which he showed soon afterwards, at the birth of his eldest child, when he insisted in performing the Jata-Karma, a birth festival in simple Brahmic form."

under the leadership of Keshub Chunder. This circumstance has been construed by some as a happy event, as it raised hopes of a wider propagation of the Brahmic religion; but by others it is deplored as creating a breach in, and endangering the existence of the *Samaj*. In whatever light however the case is viewed, it cannot be denied that on the principle that "*union is strength,*" and that every dissentsion tends only to weaken the parties concerned, and the object they have in view, the action of Keshub Chunder was hasty and reprehensible.

30. Rupture on the question—should persons with or without the sacred thread act as ministers and Devendranath's efforts to heal up the rupture.

The generally asserted cause of the rupture was the objection raised by Keshub Chunder to the wearing of the *poita* or sacred thread by those who conducted divine service in the Calcutta *Brahma Samaj*. At first Devendanath Thakur, who had himself renounced the wearing of the thread, was inclined to assist in the reform suggested by Keshub Chunder; and actually created Vijaya Krishna Goswami and Annadaprasad Chaterjia (two friends of Keshub), ministers of the *Samaj* in the place of the old ones, who had refused to comply with the reform. But on second thoughts, reflecting on what is due to the old ministers who had suffered much for the *Samaj*, and being desirous to retain and harmonize both conservative and progressive elements in the *Samaj*, as will be evident from the reply which he gave to a representation made to him in the subject by Keshub Chunder Sen and others, and which the reader will find a few pages further on, Devendranath Thakur withdrew his support, and the old thread-bearing Brahmas were replaced at the *Samaj*.

31. Rupture widened by an inter-caste marriage and Devendranath's views on the same.

The rupture between the two parties was *further widened by Keshub Chunder* solemnizing a marriage between two persons of different castes in 1863 (Saka 1786); a reform of a radical character, the adoption of which, in Devendranath's opinion, prejudicing the minds of the general Hindu community against Brahmaism would prevent the diffusion and acceptance of correct notions of the Godhead, and the consequent abolition of idolatry, a consummation which he thinks to be more devoutly wished than mere change of social institution or usage. He is not against intermarriage, but he would leave its introduction to the gradual influence of time and of Brahmaism itself, an opinion in which Keshub Chunder himself agrees in the main, as will be evident from the following extract from his speech on Social Information delivered at Bombay :

32. Keshub's support to Devendranath's view on Social Reform.

"From every true Indian my object would be, in the first instance, to extort a full and true confession of sin and a candid honest and sincere acknowledgment of the One True God as a proper object of worship, of love, and of faith. When that is done, the work of social reform may be *slow*, may come on *gently* and *quietly*; but if, without seeing the full realization of my ideas of social reformation, I were to die, simply seeing a large number of my countrymen in Bombay and Madras and Bengal standing forward manfully and boldly carrying the banners of the one True God, then, on my death-bed, I would say, with the greatest pleasure, God is glorified. *

33. Keshub removed from secretary ship and Dwijendranath Tagore appointed in his place.

Shortly after this Devendranath Thakur, perceiving that Keshub Chunder was determined to have his own way, without attending to the advice of his elders in the *Samaj*, removed him as trustee of the *Samaj* from its secretaryship. This was announced in the *Tattwabodhini Patrika* of the 15th December (1st Pous) of 1863 (S1786). Dwijendranath Thakur was subsequently appointed to the post, with Ayodhyanath Pakrasi as his assistant.

* The italics are ours.

34, Keshub's speech at Sinduriapati.

After his removal from his official connection with the *Samaj*, Keshub Chunder convened a meeting on the premises of the Metropolitan College at Sindiriapati, where he delivered a long and vehement speech on the subject of religious freedom and reform.

35. The *Indian Mirror* how it changes hands.

Hitherto, notwithstanding the differences existing between the party headed by Keshub Chunder and the *Samaj*, the subject of personal interests and properties had in no way been disturbed. The *Indian Mirror*, a weekly journal at the time, still continued to be printed at the *Tattwabodhini* Press. A Brahma of the seceding party sent a letter for publication in the *Mirror*. The letter contained an attack upon the non-conforming Brahmas. This letter became a *casus belli*. The managers of the *Samaj* objected to its publication, and disputed Keshub Chunder's right to the paper. There is no doubt that if the question of the propriety of the paper had been put to the test of the law, the paper would never have changed hands. But Devendranath Thakur was averse to taking such extreme measures, and he quiety allowed Keshub Chunder to take possession of a property to which he had not the slightest claim.

কোন পথ উত্তম ?

(শ্রীচারুবালা গুপ্তজায়া)

বৈদিকযুগে ঋষিরা মানুষের জীবনযাপনের জন্য সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ নামক দুইটি পথ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তদবধি কেহ কেহ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়া জীবন যাপন করেন, এবং কেহ কেহ তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়া তদনুসারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া জীবনযাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও রাজর্ষি জনক প্রভৃতি নিষ্কাম কর্ম্মযোগী গৃহস্থ এবং শুকদেব ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী।

জগতের মূলে যে তত্ত্ব আছে, তাঁহার কোন নাম নাই—কোন রূপ নাই, তিনি নাম-রূপবিহীন। তিনি অতীন্দ্রিয় পদার্থ, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তিনি অচিন্তনীয় এবং বাক্যমনের অগোচর। তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, একমাত্র স্বানুভূতিই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। তাঁহার মধ্যে গুণ আছে কি গুণ নাই, কেহই তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তথাপি কেহ কেহ বলেন, "তিনি নিরবয়ব এবং সগুণ" কেহ কেহ বলেন, "তিনি নিরবয়ব ও নির্গুণ," আবার কেহ কেহ বলেন, "তিনি সগুণ-নির্গুণ"। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, কেহই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কিছুই বলেন নাই, সকলেই নিজ নিজ স্বানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছেন। কোন কোন দার্শনিক বলেন, "জগতের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়।"

বেদের কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ এবং তন্ত্র—সমস্ত শাস্ত্রই মনুষ্য কর্ত্তৃক রচিত। রচয়িতার জ্ঞানবুদ্ধি ও স্বানুভূতি অনুসারে উক্ত শাস্ত্রাদি রচিত হইয়াছে। কোন শাস্ত্রকারই জগতের রচয়িতার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কোন শাস্ত্র রচনা করেন নাই। শাস্ত্রকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ন্যাসকে জীবনযাপনের উত্তম পথ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ জ্ঞানভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে জীবনযাপনের উত্তম পথ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রচয়িতা সন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে জীবনযাপনের উত্তম পথ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অত্যন্ত উদার ও প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ। ভূমণ্ডলের সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় উহাকে প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সম্মান করেন। উহা জগতের সমুদয় ধর্ম্মগ্রন্থের মুকুটমণি। সাংসারিক কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের এইরূপ সুন্দর সমন্বয় পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায় না। গীতোক্ত ধর্ম্ম মহোদার এবং সমদৃষ্টিমূলক; উহাতে দেশভেদ, কালভেদ, জাতিভেদ প্রভৃতি কোন ভেদবৈষম্য নাই। উহা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বজাতিতে সমান। সমত্বই উহার মূলমন্ত্র।

গীতোক্ত ধর্ম্মের সহিত নৈসর্গিক বা ঐশ্বরিক নিয়মেরও সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি নিয়মের কর্ত্তা মনুষ্য নহে, এই সমস্ত ভগবদ্‌বিহিত প্রাকৃতিক বিধান। গীতা উল্লিখিত নিয়মসমূহ লঙ্ঘন করিতে উপদেশ প্রদান না করিয়া সংযতরূপে উক্ত নিয়মসমূহ পালন করিতেই উপদেশ প্রদান করেন।

গীতা বলেন, "হে মানব! তোমরা যুক্তাহার-বিহার যুক্তকর্ম্মচেষ্টা ও যুক্তনিদ্রাজাগরণ অবলম্বন পূর্ব্বক মনে সন্ন্যাস রাখিয়া আমরণ সংসারের সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন কর। উপবাসাদি করিয়া শরীরকে কৃশ করিও না, ইহা দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্যপদার্থ ক্লিষ্ট হয়, এবং তাহাতে পাপ হয়। সংসারে থাকিয়া জ্ঞানভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম করিলেই ভগবানের উপাসনা করা হয়। তাঁহার উপাসনার জন্য সংসার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনে গিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জগৎরচয়িতা মানুষকে কর্ম্ম করিবার জন্যই কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, এই ভূমণ্ডল মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করতঃ জগৎরচয়িতার পাদপদ্মে আত্মসমর্পন করিয়া আমরণ গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া সংসারের সমুদয় কর্ম্ম করাই তাঁহার অভিপ্রেত ধর্ম্ম। সংসারিক কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় রোধ করতঃ সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে গিয়া ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক জীবন যাপন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। সমুদয় মানব যদি সন্ন্যাস আশ্রয় করে তাহা হইলে শতাব্দীমধ্যে মানবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ধরাপৃষ্ঠ হইতে মনুষ্যজাতি উৎসন্ন হইয়া যাউক, ইহা কখনই জগৎকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে। অতএব সন্ন্যাস অপেক্ষা জ্ঞানভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগই জীবন যাপনের উত্তম পথ।

ব্রাহ্মসমাজের মতের সহিত গীতোক্ত ধর্ম্মের অতি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সহিতও বেশ সামঞ্জস্য আছে।

পরমেশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক শুভ হয়—ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজ-মন্ত্রটি আমার বোধ হয় যেন গীতোক্ত ধর্ম্মেরই সংক্ষিপ্ত সার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অদূরভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতি ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজমন্ত্রের অনুবর্ত্তী হইবে।

বৈদিকধর্ম্মে মানুষের জীবনযাপনের জন্য সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ নামক যে দুইটি পথ নির্দ্ধারিত আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগই জীবনযাপনের সর্ব্বো-ত্তম পথ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের মতে ঐ উভয় পন্থার মধ্যে সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতঃ জীবনযাপন করিবার পরিবর্ত্তে পরমেশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনরূপ উপাসনাপূর্ব্বক গার্হস্থ্যা-শ্রমে থাকিয়া জীবনযাপনই শ্রেয় ও মঙ্গলের পথ।

খাসিয়া অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ও

বেজুড়া।
২২।৮।৩১ ইং

ভক্তিভাজন

আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণকমলেষু

মহাত্মন্!

আপনি আমার আধ্যাত্মিক ধর্ম্মগুরু। আপনার আশী-র্ব্বাদে আমি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের গতি এক প্রকার রোধ করিয়াছি। এখন আর পূর্ব্বের মত পার্ব্বত্যজাতীয় লোক খ্রীষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে না। খাসিয়া পাহাড়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায়ের নেতৃত্বে এক প্রকাণ্ড দল গঠিত হইয়াছে।

খাসিয়া পাহাড়ে ক্ষিতীন্দ্রসেবাশ্রম নামকরণ করিয়া একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য খুব চেষ্টা চলি-তেছে। খাসিয়া পাহাড়ের একজন রাজা একটি পাহাড় আশ্রমের জন্য নিষ্কর বন্দোবস্ত দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া-ছেন। আশ্রমের ব্যয়ের জন্য অর্থসংগ্রহেরও উদ্যোগ চলিয়াছে। এবারে অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর, এজন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে না। পশ্চাতে বিস্তারিত জানাইব।

আমি গারো, নাগা, কুকি, লুসাই প্রভৃতি শতাধিক পরিবার আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছি। পাহাড়ে প্রচার বেশ চলিয়াছে। সুরমা উপত্যকার হাকিম, উকীল, ভূম্যধিকারী শ্রেণীর অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ভদ্রলোকও আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন। অর্থাভাব দূর হইলে সভ্যদের তালিকা একটা ছাপাইয়া আপনার নিকট পাঠাইব। বর্ত্তমানে আমাদের এই অঞ্চলে ভয়ানক অর্থাভাব, এজন্য ইচ্ছানু-রূপ কার্য্য করিতে পারিতেছি না। ধান ও পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া গিয়াছে। কৃষকেরা দরিদ্র হওয়ায় ভূম্যধিকারী, উত্তমর্ণ, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ সকলেই অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছে।

* * *

পত্রোত্তরে শ্রীপাদপদ্মের কুশল সম্বলিত আশীর্ব্বাদ পত্র প্রার্থনীয়। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবেন। ইতি

প্রণত

শ্রীপ্রসন্ন কুমার মজুমদার।

গ্রন্থপরিচয়।

বন্ধু আমার।—পরম পূজনীয় ঋষিপ্রতিম শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের "বন্ধু আমার" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ধন্য হইলাম। ইহা পাঠ করিয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটা সুতীব্র জাগরণ আসিল। যথার্থই তিনি বন্ধুকে প্রকৃষ্টরূপে চিনিয়াছেন। মনীষি ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাই তাঁহার হৃদয়ের আবেগভরা উচ্ছ্বাসগুলি অকপটে সেই চিরবন্ধুর চরণে দিয়া প্রাণে অসীম শান্তি লাভ করিয়াছেন। যিনি জগতে আসিয়া চিরসুহৃদকে জানিয়াছেন চিনিয়াছেন, তিনিই এ মরতে অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। এ সংসার-নাট্যশালার অভিনয়ে আসিয়া শুধুই রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় জগতের আনন্দে মুগ্ধ হইয়া আমরা সেই চিরবন্ধুকে ভুলিয়া থাকি। কিন্তু যিনি হৃদয়ের মধ্যে সেই চিরসখাকে দর্শন করিয়া ও প্রকৃষ্টরূপে সেই চিরবন্ধুকে লাভ করিয়া বন্ধুপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ "বন্ধু আমার" লিখিয়াছেন, এবং বন্ধুকে চিরসহচররূপে পাইয়া তাঁহার হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাসগুলি বন্ধুচরণে নিবেদন করিয়া জীবনের সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তিনি ধন্য। আমি তাঁহার "বন্ধু আমার" পড়িতে পড়িতে সময় সময় আত্মহারা হইয়া পড়ি। বন্ধুর মধুর ডাক যেন আমারও প্রাণে সাড়া দেয়। ক্ষিতীন্দ্রবাবু যে অকপটে সেই নিত্যসখার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহার "বন্ধু আমার" পড়িলেই তাহা বোঝা যায়। যে প্রকৃত বন্ধুপ্রেম লাভ করিতে পারে নাই, তাহার এই নিগূঢ় বন্ধুপ্রীতি আসিবে কোথা হইতে? তাঁহার বন্ধুটি যে একেবারে নিখাদ খাঁটি সোনা। তাঁহার সহিত কপটতা চলে না। তাই পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "ভাবের ঘরে চুরি চলে না"। অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি লাভ করিতে গেলে নিজেকে খাঁটি বিশুদ্ধহৃদয় হইতে হইবে। তাঁহার বন্ধুর প্রতি প্রীতিভরা হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাসগুলি যেমন মধুর, তেমনি সরস সরল ও প্রাঞ্জল—অনন্ত ভাবধারাসংমিলিত। তিনি সরল মনে অকপটে হৃদয়ের বন্ধুকে যে প্রাণের উচ্ছ্বাসগুলি নিবেদন করিয়াছেন, তাহা ভক্তহৃদয়ের গোপন ব্যথার অর্ঘ্য। তাঁহার এ প্রীতি-অর্ঘ্য তাঁহার চিরসখা চিরবন্ধু নিশ্চয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক প্রাণের উচ্ছ্বাসটী যেন ভাগীরথী-নির্ঝরের মত পুণ্য-পূত পবিত্র ধারায় মানবহৃদয়কে প্লাবিত করিয়া অশ্রান্ত কলতানে ছুটিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের এই যে গোপন বাণী তিনি নির্জ্জনে একান্তে বসিয়া ভগবচ্চরণে অঞ্জলি দিয়াছেন, সেগুলি যেন পুষ্প-ধূপ-চন্দনের সৌরভে ভরা! তাঁহার এ প্রীতির আবেগ-উচ্ছ্বাসগুলি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের "বন্ধু আমার" বা ভক্তের আত্মনিবেদন আমি মস্তকে রাখিয়া ধন্য হইলাম।

—শ্রীরত্নমালা দেবী।

দেশবিদেশের গল্প।—শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমনোরম গুহ প্রণীত। ঢাকা সন্তোষ লাইব্রেরী হইতে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১০৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ৷৷৵০ আনা।

আঃ বাঁচিলাম! অনেকদিন পরে ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার উপযুক্ত একখানি গ্রন্থ পাইলাম। পাইয়া সমালোচনা করিব, কি আনন্দের আবেগ ধরিয়া রাখিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এই গ্রন্থখানি আমি আমার নয় বৎসর-বয়স্ক দৌহিত্রকে পাঠ করিবার জন্য দিয়াছিলাম। তাহার মন্তব্য অনুসারে লিখিতেছি যে, ইহা হইতে ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য—একাধারে এই তিনটী বিষয়েরই শিক্ষা পাওয়া যায়। ইহাতে অনেকগুলি ছবি দেওয়াতে ইহা ছেলেদের বড়ই উপভোগ্য হইয়াছে। বিষয়গুলি সুনির্ব্বাচিত এবং লিখনভঙ্গী সুন্দর। কেবল বালকেরা কেন, আমার ন্যায় অনেক বৃদ্ধেরাও ইহা হইতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় প্রাপ্ত হইবেন। এই প্রকার গ্রন্থ আরও অধিক প্রকাশিত হইলে এবং সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া তৎসাহায্যে বালকেরা গড়িয়া উঠিলে দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

সংসারধর্ম্ম ও গৃহচিকিৎসা।—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত বিদ্যাভূষণ তত্ত্বনিধি প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা; প্রাপ্তিস্থান আমতলা পোঃ অঃ, ছয়ঘরিয়া জেলা খুলনা।

এই গ্রন্থ পাইয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার পুস্তকের বিজ্ঞাপনে তাঁহার যে মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সংসারের মঙ্গলসাধনরূপ সেই মহৎ উদ্দেশ্য যে অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। বলিতে কি, সংসারী ব্যক্তিগণ এই পুস্তক হইতে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারিবেন। গ্রন্থের এগার পৃষ্ঠাব্যাপী সূচীপত্রে দেখা যায় যে, ৩৭৪টী বিষয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতেই গ্রন্থের বিষয়-বিস্তৃতি উপলব্ধি হইবে। ইহাতে দেহ মন ও আত্মার যাহাতে উন্নতি ও মঙ্গল হয়, তদ্বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যথাসম্ভব দৈহিক রোগের অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও দেশীয় চিকিৎসা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থ ব্যক্তিই এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র।—ডাঃ শ্রীফণীন্দ্র নাথ বসু এম-এ, পি-এইচ, ডি প্রণীত। মূল্য ১।• টাকা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৩ ফর্ম্মা। প্রাপ্তিস্থান বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট।

আমরা যে সকল গ্রন্থ ছেলেমেয়েদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি, "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র" সেই প্রকার গ্রন্থের অন্যতম। গ্রন্থখানি দেখিয়া এবং তাহা আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমাদের যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। আমরা জানিনা যে, এই পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি না; যদি না হইয়া থাকে তবে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। এই গ্রন্থে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মাতৃভক্তি, দেশপ্রেম এবং একনিষ্ঠ সাধনার বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার অনুকরণীয়। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্যনির্দ্দিষ্ট হইলে বালক ও যুবকেরা জীবনের ও বিদ্যাশিক্ষার প্রথমাবধি ঐ সকল গুণে যে অনুপ্রাণিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, গ্রন্থখানি সুকুমারমতি বালকদিগের বুঝিবার উপযুক্ত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আমার সৌভাগ্যবশতঃ, এক সময়ে আমি বিজ্ঞানবিষয়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের শিষ্য হইবার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমি বিশেষভাবে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য সময় নষ্ট করিতেন না—অধ্যাপনা ও পরীক্ষাগারে পরীক্ষণে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন; তাঁহার পরীক্ষণের সাহায্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়সকল বুঝাইবার ক্ষমতা আশ্চর্য্যরূপ ছিল। আলোচ্য গ্রন্থে ইংরাজ অধ্যাপকদিগের সহিত সমান বেতন না পাওয়া পর্য্যন্ত বেতন না লইয়া জগদীশচন্দ্রের যে তেজস্বিতা ও মহত্বপ্রদর্শনের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে দেখা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমরা প্রত্যেক বালকবালিকার হস্তে এই গ্রন্থের একখানি করিয়া দেখিতে পাইব, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

শ্যামলী।—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার।

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে—A gentleman is known by his valet—একটি লোক কি রকম তাহা তাহার চাকরকে দেখিয়া বুঝা যায়। সেইরূপ একটি কবিকে তাঁহার গ্রন্থের প্রচ্ছদপট হইতে কতকটা জানা যায় মনে করি। এই গ্রন্থের নাম শ্যামলী। প্রচ্ছদপটে একটুখানির ভিতর তাহার সুন্দর একটি ছবি দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে কবির ভিতরকার কবিত্বটুকু পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। গ্রন্থকার নিতান্তই তরুণ যুবক। তাঁহার তরুণ হৃদয়ের শ্যামল ভাব প্রত্যেক কবিতাতে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা মনে করি, এই তরুণ কবি এই পথে অগ্রসর হইলে সফলতা লাভ করিবেন।

আদর্শ সূচীশিল্প ১ম ভাগ।—শ্রীসুশীলা দেবী প্রণীত। ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, মেসার্স চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৶• ।

এই পুস্তিকাখানিতে সাড়ী প্রভৃতির উপযোগী অনেকগুলি ফুল ও লতাপাতার চিত্রনমুনা দেওয়া হইয়াছে। এগুলি সূচীশিল্পীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমরা এই পুস্তকখানি সূচীশিল্পে সুনিপুণ এক মহিলাকে দেখিবার জন্য দিয়াছিলাম। তিনি বলেন, যাঁহারা ছবি আঁকিতে জানেন না অথচ সূচীকর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয় এবং ইহা তাঁহাদের একটী বিশেষ অভাব মোচন করিবে। তবে চিত্রগুলির মধ্যে আরও একটু বৈচিত্র্য থাকিলে ভাল হইত। ইহাতে শুধু সুতার কাজ না দিয়া দু'একখানি তারের কাজের চিত্র দিলে সুবিধা হইত। কি কি রং দিয়া সেলাই করিলে কোন্ চিত্রের কোন্ অংশ দেখিতে সুন্দর হইবে, তাহা প্রত্যেক চিত্রের নিম্নে বা পার্শ্বে একটু ইঙ্গিত করিলে প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে একটু সুবিধা হইত। ইংরাজীতে এরূপ নমুনাপুস্তক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু এদেশে বোধ হয় ইহাই প্রথম। এই সূচীশিল্প আমরা কুটীরশিল্পের অন্যতর বলিয়া মনে করি এবং এই পুস্তক এবিষয়ে সাহায্য করিবার খুবই উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মোটামুটিভাবে সূচীশিল্পের প্রণালী যথাসম্ভব সংযুক্ত করিয়া দিলে পুস্তিকাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবন।—শ্রীযুক্ত সুখময় দাসগুপ্ত প্রণীত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী, ৪৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ।৶• ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—স্কুল সাপ্লাই কোং, পটুয়াটুলি—ঢাকা।

গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম দুইটী কারণে। একটী কারণ হইতেছে এই যে, এইরূপ গ্রন্থের আবির্ভাবে বালক-বালিকাদিগের রুচির পরিবর্ত্তনের জন্য লেখক ও প্রকাশকদিগের সাধু ইচ্ছা ও উদ্যোগ প্রকাশ পাইতেছে; এবং দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ হইতে বুঝিতেছি যে, বালকদিগের এইরূপ গ্রন্থ পড়িতে রুচি ও আগ্রহ জন্মিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবন সংক্ষেপে ও সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আমরা কবি Long fellowর সহিত একমতে বলি,—

"মহত চরিত আনে সদাই মোদের প্রাণে,
মোরাও মহত হতে পারি।"

তবে আমাদের একটী বক্তব্য এই যে, বালক-

বালিকার পাঠ্য পুস্তকে মহৎ লোকদিগের জীবনের Nagative side ও কলঙ্কের বিষয় যত অল্প বলা যায়, বরঞ্চ না বলিলেই ভাল হয়…উহাতে বালকদিগের মনে মহৎ জীবনের :আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। তদ্বিপরীতে আমরা বলি যে, ছেলেদের পাঠ্য মহৎ-জীবনীতে মহাপুরুষদের Positive side এবং তাঁহাদের মহত্ত্ব লাভ করিবার নিগূঢ় তত্ত্ব ও উপায়সমূহ প্রকাশ করিলে ছেলেদের বেশী উপকারের সম্ভাবনা। এই আলোচ্য গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধীর মাতৃভক্তির এবং ভগবদ্-ভক্তির যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের বড়ই মনোরম লাগিল।

শ্রুতিস্মৃতি।—স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, বি. ই. এম. আর. এ. এস বিরচিত। মূল্য দশ আনা। প্রকাশক শ্রীঅবনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। ৫০নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্.—কলিকাতা।

গ্রন্থকার আমার পরম বন্ধুগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অতি অল্পকালের পরিচয়েই তিনি তাঁহার অকৃত্রিম অমায়িকতা ও সৌহৃদ্যগুণে আমার মন সহজেই হরণ করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে, বোধ হয় ৪৫ বৎসরে, তিনি যে ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তির একটি ফটোগ্রাফ দেওয়া হইয়াছে। তাহা দেখিয়া আজ অনেক-দিন পরে আমার বন্ধুবিয়োগজনিত শোক আবার উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি "শ্রুতিস্মৃতি" যখন লিখিতেছিলেন, তখন আমাকে জানাইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর আমি সেই লেখাগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সক্ষম হই নাই। আজ তাঁহার পুত্র সেইগুলি অল্পে অল্পে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। এই সকল শ্রুতিস্মৃতি হইতে নব্য বঙ্গের ইতিহাস-রচয়িতাগণ অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীমান অবনীমোহনকে অবশিষ্ট অংশগুলি যথাসম্ভব প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।

শিক্ষায় মুক্তি।—শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক—বালী বঙ্গশিশু-বিদ্যালয়।

ইহাতে ভাবিবার অনেক কথা আছে। আমাদের মনে হয় ভগবানকে কেন্দ্রে রাখিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিলেই শিক্ষায় মুক্তিলাভ সহজ হইবে।

[দ্রষ্টব্য—স্থানাভাবে অনেকগুলি পুস্তকের সমালোচনা এসংখ্যায় প্রকাশিত হইতে পারিল না। আশা করি, পুস্তকদাতাগণ বিলম্বে সমালোচনা প্রকাশের জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।]

পত্রিকাপরিচয়।

THE MESSAGE—এই পত্রখানি গোরখপুর হইতে মাসে মাসে প্রকাশিত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র—এমন কি, সুদূর পাশ্চাত্য ভূমিতেও ভারতের ব্রহ্মবাদের সুগন্ধ বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহা সদানন্দ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়ের ভক্তি ও নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি অতি সামান্যভাবে ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন ইহা পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া সংসারের পাপতাপদগ্ধ জনসাধারণকে ছায়া ও সুস্বাদু ফলদানে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আমরা ইহার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করি-তেছি। এই পত্রখানি কোনও সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ নহে। ইহাতে নিরপেক্ষভাবে সকল ধর্ম্মেরই মতামত আলোচিত হয়। প্রতি মাসে ইহার প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত সত্যধর্ম্ম ও তদনুকূল দর্শন, বিজ্ঞান ও নীতি-বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে বিভূষিত থাকে। ইহার মূল্যও যৎসামান্য—বাৎসরিক ১৲ টাকা মাত্র। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ইংরাজী মাসিক পত্রিকা যে এত স্বল্প মূল্যে বিতরিত হইতে পারে, তাহা আমাদের :জ্ঞানগোচর ছিল না। আমরা ভারতের গৃহে গৃহে ইহার সবল ও প্রাণপ্রদ বাণী প্রচার কামনা করি। ভগবান কালী-প্রসন্ন বাবুকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত রাখুন।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১—এই সংখ্যা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রভৃ-তিতে পূর্ণ। কোন্ প্রবন্ধটী ছাড়িয়া কোন্ প্রবন্ধের উল্লেখ করিব, তাহা বুঝিয়া উঠি না। স্বামী রামদাস কর্ত্তৃক লিখিত Religious To leration বা 'ধর্ম্মে উদারতা' প্রবন্ধ বড়ই সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহা খাটি সত্য কথায় পূর্ণ। শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের লিখিত The Religion of God Vision বা 'ভগবদ্ দৃষ্টিমূলক ধর্ম্ম' প্রবন্ধ ধর্ম্ম-প্রাণ প্রবীণ লেখকের ভাবুকতায় মাখা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিত The Gita and the Gos-pel in the Present day বা বর্ত্তমান যুগের 'গীতা ও বাইবেলের তুলনাত্মক আলোচনা' পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুলিখিত। সন্ন্যাসী জ্ঞানানন্দ লিখিত The Dancing Siva বা 'শিবতাণ্ডব' কবিতাটী আমাদের বড়ই মিষ্ট লাগিল। শ্রীযুক্ত টি, এল ভাসওয়ানি লিখিত The vision of the Rishis বা 'ঋষিদিগের দৃষ্টি' উচ্চাঙ্গের ভাবুকতায় মাখা গদ্য-পদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, এই পত্রিকাখানি কিরূপ উদারভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং কিরূপ উচ্চাঙ্গের লেখকদিগের সহায়তা লাভ করিয়াছে।

রাষ্ট্রবাণী—৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৮ সাল। এই সংখ্যায় মহাত্মা গান্ধীর লিখিত "আত্মসংযম বনাম স্বেচ্ছাচার" প্রবন্ধের অষ্টম কিস্তি বাহির হইল। বিষয়টি জন্মনিরোধসম্বন্ধীয়। আমাদের বহু শতাব্দীগত দাসমনোভাবের কারণে এ বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্য জাতির মনোবৃত্তির অনুসরণে ধাবিত হইয়া অধিক হইতে অধিকতর দুর্নীতির পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইতেছি। এই কারণে ইহার কতকটা খোলাখুলি আলোচনা আবশ্যক হইলেও আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে এবং আমরা ইহা ইচ্ছা করি না। যাঁহারা এবিষয়ে বেশী খোলাখুলি আলোচনা করেন, আমরা দেখিয়াছি, অনেক স্থলেই তাঁহাদের সেই আলোচনা ভাল অপেক্ষা মন্দ ফলই অধিকতর প্রসব করে। আমরা বুঝিতে পারি না যে পাঠকেরা কি প্রকারে ধৈর্য্য ধরিয়া এই সকল আলোচনা অনায়াসেই গলাধঃকরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর আমাকে এক চিকিৎসক বন্ধু Social Science নামক একখানি গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। তাহার প্রথমেই আমার মনে পড়ে জন্মনিরোধের অনুরূপ বিষয়সকল লিখিত ছিল। তাহা পড়িয়া এতই গা-বমি করিয়াছিল যে, আমি আর উহার পাঠে অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু এখন বালক যুবক বৃদ্ধ—এমন কি, বালিকা ও মহিলা সকলেরই মন এই পূতিগন্ধময় বিষয়ে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে যে, এই সকল বিষয়ে নরনারী অবাধে আলোচনা করিতে কুণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়াছে দেখা যায়। পাশ্চাত্য প্রণালীতে জন্মনিরোধের ব্যবস্থা যে নিতান্তই পাপের কারণ, তাহা বলিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা করিব না। ইহার সমর্থনে পণ্ডিতেরা যাহাই কেন বলুন না, অনেক বড় বড় চিকিৎসকেরা প্রমাণাদি সহকারে দেখাইয়াছেন যে, ইহার ফলে পুরুষ ও রমণী উভয়েরই দেহ ও মন সর্ব্বতোভাবে ধ্বংসের অভিমুখে ধাবিত হয়। পাশ্চাত্য প্রণালীর পরিবর্ত্তে এদেশবাসীগণ যদি দাসমনোভাবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া দেশের ছেলেমেয়েদিগকে শাস্ত্রভক্তি সদাচারসমূহের উপর দাঁড়াইবার উপদেশ দেন ও সেই পথে শৈশবাবধি পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে আমরা দৃঢ়তাসহকারে বলিব জন্মনিরোধ নিয়মিত হইবার সঙ্গে দেহ ও মন সবল থাকিবে। তাহা হইলে এখনকার ন্যায় চলিবার পথে প্রতি পদে চসমাধারী ও কুব্জদেহ বালক বৃদ্ধ ছেলেমেয়ে দেখিতে হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর উক্তির শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি—"অব্যবস্থিতচিত্ততা; কঠিন এবং যে কাজে লাগিয়া থাকিতে হয় সে কাজে অনাসক্তি, শ্রমসাধ্য কাজে অক্ষমতা; উৎকৃষ্ট আরম্ভেই বর্জ্জন, মৌলিকতার অভাব—আমাদের ভিতর সাধারণতঃ দেখা যায়, ইহাদের বেশীর ভাগই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরিচালনার ফল। আমি আশা করি যুবকেরা একথা বলিয়া কখন আত্মপ্রবঞ্চনা করিবে না যে, সন্তান যদি উৎপন্ন না হয় তবে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়পরিচালনায় কিছুই যায় আসে না—তাহা দেহকে দুর্ব্বল করে না। বস্তুতঃ দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া মানুষ যখন যৌন সঙ্গ করে, তখন যে শক্তি ক্ষয় হয়, তার চেয়ে ঢের শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে যখন জন্মনিরোধের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়পরিচালনায় নিরত হয়।" এই বিষয়ে ভারতীয় ঋষিমুনিদের সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই—"জীবনং বিন্দুধারণাৎ মরণং বিন্দুপাতনাৎ"।

মুকুল—ভাদ্রসংখ্যা, ১৩৩৮ সাল। সম্পাদিকা শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ, ২৯৪নং দরগা-রোড, পোঃ পার্ক সার্কাস। বার্ষিক মূল্য মায় মাশুল ২।৵০

রামধনু—ভাদ্র সংখ্যা ১৩৩৮ সাল, ১৬নং টাউনসেণ্ড রোড হইতে সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল ২৷৵০

আমরা যে কয়েকখানি বালকবালিকার পাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হই, তন্মধ্যে 'মুকুল' একটি অপরটী 'রামধনু' উভয় পত্রেই বালকবালিকাদের সুখপাঠ্য প্রবন্ধ ও কবিতা থাকে! আমরা ছেলেমেয়েদিগকে এই দুইখানি পত্রের প্রতীক্ষায় উন্মুখ থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মানবচরিত্র যাহার দ্বারা সুগঠিত হইয়া উঠে, এরূপ মহাপুরুষ-জীবনী ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ খুব সহজ ভাষায় লিখিত হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে থাকলে ভাল হয়। তারপর যে বিজ্ঞানের আলোচনায় বালকের মনে জ্ঞান ফুটিয়া উঠিতে পারে, সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অধিকতর স্থান পাইলে আমরা সুখী হই। আমরা এই সকল বালকপাঠ্য মাসিকপত্রের সাহায্যে দেশের ছেলেমেয়েদিগকে জ্ঞানে ও বিদ্যায়, চরিত্রে ও সদ্ভাবে গড়িয়া উঠিতে দেখিবার আশা করি।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। দ্বিপল্লী।—ভাদ্র মাস, ১৩৩৮ সাল; ২০নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

এই পত্রিকা দুই একমাসের মধ্যেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আয়ুর্ব্বেদের পরিভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধটী বড়ই ভাল লাগিল, বিজ্ঞানালোচনার প্রাণ হইল পরিভাষা, পরিভাষা যত নিখুঁত হইবে, বিজ্ঞানও তত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিবে, লেখক ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধে নার্ভ শব্দ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে,

নার্ভ অর্থে স্নায়ু করা উচিত নয়; কিন্তু কি করা উচিত সেইটী দেখাইলে ভাল হইত। আমরা অনুরোধ করি, তিনি প্রবীণ কবিরাজদিগের সহযোগে একটা সম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা প্রস্তুত করিয়া এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকুন। ইহাতে চিকিৎসাসাহিত্যের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধিত হইবে, তাহা এক মুখে বলা অসম্ভব।

ইহার সম্পাদনভার শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ও শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের সুযোগ্য হস্তেই পড়িয়াছে। ইঁহাদের অনেক সুলিখিত প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে আমরা বহু সাময়িক পত্রে পাঠ করিয়া আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধে তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি। আমরা ইহার উত্তরোত্তর উন্নতির কামনা করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহা এদেশবাসী গৃহস্থের খুবই উপকারে আসিবে।

সঙ্গীতবিজ্ঞানপ্রবেশিকা—৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ ১৩৩৮ সাল। ৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ৩।০ আনা।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস মহাশয়ের পরিচালনে ইহা অষ্টম বর্ষে চলিতেছে দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। বলা বাহুল্য, ইহা আমাদের হস্তে পড়িলে সমস্তটাই সাগ্রহে পাঠ করি। সঙ্গীতের প্রতি সাধারণের বিশেষ আগ্রহ না জন্মিলে এই দুঃবদুর্দ্দিনের যুগেও কেবল সঙ্গীতবিষয়ক একখানি পত্রিকার এরূপ সুন্দরভাবে পরিচালন অসম্ভব হইত। আলোচ্য সংখ্যায় "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" নামক সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধে সুযোগ্য লেখক শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন যে, "তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই হইয়াছে"। আমরা তানসেনের দুইখানি জীবনীপুস্তক বাল্যকালে দেখিয়াছি, তন্মধ্যে একখানির নাম মনে পড়ে "সঙ্গীত তানসেন"। এই গ্রন্থখানি সুলিখিত এবং তালমান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ বলিয়াই স্মরণ হইতেছে। লেখক ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকট এই গ্রন্থ থাকা নিতান্তই সম্ভব। তিনি যদি উহা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এবং তাহার সঙ্গে যতদূর সম্ভব তানসেনের গানগুলি সংযোজিত করিয়া সুলভ মূল্যে প্রকাশ করেন, তবে সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিগণের মহদুপকার সাধিত হইবে। "সঙ্গীতযন্ত্র ও অরকেষ্ট্রায় তাহার ব্যবহার" প্রবন্ধে অনেক যন্ত্রের নাম করা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি Band এর অরকেষ্ট্রারই উপযোগী; কিন্তু যে অরকেষ্ট্রায় সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র বাজান যাইতে পারে, সেই অরকেষ্ট্রা ও তদুপযোগী যন্ত্রাদির নাম উল্লিখিত হয় নাই।

স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবনী তাঁহার স্বদেশবাসী সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান রমেশচন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত। উক্ত গায়কপ্রবর "যদুভট্ট" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রমেশবাবুর লিখিত জীবনীর মধ্যে যোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সহিত যদুভট্টের যে যোগ ছিল, তাহার বলিতে গেলে কোনই উল্লেখ নাই। আমার মনে পড়ে, বাল্যকালে, তখন আমার বয়স ৮।৯ বৎসর হইবে, যদুভট্টের নামে আমাদের পরিবারের সকলকেই মুগ্ধ হইতে দেখিতাম। যদুভট্ট আসিয়াছেন এবং তিনি গান করিবেন ইহাতে বাড়ীশুদ্ধ একটা সাড়া পড়িয়া যাইত। তিনি শুধু সঙ্গীতে গুরুকল্প ছিলেন না, কিন্তু বীণ প্রভৃতি বাদনেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, বাড়ীর সকল লোক তাঁহার বীণ ও সেতার বাদন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া মুগ্ধকর্ণে শ্রবণ করিতেন।

আমার পিতৃদেব গুণীর সমাদর করিতে জানিতেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়া যদুভট্টকে সমাজের গায়কের পদে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে আমার মাতৃদেবীকে পৃথক্‌ভাবে সঙ্গীতাদি শিক্ষা দিবার জন্যও তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রমেশ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই ঠিক যে, তিনি অধিককাল একস্থানে থাকিতে পারিতেন না। আমাদের বাড়ীতেও থাকিবার কালে দুই দুইবার চলিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ তাহা তাঁহার ত্রিপুরায় যাইবার পূর্ব্বে। আমরা রমেশ বাবুকে অনুরোধ করি যে, যদুভট্টের ন্যায় সঙ্গীত সম্বন্ধে সিদ্ধ পুরুষের একটি বিস্তৃত জীবনী লিখিতে হস্তক্ষেপ করুন। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত "ব্রহ্মসঙ্গীতের" অনেকগুলি গান তাঁহার দেওয়া সুর হইতে ভাঙ্গা। সর্ব্বশেষে কৃষ্ণকিশোর বাবুর নিকট আমাদের এই অনুরোধ, হালকা বা ভারী যে তালেরই হউক এমন সুর ও গান স্বরলিপিসহ প্রকাশ করুন, যেগুলি ঘরে পরিবারের সকলে মিলিয়া গাহিয়া ছেলেমেয়ে এবং বাটীর কর্ত্তৃপক্ষ সকলেরই মনপ্রাণ ঊর্দ্ধমুখে অগ্রসর হয়।

ইহার ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। দেশের মহাপুরুষদিগের জীবনী যতই প্রকাশিত হইতে থাকিবে, দেশ ততই উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইবে। মিথ্যা ঐতিহাসিকদিগের ইতিহাস পড়িয়া আমরা অনেক আদর্শ হারাইয়াছি। গবেষণা করিয়া যাঁহারা সেই আদর্শ পুনরুদ্ধার করিয়া দেশের ছেলেমেয়েদের সম্মুখে ধারণ করিবেন, তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।—আমরা বিগত দুই সংখ্যা ধর্ম্মতত্ত্বে দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে আলোচনার জন্য গিরিডি-নিবাসী ডাঃ ভি, রায় অনেকগুলি প্রশ্ন এবং তৎসঙ্গেই তাঁহার বিবেচনা মত সেই সকল প্রশ্নের উত্তরও লিখিয়া দিয়াছেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে কতকগুলি একটু লঘুভাবের হইলেও অধিকাংশই practical অর্থাৎ সাধারণতঃ মানুষের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন উদয় হইতে পারে, সেই সমস্ত প্রশ্ন লিখিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই সকল প্রশ্নোত্তর দ্বারা ব্রাহ্মসাধারণ উপকৃত হইবেন।

ব্যবসাবাণিজ্য।—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক ৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৫।৵০ মাত্র। ইহাতে ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষতঃ বীমাতত্ত্ববিষয়ে অনেকগুলি ভাল প্রবন্ধ আছে। আমরা কিন্তু চাই যে, practically কিভাবে ব্যবসাবাণিজ্যে হাত দিয়া দেশের ঋদ্ধি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, এইরূপ প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রকাশ করা। ইহাতে পরীক্ষিত ফরমূলা দিয়া ইহার উপকারিতা বিশেষ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

গৃহস্থমঙ্গল।—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-সংখ্যা। ৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

আমরা সম্প্রতি গৃহস্থ মঙ্গল একত্র প্রকাশিত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-সংখ্যা পাইলাম। বোধ হয় বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের আঘাত ইহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। যদি আঘাত লাগিয়া থাকে, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। এরূপ একখানি পত্র বর্ত্তমান দুর্দ্দিনেরই উপযোগী। ইহার সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ "বাজে খরচ" প্রথম স্থান পাইবার উপযোগী। ইহাতে সত্যই অনেক সারকথা লিখিত হইয়াছে। বিলাতী নকল-নবিসী করিবার ফলে আমাদের দেহ-মন যে অচিরে জরাজীর্ণ হয়, পুস্তকাদিতে ও নিজেদের অভিজ্ঞতায় প্রতিপদে তাহার সাক্ষ্য পাইলেও আমরা সহজে ছাড়িতে পারি না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার বাল্যকালে মুখ-হাত ধুইয়া প্রাতঃকালের আহার ছিল—ডিম, রুটী চায়ের পরিবর্ত্তে একধামা মুড়ি-মুড়কি; তিনি উহা ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে শেষ করিতেন। এইরূপ আহারাদির ফলে তাঁহার কখনও অম্বলের ব্যাম হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। বিলাসব্যসন দেশের যুবকদিগকে কিরূপ অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিই। এক আফিসে ১০৲ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী একদিন বিলাতী বার্ণিশ জুতা ও বিলাতী ফুলদারী মোজা পরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে যখন বলা হইল যে, আফিসের বড় সাহেব এরূপ দেখিলে বলিবেন যে, তিনি খুব প্রবল করেন এবং তাঁহার কর্ম্ম থাকা কঠিন হইবে। তখন তিনি পরদিন অবধি আর উহা পরিয়া আফিসে আসিতেন না। প্রবন্ধের প্রত্যেক কথাটি খাঁটি সত্য। আমরা উহা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। আলোচ্য সংখ্যায় টোট্‌কা-চিকিৎসামূলক প্রবন্ধের ভাগ একটু বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ প্রবন্ধ যে থাকিবে না, তাহা বলি না; কিন্তু গৃহস্থের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধক প্রবন্ধের অংশ আর একটু বেশী থাকিলে আমরা সুখী হইব। মেঘ ও বৃষ্টির বিচারবিষয়ক একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব ঠিকই লিখিয়াছেন যে, বর্ষবিচার-শাস্ত্র অবলম্বনে আমরা বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি যে, অন্তত উড়িষ্যা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতবিষয়ক বিচার কৃষকদিগকে বিশেষ সাহায্য করে।

ইণ্ডাষ্ট্রী—২২ নং আর, জি. কর রোড। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

দেখিয়া সুখী হইলাম যে, ইণ্ডাষ্ট্রী পত্রের সম্পাদক মহাশয় কৃতিত্বের সহিত একইভাবে চালাইয়া আসিতেছেন, এদেশের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পত্রিকা বিশেষ আবশ্যক হইলেও উপন্যাসপাঠাদির দ্বারা বিকৃতমস্তিষ্ক যুবকগণের মন আকর্ষণ করিতে পারা বড় সহজ কার্য্য নহে। এই কারণে আমরা অবসর পাইলেই এই পত্রের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বিরত হইব না। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, এই পত্রখানি ভারতের গৃহে গৃহে রাখিলে দেশের প্রকৃতই মঙ্গল সাধিত হইবে। সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের একটী অনুরোধ এই যে, তাঁহার ন্যায় ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন মনীষী ব্যক্তি কেবল পত্র পরিচালনের দ্বারা নহে, কিন্তু পাঁচজনকে লইয়া একটী যৌথ কারবার খুলিয়া এবং পরে তাহাকে বহুবিভাগে বিস্তৃত করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করুন। আজকাল কাজের কথা, Scientific India, ব্যবসা ও বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি অনেকগুলি মাসিক পত্র শ্রীবৃদ্ধিকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, অন্ততঃ এই সকল পত্রের সম্পাদকগণকে একত্র করিয়া একটি বিস্তৃত যৌথকারবার খোলা নিতান্ত অসম্ভব হইবে না, বরঞ্চ খুবই সম্ভবপর।

কাজের কথা।—বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। গোপালভবন, বেহালায় প্রাপ্তব্য।

আমরা কাজের কথায় ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে ইহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যাই হোক, আমরা ইহার শুভ কামনা করিতেছি। কিন্তু আমাদের দু'একটী বক্তব্য আছে, বর্ত্তমানে দেশে

"Times are out of joint" এসময় আমরা "কাজের কথায়" কেবল কাজের কথাই দেখিতে চাই—উপন্যাসী ধরণের ছেলেদের মন ভুলান কোন কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করি না। যাহাতে দেহ সবল হয়, মন শক্তিসম্পন্ন হয়, এবং আত্মা ভগবানের তেজঃকণা লাভ করিয়া সতেজ হইয়া উঠে, এরূপ প্রবন্ধ ও বিষয়সকল কাজের কথায় স্থান পাইতেছে দেখিলেই আমরা সুখী হইব।

ভারতবর্ষ—১৩৩৮ সাল, ভাদ্র। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার লিখিত "পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ" প্রবন্ধটী আমাদের বড় ভাল লাগিল। অধ্যাপক মোক্ষমুলার একস্থলে বলিয়াছেন যে, যে জাতি নিজের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হয়, সে জাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। ভারতের চতুর্দ্দিকে তাহার প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণসমূহ যেরূপ ত্বরিতগতিতে আবিষ্কৃত হইতেছে এবং সেই সকল উপকরণে অক্ষয় অক্ষরে খোদিত প্রাচীন ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী ভারতের শ্রদ্ধাগুলি যেভাবে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাতে আমাদের নিঃসংশয়ে প্রতীতি হয় যে, উন্নতির উন্নততম শিখরে ভারতের পুনরধিরোহণ ভগবানের মঙ্গলবিধানে অদূরবর্ত্তী। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, চন্দননগরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় আজ কিছুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে "কলিকাতার পুরাতন কাহিনী" ধারাবাহিকক্রমে সচিত্র প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল কাহিনী কেবল কৌতূহল নিবৃত্তি করে না, কিন্তু ইহার অন্তর্নিবিষ্ট অনেক বিষয় আজকালকার পক্ষে শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে করি।

প্রবর্ত্তক।—ভাদ্র ১৩৩৮ সাল। "উপাসনা মন্দিরে" নামক প্রবন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকট বড়ই সত্য বলিয়া লাগিল। ইহা বড়ই সত্য কথা যে, ধর্ম্ম যদি আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে বিজয়দান না করে, তবে মানুষ পরাজয়লাভের জন্য ধর্ম্মকে ধরিতে যাইবে কেন? আমরা খুব দৃঢ়তাসহকারে বলিতে পারি ও বলিতে চাই যে, ধর্ম্ম কেবল থিওরি হিসাবে ধরিয়া রাখিবার বস্তু নয়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রেও আমাদের উন্নতি ও মঙ্গলসাধনে Practical সহায়রূপে ধরিয়া রাখিবার বস্তু। এই তথ্যটী আজ কয়েকমাস পূর্ব্বে বিশদরূপে বুঝাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, প্রবর্ত্তকসম্পাদক মহাশয় উপাসকদিগের অন্তরে এই সত্য ভাবটী মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। "বৈদিক যুগে" প্রবন্ধে স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি বেদোক্ত অনেক কথা, পুরাণোক্ত কথার সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়া পুরাকাল সম্বন্ধীয় ইতিহাসরচয়িতাগণের গবেষণার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। "আয়ুর্ব্বেদ" প্রবন্ধে ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভিষগাচার্য্য মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় অনেক প্রাচীন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা মিষ্ট হইলেও এই তথ্যের স্বল্পমাত্র পরিবেশনে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। আমাদের অনুরোধ, ভিষগাচার্য্য মহাশয় পাশ্চাত্য ও আয়ুর্ব্বেদীয় উভয়বিধ চিকিৎসার তুলনাত্মক প্রবন্ধ লিখিয়া কোন্ বিষয়ে কোন্ চিকিৎসা শ্রেয়ঃকল্প তাহা যেন প্রদর্শন করেন।

কল্যাণী।—১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা। ১৩৩৮ সাল। ২০৭নং আপার সারকুলার রোড হইতে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র সেন এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক মহাশয় প্রথম সংখ্যা হইতেই ভারতে বস্ত্রসমস্যা আলোচনা করিয়া বড়ই ভাল করিয়াছেন। বস্ত্রসমস্যার সমাধানই ভারতের কল্যাণের সর্ব্বোত্তম পথ প্রদর্শন করিবে বলা যাইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধেরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন ৺রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত "The Economic History of British India" অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতেছিলাম, তখন আমারও অন্তরে এই সত্যই সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল, যে বস্ত্রসমস্যার সমাধানেই আমাদের প্রকৃত স্বরাজলাভের সম্ভাবনা, এবং এই সমাধানের কেন্দ্রমন্ত্র হইতেছে চরকায় সূতা কাটা, এবং সেই সূতা হইতে বস্ত্র বয়ন করিয়া ব্যবহার করা। আজ ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন কটকে প্রথম গমন করি তখন সেখানে সাধারণত দরিদ্র-ধনীনির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে এই প্রকার পরিধেয় প্রচলিত দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। তখন মটরগাড়ী ও লরী প্রভৃতির কোনই উৎপাত ছিল না—কিন্তু এখন সেই উৎপাত সুদূর পল্লীগ্রাম অধিকার করায় পল্লীবাসীরা ঐরূপ "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করে। চরকার সূতায় প্রস্তুত বস্ত্র বিস্তৃতভাবে প্রচলিত করিতে গেলে আমাদের কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রকৃতই এখন যেরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা আরও অনেক পাতলা না হইলে পরিবার ও কাচিবার বড়ই অসুবিধা হয় বলিয়া অনেকে উহা ক্রয় করেন না। উহার মসৃণতা খুব কম বলিয়া উহাতে অনেক ধূলা জমিয়া যায়। দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কিনিবার পথে খুব বড় বাধা এই যে, ইহা ধোপারবাড়ী দিলে বড়ই শীঘ্র ফাঁসিয়া যায়। আর একটী কথা এই, চরকায় সূতা কাটা হইলেও তাহা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিবার উপযুক্ত স্থান ও সুবিধা সহজে পাওয়া

যায় না। আমরা খদ্দরের পক্ষপাতী। অনেকের কাছে শুনিয়াছি যে, ঐরূপ সুবিধার অভাব উহার বিস্তৃত প্রচলনের পথে আর একটি গুরুতর বাধা। কি অর্থনৈতিক কি রাষ্ট্রনৈতিক ভারতের অনেকবিধ সঙ্কট দূরীকরণে খদ্দরের ক্ষমতা আজ বোধ হয় কোন ভারতবাসী অস্বীকার করিবেন না।

সংবাদ।

শ্রীভগবৎকথা।—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের "শ্রীভগবৎকথা" আসামী ভাষায় ও তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ইহার বঙ্গভাষায় তিনটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গ্রন্থখানি সাধনপিপাসু জনসাধারণের অনুরাগ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধলেশ-বর্জ্জিত। এজন্য আমরা অনুরোধ করিতে দ্বিধা করি না যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যেন এই গ্রন্থকে বালকগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দেশ করেন। কোন ছাত্র বা ছাত্রী আবেদন করিলে, তাঁহাকে এই পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ ।• আনায় দেওয়া হইবে। তেলেগু সংস্করণের অনুবাদক শ্রীযুক্ত নরসিংহম্ রাও গণ্টুরের "জ্ঞানসাধনী" পত্রিকার সম্পাদক। সুতরাং আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, অনুবাদটী নির্ভুল ও সুন্দর হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিবে বলিয়া আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বঙ্গনারী-শিক্ষাসঙ্ঘের সঙ্গীত-জলসা।—গত ১লা আগষ্ট শনিবার বঙ্গনারী-শিক্ষা-সঙ্ঘের (Bengal Womens Education League) তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতভারতী ডাঃ শ্রীবাণী দেবী D. Mus. "রাগ-রাগিণী—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসঙ্গীতে" সম্বন্ধে একটী উপভোগ্য বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সভাস্থলে প্রায় চারি শত মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। সভায় সঙ্গীত-জলসার বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। একটি অনুপম কনসার্ট বাদিত হইয়াছিল। (উহার স্বরলিপি বর্ত্তমান সংখ্যার পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হইল)। সভাটী সর্ব্বদিক দিয়া সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছিল।

—সঙ্গীতবিজ্ঞানপ্রবেশিকা—ভাদ্র ১৩৩৮ সাল।

কলিকাতা মাদকবর্জ্জন সঙ্ঘ।—গত ২৭শে ভাদ্র রবিবার ২২নং সেণ্ট জেম্স্ লেনস্থ শান্তি ইন্ষ্টিটিউটের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতা মাদক-বর্জ্জন সঙ্ঘের (Calcutta Temperance Fedaration) এক অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শান্তি ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিত "সুরাপানের নিষেধবিধি" নামক একটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পুস্তিকাকারে উহা বিতরিত হয়। সভাস্থলে প্রায় দুই শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভা অন্তে শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মৈত্র মহাশয় আলোক-চিত্রে সুরাপানের পরিণামবিষয়ে একটি পারিবারিক-চিত্র দেখাইয়া সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

নামকরণ।—গত ২৭শে ভাদ্র রবিবার পূর্ব্বাহ্নে ডাঃ শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নবকুমারীর অন্নপ্রাশন ও নামকরণ তদীয় গড়পার-রোডস্থিত বাসভবনে উপাসনাদি পূর্ব্বক যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। নবকুমারীর নাম গীতাঞ্জলি রাখা হইয়াছে। ভগবান নবকুমারীকে দেহে মনে ও আত্মাতে আশিষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করুন।

ওঁ তৎসৎ

রাগিণী—তাল

মিশ্র ঝিঁঝিট—ঠুংরি

ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী-কৃত

স্বরসম্বাদ-সহ

বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সঙ্ঘের

(Bengal Women's Education League)

তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতসভা কার্য্যতালিকা।

PART I.

Piano (Duet)—Sm. Gargi Mookerji and Sm. Bani Chatterji.

Dhrupad—Arhana Chautal—Sangit Nayak Gopeshwar Benerji.

Violin (Duet)—Bech—Mons. Ph. Sandre D. Mus. and Sm. Bani Chatterji.

Sarode—Brindabani Sarang—Kaoali—Sj. Rajendra Narayan Sen-Gupta.

Lecture—Rag-Raginis in Indian and Western Music—Sm. Bani Chatterji D. Mus.

জাগো সবে জাগো—Loom—Patatal—(British Grenadiers সুর)—
Master Amritamaya Mookerji

Go where glory waits thee—(মরি ও কাহার বাছা সুর—Misra Jhinjhit—Kaoali)
Mrs. K. K. Chatterji.

PART II.

Violin (Solo)—Paganini—Dr. Ph. Sandrê.

Thumri (Song)—Khumbaj—Tetala—Sj. Romesh Ch. Banerji,

Sitar (Solo) Piloo-Baroan—Kaoali—Sj. A. B. Adhikari.

Orchestra—Ragini Misra Jhinjhit—Tal Thumri—Sm Bani Chatterji. D. Mus.
Mrs. A. Mookerji, Mrs. J. M. Bir, Mrs. J. M. Sen.
Miss. S. Sen and Misses Sen.
Messrs. J. M. Bir, A. B. Adhikari, S. K. Ghose, F. N. Banerji,
R. N. Sen Gupta, A. C. Banerji, S. N. Sen. K. N. Mitter.

Price One Anna.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। পিয়ানোর (অভাবে ভাল অর্গ্যান হারমোনিয়মের) রেখাবকে ষড়জ করিয়া সেতার, এস্রাজ, তানপুরা, বাঁয়া তবলা ও বেহালার সুর বাঁধিতে হইবে।

২। পিয়ানোর ধৈবতকে ষড়জ করিয়া স্বরদের সুর বাঁধিতে হইবে।

৩। এই গৎটি বাজাইবার জন্য নিম্নমত বাদ্যযন্ত্রগুলির আবশ্যক—

এসরাজের ২টি পাঠ বাজাইবার জন্য ২টি এস্রাজ
" ঐ ২টি " " ২টি বেহালা
" ১ম " উচ্চ সপ্তকে বাজাইবার জন্য ১টি বেহালা
সেতারের ৩টি " " " ৩টি সেতার
স্বরদের ১টি " " " ১টি স্বরদ

পিয়ানো ১টি (অভাবে ১টি ভাল অর্গ্যান-হারমোনিয়ম)
সঙ্গতের জন্য তানপুরা, বাঁয়া তবলা এবং মন্দিরা (বা ঐজাতীয় বাদ্যযন্ত্র) আবশ্যক।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই গৎটি ভালরূপে বাজাইবার জন্য মোট ১৩টি বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন।

অভাবপক্ষে ২টি এস্রাজ (এস্রাজের ১ম ও ২য় পাঠ বাজাইবার জন্য)
২টি সেতার (সেতারের " ও " " " ")
১টি তানপুরা, বাঁয়া তবলা ও মন্দিরা হইলেই চলিবে।

৪। সেতারের পাঠে প্রত্যেক হাইফেন-যুক্ত আকার (যথা "-া") চিহ্নের জন্য একটি ঝঙ্কার দিতে হইবে। অতএব যেখানে ঐরূপ ১টি হাইফেন-যুক্ত আকার আছে (যথা "-া") সেখানে ১টি ঝঙ্কার দিতে হইবে। যেখানে ঐরূপ ২টি হাইফেন-যুক্ত আকার আছে (যথা "-া -া") সেখানে ২টি ঝঙ্কার দিতে হইবে। ইত্যাদি

৫। যেখানে হাইফেন-বর্জ্জিত আকার (যথা "া") চিহ্ন যতগুলি থাকিবে, সেই কয় মাত্রা বিশ্রাম দিতে হইবে।

৬। অতি সতর্কতার সহিত মাত্রা ও তালের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা জানা কথা যে অনেকের একসঙ্গে কোন গৎ বাজাইতে হইলে তাল ও মাত্রার অতি সামান্যমাত্রও এদিক ওদিক হইলে শ্রুতিকটু হয়।

৭। এই গৎটিতে ৬০টি "ঘর" বা bar আছে এবং প্রতি ৪র্থ ঘরের শীর্ষদেশে যথাযুক্ত সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রারম্ভের প্রথম ২টি ঘরে (১ ও ২নং ঘর) কেবল পিয়ানো, তানপুরা, মন্দিরা ও বাঁয়া-তবলা বাজিবে। পিয়ানোর অভাবে শেষ কয়টি যন্ত্র বাজিবে। অন্যান্য যন্ত্রগুলি ঐ ২টি "ঘর" বা তালনির্দ্দেশক সময় বিশ্রাম লইবে—বাজিবে না।

৮। সমগ্র গৎটি অন্যূন ২ বার বাজাইতে হইবে। শেষ করিয়া পুনরায় ধরিবার সময় "II" চিহ্নিত স্থলে আরম্ভ করিতে হইবে।

৯। এইরূপ গতের বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে সকল যন্ত্রই একই সংখ্যাযুক্ত "ঘর" বা bar বাজাইবে। যথা, যদি একটি যন্ত্র "৪" সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট ঘর বাজায়, তাহা হইলে অন্যান্য যন্ত্রগুলিও সেই একই সময়ে এবং একই সঙ্গে "৪" সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ঘর বাজাইবে। অবশ্য কোন কোন যন্ত্রের জন্য হয় ত সেই ঘরটি বিশ্রাম আছে, তাহা হইলে না বাজাইলেও মাত্রা গণিয়া যাইতে হইবে।

এস্রাজ বা বেহালা ১ম পাঠ।

ইহা বেহালার উচ্চ সপ্তকেও বাজাইতে হইবে।

১´ ● ১´ ৪ ● ১´ ●

I ৷ ৷ ৷ ৷ । -া -া ৷ ৷ I সা রা সা গা । ধা -া -া -া I পা ধা ণা ধা । র্সা -া -া না I

১´ ● ১´ ● ১´ ১২ ●

I ধা -া -া -া । সা রা সা গা I ধা ৷ -া -া । পা ধা ণা ধা I মা -া -া -া । মা ৷ ৷ ৷ I

১´ ● ১´ ১৬ ● ১´ ●

I মা মা -া ধা । পা -া -া ধণা I ধা -া -া -া । ধা -া ধা মা I পা -া -া -া । মা গা রা গা I

১´ ২০ ● ১´ ● ১´ ২৪ ●

I মা -া -া -া । মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা । ধা -া -া -া I ধা -া ধা মা । পা -া -া -া I

১´ ● ১´ ২৮ ● ১´ ●

I মা গা রা গা । মা ৷ ৷ ৷ I মা ৷ সা ৷ ৷ । সা র্সা র্সা -া I র্সা -া -া -া । ণা -া ধা -া I

১´ ৩২ ● ১´ ● ১´ ৩৬ ●

I ধা র্সা -া -া । র্ণা -া -া ধা I পা -া -া -া । পা ধা ণা র্সা I ধা পা মা গা । মা র্সা র্সা -া I

১´ ● ১´ ৪০ ● ১´ ●

I র্সা -া -া -া । ণা -া ধা -া I ধা র্সা -া -া । র্ণা -া -া ধা । পা -া -া -া । পা ধা না র্সা

১´ ৪৪ ● ১´ ● ১´ ৪৮ ●

I ধা -া -া -া । মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা । ধা -া -া -া I ধা -া ধা মা । পা -া -া -া I

১´ ● ১´ ৫২ ● ১´ ●

I মা গা রা গা । মা -া -া -া I মা -া -া -া । মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা । ধা -া -া -া I

১´ ৫৬ ● ১´ ● ১´ ৬০ ●

I ধা -া ধা মা । পা -া -া -া I মা গা রা গা । মা -া -া -া I মা ৷ ৷ ৷ । ৷ ৷ ৷ ৷ II II II

এস্রাজ বা বেহালা ২য় পাঠ।

১´ ০ ১´ ৪ ০ ১´ ০

I । । । । । । । । । II সা রা সা গা । মা -া -া -া I গা মা পা মা । ধা -া -া দা I

১´ ৮ ০ ১´ ০ ১´ ১২

I পা -া -া -া । সা রা সা গা I মা -া -া ॥ গা মা পা মা I রা সা মা । । । । । । I

১´ ০ ১´ ১৬ ০ ১´ ০

I মা মা -া ধা । পা -া -া ধণা I ধা -া -া -া । ধা -া ধা মা I পা -া -া -া -া মা গা রা গা I

১´ ২০ ০ ১´ ০ ১´ ২৪ ০

I মা । । । । মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা । ধা -া -া-া । ধা -া ধা মা । পা -া -া -া I

১´ ০ ১´ ২৮ ০ ১´ ০

I মা গা রা গা । মা । । । I মা । সা সা । সা র্সা র্সা -া I র্সা -া -া -া । ণা -া ধা -া I

১´ ৩২ ০ ১´ ০ ১´ ৩৬ ০

I ধা র্সা -া -া । র্সণা -া -া ধা I পা -া -া -া । পা ধা ণা র্সা I ধা পা মা গা । মা র্সা র্সা -া I

১´ ০ ১´ ৪০ ০ ১´ ০

I র্সা -া -া -া । ণা -া ধা -া I ধা র্সা -া -া । র্সণা -া -া ধা I পা -া -া -া । পা ধা ণা র্সা I

১´ ৪৪ ০ ১´ ০ ১´ ৪৮ ০

I ধা -া -া -া । মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা । ধা -া -া -া I ধা -া ধা মা । পা -া -া -া I

১´ ০ ১´ ৫২ ০ ১´ ০

I মা গা রা গা । মা । । । । I মা । । । । মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা । ধা -া -া -া I

১´ ৫৬ ০ ১´ ০ ১´ ৬০ ০

I ধা -া ধা মা । পা -া -া -া I মা গা রা গা । মা -া -া -া I মা -া -া -া । । । । । II II

—

সেতার ১ম পাঠ।

শ্রীবাণী দেবী

I t t t 1 | t t t 1 I t t t 1 | t t t 1 I t t t 1 | t t t 1 I t t t 1 | t t t 1 I t t t 1 | t t t 1 I

II র্রা র্সা ণা ধা | র্সা ণা ধা পা I মা মা -া ধা | পা -া -া ধণা I ধা -া -া -া |
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা ডা রা রা ডিরি ডা রা রা রা

| ধা -া ধা মা I পা -া -া -া | মা গা রা গা I মা -া -া -া | মা মা -া ধা I
ডা রা ডা রা ডা রা রা রা

I পা -া -া ধণা | ধা -া -া -া I ধা -া ধা মা | পা -া -া -া I মা গা রা গা |

| মা t t 1 I মা 1 সা সা | সা ধা ধা -া I ধা -া ধা -া | পা -া মা -া I
ডা ডা

I মা ধা ধা -া | পা -া পা মা I গা -া গা -া | পা ধা ণা র্সা I ধা ধপা মা গা |

| মা ধা ধা ধা I ধা ধা ধা ধা | পা পা মা মা I মা ধা ধা ধা | পা পা পা মা I

I গা গা গা গা | পা ধা ণা র্সা I ধা ধা ধা ধা | মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা |

| ধা -া -া -া I ধা -া ধা মা | পা -া -া -া I মা গা রা গা | মা -া -া -া I

I মা -া -া -া | মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা | ধা -া -া -া I ধা -া ধা মা |

| পা -া -া -া I মা গা রা গা | মা -া -া -া I মা t t 1 | t t t 1 IIII
ডা রা রা রা ডা

সেতার ২য় পাঠ।

I t t t t | t t t t I t t t t | t t t t I t t t t | t t t t I t t t t | t t t t I

I t t t t | t t t t II গা ধা পা মা | ধা পা মা গা I সা সা -া মা |
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা

| গা -া -া মপা I মা -া -া -া | মা -া মা রা I গা -া -া -া | রা সা ণ্‌া ণ্‌া I
ডা রা রা ডিরি ডা রা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা রা

I ধ্‌া -া -া -া | সা সা -া মা I গা -া -া মপা | মা -া -া -া I মা -া মা রা |

| গা -া -া -া I রা সা ণ্‌া ণ্‌া | ধ্‌া া া া I ধ্‌া া সা সা | সা রা গা -া I
ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা

I গা -া গা -া | রা গা সা -া I সা মা মা -া | সা রা গা রা I সা -া সা -া |

| গা মা পা ধা I মা মগা রা সা | রা সা গা -া I গা গা গা গা | রা গা সা -া I

I সা মা মা মা | সা রা গা রা I সা সা সা সা | গা মা পা ধা I মা মা মা মা |

| সা সা -া মা I গা -া -া গগা | মা -া -া -া I গা -া মা রা | গা -া -া -া I

I রা সা ণ্‌া ণ্‌া | ধ্‌া -া -া -া I ধ্‌া -া -া -া | সা সা -া মা I গা -া -া গগা |

| মা -া -া -া I গা -া মা রা | গা -া -া -া I রা সা ণ্‌া ণ্‌া | ধ্‌া -া -া -া I
ডা রা রা রা

I ধ্‌া া া া | া া া া IIII
ডা

"-া" চিহ্নিত স্থলে একটি ঝঙ্কার হইবে।

"া" " " বিশ্রাম বুঝাইবে।

ইহাতে ৬০টী ঘর বা (bar) আছে। প্রথম ২টি ঘরে কেবল পিয়ানো ও তানপুরা বাজিবে। পিয়ানোর অভাবে কেবল তানপুরা বাজিলেও চলিবে।

স্বরদ পাঠ।

৪
১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I ৎ ৎ ৎ ৎ। ৎ ৎ ৎ ৎ II ম্‌া প্‌া ম্‌া জ্ঞা। রা -া -া -া I সা রা জ্ঞা রা। মা -া -া গা I
ডা রা ডা রা ডা রা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা ডা

৮
১´ ০ ১´ ০ ১´
I জ্ঞা -া -া -া। ম্‌া প্‌া ম্‌া জ্ঞা I রা -া -া -া। সা রা জ্ঞা রা I ণ্‌া মপা মজ্ঞা রসা।
ডা রা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা রা ডা রা ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি

১২ ১৬
০ ১´ ০ ১´ ০
। ণ্‌া রা ণ্‌া -া I ণ্‌া ণ্‌া -া রা। সা -া -া রজ্ঞা I রা -া -া -া। রা -া রা ণ্‌া I
ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা ডা রা রা ডিরি ডা রা রা রা

২০
১´ ০ ১´ ০ ১´
I সা -া -া -া। ণ্‌া ধ্‌া প্‌া ধ্‌া I ণ্‌া -া -া -া। ণ্‌া ণ্‌া -া রা I সা -া সা রজ্ঞা।

২৪
০ ১ ০ ১´ ০
। রা -া রা -া I রা -া রা ণ্‌া। সা -া সা -া I ণ্‌া ধ্‌া প্‌া ধ্‌া। ণ্‌া ৎ ৎ ৎ I
ডা রা ডা রা ডা

২৮
১´ ০ ১´ ০ ১´
I ণ্‌া -া ম্‌া ম্‌া। ম্‌া মা মা -া I মা -া মা -া। জ্ঞা -া রা -া I রা মা -া -া।

৩২ ৩৬
০ ১´ ০ ১´ ০
। জ্ঞা -া -া রা I সা -া -া -া। সা রা জ্ঞা মা I রা সা ণ্‌া ধ্‌া। ণ্‌া মা মা মা I

৪০
১´ ০ ১´ ০ ১´
I মা মা মা মা। জ্ঞা জ্ঞা রা রা I রা মা মা মা। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা রা I সা সা সা সা।

৪৪
০ ১´ ০ ১´ ০
। সা রা জ্ঞা মা I রা রা রা রা। ণ্‌া ণ্‌া -া রা I সা -া -া রজ্ঞা। রা -া -া -া I

৪৮
১´ ০ ১´ ০ ১´
I রা -া রা ণ্‌া। সা -া -া -া I ণ্‌া ধ্‌া প্‌া ধ্‌া। ণ্‌া -া -া -া I ণ্‌া -া -া -া।

৫২ ৫৬
০ ১´ ০ ১´ ০
। ণ্‌া ণ্‌া -া রা I সা -া সা রজ্ঞা। রা -া রা -া I রা -া রা ণ্‌া। সা -া সা -া I

৬০
১´ ০ ১´ ০
I ণ্‌া ধ্‌া প্‌া ধ্‌া। ণ্‌া -া -া -া I ণ্‌া ৎ ৎ ৎ। ৎ ৎ ৎ ৎ IIII
ডা রা রা রা ডা

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব".

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁতৎসৎ

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৫৮ | ১৮৫৩ শক আশ্বিন

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮৭। চরণ পূজার আনন্দ।

মা! সুখ সুখ করিয়া সমস্ত বিশ্ব ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কোথাও তো সুখ পাইলাম না। তোমার প্রশান্ত ও সুস্নিগ্ধ মুখ যখন দেখি, আর তোমার চরণ যখন বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া পূজা করিতে পারি, তখনই একমাত্র সুখ পাই। সে সুখ যে কি, সেই সুখটুকু পাইবার জন্য প্রাণ সর্ব্বদা কি দুরুদুরু করিতে থাকে, তাহা আর কাহাকে জানাইব? আমার হৃদয় তো তোমার নিকট শত অপরাধের কালিমায় বর্ষার কৃষ্ণ বর্ণ জলদের আকার ধারণ করিয়াছে। মা! তুমি না ক্ষমা করিলে আর কে ক্ষমা করিবে? তুমি তোমার তেজে সেই মেঘগুলি কাটাইয়া ফুটাইয়া না দিলে আর কে সেই দুঃখের কালিমা বিদূরিত করিতে পারে? আমি বড় ভুল করিয়া বহুকাল তোমা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম। তাহার উপযুক্ত শাস্তি যথেষ্টই পাইয়াছি ও পাইতেছি। জননী! আর কেন? আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আর আমাকে কোলে তুলিয়া একটীবার আদর কর। আমার অন্তর তো তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ—একবার দেখ—আমি তোমাকে কত ভালবাসি। একবার আমার অন্তরে আসিয়া তুমি তোমার করুণার ধারা ঢালিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাও। মৃত্যুর বেড়াজালে পড়িয়া গিয়াছি—আমাকে তুমি তাহা হইতে রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে? একটুখানি জীবনবারি দাও—আমার দগ্ধ তৃষাতুর হৃদয় একটুখানি শান্তি লাভ করুক। তোমা হইতে দূরে বিপথে গিয়া কত যে দূরদূরান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—পথের সন্ধান কেহই বলিতে চাহে না; বরঞ্চ পথভ্রান্ত আমার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখিয়া আমার প্রতি ঘৃণাদৃষ্টিই নিক্ষেপ করিতে থাকে। সে যে কি কষ্ট গিয়াছে, তাহা একমাত্র তুমিই জান। শেষে জানি না কে, কিন্তু অন্তরে কে যেন বলিয়া দিল যে, তুমিই আমাকে গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিলে। আমি সেই পথ ধরিয়া আজ এই ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়া তোমার চরণের দাস হইয়া, তোমার চরণপূজার অবসর পাইয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, তেমন আনন্দ সারা জীবনেও পাই নাই। দুঃখ বিষাদের মধ্যেও

যে সুখশান্তি পাইয়াছি, তেমন নিবিড় সুখশান্তি সারা জীবনেও পাই নাই। এখন দিনে নিশীথে তোমার শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তিকে জীবনের সঙ্গী করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হইয়া গিয়াছি। এখন বাতাসের প্রতি হিল্লোলে তোমারই নিশ্বাস অনুভব করি; প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তোমারই শুভ্র সৌন্দর্য্য দেখি; ফুলের সুবাসে তোমারই গায়ের সুগন্ধ পাই। মানুষের ভালবাসায় তোমারই নিবিড় প্রেমের স্পর্শ পাই। মা! এই ক্ষুদ্র কুটীরে আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াই মুক্তির মাধুর্য্য আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছ। আমি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া যাহাতে তোমার পূর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পারি—দেখিয়া দেখিয়া তোমার আলিঙ্গনে ও আদরে মিশিয়া যাইতে পারি, তাহারই একটুখানি অবসর দাও।

৮৮। চরণ-ধূলি।

মা! আমাকে তোমার চরণধূলি হইয়া থাকিতে দাও। আমি তোমার নিত্য অনুচর ও দাস হইয়া থাকিতে চাহি। তুমি আমাকে যতই কেন ঝাড়িয়া ফেল না, আমি তোমার জ্ঞানত বা অজ্ঞানত তোমার ঐ চরণেই লাগিয়া থাকিব। আমার প্রাণ যখন সংসারের কঠিন চাপে স্পন্দহীন হইবার উপক্রম করিবে, তখন তোমার ঐ চরণের উত্তাপই আবার আমার প্রাণে জীবন ফিরাইয়া আনিবে। জননী! আমি আপনার দোষে যখন তোমার মুখের প্রসন্নতা হারাইয়া ফেলি, তখন কি বা চন্দ্রসূর্য্য, কি বা গ্রহতারকা, কোন কিছুরই জ্যোতি আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে পারে না। তুমি জান কি না জানি না, আমার দুই গাল বহিয়া নিরন্তর অশ্রুধারা তোমার ঐ চরণে ঝরিতে থাকে। সেই অশ্রুধারায় দৃষ্টি নির্ম্মল হইলে তবে তোমার প্রসন্ন মুখ আবার সম্মুখে আসিয়া জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে থাকে। আমি তোমার বড়ই দীনদুঃখী সন্তান। আমি কাহাকেও ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া-ঠুলিয়া তোমার সম্মুখে গর্ব্বে দর্পে স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইতে চাহি না; আমি অতি নীরবে তোমার চরণতলের এককোণে আসিয়া সকলের অজ্ঞাতে শুধু তোমার চরণস্পর্শ টুকু অনুভব করিতে চাহি। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে যেমন অহল্যার পাষাণহৃদয়ও সজীব হইয়া সকল সদ্ভাবের উৎসরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, জননী! দাও—দাও আমার বক্ষে তোমার ঐ চরণ তুলিয়া; আমারও পাষাণপ্রাণে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির জীবনপ্রদ উৎসসকল শতধারে উৎসারিত হইয়া উঠুক। তোমার চরণস্পর্শে আমার জীবনে শান্তিধারা বহিয়া যাক। মেঘসকল যখন বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তখন তুমিই তো তাহাদিগকে প্রচুর জলদান করিয়া তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ কর। সেইরূপ মা! আমিও তোমার একবিন্দু স্নেহের জন্য আকুলপ্রাণে তোমার চরণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তোমার স্নেহের ধারায় আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণটীকে ভরিয়া দাও। তুমি আমাকে তোমার কোলে তুলিয়া লও; একটীবার আদর করিয়া আমাকে ডাক—সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তেরও জন্য মুছিয়া যাক। তুমি একবার আমাকে তোমার প্রসন্ন মুখ দেখাও, আমার সমস্ত জীবন সফল হউক। মা! তোমার চরণে এতই অপরাধ করিয়াছি যে, এই আশাটুকু করিতেও ভয়ে প্রাণ দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠে।

৮৯। প্রেমলীলা।

মা! তারাগুলি যখন আমার পানে তাকাইয়া থাকে, আর আমি যখন তাহাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকি, তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রেম যে কি প্রকার উছলিয়া উঠে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হয় যেন উহারা তোমার নির্ণিমেষ নয়নের নিমেষের আকারেই দেখা দিতেছে। ফুলেরা যখন আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকে, আর আমি যখন তাহাদেব দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া হাসিতে থাকি, তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আর আমরা উভয়েই আনন্দের হাসি হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া যাই। ফুলেদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহাদের মধ্যে তোমারই বিশুভ্র হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখি। আমি তো তখন আর থাকিতে পারি না; তোমার কোলে উঠিয়া একবার তোমার গাঢ় আলিঙ্গন পাইতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন ইচ্ছা হয়, তুমি গুনগুন সুরে গান গাও, আমি সেই গান শুনি, আর তোমার

মুখের সুবিমল ছবি প্রাণের ভিতর আঁকিয়া লইয়া তোমার কোলে ঘুমাইয়া পড়ি। আমি তোমার এক দীনদুঃখী সন্তান। কিন্তু তুমি আমাকে কত রাজভোগের দ্রব্য দিতেছ। সে সমস্ত দেখিয়াই তো আমার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। আমি চাই, সকলের অজ্ঞাতে তোমার ঐ চরণতলে নীরবে বসিয়া থাকি। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমা হইতে তুমি দূরে যাইও না, আমাকে তুমি দূরে সরাইয়া রাখিও না। তোমার কোলে আমাকে শান্তিতে নিদ্রা যাইতে দাও। রাত্রি তোমার ধাত্রী হইয়া আসিয়া আমার চক্ষে স্বপ্নের হাত বুলাইয়া দিক। প্রভাতে উঠিয়া যেন তোমারই প্রসন্ন মুখ সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাই।

১০। পাথেয়।

মা! আমার জীবনের এই জীর্ণ তরীখানি তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছি। আমার বাহুযুগল বড়ই দুর্ব্বল; আমার পদযুগল বড়ই শ্লথ। তুমি এখন যদি ইচ্ছা কর, ইহাতে পাল তুলিয়া দাও—ইহা তরতর করিয়া তোমার ইঙ্গিত ধরিয়া চলুক। পাল তুলিয়া দিতে যদি না চাও, তবে তরীখানি এইখানেই থাকিয়া জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া তোমারই পদতলে ভাঙ্গিয়া পড়ুক। ভাঙ্গিয়া পড়িলেই যেন বাঁচি—তাহা হইলে আমায় তুমি তুলিয়া না ধরিয়া থাকিতে পারিবে না, ইহা আমি ঠিক জানি। আমি তোমার নিকট যতই কেন অপরাধ করি না, তবু আমি তোমার সন্তান; তোমার সঙ্গে আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যোগ—সে যোগ অনন্তকালেও ছিন্ন হইবার নয়। অন্তরে এই সাড়া পাইয়াছি যে, পিতামাতার নিকট সন্তানের ভুলভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু চির-অপরাধ হইতে পারে না। মা! আজ এই শরতের প্রথম প্রভাতে সূর্য্য তাহার কিরণজালে সমস্ত গগন ভরিয়া দিয়াছে, তুমিও তেমনি আমায় কোলে লইয়া তোমার আদরচুম্বনে আমাকে ভরিয়া দাও। তোমার গাত্রের সুগন্ধে আমার প্রাণ এখনই ভরিয়া উঠিয়াছে। তোমার সঙ্গে আমি একপ্রাণে মিশিয়া থাকিব, একহৃদয়ে চিন্তা করিব, অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া অনন্তকাল এক-সঙ্গে বাস করিব, ইহা ভাবিয়াই তো আনন্দে আকুল হইয়া উঠিতেছি। তুমি আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে, আমিও তোমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিব—এই নিরবধি আনন্দের সীমা কোথায়! তুমি আমার মাথায় তোমার মঙ্গলহস্ত রাখিয়া সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ দিবে—আর আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। তুমি যে পথ দিয়া চলিবে, সেই পথের ধূলিকণাও আমার কাছে পরম পবিত্র—আমি সেই ধূলি-ধূসরিত দেহ লইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইব; তখন তুমি তোমার যে বাণী শুনাইয়া আমার প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবে, তাহাই আমার নিকট অনন্ত পথের পাথেয় হইবে।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি?

(৺বিপিনবিহারী ঘোষাল)

ভারতের হিমালয় যেমন উন্নত এবং প্রশস্ত ভারতের হিন্দুধর্ম্মও সেইরূপ উদার এবং মহান্। হিন্দুধর্ম্ম একেশ্বরবাদপ্রধান ধর্ম্ম। "প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি?" অতি সংক্ষেপে এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, কেবল একমাত্র নিরাকার সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনার নামই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। তবে যে শাস্ত্রে অসংখ্য প্রকার সাকার দেবদেবীর পূজা বা কর্ম্মকাণ্ডের উল্লেখ আছে, সে কেবল নিতান্ত অল্পবুদ্ধি অথচ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবিহীন লোকদিগকে দুশ্চেষ্টাসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মপথে তাহাদিগের রুচি বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত, একএকটি রূপকবর্ণন বা এক-এক প্রকার কল্পনার অবতারণা মাত্র। যথা, ভগবান শিব তন্ত্রশাস্ত্রে মৃত্তিকা, শিলা বা ধাতুময়ী দেবতা-মূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করিয়া শেষে এই কথা বলিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন; যে,—

অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতং।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিত-নিবৃত্তয়ে॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র ১৪শ উল্লাস, ১০৬ শ্লোক।

হে পার্ব্বতী! এই যে সাধনযুক্ত বহুপ্রকার কর্ম্মের কথা বলিলাম, এ সমস্ত কেবল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে দুশ্চেষ্টাসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মপথে তাহাদিগের রুচি বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছেন; যথা,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২শ স্কন্ধ, ২০শ অধ্যায়, ৯ শ্লোক ।

সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবে, যে পর্য্যন্ত তাহাতে দুঃখবুদ্ধি অর্থাৎ বিরক্তি না জন্মে; অথবা যে পর্য্যন্ত আমার কথাশ্রবণ-মননাদিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ প্রবৃত্তি না হয়।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মবিষয়ে একটুকু শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্তই সাকার উপাসনাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন। ধর্ম্মবিষয়ে অর্থাৎ ভগবানের কথা শ্রবণ-মননে শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি জন্মিলে আর কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই।

এক সর্ব্বব্যাপী চিন্ময় পুরুষ ব্যতিরেকে অপর যত-প্রকার দেবদেবীর উল্লেখ শাস্ত্রমধ্যে আছে, সে সমস্তই যে নিতান্ত অজ্ঞান অথচ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবিহীন লোকদিগের জন্য কেবল রূপক বর্ণন বা কল্পনার লীলাখেলা মাত্র, একথা শাস্ত্রকারগণ ভূয়ঃ ভূয়ঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গিয়াছেন। যথা, ভগবান শিব তন্ত্রশাস্ত্রে একপক্ষে যেমন বহুপ্রকার দেবদেবীর ধ্যান, পূজা, বা মন্দিরপ্রতিষ্ঠাদির উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই ধ্যান, পূজা বা মন্দিরপ্রতিষ্ঠাদির বিবিধ প্রকার ফলের * কথাও লিখিয়া গিয়াছেন, অপরপক্ষে সেইরূপ সিদ্ধান্তকালে তাহাদিগের প্রতি বারম্বার কল্পনাশব্দ প্রয়োগ করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। যথা,—

অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নাম-রূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ৮ম উল্লাস, ২৮৬ শ্লোক।

হে পার্ব্বতি! (অপ্রাপ্তজ্ঞান বা অজাতবৈরাগ্য ব্যক্তিদিগের) চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণমননা-দিতে রতি বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্তই আমি কর্ম্ম-বিধিসকলের উল্লেখ করিয়াছি; এবং কেবল সেই উদ্দেশ্যেই বহুবিধ নাম ও রূপের (অর্থাৎ দেবমূর্ত্তিসকলের) কল্পনা করিয়াছি।

ভগবান শিব অপর একস্থানে বলিয়াছেন :—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ১৩শ উল্লাস, ১ শ্লোক।

এইরূপ গুণ অনুসারে নানা প্রকার রূপ (অর্থাৎ সাকার দেবমূর্ত্তিসকল)। অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের জন্য কল্পনা করা হইয়াছে।

সাকার দেবদেবী সম্বন্ধে ভগবান শিব এইরূপ কল্পনা শব্দ আরও অনেক স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন; বাহুল্য ভয়ে সে সকল আর এখানে উল্লেখ করিলাম না। †

ভগবান ব্যাসদেব সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া শেষে ১২শ স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ে স্পষ্ট বলিলেন যে, ভগবান নারায়ণ চৈতন্য ঘন মাত্র; তাঁহার এই যে রূপ বর্ণন এ কেবল কল্পনা। এতদ্ব্যতীত সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া অবশেষে এই কথা বলিয়া ঈশ্বরের নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন; যে,—

রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা হখিল গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

রূপ বিবর্জ্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণন করিয়াছি আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি আর তীর্থযাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে আঘাত

---

* কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানজনিত স্বর্গাদি ফলকথন যে শাস্ত্রে কেন আছে, তাহাও দেখান যাইতেছে; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন; যথা,—

মূঢ়ানাং ভোগদৃষ্টানামাত্মানাত্মাবিবেকিনাং।
রুচয়ে চাধিকারায় বিদধাতি ফলং শ্রুতিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ।

ভোগাভিলাষে অনুরক্ত আত্মানাত্মবিবেক-বিহীন মূর্খগণের ধর্ম্মবিষয়ে রুচি এবং অধিকারের নিমিত্তই কেবল শাস্ত্রে ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভগবান রঘুনন্দন স্মার্ত্তের মলমাসতত্ত্বের মুমূক্ষুকৃত্য নামক প্রস্তাবেও এইরূপ বচন লিখিত হইয়াছে; যথা,—

পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ড-লড্ডুকান্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি তিক্তমপ্যতি বালকাঃ॥

পিতা বা অন্যান্য গুরুজনেরা যে প্রকার ক্ষুদ্র শিশুকে নিম্বাদি তিক্ত ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে লাড্ডুক বা মোদকাদির প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন, বেদাদি শাস্ত্রসকলও সেইরূপ বহুপ্রকার কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের উল্লেখ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের রুচি বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেন মাত্র।

† যদিও অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে দুশ্চেষ্টাসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মপথে তাহাদিগের রুচি উৎপাদনার্থ শাস্ত্রকারগণ নানা প্রকার কল্পনার ব্যবহার করিয়াছেন, তথাচ অচিন্ত্য সত্যস্বরূপ পরম বস্তু পরমেশ্বর যে কোন প্রকার কল্পনার যোগ্য নহেন, এ কথাও তাঁহারা আপনারাই বলিয়া গিয়াছেন; যথা, ভগবান বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়াছেন,—

তস্মিন্ ব্রহ্মঘনে নিত্যে সম্ভবন্তি ন কল্পনাঃ।
বিচ্ছিত্তয়ঃ পয়োরাশৌ যথা রাম জলে তথা॥

যোগবাশিষ্ঠ, উপশমপ্রকরণ।

হে রাম! যেমন জলরাশি মধ্যে জলচ্ছেদ সম্ভবে না সেইরূপ নিত্য, নিবিড়, সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে কোন রূপ কল্পনাই সম্ভব হয় না।

করিয়াছি, হে জগদীশ্বর! আমার অজ্ঞানতা কৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর। *

ভগবান রঘুনন্দন স্মার্ত্ত একাদশীতত্ত্বে বিষ্ণুপূজন-বিধি আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই এই নিম্নলিখিত যমদগ্নির বচনটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন; পরে বিষ্ণুপূজা-সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুং-স্ত্র্যংশাদিকল্পনা॥

জ্ঞানযোগ রহিত ভক্তদিগের সুবিধার নিমিত্ত জ্ঞান-স্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীররহিত অর্থাৎ নিরাকার পরমেশ্বরের রূপ অর্থাৎ আকার কল্পনা করা হইয়াছে; এবং রূপকল্পনা যখন করিতে হইয়াছে, তখন স্ত্রীর অবয়ব ও পুরুষের অবয়ব এই উভয় প্রকার অবয়বই কল্পনা করা হইয়াছে।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থেও এই শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে; এবং তথায় 'উপাসকানাং' শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে; যথা, "উপাসকানাং,—জ্ঞানযোগ-রহিতভক্তানাং"।

বেদান্তসারের অধিকরণমালায় ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসা দেখা যায়; যথা,—

ব্রহ্ম কিং রূপি বারূপি ভবেন্নীরূপমেব বা।
দ্বিবিধ-শ্রুতিসদ্ভাবাদ্ ব্রহ্ম স্যাদুভয়াত্মকং॥
নীরূপমেব বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যমপূর্ব্বতঃ।
রূপং ত্বনূদ্যতে ভ্রান্তমুভয়ত্বং বিরুদ্ধতে॥

তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, ৫ম অধিকরণ।

প্রথমতঃ প্রশ্ন করিতেছেন—"পরমেশ্বর কি রূপি, অর্থাৎ সাকার? অথবা রূপি এবং নীরূপ অর্থাৎ সাকার এবং নিরাকার উভয়ই?"

ইহাতে বাদী পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, যে—"বেদাদি শাস্ত্রে যখন উভয় প্রকারেরই বর্ণন আছে, তখন পরমেশ্বর সাকার এবং নিরাকার উভয়ই"।

অবশেষে এই উত্তর পক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে,—"পরমেশ্বর যে নিরাকার তাহা বেদান্তশাস্ত্রে অতি চমৎকাররূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তবে যে কোন কোন শাস্ত্রে স্থলবিশেষে তাঁহাকে সাকাররূপে বর্ণন করা হইয়াছে, সে কেবল ভ্রান্ত লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য মাত্র। নতুবা এক বস্তুরই সাকার এবং নিরাকার এই উভয় রূপ হওয়া অসম্ভব। কারণ উহা শাস্ত্র যুক্তি এবং অনুভব এ সকলেরই বিরুদ্ধ"। †

বস্তুতঃ পরমেশ্বর যিনি তিনি মনুষ্য-ঔরসে মানবীর গর্ভে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কতবার প্রিয়া-বিয়োগে কাঁদিয়াছেন, কখনও ভ্রাতৃবিয়োগ-শোকে নদীর স্রোতে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, কখনও বা পত্নীর মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, কখনও শত্রুভয়ে ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছেন, কখনও নিজে মিথ্যা কথা কহিয়াছেন, কখনও বা অপরকে মিথ্যা কহিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কখনও অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কখনও বা বানরের সাহায্য ব্যতিরেকে শত্রুর অন্বেষণে—অধিক কি, শত্রুর কোনরূপ সন্ধান লাভ পর্য্যন্ত করিতে সক্ষম হন নাই; ইত্যাদি বর্ণনাসকল যে কতদূর সত্য এবং যুক্তিসঙ্গত তাহাও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রে বিবেচনা করিবেন।

আর এক কথা এই যে, মানবীয় যত প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে, তাহার কোনটীরই উন্নতি বা আবিষ্কারের জন্য যখন পরমেশ্বরের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করা আবশ্যক হয় নাই—তখন ধর্ম্মবিষয়েও যে তিনি সেই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ একটি শ্লোক লিখিত আছে; যথা,—

জন্মাপবাদং দ্রোহঞ্চ তথা মিথ্যাবভাষণং।
কামং ক্রোধং তথা চৌর্য্যং পরদারাভিমর্দ্দনং।
বীভৎসং মরণং ক্ষোভং দুষ্ক্রিয়া বিবিধাঃ কলৌ।
পাষণ্ডিনো বিধাস্যন্তি বিশুদ্ধে পরমাত্মনি॥

বর্দ্ধমান-রাজসংসার হইতে প্রকাশিত—"ভ্রমবিনাশ" নামক গ্রন্থধৃত ভবিষ্যপুরাণের বচন।

কলিযুগে পাষণ্ড ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ পরমাত্মাতে জন্ম-অপবাদ, দ্রোহ, মিথ্যাকথন, কাম, ক্রোধ, চৌর্য্য, পরনারী-প্রপীড়ন, বীভৎস, মরণ, ক্ষোভ এবং বিবিধ দুষ্ক্রিয়া বিধান করিবে।

* ভগবান শঙ্কর স্বামীও অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য সাকার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া শেষে ঠিক এই কথা বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

† কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বর যখন অচিন্ত্য ক্ষমতাশালী, তখন ইচ্ছা করিলে মানব-রূপে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু কথা এই যে, সর্ব্বশক্তিমত্তার এইরূপ অর্থ করিতে গেলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্ব থাকে না। তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপসকল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; এবং তিনি জন্ম-মরণাদি মানবধর্ম্মের আয়ত্ত হইয়া প্রকৃত মানবরূপে পরিণত হইয়া যান। পরন্তু যদি তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র হইতে পারিত, তবে তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ হইতে পারিত। ইহা অতি ভয়ানক মীমাংসা। অবতারত্ব বজায় রাখিতে যাইয়া নাস্তিকতায় উপনীত হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত বেদাদিশাস্ত্রে যে তাঁহাকে অজ, অব্যয়, নিত্য ও নির্ব্বিকার শব্দে বারম্বার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আর যাঁহারা সত্য সত্যই নিরাকার পরমেশ্বরের মধ্যে মধ্যে এক এক প্রকার সাকার মূর্ত্তি ধারণ করায় বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহাদিগেরও এই এক কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, "ভগবান্ নিত্যকাল যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন অর্থাৎ যাহা তাঁহার প্রকৃত ভাব, সেই ভাবটী পরিত্যাগ করিয়া কবে কোন্ কালে কি উপলক্ষে কয়েক বৎসরের জন্য কি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বক্ষণে যে রূপ তাঁহার আর নাই, সেই রূপের চিন্তা করা কি ভ্রান্তচিত্ততার কার্য্য নয়" ?

ভগবান্ যুধিষ্ঠির, যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম আত্মীয় সখা এবং আশ্রিত ছিলেন, যিনি চিরজীবন কৃষ্ণের সহিত অতিবাহিত করিলেন, তিনিও যে মহাপ্রস্থানকালে কৃষ্ণমূর্ত্তির চিন্তা না করিয়া নিরাকার পরমব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে উত্তরদিকে গমন করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারাই বা কি জানা যায় ; যথা—

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ব্বাং মহাত্মভিঃ।
হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্নাবর্ত্তেত যতো গতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ১৫শ অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক।

মহারাজ যুধিষ্ঠির হৃদয়ে পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে উত্তরদিকে গমন করিলেন। তাঁহার মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সেইদিকে গমন করিয়াছিলেন, সে পথ অবলম্বন করিলে আর ফিরিতে হইত না।

আর মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবের মুখে গঙ্গাতীরে সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওতঃ যখন সমাধি অবলম্বন করিলেন, তখন তিনিও সেই নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ; যথা,—শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখুন।

ভগবান শিব এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, যে—

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা ॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র ১৪শ উল্লাস, ১১৮ শ্লোক।

যদি মনের দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তিসকল মনুষ্যকে মুক্তি দিতে পারিত, তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থায় লব্ধ যে রাজ্য, তাহা দ্বারাও মনুষ্য রাজা বলিয়া গণ্য হইত।

শাস্ত্রকারগণ সাকার উপাসনা একেবারে উঠাইয়া দিতে না বলিয়া যাহারা একান্তপক্ষে নিরাকার উপাসনায় অক্ষম, এপ্রকার সামান্যবুদ্ধি অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিদিগের জন্য অপারক পক্ষে অনুকল্প ব্যবস্থারূপে উহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। যথা,—

অমূর্ত্তে চেৎ স্থিরো ন স্যাৎ ততো মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ।

সাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী-ধৃত গরুড়পুরাণের বচন।

যদি অমূর্ত্তি অর্থাৎ আকার-বিহীন সূক্ষ্ম পরমেশ্বরে মনের স্থিরতা করিতে না পার, তাহা হইলে মূর্ত্তি চিন্তা করিবে।

অসমর্থো মনো ধাতুং নিত্যে নির্ব্বিষয়ে বিভৌ।
শব্দৈঃ প্রতীকৈরর্চাভিরুপাসীত যথাক্রমং ॥

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষ্যধৃত বচন।

নিত্য, উপাধিশূন্য, সূক্ষ্ম বস্তু পরমেশ্বরেতে যদ্যপি মনকে ধারণ করিতে না পার, তাহা হইলে স্তোত্রপাঠাদি শব্দের দ্বারা, কিম্বা তদভাবে কোনরূপ অবয়বচিন্তার দ্বারা অথবা শেষ পক্ষে প্রতিমাদি গঠন দ্বারা ক্রমে ক্রমে উপাসনার পথে অগ্রসর হইবেক।

বস্তুতঃ শাস্ত্রকারগণ যদিও অসমর্থ পক্ষে সাকার উপাসনার বিধি দিয়াছেন, তথাচ কতদূর অনিচ্ছার সহিত যে তাঁহারা এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিলে আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং তাঁহার স্মৃতিতে এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা,—

"অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তদা-পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশমনোবুদ্ধ্যাত্মাব্যক্তপুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র তচ্চ লক্ষ্যন্তৎ পরিত্যজ্য পরমপরং ধ্যায়েৎ। এবং পুরুষধ্যানমারভেত। তত্রাপ্যসমর্থঃ ভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং কুণ্ডলিনমঙ্গদিনং শ্রীবৎসাঙ্কং বনমালাবিভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধরং চরণমধ্যগত-ভুবং ধ্যায়েৎ"।

বিষ্ণুসংহিতা, ৯৭ অধ্যায়।

যদি কেহ নিরাকার পুরুষে লক্ষ্য স্থির করিতে না পারেন, তবে তিনি প্রথমতঃ পৃথিবী চিন্তা, পরে জল চিন্তা, তদনন্তর তেজঃ বায়ু ও আকাশ চিন্তা, শেষে মন বুদ্ধি জীবাত্মা ও অব্যক্ত প্রকৃতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে শক্তি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহার চিন্তা এবং সর্ব্বশেষে প্রকৃতির অতীত যে পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তা করিবেন।

যদি এ ভাবেও ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মচিন্তা অভ্যাস করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আপনার হৃদয়পদ্মের মধ্যে দীপবৎ পুরুষ চিন্তা করিবেন।

যদ্যপি তাহাতেও অসমর্থ হন, তাহা হইলে শেষপক্ষে কিরীট-কুণ্ডলাদিযুক্ত, শ্রীবৎস-চিহ্নিত বনমালা-বিভূষিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ সৌম্যমূর্ত্তি চিন্তা করিবেন।

তবেই দেখুন কতদূর অপারক পক্ষে মূর্ত্তি চিন্তার ব্যবস্থা।

বিদেহ আত্মার সহিত কথোপকথন সম্ভব কি না? *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। প্রশ্ন—কথোপকথন সম্ভব কি না ?

কেহ কেহ বলেন যে, মৃত্যুর পরপার হইতে পরলোকগত বিদেহ আত্মা ইহলোকের অধিবাসীদিগের সহিত কথোপকথন চালাইতে পারেন না, অথবা চালাইবার চেষ্টা করিলেও এই লোকের অধিবাসীরা তাঁহাদিগের দেহ-যন্ত্রের নানাবিধ সংকীর্ণ সীমা থাকার কারণে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমাদের নিকট ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। টেলিগ্রাফ-যন্ত্র আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংবাদটী প্রেরিত হইতে পারিবে? বেতার-যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, সঙ্গীতাদি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রেরিত হইতে পারিবে?

আমরা ইতিপূর্ব্বে "মৃত্যুর পরে" প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি যে, মৃত্যুর পরেও বিদেহ আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং সেই আত্মার অপর কোন প্রকার দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকাই সম্ভব; জড় দেহের অবসানে আত্মা ঐহিক দেহের নানাবিধ সংকীর্ণ সীমার বাধা অতিক্রম করেন। তখন ইহা একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে, পরলোকগত আত্মা মাত্রেরই পক্ষে ইহলোকের অধিবাসীদিগের সহিত কথোপকথন চালান নিতান্তই অসম্ভব—বরঞ্চ সম্ভব বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

২। কথোপকথন সম্ভব—বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

জড় বিষয়ের ন্যায় অতীন্দ্রিয় বিষয়েও আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে আমাদের নিকট যে সকল প্রমাণাদি উপস্থিত হইতেছে, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছার তারতম্য অনুসারে পরলোকগত অন্তত কোন কোন আত্মা এলোকের সহিত কথোপকথন চালাইতে পারেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহা পরীক্ষিত হইয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। বিলাতের মনস্তত্ত্বসমিতির কার্য্যবিবরণীতে এইরূপ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ইহলোকেও দেখা যায় যে, জীবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে নিদ্রিত অবস্থায় বা অজ্ঞান অবস্থায় একের আত্মা আপনাকে দেহ হইতে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিমুক্ত আত্মার সহিত কথোপকথন চালাইতে সক্ষম। তখন বিদেহ আত্মার সহিত এই লোকের আত্মার কথোপকথন অসম্ভব মনে করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

৩। অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটী দৃষ্টান্ত।

(১) এক ভোর রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় আমি আমাদেরই বাটীর এক আত্মীয়ার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলাম। ঐ কথোপকথন আমি সদ্য সদ্য গাত্রোত্থান করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে ঐ আত্মীয়া আমাকে জানাইলেন যে, ঠিক ঐ ভোর রাত্রেই তিনিও আমার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। আমি তখন আমার সেই স্বপ্নলিপিখানি তাঁহাকে দেখাইলাম। উভয়ের কথোপকথনে আশ্চর্য্য মিল—একটি কথারও অমিল ছিল না।

(২) পূজ্যপাদ পিতামহদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার যৌবনকালে একখানি অতি প্রয়োজনীয় দলিল বহু সন্ধানেও না পাইয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ দলিল না পাওয়া গেলে বহু টাকার লোকসান হইত। সেই সময়ে এক গভীর রাত্রে এক বিদেহ আত্মা আসিয়া তাঁহাকে স্বপ্নে সেই দলিলের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশমত স্থানে সন্ধান করিয়া পিতামহদেব দলিলখানি পাইয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, আমি এই কথা তাঁহার মুখে এবং খুড়া জ্যেঠাদিগেরও মুখে শুনিয়াছি।

(৩) আমার এক আত্মীয়া তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতার বিদেহ আত্মার সহিত কিরূপ সহজে কথোপকথন চালাইয়া থাকেন, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। আত্মীয়া কাগজ পেন্সিল লইয়া তাঁহার ভ্রাতাকে আহ্বান করিলেই, তিনি সহজভাবে আসিয়া উপস্থিত হন এবং আত্মীয়ার প্রশ্নের উত্তরগুলি আত্মীয়ার হস্ত দ্বারা যথাযথ লিখিয়া দেন। আত্মীয়া বলেন যে, লিখিবার সময় তাঁহার হস্তের উপর ভ্রাতার হস্তের চাপ অনুভব করেন।

(৪) আমার এক আত্মীয় তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বহুদূরে অবস্থিত তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সাক্ষাতের পরেই পত্র দ্বারা আমাকে ঐ বিষয় জানাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্রোক্ত সময়ের হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, বিদেহ আত্মা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনের জন্য সময়ের অপেক্ষা রাখে—এক মিনিটে আন্দাজ আশী হইতে একশত মাইল যাইতে পারে।

(৫) আমার এক পুত্র তাহার মৃত্যুকালের কিছু পূর্ব্বে তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব বহুপূর্ব্বে পরলোকগত এক পিসার দর্শন পাইয়াছিল। সেই পিসীকে সে না দেখিলেও সে

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী।

তাঁহার আকৃতির যেরূপ যথাযথ বর্ণনা করিয়াছিল, তাহাতে আমরা সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

(৬) আমার এক আত্মীয়া তাঁহার এক পরলোকগত ভ্রাতাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার ভ্রাতার পরিবর্ত্তে তাঁহার পরলোকগত পিতৃব্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উক্ত পিতৃব্য ইহলোকে অবস্থানকালে কবিতা লিখিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং দু-একখানি কবিতার পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদেহ আত্মাও আসিয়াই নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া দিলেন। যাঁহারা উক্ত কবিতা পাঠ করিলেন, তাঁহাদের পড়িবার ভুলে স্থানে স্থানে ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে, ইহা ঐ আত্মীয়া আমাকে জানাইয়াছেন। কবিতাটী এই :—

ইচ্ছে করেছিলে তুমি তোমার সোনার সংসার
কোথায় ছিল, কেবা পরিচিত কার,
কেন বা আনিলে, কেন বা বাঁধিলে
প্রাণে প্রাণে প্রেমহার।
এবে ইচ্ছে হয়েছে সেই হার হ'তে
একটী কুসুম তার আপনি নিয়েছ
আপনি পরেছ, অভয় পদে আপনার,
আমাদের বুক ফেটে যায় যাক্ ঝরে ঝরুক অশ্রুধার।
তুমি যা ক'রেছ ভালই করেছ,
বলিতে দিও গো বার বার॥

উক্ত পিতৃব্য তাঁহার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কবিতায় তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

৪। অকারণ বিভীষিকা।

কি উপায়ে যে বিদেহ আত্মা আমাদের সহিত কথোপকথন চালাইবেন, তাহা আমাদের অপেক্ষা তিনি ভালরূপ জানেন। আমরা মৃত্যুর বিভীষিকায় বড়ই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ি—বিদেহ আত্মাকে ভূত-প্রেতের পর্য্যায়ে ফেলিয়া অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার সাক্ষাৎলাভে আতঙ্কিত হইয়া উঠি বলিয়াই আমরা বিদেহ আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার ক্ষমতা হারাইয়া বসি। সেই আতঙ্কই অনেক সময়ে আমাদের জড় মস্তিষ্কেরও বিকৃতির কারণ হয়।

মৃত্যুর পরপারস্থ অথবা পরলোকগত বিদেহ আত্মার সহিত সাক্ষাৎলাভের বিভীষিকায় আমাদের ভীত হইবার কোনই কারণ নাই। ইহলোকও যেমন বিশ্বপিতা অখিলমাতার রাজ্য, লোক-লোকান্তরও সেইরূপ— তাঁহারই রাজ্য। আমরাও যেমন তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সত্য নিয়মসমূহের দ্বারা পরিচালিত হইতেছি, লোক-লোকান্তরের অধিবাসী আত্মাগণও সেইরূপ তাঁহারই ধর্ম্মনিয়মসমূহ মানিয়া চলিতেছেন। একমাত্র ভগবানেরই অখণ্ড মঙ্গল নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিচালিত হইতেছে। ধূলিকণা হইতে উন্নততম আত্মা পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার মঙ্গল নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না।

৫। শাস্ত্রে পরলোকতত্ত্ব।

মৃত্যুর পরপারের কথা এবং সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম ও অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসকল, আমাদের শাস্ত্র অপেক্ষা অপর কোন দেশের কোন শাস্ত্রে অধিকতর বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না। ভারতের তপোনিষ্ঠ ঋষি-মুনিগণ তাঁহাদের নির্জ্জন সাধনায় এই বিষয়ের প্রতি কঠোর মনোযোগ দিবার ফলে, তাঁহাদের সম্মুখে পরলোক-তত্ত্বের দ্বার যে প্রকার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল, কোন দেশের কোন সাধকের সম্মুখে উহা সে প্রকার প্রশস্তরূপে উন্মুক্ত হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাই না। ইহারই ফলে আমাদের বেদ-বেদান্তে ও পুরাণ-তন্ত্রে অধ্যাত্মতত্ত্ব পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথাসকল অপূর্ব্ব ভাষায় ও ভাবে পত্রে পত্রে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। দুঃখের বিষয়, আমরা সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিদেশীয় সাধকদিগের উক্তির প্রতি, বিদেশের শাস্ত্রের প্রতি, সমধিক মনোযোগ প্রদান করিয়া এই সকল তত্ত্ব অধিগত করিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়া থাকি।

ওঁ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ॥

পথ ও পাথেয়।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ)

ক্ষীণ পথরেখা এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে কত গ্রাম-জনপদ অতিক্রম করে, কত গিরিদরী উল্লঙ্ঘন করে, কত প্রান্তর-বন-বনানীর ভিতর দিয়ে, পল্লীকুটিরের পাশ দিয়ে অজানা কত শত নূতন দেশে। এই পথ ধরে পথিক চলে শ্রান্তপদে অলসমন্থরগতিতে স্বীয় অভীষ্টলক্ষ্যে। যখন বন্য-তরু-গুল্ম-কণ্টকলতায় পথ দুর্গম হয়ে উঠে, তখনই মানুষ তাকে সুগম কর্‌বার চেষ্টা করে; বিশাল স্রোতস্বতীর বক্ষে রমণীয় সেতু নির্ম্মিত হয়; তুঙ্গ পাহাড়ের বক্ষ ভেদ করে মানুষের রাস্তা তৈরী হয়; ছায়াবহুল বনস্পতি পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে পথিকের ক্লান্ত দেহে ছায়া বিস্তার কর্‌তে থাকে। পথের ধারে ধারে কোথাও স্বচ্ছসলিলা শ্যামল-শৈবালদলবিমণ্ডিতা সরসী,

কোথাও নির্ম্মল কূপ পথিকের তৃষ্ণার জল বুকে করে দণ্ডায়মান; কোথাও নির্জ্জন প্রান্তর বুকে ক্ষুদ্র আপণ-মালা দ্রব্যসম্ভার সাজিয়ে পথিকের খাদ্যসমস্যার মীমাংসায় নিরত; কোথাও শষ্পাচ্ছাদিত পর্ণকুটীর নৈশাবাস রচনা করে পথিককে আহ্বান করে। কিন্তু পথ যখন এমন দেশের মধ্য দিয়ে যায়, যেখানে বৃক্ষ নেই, লতা নেই, কূপ নেই, সরোবর নেই, খাদ্যদ্রব্যের আপণশ্রেণী পথিকের জন্য বক্ষ উন্মুক্ত করে নেই—আছে মাত্র ধূসর বালুকারাশি দিগন্ত হ'তে দিগন্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত—তখন সে পথে যেতে হলে পথিক নিজের পাথেয় সঙ্গে করে পথ চলে,—প্রখর সূর্য্যকিরণের হাত থেকে আত্মরক্ষা কর্‌বার জন্য সঙ্গে নেয় আতপত্র, আধারে রাখে জল; ঝুলিতে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে কাঁধে ফেলে গন্তব্যপথে অগ্রসর হয়। আবার সঙ্গে নেয় তখন এমন লোককে যে পথ চেনে, যে হাত ধরে অভীষ্ট স্থানে পৌছে দিতে পার্‌বে—নৈলে যে পথহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে! সুতরাং যাত্রা-পথে চাই—পথ, পাথেয় ও সঙ্গী।

মানবেরও মহাযাত্রায়—জীবনের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যাবলী ও মৃত্যুর দুর্গম তিমিরাবৃত রাজ্যের মধ্য দিয়ে যে পথ বিস্তৃত, শাশ্বত ব্রহ্মলোকের সেই অভীষ্ট লক্ষ্য-পথে—প্রধানতঃ চাই পথের জ্ঞান, পাথেয় ও সঙ্গী। পার্থিব রাজ্যে যা চাই, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তারই সমভাবযুক্ত সব চাই—নতুবা যাত্রার বিফল প্রচেষ্টা হৃদয় ও মন ব্যথিত করে দেবে, গন্তব্যস্থানে উপনীত হবার কোন আশা আত্মপ্রকাশ কর্‌বে না।

পথ কি? জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংসারচক্রের ক্ষুৎপিপাসায়, আশা-বাসনায় নিপীড়িত হয়ে অবিরাম ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছি; কত সুখ ও দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত উদ্বেলিত হৃদয়ের গভীর স্তরে কত চিহ্নই না এঁকে দিচ্ছে; শোক ও মোহের ঘনান্ধকারে কতই না নিয়াশপ্রাণে বিচরণ কর্‌ছি—পথ ত খুঁজে পাচ্ছি না! কেমন করে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হব?

দেশে দেশে কালে কালে চিন্তাশীল ভাবুকের প্রাণে এই প্রশ্ন নিত্যকাল আঘাত করে বেড়িয়েছে; তাই মহাভারতে বকরূপী ধর্ম্মের চতুঃপ্রশ্নের মধ্যেও দেখি—"কঃ পন্থা?" পথ কি?

এই প্রশ্নের মীমাংসায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন পথরেখা নির্দ্দেশ করেছেন, দেশের, কালের ও সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে; কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক—গন্তব্যস্থান এক; তাই বিভিন্ন পথরেখার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে "মহিম্নঃস্তোত্রের" গন্ধর্ব্ব চিত্ররথ বলেছেন—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃ ঋজু-কুটিল-নানা-পথজুষাং
নৃণাম্ একো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

নদী যেমন মহাসমুদ্রে গিয়ে পৌছে ঋজুকুটিল নানা পথ ধ'রে, তেমনি মানবেরও লক্ষ্য এক ব্রহ্মার্ণব।

অনেক সময় দেখি, সব নদী মহাসমুদ্রের শান্ত নীলিমায় আপন ক্ষীণ জলধারা মিশিয়ে দিতে সমর্থ হয় না; কত নির্ঝরধারা তপ্ত মরুভূমির ধূসর বালুকার মধ্যে আত্মহারা হয়ে মিলিয়ে যায়; তেমনি সমস্ত পথই যে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে, তারও সম্ভাবনা কম। কোন পথ হয় ত দৃষ্টিহারা কণ্টকবনে লুপ্ত হয়ে গেছে—পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যলাভের চেষ্টায় নিরত; কোন পথ জনবহুল নগরের প্রান্তে শেষ হয়েছে,—খণ্ডকে সে অখণ্ডের আসন দিয়ে তৃপ্তিলাভ কর্‌ছে। কিন্তু এমন পথও বর্ত্তমান, যে পথ কণ্টকবন অতিক্রম করে, তুঙ্গ পর্ব্বতের অভ্রভেদী বাধা পদতলে দলিত করে, বিশাল প্রান্তরের মহানীরবতায় অঙ্গ মেলে দিয়ে, মহানগরের লোককোলাহলে বধির হয়ে ছুটে চলেছে দূর হতে দূরান্তরে, দিক্‌ হতে দিগন্তরে, যতক্ষণ না পরব্রহ্মের শাশ্বত লোকে উপনীত হয়—পার্থিব জগতের ধন, জন ও সুখৈশ্বর্য্য যার কাম্য নয়, খণ্ডকে যে অখণ্ড বলে পূজা করে তৃপ্ত হয় না; পরন্তু অখণ্ড পরব্রহ্মই যার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, ব্রহ্ম-চরণে আত্মনিবেদনই যার একমাত্র কাম্য।

কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার কথোপকথনে এই তত্ত্ব সুপরিস্ফুট হয়েছে। তৃতীয় বরে নচিকেতা যখন যমকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে
নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

তখন, যম নাচিকেতাকে পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ কর্‌বার চেষ্টা করলেন; যম বল্‌লেন—

"যে যে কামা দুর্ল্লভা মর্ত্ত্যলোকে
সর্ব্বান্‌ কামান্‌ স্বচ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।"

কিন্তু নাচিকেতা যখন কিছুতেই প্রলুব্ধ হলেন না, সুদীর্ঘ আয়ু, সুন্দরী স্ত্রী ও অসীম ধনরত্ন সব প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন, তখনই যম তাঁকে ব্রহ্মতত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটিত করে দিতে বাধ্য হলেন; কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল—ব্রহ্মজ্ঞান। খণ্ডের মধ্যে ডুবে তিনি অখণ্ডকে ভুলে যেতে রাজী ছিলেন না।

আমরাও যেদিন সংসারের ভোগসুখে মত্ত না হয়ে খণ্ডের মায়া কাটিয়ে, পরব্রহ্মের পরম পদ লাভের জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠা হৃদয়প্রদেশে অনুভব করব, তখন আমাদেরও পুরোভাগে শাশ্বত অমৃতময় ব্রহ্মলোকের পথ উন্মুক্ত দেখতে পাব। উপনিষদের অমৃতময়ী বাণী

আকাশে আকাশে, তারায় তারায়, প্রাণের তারে তারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে ; শুনতে পাব বনানীর পল্লব-মর্ম্মরে, নিদ্রাহারা তরঙ্গিণীর অশ্রান্ত কলতানে, জ্যোৎস্নার কোমল আলিঙ্গনে সুপ্তসমুদ্রের গম্ভীর মন্দ্রে, বিহগের কল-কাকলির অভ্যন্তরে—

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

পথ অত্যন্ত দুর্গম, কি পাথেয় নিয়ে এ অজানা পথে যাত্রা আরম্ভ কর্ত্তে হবে ? আবার কৃচ্ছ্রসাধ্য পথ-চলার মধ্যে দস্যু-তস্করেরও অভাব নেই ; প্রতিপদে বিঘ্ন-বিপদের সমাবেশ ; সুতরাং এমন পাথেয় চাই, যা সমস্ত বিঘ্ন-বিপদের হাত থেকে মুক্ত করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে পারবে। কি সে পাথেয় ? শ্রুতি বল্লেন, সে পাথেয় আনন্দ—যা থেকে বিশ্বসংসার উদ্ভূত ; যার বলে ত্রিভুবন জীবিত ; আবার অন্তিমে যার মধ্যে সমস্ত অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাবে। সমস্যা গভীর আকার ধারণ করল ! বিশ্বের বাজারে প্রতিপদে হতমান, জাগতিক শোকমোহে অভিভূত, দুঃখদারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে নিপীড়িত, হর্ষসুখের সামান্য স্পন্দনতালে উৎফুল্লবক্ষ, বিপদে ভয়াকুল, সম্পদে আত্মহারা মানব আনন্দের সন্ধান কোথায় পাবে, যার বলে সে অজানা সমুদ্রে পাড়ি জমাতে সমর্থ হবে ?

আর্য্যঋষি মানবের এ সমস্যার মীমাংসা করে গেছেন। ঋক্‌বেদে মহর্ষি বশিষ্ঠের উক্তির মধ্যে তা দেখ্‌তে পাই, যখন বশিষ্ঠ বল্‌ছেন "প্রভু, তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক, তাহলে আমি কোন দুঃখকষ্ট দুঃখ বলে মনে করি নে ; কিন্তু তুমি যদি না থাক, তবে যে দুঃখ আমাকে নিপীড়ন করে, তা অবর্ণনীয়"। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকেই সাথী বলে গ্রহণ কর্‌তে হবে, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ কর্‌তে হবে,—ক্ষুদ্র মানব সে অমৃতময় লোকের সন্ধান দিতে পার্‌বে না ; আর তাঁকেই যদি পথের সঙ্গী বলে গ্রহণ কর্‌তে পারি, তবেই জীবন-পথে নেমে আসবে আনন্দের অফুরন্ত ধারা—যেমন করে নেমে আসে বর্ষার বারিধারা নীল আকাশ বিদীর্ণ করে, যেমন করে নেমে আসে পাষাণ গুহার রুদ্ধ কক্ষ ভেঙ্গেচুরে স্বচ্ছ নির্ঝরধারা ! তখন মৃত্যুর অসীম তিমিরাবৃত পথ আলোকিত করে ফুটে উঠ্‌বে বাসন্তী প্রভাতে পূর্ব্বাশার অরুণরাগ ; জীবনের যা কিছু দুঃখ, যা কিছু কষ্ট, যা কিছু দৈন্য,—সব নিমেষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে ঐন্দ্রজালিকের কুহক-দণ্ডস্পর্শে ; আনন্দের অপূর্ব্ব সুষমায় ধরণীর প্রান্ত হতে প্রান্তর অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত করবে, শিশিরবিন্দু-খচিত প্রান্তর-বক্ষে সূর্য্যকিরণের মত জীবনের মরুময় বক্ষে স্বপ্নমাধুরী ফুটিয়ে তুলবে, সফল হবে জীবন-পথের পথচলা, সার্থক হবে মানবজীবন। আর্য্যঋষির এই অপূর্ব্ব অবদান পৃথিবীর বুকে নবীন স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌ল।

কালচক্রের অপূর্ব্ব আবর্ত্তনে আর্য্যঋষির উদ্ভাবিত অমৃতলোকের পথ কণ্টকময় গুল্মে আচ্ছাদিত হয়ে গেল, আনন্দের অপূর্ব্ব পাথেয়, আত্মসমর্পণ-যোগরূপ অভিনব উপায় কালবক্ষে লুক্কায়িত হল। তার স্থলে বেজে উঠ্‌ল খণ্ড দুঃখ-সুখের বাঁশরী ; জাগতিক সুখ-সম্পদের লালসাময় ঝঙ্কার। মানব ভুলে গেল অখণ্ডের বাণী, অমৃতের পথ।

কিন্তু চিরদিন সমভাবে কিছুই থাকে না ; পরিবর্ত্তন বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম ; এক যায়, আর আসে। তমসাবৃত হিমযামিনী চিরদিন সমভাবে বসুন্ধরার শুভ্রতপ্ত বক্ষে স্বীয় আসন বিস্তার কর্‌তে পারে না ; ফুটে ওঠে তিমির-রাশি ভেদ করে পূর্ব্বাশার উদয়াচলে দিব্যতেজবিলম্বিনী হেমকায়া উৎফুল্লা ঊষা—আবার জীবজগতে আনন্দের বাণী বেজে ওঠে।

ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে উপনিষদের যে মহতী বাণী দীর্ঘকাল কোন্ অতল পাথারে লুক্কায়িত ছিল ; যে পথরেখা অদৃশ্য লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল ; আবার উপনিষদের বাণী, অমৃতময় ব্রহ্মলোকের পথ ও পাথেয়ের সন্ধান এক ব্রাহ্মণ-বালকের মনের কোণে উঁকি মেরে গেল। কেঁদে উঠ্‌ল বালকের প্রাণ পৃথিবীবাসীর দুঃখে ঠিক তেমনি ভাবে, যেমনি ভাবে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে হিমাচলের পাদমূলে মৃত, রুগ্ন ও বৃদ্ধকে দেখে এক রাজপুত্রের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল জীবের দুঃখ দূর কর্ব্বার জন্য। রাজপুত্র সন্ন্যাসী হয়ে বোধিবৃক্ষমূলে নির্ব্বাণের সন্ধান পেয়েছিলেন ; ব্রাহ্মণ-বালকও দস্যু-তস্করসঙ্কুল বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে হিমগিরি অতিক্রম করে সুদূর তিব্বতে গিয়ে আর্য্যঋষির নবীন পন্থার আবিষ্কার করে নবীনভাবে বাঙ্গালার বুকে ফিরে এসে মুক্তির অপূর্ব্ব বাণী ঘোষণা কর্‌লেন—"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

দুর্গা অর্থে দুর্গতিনাশিনী।

(শ্রী.............দেবশর্ম্মা)

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপের পর বর্ষা নামিয়া বসুন্ধরাকে শীতল করিয়া দেয়। আবার বর্ষার পর শরৎ আসিয়া ঘন মেঘমালাকে অপসারিত করিয়া দেয় এবং ধরণীকে বিবিধ ওষধির শ্যাম শস্যে সুশোভিত করিয়া তোলে। কিন্তু এই শরতেরও প্রারম্ভকালে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ

অপগত হয় না। শরতের শেষভাগে যখন বর্ষাবাদলের কোন সম্ভাবনা থাকে না, সেই সময় দুর্গাপূজার বিধি আছে। এখন বঙ্গদেশের দেখাদেখি এবং দেশ-বিদেশে বঙ্গবাসীর ছড়াইয়া পড়িবার কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কোন কোন স্থানে এখানকার অনুরূপ দুর্গাপূজা রপ্তানি হইয়া গিয়াছে। এমন কি, সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, বিলাতেও একবার জনকয়েক বাঙ্গালী মিলিয়া দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এবং বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মেসোপটেমিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণ বহু আড়ম্বর সহকারে এই দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী বন্ধুবান্ধবের নিকট শুনিয়াছি যে, এক বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি মূর্ত্তি গড়িয়া দুর্গাপূজার ব্যবস্থা নাই।

এই পূজা উপলক্ষে চণ্ডীপাঠের বিধান আছে। চণ্ডী পাঠ করিলে এবং বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার বিশেষ প্রচলন আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহার মূল যে ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি আছে, তাহা না মনে করিয়া থাকা যায় না। মনে হয়, বঙ্গদেশের ইতিহাস সুসম্বদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক যুগে—সম্ভবত বৌদ্ধযুগের অবসান-কালে—বর্ষাপগমে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে দুর্গানাম্নী কোন বীররমণী অবতীর্ণ হইয়া শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া দেশকে দুর্গতি ও বিনাশের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে সম্ভবত দুর্গা শব্দের দুর্গতিনাশিনী অর্থ করিয়া উহা ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ বলিয়া প্রচার করা হইল।

দুর্গার আবির্ভাবকালে বোধ হয় দেশে বীরপুরুষের বড়ই অভাব ঘটিয়াছিল। সেই কারণে স্বদেশের রক্ষয়িত্রী দুর্গাদেবী জনসাধারণের দৃষ্টিতে মহিমা ও জ্যোতিপূর্ণ এক অসাধারণ ব্যক্তিরূপে (outstanding personality) প্রতিভাত হইয়াছিলেন; এবং সেই অবধি তিনি হিন্দু-সাধারণের অন্তরের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। অনু-সন্ধান করিলে বঙ্গদেশে বীর রমণীর সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে না। আমি বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম যে, বাঁশ-বেড়িয়া গ্রামস্থ আমার এক মাসীর বাড়ীতে একবার ডাকাত পড়িয়াছিল। ডাকাতেরা সংখ্যায় বারোজন ছিল। মাসীর বাড়ীতে এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে সাহসী পুরুষ কেহই ছিল না। সে কালের কথা—তখন ডাকাত পড়িয়াছে শুনিলে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাক, পুরুষেরাও কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যাইত, তাহার কোনই ঠিকানা থাকিত না। আমার মাসী কালবিলম্ব না করিয়া এক-খানি খাঁড়া হস্তে ডাকাতদিগের সম্মুখীন হইলেন। ডাকাতেরা তাঁহার সেই চণ্ডীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। এই সেদিন ঢাকায় হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার সময়ে এক হিন্দু বালিকা যে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে হিন্দুসাধারণের পূজার পাত্র হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান-যুগে বঙ্গদেশ সমগ্রভাবে বিপক্ষহস্ত হইতে কোন এক মহিলা কর্ত্তৃক রক্ষিত হয় নাই বলিয়া দুর্গাদেবীর পর আর কোন রমণীর বিস্তৃত-ভাবে পূজা দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত হয় নাই।

দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তাঁহার ধ্বজার চিহ্ন ছিল সিংহ। দুর্গাদেবী মহিষমর্দ্দিনী বলিয়া বিখ্যাত; একসময় তৈমুরলঙ্গ যে প্রকার মোগলভূমি হইতে ভারতে নামিয়া লুটপাটের দ্বারা ভারতভূমিকে উৎসন্নদশায় আনিবার উপক্রম করিয়া-ছিলেন, সম্ভবতঃ সেইরূপ মহিষ নামক কোন দুর্দ্দান্ত অসুরধর্ম্মী ব্যক্তি সুখশান্তিময় বঙ্গদেশে নামিয়া বঙ্গভূমিকে নিতান্তই বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমাদের অনুমান হয়, সম্ভবত এই মহিষাসুর তিব্বত বা ভূটান প্রভৃতি বঙ্গদেশের উত্তরাংশস্থিত কোন এক দেশ হইতে আসিয়াছিল। এই মহিষাসুরকে সমূলে বিধ্বস্ত করিবা ফ্রান্সের বীর রমণী Joan of Arc এর ন্যায় সকলের সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। দুর্গাদেবীকে দশভূজা বলাতে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, চতুর্দ্দিকে তাঁহার কিরূপ ক্ষিপ্র গতি ছিল। তিনি কেবল মহিষাসুরকে বধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু বিপক্ষের আক্রমণ হইতে সকল দিকই সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

দুর্গাপূজার পূর্ব্বদিনে "কলাবউ" স্নান করান হয়। ভাগীরথী-বিধৌত বঙ্গের সমতল ভূমিতে সহজলভ্য আহার্য্যাদির প্রাচুর্য্যের ফলে উর্ব্বরমস্তিষ্কে কল্পনার সাহায্যে মূল সত্য কিরূপ বিকৃত আকার ধারণ করিতে পারে, "কলাবউ"-স্নানের বিধানে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "কলা"শব্দের প্রকৃত অর্থে আমরা "চতুঃষষ্টি কলা" বা চৌষট্টি প্রকার বিদ্যা প্রাপ্ত হই। অনুমান হয় যে দুর্গাদেবী ঐ চৌষট্টি প্রকার বিদ্যার মধ্যে অনেকগুলিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেকালে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে হইলে স্নান করিয়া পূতবেশে পবিত্র হৃদয়ে নিত্য পাঠারম্ভ করিতে হইত; অনুমান হয় কোন এক কুক্ষণে কোন এক মহাপণ্ডিত (?) এই বিষয়ের ভাবগ্রহে অসমর্থ হইয়া অথবা নিজের পাণ্ডিত্য ফলাইবার চেষ্টায় বঙ্গদেশে অত্যন্ত সুলভ কদলীবৃক্ষকে কলাবিদ্যার স্থানে বসাইয়া এবং তাঁহাকে বধূরূপে কল্পনা করিয়া তাহার স্নানের বিধান দিয়াছিলেন। বোধ হয় কদলীবৃক্ষের শীতলতা প্রভৃতি গুণ এবং তাহার ফলের সুখভোগ্যতা

তাঁহাকে কদলীবৃক্ষেরই প্রতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। দুর্গাদেবী নিজেও যেরূপ বিদুষী ছিলেন, অনুমান হয়, তিনি কোন বিদ্বান পুত্রেরও জননী ছিলেন। এই পুত্র যে সেকালে নানা বিদ্যায় বিভূষিত ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার জন্য তাঁহার পুত্রকে বেদব্যাস-রচিত মহাভারতের লেখক সুপণ্ডিত গণেশের সহিত এক করিয়া তাঁহাকে গণেশজননী বলা হইয়াছে। হইতে পারে যে, দুর্গাদেবীর পুত্র বহুবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন এবং বিদ্যাচর্চায় একান্ত অনুরক্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহারই উদ্দেশে "কলা" বধূরূপে কল্পিত হইয়াছিল।

দুর্গাপূজার সঙ্গে কলাবৃক্ষকে সংযুক্ত করিবার আর একটী কারণ মনে হয়, দুর্গাদেবী সম্ভবতঃ কলাবৃক্ষকে বঙ্গদেশে আমদানী করিয়াছিলেন, অথবা তাহার চাষ বহুবিস্তৃতরূপে বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, তিনি কেবল কলাবৃক্ষের চাষই প্রবর্ত্তন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধ নয়টী জিনিসের যথা,—কচু, রম্ভা, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধানের চাষ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইহারই জন্য এই নয়টী বস্তু কলাবৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া দিয়া স্নান করান হয়, ইহারই নাম "নবপত্রিকা"। মনে হয়, শরৎকালে এই কয়েকটী বৃক্ষেরই পত্র বিশেষভাবে নব উদ্গত হয় বলিয়াই সংক্ষেপে ইহাদের নামকরণ করা হইয়াছে "নবপত্রিকা"।

সুন্দরবনে কয়েকদিন।

(৩)

(শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, পি-আর, এস্)

ভোরবেলা উঠিয়া খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া স্নান করিয়া লইলাম। আজ আমরা যাইবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম—সে নৌকায় বা পাল্কীতে বা হাঁটিয়া, যাহা করিয়াই হউক। শেষকালে ঠিক হইল যে, আমরা ছেলেরা কয়েকজন আগেই একখানি নৌকা করিয়া যাত্রা করিব, পরে আর একখানিতে গুরুজনরা আসিবেন। আমরা তিনজনে প্রায় দশটার সময় ৩নং লাটের দিকে রওনা হইলাম। একবার যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম,—সেই ধানের ক্ষেত ও অসংখ্য মরাই, সেই বৃক্ষকুঞ্জে ঢাকা কুটীর ও কাছারী বাড়ী, তাহার সামনে কলাগাছে ঘেরা আমাদের প্রিয় পুকুরটী। আমরা বাঁধের উপর দিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম। বর্ষাকালে খালের নোনাজল পাছে জমি নষ্ট করিয়া দেয়, সেইজন্য বাঁধ না দিলে এখানে চাষ হইবার উপায় নাই। একবার বাঁধ ভাঙ্গিলেই সব গেল। ৩নং লাটে পৌঁছাইয়া আমরা খাইয়া লইলাম। এখানকার দৃশ্য আরও পরিষ্কার, গাছপালা খুব কমই আছে। যেদিকে তাকাই সে দিকেই চক্রবালরেখার শেষসীমা পর্য্যন্ত ধূ—ধূ করিতেছে অনন্ত মাঠ; মাঝে মাঝে কেবল কৃষকদের কুটীর আর ধানের স্তূপগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রৌদ্র ক্রমেই প্রখর হইতে লাগিল। ১২টার সময় জোয়ার আসিলে আমরা নৌকায় জিনিসপত্র উঠাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। ভরা জোয়ারের জল টলমল করিতেছিল। তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল—সবুজ জলের উপর রজতশুভ্র রশ্মির চপল খেলা বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। মাঝিরা ছাড়া আমরা নৌকায় ছিলাম—ওরা পাঁচ ভাই ও চাকর গোকুল। গুরুজনরা বা মেয়েরা কেউই ছিলেন না, কোনও গণ্ডগোল-বাধা কিছুই নাই; কাজেই বেশ স্ফুর্ত্তি করিতে করিতে যাওয়া যাইবে। চার ভাই মিলিয়া দাবা খেলিতে লাগিল, আমি বাকাটার সঙ্গে ছইএর বাহিরে মুখ বাড়াইয়া গল্প জুড়িয়া দিলাম। গল্প হইতে হইতে আমরা গুণাকাটার খাল ছাড়াইয়া দুর্ব্বাচটীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম। ওরা বাঁশী শুনিতে চাহিল, আমি কতকগুলি সুর বাজাইলাম। আর একখানি নৌকার এখনও দেখা নাই। চরের উপর ছোট-বড় বিস্তর কুমীর শুইয়া আছে দেখিলাম—তাহারা দিব্য আরামে রৌদ্র পোহাইতেছিল। বন্দুক থাকিলে একবার পরীক্ষা করা যাইত বলিয়া ওরা আপশোষ করিতে লাগিল। দিনমণি যতই অস্তাচলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই আমরা বড়গাঙের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি ইত্যবসরে আমাদের বুড়া মাঝি, তীরের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা লম্বা সুঁদরী গাছগুলির (যাহা হইতে নাম হইয়াছে সুন্দরবন) ও আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে পালতোলা নৌকাগুলির sketch করিয়া লইলাম। ক্রমে আমরা বড় গাঙে আসিয়া পড়িলাম। দূরে নামখানায় ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখা যাইতে লাগিল। তখন সন্ধ্যাসূর্য্যের কোমল আলোকে জলস্থল চারিদিক অপূর্ব্ব আভায় উদ্ভাসিত। সত্য সত্যই মনে হইতেছিল—"দেখি নাই—কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া!" সেই অপরূপ বাহ্যদৃশ্য অন্তরের কাছে আরও মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল, আমাদের বুড়া মাঝির সরস রসিকতায়। তাহার একএকটী বুলির দাম হাজার টাকা। আমরা যখন সপ্তমুখীর সঙ্গমে আসিয়া পড়িলাম, তখন পশ্চিমা-

কাশে রাঙা রঙের আগুন লাগিয়াছে, আর সেই আগুন প্রতিফলিত হইতেছে সবুজ জলের অনন্ত উদার বক্ষে। যে দিকেই তাকাই কোনও সীমা নাই। উপরে রঙের স্বপনভরা বিচিত্র আকাশ আর নীচে অপার অনন্ত বারি রাশি। মাঝখানে আমাদের ক্ষুদ্র তরণীখানি পাল তুলিয়া জলকে তরঙ্গায়িত করিয়া মহানন্দে ছুটিয়াছে। সেই অসীমত্ব প্রাণে আনিয়া দেয় এক অনির্ব্বচনীয় আবেশ, এক অজানা বেদনা। তখন সত্য সত্যই মন "ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া"। বাঁশীর সুমিষ্ট লহরীর সঙ্গে হৃদয় অপূর্ব্ব সুরে ভরিয়া উঠে, এবং আপনা আপনিই গাহিয়া উঠে—

"কোথায় আপনা ভুলে এসেছি কোথায়
হিয়া মাঝে যেন কার ডাক শুনা যায়
কি যেন কি মোহাবেশে
কোথায় এসেছি ভেসে
ধূ—ধূ করে দুই পাশে
বিজন বেলায়।"

এই রকম কত ভাব, কল্পনা কত আবেগ যে চিত্ত-পটে উঠিয়া আবার মিলাইয়া যায়—রেখে যায় শুধু একটা উদার উদাস প্রেরণা, এই অনন্ত ভূমা মহানের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলার আকুল বাসনা। কাল-জলে নিশির নৃত্য পিছনে ফেলিয়া যখন আমাদের নৌকা-খানি সেই বিশাল জলরাশি হইতে নামখানার খালে ঢুকিতেছিল, তখন সেই সন্ধ্যা-আঁধার-আচ্ছন্ন অনন্ত জলধির কাছে আমরা সমস্বরে শেষ বিদায় লইলাম। এই সুদূর বিজনে, প্রকৃতির লুকানো শোভার মধ্যে আমাদের জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস, জল স্থল কম্পিত করিয়া পাশের নৌকাগুলিকে চমকিত করিল। গভীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাঙ্গলার সুজলা সুফলা মূর্ত্তি-বন্দনা, বাঙ্গালীর চির আরাধ্য দেশমাতৃকার জয়ধ্বনি ধীরে ধীরে অনন্তে মিলাইয়া গেল।

খালের দুই পাশে সারি সারি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, তাহাদের ভিতর হইতে আলোগুলি মিটমিট করিয়া উঁকি মারিতেছে; কেবল আমাদের নৌকাখানিই অবিরাম চলিয়াছে। গান গাহিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলাম, তাই বাঁশীটী তুলিয়া লইলাম। ঘন কুয়াসায় দেখিতে না পাইয়া একবার আমাদের নৌকার সঙ্গে আর একখানি তীরে বাঁধা নৌকার ধাক্কা লাগিল। তাহার ভিতরের লোকেরা বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ এইরূপভাবে ধাক্কা খাইয়া তাহাদের নিদ্রা ছুটিয়া গেল এবং একটা কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়াছে মনে করিয়া সকলে মিলিয়া ভীষণ গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল। পরে আসল খবর পাইয়া আশ্বস্ত হইল; কোনও পক্ষেরই কোনও ক্ষতি হয় নাই। ক্রমে ক্রমে গল্প করিতে করিতে আমাদের নৌকার সকলেও একে একে ঘুমাইয়া পড়িল—কেবল-মাত্র আমি জাগিয়া। বসিয়া বসিয়া আর কি করি, পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল লইয়া লিখিতে লাগিলাম:—

"নৌকায় চলেছি। সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল আমি ও মাঝিরা জাগ্রত। বাহিরে ঘোর অন্ধকার, তীরের বন সেই অন্ধকারকে আরও ঘনিয়ে তুলে এক গভীর তমসার সৃষ্টি করেছে। কাস্তের ফলার মত দ্বিতীয়ার চাঁদ কিছুক্ষণের জন্য নদীর জলের উপর আপনার রজত রশ্মি প্রতিফলিত করে আবার ডুবে গেছে। এখন চারিদিকে জমাট কুয়াসা আমাদের ঘিরে আছে, কেবল তারাগুলি ঝিকমিক্ করছে। বাইরে কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া নেই, সব নীরব নিস্তব্ধ। দাঁড়ের ঝুপ্ঝাপ্ শব্দে, নিঝুম রাতে প্রকৃতির এই ঘোমটা টানা প্রশান্ত মূর্ত্তিকে স্পন্দিত করে আমাদের নৌকাখানি ধীরে ধীরে চলেছে—বাহিরে ভিতরে সব চুপচাপ। মাঝে মাঝে কচিৎ কখনও একখানা তীরে বাঁধা নৌকার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। মাঝ গাঙ্গে বাঁধা আলোকসজ্জায় সজ্জিত সুবিন্যস্ত ষ্টীমারগুলি দেখে মনে হচ্ছে কোন্টা ভাল, কোনটা লোভনীয়—এই স্বদেশী নৌকা না ঐ আড়ম্বর-পূর্ণ বিদেশী জাহাজ? পরক্ষণেই আবার মনে হল, কবি বলে গেছেন—

"যদি দেয় স্বরগের সুখে
তবু শ্লাঘ্য নহে স্ববশের দুখে॥"

বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছি—বাঁশী আমার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে। প্রাণে এক অনমুভূত ভাব ছেয়ে ফেলেছে। অনন্ত আশা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে চলেছি, জানিনা কি সংবাদ সেখানে প্রতীক্ষা করছে। অশঙ্কায় হৃদয় দুরু দুরু কেঁপে উঠ্ছে, জানিনা গিয়ে কি শুনব, কি দেখব, কি বলব। নানা-রকম চিন্তা মনকে আলোড়িত করছে, মথিত করছে।"

এরকম অবস্থায় কতক্ষণ কাটাইয়া দিলাম। অবশেষে আমরা কাকদ্বীপে পৌঁছিলাম, তখন রাত প্রায় বারটা। গোকুল বাজারে যাইয়া মুড়ি ও মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিল, সেগুলি আনন্দে উদরসাৎ করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লওয়া গেল।

ভোর না হইতেই, কাকদ্বীপের কাক না ডাকিতেই আমরা নৌকা হইতে তীরে নামিলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, লোনা জলে মুখ-হাত-পা ধুইয়া, গঙ্গার অনন্ত প্রসারিত বক্ষে তরুণ অরুণের সোনার জাল বিস্তার দেখিয়া, বেলাভূমিতে কাদার মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া আমরা আবার

নৌকায় উঠিলাম। এইরূপ চিত্তাকর্ষক বিপুল উন্মুক্ততার মাঝখানে এই রকম নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ আর বোধ হয় হইবে না। চারি পাশে কত অসংখ্য নৌকা বাঁধা ছিল, কেহ বা যাত্রী লইতেছে, কেহ মাল তুলিতেছে, কেহ বা ভরাপালে ছুটিয়া চলিয়াছে—আমি বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। জোয়ার আসিলে আমাদের নৌকা ছাড়িয়া আবার অকূল বারিসমুদ্রে ভাসিয়া চলিলাম। ওদিকে রান্নার আয়োজন হইতে লাগিল। বাজার হইতে যাহা কিছু চাল-ডাল পাওয়া গিয়াছিল, গোকুল তাহাতে খিচুড়ী চড়াইয়া দিল। আমরা বাঁশী বাজাইয়া গল্প করিয়া সময়টা কাটাইয়া দিলাম। অবশেষে রান্না শেষ হইলে শুধু গরম গরম খিচুড়ী আর আলু ভাতে দিয়া চমৎকার খাওয়া গেল। পুণ্যতোয়া গঙ্গাবক্ষে অসীম জলধির মাঝখানে নৃত্যশীলা তরণীর উপরে সে কি পরিতৃপ্ত ভোজন—সে আর লেখনীতে প্রকাশ হয় না। ক্ষুধায় সকলেরই পিত্ত জলিয়া যাইতেছিল... খিচুড়ী সিদ্ধ হইতে আর দেরী সহিল না। সে কি উল্লাস, কি স্ফূর্ত্তি। গুরুজনেরা ত আর কেউ ছিলেন না সাবধান বা বারণ করিবার জন্য। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাই করিতেছিল। কি মজাই হইতেছিল! আমাদের মধ্যে একজনের জলে ভয়ানক ভয়। সে যতই বারণ করিতেছিল আমরা দুষ্টামি করিয়া নৌকাটী ততই দোলাইতেছিলাম এবং মাঝিকে বলিতেছিলাম মাঝগাঙ্গ দিয়া চলিতে; শেষে যখন জাহাজের বড় বড় ঢেউগুলি নৌকাকে ধাক্কা দিতে লাগিল আর আমাদের নৌকাখানি হালকা পালকের মত উঁচু নীচু হইয়া ভীষণভাবে দুলিতে লাগিল, তখন বেচারা মুখ শুকাইয়া নৌকা আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু আমার যদিও এই প্রথম নৌকা চড়া, তবুও মোটেই ভয় করিতেছিল না। আমার বড় আনন্দ হইতেছিল। যাইতে যাইতে দেখিলাম অনেক প্রকাণ্ড জাহাজ কলিকাতায় যাইতেছে। তাহারা অপর কিনারা দিয়া যাইতেছিল। এখানে গঙ্গা প্রায় পাঁচ ছয় মাইল চওড়া হইবে—এপার-ওপার দেখা কঠিন। এই গাঙ্গে যখন তুফান উঠে তখন না জানি কি ব্যাপার হয়! আমি সমস্তক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই বিরাট দৃশ্য আস্বাদন করিতেছিলাম, আর জলের উপর সূর্য্যকিরণের অপূর্ব্ব খেলা দেখিতেছিলাম। আমরা যখন ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছিলাম, তখন বেলা আড়াইটা। গঙ্গার কাছ থেকে বিদায় লইয়া আমরা তীরে উঠিলাম, উঠিয়া বরাবর রেল-ষ্টেশনে গেলাম। চব্বিশ ঘণ্টার উপর নৌকায় কাটাইয়া আবার আমরা ডাঙ্গার মানুষ ডাঙ্গায় ফিরিলাম।

মনে হইতেছিল যেন প্রকৃতির কোন অজানা অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আবার সভ্যতার মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম। ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেখি আড়াইটার একখানি ট্রেণ ছিল, কয়লায় খনিতে ধর্ম্মঘট হওয়ায় সেখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটী খবর শুনিলাম, ধর্ম্মঘট উপলক্ষে স্বামী বিশ্বানন্দকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বাড়ী যাইবার জন্য, সব খবর শুনিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—আর ভাল লাগিতেছিল না। কিছু লুচী-তরকারী খাইয়া আমরা পাঁচটার সময় গাড়ীতে উঠিলাম; ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। গাড়ীর সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় ভয়ানক ভীড় হইয়াছিল। সহযাত্রী এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল; তাঁহার নিকট হইতে কংগ্রেসের অধিবেশন, কলিকাতায় যুবরাজের আগমন প্রভৃতি অন্যান্য খবর পাইয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা হইল। আমাদের মত হুজুগে লোকের কি আটদিন কাগজ না পড়িয়া বিনা খবরে থাকা সোজা কথা? এক সপ্তাহকাল গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে কাটাইয়া সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমরা আবার জনকোলাহল-মুখরিত কলিকাতা নগরীতে পৌঁছিলাম। তারাদের কাছ থেকে বিদায় লইয়া একেবারে সোজা বাড়ী। কেবল দুইটা বাঁশী হাতে লইয়া চটী জুতা চটাস্ চটাস্ করিয়া আমায় একলা ঢুকিতে দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

পুরাণ-প্রসঙ্গ।

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ বি-এল)

(ভূমিকা)

বহুকাল যাবৎ শাস্ত্রাদির বিশেষতঃ পুরাণশাস্ত্রের রীতিমত পঠন-পাঠন ও কথকতাদি বিবিধোপায়ে পূর্ব্বের ন্যায় সুপ্রচার বন্ধপ্রায় রহিয়াছে। নানা কারণে পুরাণ-শাস্ত্রে অবিচলিত বিশ্বাস রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, এমন অনেক কথা ও প্রথাদি প্রচলিত আছে, যাহার সহিত শাস্ত্র ও পুরাণের সঙ্গতি রক্ষা করা দুরূহ বলিয়া কথিত হয়। এই জন্য বর্ত্তমান কালে অন্যান্য সমস্যার ন্যায় দেখা দিয়াছে—শাস্ত্র-সমস্যা ও তদন্তর্গত পুরাণ-সমস্যা।

শাস্ত্রাদিতে বিশেষতঃ পুরাণশাস্ত্রে লোকের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা পুনরানয়ন করিতে হইলে অশ্রদ্ধার কারণনির্ণয় ও

তাহার প্রতীকার অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং তৎপরে উপযুক্ত অর্থাৎ কালোপযোগী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী করতঃ শাস্ত্র বিশেষতঃ পুরাণ-শাস্ত্রের পুনঃপ্রচার আবশ্যক বোধ করি।

ঐ সকল অশ্রদ্ধার কারণ আলোচনা করিতে যাইলে কতকগুলি অপ্রিয় তথ্যের সম্মুখীন হইতে হইবে, কিন্তু ভয় করিলে চলিবে না—নির্ভয়ে প্রিয় ও অপ্রিয় সকল তথ্যের সম্মুখীন হইয়া সত্যের সন্ধান করতঃ তাহা প্রচার করিতে হইবে। সত্যপ্রকাশেই সমস্যার অন্তর্দ্ধান অবশ্যম্ভাবী। সত্য তথ্য প্রকাশে শাস্ত্রের তথা মূল-পুরাণশাস্ত্রের গৌরবই বৃদ্ধি পাইবে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

আলোচনা দ্বারা পুরাণ সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধান ও সত্য-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই—পুরাণরচনায় ব্যাসদেবের সঠিক স্থাননির্দ্দেশ প্রয়োজন। তৎপরে দেখাইব যে, মূল পুরাণশাস্ত্র অবিশ্বাস্য নহে—বরং বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্বাদির আবিষ্কারসকল মূল পুরাণ-শাস্ত্রনিহিত ইতিহাস আদির সমর্থনই করে।

পুরাণ হইতে সত্য তথ্য সংকলন ও প্রচার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

পুরাণরচনায় ব্যাসদেবের স্থান।

পুরাণের ইতিহাস।

পুরাণরচনায় ব্যাসদেবের স্থাননির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রথমতঃ পুরাণের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। তাহাতে ব্যাসদেবের স্থান কত উচ্চে ও কি ভাবে তাহা নির্ণয় হইতে পারে, ইহা বুঝা সহজ হইবে।

পুরাণাদি-পাঠে আমাদের মনে যে সকল কথা উদিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ বর্ণনা করিব। প্রথম কথা আমার এই যে, ব্যাসদেব যেভাবে বেদ সংকলন ও বিভাগ করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তিনি বিশাল পুরাণ-শাস্ত্রকে সংক্ষেপ করতঃ পরিবর্ত্তন বা সংকলন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি পুরাণসমূহের সংকলয়িতামাত্র ছিলেন—গ্রন্থকার ছিলেন না, অর্থাৎ তিনি বিশাল পুরাণ-শাস্ত্রকে সংক্ষেপ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র; পরন্তু মূল-রচনা তাঁহার নহে—অন্যের। একথা শুনিয়া প্রথমে হয় ত আশ্চর্য্যানুভব হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলে আমার কথার সত্যতা প্রতীত হইবে।

(১) পুরাণের প্রথম যুগ।

মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে—

> নির্দ্দগ্ধেষু চ লোকেষু বাজিরূপেণ বৈ ময়া।
> অঙ্গানি চতুরো বেদান্ পুরাণং ন্যায়বিস্তরম্॥
> মীমাংসাং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ পরিগৃহ্য ময়া কৃতম্।
> মৎস্যরূপেণ চ পুনঃ কল্পাদাবুদকার্ণবে॥
> অশেষমেতৎ কথিতমুদকান্তর্গতেন চ।
> শ্রুত্বা জগাদ স মুনীন্ প্রতিবেদান্ চতুর্ম্মুখঃ॥

অর্থাৎ "লোকসকল দগ্ধ হইয়া গেলে আমি বাজিরূপ ধারণ করিয়া বেদাঙ্গসকল, বেদচতুষ্টয়, ন্যায়বিস্তর, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি পরিগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদিত করিয়াছিলাম। তৎপরে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কল্পারম্ভে পুনরায় আমি একার্ণব জলের অভ্যন্তরে অবস্থান-পূর্ব্বক ঐ সকল অশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর চতুরানন তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া বেদ ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করিলেন।"

মৎস্যপুরাণের এই কথাই স্কন্দপুরাণেও সমর্থিত হইয়াছে; যথা—স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্যখণ্ড, রেবাখণ্ড, ২০ শ্লোক হইতে ২৩ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণনামধ্যে দৃষ্ট হয় যে—"শাস্ত্রনিচয়ের মধ্যে পুরাণই ব্রহ্মার প্রথম শাস্ত্র, তাঁহার বক্ত্র হইতে প্রথমে পুরাণশাস্ত্র নির্গত হইয়া তার পর বেদনিবহ নির্গত হয়। এই কল্পান্তরে ত্রিবর্গ-সাধন ও শতকোটী প্রবিস্তর একই মাত্র পবিত্র পুরাণ ছিল। চতুরানন ব্রহ্মার স্মৃতিমাত্রে এই পুরাণশাস্ত্র তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় এবং তিনি মুনিগণের নিকট কীর্ত্তন করেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃত বচনাদি হইতে জানা গেল যে, পুরাণের মূল উৎপত্তিস্থল (origin) বিষ্ণু বা ব্রহ্মা। বিষ্ণু বা ব্রহ্মা দ্বারাই বেদের ন্যায় পুরাণও সর্ব্বপ্রথম রচিত বা প্রকাশিত হয়; পরে ব্রহ্মাই মুনিগণের নিকট ঐ পুরাণসকল প্রকাশ বা কীর্ত্তন করেন। পুরাণাদিতে উক্ত প্রকার এবং আরও অন্যান্য বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ব্যাসদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে মৎস্যাবতার ও বাজি-অবতারের যুগে পুরাণ বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং পুরাণের এই বাক্যসকল সত্য বলিয়া মনে করিলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্যাসদেব কখনই পুরাণের মূল প্রণেতা (original or first author) হইতেই পারেন না।

পুরাণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বহু যুগ পূর্ব্বে মুনিগণের নিকট পুরাণ-প্রকাশের পর পুরাণ বহুবিস্তৃতি লাভ করে অর্থাৎ পুরাণের শ্লোকসংখ্যা বা আকার দীর্ঘতর ও বহুতর হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে, এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যখন পুরাণশাস্ত্র বহুবিস্তৃত হওয়ায় লোকে পুরাণপাঠে বিরত হইয়াছিল; পরে ব্যাসদেব উহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সংকলন করায় পুনরায়

লোকসমাজে পুরাণপাঠ প্রচলিত হয়। যথা মৎস্য পুরাণে—

"কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো নৃপ।

ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥" ইত্যাদি।

অর্থাৎ, "কালক্রমে বহুবিস্তৃত অনন্ত পুরাণশাস্ত্র-পাঠে লোকে বিরত হইয়াছিল। তাই ভগবান ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া উহা সংক্ষেপতঃ পরিবর্ত্তিত করেন।"

পুনশ্চ —

চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।

তদাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে।

অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥

তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্॥

পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদিহোচ্যতে॥"

অর্থাৎ, "প্রতি দ্বাপরযুগেই এই পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, শত কোটি শ্লোকের সংক্ষেপে চারি লক্ষ শ্লোক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অষ্টাদশ পুরাণ কীর্ত্তিত হয়। আর সেই শতকোটি শ্লোকাত্মক পুরাণ এখনও দেবলোকে প্রচলিত।"

মৎস্য পুরাণের এই বর্ণনা স্কন্দ পুরাণেও সমর্থিত হইয়াছে। যথা—স্কন্দ, আবন্ত্যখণ্ডান্তর্গত রেবাখণ্ড, ২৬ হইতে ২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণনামধ্যে দেখা যায়— "বিভু বিষ্ণু কালক্রমে পুরাণের অগ্রহণ দেখিয়া তপস্বী ব্যাসবেশ ধারণ করিয়া যুগে যুগে পুরাণের উপসংহার করিতে লাগিলেন। ঋষি ব্যাস অষ্টলক্ষ প্রমাণে প্রত্যেক দ্বাপরেই সেই পুরাণ অষ্টাদশধা বিভক্ত করিয়া এই ভূর্লোকে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি দেবলোকে শতকোটিপ্রবিস্তর পুরাণশাস্ত্র বিদ্যমান। ঋষি ব্যাস তাহাকে চতুর্লক্ষাত্মক করিয়া যে অষ্টাদশ পুরাণের প্রণয়ন করেন, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণন করিব।"

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে এইকয়টী তথ্য জানা গেল যে—(১) ব্যাসদেবের জন্মের বহুপূর্ব্বেই বিষ্ণু ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পুরাণ প্রকাশিত হয়। (২) ব্রহ্মা মুনিগণের নিকট পুরাণ প্রকাশ করিলেন। (৩) কালক্রমে পুরাণ বহুবিস্তৃত হওয়ায় লোকে পুরাণপাঠে বিরত হয়। (৪) তৎকালে ব্যাসদেব ঐ বিস্তৃত পুরাণকে সংক্ষেপতঃ পরিবর্ত্তিত করেন অর্থাৎ প্রচলিত পুরাণের সংকলন করিয়াছিলেন।

পুরাণের চতুর্থ যুগ ও তদনন্তর যুগ।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, কালক্রমে বহুবিস্তৃত পুরাণশাস্ত্রপাঠে লোক বিরত হইয়াছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বাধীন বিদ্যানুরাগী আর্য্যজাতির মধ্যে কেন এবম্প্রকার ঘটনা অর্থাৎ ইতিহাস বা ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে বিরতি সম্ভব হইয়াছিল, এপ্রশ্ন স্বভাবতঃ ও স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। ইহার কথঞ্চিৎ উত্তর স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, যথা—স্কন্দপুরাণ, মহেশ্বরখণ্ডান্তর্গত কুমারিকাখণ্ড ৪০ অধ্যায় ১৯৫ শ্লোক হইতে ২০২ শ্লোক মধ্যে দৃষ্ট হইবে যে—

"সেই ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত থাকে। ......তার পর দ্বাপরযুগ প্রবৃত্ত হইলে নরগণের বুদ্ধির পার্থক্য ঘটিতে থাকে।......ক্রমশঃ বর্ণসঙ্কর হইতে থাকে ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই সময়েই ব্যাসগণ ("তদা ব্যাসৈঃ" ইত্যাদি) দ্বিজগণের পক্ষে সুগম করিবার জন্যই এক বেদকে চারি ভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন। আর "ইতিহাস-পুরাণানি ভিদ্যন্তে লোকগৌরবাৎ"—অর্থাৎ লোকগণের রুচিভেদানুসারে ইতিহাস পুরাণাদি রচিত হয়।"

সুতরাং পুরাণরচনার কালসম্বন্ধে এই উদ্ধৃত বচন হইতে জানা যায় যে, দ্বাপরযুগে যৎকালে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তৎকালেই অর্থাৎ সেই সামাজিক বিপ্লবকালেই জনগণের রুচিভেদানুসারে পুরাণ রচিত বা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

পুরাণ-সংহিতা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, দ্বাপরযুগে এবম্প্রকার ভীষণ সামাজিক বিপ্লবকালে ব্যাসদেব কোন্ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন ও তাহা এক বা একাধিক—এবং এক হইলে ব্যাসদেব-লিখিত সেই মূল পুরাণ এক্ষণে কোথায়? আরও জানা আবশ্যক, সেই এক পুরাণসংহিতা কাহার বা কাহাদের দ্বারা অষ্টাদশধা বিভক্ত হইয়াছে?

প্রচলিত ধারণা এবং কতকগুলি পুরাণের উক্তি অনুসারে অষ্টাদশ পুরাণই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকর্ত্তৃকই রচিত বলিয়া খ্যাত। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা যাউক। পুরাণপাঠান্তে আমার ধারণা হইয়াছে যে, ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন নাই, তিনি মূলতঃ একখানিমাত্র "পুরাণসংহিতা" লিখিয়াছিলেন।

অনেকগুলি পুরাণের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মূলতঃ পুরাণ একই ছিল। কয়েকটী পুরাণান্তর্গত পুরাণপ্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে, একটি মাত্র মূল "পুরাণসংহিতা" ব্যাসদেব রচনা করিয়াছিলেন। পরে যেভাবে ব্যাসশিষ্য ও প্রশিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক বেদশাখাদি বিস্তার ও প্রচলিত হইয়াছিল, সেই ভাবেই তৎশিষ্য ও প্রশিষ্যগণকর্ত্তৃক উক্ত ব্যাসলিখিত মূল পুরাণসংহিতা বহুধা ও ক্রমশঃ অষ্টাদশধা বিভক্ত হইয়াছিল। যথা:—

(১) মৎস্য পুরাণে—

"পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ"
অর্থাৎ তখন কল্পান্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল।

(২) স্কন্দপুরাণেও—এই কথা সমর্থিত হইয়াছে—
পুরাণমেকমেবাসীৎ অস্মিন্ কল্পান্তরে মুনে"
অর্থাৎ (সূত সৌনক ঋষিকে বলিতেছেন) হে মুনে! এই কল্পান্তরে একইমাত্র পুরাণ ছিল।

ইহা হইতে জানা গেল যে, মূলতঃ কল্পান্তরে একখানি মাত্র পুরাণ ছিল।

(৩) বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ব্যাসদেব একটীমাত্র মূল পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন; যথা, বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়:—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥১৬
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥১৭ ...
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতাঃ॥১৯
চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে॥২০

অর্থাৎ পুরাণার্থবিশারদ ভগবান বেদব্যাস—আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পসিদ্ধির সহিত পুরাণসংহিতা (এস্থলে "পুরাণসংহিতাং" শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে একখানি মাত্র) রচনা করিলেন। বেদব্যাসের সূতজাতীয় রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে পুরাণ-সংহিতা (এস্থলেও "পুরাণসংহিতাং" শব্দ একবচনবিধায় একখানিমাত্র "পুরাণসংহিতা" বুঝিতে হইবে) দিয়াছিলেন (বা অধ্যাপন করিয়াছিলেন)। তদনন্তর ১৮ শ্লোকে ব্যাসদেবের প্রশিষ্য বা রোমর্ষণের ছয় শিষ্যের নামোল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে কাশ্যপবংশীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন ইহারা রোমহর্ষণ হইতে অধীত মূল সংহিতা অবলম্বনে প্রত্যেকে।একএকখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। হে মুনে! ঐ চারি সংহিতার সারসংগ্রহ করিয়া আমি এই বিষ্ণুপুরাণ রচনা করিয়াছি।"

(৪) বায়ুপুরাণ:—ব্যাসদেব কর্ত্তৃক একখানিমাত্র পুরাণসংহিতা রচনার সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই কথাই বায়ুপুরাণেও দেখা যায়। যথা বায়ুপুরাণ ৬০ অধ্যায়—রোমহর্ষণ কহিতেছেন—"রোমহর্ষণ তাঁহার (ব্যাসদেবের) পঞ্চম শিষ্য। ভগবান দ্বৈপায়ন ইতিহাস, পুরাণমাত্র আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।" ১৪ ও ১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এস্থলেও 'পুরাণ' শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় একখানি মাত্র পুরাণসংহিতা বা ব্যাস কর্ত্তৃক সংকলিত মূল পুরাণই বুঝিতে হইবে।

পুনশ্চ:—পুরাতত্ত্ববিশারদ দ্বৈপায়ন আখ্যা, উপাখ্যান, গাথা ও কুলকর্ম্ম দ্বারা পুরাণসংহিতা (এস্থলেও "পুরাণসংহিতা" শব্দ—একবচনার্থকবিধায় মূল পুরাণসংহিতা যে একটিমাত্র ছিল, ইহাতে সন্দেহই হইতে পারে না) রচনা করিয়াছেন। ২১ শ্লোক।

পুনরায়—"ষট্‌শঃ কৃত্বা ময়াপ্যুক্তং পুরাণমৃষিসত্তমাঃ।" বায়ুপুরাণ ৬১ অধ্যায় ৫৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, হে ঋষিসত্তমগণ! আমিও ঐ সংহিতা ৬ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি।

৫। অগ্নিপুরাণ।

বিষ্ণুপুরাণের এই কথাই পুনরায় অগ্নিপুরাণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। যথা,—অগ্নিপুরাণ, ২৭১ অধ্যায়, ১১ শ্লোক হইতে ১৩ শ্লোক পর্য্যন্ত।

"প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ॥১১॥
কৃতব্রতোঽর্থ সাবর্ণিঃ ষট্‌শিষ্যাস্তস্য চাভবন্।
শাংশপায়নাদয়শ্চক্রুঃ পুরাণান্ত্র সংহিতাঃ॥১২॥
ব্রাহ্মাদীনি পুরাণানি হরিবিদ্যা দশাষ্ট চ।
মহাপুরাণে হ্যাগ্নেয়ে বিদ্যারূপো হরিস্থিতঃ॥১৩॥

অর্থাৎ "সূত লোমহর্ষণ ব্যাসদেব হইতে পুরাণাদি প্রাপ্ত হইয়া সুমতি, অগ্নিবর্চ্চাঃ, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, কৃতব্রত ও সাবর্ণি এই ছয়শিষ্যকে বিতরণ করেন। শাংশপায়নাদি মুনিগণ পুরাণসমূহের সংহিতা ও হরিবিদ্যাময় ব্রাহ্মাদি অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন।"

অগ্নিপুরাণের এই শেষোক্ত উদ্ধৃত বচন হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ব্যাসদেবের প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক (অর্থাৎ ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণ, ঐ লোমহর্ষণের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক) অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছিল।

সুতরাং এক্ষণে উপরোক্ত আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে যে—১) ব্যাসদেব একখানি মাত্র মূল "পুরাণসংহিতা" রচনা বা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (২) পুরাণের অন্তর্গত প্রমাণাদি হইতে বিশেষতঃ অগ্নিপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ব্যাসদেবের প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃকই অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছিল,—ব্যাসদেব কর্ত্তৃক নহে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার।

(স্বামী সদানন্দ)

একদিন মহর্ষিদেব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র একেশ্বরবাদ, সমীদের

স্থানে অসীমের উপাসনাস্থাপন, ক্ষুদ্রের পরিবর্ত্তে অনন্তের পূজাপ্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তির উপরে ব্রাহ্মসমাজের আচার-ব্যবহার সামাজিক প্রথাদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের দেবতা বিশ্বপতি পরব্রহ্ম। সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়েরই তাঁহার পূজা করিবার সমান অধিকার আছে। সুতরাং তাঁহার উপাসনা এবং ধর্ম্মপ্রচার কোন শাস্ত্রবিশেষে বা কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তবে, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির এবং ভাষার মধ্য দিয়া উপাসনা করিলে বা উপদেশ প্রদান করিলে অধিকতর প্রাণস্পর্শী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজের মধ্যে যেমন বাইবেল বা কোরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া উপদেশাদি প্রদান করিলে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না, তদ্রূপ খৃষ্ট বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদ-উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্রের বচন দ্বারা তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা সম্ভবপর নহে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে উপাসনার অঙ্গ এবং ভাষা পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। তবে নানা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক সদৃশ বচন উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম্মের সার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রসারিত হইয়া মনুষ্যের সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম্মান্ধতা দূরীকৃত করিতে পারা যায়, ইহা প্রচারক মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আদি-ব্রাহ্মসমাজে যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বচন সংগ্রহ করিয়া উপাসনাপ্রণালী গঠিত হইয়াছে, তাহা যে সকল দেশে বা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, তাহা নহে। আদিসমাজের প্রধান কার্য্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে। এজন্য উক্ত প্রথা অবলম্বন করাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু যদি কোন খৃষ্টান বা মুসলমান দেশে আদিসমাজের শাখা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে, কিন্তু কেবল ঐ সকল দেশের জন্য। বলা বাহুল্য যে মহর্ষিদেব বাইবেল বা কোরাণাদির প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ এরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি স্বয়ং বাইবেল এবং মুসলমান-ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; এবং সময়ে সময়ে ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক বচন আবৃত্তি করিতেন।

মহর্ষিদেবের যুক্তি যে অতি সমীচীন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে, সংস্কৃত শ্লোকসমন্বিত আদি-সমাজের উপাসনাপ্রণালী ও ব্যাখ্যানাদি হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণস্পর্শী হয়, খৃষ্টীয় উপাসনালয়ের অনুকৃত উপাসনাপ্রণালী যেরূপ হয় না। কোন সময়ে ভারতবর্ষের কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মসমাজে আমি মাসে একদিন করিয়া বেদী গ্রহণ করিতাম। আমি দেখিয়াছি, যে যে দিনে উপাসনা করিবার ভার আমার উপর পড়িত, সেই সেই দিবস উক্ত উপাসনামন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া যাইত। অপর দিবস তাহার অর্দ্ধেকও পূর্ণ হইত না। কারণ ঐ সকল দিবসে সমাজের সভ্যগণ ব্যতীত অনেক হিন্দু ভদ্রলোক উপাসনায় যোগদান করিতেন।

মহর্ষিদেব আর একটী কথা বলিয়াছিলেন যে, প্রচার-কার্য্যে বৃত হইয়া কোন ধর্ম্মের উপর কটাক্ষপাত বা কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিবে না। ইহার দ্বারা কেবল যে বিরোধ টানিয়া আনা হয় তাহা নহে, প্রচারকের আধ্যাত্মিক অবনতিও হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়াছি যে যখন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বৈদেশিক প্রণালীর অনুকরণে উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন মহর্ষিদেব ব্যথিত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় শেষজীবনে ইহার জন্য অনুতাপ করিয়া প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি সংস্কৃত শ্লোকগুলি উপাসনাপ্রণালী হইতে উঠাইয়া দিয়া বড় ভাল করেন নাই। একথা অনেকেই অবগত আছেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় আজকাল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া উপদেশ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিতেছেন। শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতি ব্রাহ্ম প্রচারকগণও এই পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন।

একণে আমাদের দেশে খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা ক্রমশই কঠিনতর হইতেছে। সুতরাং অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আমাদিগকে কেবলমাত্র হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে। এইজন্য আমার বিশ্বাস যে, যতদূর সম্ভব হিন্দুশাস্ত্রের ভিতর দিয়া প্রচার করিতে পারিলে আমরা অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারিব। আমি অবগত হইলাম যে, সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য একটা সুব্যবস্থা করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এই নিমিত্ত আমি এই সকল বিষয় উদ্যোগ-কর্ত্তাদের নিকটে উপস্থিত করিলাম। আশা করি তাঁহারা এবিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে নারীর সম্মান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। নারীর প্রতি সম্মান ভারতের চিরন্তন রীতি।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে স্ত্রীজাতির প্রতি সমাদরপ্রদর্শন একটি বিশুদ্ধ চিরন্তন রীতি। কেবল মাখেমাত্র সমাদরপ্রদর্শন

নহে, প্রাচীনকালে ভারতের আর্য্যগণ স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের জ্যোতিস্বরূপ এবং পূজার যোগ্য বলিয়া দৃষ্টি করিতেন—"পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ"। তাঁহারা স্ত্রীলোক এবং গৃহের শ্রী উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতেন না—"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন"। আমাদের শৈশবকালে কোন বালক কোন বালিকাকে প্রহার করিলে আমরা স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে গুরুজনদিগের সকলকেই এই বলিয়া বালককে নিষেধ করিতে শুনিতাম যে, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলিতে নাই—তাঁহারা মায়ের সমান। হায়! দুঃখের কথা, এভাবের কথা একালে আর অন্ততঃ সহরগুলিতে বড় একটা শুনিতেই পাওয়া যায় না। ইহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন, যে চণ্ডী গৃহে গৃহে পঠিত হয়, সেই চণ্ডী বলিতে গেলে, স্ত্রীজাতির মাতৃত্বের উপরই সম্প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডী স্ত্রীলোকের মাতৃমূর্ত্তি যেরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, অন্য কোন শাস্ত্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" ইহাই বলিতে গেলে চণ্ডীর ভিত্তি বা কেন্দ্র। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রেরও বোধ হয় মূল উদ্দেশ্য মাতৃত্বের সাধনা। ইহাতে মাতৃত্ব-সাধনার যে প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে অতি অল্পকালের মধ্যেই নারীর মাতৃত্ব-বোধ এবং সুতরাং নারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন অতি সহজে আয়ত্ত হয়, ইহা অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য।

২। চীনবাসী দার্শনিক কবির অভিমত।

স্ত্রীলোককে এই প্রকার মাতৃরূপে দর্শন কেবল ভারতের নহে, কিন্তু সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডেরই অন্তর্নিহিত ভাব বলিয়া মনে হয়। এই সেদিন চীনদেশের অন্যতর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক-কবি লিউ-ইয়েম-হোম এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতিকে মাতার আসনে না বসাইলে জগতে কিছুতেই প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে না এবং মঙ্গল সাধিত হইবে না। তাঁহার কথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ চীনদেশের সাধারণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে সংগ্রাম বাধিয়াছিল, সেই সংগ্রামে তিনি বৈপ্লবিকদলের অন্যতর নেতা ছিলেন; এবং সেই দলের প্রচারিত নীতি অনুসারে তিনি পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলকেই নির্ব্বিশেষে সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিতে, এমন কি, স্ত্রীলোকদিগকে যুদ্ধের সৈনিকের অধিকার এবং প্রয়োজন মত যুদ্ধনেতারও অধিকার দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অধিকার-প্রদানের ফল সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি স্ত্রীজাতিকে সমাজের বহির্বিষয়সমূহে অতিমাত্র ব্যাপৃত থাকার পরিবর্ত্তে মাতৃত্বের আসন পুনরধিকার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

৩। পাশ্চাত্যদিগের মনোভাব।

স্ত্রীজাতিকে মাতৃমূর্ত্তিতে দর্শন পাশ্চাত্য দেশবাসীগণের হৃদয়ের একটি কোণেরও অংশ স্পর্শ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে—ব্যাভিচার করিও না—"Thou shalt commit no Adaltery"; কিন্তু এই নীতি কিসের বলে কোন্ ভিত্তির উপর—মানবের অন্তর্নিহিত কোন সমুন্নত বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার কোনই উল্লেখ নাই। সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন কবি ওয়াল্টহুইটম্যান তাঁহার অমর কবিতাপুস্তকে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সহিত সমান আসন প্রদান করিয়া উভয়েরই জয়গীত গাহিয়াছেন, কিন্তু তাহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্ত্রীজাতিকে মাতৃত্বের উপযুক্ত গৌরব প্রদান করিতে পারেন নাই। আমাদের বাল্যকালে এই বিষয়ে পাশ্চাত্যদিগের মনোভাবের পরিচায়ক একটী সত্য গল্প শুনিয়াছিলাম। সেই গল্পটী তৎকালে সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়া ভারতবাসী মাত্রেরই উপভোগ্য ও আমোদের বিষয় হইয়াছিল। গল্পটী এই—"এক সাহেবের আপিসে এক বাঙ্গালী কেরাণীগিরি করিত। তাহার পরিবারে পোষ্যবর্গের সংখ্যা অনেকগুলি ছিল। কেরাণী তাহার স্বল্প বেতনে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। সে তাহার মনিবসাহেবকে বেতন বৃদ্ধির জন্য অনেকবার উপরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য না হওয়ায় সাহেবের স্ত্রী মেমসাহেবকে বেতনবৃদ্ধির জন্য হাতে পায়ে ধরাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থির করিল। সে ভাবিল, মেমসাহেবের সহিত মাতৃত্বের সুবাদ পাতাইলে মেমসাহেব তাহার দুঃখে নিশ্চয়ই বিগলিত হইবেন। ইহা ভাবিয়া একদিন, অবসরমত সাহেব ও মেমসাহেব যখন নির্জ্জনে একত্র চা-পান করিতেছিলেন, সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া মেমসাহেবকে সে মাতৃসম্বোধন পূর্ব্বক সকল দুঃখের কথা বলিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু দুঃখের কথা আর বলা হইল না। কেরাণী যখনই মেমসাহেবকে মা বলিয়া ডাকিল, তখনই সাহেব উঠিয়া চাবুক আনিয়া তাহার মা বলিবার স্পর্দ্ধার পুরস্কার স্বরূপ তাহার পৃষ্ঠে কয়েক ঘা বসাইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তার দুঃখ দূর হওয়া তো দূরে থাক, মা বলিবার পুরস্কারস্বরূপে তাহার চাকুরিটী পর্য্যন্ত হারাইতে হইল।

৪। এবিষয়ে দাসমনোভাব পরিত্যাজ্য।

বর্ত্তমানে এদেশে বিশেষত কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য নগরে স্ত্রীজাতিকে মাতার আসনে বসাইয়া

অন্তরে পূজা করিবার ভাব চলিয়া যাইতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ। ইহার একটি প্রধান কারণ, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীকে ভারতের সমুন্নত ভাবধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া পাশ্চাত্য ভাবের উপর সংগঠিত শিক্ষাপ্রণালীর উপর দাঁড় করাইবার চেষ্টা। আমরা দাসমনোভাবের কারণে নিজেদের বিচারবুদ্ধি হারাইয়া পাশ্চাত্য দেশের দুর্নীতিপ্রবণতার অনুকূল পুরমহিলা ও কুলবধূদিগের সম্ভ্রমশীলতার হানিকর অভিনয় ও নৃত্য প্রভৃতি এদেশে প্রবর্ত্তন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি। চারিদিকে দুর্নীতির উত্তালতরঙ্গসমূহ সমগ্র ভারতকে যে প্রকার গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিতেছে, তাহাতে আমাদের মনে হয়, আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া পার্থিব সুখের প্রতি অতিরিক্ত বদ্ধদৃষ্টি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর সহিত সম্পূর্ণরূপে একাত্মযোগে যুক্ত না হইয়া অন্তত অনেকাংশে প্রাচ্য সভ্যতার সমুন্নত শিখরে শিক্ষাপ্রণালীকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের অধস্তন সন্তানসন্ততিগণকে ঔদ্ধত্য দুর্ব্বিনয় প্রভৃতি জাতীয় অধঃপতনের কারণসমূহ হইতে রক্ষা করিতে চাহিলে সেই নবসংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

৫। আমাদের কর্ত্তব্য।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, মহিলানৃত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া সমাজের চারিদিকে নারীত্বের অবমাননার যে বিষবীজ উপ্ত হইতেছে, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, তত্ত্ববোধিনী, ভোটরঙ্গ প্রভৃতি সাময়িক পত্রসমূহের প্রবল লেখনী উহার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছে। এই সকল সাময়িক পত্র নৃত্যাদির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও আমরা মনে করি, তাঁহারা রোগের মূল ধরিয়া সংগ্রাম করিতেছেন না। আমাদের মতে সত্য সত্য এই দুর্নীতিপ্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলে উহার মূলে গিয়া বর্ত্তমান কালের বারবণিতাশ্রেণীর অভিনেত্রীগণের সহিত যে সকল নাট্যমঞ্চে অভিনয় করা হয়, সেই সকল থিয়েটার প্রভৃতি যাহাতে বাল্যাবধি আমাদের সন্তানগণ বর্জ্জন করে এবং যৌবনের লালসাপ্রদীপ্ত উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণ বয়কট করা হয়, তদ্বিষয়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করা কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে আমাদের বিশ্বাস নারীত্বের অবমাননারূপ বিষবীজসকল কিছুতেই মরিবে না, বরঞ্চ তাহা সময়ে বিষগর্ভ ফল প্রসব করিয়া সমগ্র ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিবে। আমাদের মনে হয়, সজ্ঘবদ্ধ হইয়া এই বিষয়ে অগ্রসর হইলে আমাদের সফলকাম হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

যীশুর গুরু কে?

(শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত)

প্রাচীন ভারত যে ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং আজিকার সভ্য জগৎ যে প্রাচীন ভারতের নিকট কতদূর ঋণী, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। "যীশুর ভারতীয়ত্ব" কথাটী দেখিয়াই অনেকে বিস্মিত হইবেন। খৃষ্টধর্ম্ম আজ সভ্য জগতে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। "যীশুর ভারতীয়ত্ব" কথাটী শুনিয়া বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিষয়টী লেখকের উদ্ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা নহে—সংগৃহীত সংবাদ মাত্র, তথ্যান্বেষী পাঠকমহোদয়গণ ইহার সত্যতা বিবেচনা করিবেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে "ইণ্ডিয়ান নেশন" নামক পত্রিকায় "যীশুর গুরু কে" (Who were the Gurus of Jesus Christ) এই নামে একটী ইংরাজী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে ঐ নিবন্ধটী ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্টের দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। সর্ব্বশেষে উক্ত প্রবন্ধ "পথের কথা ও নীতিগাথা-সংগ্রহ" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

যীশুর গুরু কে?

সকলেই জানেন, যীশুর বাল্যজীবন-কাহিনী নিউ টেষ্টামেণ্ট (New Testament) হইতে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। গস্পেল (Gospel) এর শ্লোকসমূহ এবিষয়ে উদাসীন। যীশুর বাল্যজীবনীর এক অংশ এতদিনে প্রকটিত হইল এবং জানা গেল যে, হিন্দু এবং বৌদ্ধগণই ঈশ্বরের পুত্রের ধর্ম্ম-গুরু। কিরূপে এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল?

এম্ নাটোভিচ্ (M. Natovitch) নামক জনৈক রুশীয় পরিব্রাজক তিব্বত ভ্রমণকালীন তিব্বতের সাধু লামাগণের নিকট সুপরিচিত হন। তাঁহারা কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহারা জনৈক পাশ্চাত্য সাধুর কথা জানেন, তাঁহার নাম ছিল ঈশা। অতঃপর তাঁহারা ঐ সাধুর দুইএকটী কথা নাটোভিচের নিকট বলাতে তাঁহার সন্দেহ হয়, উক্ত পাশ্চাত্য সাধু যীশু ব্যতীত অপর কেহই নহেন। লামাগণ বলেন, উক্ত পাশ্চাত্য সাধুর (Prophet) জীবনী হিমিস্ নামক একটী মঠে রক্ষিত আছে। কৌতূহলী পরিব্রাজক বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া হিমিস্ মঠে উপস্থিত হ'ন। তথাকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের (Monks) নিকট হইতে তিনি দুইটী বিরাট পুঁথি দেখিবার জন্য প্রাপ্ত হন, তাহাই ঈশার জীবনী। উক্ত জীবনীর সার মর্ম্ম এই—

ঈশা ইসরাইলপ্রদেশে দরিদ্র পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল এবং তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি সিন্ধুপ্রদেশে পলায়ন করেন এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি আর্য্যদের সহিত জগন্নাথ, রাজগৃহ, কাশী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি বেদাধ্যয়ম শিক্ষা করেন ও বেদজ্ঞ হ'ন। তিনি বেদের ঐশ্বরত্ব এবং পরব্রহ্মের অবতারত্ব অস্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হইয়া বৌদ্ধদের শরণাপন্ন হ'ন। অতঃপর তিনি পালি শিক্ষা করেন এবং অল্প দিনেই বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্যজ্ঞ হ'ন। পরে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার করিতে করিতে পারস্য দেশে উপনীত হ'ন। তথা হইতে পলায়ন করিয়া ২৯ বৎসর বয়সে তিনি জুডিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জনপ্রিয়তা দেখিয়া পন্টিয়াস্ পীলাত (Pontius Pilate) ভীত হন এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করেন। তথাকার জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি দেন। ঈশা পুনরায় ধর্ম্মপ্রচার করেন। ধর্ম্মের প্রসার দেখিয়া পীলাত পুনরায় তাঁহাকে ধৃত করেন এবং দুইজন ডাকাতের সহিত তাঁহার বিচার হয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য কয়েক জন লোকও উপস্থিত ছিল। বিচারকালীন ঈশার জ্ঞানগর্ভ উত্তরে পীলাত খুব ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিতে হুকুম দেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা পাপ কাজ ভাবিয়া পবিত্র জলে হস্ত ধৌত করেন। যীশুকে ডাকাতদের সহিত ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তৃতীয় দিনে যীশুর শবাধার শূন্য দেখা যায়। উপরিউক্ত কাহিনী নিউ টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত যীশু-চরিত্রের প্রায় অনুরূপ। অতএব বুঝা গেল, যীশু প্রথমে হিন্দুগণের এবং পরে বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে (ধর্ম্ম) শিক্ষা করেন ··· ···।

যদি এই সকল ঘটনা সত্য হয়, তবে যীশুকে লইয়া গৌরব করিবার কারণ ভারতের আছে। কারণ হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্ম। শেষোক্ত ধর্ম্মটী আবার হিন্দুধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত। এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

—সময়, ১২।৫।৩৮

রাজা রামমোহন রায়।

(শ্রীরত্নাবলী বড়ুয়া বি-এ)

ভারতের ইতিহাস তিনটী যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ Creative বা উৎপত্তি যুগ; যে সময় ঋষিগণ মিলিত হইয়া ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকারে এক উন্নত সোপানে রাখিয়াছিলেন। তাহার পর অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন যুগ (Dark age), যে সময় ভারতের সকল দিকে অধোগতির সূচনা—মানসিক বল, আধ্যাত্মিক বল, নৈতিক বল, সামাজিক বল, সকল বিষয়ে একটা নিশ্চলতার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল—ভারতবাসীগণের মধ্যে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। তৎপরে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষণে আসিয়া ভারতে একটী নূতন যুগের সৃষ্টি হয়, যে সময় ভারতবাসীর মনে সামাজিক উন্নতি (social regeneration) এবং জাতীয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই যুগকেই রামমোহন-যুগ বা নবভারত-যুগ বলিতে পারি।

যে সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়, সেই সময়ে ভারতের সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন অতি হীন অবস্থায় ছিল। নানাবিধ কুসংস্কার প্রবেশ করিয়া পবিত্র হিন্দুধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছিল, বহু সঙ্কীর্ণ রীতি-নীতি হিন্দুর সামাজিক জীবন অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতবর্ষের এই ক্রমশঃ অবনতি-পথে রাজা রামমোহন রায়ই বাধা দিয়াছিলেন। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের ভাগ্যাকাশে নব-ভারতের প্রথম আলোকরেখা আমরা রামমোহন রায়ের জীবন-কালে দেখিতে পাই। নানাদিক্ হইতে অশেষ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও, অক্লান্তভাবে জাতীয় জীবনের উদ্ধারের জন্য এক মহাব্রতে ব্রতী হন প্রথম রামমোহন রায়।

রামমোহন রায়ের জীবনীর বিষয়ে আজকাল সকলেই জানেন। সেই বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া আমার প্রবন্ধটীর আকার বৃদ্ধি করিতে চাহি না। রামমোহন রায়ের মহত্বের বিষয়ে কয়েকটী মাত্র কথা বলিয়া এই প্রবন্ধটী শেষ করিব। রাজা রামমোহন রায়ের যদিও আপন জন্মস্থানের প্রতি অধিক প্রীতি ছিল, তথাপি তিনি সমস্ত ভারতের হিতৈষী ও হিতসাধক ছিলেন। তিনি স্বজাতি হিন্দুসম্প্রদায় ও তাহার শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই হিন্দুধর্ম্মের মূল ও প্রধান সত্যসকলের উপর তাঁহার অত্যন্ত আস্থা ছিল; কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন না। মুসলমান, খৃষ্টানাদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও শাস্ত্রসকল যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়া তাহার মূল তত্ত্বসকল বুঝিয়া, সেই সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই শাস্ত্রসকল কেবল যে তিনি পণ্ডিতের ন্যায় পাঠ করিয়াছিলেন তাহা নহে, নিজেই মহামনস্বী ছিলেন বলিয়া মনন ও ধ্যানের দ্বারা সকল ধর্ম্মের সার-সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন;

কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি তাঁহার বিচারশক্তিকে বলহীন করিতে পারে নাই।

যাহাতে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার স্বাধীন দেশের সমকক্ষ হয়, এইটাই তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা ছিল। ভারতবর্ষ যে কালে স্বরাজলাভ করিবেই, ইহা তিনি তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—যদিও স্বরাজ কথাটী তিনি ব্যবহার করেন নাই। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য তিনি তৎকালোচিত অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় উন্নতির চেষ্টায় তাঁহাকে আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ভারতবর্ষের মুক্তির সাধনে তিনি নিরস্ত্র-চেষ্টার প্রবর্ত্তক ছিলেন এবং শাসনকর্ত্তাদিগের সাহায্যে তিনি এই সকল করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

ভারতবাসী বিদ্যালাভ প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ পাইলে য়ুরোপবাসীর যে সমকক্ষ হইতে পারিবে, এই মত তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় জ্ঞানসমষ্টি যে পাশ্চাত্য জ্ঞানসমষ্টি অপেক্ষা কোনগুণে হীন নহে, এই কথাই তিনি বিশ্বাস করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের এমন স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা থাকা সত্বেও তাঁহার হৃদয়ে একটী অতি উদার বিশ্বজনীন মানবপ্রেম ছিল। বিদেশী কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিলে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইত, এবং স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টায় কোন জাতি বিফলপ্রযত্ন হইলে তিনি মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইতেন। আয়র্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় তিনি সেই জাতির প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের প্রতি ইংলণ্ডের অত্যাচারের বিষয়ে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জাতিদেশনির্ব্বিশেষে তাঁহার স্বাধীনতা-প্রিয়তা কত প্রবল ছিল, ইহা হইতেই বুঝা যায়।

সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মবিষয়ে ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও তিনি সকলের মঙ্গল ও স্বাধীনতাপ্রার্থী ছিলেন। এই সকল সাধনা তিনি তাঁহার জীবনের মুখ্যব্রত করিয়াছিলেন, এবং এই সকল সাধনার পথে নানারূপ বাধাবিঘ্ন থাকা সত্বেও তাঁহার সঙ্কল্পের স্থিরতা সামান্যমাত্রও ভ্রষ্ট হয় নাই। বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের মূলে রাজা রামমোহন রায়ই ছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানাদির জ্ঞানলাভ আবশ্যক, এবং সেই সময়ে ইংরাজী না জানা থাকিলে এই প্রকার জ্ঞানলাভের অন্য উপায় নাই দেখিয়া তিনি ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেন এবং তাহার ফলে বর্ত্তমান শিক্ষালাভের মূলভিত্তি স্থাপন করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা উচিত নহে যে, তিনি কেবল বিদেশী শিক্ষাপ্রচারেই যত্নপরায়ণ ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের অতুলনীয় পরাবিদ্যা যাহাতে লুপ্ত না হয়, বিস্মৃতির অতলজলে নিমগ্ন না হয়, তাহার জন্য নিজে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন।

রাজা রামমোহন রায় একজন বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন দেখিয়াই অধুনা সমস্ত সমাজেই তাঁহার এমন সমাদর। তিনি পৃথক পৃথক ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি মধ্যে সকলের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার দ্বারাই একটী মিলনের সত্যপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি দেশে দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে একটী মিলনস্থান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে আদানপ্রদান ধনীদরিদ্রের আদানপ্রদানের ন্যায় না হয়—সমান-সমানের ন্যায় হয়, তাহার নিমিত্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোরাজ্যের মধ্যে একটী সেতু রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের নিকট বিশেষ করিয়া নারীসমাজ অধিক সমাদরের বিষয়। তিনি যে কেবল পুরুষের হীনদশা দেখিয়া তাহার মুক্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন এমন নহে, ভারতসমাজে নারীর দুর্গতি দেখিয়াও তিনি বড় দুঃখ পাইয়াছিলেন। নারীর দায়াধিকার ও নারীর সামাজিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষিতা নারীসমাজের অপেক্ষা অন্য কেহ বোধ হয় অধিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে তাঁহার সমতুল্য ভারতে অদ্যাপি কোন সমাজসেবক জন্মায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দণ্ডবিবেক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

দণ্ডবিবেক-গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, হিন্দুরাজত্ব আমলে পাত্রবিশেষে রাজদণ্ডের বা শাস্তির তারতম্য ঘটিত। বিচারককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে দণ্ড দিবার সময় নিম্ন কয়েকটি বিষয়ে—

জাতির্দ্রব্যং পরিমাণং বিনিয়োগঃ পরিগ্রহঃ।
বয়ঃ শক্তিগুণৌ দেশঃ কালো দোষশ্চ হেতবঃ॥

১। অপরাধীর জাতি, ২। দ্রব্য—যাহা লইয়া অপরাধ, চোরের পক্ষে হৃত সম্পত্তি, ৩। পরিমাণ—

দ্রব্যের পরিমাণ, ৪। বিনিয়োগ—হৃত দ্রব্যের ব্যবহারিক উপকারিতা ৫। পরিগ্রহ—যাহার দ্রব্য গৃহীত, ৬। বয়ঃ—অপরাধীর বয়স ৭। শক্তি—অর্থাৎ অপরাধীর অর্থশক্তি, ৮। গুণ—ন্যূনাধিক দণ্ডের প্রয়োজন, ৯। দেশ—কোন্ দেশের অধিবাসী—গ্রামের বা অরণ্যের, ১০। কাল—দিবস বা রাত্রি, ১১। দোষ—অপরাধবিশেষে। ইংরাজি আইনে স্পষ্টতঃ এরূপ বিধান না থাকিলেও বিচারকগণ এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উচিত দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। 'দোষ' বা অপরাধবিশেষ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—অনুবন্ধ ও অননুবন্ধ অর্থাৎ জীবনে একবার মাত্র কৃত (solitary) বা অনেকবার (repeated) কৃত। একবারমাত্র করিলে শাস্তির পরিমাণ অল্প। বহুবার অনুষ্ঠিত হইলে শাস্তির পরিমাণ প্রতিবারেই অধিক।

পাত্রবিশেষে দণ্ডের ন্যূনাধিক্য আছে।

"অষ্টাপাদ্যন্ত্ত শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষং, ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য, দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য তু। ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।" চৌর্য্য অপরাধে শূদ্রের চোরাই মালের মূল্যের ৮ গুণ, বৈশ্যের ১৬ গুণ, ক্ষত্রিয়ের বত্রিশ গুণ, ব্রাহ্মণের ৬৪ গুণ বা একশত গুণ অর্থদণ্ড হইবে। কেননা, হীন জাতির অজ্ঞান বশতঃ পাপ করা স্বাভাবিক। উচ্চতর জাতির সম্বন্ধে সেরূপ নহে। কাত্যায়নও ঐ শ্লোকের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

যেন দোষেণ শূদ্রস্য দণ্ডো ভবতি ধর্ম্মতঃ।
তেন বিট্ (বৈশ্য) ক্ষত্র-বিপ্রাণাং দ্বিগুণো দ্বিগুণো ভবেৎ॥

অল্প মূল্য দ্রব্যের চৌর্য্যে নারদের মতে চোরের হৃত দ্রব্যের পাঁচগুণ অর্থদণ্ড হইবে। একশত সংখ্যক রত্নের চৌর্য্যাপরাধে বধদণ্ড হইবে।

এতৎব্যতীত পাঁচটি বিষয়ের দিকে বিচারকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (১) বাধ, (২) অপকর্ষ, (৩) সাম্য, (৪) উৎকর্ষ, (৫) পরিনিষ্ঠা। বাধ অর্থে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি। ঐ বাধ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—(ক) সাধারণ, (খ) অসাধারণ। সাধারণ বাধ অনুসারে গুরু, পুরোহিত, ব্রহ্মচারী ও রাজা এই কয়েকজন বধ-দণ্ডনীয় হইবে না। রাজা অর্থে অবান্তর নরপতিও বধ দণ্ডনীয় নহেন। অসাধারণ বাধ অর্থে নিজ জীবন বা আত্মরক্ষার জন্য (self-defence) অকার্য্যকরণেও দণ্ড হইবে না। কেননা "আত্মানং গোপায়ীত" আপনাকে সতত রক্ষা করিবে, ইহা শাস্ত্রবাক্য। ঐরূপ অপরাধে রাজদণ্ডের আবশ্যক নাই, প্রায়শ্চিত্তই পাপমোচনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। ক্ষুধার্ত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও পথিক পথিপার্শ্বস্থ ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু বা মূলা বা সামান্য কিছু অপহরণ করিলে তাহারও দণ্ড হইবে না।

অপকর্ষ। চুরি করিতে হইলে পর পর অনেকগুলি কার্য্য করিতে হয়। সিঁদ কাটা, হৃতদ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন ইত্যাদি। একারণে চুরিকে "অনেক কর্ম্মকলাপসাধ্য" বলা হইয়াছে। চুরির আরম্ভে (attempt) ধরা পড়িলে প্রকৃত চুরি অপরাধের একচতুর্থ দণ্ড হইবে। চুরিকার্য্যে আর একটু অগ্রসর হইলে অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। চুরির কার্য্য সমাপ্ত হইলে চোরের পূর্ণ দণ্ড। ঐ পূর্ণ দণ্ডকেই 'সাম্য' বলে।

উৎকর্ষ। প্রথম অপরাধের জন্য দণ্ডের পরিমাণ অল্প। কিন্তু প্রথম দণ্ড ভোগ করিয়াও যাহার চৈতন্য হয় নাই—আবার অপরাধ করে, তাহার পক্ষে দণ্ডের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

পরিনিষ্ঠা। প্রাণীহত্যা ব্যতীত অপরাধে পিতা মাতা প্রভৃতির কেবল বাক্‌দণ্ড হইবে, এবং সন্ন্যাসীদিগের ধিক্‌দণ্ড হইবে। যথা "গুরূন্ পুরোহিতান্ পূজ্যান্ বাক্‌দণ্ডেনৈব দণ্ডয়েৎ"। অস্পৃশ্য, ধূর্ত্ত, ক্রীতদাস, ম্লেচ্ছ এবং অসবর্ণ-বিবাহজাত অপরাধীদিগের অর্থদণ্ড ব্যতীত অন্যরূপ দণ্ড হইবে। কেননা অন্যায়-উপার্জ্জিত বলিয়া ইহাদের অর্থ মলাত্মক অর্থাৎ মলিন। দাস পরতন্ত্র অর্থাৎ মনিবের একান্ত অধীন বলিয়া তাহাদের ধনদণ্ড হইবে না। পূর্ব্বপ্রস্তাবে সামান্যভাবে বলিয়াছি যে শিল্পীর শিল্পোপকরণ, বণিকদিগের তুলাদণ্ড এবং মান ও প্রতিমান অর্থাৎ বাটকারা, কৃষকদিগের গরুর গাড়ি ও বীজধান্য পেশাদার নাট্যজীবিদিগের বাদ্যভাণ্ড অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি, বেশ্যাগণের গৃহশয্যা অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি এবং যোদ্ধাগণের অস্ত্র-শস্ত্রাদি, রাজা অর্থদণ্ডের বিনিময়ে ক্রোক বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। কেননা ঐ সমস্ত উপকরণই তাহাদের জীবিকার উপায়মাত্র, একেবারে নিঃস্ব হইলে তাহারা আরও পাপকর্ম্ম করিবে।

কাহাকেও রাগাইয়া দিলে যদি সে বিষভক্ষণ করে, তাহা হইলে যে ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দিয়াছে, সে বধদণ্ডনীয় হইবে না। সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে, সামান্য অপরাধে বাক্‌দণ্ড, অপরাধ-চেষ্টায় ধিক্‌দণ্ড, পূর্ণ অপরাধে অর্থদণ্ড এবং রাজদ্রোহে বন্ধনদণ্ড বা নির্ব্বাসনদণ্ড। মহা অপরাধকারীর পক্ষে সকল প্রকার দণ্ডই এককালে প্রযোজ্য। বাক্‌দণ্ড ও ধিক্‌দণ্ড ব্রাহ্মণ-বিচারক দিতে পারিবেন; কিন্তু অর্থদণ্ড ও বধদণ্ড বা কারাদণ্ড

কেবলমাত্র রাজাই দিতে পারিবেন, ইহা বৃহস্পতি-সম্মত।

মনুষ্যমারণ-দণ্ড।

"অবিজ্ঞাতে হন্তরি" অর্থাৎ কে হত্যা করিয়াছে তাহা না জানা থাকিলে সুবিচার জন্য যাজ্ঞবল্ক্যের মতে রাজ-পুরুষদিগকে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) মৃতের পুত্র, বন্ধুবর্গ ও রক্ষিতা স্ত্রী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, কাহার সঙ্গে তাহার শত্রুতা ছিল।

(খ) কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া মৃত, মৃত্যুর পূর্ব্বে কাহার সহিত বাটীর বাহির হইয়াছিল অর্থাৎ নারীসংগ্রহ, দ্রব্য-সংগ্রহ অথবা জীবিকাসংগ্রহের জন্য।

(গ) যে স্থানে হত্যা হইয়াছে, সেইখানকার স্থানীয় লোকগণকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

এইরূপ নানা তথ্য লইয়া বৈর অনুমানে ঘাতক কে, তাহা স্থির করিতে হইবে।

তাহার পরে ঘাতক স্থির হইলে দণ্ডের ব্যবস্থা এই-রূপ। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ বধ হইলে তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ, অধিকন্তু বধদণ্ড প্রয়োজ্য। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র ঐ-ঐ জাতি কর্ত্তৃক নিহত হইলে ক্ষত্রিয়ের অপরাধীর পক্ষে সহস্র ধেনুদণ্ড, বৈশ্যের পক্ষে শত ধেনুদণ্ড, শূদ্রের পক্ষে দশ ধেনুদণ্ড। বৈশ্য বা শূদ্র বধ হইলে অধিকন্তু একএকটী বৃষ অপরাধীর নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপে আদায় হইবে। ঋতুমতী স্ত্রীলোককে বধ করিলে ক্ষত্রিয়বধের জন্য যে দণ্ড, তাহাই প্রয়োজ্য হইবে। ব্রাহ্মণ যদি অন্য তিন জাতির মধ্যে কাহাকেও হত্যা করে, তাহা হইলে অপর তিন জাতি কর্ত্তৃক হত্যা হইলে যে সাজা হয়, ব্রাহ্মণেরও সেই সাজা বা দণ্ড হইবে, ইহা বৌধায়নসম্মত। যদি কতকগুলি লোক একত্র মিলিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া কাহাকেও হত্যা করে, তাহা হইলে যাহার প্রহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি বধদণ্ড-যোগ্য, তাহার সঙ্গীগণ সহায় বিধায় তাহাদের প্রত্যেকের দণ্ডের পরিমাণ অর্দ্ধেক, একথা আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। যদি কেহ অপরকে অর্থসাহায্যে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা সাহস বা অপরাধের কার্য্য করায় (কারয়েৎ), তাহা হইলে অপরাধী যে দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, ষড়্যন্ত্রকারীর দণ্ড তাহার চতুর্গুণ হইবে।

ব্রাহ্মণেতর জাতিহত্যা সম্বন্ধে বৌধায়নসম্মত দণ্ড যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা গ্রন্থকার বর্দ্ধমানের অভিমত নহে। বর্দ্ধমান স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন "স্বজাতীয়-বধে বধ এব দণ্ডঃ" অর্থাৎ স্বজাতিবধে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-বধে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়-বধে, বৈশ্য বৈশ্যবধে, শূদ্র শূদ্রবধে বধদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং উক্ত মতের পোষকতায় বর্দ্ধমান আপস্তম্ব মুনির এক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, "ঘাতনে তু প্রমাপণং" হত্যা করিলেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

উপরে যাহা বিবৃত হইল তাহা কামকৃত অপরাধ অর্থাৎ (intentional) ইচ্ছাকৃত। যেখানে অপরাধ কামকৃত নহে, কিন্তু প্রমাদকৃত বা অকামকৃত (unintentional) তাহা "দণ্ডপারুষ্য"পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। তাহার সারাংশ পরে বিবৃত করিব।

ইতিপূর্ব্বে অকারণ প্রাণীবধেও যে বধকারী দণ্ডার্হ হইত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে—"হংস, বায়স, বর্হিণ, চক্রবাক, বলাকা, কাক, উলুক (পেচক), মণ্ডুক, নকুল, অহি, খঞ্জরীট, বভ্রু-নকুলাদীনাং বধে শূদ্রবৎ"। নকুল অর্থে জলনকুল (সম্ভবতঃ ভোঁদড়), বভ্রু-নকুল অর্থে স্থলনকুল অর্থাৎ বেঁজি। ইহাদিগকে অকারণ বধ করিলে শূদ্রহত্যা করিলে যে দণ্ড হয় (এখানে বধদণ্ড নহে), তাহাই প্রযোজ্য। ইহার মধ্যে কয়েকটি প্রাণী সম্মার্জ্জক-শ্রেণীভুক্ত বিধায় তাহাদের বধ শাস্ত্রবিরোধী ছিল।

গ্রন্থপরিচয়।

ক্ষণজন্মা ক্ষণাদেবী—শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোং, ২২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

নারীর বিষয় লিখিবার ভার লইয়াছেন নারী। খুবই সঙ্গত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী; তন্মধ্যে অধিক পৃষ্ঠায় ক্ষণার জীবনী লিখিত বাকী অংশে ক্ষণার বচন। আমরা বহু পূর্ব্বে "নবনারী"-গ্রন্থে ক্ষণার সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পরে এবিষয়ে আর কোন সাড়াশব্দই পাই নাই। এই গ্রন্থে উহা নবতরভাবে লিখিত দেখিতেছি। গ্রন্থখানির লিখনভঙ্গী খুবই ভাল। ইহার ভিতর একটি পবিত্র ভাবের হাওয়া বহমান। গ্রন্থখানি প্রত্যেক বালক-বালিকার হস্তে দিবার উপযুক্ত। পরিশিষ্টে "ক্ষণার বচন"গুলি দেওয়ায় গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে,

মনে হয়। এই বচনগুলির অতিরিক্ত আরও অনেক বচন খনার নামে প্রসিদ্ধিগাভ করিয়াছে।

উপনিষৎরহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা প্রণীত; মূল্য ৸৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান:—উপনিষৎরহস্য-কার্য্যালয়—কোঁড়ার বাগান, হাওড়া।

গ্রন্থের নাম "উপনিষৎরহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা"। আমাদের মনে হয়, শেষোক্ত নামই অর্থাৎ 'গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা' গ্রন্থের উপযুক্ত নাম। আমরা গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম। আমরা যে ভাবে উপনিষদ পড়ি ও জানি, সে ভাবে উপনিষদের রহস্য বিষয়ে কোন তত্ত্ব গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া দেখি না। গ্রন্থে গীতার বিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায়ই সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাগুলি ভক্তের প্রাণের ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। সংস্কৃত শব্দগুলি ব্যুৎপত্তির ভিতর দিয়া দেখিতে চাহিলে অনেক অর্থই প্রকাশ করিতে পারে। এই দিক দিয়া অনেক পণ্ডিত গীতারও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা গীতার এবং মহাভারতীয় যুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করি; কাজেই গীতায় ব্যবহৃত শব্দগুলির অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য অর্থ ধরিবার পক্ষপাতী নহি। শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ দুর্য্যোধন অর্থে দুর্দ্দমনীয় মন এবং পঞ্চপাণ্ডব অর্থে পঞ্চকোষ এবং আরও অনেক শব্দের অনেক প্রকার কষ্টসাধ্য অর্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাখ্যাগুলি এই সকল কষ্টসাধ্য অর্থের উপর দাঁড় করাইলেও আমাদের বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে। ইনি 'কুরুক্ষেত্র'-শব্দের উৎপত্তি কৃ-ধাতুর অনুজ্ঞাসূচক "কর"-অর্থবাচক "কুরু" শব্দ হইতে বলিয়াছেন—ইহা নূতন বটে; কুরুক্ষেত্র-শব্দের এই ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণের এই সকল ব্যাখ্যা যখন "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা সেগুলি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। এখন শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া ভক্তদিগের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন।

খৃষ্টানুসরণ—খৃষ্টতত্ত্বপ্রচারসমিতি কর্ত্তৃক ২নং ওয়েলিংটন লেন হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

আমরা গ্রন্থখানি দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। ইহার আকার পরিপাটি। ইহা "ইমিটেশন অফ ক্রাইষ্ট" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ। ইতিপূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের ভাব লইয়া অনেক ছোট-বড় গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ এই প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও উপাসনার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় যখন ইহার অনুবাদক, তখন অনুবাদের ভাষা যে সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা ইহার অনেকাংশ পড়িয়া দেখিলাম। বাস্তবিকই অনুবাদটী সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রকাশে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইল, তাহা বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি না। ইহার ভূমিকা যদি সত্যই শ্রীযুক্ত শোর-মহোদয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বঙ্গভাষায় জ্ঞান দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। কেবল একটি স্থানে তিনি 'ননখৃষ্টিয়ান্' শব্দের অনুবাদ 'ন-খৃষ্টান' করিয়াছেন, আমাদের মতে উহা 'অ-খৃষ্টান' করিলেই ভাল হইত। এই প্রসঙ্গে আমরা সাবিত্রীপ্রসন্ন বাবুকে একটি অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যদি রাজা রামমোহন রায়ের "Precepts of Jesus"—Guide to peace and Happyness" গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, তবে উহা কেবল খৃষ্টির সম্প্রদায়ের নহে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের ভক্তিপিপাসুমাত্রেরই উপকার সাধন করিবে।

পল্লীস্বাস্থ্য ও সরল স্বাস্থ্য-বিধান:—৩য় সংস্করণ। ৺চুণীলাল বসু প্রণীত ও শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু ও জ্যোতিপ্রকাশ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ২৫ নং মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৯১৬ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার চারি বৎসর পরেই ১৯২০ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থকারের পরলোকগমনের পর এবারে তাঁহার পুত্রদ্বয় কর্ত্তৃক ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহার তিনটী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে দেশবাসী যে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন, তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। আর কয়েক বৎসর হইল, তিনি যখন রাঁচিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দেশের স্বাস্থ্য (বা অস্বাস্থ্য) বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার নিত্যই আলাপ হইত। দেশবাসীর স্বাস্থ্যবিষয়ক দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তিনি যে কিরূপ গভীরভাবে চিন্তা করিতেন এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের উপায়সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সময়েই তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থ এবং "খাদ্য" প্রভৃতি

গ্রন্থ, তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী সেই আকুল চিন্তার ফল। গ্রন্থের বাহিরের আকার যেমন সুন্দর, ইহার লিখিত বিষয়গুলিও সেইরূপ সুন্দর ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি যে, তাঁহারা দেশবাসীর স্বাস্থ্যবিধানে ইচ্ছুক হইলে এই পুস্তকখানি যেন প্রবেশিকার জন্য পাঠ্যনির্দ্দিষ্ট করেন। আমরা দেখিয়াছি, স্বাস্থ্যবিধানসম্বন্ধীয় বালোপযোগী পুস্তক নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্যনির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বালকদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। সেইরূপ প্রবেশিকার জন্য এই গ্রন্থের এক-একটী বিশেষ অংশ একএক বৎসরে নির্দ্দিষ্ট হইলেও সমস্ত গ্রন্থই ছাত্রদিগের দৃষ্টি ও মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করিবে। সমস্ত গ্রন্থের ভাব মনের মধ্যে বসিয়া গেলে ছাত্রগণ সংসারে যতই প্রবেশ করিবে, ততই গ্রন্থোক্ত উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। চুণীলাল বাবুর কৃতী পুত্রগণ গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। গ্রন্থটী পনেরো অধ্যায়ে বিভক্ত। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বোধ হয় এমন একটিও প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে (কেবল পারিতোষিক পুস্তকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিলে চলিবে না) অন্তর্ভুক্ত করুন বা নাই করুন, আমরা দেশের হিতকামী প্রত্যেক দেশবাসীকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাববশতঃ বিস্তৃত সমালোচনায় এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে দেখাইতে পারিলাম না, ইহার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

শয়তানের সুমতি :—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত। সচিত্র গল্পপুস্তক। মূল্য বারো আনা। প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী; ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

ছেলেদের উপযোগী ছোট গল্পের পুস্তক অনেক আছে; কিন্তু শিক্ষাপ্রদ বড় গল্প বা উপন্যাস তত নাই। আলোচ্য গ্রন্থটী সেই অভাবমোচনে সমর্থ হইয়াছে। গ্রন্থকার ছেলেদের ভাষায় তাহাদের উপযোগী করিয়া এমন নিপুণভাবে নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন যে, গ্রন্থটী শেষ না করিয়া উঠা যায় না। পাঠকালে মনেই হয় না যে, গ্রন্থকার ছেলেদের গণ্ডীর বহির্ভূত, শিক্ষকের পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাতেই গ্রন্থকারের লেখনীর সার্থকতা।

ভয়ঙ্কর :—শ্রীপ্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য দশ আনা। প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার; শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স। ২২।৫, শ্যামপুকুর লেন,—কলিকাতা।

এই গ্রন্থে ভয়ঙ্কর, বন্ধু, কাণা ও পা-কাড়া শীর্ষক চারিটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প আছে। গল্পগুলি ছেলেদের মাসিক "রামধনু" পত্রিকায় যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনই যে তাহা শিশুগণের মনোহরণে সমর্থ হইয়াছিল, এবিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সেই গল্পগুলি এখন সচিত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলিও যেরূপ কৌতূহলোদ্দীপক চিত্রগুলিও তদ্রূপ নিপুণহস্তে অঙ্কিত। আমরা প্রেমেন্দ্র বাবুর শিশুপাঠ্য অন্য কোন রচনা পূর্ব্বে দেখি নাই। মনে হয় যে, ইহাই তাঁহার প্রথম উদ্যম। আমাদের অনুমান সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার প্রথম উদ্যমেই তিনি সুন্দর সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

THE INFLUENCE OF INDIAN THOUGHT ON THE THOUGHT OF THE WEST :—স্বামী অশোকানন্দলিখিত। ৪নং, ওয়েলিংটন লেন; অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত রোঁমারোলাঁর লিখিত বিবেকানন্দ জীবনীর বিশেষ এক অংশ উপলক্ষ করিয়া এই টিপ্পনী লিখিত হইয়াছে। এই ৪৫ পৃষ্ঠাব্যাপী টিপ্পনীর মধ্যে লেখক স্বামী অশোকানন্দ তাঁহার জ্ঞানের গভীর পরিচয় দিয়াছেন; এবং পাশ্চাত্য চিন্তার উপর প্রাচ্যভাবের গভীর প্রভাব সুস্পষ্টরূপে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। পুস্তকখানি একটি নোটের আকারে লিখিত হইলেও ইহা খুবই Suggestive বা অনেক বিষয়ের ইঙ্গিতে পূর্ণ।

হীরের ফুল :—শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রণীত। দাম—ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—দি মুসলমান পাবলিশিং কোং লিঃ। ১১।৪ কড়েয়া বাজার রোড,—কলিকাতা।

এই পুস্তিকায় সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলির প্রায় সব কয়টিই ইস্‌লামীয় মহাপুরুষগণের জীবনপ্রবৃত্তি অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম হইলেও ইহা ব্যর্থ হয় নাই। মুসলমান সাহিত্যের একটা দিক এইভাবে বঙ্গসাহিত্যে আমদানী করার কারণে আমরা নবীন গ্রন্থকারকে অভিনন্দন করিতেছি। কিন্তু আমাদের একটা বক্তব্য এই—হিন্দুই হই, মুসলমানই হই, আমরা সকলেই যখন বাঙ্গালী, তখন বাঙ্গালী যে ভাষা বলে, সেই ভাষাই ব্যবহার করা উচিত। কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যদি বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিতে বসিয়া বাংলার অপ্রচলিত সংস্কৃতশব্দের বহুল প্রয়োগ

করেন, তাহাও যেরূপ সুখপাঠ্য হয় না, সেইরূপ ইস্লামীয় ভ্রাতাগণ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে গিয়া আর্ব্বী উর্দ্দু শব্দের বহুল প্রয়োগ করিলে সুখপাঠ্য হইবে না। গ্রন্থের স্থানে স্থলে এই দোষ লক্ষিত হইলেও, অধিকাংশ স্থলই সুবোধ্য।

কল্যাণ—শ্রীকৃষ্ণসংখ্যা— আমরা 'কল্যাণ' নামক হিন্দী মাসিক পত্রের শ্রীকৃষ্ণসংখ্যা পাইয়া যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলাম। মাসিক পত্রের সংখ্যা বলিতে যাহা বুঝায় শ্রীকৃষ্ণসংখ্যা তাহা নহে। ইহা ডবল ডিমাই ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী cyclopoedia বা বৃহৎ কোষ-অভিধান বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। ইহাতে আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানা দিক হইতে আলোচিত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কামধেনু বা কল্পতরু। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যিনি যাহা অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ইহাতে তদ্বিষয়ক কোন না কোন সত্যের সন্ধান নিশ্চয় পাইবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান যুগের জনসাধারণ যে দিকটা বেশী দেখিতে চান, সেই ঐতিহাসিক গবেষণার দিক আশানুরূপ আলোচিত হয় নাই। মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় অনেক প্রচলিত বিষয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার চিত্রগুলি অতীব সুন্দর। কোন বাংলা গ্রন্থে এত অধিক-সংখ্যক ও এরূপ সুন্দর চিত্রের সমাবেশ আমরা দেখি নাই।

কল্যাণসম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মাসিক পত্রের গীতাজয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাও গীতাসম্বন্ধে একটী প্রকাণ্ড গ্রন্থবিশেষ। এই দুই সংখ্যা সম্পাদকমহাশয়ের কর্ম্মকুশলতার অক্ষয় পরিচয় প্রদান করিবে। ইহার পর এই পত্রের কোন্ কোন্ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে, আমরা তাহার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

গৃহস্থের সাধন—ডাক্তার শ্রীচণ্ডীচরণ পাল সঙ্কলিত এবং শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ১২নং বৃন্দাবন পালের লেন আমানন্দ-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ বার আনা।

গ্রন্থকার একজন নিষ্ঠাবান গীতাভক্ত। তিনি তাঁহার গুরুদেবের কৃপায় গীতার ভিতর দিয়া যে সকল সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মূল বক্তব্য এই যে, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে গীতোক্ত সাধনা অবলম্বনে ধর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। মোটামুটি বলিতে পারি, তাঁহার মূল কথার সহিত আমরা একমত। গীতাভক্ত সাধনপিপাসুদিগের নিকট এই গ্রন্থ পরম উপাদেয় লাগিবে। ইহার সর্ব্বশেষে "কলিকাতা নিখিল বঙ্গনারী-সম্মিলনে" সভানেত্রী শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা সংযুক্ত করিবার সঙ্গতি বুঝিলাম না। সম্ভবতঃ দপ্তরীর প্রমাদবশতঃ এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

বলযৈভিকী—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান আর্য্যশক্তি লাইব্রেরী, ১২নং কলেজ স্কোয়ার।

গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। "বলযৈভিকী" নাম দেখিয়া আমরা বড়ই ভীত হইয়াছিলাম যে, ইহার যথাযথ সমালোচনা করিতে পারিব কি না। আমাদের মনে বড়ই ভয় ছিল যে, ইহা একখানি রাজনৈতিক গ্রন্থ এবং হয়তো ইহা অসহযোগের পরিবর্ত্তে অত্যুগ্র ভাবের ঝোঁকে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই আশ্বস্ত হইলাম। প্রবীণ লেখকের প্রবীণতা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নবীনের প্রতি স্নেহ বলযৈভিক সম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্বের দিকে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে। আমরা আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে কর্ম্মের বিরাট ভূমির পরিবর্ত্তে জন্মের সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাই বলিয়া আমাদের সমাজে এত বিরোধ-বিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বতন ঋষিদিগের ন্যায় আমরাও যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে কর্ম্মগত করিয়া তুলি এবং কথায় কথায় সামান্য দোষ বা বারেক পদস্খলনের জন্য ক্রমাগত আপন-জনকে বিচ্ছিন্ন করিবার পরিবর্ত্তে জগদ্বাসীকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা ও অধিকার সঞ্চয় করি, তবে বর্ত্তমানে দাসমনভাবের কারণে 'বলযৈভিক' নামেই আমরা যেরূপ নৃত্য করিতে থাকি, সেরূপ নৃত্য করিবার কোনই প্রয়োজন থাকিবে না। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ভারতের বিশেষ ধন; সেই ধনকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের সকল কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হইবে। মস্তক যদি বিকৃত হয়, তবে সমস্ত শরীরই বিকল হইয়া যায়; কিন্তু মস্তক যদি ঠিক থাকে তবে এক-আধ অঙ্গ বিকল হইলেও তাহার প্রতীকার সম্ভব হয়। আমাদের শাস্ত্রে এই কারণে সকল তত্ত্বের শিরস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে আমাদের দেশে তর্কশাস্ত্রাদিতে উপর হইতে নীচে নামা বা অবরোহপ্রণালী গৃহীত হয়, কিন্তু নীচে হইতে উপরে যাওয়া বা আরোহপ্রণালী অবলম্বিত হইতে দেখা যায় না। আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও এই অবরোহপ্রণালীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য সমাজে নব নব উদ্ভাবিত রীতিনীতিগুলি আরোহ-

প্রণালীর পরীক্ষার অগ্নিতে উত্তীর্ণ হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, সেগুলির কোন্‌টী অবলম্বনীয় আর কোন্‌টীই বা পরিত্যজ্য। আলোচ্য গ্রন্থে মোটামুটি বলিতে গেলে এই তত্ত্বই বিশদরূপে বোঝান হইয়াছে। আশা করি গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য মোহে বিশেষতঃ বলশেভিক নামের মোহে মুগ্ধ নবভারতের তরুণসম্প্রদায় দাস মনোভাব পরিহারপূর্ব্বক দেশের যাহা কিছু ভাল আছে, তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিবার মতিগতি লাভ করিবেন এই গ্রন্থ আমরা প্রত্যেক তরুণ যুবকের হস্তে দেখিতে পাইলে সুখী হইব।

সমস্যা ও সমাধান :—শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ প্রণীত। মূল্য ১।০ সিকা। প্রাপ্তিস্থান—৯১ নং আপার সার্কুলার রোড্‌—কলিকাতা।

এই গ্রন্থখানির নাম বিষয়ের উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে চারিটী বিষয়ের সমস্যা উপস্থিত করা হইয়াছে; এবং মুসলমানদিগের শাস্ত্র অনুসারে বিশেষতঃ কোরাণের উপর দাঁড়াইয়া এই চারিটী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। জনাব মহম্মদ আক্রাম খাঁ মুসলমান-শাস্ত্রে যেরূপ সুপণ্ডিত, তাহাতে তাঁহার নিকট উপযুক্ত সমাধানই পাওয়া গিয়াছে। প্রথম সমস্যা "এসলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার"। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, মুসলমান শাস্ত্রে নারীকে উচ্চ মর্য্যাদা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তিনি দু'এক স্থলে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত এসলাম শাস্ত্রের তুলনা করিয়া শেষোক্ত শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এই স্থলে তর্কবিতর্ক করিবার স্থান নাই, সুতরাং কোন্‌ শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ এবং কোন্‌ শাস্ত্র অশ্রেষ্ঠ, এস্থলে সে বিষয়ের আলোচনা করিতে বিরত রহিলাম। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, আমাদের শাস্ত্রে সমগ্র স্ত্রীজাতিকে মাতৃত্বের আসনে বসাইয়া অতি উচ্চ মর্য্যাদা ও অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। আমরা বিবেচনা করিতাম যে, কোরাণশাস্ত্র অনেক বিষয়ে মানবের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ভাবের উপর দণ্ডায়মান। আক্রাম খাঁ সাহেবের আলোচ্য নিবন্ধে আমাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। দ্বিতীয় সমস্যায় সুদ লওয়া বিষয়ে তিনি দেখাইয়াছেন, সুদ লওয়া কোরাণবিরুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রেও সুদ লওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর শপথ দেওয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ যেভাবে গঠিত, তাহাতে স্বভাবতঃ সুদ লওয়া বন্ধ হইতে পারে না। এস্থলে কি হিন্দুশাস্ত্র, কি এসলাম শাস্ত্র স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়াছেন বলিয়া কোনটাই ইহার গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই, যদি জনাব সাহেব সুদ লওয়ার উপযুক্ত গতি বা proper direction এসলাম শাস্ত্র হইতে দেখাইতে পারিতেন, তবে বোধ হয় তিনি মুসলমান সমাজকে নবতর মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। তৃতীয় সমস্যায় সঙ্গীতবিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, মন্দ সঙ্গীত পরিত্যাজ্য এবং ভাল সঙ্গীত শিক্ষণীয়। ইহাই তো ঠিক কথা। কারণ ইহা মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তির উপর দণ্ডায়মান। ভগবান কর্ত্তৃক মানবাত্মার নিহিত সাধুবৃত্তিসমূহের বিরুদ্ধে যে শাস্ত্রে যাহাই কেন বলা হউক না, আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না, যথাসময়ে পরিত্যক্ত হইবেই। সঙ্গীতশিক্ষা এসলাম শাস্ত্রের বিরোধী হইলে মুসলমান বাদসাহ প্রভৃতির সভায় এবং মুসলমান ওস্তাদগণের মধ্যে উহা যেপ্রকার প্রসার ও উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা কখনই সম্ভব হইত না। গ্রন্থোক্ত চতুর্থ সমস্যা চিত্র বিষয়ে। ইহার প্রথমাংশ পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম যে, ইসলাম-শাস্ত্রে চিত্রবিষয়ে সমস্যারও সমাধান করা হইয়াছে মানবের স্বাভাবিকতার উপর দাঁড়াইয়া। কিন্তু এই নিবন্ধের শেষাংশে যে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার সহিত প্রথমাংশের সম্পূর্ণ মিল দেখিতে পাইলাম না। সাধারণত বস্ত্রে জীবজন্তু অঙ্কিত থাকিলে নির্দ্দোষ হইবে, কিন্তু উহা দেওয়ালে টাঙ্গাইলে সদোষ হইবে—ইহার কারণ ও তত্ত্ব একটু বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত।

যাই হৌক, আমরা এই গ্রন্থখানির প্রকাশে বড়ই সুখী হইয়াছি। তাহার একটি প্রধান কারণ, ইহা হিন্দু ও মুসলমান সমাজ হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে বিশেষ সহায়তা করিবে। গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ এবং লিখনভঙ্গী সুন্দর। ইহাতে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তিলমাত্র বিদ্বেষের ভাব পরিলক্ষিত হয় না। আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের নেতৃবৃন্দকে এই গ্রন্থপাঠে অনুরোধ করি।

ইঙ্গিত :—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান :—বরদা এজেন্সী, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট—কলিকাতা।

গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে "ইঙ্গিত"। আমরা কিন্তু ইহার নাম দিতে চাই "রত্নহার"। ইহাতে আটত্রিশটী বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেকটী এক-একটী রত্নবিশেষ। সমগ্র গ্রন্থে পবিত্রভাবে সুমঙ্গল বায়ু প্রবহমান। ইহার ভাষাও অতি সুন্দর। এই গ্রন্থ প্রত্যেক বালক-বালিকার পাঠোপযোগী; আশা করি, ইহা বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদিগকে পারিতোষিকরূপে বহুল বিতরিত হইবে।

কিরূপে রোগী দেখিতে হয়—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ন্যাষ-কৃত How to take the case গ্রন্থের অনুবাদ। মূল্য বার আনা। প্রাপ্তিস্থান ভারত পাব্‌লিশিং হাউস, ২১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

আমরা যতদূর দেখিলাম তাহাতে মনে হয়, অনুবাদটী সুন্দর ও সুখবোধ্য হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক এবং চিকিৎসার্থী উভয়ই বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে হোমিওপ্যাথির ন্যায় সুলভ অথচ ফলদায়ক চিকিৎসাই অবলম্বন করা ব্যতীত আর কোন উপায় দেখি না। সেই জন্য হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ যতই সুবোধ্য ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হইবে, ততই আমরা আনন্দিত হইব।

রাসলীলা :—শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান শান্তিপুর, নদীয়া।

এই ৩৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তিকার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থকার রাসলীলা ও গোষ্ঠবিহার সম্বন্ধীয় পুরাতন তত্ত্ব নূতন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীকীর্ত্তনকুসুমাঞ্জলি বা সাধনতত্ত্বসার :—কথক শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল বিদ্যারত্ন প্রণীত। মূল্য—১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শান্তিপুর, নদীয়া।

গ্রন্থখানি সংকীর্ত্তনের তত্ত্ববিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র কোষ-গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সংকীর্ত্তন বিষয়ক প্রায় সকল তত্ত্বেরই বিবরণ ও প্রণালী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং ইহা বৈষ্ণব সাধকদিগের বিশেষ উপাদেয় লাগিবে নিঃসন্দেহ। তবে তিনি যে সকল কীর্ত্তনপদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলির রচয়িতাগণের নাম উল্লিখিত না থাকায় প্রাচীন পাঠের সহিত গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া দেখা সুসাধ্য হইল না। সে ভার আমরা কীর্ত্তনগায়ক ও বৈষ্ণব-সাধকদিগের উপর ন্যস্ত করিলাম।

জ্ঞানের প্রদীপ :—শ্রীরামচন্দ্র দত্ত বিদ্যাভূষণ তত্ত্বনিধি প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—আম্রতলা পোঃ ছয়ঘরিয়া,—খুলনা।

ইহা ৪৭ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং গ্রন্থকারের "সংসার-ধর্ম্ম ও গৃহচিকিৎসা" পুস্তকের পরিশিষ্টরূপে লিখিত। তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে সংসারধর্ম্ম সুচারুরূপে প্রতিপালন করা অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব অতীব সংক্ষিপ্ত আকারে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা গত সংখ্যায় "সংসারধর্ম্ম ও গৃহচিকিৎসা"র সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছি। ঐ গ্রন্থ যাহারা পাঠ করিবেন, তাঁহাদের নিকট এই পুস্তিকাখানি বিশেষ সমাদৃত হইবে। আমাদের পুস্তিকাখানি ভালই লাগিয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়া :—শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু এম-এ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য—এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আত্মশক্তি লাইব্রেরী; ১৫নং, কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা।

এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু প্রণীত "সোভিয়েট রাশিয়া" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদটী আমরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম। অনুবাদের ভাষা অতি পরিপাটী হইয়াছে। নেহেরু-মহোদয়ের গ্রন্থটী প্রধানতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার বহিরাকার বিষয়েই লিখিত। সমস্ত দেহ পরিপুষ্ট ও সুস্থ থাকিলে মস্তিষ্ক যেরূপ সবল থাকিবার সম্ভাবনা, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনপদ্ধতি, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি বহিরঙ্গ-সকল উন্নতির অভিমুখে পরিচালিত হইতে হইতে পরিণামে ইহারা সমগ্র দেশকে এক অভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে উপনীত করিবে। আলোচ্য গ্রন্থে সোভিয়েট রাশিয়ার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তথ্যসমূহ বেশ একটু নূতনভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এই একটি চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইতেছি যে, বর্ত্তমান রুশিয়া সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ প্রকাশের ফলে ভারতবাসীর মস্তকে ইতিপূর্ব্বে রুশভীতির যে পাষাণ চাপান ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে অপসারিত হইয়াছে।

স্বামী-শিষ্য-প্রসঙ্গ—১ম ও ২য় খণ্ড। স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি-লিখিত। মূল্য যথাক্রমে ছয় আনা ও ১৲ টাকা। লালতারা-বাগ, হরিদ্বার হইতে প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ডের নিবেদনে একস্থানে রচয়িতা যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমরাও একমতে বলি যে, সাধনপথের—প্রকৃত মোক্ষপথের অগ্রগামী পথিক হইতে চাহিলে দ্বৈত-অদ্বৈত এবং অন্যান্য শত মতবাদ লইয়া কলহবিবাদ করা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী নিবেদনে গীতোক্ত মতামত লইয়া তর্কবিতর্কের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করায় পাঠকদিগের অন্তরে বিরোধ আসিবার অবসর প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমৎভোলানন্দ গিরির যে স্বল্পসংখ্যক বাক্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই সাধনপথের পথিকদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমরা জানি, শ্রীমৎভোলানন্দের অনেক শিষ্য ভারতে অন্ততঃ বঙ্গদেশের চারিদিকে বহু-বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া আছেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়। উহাতে গুরু-শিষ্যসংবাদের নাটকীয় আকার না দিলেও চলিতে পারে। এরূপ গ্রন্থে বিসূচিকা দেবীর একাগাড়ীতে চড়িয়া আবির্ভাব এবং অপর এক সাধুর আদেশে সেই একার

থোড়া বাদিয়া তিরোভাব-বিষয়ক উপাখ্যান স্থান না পাইলেই ভাল হইত। কারণ সেগুলি শ্রীমৎভোলানন্দের শিষ্যগণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইলেও বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হইবে বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর অষ্টোত্তরশতনাম—অনুবাদক শ্রীচণ্ডীচরণ পুরাণতীর্থ। মূল্য দুই আনা। প্রাপ্তিস্থান পোঃ পলাশবন, জেলা বর্দ্ধমান।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ পুরাণতীর্থ ভাগবত পুরাণোক্ত গঙ্গার একশত আট নাম তাহার গদ্য ও পদ্যানুবাদ-সহ প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদগুলি আধুনিক কালের ঠিক উপযুক্ত না হইলেও উহার দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকগুলি বুঝিবার বেশ সুবিধা হইয়াছে। গঙ্গাপূজার মন্ত্রগুলিও ইহার শেষাংশে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় হিন্দু মাত্রেরই উপকারে আসিবে। আমাদের মনে হয়, এই পুস্তিকার শেষাংশে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাস্তোত্রগুলিও সানুবাদ সংযোজিত করিয়া দিলে পুস্তিকাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

অধ্যাত্ম-বিদ্যা—স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি-লিখিত; মূল্য ॥০ আট আনা। প্রাপ্তিস্থান লালতারা-বাগ, হরিদ্বার।

গ্রন্থখানি শ্রীমৎভোলানন্দ গিরির অধ্যাত্মবিষয়ক সদুপদেশে পূর্ণ। কয়েকটী স্থল ব্যতীত উপদেশগুলি আমার বড়ই ভাল লাগিল। শ্রীমৎমহাদেবানন্দ গিরি সর্ব্বজনমান্য তাঁহার গুরুদেবের উপদেশগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে চিনিবার সুবিধা দিয়াছেন এবং সাধনপিপাসুদিগের মহোপকার করিয়াছেন। একটী উপদেশে আছে, 'গুরুবাক্য অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে'। বোধ হয়, ইহা অক্ষরশঃ স্বীকার করিতে হইবে এরূপ বলা শ্রীমৎভোলানন্দের উদ্দেশ্য নহে; কারণ তাহা যদি হইত তবে সদ্‌গুরুনির্ব্বাচন লইয়া কোন উপদেশ অথবা এক গুরু ছাড়িয়া শিষ্যের অপর গুরু গ্রহণ করার দৃষ্টান্তও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত না; যে গীতা অবলম্বনে শ্রীমৎভোলানন্দের উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের অনেক উক্তিসম্বন্ধে অর্জ্জুনের সংশয় উঠিবার কথাই থাকিতে পারিত না। আমরা অন্ধভক্তির পক্ষপাতী নহি। 'যুক্তিহীন বিচারের ফলে ধর্ম্মহানি হয়' মনুসংহিতার এই উক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

ভাগবত-কুসুমাঞ্জলি—রায়বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন-প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা। প্রাপ্তিস্থান "কমলকুঞ্জ"; ১১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া ভক্তিসাগর গ্রন্থকারের কৃষ্ণনিবেদিতচিত্তের ভক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি যথার্থ ভক্তের প্রাণে ভাগবত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই এই গ্রন্থের শ্লোকগুলি অন্তরমুখী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ এত সরল ও সুখবোধ্য করিতে পারিয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এই-রূপ অনেক গ্রন্থ প্রকাশপূর্ব্বক ভক্তিপিপাসুদিগের উল্লাসবর্দ্ধন করিবেন।

জাতিভেদ:—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত। মূল্য—।০ চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—কটন্ লাইব্রেরী, ঢাকা।

পুস্তিকাখানি পড়িয়া মনে হয়, যেন কোন সভার বক্তৃতাকারে পঠিত বা তদুদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং বলা বাহুল্য, ইহা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের মত সর্ব্বশেষে প্রকাশ পায় যে, গুণকর্ম্ম অনুসারে জাতিভেদ হওয়া কর্ত্তব্য; এবং প্রাচীন ভারতে তাহাই প্রচলিত ছিল। আমরা তাঁহার সহিত এবিষয়ে একমত। প্রাসঙ্গিকভাবে লেখককে জাতিভেদের ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে হইয়াছে। সেই সকল কথায় জাতিভেদসম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্ত নানা ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নবভারতের সমাজকে নবতর গঠন দিবার প্রয়াসী নেতৃবৃন্দকে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহাদের বিশেষ উপকারে আসিবে।

মর্ম্মনির্ঝর:—শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা—'কমলকুঞ্জ' হইতে প্রকাশিত।

পুস্তকাখানির "মর্ম্ম-নির্ঝর" এই নামকরণ উপযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভাবুকের মর্ম্ম-উৎস হইতে উৎসারিত কয়েকটী ভাবকণিকায় সংরচিত। ভাবকণিকাগুলি সমস্তই বলিতে গেলে ভগবানের চরণাভিমুখী; সুতরাং বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে পবিত্রতার সুমন্দ বায়ুহিল্লোল প্রবহমান। ইহা পড়িতে পড়িতে চিত্তকমলে প্রগাঢ় শান্তি আসিয়া অধিষ্ঠিত হয়।

পূর্ণ-জ্যোতি:—স্বামী পূর্ণানন্দ-কথিত এবং চক-বাজার ধর্ম্মপ্রাণ হইতে শ্রীমতিলাল সেন বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থে সাধারণতঃ ধর্ম্মপথের পথিক কি প্রকার সাধনের দ্বারা অগ্রসর হইবেন, তাহাই সুন্দরভাবে উল্লিখিত

হইয়াছে। একজন প্রকৃত সাধকের উপদিষ্ট বাণী বলিয়া ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। ঐ সকল বাণী সংস্কৃত শ্লোকের আকারে নিবদ্ধ বলিয়া উহার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান সাধুহৃদয় ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থোক্ত উপদেশের দ্বারা লাভবান হইবেন নিঃসন্দেহ।

চলন্তিকা—শ্রীরাজশেখর বসু সঙ্কলিত। মূল্য ২৸৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স; ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় ৺চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের অন্যতম পুত্র। চন্দ্রশেখর বাবু একদিকে বর্দ্ধমান রাজসরকারে কর্ম্মোপলক্ষ্যে স্বীয় কর্ম্মপটুতার সুপরিচয় দিয়াছেন; সেইরূপ তিনি তাঁহার "অধিকার-তত্ত্ব" "বেদান্তপ্রবেশ" প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সাহিত্যপ্রিয়তা, রচনা-শক্তি ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে গভীর অভিজ্ঞতার সুপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাজশেখর বাবুও "বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে"র সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে বলিতে গেলে একচ্ছত্রী পরিচালকরূপে অবস্থিত থাকিয়া একদিকে কর্ম্মদক্ষতার আশ্চর্য্য পরিচয় দিতেছেন, অপর দিকে এই 'চলন্তিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে গভীর অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও এই গ্রন্থপ্রকাশে তাঁহার যথেষ্ট শক্তিমত্তাও প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়িতাম তখন "Slang Dictionary" নামক ইংরাজী চলিত ভাষার একখানি অভিধান দেখিয়াছিলাম। সেই অবধি বাঙ্গালা ভাষায় ঐরূপ একখানি অভিধান প্রণয়ন করার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থখানি আমার সেই ইচ্ছা একপ্রকার পূর্ণ করিয়াছে বলিতে পারি। আমরা পরীক্ষার্থ কয়েকটী শব্দ ইহাতে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলাম; সেই সব শব্দ অন্য বড় বড় অভিধানে পাইলাম না, কিন্তু সেইগুলির প্রত্যেকটা এই গ্রন্থে পাইলাম। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ব্যাকরণঘটিত, বানান-ঘটিত প্রভৃতি বঙ্গভাষাসম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্বসকল যে প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অনেক শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তাদির দ্বারা যে প্রকার সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে কেবল সাহিত্যসেবী নহে, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকটেও ইহার উপকারিতা সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি যাঁহাদের কিছুমাত্র অনুরাগ আছে, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমরা এই গ্রন্থের এক একখানি নিঃসঙ্কোচে ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ইহার একখানি সঙ্গে থাকিলে অনেক বড় বড় অভিধান কিনিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

মহেশ্বরপাশাপরিচয়—ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ সাহিত্যভূষণ সঙ্কলিত। মূল্য ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান মহেশ্বরপাশা, খুলনা; এবং ৫২সি, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

আমরা গ্রন্থকার খগেন্দ্রবাবুকে এবং এই ইতিহাস-লিখনে তাঁহার পরামর্শ ও উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে অন্তরের সহিত অভিনন্দন করিতেছি। গ্রন্থখানি আমরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম এবং উহার তৃতীয় অধ্যায় আমরা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলাম। গ্রন্থখানি সুলিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ও ভূমিকালেখক মহাশয়দ্বয়ের সহিত আমরাও দেশবাসী-গণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষমুলারের কথা আমরা সকলকে অন্তরে ধারণ করিবার জন্য অনুরোধ করি যে, নিজ নিজ প্রাচীন ইতিহাস ও কীর্ত্তিকলাপের প্রতি দৃষ্টি না ফিরাইলে কোন জাতি বা দেশের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। জার্ম্মাণীর উন্নতি এই সত্যবাণীর জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমানে ভারতে যে প্রকার উন্নতির প্রচেষ্টা চলিতেছে তৎসাধনে সহায়তা করিতে চাহিলে অলসতায় কালক্ষেপণ করিবার উপযুক্ত নাটক, উপন্যাস, নবন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থাদি প্রকাশ করা সযত্নে স্থগিত রাখিয়া প্রতি পল্লীর প্রতি নগরের ইতিহাসসংগ্রহে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। "আমোদপ্রমোদ" পরিচ্ছেদে থিয়েটার প্রভৃতিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু দেশের চিরন্তন খেলা "কপাটি" প্রভৃতির কোনই উল্লেখ নাই। এগুলির উল্লেখ করিলে ভাল হইত। খুলনা একটি প্রসিদ্ধ জেলা, বিশেষতঃ দৌলতপুর-কলেজ স্থাপন এই জেলার খ্যাতি সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে। আমরা দেশের ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেককে এবং স্কুল-কলেজ প্রভৃতির প্রত্যেক লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই গ্রন্থসংগ্রহে অনুরোধ করি। দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা গ্রন্থকার ও প্রকাশকদিগকে বলিতে চাই যে, তাঁহাদের ঈপ্সিতমত বিক্রয় না দেখিলে যেন এতদ্বিধ অন্যান্য গ্রন্থপ্রকাশে নিরস্ত না হন। এইরূপ গ্রন্থের শেষে বিখ্যাত পুস্তকগুলির অনুকরণে ইনডেক্স বা বিষয়সূচী দিলে ভাল হয়।

ওঁতৎসৎ

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৫৯

১৮৫৩ শক কার্ত্তিক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১। গান গাও, আর আমি শুনি।

মা! তুমি গান গাও, আর আমি সেই গান শুনি আর গাইতে শিখি। যে গানে আমার পাষাণ হৃদয় গলিয়া গিয়া অশ্রুতে পরিণত হইবে এবং তোমার চরণ ধৌত করিবে, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে গানে প্রেমের বন্যা বহিয়া আমার শুষ্ক হৃদয়মরুভূমের দুই কূল ভাসাইয়া দিবে এবং আমার এই মরা মনকে তোমার চরণের শান্তিময় উপকূলে উপস্থিত করিবে, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে গানে আমাকে নিশীথের ঘোর অন্ধকারে ঘিরিয়া রাখে এবং বাহিরের শত টানাটানি হইতে রক্ষা করে, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে গানে আমার অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, এবং আমাকে সংসারের ভার হাসিমুখে বহন করিবার সক্ষমতা প্রদান করে, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে গানে আমার প্রাণে চাঁদের কিরণ খেলা করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে এবং আমার মুখের জ্যোতি অপূর্ব্ব সুষমা লাভ করিতে [illegible] তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে [illegible]নে আমি আমার জীবন[illegible] নির্ভয়ে অকূল অপার সাগরে ভাসাইয়া দিতে এবং যথাসময়ে তোমার চরণের কূলে পৌঁছিতে পারি, তুমি আমাকে সেই গান শো[illegible] যে গানে আমার এই বক্ষে-লাগা শত-সহ[illegible] ঝটিকার প্রবল বেগ সহ্য করিবার দৃ[illegible] করিতে পারি এবং তাহার মধ্যে তোমা[illegible] মুখের সুমঙ্গল জ্যোতি সুস্পষ্ট দেখি[illegible] তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। [illegible] আমাকে কোলে লইয়া তোমার গীত[illegible] শোনাও—আমি সকলের অন্তরালে [illegible] কোলে আশ্রয় লই আর সেই গান শুনি [illegible] নিশি তোমার প্রেম আর আমার অশ্রু [illegible] গিয়া আমাকে বিগলিত করিয়া দিক। [illegible] আর আমাতে থাকিতে চাহি না, আর পারিও না। আমি তোমার ঐ চরণের ধূলি হইয়া যাহাতে সারা জীবন তোমার গানে অমৃতধারা শুনিতে পাই, তাহারই ব্যবস্থা তুমি করিও।

১২। উৎসবের আনন্দে।

মা! আমার প্রাণে যতগুলি প্রদীপ তুমি সাজাইয়া রাখিয়াছিলে, আজ সকল প্রদীপই তুমি

...র প্রাণে আজ যেন ...সিয়াছে। চারিদিকেই ... রাগিণী বাজিয়া উঠিয়া ...য়িরা ক... তুলিতেছে। আজ ...প্রাণ হইতে উৎসবের জোয়ার ছুটিয়া গিয়া ...বাসীকে জাগাইয়া তুলিতেছে। আমার ...সবের প্রাঙ্গণে আজ সকলেই ছুটিয়া আসিতেছে। ...মার যে মধুর নাম আমার প্রাণে ঝঙ্কার দিয়া ...ছে, আজ বিশ্ববাসী সেই নাম গাহিয়া আত্ম- ...হইতে চাহিতেছে। সকলের প্রাণ আমার ..., আর আমার প্রাণ সকলের প্রাণে আজ ...ার নামের ভিতর দিয়া মিশিয়া যাইতেছে। ...ও দ্বন্দ্ব কিছুই আর আমার দৃষ্টিতে পড়িতেছে না। আমার প্রাণের ভিতর তোমার জন্য যে স্বর্ণরচিত আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহার উপর তোমার চরণধূলি পড়িয়াছে, তাই আমার অন্তরে বাহিরে এত উৎসবের তরঙ্গ আসিয়া আমার প্রাণকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে। এই উৎসব যে এত সহজে সার্থকতা লাভ করিবে, ...া বুঝিতে পারি নাই। কি জানি কি মন্ত্রবলে উৎসবের বার্ত্তা আজ দিকে দিকে ছড়াইয়া ...য়াছে। তুমি তো আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরের ...র প্রাঙ্গণে লোকের পর লোক ডাকিয়া ...ছ। কিন্তু আমায় এমন শক্তিসামর্থ্য ...ন আগন্তুক ভক্তদিগের সেবায় কোন- ত্রুটী না হয়। আমার একমাত্র সম্বল ...ধুর নাম। আমি তাহাই দিনের পর ...র পর মাস পরিবেশন করিয়া চলিব। তুমি দেখো, সেই নামেই যেন সকলের ...মি তৃপ্তি আনিয়া দিতে পারি। আমার ... তুমি অধিষ্ঠিত হইও, আর আমার সকল ...ক্তের ভিতর দিয়া তোমারই শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তি, তোমারই সৌম্য উদার ভাব ফুটিয়া বাহির হউক। আমার জীবনের উন্মেষেও যেমন তোমারই নাম আমার প্রাণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল; জীবনের কাজ যবে শেষ হইবে তখনও যেন তোমারই নাম করিতে করিতে তোমারই চরণতলে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।

১৩। সুখে দুঃখে জীবনলাভ।

মা! আমার চক্ষে যখন তুমি ঘুমের হাত বুলাইয়া ঘুম আনিয়া দাও, তখন আমি জীবন লাভ করি। আবার যখন জাগরণের সোনার কাঠি বুলাইয়া আমার চক্ষে জাগরণ আনয়ন কর, তখনও আমি জীবন লাভ করি। আমাকে যখন সুখের শান্তিধারায় অভিষিক্ত কর, তখনও তাহাতে আমি জীবন লাভ করি। আবার যখন তুমি আমাকে দুঃখদৈন্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তোল, তখনও তাহাতে আমি জীবন লাভ করি। তুমি যখন আমাকে সুন্দর সজ্জায় সুসজ্জিত কর, তখনও তাহাতে আমি জীবন লাভ করি। আবার আমি যখন সংসারে ধূলিধূসরিত দেহে দুর্গন্ধ বহন করিয়া বিচরণ করিতে থাকি, তখনও তাহাতে আমি জীবন লাভ করি। জীবনের লীলাখেলার মধ্যে যখন ডুবিয়া থাকি তখন তাহাতে জীবনলাভ করি। আবার মরণ যখন তোমার শান্তিবার্ত্তা বহন করিয়া আমার শিয়রে নীরবে আসিয়া দাঁড়ায় তখনও তাহাতে আমি জীবন লাভ করি। আমার ঘরের চারিদিকে যখন প্রদীপগুলি জ্বলিয়া তোমার জ্যোতিতে আমার হৃদয়মন আলোকিত করে, তাহাতেও জীবন পাই। আবার যখন সমস্ত প্রদীপ... নিভিয়া গিয়া আমাকে ঘন অন্ধকারে ফেলিয়া রাখে, তাহার ভিতর হইতেও জীবনের উৎস খুলিয়া যায়। সংসারসাগর যখন নিস্তরঙ্গ হইয়া আমাকে শান্তিসাগরে ডুবাইয়া দেয়, তখনও তাহাতে জীবন পাই। আবার যখন সংসারসাগরে প্রবল বেগে ঝঞ্ঝাবাত উঠিয়া আমাকে ভীষণ দোল খাওয়ায়, তখনও তাহাতে জীবন পাই—কখনও বা ঢেউয়ের নীচে তলাইয়া যাই, আর কখনও বা উপরে ভাসিয়া উঠি। তোমার সহিত মিলনে যে অশ্রু বহে, তাহাতেও জীবন পাই। তোমার বিরহে যে অশ্রু ঝরে, তাহাতেও জীবন পাই। তোমার ভ্রূকুটিতেও জীবন পাই। তোমার প্রসন্ন মুখেও জীবন পাই। তোমার নিকট প্রার্থনা করি আমাকে তোমার প্রসন্নমুখ দেখাও।

১৪। অন্তরে আছ, তবু কেন কাঁদি?

মা! কাল ছিলাম ভাল; আজ দেহ বড়ই অসুস্থ হইল। কোথায় যাই, কি করি, ভাবি- য়াই তো আকুল। মনের অসুখ কিছুই নাই। মনপ্রাণ তোমারই চরণে চক্ষু রাখিয়া পড়িয়া...

আছে। তুমি একবার স্নেহভরে নাম ধরিয়া ডাক, আমার সকল রোগ সকল কষ্ট দূর হইয়া যাক। তুমি যখন আমার মাথার শিয়রে দিনরাত আছ, তবু আমার প্রাণে অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠে কেন? রোগশোক দুঃখকষ্ট আমার মাথার উপর জমাটবাঁধা ঘন মেঘের মত দাঁড়াইয়া আছে। আমার প্রাণের চারিদিক যেন গুমট হইয়া আছে—হাসিগান সকলই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কুলকুল-ধ্বনিতে নদী আপনার মনে বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার প্রাণ আজ যেন তাহাতে সাড়া দিতে পারিতেছে না। বৃষ্টি মুষলধারে পড়িতেছে, তাহার এক-একটী বিন্দুর তালে তালে গাছের এক-একটী পাতা গ্রীবাভঙ্গী সহকারে কতই নৃত্য করিতেছে, কিন্তু আমার প্রাণে যেন আজ তাহা সাড়া দিতে চায় না। মা! একটীবার তুমি ডাক, আমার রোগশোক, দুঃখকষ্ট দূর হইয়া যাক; আমার প্রাণের হাসির উৎস আবার শত-ধারে উৎসারিত হইয়া উঠুক। সেই ছেলেবেলার মত জীবনের এই সন্ধ্যাকালেও যেন তোমায় মা—মা বলিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারি। দিনের বেলাতেও যেমন তোমারই নয়নে নয়ন রাখিয়া জাগিয়া থাকি, রাত্রিতেও যেন সেইরূপ তোমারই অনিমেষ দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া তোমারই কোলে সুখে নিদ্রা যাই।

১৫। চিরসাথী।

মা! আজ শরতের প্রকৃতি আনন্দে ঢলঢল। তাহার আকাশে বাতাসে হাসি যেন ধরে না। কিন্তু আমাকে তুমি একি অবস্থায় ফেলেছ যে, আমার প্রাণে দিনরাত ঘন বিষাদেরই ক্রন্দন জাগিয়া থাকে। আমার প্রাণের গান থামিয়া গিয়াছে, সমস্ত চিন্তার উৎস যেন শুকাইয়া গিয়াছে—কেবল জাগিয়া আছে কান্না—কান্না। জানি না আমার এ চোখের জল তুমি কবে মুছাইয়া দিবে। দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত আসে, আমার প্রাণের উপর তাহাদের কোনও স্পর্শই যেন আসিয়া লাগে না। গ্রহ-তারাগুলি আঁধার রাত্রি ভেদ করিয়া কি সুন্দর হাসিই না হাসে। আমার মুখে যেন তাহার কিছুমাত্র স্পর্শ লাগিতেই চায় না। সূর্য্য উঠিয়া সান্ধ্যস্নানের জন্য পশ্চিম সাগরে কি আনন্দখেলা খেলিতে খেলিতে অবগাহন করে। পূর্ণিমার চাঁদ পূর্ণ যৌবনের কি আনন্দে সাগরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে আর হাসিতে কুটিকুটি হইয়া যায়। আমার কিন্তু একমাত্র তোমা ব্যতীত প্রাণের সঙ্গে খেলার চিরসাথী আর কেহই নাই। আজ মনে হয় যেন কত দীর্ঘ দীর্ঘ কাল তোমার চরণপূজার অবসর পাই নাই, তাই আমার প্রাণটা দুঃখকষ্টের কঠি[illegible] আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। বিপ[illegible] মেঘজাল আমাকে ঘিরিয়া ফেলিতে চায়। [illegible] তোমার প্রসন্ন মুখ আমাকে দেখাও। [illegible] বুকের উপর তোমার চরণখানি রাখো। [illegible] দুঃখকষ্ট ও বিপদবিষাদের ভিতর দিয়া [illegible] আগমনী গীত ভৈরবী রাগিণীতে বাজিয়া [illegible] তখন মেঘমুক্ত আকাশের মত আমার প্রাণ [illegible] হইবে আর তোমার প্রসন্ন মুখের হাসিতে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিবে। তুমি আমাকে তোমার চরণের দাস বলিয়া গ্রহণ কর। তাহাতেই আমার জীবনের সমস্ত আশাভরসা পরিসমাপ্ত হউক।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি?

(৺বিপিনবিহারী ঘোষাল)

(২)

ভগবান শিব বলিয়াছেন:—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো, ধ্যানভাবস্তু ম[illegible]
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজা[illegible]
মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ১৪শ উল্লাস, [illegible]

একমাত্র পরব্রহ্মকে সর্ব্বত্র সত্যবস্তুরূপে যে [illegible] উপলব্ধিকরণ, তাহাই সাধকের উত্তম ভাব [illegible] উৎকৃষ্টরূপ ভজনা)। ধ্যানভাব মধ্যমরূপ [illegible] স্তোত্রপাঠ বা জপ, ইহা অধমরূপ ভজনা। আর পূজা অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতিপ্রদান * বা প্রতিমাদি[illegible] যে দেবতার অর্চ্চনা, তাহা অধম হইতেও অধম ভা[illegible] অর্থাৎ তাহা যার-পর-নাই অপকৃষ্টরূপ ভজনা।

* কোন কোন স্থলে এইরূপ পাঠভেদ দেখা যায়, যথা—
উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো হোমপূজাঽধমাধমা॥

এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত তাঁহাদিগের প্রতি যে শাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলে মূর্খ, ভ্রান্ত, অল্পবুদ্ধি, অল্প-তপস্যাসম্পন্ন, তামস-জ্ঞানপ্রাপ্ত, অধিক কি আত্মহননকারী, গরুর গাধা ইত্যাদি কুৎসিত বাক্য-সকল প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা দ্বারাই বা তাঁহাদের অন্তরের কি ভাব প্রকাশ পায়? দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই-একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি মাত্র। যথা,—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—

কিং স্বল্পতপসাং নৃণাম্ অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৮৪ অধ্যায়।

কহিলেন, হে ঋষিগণ! যে সকল মনুষ্য ...তে দেবতাদর্শন করে, তাহাদিগের কি অল্প ...

...ান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন;—

...ঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধী ...দ্ধিশ্চ জলে ন জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৮৪ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ঋষিগণ! যে ব্যক্তির এই ত্রিধাতুবিশিষ্ট অর্থাৎ কফ-পিত্ত-বায়ুময় দেহে আত্মবোধ হয়, আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আপনার জ্ঞান হয় এবং মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয়, আর যাহার গঙ্গা-যমুনাদি জলেতে তীর্থবোধ হয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিতে ...না, সে ব্যক্তি অতি বড় গরু, বা গরুর অন্য ...াহী গর্দ্দভবিশেষ।

ক্রিয়াবতাং বিষ্ণুর্যোগিনাং হৃদয়ে হরিঃ।
...স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাম্॥

ব্রহ্মপুরাণ।

...। এই শ্লোকের এইরূপ পাঠ আছে,

...দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
...বুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥

উত্তরগীতা, ৩য় অধ্যায় ৮ শ্লোক।

...শ্লোকের অর্থ এই যে:—

...যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড-রত সাধারণ দ্বিজাতিগণ ... দেবতারূপে দর্শন করেন, যোগীগণ হরিকে ...র মধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, অল্পবুদ্ধি লোকসকল ...তমাতে দেতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আর পরমাত্ম-...নপ্রাপ্ত সমদর্শী ব্যক্তিরা প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক ...ভূতে পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করেন।

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা।
ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক মুক্তিঃ ক্বেহ বা সুখং॥

পঞ্চদশী। চিত্রদীপ ২১৭।

যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলেই ভ্রান্তরূপে পরিগণিত হন। সে অবস্থায় তাঁহাদিগের মুক্তিই বা কোথায় আর সুখই বা কোথায়?

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠ-লোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥

রঘুনন্দনস্মৃতি। আহ্নিক-তত্ত্ব।

সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যগণের জলেতে দেবতাবুদ্ধি হয়, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের আকাশেতে দেবতা-বুদ্ধি হয়, মূর্খ লোকদিগের কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে দেবতাবুদ্ধি হয়, আর যোগশীল ব্যক্তিগণের আত্মাতে দেবতাবুদ্ধি হইয়া থাকে।

ভগবান শিব বলিয়াছেন:—

মৃচ্ছিলা-ধাতু-দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র ১৪শ উল্লাস, ১১৯ শ্লোক।

মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু অথবা কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমাসমূহে ঈশ্বরবুদ্ধি করত মূর্খ তপস্বীসকল কেবল কষ্টভোগ করে, কিন্তু মুক্তিরূপ যে উৎকৃষ্ট শান্তি তাহা অবগত হইতে পারে না।

ভগবান শিব নামরূপাদি কল্পনাসমূহকে বালক্রীড়ার ন্যায় জানিয়া ঐ সকলকে পরিত্যাগ করত মনুষ্যগণকে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে বারংবার উপদেশ করিয়াছেন; যথা,—

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপ-নামাদিকল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১৪ উল্লাস, ১১৭ শ্লোক।

যে ব্যক্তি রূপ নাম আদি কল্পনাসমূহকে বালক্রীড়ার ন্যায় জানিয়া ঐ সকলকে পরিত্যাগ করত ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, সে-ই মুক্তিলাভ করে।*

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

---

* তুলসীদাস নামক প্রসিদ্ধ সাধক ও কবি বলিয়াছেন:—

তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে সব্ গোড়িয়াকি খেল্।
যব্ প্রিয়সে সরবর্ হোয়ি তো রাখ্ পেটারি মেল্॥

দোঁহাবলী।

হে তুলসীদাস! এই যে জপ-তপ-প্রতিমা পূজা, এসমস্তকে বালিকাদিগের পুত্তলিকা খেলার ন্যায় জানিবে। যতদিন বালিকাদিগের স্বামীসহবাস না ঘটে তাহারা সেই পর্য্যন্ত যেমন ঐ সকল পুত্তলিকা লইয়া খেলা করে, পরে স্বামীসহবাস হইলে সেই সকলকে পেটিকায় তুলিয়া রাখে, এই সকল জপ-তপ-প্রতিমা-পূজাকেও সেইরূপ বুঝিবে।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকং॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

যিনি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অবস্থিত পরস্পর বিভক্ত পদার্থ-সকলের মধ্যেও অবিভক্তরূপে অবস্থিত এক পরমাত্মার অব্যয় ভাব নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিও।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং।
অতত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অধ্যায়, ২২ শ্লোক।

আর প্রতিমা বা কোন দেহ প্রভৃতি একএকটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট পদার্থে পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপে আছেন এইরূপ যে বাস্তবিক অযৌক্তিক ও তুচ্ছ জ্ঞান, হে অর্জ্জুন! তাহাই তামস জ্ঞান শব্দে কথিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উত্তম, মধ্যম, এবং প্রাকৃত ভাগবতের লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান শিব আরও বলিয়াছেন যে, অন্যান্য যুগ যেরূপ অন্যান্য শাস্ত্র প্রধান, যথা—সত্যযুগ বেদপ্রধান, ত্রেতাযুগ স্মৃতিপ্রধান, দ্বাপরযুগ পুরাণপ্রধান, সেইরূপ কলিযুগ তন্ত্রপ্রধান; এবং সেই তন্ত্রমধ্যে কলিযুগের মনুষ্যগণের জন্য কলিজনিত যাবতীয় অশুভ-নিবারণের এবং অতি সহজে মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ তিনি এইরূপ বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেঽতিদুস্তরে।
নিস্তার-বীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি! কৈবল্যায় সুখায় চ॥
মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ৩য় উল্লাস।

হে প্রিয়ে! অতি দুস্তর, তপস্যাদিবিহীন, ঘোর পাপযুগ কলিতে ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তারের বীজ-স্বরূপ।

হে দেবি! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, কলিতে ব্রহ্মদীক্ষা ব্যতিরেকে কৈবল্য সুখ অর্থাৎ মুক্তিলাভের অন্য উপায় আর নাই, নাই।

ভগবান শিব তন্ত্রমধ্যে যে কুলাচার ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি উত্তম কুলাচারীর লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১০ম উল্লাস, ২১২।

হে পার্ব্বতি! যিনি ব্রহ্মেতে সকল বস্তুর অবস্থিতি এবং সমস্ত জগতে ব্রহ্মের অবস্থিতি দর্শন করেন, তাঁহা-কেই তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুলাচারী এবং জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া জানিও।

গীতার মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই ভাব সর্ব্বত্র বর্ণন করিয়াছেন। যথা, তিনি একস্থলে বলিয়াছেন,—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩শ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক।

হে অর্জ্জুন! স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত বিনাশী বস্তুর মধ্যে একমাত্র অবিনাশীরূপে বর্ত্তমান এই পরমেশ্বরকে যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত দেখে, সে-ই যথার্থ দেখে।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩শ অধ্যায়, ২৮ শ্লোক।

হে ধনঞ্জয়! সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত যে পরমেশ্বর তাঁহাকে যিনি সকল স্থানে সমানরূপে দেখেন, তিনি আর আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে হনন করেন না; এইজন্য তিনি পরম গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

যাঁহারা পরমাত্মাস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে দর্শন না করেন, গীতার মতে এবং শ্রুতির মতে তাঁহারা পরমাত্মাকে হনন করেন।

ঈশোপনিষদে এইরূপ শ্রুতি আছে:—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

যাহারা আত্মহননকারী অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞানবিহীন, তাহারা মৃত্যুর পর অজ্ঞানাচ্ছন্ন যে অসুর-যোনি তাহাতে যাইয়া জন্মগ্রহণ করে।

কেনোপনিষদেও এইরূপ বচন আছে; যথা

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

যদি ইহলোকে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মকে পার, তবে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। আর ইহলোকে যদি তাঁহাকে না জানিতে পার, তবে মহতী হইবেক। ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে প্রত্যেক প... অবস্থিত জানিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন এ... অমরত্ব লাভ করেন।

যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভগবান শিব এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

স ধন্য স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ॥
সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্য কর্ণপথোপান্ত-প্রাপ্তো মন্ত্র-মহামণিঃ॥

ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে।
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ ॥
গায়ন্তি গায়নীং গাথাং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ।
অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ ॥
কিমস্মাকং গয়াপিণ্ডৈঃ কিং তীর্থৈঃ শ্রাদ্ধতর্পণৈঃ।
কিং দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমন্যৈর্ব্বহুসাধনৈঃ ॥
বয়মক্ষয়তৃপ্তাঃ স্ম সৎপুত্রস্যাস্য সাধনাৎ ॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ৩য় উল্লাস ১৮—২২।

এই ব্রহ্মমন্ত্র রূপ মহামণি যাঁহার কর্ণোপান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতার্থ, তিনিই কৃতী, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই সর্ব্বতীর্থে স্নাত, তিনিই সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত। হে পার্ব্বতী! তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ, তিনিই সর্ব্বলোকে প্রতিষ্ঠিত। ১৮—১৯। শিবে! তাঁহার মাতা পিতা ধন্য হন, তাঁহার কুল পবিত্র হয়, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন এবং তাঁহারা পুলকিতশরীর হইয়া এই গাথা গান করেন যে, (২০) আমাদের বংশে উৎপন্ন পুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র করিয়াছে। আমাদের নিমিত্ত গয়াতে পিণ্ডদানে আর আবশ্যক কি? তীর্থেই বা আবশ্যক কি? শ্রাদ্ধতর্পণেই বা আবশ্যক কি? ২১। আমাদের উদ্দেশে দানেই বা প্রয়োজন কি? জপেই বা প্রয়োজন কি? অন্যান্য বহুবিধ সাধনেই বা প্রয়োজন কি? আমাদের এই সৎপুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা রূপ যে সাধন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ২২। ইত্যাদি—

যাঁহারা নিরাকার সত্য বস্তুর উপাসনায় অসমর্থ হইয়া সাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা যাহাতে স্থূল হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মভাবে উপনীত হইতে পারেন, তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ সকলেই বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছেন; যথা,—

নির্জ্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েৎ।

পুরাণের ৫।৯।৩৫ শ্লোকের টীকায় স্বামীধৃত বচন।

স্থূল চিন্তাসক্ত আত্মাকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্মেতে লইয়া যাইবে।

বিষ্ণুপুরাণের ৬ষ্ঠ অংশের ৭ম অধ্যায়ে ৮৫ হইতে ৯০ শ্লোক পর্য্যন্ত এই কয়েকটী বচনে এই বিষয়টি অতি পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে সে সকল আর এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

ভগবান শিবও মহানির্ব্বাণ এবং কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রে এই ভাব অনেক স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ শাস্ত্র উপদেশ অনুসারে যে একণে আর আমাদের দেশে কার্য্য হয় না, তাহার সর্ব্ব প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মবিষয়ে যাঁহারা আমাদের সমাজের উপদেষ্টা তাঁহারা প্রায়ই আপনাদের দায়িত্ব অনুভব করিয়া কার্য্য করেন না; তদ্ব্যতীত অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপদেষ্টা যিনি তিনি প্রকৃত উপদেষ্টা হইবারই উপযুক্ত নন। যিনি নিজে সূক্ষ্ম উপাসনার কিছুই জানেন না, তিনি কিরূপে শিষ্যকে সূক্ষ্মবিষয়ের উপদেশ করিবেন, অথবা কিরূপেই বা ক্রমে স্থূল হইতে শিষ্যকে সূক্ষ্মে লইয়া যাইবেন? যিনি নিজে অন্ধ, তিনি কিরূপে অন্য অন্ধের পথদর্শক হইতে পারেন?

উপদেষ্টা সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, যথা,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

গীতা ৪।৩৪।

হে অর্জ্জুন, যাঁহারা জ্ঞানী অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ এবং যাঁহারা তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে ব্রহ্মসত্তা অনুভব বা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, সেই সকল মহাত্মাগণকে তুমি নমস্কার দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা এবং সেবা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিও। তাঁহারা তোমাকে প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ করিবেন।

জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—"জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ, তত্ত্বদর্শিনঃ অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাঃ"।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও গুরু সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন, যথা,—

তস্মাদ্‌ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥

ভাগবত ১১।৩।২২।

যে ব্যক্তি উত্তম এবং মঙ্গল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদাদি শাস্ত্রদর্শী, পরব্রহ্মের ধ্যানপরায়ণ এবং ব্রহ্মেতে উপশমাশ্রয়ী অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন, যে,—

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নং।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং ॥

ভাগবত ১১।২৬।৩১।

যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে নৌকা যে প্রকার পরম আশ্রয়স্বরূপ হয়, ঘোর সংসারজলাশয়ে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনকারী জীবগণের পক্ষে ব্রহ্মবিৎ সাধুসজ্জনও সেইরূপ হয়েন।

শ্রুতিতেও এইপ্রকার গুরুর কথা লিখিত আছে ; যথা,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ ।
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ।

মুণ্ডকোপনিষদ্ ॥ ১।২।১২ শ্রুতি ।

শঙ্কর স্বামীও এইরূপ গুরুর জন্য উপদেশ করিয়াছেন ।

তন্ত্রশাস্ত্রে ভগবান শিব গুরুকরণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন ; তিনি এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন যে, যদিও প্রথমতঃ কোন অনভিজ্ঞ গুরুর নিকট হইতে উপদেশ বা মন্ত্র গ্রহণ করা হয় এবং পরে যদি কোন জ্ঞানবান্ (গুরুর) ব্যক্তির সহিত সম্মিলন ঘটে, তাহা হইলে সেই অনভিজ্ঞ গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানবান গুরুর শরণ লইবে। ইহাতে গুরুত্যাগের যে দোষ তাহা ঘটিবে না। যথা,—

অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সংশয়চ্ছেদকারকং ।
গুর্ব্বন্তরন্ত গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে ॥

কুলার্ণব-তন্ত্র ।

প্রথমতঃ অনভিজ্ঞ গুরু প্রাপ্ত হইয়া শিষ্য যদ্যপি পুনর্ব্বার সংশয়চ্ছেদকারক অপর গুরুতে গমন করে, তাহা হইলে সে শিষ্য গুরুত্যাগ দোষে লিপ্ত হয় না ।

তিনি আরও বলিয়াছেন ;—

মধু লুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরো গুর্ব্বন্তরং * ব্রজেৎ ॥

কামাখ্যা-তন্ত্র ।
কুলার্ণব-তন্ত্র ।

মধুলোভী ভৃঙ্গগণ যে প্রকার পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, সেইরূপ জ্ঞানলাভেচ্ছু শিষ্যও গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে (অর্থাৎ এক গুরু হইতে অন্য গুরুতে) গমন করিবেন ।

ভগবান শিব এতদূর বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃস্মৃতঃ।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

তত্ত্বজ্ঞৈরুপদিষ্টা যে তত্ত্বজ্ঞাস্তে ন সংশয়ঃ ॥
পশুভিশ্চোপদিষ্টা যে দেবি তে পশবঃ স্মৃতাঃ ॥

কুলার্ণব-তন্ত্র ।

---

* মন্ত্রান্মন্ত্রান্তরং ইতি পাঠান্তরম্ ।

উৎসব ও পাথেয় ।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ, বি-এল)

রেলপথে আরামদায়ক স্লিপিংকার ও রেস্তরাঁ-কারের প্রবর্ত্তক মহামতি পুল্‌ম্যান আমেরিকায় রেলপথে ভ্রমণ করবার সময় তৎকালপ্রচলিত স্লিপিংকারে এক রাত্রি বাস করে নিদ্রার অভাবে বিষম কষ্টভোগ করেছিলেন । সেইরূপ কষ্টের হাত হ'তে বিশ্বের অধিবাসীকে মুক্ত কর্ব্বার জন্য তিনি নবীন আরামদায়ক স্লিপিংকার ও যাত্রীর ভোজনের জন্য রেস্তরাঁ গাড়ীর প্রবর্ত্তন করেন । তাই আজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যাত্রী সুখসেব্য গাড়ীতে বসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাদ্যদ্রব্য পেয়ে অকুতোভয়ে পরম আনন্দে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থিত স্যানফ্রান্সিস্‌কো থেকে আটলান্টিকের উপকূলবর্ত্তী নিউইয়র্কে চলে যাচ্ছে ; যাত্রীদের মনে হচ্ছে যেন তারা সুসজ্জিত হোটেলে বসে আছে আর বাতায়নতলে ছায়াচিত্রের ছবির মত ছু'টে চলেছে, দীর্ঘ তৃণাচ্ছাদিত প্রেয়ারী(prairie) উত্তুঙ্গ রকী পর্ব্বতের বিশাল দেহ, যোজন-বিস্তৃত বনস্পতির শাখা-বাহুপল্লব, উদ্দামগতি কলরেডো নদীর পর্ব্বতমধ্যস্থ ক্ষীণ জলধারা, জলপ্রপাতের লোক-বিমোহন দৃশ্য, কত কৃষকপল্লী, কত ধনজনসমৃদ্ধ মহানগরী ।

পুল্‌ম্যানের মত মহাত্মা রামমোহনও আমাদের অজানা রাজ্যে যাত্রার নূতন পাথেয় নিয়ে এসে আমাদের পুরোভাগে উপস্থাপিত করেছেন । পিতা বলে, মাতা বলে, বন্ধু বলে অনন্ত করুণাময় পরব্রহ্মের চরণে আত্মনিবেদন কর্‌লে আর আমাদের কোন বিভীষিকা জীবন-পথে অগ্রসর হবে না, সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝা, সমস্ত করকাবৃষ্টি, সমস্ত দুঃখের বন্যা পলকে তিরোহিত হবে। নবীন রূপে, নবীন সুষমায়, নবীন পুষ্পে-পল্লবে জীবনপথ আস্তৃত হবে। এই অপূর্ব্ব অভিনব পাথেয় পুল্‌ম্যান-গাড়ীর মত সুখে স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবে, কোন ভয়, কোন দুঃখ আমাদের প্রাণের বীণায় আঘাত করে বেসুরা রাগিণী ঝঙ্কৃত কর্‌তে সমর্থ হবে না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে, আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে, তিমিরাবগুণ্ঠনময়ী নিশীথিনীর নিবিড় বক্ষে, অন্তরে বাহিরে বিশ্বজগতে—আমরা দেখতে পাব পরম পিতার শান্ত-নির্ম্মল-শ্রী ; তাঁহারই মঙ্গল হস্ত সম্প্রসারিত দিকে দিকে ; অজানার ভীতিবিহ্বলতা কাটিয়ে দিয়ে চিরপরিচিতের মোহনরূপে দণ্ডায়মান বিশ্বপিতা, অখিলমাতা, ভুবনবন্ধু ।

এমনি ভাবে আত্মসমর্পণ করে পরব্রহ্মের চরণে

পাশ্চাত্য ঋষি ইহুদী দার্শনিক স্পিনোজা সুখে দুঃখে উদাসীন হ'তে পেরেছিলেন, অত্যাচার উৎপীড়ন কুসুম-বর্ষণ বলে মনে করেছিলেন; অথচ এই মনীষীর অন্তরের ভাব উপলব্ধি কর্‌তে অক্ষম মানব তাঁকে mystic আখ্যা দিয়ে বিদ্রূপ করে বলেছিল—"He is either an atheist or a God-intoxicated man" যেহেতু তিনি বিশ্বময় ভগবানের সত্তা অনুভব কর্‌তেন, জ্ঞানমিশ্র ভক্তিবলে পরব্রহ্মের চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আজো তাঁর প্রবর্তিত 'Intellectual Love of God' দার্শনিকগণের গবেষণার বিষয়ীভূত।

এই আত্মসমর্পণযোগে পরব্রহ্মে তদ্গতচিত্ত ভক্তবীর যবন হরিদাস বাইশবাজারের বেত্রাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করেছিলেন। আবার উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সাদর নিমন্ত্রণও উপেক্ষা করেছিলেন।

অজানার পথে যাত্রার প্রারম্ভে আমাদিগকে নিতে হবে রামমোহনের এই অপূর্ব্ব পাথেয়। তবেই জীবন ও মৃত্যুর রহস্যময় রাজ্য অতিক্রম করে আমরা অমৃত-সোপানে উপনীত হ'তে পার্‌ব।

রেলগাড়ী চলে; কিন্তু এঞ্জিনের কয়লা ফুরিয়ে যায়, জল ফুরিয়ে যায়, মাঝে মাঝে বড় বড় জংশন ষ্টেসনে থেমে, এঞ্জিনকে জল ও কয়লা সংগ্রহ কর্‌তে হয়; নতুবা গাড়ী চলতে পার্‌বে না—পাথেয় ফুরিয়ে গেলে পথে আটকে পড়্‌তে হবে। পুল্‌ম্যান রেস্তরাঁ-কারও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে, নতুবা যাত্রীদের খাবার যোগাতে পার্‌বে না, মাঝে মাঝে স্লিপিংকারের মলিন বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করে নেয়; নূতন পোষাকে আবার বিছানা প্রভৃতি সুন্দর শোভন হয়ে উঠে।

আমাদেরও তেমনি যাতে পথের সম্বল ফুরিয়ে না যায়, অজানার পথে চল্‌তে চল্‌তে যেন আমরা ক্ষীয়মান পাথেয় পুনরায় সঞ্চয় কর্‌তে সমর্থ হই, তারই জন্য আর্য্য ঋষি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। মহামনীষী রামমোহনও জীবনের যাত্রাপথে উৎসবরূপ মহামিলনের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাই পূত নির্ঝর-ধারা যেমন অন্যান্য নির্ঝরের জল-ধারা সংগ্রহ করে নিজের দেহ পুষ্ট করে সাগরাভিমুখে ছুটে চলে গ্রাম জনপদ ভাসিয়ে দিয়ে প্রান্তরবক্ষ শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ করে, আমরাও তেমনি উৎসবের ব্যপদেশে, ঐকান্তিক ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের সাহচর্য্যে নিজের যা কিছু ক্ষুদ্রতা, যা কিছু দৈন্য, যা কিছু ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিপন্থী, তা পরিহার করে, যা সাধনের অনুকূল, ব্রহ্মনিষ্ঠার উপযোগী, সেই প্রাণবস্তু সংগ্রহ করতে পারি। যদি দেখি ঠিক্ পথ চিন্‌তে পারিনি, আত্মসমর্পণের স্থানে আত্মভরিতায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেছে, বিপথে কণ্টক-বনে বিচরণ কর্‌ছি, অমনি মহামিলনের মধ্যস্থিত ব্রহ্মপথদর্শী মহাপুরুষ স্নেহগম্ভীর কণ্ঠে স্নেহমাখা বচনে জিজ্ঞাসা কর্বেন—'পথিক তুমি পথ হারিয়েছ ?' আর আমার ভ্রম সংশোধন করে, আমাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন অজানার পথে; আবার সেই পাথেয় সম্বল করে জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য অবলীলায় সহ্য কর্‌তে সমর্থ হব, শত বিপদেও কাতর হবার কোন লক্ষণ দেখা যাবে না।

উৎসবে মহামিলনের অবসানে যখন আবার পথচলা সুরু হবে, তখন দেখব দিকে দিকে প্রভাতের বিহগ-কাকলী আমাদিগকে অভিনন্দিত কর্‌ছে; বৃক্ষে বৃক্ষে কুসুমরাশি আকাশে বাতাসে সৌরভলিপি প্রেরণ কর্‌ছে, সুপ্ত হৃদয়ের নীরব সিংহাসনে পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হেসে উঠ্‌ছে পৃথিবী ফলে ফুলে, আলোকে শিশিরে, নবীন সম্পদ্‌সম্ভারে। আনন্দের অপূর্ব্ব পাথেয় জীবনকে ভাদ্রের ভরা নদীর মত কূলে কূলে পরিপূর্ণ করে তুলেছে; জীবনের যা কিছু নীরবতা, যা কিছু কাঠিন্য, যা কিছু অপূর্ণতা আনন্দের অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যে নূতন রূপ ধরে চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; যেন কার অশরীরী মন্ত্র-ঝঙ্কারে শয়নে স্বপনে, ভোজনে গমনে, দিবসের কর্ম্মকোলাহলে, ঊষার সিন্দূরবিন্দুর মধ্যে, পৃথিবীর সমস্ত দ্বন্দ্ব নিরসন করে, অবিরাম কর্ণকুহরে ধ্বনিত হচ্ছে—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।

কে আছে অলস, কে আছে নিশ্চেষ্ট, কে আছে পথভ্রষ্ট, কে আছে উদাসীন, কে আছে জীবন্মৃত—এ উদাত্ত আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কোমল শয্যায় সুখ-শয়নে নিদ্রিত থাকতে পারে ?

এই মহামিলনে পাথেয় সঞ্চয় করতে করতে, ভুল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, একদিন মহামহানের বিশ্বব্যাপী মিলনোৎসবে উপনীত হতে পার্‌ব, যেদিন প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌ব—হে প্রভো, এ বিশ্বসংসারের যা কিছু ধনজন-সুখৈশ্বর্য্য সবই অকিঞ্চিৎকর, সমস্তই শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে স্থৈর্য্যময়ী নীরবতায় বিলীন হয়ে যাবে; তুমিই একমাত্র সার; আমার অন্ধকারময় জীবন-পথে আলোক-বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

"নিয়ে চল আমাকে সে মিলনোৎসবে—যেখানে দিগঙ্গনার মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছে দিকে দিগন্তরে, লোকে লোকান্তরে ঘোষণা করে আনন্দের অমৃতময়ী বাণী; সে উৎসবে ছুটে চলেছে সুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ, নিত্যকাল ধরে আকাশগঙ্গার কূলে কূলে দিক-দিগন্তব্যাপী অসীম ছায়াপথের ধারে ধারে ছুটে চন্দ্র তপন তারা; যে উৎসবের সাড়া পেয়ে বিজন-বনপ্রান্তে পুষ্পবক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছে বন্যযূথিকামুকুল; যে উৎসবের গুণগান করে পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে ছুটে চলে

বিহঙ্গমালা; নৈশাকাশ বিপ্লাবিত করে পাপিয়ার করুণ সঙ্গীতলহরী যে উৎসবের বোধনগানে নিরত; যে উৎসবের আনন্দধ্বনি চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে; যে অনন্ত উৎসবক্ষেত্রে সমুদ্ভূত অপরিসীম আনন্দের কণা মাত্র পেয়ে যোগীর হৃদয়কন্দর আনন্দে স্পন্দিত; ভোগীর বিলাসপ্রাঙ্গণ আলোকোজ্জ্বল, রোগীর ক্ষীয়মান অধর হাস্য-রেখায় উদ্ভাসিত; যে উৎসব জননীর বক্ষ স্নেহধারায় পরিপূর্ণ করে রেখেছে, শিশুর রক্তিম অধরে অস্ফুট ভাষা দিয়েছে, মাতার প্রাণে করুণার সঞ্চার করেছে; ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের হৃদয়নিহিত ভাবধারা আজো ছুটে চলেছে যে উৎসব-অঙ্গনতলে সঞ্চরমান মেঘমালা ভেদ করে ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধতরলোকে; অকৃতী, অধম, সাধন-শক্তিবিহীন সংসার-গহন-বনে পথহারা, কণ্টকতরুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত-দেহ, হিংসাদ্বেষ-ঝটিকা-সন্তাড়িত উত্তপ্ত মরুবালুকার অভ্যন্তরে আকণ্ঠনিমজ্জিত আমি —আমাকে তোমার অপূর্ব্ব মিলনোৎসবে নিয়ে চল; অন্তরে আনন্দের কণামাত্র সঞ্চারিত করে জীবন্মৃত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন কর।

যে দিবস এই মিলনোৎসবের মধ্য দিয়ে সেই মিলনোৎসবের ছবি প্রাণে প্রতিবিম্বিত হবে, সেই দিনই সার্থক হবে আমাদের এই জাগতিক উৎসব, আমাদের পার্থিব মিলন।

আষাঢ়ের শান্ত সন্ধ্যা; বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা শ্যামল পত্রপুঞ্জে, সতেজ পুষ্পবীথিকায়, নবীন তৃণাঙ্কুরে নিপতিত হচ্ছে। এই বৃষ্টিধারার মত পরব্রহ্মের অনন্ত করুণাধারা উৎসব-প্রাঙ্গনতলে সাধকমণ্ডলীর প্রাণে প্রাণে বর্ষিত হোক; বৃষ্টিধারা-স্পর্শে যেমন ধরণীর উষ্ণতা মন্দীভূত হয়, তেমনি ভগবানের অপার আনন্দ ভক্তবৃন্দের হৃদয়নিহিত দুঃখ-অশান্তি-দাবানল প্রশমিত করে বিমল শান্তির অমিয় নির্ঝরধারা ফুটিয়ে তুলুক। হে পরমাত্মন্, তোমারই অপূর্ব্ব বর্ণনাতীত জ্যোতি হৃদয়গুহার তিমিররাশি দূরীভূত করে, তাকে জ্ঞান-বৈরাগ্য-শ্রী-বিমণ্ডিত করে তুলুক। তোমার করুণায় আমাদের উৎসব সফল হোক।

হিন্দু-দণ্ডনীতি।

স্তেয়।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

'স্তেয়' শব্দে চৌর্য্য বুঝায়। বর্দ্ধমানের মতে "অনৈয়ায়িকং পরস্বগ্রহণং" অন্যায় মতে পরদ্রব্যগ্রহণ, ইহারই নাম চৌর্য্য। ডাকাতির সঙ্গে চৌর্য্যের পার্থক্য এই,—রক্ষীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক অপহরণের নাম ডাকাতি বা সাহস। "নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং" অর্থাৎ রক্ষীপুরুষের অজ্ঞাতসারে অপহরণের নাম স্তেয় বা চৌর্য্য। চোর আবার দুই ভাগে বিভক্ত—প্রকাশ-তস্কর, অপ্রকাশ-তস্কর। প্রকাশ-তস্কর বলপ্রয়োগ না করিয়া ছলপ্রয়োগ করিয়াই পরদ্রব্য অপহরণ করে। অপ্রকাশ-তস্কর "সুপ্ত-মত্ত-প্রমত্ত-আর্ত্তানাম্ অপ্রকাশম্ অপেক্ষ্য অপহারাৎ" অর্থাৎ নিদ্রিত, উন্মত্ত, মাদকসেবনে লুপ্তজ্ঞান, রোগ-শোক-দারিদ্র্যে কাতর ব্যক্তির হতচেতনার সুবিধা পাইয়া যাহারা অপ্রকাশ হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে চুরি করে, তাহারা অপ্রকাশ-তস্কর।

রাস্তায় যাইতে যাইতে যাহা কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তাহা যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং সাবধানে রাখিবে। কুড়াইয়া লইলেই চুরি হয় না।

অন্যহস্তাৎ পরিভ্রষ্টম্ অকামাৎ উদ্ধৃতং পথি।
চৌরেণ বা প্রতিক্ষিপ্তং লোপ্ত্রং যত্নাৎ পরীক্ষয়েৎ॥

অপরের হস্ত হইতে যাহা পরিভ্রষ্ট হয়, এবং উহা চুরি করিব না (অকামাৎ) এইরূপ মানসে যদি উহা কুড়াইয়া লওয়া হয়, অথবা চোরে যাহা রাস্তায় ফেলিয়া যায়, তাহা যদি হস্তগত হয়, যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

যে ব্যক্তি চোরকে বা হত্যাকারীকে জানিয়া শুনিয়া ভাত (অন্ন), বাসস্থান, শীতনাশের জন্য অগ্নি, তৃষ্ণানাশের জল বা চুরি করিবার উপদেশ বা মন্ত্র দিয়া সাহায্য করে বা চুরি করিবার জন্য যাতায়াতের পাথেয় দেয়, সে-ও দণ্ডনীয় হইবে। যথা—

ভক্তাবকাশাগ্ন্যুদকমন্ত্রোপকরণব্যয়ান্।
দত্বা চোরস্য হন্তুর্বা জানতো দণ্ড উত্তমঃ॥

প্রভু দ্বারা নিযুক্ত হইয়া যদি ভৃত্য কোন অন্যায় কার্য্য করে, তবে প্রভুই দণ্ডনীয় হইবে—ভৃত্য নহে। বৃহস্পতির বচন এইরূপ—

প্রভুণা বিনিযুক্তঃ সন্ ভৃতকো বিদধাতি যঃ।
তদর্থম্ অশুভং কর্ম্ম স্বামী তত্রাপরাধ্নুয়াৎ।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে প্রজার মধ্যে যদি কাহারও ধন অপহৃত হয়, তাহা পূরণ করিয়া দিবার জন্য রাজা স্বয়ং দায়ী। যদি চোরাই মাল পাওয়া যায় তাহা

হইলে রাজা যাহার ধন অপহৃত হইয়াছে তাহাকে সমস্তই দিয়া দিবেন। নিধি অর্থাৎ বহুমূল্য প্রস্তরাদি অপহৃত হইলে যদি তাহা রাজকর্ম্মচারীগণের চেষ্টায় উদ্ধার হয়, তাহা হইলে রাজা উহার মধ্য হইতে নিজ ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক বক্রী নিধি যাহার অপহৃত হইয়াছে তাহা তাহাকে দিয়া দিবেন। অপহৃত দ্রব্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা ফেরৎ দিবার সময় যদি প্রকৃত মালিক সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ মালিককে দিয়া শপথ করাইতে হইবে (কতকটা affidavitএর মত) অথবা তাহার বন্ধুবান্ধবকে দিয়া স্বত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

প্রকাশ-তস্করের কথা যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বণিক তাহার অন্তর্গত। বণিক আবার দুই ভাগে বিভক্ত; একদল ক্রয়-বিক্রয়োপজীবী আর এক দল দ্রব্যনির্ম্মাণ-উপজীবী অর্থাৎ কারিকর (trader and manufacturer)।

যে বণিক বিক্রেয় বস্তুর ওজনে কৃত্রিম বাটখারা ব্যবহারে ক্রেতাকে প্রতারিত করে, সে পূর্ব্ব (প্রথম) শাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অর্থাৎ তাহার জরিমানা ২৪ পণ হইতে ৯১ পণ পর্য্যন্ত হইবে।

অল্পমূল্যং তু সংস্কৃত্য নয়ন্তি বহুমূল্যতাম্।
স্ত্রী-বালকান্ বঞ্চয়ন্তি দণ্ড্যাস্তে হর্থানুসারতঃ ॥
হেমমুক্তাপ্রবালাদ্যং কুর্ব্বতে কৃত্রিমং তু যে।
ক্রেত্রে মূল্যং প্রদাপ্যাস্তে রাজ্ঞে চ দ্বিগুণং দমম্ ॥

অর্থাৎ অল্পমূল্য দ্রব্যকে সংস্কার করিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে বহুমূল্য বলিয়া স্ত্রী বা বালককে বিক্রয় করে এবং তাহাদিগকে এইরূপে প্রতারিত করে, প্রাপ্ত মূল্য অনুসারে সে দণ্ডনীয় হইবে। যে ব্যক্তি স্বর্ণ মুক্তা বা প্রবাল কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়া ঐ ঝুটা মাল পরকে বিক্রয় করে, তাহাকে ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিতে হইবে এবং শাস্তিস্বরূপে রাজাকে দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্য জরিমানা দিতে হইবে।

সর্ব্বকণ্টকপাপিষ্ঠং হেমকারং তু পার্থিবঃ।
প্রবর্ত্তমানম্ অন্যায়ে ছেদয়েৎ লবশঃ ক্ষুরৈঃ ॥

যে কৃত্রিম সোনা প্রস্তুত করে, সে প্রকাশ-তস্করের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম। রাজা তাহাকে ক্ষুর দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবেন, ইহা মনুসম্মত। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তাহার ত্রি-অঙ্গচ্ছেদ (নাসা কর্ণ ও হস্ত) করিবে। পারদাদি যোগে কৃত্রিম সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার আভাস এইখানে পাওয়া যায়।

মৃৎ-চর্ম্ম-মণি-সূত্রায়ঃ-কাষ্ঠ-পাষাণ-বাসসাম্ ॥
অজাত্যৌ জাতিকরণে বিক্রেয়াঃ অষ্টগুণো দমঃ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অল্পমূল্য বস্তুকে বাহ্যিক ভাবে বহুমূল্য বস্তুর সদৃশ করিয়া ক্রেতাকে প্রতারিত করে, তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৮ গুণ জরিমানা হইবে। কৃষ্ণ মৃত্তিকায় কস্তুরিকার (মৃগনাভির) গন্ধ-প্রলেপ করিয়া মৃগনাভি বলিয়া বিক্রয়, বিড়াল-চর্ম্মকে পালিশ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম বলিয়া বিক্রয়, সাধারণ কাঁচকে লাল রঙ দিয়া পদ্মরাগ-মণি বলিয়া বিক্রয়, তুলার কাপড়ে রঙ লাগাইয়া রেশমী কাপড় বলিয়া বিক্রয়, লোহার দ্রব্য মাজিয়া ঘষিয়া রূপার দ্রব্য বলিয়া বিক্রয়, বেলকাঠে চন্দনপ্রলেপ করিয়া চন্দনকাষ্ঠ বলিয়া বিক্রয় ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্তই দণ্ডার্হ। প্রাচীন সময়ে এই সমস্ত চাতুরী সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের ও রাজার যেরূপ প্রখর দৃষ্টি ছিল, বর্ত্তমান সময়ে সে ভাবে রাজার দৃষ্টি আছে কিনা সন্দেহ। হাতুড়ে চিকিৎসকও একভাবে প্রবঞ্চক ও তস্করের সামিল। তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে—

অজ্ঞাত্বৌষধি-মন্ত্রস্তু যশ্চ ব্যাধেরতত্ত্ববিদ্।
রোগিভ্যো হর্থং সমাদত্তে স দণ্ড্যশ্চৌরবৎ ভিষক্ ॥

যাহারা ব্যাধির তত্ত্ব ও ঔষধসম্বন্ধে অজ্ঞ অথচ রোগীর নিকট চিকিৎসাচ্ছলে অর্থ গ্রহণ করে, সে চোরের ন্যায় দণ্ড পাইবার যোগ্য। যাহারা অজ্ঞ হইয়া পশু-চিকিৎসা করে, তাহাদের প্রথম সাহস দণ্ড (২৪ হইতে ৯১ পণ)। যাহারা অজ্ঞ হইয়া মনুষ্যচিকিৎসা করে, তাহাদের মধ্যম সাহস দণ্ড (দুইশত হইতে পাঁচ শত পণ)। যাহারা অজ্ঞ হইয়া রাজ-পুরুষগণের চিকিৎসা করে, তাহাদের উত্তম সাহস দণ্ড হইবে (অর্থাৎ ছয়শত হইতে হাজার পণ দণ্ড হইবে)। উপরিউক্ত সমস্ত দণ্ডগুলি প্রদত্ত হইবে, যদি রোগী না মরে। মরিলে আরও গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

উৎকোচদানের দণ্ড।

রাজার সভ্য অর্থাৎ সভাসদ্‌গণ যদি অর্থলোভে মিথ্যা কথা বলেন বা উৎকোচ গ্রহণ করেন, অথবা লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চনা করেন, নির্ব্বাসনই তাহাদের দণ্ড।

অন্যায়বাদিনঃ সভ্যাঃ তথৈবোৎকোচজীবিনঃ।
বিশ্বস্তবঞ্চকাশ্চৈব নির্ব্বাস্যাঃ সর্ব্ব এব তে ॥ বৃহস্পতি।

মনুর মতে তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ দণ্ড। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তাহাদের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড।

দ্যূতকার-দণ্ড।

দ্যূতক্রীড়া দ্বিবিধ। অপ্রাণী বা অচেতন বস্তু অর্থাৎ টাকাকড়ি প্রভৃতি লইয়া যে ক্রীড়া হয়, তাহাকে

'দ্যূত' বলে; প্রাণী অর্থাৎ পারাবত কুক্কুট প্রভৃতি বা মেষ মানুষ প্রভৃতি লইয়া যে ক্রীড়া হয়, তাহাকে 'সমাহ্বয়' বলে। কেবল দ্বিতীয় প্রকার কার্য্য রাজার অনুমতি লইয়া প্রজা করিতে পারে, অন্যথা নহে। দ্যূতক্রীড়কের দণ্ড চোরের ন্যায়। অধিকন্তু দ্যূতক্রীড়ককে তাহার অর্জ্জিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হইত।

শঠ জ্যোতির্ব্বিদের দণ্ড।

যে ব্যক্তি জ্যোতিঃশাস্ত্রে অজ্ঞ, অথচ অর্থের লোভে লোকের প্রত্যয় জন্মাইয়া মিথ্যা জল্পনা করে, তাহাদের আর্জ্জিত অর্থ অনুসারে দণ্ড হইবে।

রজকের দণ্ড।

যে রজক মসৃণ ফলকের উপর ধীরে ধীরে বস্ত্র কাচিবে, তাহার এক রৌপ্য মাসক দণ্ড হইবে। রজক যদি কাচিবার জন্য প্রদত্ত বস্ত্রাদি নিজে ব্যবহার অর্থাৎ পরিধান করে, তবে তাহার দণ্ডের পরিমাণ তিন পণ।

ঔপাধিক দণ্ড (False inducesment)।

রাজা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, অতএব আমাকে টাকা দাও, আমি রাজাকে শান্ত করিব, এইরূপ বা এবংবিধ উপায়ে যাহারা অর্থসংগ্রহ করে, তাহাদিগকে ও তাহাদের সহায়ীভূত লোক-সকলকে প্রকাশ্য স্থানে অঙ্গচ্ছেদাদিপূর্ব্বক হত্যা করিবে।

শিক্ষকাদির দণ্ড।

যে ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া পরে কোন ব্যক্তিকে বিদ্যা বা শিল্প না শিখায়, তাহাকে তাহার গৃহীত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

মান্ত্রিক-তান্ত্রিকের দণ্ড।

যাহারা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঔষধি প্রয়োগ করিয়া লোককে চমৎকৃত করিতে চায়, ও কেবলমাত্র বশী-করণ প্রয়োগ করে তাহাদের নির্ব্বাসন দণ্ড।

ভণ্ড সন্ন্যাসীর দণ্ড।

যাহারা দণ্ড ও অজিনের (মৃগচর্ম্মের) সাহায্যে আপনাকে সন্ন্যাসী বলিয়া প্রকাশ করে এবং কৌশলে অর্থসংগ্রহ করে, তাহাদের বধদণ্ড হইবে।

অপ্রকাশ-তস্কর অর্থাৎ যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে চুরি করে ও যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা দ্বিবিধ। এক প্রকার হইতেছে সিঁদেল চোর। আর এক প্রকার হইতেছে বনবাসী চোর। বৃহস্পতির মতে অপ্রকাশ-তস্কর পাঁচ ভাগে বিভক্ত। সিঁদেল, পথিকের ধনাপহরণকারী, গৃহস্থের পশুপক্ষী অপহারক, উৎক্ষেপক ও শস্যহর। উৎক্ষেপক শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি অপরের মুখে বস্ত্রক্ষেপণ করিয়া অপহরণ করে। ব্যাসের মতে আরও চব্বি প্রকার চোরের উল্লেখ আছে। চোর যদি সিঁদ কাটিয়া কিছু না পায় বা যৎসামান্য পায়, তাহা হইলেও তাহার দণ্ডের তারতম্য হইবে না। চোর ধৃত হইলে তাহাকে চোরাই-মাল ফেরত দিতে হইবে এবং রাজা তাহার সম্বন্ধে শূলদণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। যে ব্যক্তি স্ত্রীহর্ত্তা অর্থাৎ পরের স্ত্রী অপহরণ করে, তাহাকে লোহার খাটে শোয়াইয়া অগ্নিদগ্ধ করিবে। যে মানুষ চুরি করে, তাহার হাত-পা কাটিয়া রাজপথে দাঁড় করান হইবে। যে গোহর্ত্তা অর্থাৎ গরু চুরি করে, তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া পরে তাহাকে বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া মারিবে। সাধারণ পশু হরণ করিলে তাহার পায়ের অর্দ্ধেক তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে। উৎক্ষেপকের ও গ্রন্থিভেদকের দণ্ড তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীচ্ছেদন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের চুরি তিন ভাগে বিভক্ত। মাটির ভাঁড়, কাষ্ঠ, চম্ম, তৃণ, শমীধান্য ও প্রস্তুত অন্ন অপহরণ, ইহা হইল ক্ষুদ্র চুরি। মধ্যম চুরি হইতেছে রেশমের বস্ত্র বাদে সর্ব্ববিধ বস্ত্র, গরু ব্যতীত সর্ব্ববিধ প্রাণী, এবং স্বর্ণ ব্যতীত সর্ব্ববিধ ধাতুদ্রব্য অপহরণ। উত্তম চুরি হইতেছে স্বর্ণ, রত্ন, রেশমের বস্ত্র, স্ত্রী পুরুষ, হস্তী, অশ্ব, দেবতা ব্রাহ্মণ ও রাজার জিনিস অপহরণ। হৃত দ্রব্যের মূল্য একশত টাকার অধিক হইলে এবং ঐ বস্তু ব্রাহ্মণের হইলে অপরাধীর বধদণ্ড ব্যবস্থা। অপহৃত বস্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির হইলে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড হইবে। মধ্যম দ্রব্য অপহরণের জন্য অর্থদণ্ড হইবে; অধিকন্তু চোরকে অপহৃত বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। ক্ষুদ্র বস্তু অপ-হরণের জন্য অর্থদণ্ড-ব্যবস্থা।

পরদারাভিমর্ষণ।

পরদার অর্থে নিজ ভার্য্যা ব্যতীত স্ত্রী। পরস্ত্রী সংগ্রহ (kidnapping and abduction) তিন প্রকারে ঘটিতে পারে। ছলে, বলে এবং অনুরাগে। স্বজনাভিগমন (incest) সম্বন্ধে লিঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা। উত্তম বর্ণের পরদারাভিগমনের শাস্তি দোষীকে ধরিয়া কুকুরকে দিয়া তাহাকে খাওয়াইবে।

কন্যাদূষণ দণ্ড।

অবিবাহিত কন্যাগমনে স্বজাতীয় কন্যাধর্ষণ-কারীর দণ্ড তাহার দুই অঙ্গুলিচ্ছেদ। উত্তমজাতীয়া কন্যাধর্ষণের দণ্ড সর্ব্বস্বহরণ ও বধদণ্ড।

কন্যাহরণ অপরাধ।

উত্তম বর্ণের কন্যাঅপহরণে দোষীর বধদণ্ড। স্বজাতীয় হইলে ও কন্যা অনুরাগিণী হইলে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা নাই; কেননা পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ঘটিতে পারে।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

(শ্রীরত্নবালা দেবী)

মানবজীবনের শিক্ষাই মূলভিত্তি। শিক্ষার বলেই মানব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কি নর কি নারী, শিক্ষা মানব মাত্রেরই প্রয়োজন। মানুষকে মানুষরূপে গড়িয়া তুলিতে গেলে শিক্ষাই তাহার প্রধান সহায়। মানবজীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষাই তাহার একমাত্র সদুপায়। কিন্তু পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের পিতামাতারা বিদ্যাশিক্ষার সাফল্য কি, বোধ হয় জানিতেন না; সেই জন্য নারী-জাতিকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া উচিতও মনে করিতেন না। শত বৎসর পূর্ব্বে যে, নারীসমাজ এক প্রকার নিরক্ষর ছিল, এ কথাটি বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু তখনকার নারীদিগের শোচনীয় অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিন। এক্ষণে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নারীজাগরণের দিন আসিয়াছে। নারীরা নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াছে। আমাদের দেশে এই নারীশিক্ষার বিস্তৃতির জন্য যদিও অনেক স্কুল কলেজ সংস্থাপন হইয়াছে বটে, তথাপি নারীশিক্ষার অভাব-অসম্পূর্ণতা এখনও অনেক আছে। সহরের মধ্যে স্থানে স্থানে নারীশিক্ষার জন্য দু'দশটি বিদ্যালয় থাকিলেও পল্লীগ্রামে এখনও নারীশিক্ষা প্রসার লাভ করে নাই। পাশ্চাত্য দেশের নারী-শিক্ষার তুলনায় আমাদের দেশ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। সহরের নারীশিক্ষার তুলনায় পল্লীগ্রামের নারীর অবস্থা অনেক হীন, তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। যতদিন ভারতে নারীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিস্তার না হইবে, ততদিন নারীসমাজের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত।

দুঃখের বিষয় এখনও আমাদের দেশের পিতা-মাতারা পুত্রকন্যার শিক্ষার পার্থক্য রাখেন। এই শিক্ষার পার্থক্যই নারীদিগকে হীন করিয়া রাখিয়াছে। [illegible]রী যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিলে পুরুষের [illegible]মকক্ষ হইতে পারেন, এখনকার দিনে তাহার শত শত নিদর্শন আছে। আমাদের দেশে শিক্ষার অভাবেই নারীজাতির হীনাবস্থা হইয়াছে। তাই মনে হয়, স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা সমান ভাবেই হওয়া দরকার।

তবে পুরুষের শিক্ষার সহিত নারীশিক্ষার কিছু পার্থক্য আছে। নারীপুরুষ লইয়াই মানবসমাজ। যদি বাস্তবিক মানব-সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে হয়, তবে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের শিক্ষার প্রয়োজন। কেননা নারীপুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়াই যখন সংসারধর্ম্মের সমাজধর্ম্মের পরিপুষ্টি সাধন হয়, তখন নারীপুরুষ উভয়কেই সমাজের অঙ্গ বলিতে হয়। অতএব একের উন্নতিতে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ হইতে পারে না। মানবসমাজের পুষ্টি ও বল-শক্তি-সামর্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষার আবশ্যক। নতুবা মানবসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভ হইতে পারে না। দেহের এক অঙ্গের পুষ্টি হইলেও অপর অঙ্গ পঙ্গু হইয়া থাকে। এজন্য মানবসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধন করিতে গেলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষায় সমান অধিকার হওয়া চাই।

সেকালে সাধারণ লোকের মধ্যে এত শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। বিদ্যার সার্থকতা তখন লোক বুঝিতে পারে নাই, এজন্য পুত্রকন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দেওয়া যে উচিত, তাহা তাঁহারা মনে করিতেন না। পুত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অর্থো-পার্জ্জন দ্বারা পিতামাতার ভরণপোষণ করিবে, কন্যা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়াই নারীশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। নারীদের যে জগতে শত শত কর্ত্তব্য আছে, সেকালের পিতামাতাগণ তাহা জানিতেন না। কিন্তু জাগতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীগণ বুঝিলেন, তখন নারীশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই বিদ্যাসাগরের যুগ হইতে নারীশিক্ষা প্রসার লাভ করিল। শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ মহামতি বেথুন সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় ও যত্নে নারীশিক্ষার সূত্রপাত হইল। মহাত্মা বেথুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি মহাত্মা-গণের অসীম যত্নে ও বিপুল উদ্যমে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য মহাত্মা বেথুন সাহেব কর্ত্তৃক বেথুন স্কুল স্থাপিত হইল। তাহার পূর্ব্বে হিন্দুরমণীর শিক্ষার জন্য কোন স্কুল-কলেজের সৃষ্টি হয় নাই। আমরা সেই মহাপ্রাণ বেথুনের কৃপায় আজ নারীশিক্ষার কিছু কিছু উন্নতি দেখিতেছি। বালিকাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পুষ্টির সহিত মনের মধ্যে যে সকল নব নব আশা উদ্যম জাগিয়া উঠে, তাহারা বাল্যজীবনের প্রারম্ভেই বিবাহিত হইয়া স্বামীগৃহে গমন করায় তাহাদের হৃদয়ের সেই সুখের স্বপ্নগুলি কোথায় ভাসিয়া যায়। প্রভাত-অরুণস্পর্শে যেমন শিশিরবিন্দুগুলি বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাল্যজীবনেই বিবাহিত হইয়া স্বামীগৃহে গমনের সঙ্গে সঙ্গেই বালিকাদের মনের আশা ও উদ্যম একে একে শুকাইয়া যায়। বাল্যে স্বাধীন মনো-বৃত্তিগুলিতে বাধা পড়ায় বালিকাজীবনের আনন্দউৎসাহ-গুলি এককালেই নষ্ট হইয়া যায়। অন্ততঃ নারীজাতির

বিবাহ চৌদ্দ বৎসরের কমে দেওয়া উচিত নহে। নারী শিক্ষালাভ করিয়া যখন জননী ও গৃহিণী হইবার উপযুক্ত হইবেন, তখনই তাঁহাদের বিবাহকাল প্রশস্ত। নারীদিগের দৈহিক পুষ্টি ও মানসিক বিকাশ যতদিন না হয়, ততদিন বিবাহ না দেওয়াই উচিত। কেন না, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কর্ত্তব্যভার নারীকে বহন করিতে হয়; এজন্য বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের পিতৃগৃহে থাকিয়া সুশিক্ষা লাভ করা দরকার। নারীকে জননীর মহিমাময় পদে আরূঢ় হইয়া সন্তানপালনের কঠোর দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে। মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণ পরিণতি। সুশীলা মাতা হইতেই সৎ পুত্রের উদ্ভব হয়। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানসিক সদ্‌বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তোলা আবশ্যক। বালিকাদের বাল্যজীবনের আশা, উদ্যম ও স্বাধীন মনোবৃত্তিগুলি পূর্ণ বিকশিত না হইতেই অধিকাংশ স্থলে কোন্ অজ্ঞাতের কোলে তাহারা বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইহার প্রকৃত কারণ নারীশিক্ষার অভাব ও অসম্পূর্ণতা। শিক্ষাই নারীকে জ্ঞানের ও কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দেয়। শিক্ষাই জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার জন্য বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও এখনও যে শিক্ষার সম্যক বিস্তৃতি হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। নারীসমাজের শিক্ষাবিষয়ে এখনও অনেক অভাব আছে। তবে আমাদের মতে নারীপুরুষের শিক্ষার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা চাই। কেননা, নারী জগতের মাতা—জগতের জননী। নারীজীবনের পূর্ণ পরিণতিই মাতৃত্বে। এজন্য বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে যাহাতে স্নেহদয়া ভক্তিমমতা ভালবাসা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি বিকশিত হইয়া উঠে, তাহারও বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। নারীশিক্ষা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিসমাপ্ত নহে,—নারীর শিক্ষা কর্ত্তব্যপালন, গার্হস্থ্যধর্ম্মপালন, সন্তানপালন, রোগী-চর্য্যা ও গুরুজনসেবা এবং গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্যরক্ষা। এইগুলি নারীশিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীর গার্হস্থ্য নীতিশিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক।

নারী সুগৃহিণী ও সংসারে লক্ষ্মীরূপিণী হইয়া স্নেহময়ী মূর্ত্তিতে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল দিয়া, রোগে সেবা, শোকে শান্তি হইয়া আমাদের দরিদ্র বঙ্গগৃহের অভাব-অশান্তি দূর করিয়া অস্বচ্ছন্দতাপূর্ণ বঙ্গসংসারে সুখশান্তি পবিত্রতা আনয়ন করিয়া নিরানন্দময় সংসারে আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকিবেন, ইহাই প্রার্থনীয়। নারী বিবাহিত হইলেই মাতৃত্বের মহিমায় পত্নীত্বের ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া থাকেন। বিবাহের পর স্বামী-গৃহে আসিয়া নারীর আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। নারী তখন নিজের অস্তিত্ব পরিজনবর্গের সহিত মিশাইয়া দেন। বঙ্গসংসারে নারী স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে মন্ত্রী ও পরিচর্য্যায় সেবিকা। নারীর জীবন পরার্থে—স্বার্থে নহে। যে শিক্ষায় নারী কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়া গুরুজনসেবানিরতা হইয়া সৎপুত্রের জননী হইয়া নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, যে শিক্ষায় নারী সংযমপরায়ণা দয়াময়ী হইয়া রোগে-শোকে সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে অবিচল হইয়া স্বামীসেবায় ধন্য হইতে পারেন, তাহাই নারীর শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য অনুকরণের ফলে নারীসমাজে বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী শিক্ষায় বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণে তাঁহাদের সংযম নষ্ট হইতেছে; এবং জননীর আদর্শে তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণও বিলাসী হইয়া উঠিতেছে। বিদুষী ভগিনীগণ এবিষয়ে সংযম-পরায়ণ হইলে নারীসমাজের কল্যাণসাধন হইবে।

প্রকৃতভাবে শিক্ষা লাভ করিতে গেলে নারীকে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীনীতি ও নারীধর্ম্ম এবং নারীজনসুলভ গুণগ্রাম কি, তাহা সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, সংযম সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য ও ক্ষমা প্রভৃতি গুণেও নারীকে ভূষিত হইতে হইবে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের শিক্ষায় পার্থক্য থাকিলেও নারীশিক্ষা নিতান্ত সহজ নহে। পুরুষদিগের শিক্ষা যেমন নানা জটিল বিষয়ে পূর্ণ, তেমনি স্ত্রীশিক্ষাতেও বহু দায়িত্ব আছে। পুরুষ অর্থোপার্জ্জন করিয়া বাহিরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও পরিজনবর্গের ভরণ-পোষণ প্রভৃতির জন্য যেমন দায়ী, তেমনি নারীও গৃহসংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও পরিজনবর্গের সুখশান্তি বিধান করিতে বাধ্য। শুধু বিদ্যাশিক্ষায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভে নারীশিক্ষার পূর্ণতা ও সাফল্য হয় না। কর্ত্তব্যই নারীর তপস্যা। নারী সংসারে সৎপুত্রের মাতা হইয়া আদর্শ গৃহিণী হইয়া আদর্শ জননী হইয়া সুখ শান্তি আনন্দ আনয়ন করিয়া সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবেন। ইহাই নারীজীবনের সাফল্য। ইহার বিপরীত ভাব হইলে নারীর জীবনে শান্তিসুখ থাকে না। পত্নী উপরোক্ত গুণবতী না হইলে পতিও সংসারে সুখী হইতে পারেন না; এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সুখস্বচ্ছন্দতাও থাকে না। নারীরা নিজের সরলতা কোমলতা প্রেম ও ভালবাসার মাধুর্য্যে পুরুষদিগের জীবন উদ্বোধিত ও সরল করিয়া রাখিতে না পারিলে দাম্পত্যজীবনের সুখশান্তি থাকে না। নারীর দায়িত্ব সংসারে পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী। সন্তানপালন রোগীচর্য্যা গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি কার্য্যগুলিতে নারীর বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়ো-

জন। শিক্ষার অভাব হেতু নারীদের সন্তানপালনের অনভিজ্ঞতায় সূতিকাগারে বহু শিশুর জীবন নষ্ট হয়। নারী বিশ্বের জননী হইয়া বিশ্বকে ভালবাসিবেন ও বিশ্বের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সংসারসংগ্রামে তাঁহাকে জয়ী হইতে হইবে। আমাদের সমাজ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই হেতু ধর্ম্মকে মূলভিত্তি করিয়া নারীর শিক্ষা দিতে হইবে। আমাদের নারীসমাজে জাতীয় ভাবের শিক্ষাই প্রয়োজন। ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে চরিত্রে প্রতিভায় নারীর নারীত্বের গৌরব ও মর্য্যাদা ফুটিয়া উঠা দরকার। আমরা তাই সীতার মত সাবিত্রীর মত পতি-প্রাণা, বেহুলার মত ফুল্লরার মত পতিপ্রেমবিমুগ্ধা, সতীর মত গৌরীর মত পুণ্যপূতা ভারতনারীর মহান্ আদর্শ দেখিতে চাই। আমাদের দেশের নারীর স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে অর্দ্ধাঙ্গিণীরূপে পত্নীরূপে পতির সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্যতা লাভ করা চাই। তাই নারীশিক্ষায় দৃঢ়তা সংযম ও ত্যাগের স্থান থাকা চাই। নারী শুধু বসনেভূষণে বিলাসে গা-ঢালিয়া দিলে নারীত্বের বিকাশ হইবে না। খ্যাতনামা কবি নবীন সেন তাই স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

রোগে শান্তি দুঃখে দয়া
শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া।

এখন চাই নারীর জাগরণ, চাই নারীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, চাই নারীর সংযম।

আত্মসম্মান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজকাল একটা ঢং উঠিয়াছে নিজেকে খুব নীচু করিয়া বলা। এটা নাকি মস্ত বিনয়। অবশ্য মনে যতটা বিনয় জাগ্রত হউক বা না হউক, মুখে দেখানো চাই। কলিকাতায় একজন মস্ত ধনী লোকের গৃহে কেহ অতিথি হইলে তিনি তাঁহাকে বলিতেন—এ সমস্তই আপনার। তিনি নিশ্চয়ই ইহা মুহূর্ত্তেরও জন্য ভাবিতেন না যে, অতিথি সত্যই স্থির ধারণা করিবেন যে, সেই ধনীর প্রাসাদ ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার হইয়া গেল। তবু অতিথির নিকট ঐ প্রকার বলা অল্পবিস্তর শোভন হইতে পারে। কিন্তু যখন তখন বৃথা মৌখিক বিনয়-প্রকাশ শোভন তো নয়ই, বরঞ্চ অনেক সময়েই বিরক্তি-কর হইয়া উঠে।

এই প্রকার বিনয়ের উদ্ভব সম্ভবত চৈতন্যদেবের সময় অবধি হইয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্যতর প্রধান ভাব ছিল—

অমানিনা মানদেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
তৃণাদপি সুনীচেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

যে ব্যক্তি নিজে মানের আকাঙ্ক্ষা রাখিবে না, কিন্তু অপরকে সর্ব্বদাই মান দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে; লোকের অত্যাচার, নিন্দা প্রভৃতি তরুর ন্যায় একটা কথা না বলিয়া অম্লানবদনে সহ্য করিবে এবং আপনাকে নীচ হইতেও সুনীচ বিবেচনা করিবে, সে-ই প্রকৃত হরিকে ভজনা করিবার উপযুক্ত পাত্র। কথাটা বড়ই উচ্চদরের কথা এবং যাঁহার মুখারবিন্দ হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছিল, তাঁহার অন্তর হইতেই ইহা বাহির হইয়াছিল, স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার পর শিষ্যপরম্পরায় এই ভাবটী যে আকারে নামিয়া আসিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমানে তাহা অনেক স্থলেই ভক্ত-ভণ্ডামিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; হাতে মালা জপিব, মুখে হরিনাম বলিব, আর অন্তরে অধমর্ণের নিকট সুদ কত প্রাপ্য তাহারই হিসাব করিব, এই ভাবের ভণ্ডামিতে দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকার ভণ্ডামির কারণে বৈষ্ণব অনেকের নিকট হেয় দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণবীয় বিনয়ভাবের উচ্চতা উপলব্ধি করিয়া তাহারই অনুকরণে নব্যযুগে কোন ধর্ম্মসংস্কারক উহার প্রচারে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে পরস্পরের পদধূলিগ্রহণের আতিশয্য দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেভাবে বিনয়প্রকাশ ভক্তদের অন্তর হইতে অভিব্যক্ত ও বিকশিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না, কারণ তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিল না।

বিনয় যাঁহাদের জীবন, যাঁহাদের প্রাণের ধর্ম্ম, তাঁহাদেরই পক্ষে বিনয়প্রকাশ সাজিতে পারে। এই কারণে আমরা যথাযুক্ত বিনয়প্রকাশের পক্ষপাতী হইলেও অতিরিক্ত ও অযথা বিনয়প্রকাশ অনুমোদন করিতে পারি না।

অতিরিক্ত বিনয়প্রকাশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার আমাদের আরও একটী কারণ আছে। ইহা তো প্রসিদ্ধি আছে যে, একজনকে যদি ক্রমাগত অসাধু বলিতে থাকা যায়, তবে সে ক্রমে অসাধুতারই পথে ক্রতই নামিয়া যায়;

একজন অসাধুকে যদি ঘৃণা করিবার পরিবর্ত্তে ক্রমাগত সাধু বলিতে থাকা যায়, তবে সেও নাকি সাধুতার পথে অগ্রসর হয়। প্রবচনগুলি বহুযুগের অভিজ্ঞতার সংহত আকারে অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং আমাদের পক্ষে ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, উপরোক্ত চলিত কথার ভিতরেও যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। ঐ কথার উপর দাঁড়াইয়া আমরা বোধ হয় বলিতে পারি যে, অতিরিক্ত অযথা নকল বিনয় প্রকাশ করিতে গিয়া নিজেকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা হেয় প্রচার করিতে করিতে হেয় হইবার অনেক ভাব ও চিন্তা আমাদিগকে নিঃসন্দেহ স্পর্শ করিবে—স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে না। বর্ত্তমানে auto-suggestion অথবা আত্মমোহন তো সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য রূপে দাঁড়াইয়াছে। নিজেকে ক্রমাগত হেয় বলিতে বলিতে ঐ আত্মমোহনের ফলেই অনেকটা হেয় হইয়া পড়িতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারি না। আজ কিছুকাল হইল, আত্মমোহনের প্রভাব সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প শুনিয়াছিলাম। লর্ড কার্জ্জনের এক বন্ধু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। অপেক্ষাগৃহে বা ante chamberএ তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কার্জ্জনের পরিচারক বন্ধুর নিকট হইতে তাঁহার নামপত্র লইয়া প্রভুর নিকট দিতে গেল। ইতিমধ্যে বন্ধু শুনিতেছেন—লর্ড কার্জ্জন চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—I can, I shall, I must,—আমি পারি, আমি করিব, আমি নিশ্চয়ই করিব। বন্ধুর নাম পাইয়া লর্ড কার্জ্জন ভৃত্যকে বন্ধুকে লইয়া আসিবার আদেশ করিলেন। বন্ধু লর্ড কার্জ্জনের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ প্রকার চীৎকার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি auto-suggestion দ্বারা তাঁহার influenza আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

যাক্, মোটের উপর কথা এই যে, অতিবিনয় প্রকাশ করিয়া কাহারও ইহা দেখানো সঙ্গত নহে যে, তিনি জগতের যেখানে যে আছে, সকলের অপেক্ষাও হেয়—সকলের অপেক্ষা তাঁহার আসন নিম্নে; আর অতি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কাহারও ইহাও মনে করা সঙ্গত নহে যে, জগতে সকলের অপেক্ষা তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহার আসন সকলের উপরে। কোন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক, অবশ্য উপহাস করিয়া, অপর একজন ধর্ম্মপ্রচারককে বলিয়াছিলেন—দেখুন, যখন বক্তৃতা বা উপদেশ দিবেন, তখন একমাত্র নিজেকেই মানুষ ভাবিবেন এবং শ্রোতৃবৃন্দকে মেষের দল ভাবিবেন। তিনি অবশ্য উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহাদের অন্তর অতিমাত্র অহঙ্কারে ডুবিয়া থাকে, তাঁহারা সচরাচর সত্যই ঐ প্রকার ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন।

নিজেকে ক্রমাগত হেয় মনে করা, মুখে বলা, অন্তরের উচ্চ আশাভরসা, প্রাণের উচ্চ আকাংক্ষা সকলই নির্ব্বাপিত করে, মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করিবার যথেষ্ট সহায়তা করে। অতিবিনয়ী ব্যক্তি নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। স্বভাবতই নিজেকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পরাংমুখ হয়। অতিবিনয় মনের উপর উগ্র বিষের কাজ করে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং, এই কথাটী বোধ হয় সকলেরই জানা আছে।—

অতি দর্পে হতা লঙ্কা; অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্॥

অতি দর্পের ফলে লঙ্কা গেল; অতি মানের ফলে কৌরবগণ বিনষ্ট হইল; অতি দানের ফলে বলিরাজা বাঁধা পড়িল; অতিমাত্রায় যাহা কিছু তাহা গর্হিত, অর্থাৎ বেশী কিছু করা বা সামঞ্জস্যের অতিরিক্ত করিয়া বাহাদুরী করা কিছু নয়—গুণের বদলে তাহা দোষের কারণ হইয়া পড়ে।

আমরাও এখানে বলিতে চাই, অতিরিক্ত অবিনয় বা দুর্বিনীতভাব যেমন বহু অনিষ্টের কারণ হয়, সেইরূপ অতিরিক্ত অর্থাৎ অযথা বা অসঙ্গত বিনয়-প্রকাশও নানা অনিষ্টের কারণ হয়। নিজেকে যদি সমালোচনার তৌলদণ্ডে ফেলিয়া ওজন করিতে চাও, কর; তাহাতে কোনই আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সেই ওজনের ফলে নিজের যথার্থ মূল্যটুকু বাহির করিতে হইবে। সেই মূল্যটুকু বাহির করিয়া তাহারই উপর সংসারক্ষেত্রে বীরের মত বিচরণ করিতে হইবে। নিজের ভুলভ্রান্তি বা কোন বিষয়ে অক্ষমতার জন্য কখনই নিজের কাছেও নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করিবে না, অপরের কাছে তো হেয় প্রতিপন্ন করা দূরের কথা। ভগবান বিশ্বপতি, জগৎসংসারের সকল ঐশ্বর্য্যের আকর; তুমি তাঁহার সন্তান; তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত। তিনি তোমার অন্তরে চির অধিষ্ঠিত। সুতরাং আপনাকে তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান জানিয়া অন্যায় বিনয় প্রকাশ করিবে না—সকলের নিকট যাহাতে উপযুক্ত মানমর্য্যাদা লাভ কর, সংসারে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে যাহাতে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইতে পার, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হইবে। ঈশ্বর সহায় হইবেন।

সকল ধর্ম্মেই সত্য, সকল ধর্ম্মই সত্য নহে।

গত ২৬শে কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে "শ্রীকেশবচন্দ্রের ক্রন্দন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা কোন এক প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের নববিধান-শাখার কোন কোন আচার্য্য এই যে মত ব্যক্ত করেন যে, "সকল ধর্ম্মই সত্য", তাহা কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। তাহা যদি সত্য হইত তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম প্রধান প্রচারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রয়োজনই হইত না। আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে নববিধানসমাজের কোন নেতার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা সাধারণতঃ প্রচলিত অর্থের পরিবর্ত্তে কিছু বিভিন্ন অর্থে ধর্ম্মশব্দের ব্যবহার করেন, এবং সেই অর্থ ধরিয়াই তাঁহারা সচরাচর "সকল ধর্ম্মই সত্য" বলেন। আমরা নিষ্প্রয়োজনে প্রচলিত কোন শব্দের অপ্রচলিত বা মনঃকল্পিত অর্থের ব্যবহার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা সমীচীন বিবেচনা করি না। ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক শব্দের এইরূপ ব্যবহারের ফলেই প্রকৃত সত্যধর্ম্মের উপর বিস্তর আগাছা পরগাছা জন্মিয়া উহাকে ঢাকিয়া ফেলে, ভারতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশের উপর দাঁড়াইয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজের নববিধানশাখার ভ্রাতৃবর্গকে "সকল ধর্ম্মই সত্য" এই কথা পরিত্যাগ করিয়া "সকল ধর্ম্মেই সত্য" এই কথাই ব্যবহার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। ইহার ফলে আমাদের বিশ্বাস ব্রাহ্মসমাজ মিলনের পথে অন্ততঃ কিছুদূর অগ্রসর হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের সকল কর্ম্মে, সকল ভাবে ও চিন্তায় মিলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা নিম্নে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশ সহ উপরোক্ত "শ্রীকেশবচন্দ্রের ক্রন্দন" প্রবন্ধের অনেক অংশই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্রের ক্রন্দন।

(কেশবচন্দ্র) পৌত্তলিকতাকে ঈশ্বরের শত্রুতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন:—"হরির দুষমন যারা, তাদের যদি আদর করি, তাহলে উপাসনার ঘরে আসিয়া দেখিব, দরজা বন্ধ। শত্রুকে যদি প্রশ্রয় দি, হরিকে আর পাওয়া যাইবে না। শত্রুকে প্রশ্রয় দিলে ভক্তি শুকায়, চরিত্র লোপ হয়। একবাটি ঘন দুগ্ধে যেমন একটু টক দিলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি ভক্তি ছিঁড়ে যায়।"

এই বলিয়া তিনি দুর্গোৎসব উপলক্ষে কাঁদিয়া বলিলেন, "দেখ মা, আজ লোকে তোমাকে ঘরে আনিবে, না কাহাকে লইয়া আসিল ? মৃত মৃত্তিকা, তাকে আনিয়া 'মা মা' রবে ডাকছে। আহা, দুঃখ হয়! মাটী, কাঠ, খড় এ সব মা হয়ে বঙ্গবাসীর প্রাণমন আকর্ষণ করিতেছে। পুতুল, তুই কেন মার জায়গা নিলি ? রংকরা পুতুল, তুই সামান্য মাটী হয়ে ব্রহ্মাণ্ডপতির আসন নিলি ? যারা দেশের পিতামাতা, শাস্ত্রকার, চিকিৎসক, তারা কি এই উপায় করে গেল যে, বৎসরান্তে যত পাপ হবে, একটা মাটীর পুতুল হইয়া সব পাপ দূর করিবে ? মাটীর দুর্গা! দেশটা ঘুমাইতেছে নাকি ? ঘোর বিকার, বাঙ্গালীগুলো চীৎকার কচ্ছে। খড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, এই আমার পরিত্রাণ। বঙ্গদেশ, সোণার দেশ, যায় আর কি। মা, সোণার দেশকে বাঁচাও। আমাদের উপায় তুমি। পৌত্তলিকতা রোগ বড় ভয়ানক। তুমি শান্তিজল ঢাল। সচ্চিদানন্দময়ি মা, এস।"

আবার অন্যত্র তিনি ঈশ্বরের নিকট কাঁদিয়া বলিলেন "হে পরমেশ্বর, আমাদের স্বজাতির এই দুর্দ্দশা! কোথায় মা দুর্গা ? একটা কল্পিত দুর্গা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে যাহা ইচ্ছা পাপ অত্যাচার করিতেছে। এক পৌত্তলিকতার ভ্রমে দেশ গেল। আচ্ছা, তাই যেন মানিলাম যে, লোকে বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে মাটির ভিতর পূজা করিতেছে; কিন্তু ওদিকে পূজার বাজনা, এদিকে বো—র শব্দ! দয়াময়, কিসের জন্য কাঁদিব ? ভ্রমবশতঃ মাটীপূজা করিতেছে সেজন্য, না জেনে শুনে তোমার নামে পাপ করিতেছে সেজন্য ? কোথায় গেল যোগীদের যোগসাধন, হোম, আর্য্যদের স্তবপূজা ? সে সব গিয়ে আজ মাটীপূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপের অত্যাচার! একি ধর্ম্ম ? অর্দ্ধেক নাস্তিকতা, অর্দ্ধেক মাটীপূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপ মিশে গেল। আর কি বাকি রহিল ? কপটতা, নাস্তিকতা, ধূর্ত্ততা, অবিশ্বাস সব এক হইল!"

তাই তিনি আরো কাঁদিলেন, "আজ এই জাতির গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়া এদেশ হাসিতেছে, আজ আবার চিরদুঃখিনীর মত হয়ে মাতৃভূমি কাঁদছে। বুক চিরে দেখাচ্ছে কত দুঃখ। ধর্ম্মের নামে কত পাপ হচ্ছে। সামান্য মৃত্তিকার কাছে হিন্দুর মাথা আজ অবনত। দেশশুদ্ধ লোক মেতেছে, কিসের জন্য ? পুতুলকে দেবতা মনে করে। এ পূজা দেখাচ্ছে, আমরা কত নীচ হতে পারি। এর চেয়ে নীচ আর কি হবে ? খড়ের পর্য্যন্ত পূজা হলো। যাঁরা এক সময় হিমালয়ে

তোমার ধ্যানধারণা করিতেন, আজ বঙ্গদেশে সিদ্ধ-ভূমিতে এসে তাঁরা খড়ের মাটীর পূজা কচ্ছেন! পণ্ডিতেরা এই মাটীর সম্মুখে শ্লোক উচ্চারণ কচ্ছেন।"

"আজ এ সময় যত নির্দ্দোষ আমোদ তোমার ভক্তদের মন আমোদিত করিতেছে, সেগুলো যেন রেখে দি। আমাদের কাছে সব নিরাকার। আমাদের মা, দয়া কর, মাটীপূজা দূর কর, ভাল জিনিষগুলি রক্ষা কর। এই যে এসময় পুত্র পিতার প্রতি ভক্তি দেখায়, এটি যেন থাকে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি যে বিশুদ্ধ প্রণয় দর্শন করায়, তা যেন থাকে। এই যে বৎসরান্তে পিতা-পুত্র স্বামীস্ত্রীর যে পবিত্র মিলন, তা যেন রক্ষা পায়। বঙ্গদেশের গৃহস্থ বড় সুখী, এই যে আদর্শ পরিবার যেন থাকে। মা, ধর্ম্মরক্ষিণী স্ত্রী, এখনকার নব্য স্ত্রীরা যেন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। ধর্ম্মরক্ষার ভার তাঁদের হাতে। এদেশ চিরকাল ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। যা এর ভিতর খারাপ আছে, দূর কর; কালরাত্রি পোহাইল। দয়াময়ি, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমরা এই পূজার অসার অংশ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের মধুরতা পবিত্রতা যাহা আছে গ্রহণ করিয়া, আমরা ভাল হই, অন্যকেও ভাল করি।"

(নববিধান) সর্ব্বধর্ম্মের অসার ভাগ, মানবীয় মনঃকল্পিত ভাগ যাহা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সার অংশ, সত্য অংশ, যাহা প্রকৃত বিধাতার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাংশ, তাহা ব্রহ্ম-প্রেরণায় দিব্য জ্ঞানে দর্শন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। নববিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ তাই পৌত্তলিক ধর্ম্মের মধ্যেও যাহা অধ্যাত্ম সত্য, তাহা উদ্ধার করিয়া, তাহার খোসা যাহা তাহা পরিত্যাগ করিলেন ও তাহাই করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন।

উক্ত প্রবন্ধের লেখক নববিধানের নামে সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে অসার বাদ দিয়া সার সত্যধর্ম্মসংগ্রহে কর্ত্তব্যতাবিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্রাহ্মসমাজের অপর দুই শাখা ও উক্ত কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কিছুমাত্র কম বলেন না। কিন্তু সত্য ধর্ম্মের খাঁটি আদর্শ ঠিক রাখিবার জন্য প্রচলিত মূর্ত্তিপূজাসমূহ উপলক্ষে ব্যবহৃত দেবদেবীর নাম ও পূজাবিধি প্রভৃতি তাঁহাদের উপাসনায় কোন প্রকার স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডে এই কারণেই উপাসনায় প্রচলিত দেবদেবীর নাম প্রভৃতি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজের ঐ অপর দুই শাখা রামমোহন রায়ের ঐ নিষেধবিধি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই নববিধান-সমাজও রাজা রামমোহন রায়ের ঐ নিষেধবিধি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়াই উপলব্ধি করিবেন।

THE

BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(3)

36. The *National Paper*.

On the loss of the *Indian Mirror*, which was of course immediately utilised for purposes of invective and attack, the *National Paper* was started for justifiable defence. So keen and true were the shafts it strung, that roused and excited seceding Brahmas convened a general meeting at the Sealdah station to discuss the matter, and Keshub Chunder delivered a spirited address to a large number of people.

37. Keshub's letter to Devendranath dated the 19th Ashar, 1787 *Saka*. (2nd July 1865 A.D.)*

It was finally agreed by Keshub Chunder and his friends to send the following letter to Devendranath Thakur, which we insert below with that gentleman's reply :—

TO THE REVERED DEVENDRANATH THAKUR,
Trustee and Principal Minister of the
Calcutta Brahma Samaj.

Sir,—With due reverence we beg to represent that it is with feelings of joy and triumph that the Brahmas behold the progress which the *Samaj* has been making for some years past, and which has led many to be more attached to that religion, with a conviction of its being a manifestation of Divine Mercy and the Majesty of

---

* The English date (19th June 1864 A.D.) given in the book seems to be a mistake. The English date corresponding to the Bengali date of the letter should be 2nd July 1865 A. D. *Ed. T. P.*

Truth. We have full and vivid instances of its progress on every side. The truth of Brahmaism has been spreading to every quarter whether young or old, man or woman, rich or poor, learned or unlearned, all are continually repairing to its asylum. The numbers of Brahmas are increasing as much as the branches of the *Samaj* are being established on all sides. It is increasing in depth as it is extending in length and breadth. As it is stretching far and wide to bind all human hearts in one universal faith, so it is taking a deep root in the lives of men. Whether, as relates to the advancement of divine knowledge or expansion of divine love ; whether as regards the purification of the heart or social reform ; whether as concerns the preaching of the religion or proselytism of the people, there is a marked progress in everything all around us.

But we need not give a lengthy description of these things to you, who, for a space of about thirty years, have been with unflagging zeal and energy, labouring for the success of the *Samaj*, and cannot but feel delighted, we believe, at the present progress of our cause, when you have so many times gladly told us that we have succeeded even beyond your expectations. It is this current of progress which has given rise to the present dissension. Many young Brahmas are dissatisfied with the old mode of conducting proceedings observed in the *Samaj*, and this dissatisfaction has become the root of the present discord. Though this discord is much to be regretted, yet it is not a thing to be wondered at. Such disputes are generally known to take place whenever a change or reform is introduced, and whenever old and new doctrines come into collision with each other. Their mutual struggles to gain the upper hand is always productive of much dispute, debate and discussion, though at the end truth must prevail, and all peace and bliss are sure to be restored by the mercy of God. The apathy and discontent which many are now found to bear against the *Brahma Samaj* tend only to corroborate this truth. With the advancement of knowledge, many have now come to believe in the independence, the catholicity and progressiveness of Brahmaism ; and that it is quite opposed to idolatrous and sectarial faiths, and to all kinds of social and domestic evils. Impressed with this belief, the educated young party, finding the rules and forms of the *Samaj* to be of a limited and sectarian kind, and subversive of all improvement and progress, have become unwilling to keep further connection with it, and have become eager to adopt better forms and rules. The present discord is not owing to any dispute regarding any earthly property, or to any earthly interest or enmity of any kind, but a pure disinterested contest for the advancement of religion.

It is a dispute between the exalted ideal of religion in the hearts of the young Brahmas, and the state of the old *Samaj*. It is for this reason quite necessary to introduce some changes, which the *Samaj* would do well to adopt. It will not be possible for the *Samaj* to effect the great purpose it has in view, *i. e.*, the regeneration of the people, unless it keeps pace with the exalted sentiments of the times ; unless it changes the mode of its action agreeably to the new ideas and new wants of the community, and suit its course to the spirit of the pushing and progressive class of its members. The *Samaj* ought to progress according to the progressive spirit of its religion.

Believing such reformation to be necessary, we beg to submit the following propositions to your liberal consideration, and hope you will do what you think right and proper :—

1st.—That no minister, or preacher, or reciter of the *Samaj*, should retain any mark of caste or sectarian distinction whatever.

2nd.—That honest, pious and learned Brahmas only be allowed to occupy seats on the Vedi.

3rd.—That the hymns, expositions and sermons should be fraught with the liberal sentiments of Brahmaism. No expression of disapprobation or vituperation must be used in them against any sect or religion ; they should express a fellow-feeling with all of them.

Should you feel disinclined to adopt the aforesaid suggestions of change in the Divine Service of the *Samaj*, you will oblige the generality of Brahmas by appointing some other day for our public worship in the *Samaj* in the said form.

This compliance on your part will doubtless settle the present dispute, and re-establish union among the Brahmas in place of the discord which has now arisen among them. Should you feel unwilling also to comply with this request, you will oblige us by giving your best advice for our establishing a separate *Brahma Samaj* for ourselves.

Yours most obediently,

(Signed,) Keshub Chunder Sen.
Umanath Gupta.
Mahendranath Bose.
Jadunath Chakrabarti.
NibaranChunder Mukhopadhyaya
Pratap Chunder Majumdar.

Calcutta, 19th Ashar, 1787 Saka.
(2nd July 1865).

38. Devendranath's reply.

To the above, Devendranath replied as follows :—

Beloved Keshub Chunder Sen, Umanath Gupta &c. &c.

With regard is the following addressed :—

I received your address of 19th Ashar, and became acquainted with your wishes and request. Your dissatisfaction with the present mode in which the proceedings of the *Brahma Samaj* are conducted, and intention of establishing a new mode, is a sign of the progress of the *Brahma Samaj*.

I well know that it is not with the *Brahma Samaj* alone, but with every kind of human institution, that no mode of procedure can for a long time remain stationary, and a firm resolution for preserving its old character is repugnant to the laws of society. Human condition changes according to the tenor of the time, and new institutes are substituted instead of old ones, without which every progress must cease in its course. The *Brahma Samaj* has never failed to adopt this law (of renovation). Whenever it was thought necessary to change an old rule, it has been done as far as it was deemed practicable, and the same principle still continues in force, and is punctually observed at all times.

2. It is no wonder that many should believe Brahmism as quite repugnant to idolatry, sectarianism, and social and domestic evils of every kind. Without such a belief no one can realize the object with which he embraced it. Impressed with this belief, most of the young educated men are led to consider the present rules, the service and the forms of the *Samaj*, as exponents of a limited and sectarian faith, and suppressive of improvements, obliging them to give up their connection with it and to follow a better course. It is for this purpose that you have with one accord proposed to me three articles of improvement, which I was glad to take into my mature consideration.

3. Your first proposition states, "that no minister, sub-minister or reciter of the *Samaj* is to wear any sign on his person distinctive of caste or sect." I do not suppose that you intend to mean the titles of men (such as Mookerjea, Banerjea, &c.,) which are expressive of caste distinctions by the word *sign* which you have used. You simply seem to mean by the term the Brahminical thread which serves as an exponent of the Brahmin class. I cannot for several reasons give my consent to your proposals at present, and the reasons why I dissent are stated as follows :

4. Long before the introduction of *anushthanas* or Brahmic domestic rites, divine service was the only ceremony performed at the *Samaj*. Those who then had the faith and courage to join the *Samaj* and attend divine service only had to undergo every kind of better persecution, like the practisers of the said Brahmic rites at this time. The introduction of a reformed ritual into the *Brahma Samaj*, and the accession of Brahmas with such exalted sentiments and views as yourselves have been the fruits of *their* patience, agitation and zeal. You also, when you first joined the *Samaj*, had no other object in view than to perform divine worship only, and it is very likely that there are some men

among you who cannot join in any thing else but that worship. There are many both among the old as well as new parties, who have not yet been able to observe *anusthan*, and yet neither they nor you are objects of my disregard. What I wish is simply this, that both you as well as they, being on friendly terms with each other, may effect the improvement of the *Brahma Samaj* that your strength combined with theirs may sustain the institution; and that your examples may infuse strength and encouragement to them. But if you come to disagree with each other, it will be to the disadvantage of both parties; you will lose in strength as they in courage and progress. Both these occurrences are as painful to me as they are detrimental to the interests of the *Samaj*, and it is my implicit duty to prevent the adoption measures which will cause such occurrences. The adoption of your very first proposition will not, I am sure, fail to be attended with this unhappy consequence. Again, on the other hand, I have to apprehend that, unless I were to concede to your proposals, you also will alienate yourselves from the *Samaj*, and bring on the same evil I want to avert. Yet I think it will savour of a great partiality on my part if I should be disposed to slight them by conceding to your terms. For how is it possible for me to deprive men of those privileges, which they still retain by their conformity and strict obedience to those rules by which they have come to, and have kept possession of, them up to this time? Should the largeness of your souls enable you patiently to bear with the authority they have acquired in the *Samaj*, and to act in co-operation with them with loving hearts and minds, as with your elder brothers, you will no doubt in that case be able to effect far greater progress in the cause of Brahmaism than in the manner you have already proposed. If you act in the way I advise you will find them more favourable to the reforms you want to introduce than if you act in the way you propose. There is no difference between you and them, in the ends and objects you have both in view which is the well-being of the *Samaj*, but about the manner and means of bringing them into execution.

5. It is but superfluous to notice your second and third proposals, because both of them, as far as I am aware, are always observed in actual practice in the *Samaj*, as much as possible according to the light possessed by the members.

6. You have represented in the next place that if I should disagree with you in adopting the new modes of service recommended by you, you will feel obliged by my appointing a certain day of the week for the performance of divine worship by "the generality of Brahmas," in the *Samaj* according to your new form. By this it appears that you have designated the few Brahmas who are dissatisfied with the present state of the *Samaj*, by the title of "the generality of Brahmas," but there are Brahmas greater in number than those who have joined with you, they as well as you are known by the appellation of "the generality of Brahmas." If you should mean all Brahmas by this term, and ask for all the appointment of another day in the week for offering their prayers in the *Samaj*, such a request is altogether unnecessary; because the days already appointed for divine worship in the *Samaj*, are for the generality of Brahmas and not only for Brahmas but the public in general. The generality of Brahmas grace the hall of worship with their presence on those days and testify the joy of their minds at the same.

7. But if you should request another day for *your* worship alone in the *Samaj*, I am really sorry I cannot comply with this request also. You say that "this will be good for both parties, and introduce harmony in the place of the discord now reigning in the *Samaj*." But I can clearly foresee that this will be a source of greater discord in the *Samaj*, which is highly improper in a place of public worship. I had once before made a rule that some of you should conduct divine service on the first Wednesday of every month, in which case you would have been enabled, without requiring another day for your special

worship, to lay down the foundation of an improvement without any detriment. Divine service was once conducted according to this rule, and we waited for you on several other occasions. But to my great disappointment you declined to attend; and now I see no way of union unless you join together in your worship as before.

8. At the end it appears that, unless I consent to any of your terms, you will etablish a separate *Samaj*, for which you have asked my advice. I say the more *Samajes* are established at different places for the worship of the One Only God, the more good is it calculated to confer on mankind. Relying on the instruction of the great Ram Mohan Roy, the founder of Brahmaism, I sincerely give you this advice that you should make use of such sermons, expositions, prayers, and hymns, at your Divine Service in the said *Samaj*, which are best calculated to exalt the intellect, heart, soul, and mind towards God, and which help to infuse Divine love, purity piety, and holy sentiments into the heart and mind.

9. Being prevented by the aforesaid reasons to give my consent to your request, I beg you will not be displeased with me. So peace and prosperity wait on you and God always manifest himself to you.

Your sincere well wisher,

DEVENDRANATH SARMA.

Calcutta,
23rd Ashar, 1787 Saka.
(6th July, 1865).*

নানাকথা।

হিন্দুমিশনের সাফল্য।—আমরা কার্ত্তিক মাসের হিন্দুমিশন পত্রে হিন্দুমিশনের সাফল্য পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। সকল মনুষ্যকে ভ্রাতৃভাবে দেখাই আমাদের মূলমন্ত্র। কিন্তু ভগবানের মঙ্গল বিধানে যেরূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তৃণ-বৃক্ষাদির জন্ম ও বৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ বিভিন্ন মানবসমাজেও বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা বা culture এর উদ্ভব ও স্থায়িত্ব লাভ হয়। এই ভারতবর্ষে যে শিক্ষাদীক্ষা জন্মলাভ করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাকে ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রূপ দান করা বড়ই কঠিন; কিন্তু তাহাকে সাধারণত হিন্দু শিক্ষাদীক্ষা বা হিন্দু culture বলিলে তাহার ভাব আমাদের অনেকটা হৃদ্গত হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগতের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে এই হিন্দু culture এর স্থান অনেক উচ্চে। সেই কারণে আমরা এই হিন্দু culture এর ক্রমাগত প্রসার ও গভীরতা দেখিতে পাইলে খুবই সুখী হইব। এই প্রসার ও গভীরতা লাভের পক্ষে সমভাবের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি একটা বড় রকমের সহায়। এই কারণে শুদ্ধির সাহায্যে বা অন্য উপায়ে হিন্দুভাবের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা আমরা খুবই অনুমোদন করি। উপরোক্ত প্রবন্ধে আমরা দেখি যে এবারকার লোকগণনায় বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ১৩॥০ লক্ষ বৃদ্ধির মধ্যে শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে ৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার জন্য আমরা হিন্দুমিশনকে অভিনন্দন করিতেছি। আমরা ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতে চাই যে, আমাদের এই আনন্দের মূলে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবের নামগন্ধ নাই।

প্রত্যেক লোকের বাগান করা :—সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখি যে, সুপ্রসিদ্ধ হেন্‌রি ফোর্ড আদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহার প্রত্যেক কারখানার বিবাহিত কর্ম্মচারীকে নিজ নিজ জমি চাষ আবাদ করিয়া যথাশক্তি শস্যাদি উৎপাদন করিতে হইবে, যাহাতে কর্ম্মচারীগণের প্রত্যেকে আগামী শীতকালের মধ্যে ঐ উৎপন্ন শস্যাদি হইতেই নিজ নিজ পরিবারের ভরণপোষণ চালাইতে পারে। এই আদেশ এমন কঠোর যে, যাহারা শাকসব্জি প্রভৃতি শস্যাদি উৎপাদন করিতে না পারিবে, তাহাদিগকে ফোর্ডের কারখানা হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

ফোর্ডের উদ্দেশ্য যে, এরূপ আদেশের পরিণামে দেশের বেকারসমস্যার একটী সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। বিগত মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে জার্ম্মানীর চাষআবাদ-বিষয়ক ব্যবস্থা সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম যে, সে দেশে জমী পতিত রাখার বিরুদ্ধে এমনই কড়া নিয়ম জারী ছিল যে, মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার ধারে এতটুকু জমী নিষ্ফলরূপে পড়িয়া থাকিলে মিউনিসিপ্যালিটীকেও তজ্জন্য জরিমানা দিতে হইত। এইরূপ ব্যবস্থার ফলেই নাকি যুদ্ধের সময়ে যখন জার্ম্মানী চারিদিক হইতে অবরুদ্ধ হইয়াছিল এবং প্রতিপদে তাহার আহার্য্য দ্রব্য আমদানি হওয়া রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, তখনও জার্ম্মানী অন্তত আহার্য্য দ্রব্যবিষয়ে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল; যুদ্ধের

---

* *Vide* Footnote in page 199 above.
—*Ed. T. P.*

চার-চারটী বৎসর আহার্য্য-দ্রব্যের জন্য জার্ম্মানীকে কাহারও নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইতে হয় নাই, বরঞ্চ জার্ম্মানী দেশবাসীর আহার যোগাইয়া উদ্বৃত্ত হইতে তাহার মিত্রসংঘকেও আহার যোগাইতে পারিয়াছিল। আর আমাদের দেশে কত কত জমী "সুফলার" পরিবর্ত্তে "নিষ্ফলা" থাকিয়া যেন শ্মশানের মৃত্যুহাসি হাসিতেছে। এখন বুঝিতেছি, আমাদের বাল্যকালে কি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া পিতৃদেব আমাদের বাটীর সংলগ্ন ভূমিখণ্ড চাষ-আবাদ করিয়া বাগান করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতেন। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক ভারতবাসী নিজ নিজ অধিকারস্থ জমীর চাষ আবাদের সুবন্দোবস্ত করিয়া আহার্য্যের ব্যবস্থা করিলেই দেশের কল্যাণ হইবে। নতুবা "পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে"।

ভারতে যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ—ঠিক এক বৎসর হইল, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষে ডাঃ সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতার মধ্যে তিনি একটী কথা বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে চাহিলে, বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি আবশ্যক সেই সকল যন্ত্রপাতি বিষয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া তোলা দরকার। এই কথাটী একটা খুবই বড় সত্য বলিয়া আমার প্রাণে লাগিয়াছিল। আমরা কিন্তু দেখি ভারতবাসী যে তিমিরে সেই তিমিরে। এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা শুনি নাই যে, ভারতে কলকারখানা যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য কোন বড় বা ছোট কারখানা খোলা হইয়াছে। আমরা অবশ্য দেখিয়া সুখী হইতেছি যে, "কেমিক্যাল ওয়ার্কস" নাম দিয়া বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক কারখানা ভারতের বিভিন্ন দিকে খোলা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বিদেশীয়গণ সহসা ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি আমদানী বন্ধ করিয়া দেন, তবে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইবে কি প্রকারে? তখন তো বিদেশের নিকটে দয়ার জন্য ভিক্ষাপাত্র লইয়া দাঁড়াইতে হইবে অথবা ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা বন্ধ করিতে হইবে। আমি ব্যবসায়ে মার্কিণদিগের কৃতকার্য্যতার কারণ বিষয়ক একখানি পুস্তকে দেখিয়াছিলাম যে, তাহাতে ব্যবসায়ীগণের নিজ নিজ ব্যবসায়ের মূল ধরাকে কৃতকার্য্যতার কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কথাটা খুবই ঠিক। আমরা যদি ছাপাখানার ব্যবসায়ে নামি, তবে উহার কৃতকার্য্যতার জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, যথা ছাপার কালি, কাগজ প্রভৃতি, আমাদিগের কর্ত্তব্য হইবে ছাপাখানা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা করা এবং যথাসাধ্য মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুতেরও চেষ্টা করা। ব্যবসায়ীদের কৃতকার্য্যতার কারণ ও উপায় সম্বন্ধে আমি ভারতবাসীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম। আশা করি, অদূর-ভবিষ্যতে এই ইঙ্গিত অবলম্বনে তাঁহারা বিবিধ উদ্যমে ভগবানের কৃপায় সফলকাম হইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দিনের পর দিন বঙ্গবাসী শিক্ষিত জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। গত ২৮শে কার্ত্তিকের "হিন্দু" পত্রে 'প্রাচ্য ভূখণ্ডে নারীর সম্মান' প্রবন্ধ এবং ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখের "হিন্দু" পত্রে 'বিদেহ আত্মার সহিত কথোপকথন সম্ভব কি না' ও ২৮শে কার্ত্তিক তারিখের "সময়" পত্রে 'দুর্গা অর্থে দুর্গতি-নাশিনী' প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। সকল বিষয়ে বিশেষত বর্ত্তমান যুগে দুর্নীতি-দমনে সফলতা লাভ করিতে হইলে সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র প্রভৃতির যথাসম্ভব সঙ্ঘবদ্ধভাবে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট—আমরা গত ৫।১১।৩১ তারিখের এড্‌ভান্স কাগজে দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই শিক্ষায়তন হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত এস, কে, দত্ত জার্ম্মাণীতে গিয়া মিউনিক সহরের জলসরবরাহের কারখানায় এবং বার্লিন সহরে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের অধীনে কার্য্য করিয়া সন্তোষ-বিধান করিয়াছেন। এই দুই কারখানার একএক বিভাগে তিনি সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিক্ষায়তন হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিদেশে এরূপ উচ্চ কর্ম্ম পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষ-বিধান করা ভারতবাসীর পক্ষে বোধ হয় এই প্রথম। উক্ত শিক্ষায়তনের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। ভারতবাসীর পক্ষে উচ্চাঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার পথ এদেশে এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। পূর্ব্বে রুড়কী কলেজে ভারতবাসীর পক্ষে এইরূপ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু আজ অনেক বৎসর হইল তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানি। যাদবপুরের শিক্ষায়তনকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন করিতেছি। এই শিক্ষায়তনের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারি।

বেজুড়ার বীর ৺বৈদ্যনাথ মজুমদার।

(শ্রীচারুবালা দেবী গুপ্তজায়া)

[শ্রীচারুবালা গুপ্তজায়া তাঁহার স্বদেশস্থ এক বীরপুরুষের বিবরণ আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে এক প্রসঙ্গে আমরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে এমন অনেক মহাপুরুষ ও মনীষিণী রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইলে সেই সেই গ্রাম ধন্য হইবে এবং বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইবে। আমরা এই উদ্দেশ্যে লেখিকার প্রেরিত প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য গ্রামের এইরূপ ইতিহাস যদি প্রাপ্ত হই, তবে তবে তাহাও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ভং সং]

কাশ্যপগোত্র ক্ষত্রিয়বর্ণ মজুমদারবংশের এক শাখা বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া গ্রামে, দ্বিতীয় শাখা ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃপাতী বনগ্রাম গড়িহাটা ও সেরপুর গ্রামে, এবং তৃতীয় শাখা শ্রীহট্ট জেলান্তঃপাতী বেজুড়া, আজিউড়া, বরগ, ইটাখোলা ও সুরমা গ্রামে অবস্থিত আছে। ময়মনসিংহের শাখার চৌধুরী উপাধি এবং বর্দ্ধমান ও শ্রীহট্টের শাখাদ্বয়ের মজুমদার উপাধি। ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামের স্বনামবিখ্যাত ব্যারিষ্টারপ্রবর পরলোকগত আনন্দমোহন বসু মহাশয় আজিউড়ানিবাসী পেন্‌সনপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট অফিসার ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত মথুরচন্দ্র মজুমদার বি-এ, মহোদয়ের পিতৃষ্বস্রীয়।

উক্ত মজুমদার-বংশ ভারতে মুসলমানশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে সন্তানপরম্পরায় ভূম্যধিকারীস্বরূপে প্রজাপালন ও সংরক্ষণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। জনশ্রুতি এই যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত উল্লিখিত মজুমদারবংশের আদি পুরুষ। বহু অনুসন্ধান করিয়াও আজ পর্য্যন্ত উক্ত জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

৺বৈদ্যনাথ মজুমদার মহাশয় মুসলমানরাজত্বের অবসান ও ইংরাজরাজত্বের উদয়ের সন্ধিক্ষণে বেজুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ ও অমরকোষ অভিধান কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, এবং একাদশ বৎসর হইতে পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াই লাঠিখেলা শিক্ষা করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং অল্পায় সময়ের মধ্যেই তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তাঁহার শরীরে সমধিক বল ছিল। পাঁচ জন লোক যে প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিতে পারিত না, তিনি অবলীলাক্রমে সেই প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন।

রঘুনন্দন পর্ব্বত হইতে বন্যহস্তী মধ্যে মধ্যে বেজুড়াতে আসিয়া উপদ্রব করিত। বৈদ্যনাথ এক দিবস একটি বন্য হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন, এবং এই সুযোগে গ্রামের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গিয়া উহাকে বধ করিল। তিনি এক দিবস দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পশ্চাতে অনতিদূরে একটি বন্য মহিষ শৃঙ্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। তিনি লম্ফ দিয়া গিয়া উক্ত মহিষের শৃঙ্গদ্বয় দুই হস্ত দ্বারা ধারণ করিলেন, এবং মহিষের নাসিকাতে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, তাঁহার পদাঘাতে মহিষের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

থাঁটুয়া গ্রামনিবাসী মুরালী নামক এক যবনদস্যু ছিল। সে দিনেই দস্যুতা করিত। সে সদলবলে রাজপথে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর পথিককে মারিয়া ধরিয়া বধ করিয়া সমস্ত লুণ্ঠন করিত। তাহার দৌরাত্ম্যে এতদঞ্চলের লোকেরা রঘুনন্দন পর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্তে ও স্বাধীন পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় চলিয়া যাইতে লাগিল। এতদঞ্চল প্রায় উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া উক্ত বীরকেশরী বৈদ্যনাথ যবনদস্যু মুরালীর বংশ ধ্বংস করতঃ দেশে শান্তি সংস্থাপন করিলেন। তদবধি এই অঞ্চলে আর দস্যুতা হয় না। এতদঞ্চলের লোকেরা পরম শান্তির সহিত জীবনযাপন করিতেছে। এতদঞ্চলের মুসলমানেরা তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত সন্তানপরম্পরায় মজুমদারবংশের অনুগত হইয়া আছে।

উক্ত বীরকেশরী মজুমদার তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামে প্রজাদিগের পানীয়জলের জন্য একএকটি পুষ্করিণী ও প্রত্যেক গোচর মাঠে গবাদি পশুর পেয়জলের নিমিত্ত একএকটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। এই সমস্ত পুষ্করিণী 'মজুমদারের তালাও' নামে অদ্যাপি তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার জমিদারীর পশ্চিমসীমা সরাইল পরগণা, পূর্ব্বসীমা তরপ পরগণা, উত্তরসীমা উজাইল পরগণা এবং দক্ষিণসীমা স্বাধীন পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা জেলা। তাঁহার এই বিপুল ভূসম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

বীরকেশরী বৈদ্যনাথ কেবল যে শারীরিক বলে বলীয়ান ছিলেন, এমন নহে, তাঁহার অসাধারণ মানসিক বলও ছিল। তিনি একজন উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত

ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রায় তিন ঘণ্টা কাল স্বকীয় দ্বারপণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। তিনি প্রজাপালনতৎপর ছিলেন। দুর্জ্জনের শাসন ও সজ্জনের সংরক্ষণ তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কার্য্যে নিয়মিত রাহতেন। তিনি দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি সত্যভাষী ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন।

উক্ত মজুমদার মহাশয় পাটুলী ও বুল্লা নামক দুইখানি গ্রাম তাঁহার কুলপুরোহিতকে দান করিয়াছিলেন। এই পুরোহিতবংশ অদ্যাপি মজুমদারবংশের পৌরোহিত্যের জন্য উক্ত গ্রাম দুইখানা ভোগদখল করিতেছেন। তিনি দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ বহু ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি এতদঞ্চলের হিন্দুমুসলমান উভয় সমাজের সমুদয় ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বহু ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেজুড়াতে পাঁচটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নানাদেশীয় ছাত্রেরা সেখানে আসিয়া সাহিত্যব্যাকরণ, কাব্যঅলঙ্কার, স্মৃতিশ্রুতি, দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিতেন। তিনি অধ্যাপকদিগকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন। সংস্কৃত আলোচনার জন্য এতদঞ্চলের লোকেরা বেজুড়াকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া সম্মান করিত।

বীরকেশরী প্রিয়দর্শন ও উদারচরিত্র ছিলেন। তাঁহার শরীর সুস্থ, সবল ও নীরোগ ছিল। তিনি ব্রহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রত্যহ বহুদূর ভ্রমণ করিয়া মুক্তবায়ু সেবন করিতেন। তিনি দেড়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একদিনও রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পান নাই।

বৈদ্যনাথ দরিদ্রনারায়ণকে মুক্তহস্তে দান করিতেন, তিনি প্রত্যহ অতিথি-সেবা করাইয়া নিজে আহার করিতেন, তিনি প্রতি বৎসর শীতকালে দরিদ্র নরনারীকে শীতবস্ত্র প্রদান করিতেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ, তেজস্বী ও কর্ম্মযোগী ছিলেন। তিনি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামে ধান্যভাণ্ডার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রজাবৃন্দের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ঐ সমস্ত ভাণ্ডার হইতে ধান্য প্রদান করিতেন।

বৈদ্যনাথ সর্ব্ববিষয়ে সাম্যবাদী ছিলেন। তাঁহার কোন বিষয়ে বৈষম্য ছিল না। তিনি বলিতেন, "পরমেশ্বর আমার আদর্শ; তিনি যখন সমদর্শী, তখন আমিও সমদর্শী। তিনি সর্ব্বপদার্থে সমভাবে অবস্থিত আছেন, সুতরাং সমস্ত পদার্থ সমান। সর্ব্ব পদার্থকে সমানভাবে প্রীতি করাই আমার ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য। এক পদার্থের প্রতি প্রীতি এবং অন্য পদার্থের প্রতি অপ্রীতি করিলে একই পরমেশ্বরের এক অংশের প্রতি প্রীতি এবং অন্য অংশের প্রতি অপ্রীতি করা হয়। ইহা মহাপাপ। সর্ব্ব পদার্থকে সমভাবে প্রীতি করাই পুণ্যকর্ম্ম। ফলতঃ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতের প্রতি প্রীতিভক্তি করিয়া হিতসাধন করাই ধর্ম্ম, ইহা দ্বারাই পরমেশ্বরের আরাধনা হয়।"

চিঠিপত্র।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। সে সমস্ত পত্র তাঁহার কন্যা লীলাবতী মিত্র মহাশয়ার নিকট ছিল। ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার অনেকগুলি পাঠ করিবার জন্য লইয়া গিয়া মহর্ষির আত্মচরিতের শেষাংশে প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক খানা চিঠি লীলাবতী মিত্র মহাশয়ার বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তাহার একখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

* * *

বাঁকিপুর, ৭ই পৌষ, ৫৪ শক।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার,

সারদা আমার ঘরের ছেলের মত ছিলেন। তাঁহার সকলের প্রতিই অমায়িক ব্যবহার ছিল। তিনি সকলকেই উপযুক্ত মত সম্মান ও সমাদর করিতেন, বিশেষতঃ আমার সকল কার্য্যেই তাঁহার তৎপরতা, উদ্যোগ ও উদ্যম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম। তিনি উন্মুখ হইয়া থাকিতেন, তাঁহাকে আমি কোন্ কার্য্যে কখন্ প্রেরণা করি, এবং তাঁহাকে আমার কোন অভীষ্ট কার্য্য করিতে বলিলে তিনি নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাহা সম্পন্ন করিতে ধাবিত হইতেন। আমার মনে হয় না যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—পরলোকে আমার জন্য কোন স্থান সজ্জীভূত করিতে যেন তিনি অগ্রসর হইয়াছেন।

২৪ অগ্রহায়ণে ৮টা রাত্রিতে রবির বিবাহ হয় এবং সেই ২৪ অগ্রহায়ণে ৮॥• রাত্রির সময়ে সিলাইদহের কুঠীতে সারদার মৃত্যু হয়। সংসারে হর্ষ-শোক সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্মবাদিরা এই সংসারের হর্ষ-শোক উভয়কেই পরিত্যাগ করেন। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি।"

তোমার একটি গভীর উক্তি আমার মনকে অমৃতাভিষিক্ত করিয়াছে—The impious of my own religion are not my friends but the pious of all relegions are.

তোমাকে আর একটি শুভ সংবাদ দিতেছি যে, এই শরীরের সঙ্গে আমার আত্মার সম্বন্ধ দিন দিন ক্ষীণ ও অবসন্ন হইতেছে। কি আনন্দ! রোগের আয়তন জরা-শোকে আকীর্ণ এই শরীর আমাকে আর ক্লেশ দিতে পারিবে না। Bodily wants and necessities are so various and engross so much of our attention that they often prove a clog to the soul in the path of spiritual advancement—কি ঠিক কথা, এ কি ঠিক কথা! তোমার এ অমূল্য কথা এ সময়ে আমার বড়ই আদরণীয়।

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণঃ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

পুনশ্চ—বয়সি সাহেব আবার টাকা টাকা করিতে-

ছেন, এবার আদিসমাজ হইতে তাঁহাকে কি দেওয়া যাইবে তাহার উপদেশ আমাকে দিবে। ইহার উত্তর বোলপুরের শান্তিনিকেতন ঠিকানাতে দিবে।

সঞ্জীবনী, ৩রা বৈশাখ ১৩৩৮।

বঙ্গভাষা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "শরৎচন্দ্র" শীর্ষক নিবন্ধে প্রথম দিকে এই মর্ম্মে লেখা আছে যে, আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম আবির্ভাব বঙ্গদর্শনে। এর পূর্ব্বে বাঙালীর আপন মনের ভাষা সাহিত্যে স্থান পায় নাই। আমার মনে হয় কথাটি ঐতিহাসিক বিচারসহ নহে। বঙ্গদর্শনের বহুপূর্ব্বেই যে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আধুনিক বাঙ্গলা ভাষার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা যে-কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক পুরাতন সংখ্যাগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথও একসময়ে এই তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন।

আধুনিক ভাষা বলিতে রবীন্দ্রনাথ যদি কথিত ভাষা বুঝিয়া থাকেন তবে তাহাও 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং ঐ সকল গ্রন্থের যে বঙ্গসাহিত্যে রীতিমত স্থান আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীকল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

সংবাদ।

শ্রীললিতমোহন দাস।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয় আজ কয়েক মাস যাবত কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া আছেন। কিছুকাল হইল তিনি রাজবন্দী হইয়া কয়েক মাস কারাবাস ভোগ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে মুক্তিলাভের পর অবধি তাঁহার রোগের সূত্রপাত হইয়াছে। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি ভগবান তাঁহাকে শীঘ্র নিরাময় করুন এবং তাঁহাকে সুস্থ ও সবল করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় দীর্ঘকাল নিযুক্ত রাখুন।

শোকসংবাদ।

৺কুমারকৃষ্ণ দত্ত।—গত ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার দ্বিপ্রহরে হাটখোলার দত্ত-পরিবারের প্রসিদ্ধনামা কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় তাঁহার গোয়াবাগানের বাসভবনে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। ইনি যৌবনে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা এটর্নি ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে ইনি আইন ব্যবসায় ত্যাগপূর্ব্বক প্রাচ্য সভ্যতা ও শিক্ষার ভক্ত হইয়া দেশহিতকর আন্দোলনে যোগদান করেন। ইনি শিক্ষা ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সভাসমিতি ও গ্রন্থপ্রকাশ দ্বারা বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শেষজীবনে [illegible] সহিত অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত হইয়া তিনি সহিত্যের মধ্য দিয়া দেশসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইঁহার শোক সন্তপ্ত পুত্রকন্যাদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

মহাত্মা টমাস এডিসন।—আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহাত্মা টমাস্ এডিসন সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। সংবাদপত্রের বিক্রেতারূপে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। ২২ বৎসর বয়স হইতে তিনি কয়েক বৎসর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নানাস্থানে টেলিগ্রাম বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। ভগবানের বিধানে সেই কার্য্য হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান সংগ্রথিত হইয়াছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও স্বীয় প্রতিভাবলে তড়িৎসংক্রান্ত বিষয়ে এতই উন্নতি করিয়াছিলেন যে, বলিতে গেলে, ঐ বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম আসন লাভ করিয়াছিলেন। তড়িৎসংক্রান্ত কোন কথা তিনি বলিলে তাহা উপেক্ষা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তিনি গ্রামোফোনের সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কারের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনকালে তিনি সহস্রাধিক বিজ্ঞানভিত্তি নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি অতি সংযতভাবে জীবন পরিচালিত করিবার ফলে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। আমরা দেশবাসীকে এইরূপ মহাপুরুষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে বলি।

আদিব্রাহ্মসমাজ

১৮৫২ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

আয় ও ব্যয়।

১৮৫২ শক। ১৩৩৭ সাল।

আয়	৫৮৫১/৬
পূর্ব্বস্থিত	১৩৬৮৶/১
সমষ্টি	৪০২০৲১
ব্যয়	৩৮০৬/০
স্থিত	২১৩৸৶৯

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	২৪০০৲
উৎসবের দান	২৲
হেণ্ডেরসন্ ...	১০০৲
এককালীন দান	৺৲
আনুষ্ঠানিক দান	৪৲
... আদায়	৫৩১৶৯
গচ্ছিত টাকার সুদ	১৩৶৯
সমষ্টি	৩৭৫৫॥/৬

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৯০।৶০
হাল	১০৫৲
বিজ্ঞাপন	২১৮৲
মাশুল	১৩।৶০
নগদ	২৲
অগ্রিম	২॥৵০
সমষ্টি	৪৩১॥০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৪৬॥৶৬
মাশুল	২৸৬
কমিশন	১৵৩
গচ্ছিত	৬৸০
সমষ্টি	৫৭।৵৩

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	২৫৪৵৩
কাগজের মূল্য	৪৪।৶৬
দপ্তরী	৭৲
সমষ্টি	৩০৫॥৴৯
সর্ব্বমোট	৩৮৫১৴৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের পাথেয়	১২০৲
গায়ক	৫৬৮৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬৫৲
হিঃ রক্ষক	১৩০৲
বেহারা	১৪৪৲
মেথর	২৭৲
প্যাখাকুলি	৬।৵০
মাশুল	২২॥৶৩
Electric	৭৪॥৴০
আলো মেরামত	২৸০
কেরোসিন	৭৸৴০
বারবরদারী	৫৩৸৵৬
Tax	১৮৪৴০
বিবিধ	৫২৸৵৯
চৈত্র-সংক্রান্তি	৬।৵৯
মরম্মতী	১৬॥৴০
পূর্ব্বকার্য্য	১৪১৸৴৬
মেডিকেল মিশন	৯৶৯
পার্ব্বণী	২।০
পাখা মেরামত	১৫৲
মাঘোৎসব	৪৮।৴০
সেভিংস ব্যাঙ্ক	২৲
সমষ্টি	১৪৯৮॥৶৬

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজের মূল্য	২৩০।৶৯
দপ্তরী	৫৫৵০
প্রবন্ধ	২৭॥৶৬
মাশুল	৬৪।৯
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬৫৲
হিঃ রক্ষক	১৩০৲
মূল্য আদায়ের কমিশন	১৯।০
বিজ্ঞাপনের কমিশন	১২৲
বিজ্ঞাপন	১৲
বিবিধ	৫৸৵০
সমষ্টি	৬০৫৸০

পুস্তকালয়।

কমিশন	৪৸৵৩
মাশুল	৪৶০
পুস্তক ক্রয়	৮৸৵৬
বিবিধ	॥৶০
সমষ্টি	১৮॥৵৯

যন্ত্রালয়।

কম্পোজিটর	৬৭৬৵০
প্রেসম্যান	২৩১॥০
ইঙ্কম্যান	৮৮৸৶৬
কাগজ তোলা	৭৯॥৵৩
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬৫৲
হিঃ রক্ষক	১৩০৲
প্রুফ কাগজ	৫৸৯
ছাপার কাগজ	১৭০৶৯
কালি	১২।৵০
তৈল	৬।০
তামাক	৪৸৬
সাজিমাটি	৩৲
রুলঢালা	২৵০
মাশুল	৶৬
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১৬৵৯
লেই জন্য ময়দা	১॥৴০
দপ্তরী	৭০॥৶০
বিবিধ	৯৸৵৬
জলপানী	২৵০
শিরিষ	২৴৬
ব্রাশ	৸৶০
দড়ি	৸০
রুল ঢালা	২।৵০
অক্ষর ক্রয়	২৪৫৯
সমষ্টি	১৬৮৭৸৵৯
সর্ব্বমোট	৩৮০৬৴০

	আয়	ব্যয়		
ব্রাহ্মসমাজ	৩০৫৬॥৴৬	১৪৯৮॥৶৬	+	১৫৫৭৸৵০
তত্ত্ববোধিনী	৪৩১॥০	৬০৫৸০	−	১৬৯।০
পুস্তকালয়	৫৭।৵৩	১৮॥৵৯	+	৩৮॥৶৬
যন্ত্রালয়	৩০৫॥৴৯	১৬৮৭৸৵৯	−	১৩৮২।৴০
[illegible]		৩৮০৬৴০ =	+ [illegible] − [illegible] =	+ [illegible]

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৬০ | ১৮৫৩ শক অগ্রহায়ণ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৭৬৫ শক ১৭ই ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা
১০৬০

১৮৫৩ শক
অগ্রহায়ণ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৬। অন্তর।

মা! তোমার কোলে আমি বড় আরামেই শুইয়াছিলাম, সুখে নিদ্রা দিতেছিলাম। আমাকে তুমি জাগাইয়া তুলিলে কেন? আমার অমন সুখের নিদ্রা তুমি ভাঙ্গাইলে কেন? অত ভোরে আমার জীবন ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া, আমাকে তোমার কোল হইতে নামাইয়া কোথায় যে লুকাইয়া পড়িলে, তাহার কোনই ঠিকানা নাই। আমার অন্তরের ক্ষুৎপিপাসা কে বিদূরিত করিবে? ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় আমি এদিকে ওদিকে চারিদিকেই তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, কোথাও তোমাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। তুমি যখন নিকটে আস, তখন তোমার মুখের জ্যোতিতে আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। আবার তুমি যখন দূরে চলিয়া যাও, তখন মসীবর্ণ ঘন অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। তোমার স্নেহপ্রেমে পরিপুষ্ট হইয়া যখন সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন কতবার যে নিরর্থক ও নিষ্ফল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দিবসের শেষে ব্যর্থকাম হইয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে তোমার চরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বলা যায় না। তুমিও ততবারই স্নেহহস্তে অশ্রু মুছাইয়া আমাকে সজীব করিয়া সংসারে ফিরাইয়া পাঠাইয়াছ। জন্ম অবধি মা! তোমাকেই আমি জানি—তুমি নিকটেই থাক আর দূরেই থাক, আমি ঠিক জানি, তোমার অনিমেষ দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমার দিকে নিপতিত আছে; তাই কিছুতেই আমি ভয় পাই না—অন্ধকারই আমাকে ঘিরিয়া থাক বা উজ্জ্বল আলোকে আমার পথ আলোকিত হউক, জীবনের জ্যোতিতেই আমার প্রাণ উচ্ছ্বসিত হউক বা মরণের যাতনায় প্রাণ ব্যথিতই হউক।

১৭। অশ্রু।

মা! আমার ক্রন্দনের তো শেষ নাই। এত অশ্রুই বা কোথা হইতে পাইয়াছিলাম, তাহা জানি না। দিন নাই, রাত নাই, চোখের জল ঝরিতেছে তো ঝরিতেছেই। চোখের জলে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গেল, সমস্ত ঘর-দুয়ার ভাসিয়া গেল, তবুও থামিবার নাম নাই। কখনো বা মনে হয়, নির্ঝরিণীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার কাছে গিয়া তোমার চরণে আমার সমস্ত অশ্রুধারা নিবেদন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই, আর তোমার

নিকটে আমার সমস্ত দুঃখকষ্টের সকল জ্বালা-যন্ত্রণার শান্তি ভিক্ষা করিয়া আনি। কখনো বা মনে বড়ই ক্ষোভ অভিমান আসে যে, তুমি আমাকে এই দুঃখের অবস্থায় ফেলিলে কেন? তখন আমি তোমার সন্তান বলিয়া নিজেকে বুঝিতে পারি; তাই তখন মনে হয়, সাগর-তরঙ্গের মত রোষে অভিমানে গর্জ্জন করিতে করিতে তোমার কাছে গিয়া মুখ ফুলাইয়া কাঁদিতে থাকিব, দেখিব, মা সন্তানের দুঃখকষ্ট দূর করেন কি না, জ্বালাযন্ত্রণা নির্ব্বাণ করেন কি না। মা—মা! আমার মনের এই উদ্ধত ভাব দূর করিয়া দাও। এই রকম ভাবের ভারে আমি দাঁড়াইতে পারি না—কি এক অজানা ভয়ের সঙ্গে তোমার প্রতি গভীর ভালবাসার দ্বন্দ্ববিবাদে প্রাণটা আনচান করিয়া উঠে। সংসারে কলহবিবাদ অনেক করিয়াছি। আর না। এখন প্রাণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, তোমার কোলে আশ্রয় লইয়া তোমারই স্নেহের কোমল হস্তে আমার অশ্রু মুছাইয়া লই। তাহা হইলেই আমার প্রাণে অবিরাম শান্তি বিরাজমান থাকিবে। তখন তোমার চরণধূলিই আমার খেলার নিত্যসঙ্গী হইবে—আমি বাঁচিয়া যাইব। তখন তোমার নয়নের এক এক ইঙ্গিতে আমার প্রাণে আনন্দের শত শত তরঙ্গ উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। তখন তুমি আমাকে তোমার আকাশের কেশদামে আচ্ছাদিত করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইবে, আর চুম্বনের অগাধ সাগরে আমাকে ডুবাইয়া দিবে।

৯৮। নীরব ভাষা।

মা! সংসারে তো দেখি, যাহারা বড়ই চীৎকার-ধ্বনিতে তাহাদের আশাভরসার কথা তোমাকে জানায়, তাহাদের আশাভরসা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি আগে ছুটিয়া যাও। কিন্তু আমি নীরব অশ্রুপূর্ণ ভাষায় আমার প্রাণের দুঃখবেদনা দিবারাত্রি জানাইতেছি, তাহা নিবারণ করিবার জন্য তো তুমি অগ্রসর হও না? আমি যে নীরব ভাষায় তোমার চরণে আমার আশা-ভরসা দিবানিশি জানাইতেছি, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য তো তোমার কোনই আগ্রহ দেখি না? তুমিও তো নীরব ভাষাতেই আমার সঙ্গে কথা কও। আমি তোমার সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া সংসারের সরব ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি; তোমারই নীরব ভাষায় তোমার সঙ্গে কথা কহি। এই ভাষাতেই তো আমি আকাশের সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে কথা কহিয়া সাড়া পাই; তুমিই বা তবে সাড়া দিবে না কেন? আমাকে কেন পথের এক ধারে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলে? সে আজ অনেক দিনের কথা। এই দীর্ঘকালে আমি পথের পর পথ—কত যে পথ তোমারই সন্ধানে ঘুরিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আমি ভবঘুরে হইয়া পড়িয়াছিলাম; তখন জনপ্রাণী আমার সঙ্গী ছিল না। এখন ভবঘোরা হইতে এই কুটীরে আসিয়া দেখি, তুমিই আমার নিত্যসঙ্গী ছিলে, আর এই কুটীর-দুয়ারেও আমাকে চরণে আশ্রয় দিতেছ। বড়ই আশ্চর্য্য দেখি যে, যেথাকার যত পথ, সকল পথই আমার এই কুঁড়ে ঘরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এত দূরদূরান্তর ঘুরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমার সমস্ত কাজকর্ম্ম, আমার সমস্ত আশাভরসা যেন শেষে তোমার চরণের নিকটে এই কুটীরেই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। আমার অশ্রু এখন যেন বিগলিত আনন্দের আকারে অন্তরে দেখা দিতেছে। তোমাকে নিকটে পাইয়া আমার হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠি-তেছে; চারিদিকে সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়া আমাকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেছে। তুমি সর্ব্বদাই নিকটে থাক, আর আমায় চরণতলে বসিতে দিও—ইহাই আমার একমাত্র আশা, ইহাই আমার অনন্ত পথের ভরসা ও সম্বল।

৯৯। মেঘের মাঝে আলো।

মা! চারিদিকে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিতেছে। আমার মন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। জানি, তুমি ঐ মেঘের বাহনে চড়িয়া কোন্ অতর্কিতে আমার এই ভাঙ্গাচোরা কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার দেখা পাইব আশা করিয়া কত দূরদূরান্তরে ঘুরি-লাম, কত বড় বড় প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু কোথাও তো তোমার দেখা পাইলাম না। যেখানে গেলাম, মনে হইল, ঠিক তাহার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেই তুমি সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছ, পাছে

আমি তোমার দেখা পাই। শেষে যখন আমি নিজেকে সকল হইতে সরাইয়া আনিয়া এই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়া বসিলাম, তখনই তুমি আমায় ধরা দিতে আসিলে। এখানেও দেখি, চারিদিকে মেঘ যত ঘনাইয়া আসে, তুমিও তত আমাকে তোমার বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া আমাকে অভয় দিতে থাক। তখন মনে হয়, মেঘও চিরকাল আমার চারিদিকে ঘনাইয়া আসুক, আর তোমারই কোলে আমি শুইয়া তোমাকে জাপটাইয়া ধরি—আমার ভয়ভাবনা সমস্তই বিদূরিত হউক। মেঘ বড়ই গর্জ্জন করিতেছে—করুক—আমি তোমার কোলে নির্ভয়ে শুইয়া আছি। আমার জীবনের কাজকর্ম্মও আর কিছুই বাকী নাই। যত কিছু কাজকর্ম্ম হাতে লইয়াছিলাম, সমস্তই তো তোমাকে পাইবার প্রত্যাশায়। তাহাই যখন পাইয়াছি, তখন তো আমার কাজ কিছুই বাকী নাই—কাজকর্ম্মের পরপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। একটী সরু সুতামাত্র আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—তোমার যেদিন ইচ্ছা হইবে সেই সূত্রটুকুও কাটিয়া দিও—তখন একেবারে তোমাতে আর আমাতে। আমাদের উভয়ের মিলনপথে, উভয়ের মধ্যে গভীর শান্তির পথে কেহই আসিয়া দাঁড়াইবে না। জননী! তুমিই আমার কাছে থেকো আর আমাকে কাছে রেখো—এখন আমার জীবনতরী তোমার যেথা ইচ্ছা সেথা ভাসিয়া যাক।

১০০। জননী ও সন্তান।

মা! আমি তোমার সন্তান। তুমিই আমার জননী। এই সম্বন্ধটুকু জানাই হইল আমার অনন্ত জীবনের পথের সম্বল। তুমিই মা আমার নয়ন-তারা। পাছে আমার নিমেষ পড়ে, আর তাহারই মধ্যে তুমি অদৃশ্য হইয়া যাও, সেই ভয়ে আমি দিবানিশি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তোমারই নয়নের দিকে চাহিয়া আছি। আমার দিনেও ঘুম নাই, রাতেও ঘুম নাই। আমার মনপ্রাণ তোমার ঐ চরণের উপরেই পড়িয়া আছে। তোমার চরণ-ধ্বনি আমার বক্ষে নিত্যই বাজে, আমি তাহারই তালে তালে নৃত্য করিতে থাকি। আমাকে তুমি এই পৃথিবীতে যে কাজের ভার দিয়া পাঠাইয়াছিলে, এখানকার জীবন তো শেষ হইয়া আসিল, দীর্ঘ অবকাশ লইবার তো সময় আসিয়া পড়িল, কিন্তু তোমার কাজ যে সুচারুরূপে করিতে পারিয়াছি, তাহা কিছুতেই বলিতে পারি না। অনুতাপে প্রাণমন জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে মনে হয়, একখণ্ড পাষাণ লইয়া বক্ষস্থল ভাঙ্গিয়া ফেলি, তোমার চরণে মাথা কুটিয়া বিচূর্ণিত করি। তোমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাজ করিয়াছি, চিন্তা করিয়াছি, সে সমস্ত যখন ভাবি, তখন আপাদমস্তক অনুতাপের আগুনে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে। তোমার বিরুদ্ধে গিয়া অবধিই আমার জীবনের সুখশান্তি সমস্তই হারাইয়া বসিয়াছি। এবার যেখানে আমাকে লইয়া যাইবে, দেখো সেখানে যেন আমাকে স্বাধীনতা দিবার অছিলায় তোমার বিরুদ্ধে যাইবার অবসর দিয়ো না। আমায় তোমার কোলেই নিত্য আশ্রয় দিয়া রাখো, এইটুকু ভিক্ষা চাই।

প্রার্থনা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের উপাসনার একটী ভিত্তি হইতেছে প্রার্থনা। উপাসনার মূল মন্ত্র হইল, ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। এই প্রীতিসাধনের অন্যতর অঙ্গ হইল প্রার্থনা। প্রার্থনা দ্বারা আমরা ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হই, তাঁহাকে পিতামাতা ও সখাসুহৃৎ বলিয়া শুধু জানা নহে, কিন্তু উপলব্ধি করিতে পারি। কতকগুলি অক্ষরমূলক মন্ত্র বা শ্লোকাদির বারম্বার আবৃত্তি করার নাম প্রকৃত প্রার্থনা নহে।

সাধারণতঃ আমরা দুঃখবিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, অথবা আমাদের সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, আমরা করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে বড়ই কাতরকণ্ঠে ডাকি বটে এবং ভাবি যে, আমাদের কাতর ক্রন্দনেরই বলে ভগবান আমাদের প্রার্থনা সফল করিবেন। এরূপ প্রার্থনাও যে, একেবারে নিষ্ফল তাহা আমরা বলি না। ইহারও ফলে স্বল্পমাত্রাতে ভগবানের সহিত উপাসক যোগযুক্ত হন। এইভাবে যিনি ডাকেন, তিনি আসলে দেখিতে পান না, বুঝিতে

পারেন না যে, ভগবান মঙ্গলময়—আমাদের যাহাতে মঙ্গল, তাহাই তিনি বিধান করিবেন।

তাঁহাকে মঙ্গলময় জানিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে যোগযুক্ত করিয়া তাঁহাকে আত্মস্থ করিবার জন্য যে কাতর প্রার্থনা, তাহাই উপাসনার একটী মুখ্য অঙ্গ। প্রার্থনা যদি সফল করিতে চাও, তবে ভগবানের উপর দৃঢ় আস্থা রাখ, তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হও। কেবল তাঁহার উপর নির্ভরশীল হইলেই চলিবে না, প্রার্থনাকে সফল করিতে চাহিলে আমাদিগকে সত্যপথের পথিক হইতে হইবে, কারণ ভগবান যে সত্যস্বরূপ। সত্য কথা বলিতে কি, সত্যপথের পথিক হওয়া আর ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া, আমার মনে হয়, এই উভয় পরস্পরের সহিত বড়ই ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ, একটাকে ছাড়িয়া আর একটী থাকিতে পারে না। সত্যপথের পথিক হইলে আমি কখনই মন্দকর্ম্মের দিকে দৌড়িতে পারিব না—আমাকে শুভকর্ম্মে, আমার নিজের ও জগতের মঙ্গলজনক কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিতে হইবে। তখন আমি যে কর্ম্ম হাতে লইব, সেই কর্ম্মই যে জয়যুক্ত হইবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় থাকিবে না। এই সংশয়ের অভাবেই তো মানুষ কৃতকার্য্যতার বারো আনা পথ উত্তীর্ণ হইতে পারে।

এই প্রকার নিজের সত্যের উপর এবং নিজের শুভ ও কল্যাণপ্রদ ভাবের উপর অবিচলিত আস্থার এক আশ্চর্য্য চালনীশক্তি আছে; এই আস্থা অন্তরে এমন এক জোয়ার আনিয়া দেয়, যাহার বলে আমাদিগকে উন্নতির পথে, বিজয়ের পথে, ভগবানের সহিত যোগের পথে ঠেলিয়া লইয়া যায়—সেই পথে কাহারও অর্গলস্বরূপে দাঁড়াইয়া গতি রুদ্ধ করা সহজসাধ্য হয় না।

যে মানুষ প্রার্থনা করিতে জানে, তাহাকে অলস নিষ্কর্ম্মা বলিয়া জানিও না। আজকাল বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে যে, যে রশ্মি আমাদের চর্ম্মচক্ষের বাহিরে অদৃশ্য আকারে বর্ত্তমান থাকে, সেই রশ্মিরই কার্য্যকারিতা সমধিক প্রবল। সেইরূপ যে মানুষ প্রকৃত প্রার্থনাশীল, তাঁহার সেই প্রার্থনার ভিতর যে নীরব কর্ম্ম কার্য্য করে, তাহার নিকটে আমাদের হট্টগোলবিশিষ্ট শত সহস্র কর্ম্ম পরাজয় মানিতে বাধ্য হয়। এইজন্য প্রকৃত প্রার্থনাশীল মানবের এক এক ইঙ্গিতে শত সহস্র লোক সহজেই পরিচালিত হয়। এইজন্যই চলিত কথায় বলে—প্রার্থনাশীল মানবের আদেশে পর্ব্বতও বিচলিত হয়। প্রার্থনা দ্বারা মানুষ বিশুদ্ধ হইয়া উঠে, কারণ উহারই সাহায্যে মানুষ "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এর পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করে। সেই পবিত্র সংস্পর্শের ফলে আমাদের পাপতাপ মলিনতা যাহা কিছু, সকলই ক্ষণেকের মধ্যে দগ্ধ হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশে যে আদিম সভ্যতার উপযুক্ত জড়প্রবণভাব বড়ই প্রবল, ইহা পথে চলিতে চলিতে যে কোন পথিক বুঝিতে পারে। আর প্রাচ্য জগতে জড়প্রবণ শতবিধ ভাবের মধ্য দিয়াও অধ্যাত্মপ্রবণতা যে অন্তর্নিগূঢ় আকারে প্রবলভাবে বহমান, তাহা বলিতে গেলে একপ্রকার অবিসংবাদীরূপে সর্ব্বসম্মত। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণত প্রার্থনা প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়সকল এই কারণে আধাআধি গৃহীত হয়, প্রাচ্যবাসীরা সেগুলি পুরাপুরি ভাবে গ্রহণ করে। পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রচলিত "প্রার্থনা কর কিন্তু বারুদ শুষ্ক রেখো"—"Pray but keep the powder dry" এই বাক্যটী আমাদের উক্তি বহুল পরিমাণে সমর্থন করে। এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে প্রার্থনার উপর পাশ্চাত্য জনসাধারণের আধাআধি কেন, আসলে কিছুমাত্র আস্থা নাই। আর আমাদের দেশে বিশ্বামিত্র যে মহাবাণী জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন যে, "ধিক্ বলং ক্ষাত্র বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং" পশুবল কিছুই নহে, ব্রহ্মতেজে পূর্ণ যে বল তাহাই প্রকৃত বল—এই মহাবাণীই আজ সহস্র সহস্র যুগ ধরিয়া ভারতবাসীরা অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। এদেশে ভগবানই একমাত্র দুর্ব্বলের বল বলিয়া গৃহীত হন। প্রাচ্যবাসীর মর্ম্মকথা এই যে, প্রার্থনা কর, বারুদের ভাগ্যে যাহাই হোক।

পাশ্চাত্যবাসীদের সঙ্গে প্রাচ্যবাসীরা এই কারণে সমস্ত হৃদয়ের সহিত মিলিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যবাসী ও প্রাচ্যবাসী উভয়ের পরস্পরের সহিত ব্যবহারের যে প্রকার আদানপ্রদান চলিতেছে, তাহাতে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত মিলন সুদূরপরাহত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মিলনের যতই চেষ্টা হোক, উভয়ের মধ্যে ঐ ঈসপের কথিত কাংস্যপাত্র ও মৃন্ময়পাত্রের তথাকথিত মিলনের ভাব সর্ব্বদা জাগরূক থাকিলে মুখস্থ মিলনে কাহারও মনে কিছুতেই প্রকৃত মিলনের ভাব আসিতে পারে না। মিলনের পরিবর্ত্তে মারাত্মক সংশয় সর্ব্বদা জাগিতে থাকে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশের অধিবাসীগণ যেদিন প্রাণ খুলিয়া মিলনের জন্য ব্যাকুল হইবে, প্রকৃত মিলনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, সেইদিন যে স্বর্গরাজ্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইবে এবং সেদিন যে জগতের সর্ব্বত্র প্রকৃত এক আশ্চর্য্য শান্তিবাণী বিঘোষিত হইবে, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেমন ভীমকে কপটাচারভক্তি সর্ব্বনাশকর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে গিয়া ভীষণ প্রতিঘাত পাইয়াছিলেন, সেইরূপ যে কোন জাতি অপর জাতিকে স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে মিথ্যাভিত্তি অপ্রকৃত মিলনে আবদ্ধ করিতে যাইলে ভগবানের মঙ্গলবিধানে সেই জাতিই বিনাশসাধক প্রতিঘাত পাইতে বাধ্য হইবে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ সত্যরূপে ধরা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্যদিগের প্রার্থনায় এই প্রকার আধাআধি ভাবের দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। আজ কিছুকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, নিউইয়র্ক সহরের কোন এক সুপ্রসিদ্ধ গির্জ্জায় উপাসকের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছিল বলিয়া উপাসনার পরে নৃত্য দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—লক্ষ্য এই যে, পশুবৃত্তি উদ্দীপনের আনন্দে যদি গির্জ্জাটা "উপাসকমণ্ডলী" (?) দ্বারা পূর্ণ হয়! এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখি যে, বিলাতের কোন বড় গির্জ্জাপতি তাঁহার গির্জ্জা "উপাসকমণ্ডলী" (?) দ্বারা পূর্ণ করিবার বেশ একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন—বায়োস্কোপের টিকিট কিনিয়া বিতরণ! এদেশেও ঐ প্রকার ঢংয়ের বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, অন্ততঃ বঙ্গদেশে দুইএকটী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা নিজেদের দল পুষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ব্যভিচার প্রভৃতি দুর্নীতিসমূহ অম্লানবদনে সমর্থন করে! ভগবানের মঙ্গলবিধানে এই সকল সম্প্রদায় দাঁড়াইতে পারিবে না, কিন্তু তাহারা সমাজের গাত্রে যে আঁচড় কাটিয়া যাইবে, সুনীতিপক্ষপাতীদিগের পক্ষে সেই আঁচড় উঠাইতে কিছু সময় লাগিবে, বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষকে আমরা যদি বাঁচাইতে চাই, যদি এই যুগসন্ধিক্ষণে মৃতপ্রায় দেশের প্রাণে নবজীবন আনিতে চাই, তবে আমাদিগকে সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইতে হইবে, প্রার্থনাশীল হইতে হইবে, ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাধন করিয়া আমাদিগকে জগতের মঙ্গলসাধক ও পবিত্রতাসাধক হইতে হইবে। ভগবান যদি থাকেন এবং তাঁহার শক্তি ও ইচ্ছা যদি অপ্রতিহত হয়, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, মঙ্গল ও স্বাধীনতালাভের পথে সত্য সত্য কেহ কোন বাধা স্থাপন করিতে পারে।

ভগবানের সঙ্গে একযোগে যুক্ত হও, স্বাধীনতা হইতে তোমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবে না—পারিবে না। ধর্ম্মরাজ্যে 'ফল' অবলম্বিত উপায়সমূহকে পরিশুদ্ধ করিতে পারে না—The end cannot justify the means। এখানে ফলটীও ভাল অর্থাৎ শুভ বা কল্যাণপ্রদ হওয়া চাই এবং তাহা লাভ করিবার উপায়সকলও কল্যাণপ্রদ হওয়া চাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা সহজ ও আপাততৃপ্তিপ্রদায়ক হইতে পারে; কিন্তু সেই ইচ্ছা সংযত করিয়া ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত নিজ ইচ্ছা সংযুক্ত করিয়া অসাধু ব্যবহারকে সাধুতা দ্বারা জয় করিলে, অসত্য ব্যবহারকে সত্যের দ্বারা জয় করিলে যে বল অর্জ্জিত হয়, তাহার শক্তির নিকট সমগ্র জগত নতমস্তক হইয়া পড়ে— সুরলোক হইতে দেবতারাও তাহা অবাকনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার বললাভই প্রকৃত প্রার্থনার জলন্ত পরিচয়। যে প্রার্থনার ফলে আমরা শত্রুদিগেরও মঙ্গল প্রার্থনা করিবার শক্তি অন্তরে ধারণ করিব, সেই প্রার্থনাই প্রকৃত প্রার্থনা। অকিঞ্চনগুরু ভগবান আমাদিগের অন্তরে সেই প্রার্থনারই অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া দিন। আমাদের হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা, সমস্ত দৈন্য ও দুর্ব্বলতা সেই প্রার্থনার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাক্।

বৌদ্ধ ও জৈনসাহিত্যে 'কৃষ্ণচরিত্র'।

(ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার)

ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঐতিহাসিক সত্য, অনেক সময়ে এ দুয়ের মধ্যে ঐক্য রাখা সম্ভবপর হয় না। ইতিহাসের সম্বন্ধ বহির্জ্জগৎ লইয়া কিন্তু ধর্ম্মের অনুভূতি ও প্রসার হয় অন্তর্জ্জগতে, তাই ধর্ম্মসংস্কার ও ঐতিহাসিক সত্য এ উভয়ের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ঐতিহাসিক বুদ্ধ ও চৈতন্য এবং বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবগণের কল্পিত এই দুয়ের চিত্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অন্যান্য অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের সম্বন্ধেই একথা খাটে।

বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় কৃষ্ণও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন এবং ভক্তগণের হস্তে তিনিও অতিপ্রাকৃত মানুষরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই কল্পিত চরিত্রের পশ্চাতে যে ঐতিহাসিক মানুষটী লুক্কায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান করাই ইতিহাসের কার্য্য। চৈতন্য-সম্বন্ধে এই কার্য্য এখনও খুব কঠিন হয় নাই। বুদ্ধদেব চৈতন্যের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন করা আরও দুরূহ। কিন্তু দুরূহ হইলেও এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা হইয়াছে এবং কিছু কিছু ফললাভও হইয়াছে। কৃষ্ণ বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার জীবনের প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করা আরও কষ্টকর। কৃষ্ণ-বাসুদেব যে বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এই সম্বন্ধেই কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পণ্ডিতগণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, অনেকের মনে এখনও হয় তো আছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কৃষ্ণ অথবা

বাসুদেব নামে সত্য-সত্যই একজন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণই যে পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবগণের উপাস্য দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছেন এই সিদ্ধান্ত অনেকেই সমীচীন বলিয়া মনে করেন। বুদ্ধদেবের ন্যায় কৃষ্ণ-বাসুদেবও কালক্রমে ভক্তগণের ঈশ্বররূপে পরিগণিত হইয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। (১)

পুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অপ্রাকৃত ও অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমুদয় কাহিনীর মধ্য হইতে কৃষ্ণের যথার্থ জীবনচরিত সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যাঁহারা কৃষ্ণের ভক্ত বা উপাসক নহেন তাঁহাদের গ্রন্থেও এই ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৌদ্ধ ও জৈন-গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। অবশ্য এগুলিও গল্প, কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণ মানুষরূপেই কল্পিত হইয়াছেন। ভক্তগণের মানসপ্রসূত অতিরঞ্জিত চিত্রের সহিত এইগুলির তুলনা করিলে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কেবল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মসাহিত্যে কৃষ্ণ কিরূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছেন মাত্র তাহারই কিছু নিদর্শন দিতে চেষ্টা করিব। বৌদ্ধ "ঘতজাতকে" নিম্নলিখিত আখ্যানটী আছে।

অতীতকালে উত্তরাপথে কংসরাজ্যে (২) অসৃতঞ্জন নগরে মহাকংস নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। কংস ও উপকংস নামে দুই পুত্র ও দেবগর্ভা (দেবগর্ত্তা) নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যার জন্মদিবসে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন যে, ইহার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র কংসরাজ্য (৩) ও কংসবংশ বিনাশ করিবে। রাজা মহাকংস অপত্যস্নেহপ্রবৃত্ত কন্যার প্রাণবধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর কংস রাজা ও উপকংস উপরাজা হইলেন। ভগিনীর প্রাণনাশ করিলে লোকনিন্দা হইবে এই বিবেচনায় তাঁহারা ইহাকে বিবাহ না দিয়া একস্তম্ভযুক্ত (১) প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলেন। নন্দগোপা নামে দেবগর্ভার এক পরিচারিকা ছিল। তাহার স্বামী অন্ধকবৃষ্ণি (? অন্ধকবেণ্হু) দেবগর্ভার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

তৎকালে উত্তর মথুরায় (মধুরা) মহাসাগর নামক রাজা ছিলেন। তাঁহার সাগর ও উপসাগর নামক দুই পুত্র, তাঁহার মৃত্যুর পর যথাক্রমে রাজা ও উপরাজা হইয়াছিলেন। উপসাগর ভ্রাতার অন্তঃপুরে দুষ্কার্য্যের অপরাধে ধৃত হইয়া সহাধ্যায়ী ও বাল্যসুহৃৎ উপকংসের নিকট পলায়ন করিলেন। উপকংসের অনুরোধে রাজা কংস তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে উপসাগর দেবগর্ভার বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইলেন, দেবগর্ভাও তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও নন্দগোপার নিকট তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ক্রমে নন্দগোপার সাহায্যে নিশাযোগে দেবগর্ভার গৃহে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল এবং এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে দেবগর্ভার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন কংস ও উপকংস দুই ভ্রাতা নন্দগোপাকে অভয়দানপূর্ব্বক তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপসাগরের সহিত দেবগর্ভার বিবাহ দিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন যে যদি দেবগর্ভার কন্যাসন্তান হয় তাহা হইলে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যদি পুত্রসন্তান হয় তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহার প্রাণনাশ করিবেন।

যথাকালে দেবগর্ভা একটী কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। কংস ও উপকংস ইহা শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং নবজাত কন্যার 'অঞ্জনাদেবী' এই নামকরণ করিলেন। গোবর্দ্ধমান (গোবড্ঢমান) নামক গ্রাম তাঁহারা ভগিনীকে প্রদান করিলেন এবং উপসাগর ও দেবগর্ভা অতঃপর তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে একই দিনে দেবগর্ভা ও নন্দগোপার

---

(১) কৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহার 'বিশিষ্ট প্রমাণ Sir R. G. Bhandarkar প্রণীত Vaishnavism, Saivism and Minor Religious System এবং Dr. H. C. Roy Choudhury প্রণীত Early History of Vaishnavism দ্রষ্টব্য।

(২) মূলের কংসভোগ শব্দটী ইংরেজী অনুবাদক Kamsa District এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। কংস শব্দ কোন ভূভাগ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত এরূপ প্রমাণ পাই নাই।

(৩) এখানেও মূলে আছে 'কংসভোগ' কিন্তু 'কংসগোত্ত' অর্থাৎ 'কংসগোত্র' এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

(১) ইংরেজী অনুবাদক মূলের "একথূণকং পাসাদং" এই শব্দদ্বয়ের 'a single round tower' এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু পালি 'থূণা' (সংস্কৃত—স্থূণা) শব্দের অর্থ স্তম্ভ। পালি মহাবংশে 'একথূণিকং গেহং' এই পদের "an apartment built on a single pillar" Childers এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (Childer's Pali Dictionary, p. 505)। একস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদটী ঠিক কি রকম বুঝিতে পারা যায় না। প্রাচীন ভারতের স্থপতিবিদ্যা-বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা এই বিষয়টী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

গর্ভসঞ্চার হইল এবং একদিনেই দেবগর্ভা একটী পুত্র ও নন্দগোপা একটী কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। দেবগর্ভা পুত্রের প্রাণনাশভয়ে ভীতা হইয়া গোপনে স্বীয় সন্তান নন্দগোপার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং নন্দগোপার কন্যা নিজের নিকট আনাইয়া রাখিলেন। তাঁহার ভ্রাতারাও ভগিনীর কন্যাসন্তান প্রসব হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে যথাবিধি লালন-পালনের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে ক্রমে দেবগর্ভার দশ পুত্র ও নন্দগোপার দশ কন্যা জন্মিল। পুত্রগণ নন্দগোপার নিকট ও কন্যাগণ দেবগর্ভার নিকট পালিত হইল; কেহই কিছু জানিতে পারিল না। দেবগর্ভার জ্যেষ্ঠপুত্র বাসুদেব, দ্বিতীয় পুত্র বলদেব এবং অবশিষ্ট পুত্রগণ যথাক্রমে চন্দ্রদেব (চন্দদেব), সূর্য্যদেব (সুরিয়দেব), অগ্নিদেব (অগ্‌গিদেব), বরুণদেব, অর্জ্জুন (অজ্জুন), প্রদ্যুম্ন (১) (? পজ্জুন) ঘৃতপণ্ডিত (ঘতপণ্ডিত) ও অঙ্কুর নামে অভিহিত হইল।

'অন্ধকবৃষ্ণিদাস-পুত্র' নামে পরিচিত এই ভ্রাতৃগণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বলশালী ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্বাপহরণ, এমন-কি রাজদ্রব্য পর্য্যন্ত লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। প্রজাগণ রাজার নিকট অভিযোগ আনয়ন করিলে রাজা অন্ধকবৃষ্ণিকে ডাকাইয়া পুত্রগণের দুর্ব্বিনীত আচরণের নিমিত্ত তাহাকে অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলেন। ভীত হইয়া অন্ধকবৃষ্ণি রাজ-সমীপে যথাযথ নিবেদন করিল। রাজা কংস, ইহারা তাহার ভগিনীপুত্র, এই গূঢ় রহস্য বিদিত হইয়া কি উপায়ে ইহাদের বিনাশ-সাধন করা যায়, অমাত্যবর্গের সহিত তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অমাত্যবর্গ বলিলেন, "ইহারা মল্লযুদ্ধকারী, নগর-মধ্যে মল্লযুদ্ধ হইবে এইরূপ ঘোষণা করা যাউক, তৎপর ইহারা যুদ্ধমণ্ডপে উপস্থিত হইলে ইহাদের বিনাশ করা যাইবে।" তদনুসারে রাজা চাণুর ও মুষ্টিক (মুট্‌ঠিক) নামক মল্লদ্বয়কে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন এবং ভেরীবাদন দ্বারা সপ্তম দিবসে রাজদ্বারে 'মল্লযুদ্ধ হইবে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে চাণুর ও মুষ্টিক রঙ্গস্থলে আসিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিল। অন্ধকবৃষ্ণির দশ পুত্রও পথিমধ্যে রজকবীথি লুণ্ঠন করিয়া দিব্য বিচিত্র বস্ত্র এবং গন্ধবণিক্ ও মালাকরের নিকট হইতে গন্ধ ও মাল্য গ্রহণ করিয়া সুশোভিত ও সুগন্ধযুক্ত হইয়া যুদ্ধমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমে বলদেব চাণুর ও মুষ্টিককে হত্যা করিলেন। (১) মুষ্টিক মৃত্যুকালে প্রার্থনা করিল যেন যক্ষ হইয়া বলদেবকে গ্রাস করিতে পারে, তদনুসারে কালমত্তির নামক অরণ্যে সে যক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর বাসুদেব চক্রক্ষেপণ করিয়া কংস ও উপকংস দুই ভ্রাতার শিরশ্ছেদন করিলেন। ভীত ত্রস্ত অধিবাসীগণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহারা অসিতাঞ্জন নগরে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলেন ও মাতাপিতাকে তথায় আনাইলেন। তৎপর সমগ্র ভারতবর্ষ জয়ের উদ্দেশে বহির্গত হইয়া কালসেন রাজার রাজধানী অযোধ্যানগরী অধিকার করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দ্বারাবতী জয়ের উদ্দেশে নির্গত হইলেন। দ্বারাবতী নগরীর একদিকে সমুদ্র একদিকে পর্ব্বত। শত্রু উপস্থিত হইলেই ইহার রক্ষক যক্ষ গর্দ্দভরবে চীৎকার করিতে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ সমগ্র নগরী উৎপতিত হইয়া সমুদ্র মধ্যে এক দ্বীপে অবস্থান করে। পরে শত্রু পশ্চাৎপদ হইলে পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বাসুদেব ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ দ্বারাবতীগ্রহণে অসমর্থ হইয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শরণাপন্ন হইলেন। পরে তাঁহার পরামর্শ অনুসরণ করিয়া দ্বারাবতী রাজ্য অধিকার করিলেন। ক্রমে তাঁহারা চক্রদ্বারা ত্রিষষ্টিসহস্র রাজার প্রাণবধ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীয় অধিকার স্থাপনপূর্ব্বক দ্বারাবতীতে অধিষ্ঠিত হইলেন। সমগ্র রাজ্য দশ ভাগে বিভক্ত হইল। সর্ব্বকনিষ্ঠ অঙ্কুর বাণিজ্যে লিপ্ত হইলেন। অবশিষ্ট নয় ভ্রাতা ও তাহাদের ভগিনী অঞ্জনাদেবী এক-একটী রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং দ্বারাবতীতে বসবাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পুত্রকন্যা-সমভিব্যাহারে বহুবর্ষ রাজত্ব করিলেন। তৎকালে মনুষ্যের আয়ুঃ-পরিমাণ বিংশসহস্র বর্ষকাল ছিল।

কালক্রমে বাসুদেবের এক পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে বাসুদেব শোকে উন্মত্ত হইলেন এবং সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৃতপুত্রের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত ঘৃতপণ্ডিত এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিয়া 'আমাকে একটী শশক দাও, আমাকে একটী শশক দাও' এই বলিয়া দ্বারাবতীর পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন। রোহিণেয় নামক অমাত্য বাসুদেবের নিকট

(১) 'পজ্জুন' সংস্কৃত প্রদ্যুম্ন ও পর্জ্জন্য এ উভয়েরই রূপান্তর হওয়া সম্ভব। (English Translation of the Jatakas, Vol. IV. p. 51 fn 1)

(১) জাতক, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৯

এই সংবাদ বিবেচন করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ শীঘ্র ওঠ, হে কেশব তুমি এখানে বিলাপ করিতেছ আর তোমার ভ্রাতা উন্মত্ত হইয়া ঘুরিতেছে।" ইহা শুনিয়া কেশব ঘৃতপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কিরূপ শশক চাও বল, মণি-মুক্তা, স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহ, শঙ্খ শিলা অথবা প্রবাল-নির্ম্মিত যেরূপ শশক চাও আমি তাহাই আনিয়া দিতেছি। ঘৃতপণ্ডিত বলিলেন, 'আমি এ সকল কিছুই চাই না, কেবল চন্দ্রের কোলে যে শশক আছে আমাকে তাহাই আনিয়া দাও।' রাজা বাসুদেব ভ্রাতার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ তুমি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, কারণ তুমি অপ্রার্থনীয় বস্তুর প্রার্থনা করিতেছ।" ইহা শুনিয়া ঘৃতপণ্ডিত বলিলেন, "হে কৃষ্ণ যদি তুমি ইহা জান, তবে মৃতপুত্রের নিমিত্ত শোক করিতেছ কেন?" এই কথা শুনিয়া বাসুদেব পুত্রশোক পরিহার করিলেন।

বাসুদেব বহুকাল রাজ্যশাসন করিলে একদা তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পরামর্শ করিলেন, "ঋষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন কি না আমরা ইহার পরীক্ষা করিব।" একটী বালকের উদরে একটী বালিশ বান্ধিয়া তাহারা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে জিজ্ঞাসা করিল "তাপস, এই কুমারী কি প্রসব করিবে?" মুনি দিব্যচক্ষুতে সমুদয় অবগত হইয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ইহার খদিরকাষ্ঠ প্রসব হইবে। উহা দগ্ধ করিয়া ভস্ম-রাশি নদীজলে নিক্ষেপ করিলেও তদ্দ্বারা বাসুদেবকুল বিনষ্ট হইবে।" তখন বালকগণ তপস্বীকে ভণ্ড বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। রাজগণ সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া ভীত হইলেন। সপ্তম দিবসে উক্ত কুমারের কুক্ষি হইতে খদিরকাষ্ঠ নির্গত হইলে তাহা ভস্ম করিয়া নদীজলে ভাসাইয়া দিলেন। কিয়দ্দূর নদী-পার্শ্বে লাগিয়া ভস্মরাশি একটী এরক বৃক্ষে পরিণত হইল।

অনন্তর একদিন রাজগণ ও রাজকুমারগণ জলকেলি উপলক্ষে ঐস্থানে গমন করিয়া কলহে রত হইলেন। মুষল অভাবে তাহারা এরক বৃক্ষের পত্র লইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ঐ পত্র মুষল আকারে পরিণত হইয়া পরস্পরের বিনাশ করিতে লাগিল। বাসুদেব, বলদেব, অঞ্জনা দেবী ও তাহাদের পুরোহিত রথে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। আর সকলে ঐ স্থানে বিনষ্ট হইলেন। পথিমধ্যে কালমত্তির-বনে মল্ল মুষ্টিক স্বীয় প্রার্থনা-অনুসারে যক্ষযোনিরূপে বাস করিতেছিল; বলদেব তাহার হস্তে নিহত হইলেন। বাসুদেব বনমধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে জরানামক ব্যাধ শূকরভ্রমে তাঁহাকে বধ করিল। এইরূপে অঞ্জনা ব্যতীত সকলেই বিনষ্ট হইলেন।

অন্যান্য বৌদ্ধজাতকেও কৃষ্ণ-বাসুদেবের উল্লেখ আছে। কুম্ভজাতকেও সুরাপানের দোষ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গাথাটী উদ্ধৃত হইয়াছে—(১)

"এই সুরাপান করিয়াই অন্ধকবৃষ্ণি-পুত্রগণ (অন্ধক-বেন্‌হু পুত্তা) সমুদ্রতীরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মুষলদ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছিল।"

সংকিচ্চ জাতকে সাধু ব্যক্তির প্রতি অসদাচরণ করিলে কি বিষময় পরিণাম ঘটে তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গাথাটী উদ্ধৃত হইয়াছে—(২)

"ঋষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে আক্রমণের ফলে অন্ধকবৃষ্ণি-গণ (অন্ধক বেন্‌হুয়ো) পরস্পরের মুষলের আঘাতে যমালয়ে গমন করিয়াছিল।"

জৈন উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রে কৃষ্ণ-বাসুদেব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প আছে।

"শৌর্য্যপুর নামক নগরে বাসুদেব নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী, রোহিণী ও দেবকী। রোহিণীর পুত্র রাম, দেবকীর পুত্র কেশব। শৌর্য্যপুরে আর একজন রাজা ছিলেন তাঁহার নাম সমুদ্রবিজয়, তাঁহার স্ত্রী শিবার গর্ভে অরিষ্টনেমি নামে তাঁহার এক পুত্র হয়।

"কেশব রাজীমতীর নামে এক রাজকন্যার সহিত অরিষ্টনেমির বিবাহ স্থির করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় কুমার অরিষ্টনেমি সৈন্য-সামন্ত-পরিবৃত হইয়া উপযুক্ত সমারোহ-সহকারে বিবাহ করিতে চলিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখিলেন কতকগুলি পশুবধের আয়োজন হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহারই বিবাহের ভোজ উপলক্ষে এই সমুদয় পশুবধ করা হইবে। ইহা শুনিয়া তাঁহার মনে গভীর দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি সংসার ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া দ্বারকাপুরী ত্যাগ করিয়া রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। রাম ও কেশব অরিষ্টনেমির সহিত রৈবতকে সাক্ষাৎ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন।"

এই গল্পের শৌর্য্যপুর, সম্ভবতঃ 'মথুরা'। কৃষ্ণের এক নাম শৌরি, সম্ভবতঃ ইহা হইতেই শৌর্য্যপুরের উৎপত্তি। কিন্তু অরিষ্টনেমির বিবাহ প্রভৃতি ঘটনা দ্বারকাতেই হইয়াছিল।

'অন্তগড় দসাও' নামক আর একখানি জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে কৃষ্ণের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রধান প্রধান অংশগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। (১) "দ্বারাবতী নগরীতে বাসুদেব রাজত্ব করিতেন, তাঁহার এক নাম

(১) জাতক, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৮
(২) জাতক, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭

ছিল কৃষ্ণ। দশার্হ-বংশীয় সমুদ্রবিজয়, বলদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, মহাসেন, বীরসেন, উগ্রসেন প্রভৃতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রুক্মিণী প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র রাণী এবং অনঙ্গসেনা-প্রমুখ বহু সহস্র বারবণিতা ছিল।"

(২) দ্বারাবতী নগরীতে বসুদেব নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম দেবকী। একদিন মহাত্মা অরিষ্টনেমি দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ছয়জন শিষ্য দেবকীর নিকট ভিক্ষার জন্য গমন করিল। দেবকী এই শিষ্যগণের কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং পরিচয় লইয়া জানিলেন যে ইহারা ছয় ভাই। তাঁহাদের পিতার নাম 'নাগ', মাতার নাম সুলসা এবং তাঁহাদের জন্মস্থান ভদ্দিলপুর। তাহারা চলিয়া গেলে দেবকী মনে মনে ভাবিলেন "বাল্যকালে এক সাধু আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে আমার এমন আটটী পুত্র হইবে যে, তাহাদের তুল্য ভারতবর্ষে আর দেখা যাইবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না—সুতরাং মহাত্মা অরিষ্টনেমিকে এই বিষয় নিবেদন করিব।" অতঃপর দেবকী অরিষ্টনেমির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অরিষ্টনেমি দেবকীকে বলিলেন—"ভদ্দিলপুরে নাগ নামক এক ব্যক্তির সুলসা নামে স্ত্রী ছিল। তাহার বাল্যকালে এক জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে সে মৃতবৎসা হইবে। সুলসা ভক্তি-সহকারে 'হরিণেগমেসী' নামক দেবের পূজা করিল। ফলে তুমি ও সুলসা একই কালে সন্তান প্রসব করিলে, কিন্তু হরিণেগমেসী সুলসার মৃতপুত্রগুলি তোমার নিকট রাখিয়া তোমার পুত্রদিগকে সুলসার নিকট রাখিত। প্রকৃতপক্ষে সুলসার পুত্র নামে পরিচিত অরিষ্টনেমির ছয় শিষ্য তোমারই সন্তান।" তখন দেবকী মনে মনে ভাবিলেন—"হায় আমি নলকুবেরের ন্যায় সাতটী পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করিলাম, কিন্তু একটীকেও শিশু-অবস্থায় পালন করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র পুত্র কৃষ্ণ-বাসুদেব ছয়মাস অন্তর একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে।" অতঃপর দেবকী কৃষ্ণের নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিলেন। তখন কৃষ্ণ হরিণেগমেসী দেবকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহার এক কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিবে এই বর লাভ করিলেন। ক্রমে দেবকীর এক পুত্র হইল—তাহার নাম হইল "গয়সুকুমাল।" গয়সুকুমাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া অরিষ্টনেমির নিকট দীক্ষালাভ করিল।

(৩) একদিন কৃষ্ণ অরিষ্টনেমিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে দ্বারাবতী নগরীর ধ্বংস হইবে?" অরিষ্টনেমি বলিলেন, "জল অগ্নি ও দ্বৈপায়ন ইহার ধ্বংসের কারণ হইবে।" এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ ভাবিলেন তাঁহার বংশের অনিরুদ্ধ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহারাই সুখী যদি তিনি রাজ্যের দায়িত্ব বহন করায় সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। অরিষ্টনেমি তাঁহার মনের গোপন চিন্তা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ তাহা হইবার নয়, বাসুদেব মাত্রেই পূর্ব্বজন্মে চুক্তি করিয়াছে, সুতরাং তাহারা এজন্মে সন্ন্যাস লইতে পারিবে না।"

তখন কৃষ্ণ অরিষ্টনেমিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মৃত্যুর পর আমি কোথায় জন্মগ্রহণ করিব?" অরিষ্টনেমি বলিলেন, "তোমার মাতাপিতার আহ্বানে তুমি এই স্থান ত্যাগ করিবার পর, প্রবল জলস্রোত, অগ্নি ও দ্বৈপায়নের ক্রোধ দ্বারাবতী ধ্বংসের কারণ হইবে। রাম ও বলদেবের সহিত তুমি দক্ষিণসমুদ্রের দিকে "পাণ্ডু মথুরায় পাণ্ডু রাজার পুত্র" যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডবের নিকট যাত্রা করিবে। কোশম্ব-বনে বৃহৎ ন্যগ্রোধ-বৃক্ষের নিম্নে পীতবাসধারী তোমার বাম পায়ে জরাকুমারের বাণ লাগিয়া তোমার মৃত্যু হইবে। মৃত্যুর পর তুমি নরকে যাইবে।" এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। তখন অরিষ্টনেমি বলিলেন, "তুমি দুঃখিত হইও না। নরকভোগের পর এই ভারতবর্ষেই পৌণ্ড্রদেশে তোমার জন্ম হইবে এবং তুমি মোক্ষলাভ করিবে।" অতঃপর কৃষ্ণের পত্নী পদ্মাবতী, গৌরী, সত্যভামা, রুক্মিণী, জাম্ববতী প্রভৃতি অরিষ্টনেমির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণীর জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে মোক্ষলাভ করিলেন।

কৃষ্ণ-সম্বন্ধে জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে আর যে সমুদয় আখ্যান আছে বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। যে কয়েকটী আখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সম্যক্ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করাও বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কৃষ্ণের জন্মের ও জীবনের মূলবিবরণ পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে যেরূপ পাওয়া যায় তাহার সহিত উক্ত আখ্যানগুলির প্রভেদও যেমন আছে সামঞ্জস্যও তেমনি। যশোদার সহিত সন্তানবিনিময়, কংসের আখ্যান, দ্বারকায় রাজ্যস্থাপন, পাণ্ডবগণের সহিত সখ্য, দ্বারকার ধ্বংস ও অপঘাতমৃত্যু প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে একটা ঐক্য এই সকল গল্পের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই সমুদয় বিভিন্ন উপাদানের তুলনা-মূলক আলোচনা দ্বারাই কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি গড়িতে হইবে। পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে কৃষ্ণের চরিত্র যেরূপ অঙ্কিত

হইয়াছে, ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থেও বুদ্ধের চিত্র সেইরূপ—তথাপি বুদ্ধের ঐতিহাসিক কাহিনী কতক পরিমাণে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে। অনুরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া উল্লিখিত উপাদানের সাহায্যে কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি গঠিত হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়। •

ভারতীয় সঙ্গীতের অধ্যাত্মভাব।

(ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী).

অতি অল্প লোকই ভারতীয় সঙ্গীতের তত্ত্ব, বিশেষত উহার ঐতিহাসিক দিক লইয়া নাড়াচাড়া করেন। যাঁহারা আপনাদিগকে সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে সমুৎসুক, তাঁহাদের অধিকাংশই উহার practical দিক বা যন্ত্রাদির সাহায্যে বাজাইবার ও গাহিবার দিক আলোচনা করিতেই ভালবাসেন। আমরা ভারতীয় সঙ্গীত উপলক্ষে উপরোক্ত কথা বলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু ইহা সকল দেশের ও সকল জাতির সঙ্গীতজ্ঞদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বজাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে একটি অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বজনীন প্রাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বলা বাহুল্য যে, সকল দেশের, সকল জাতির ও সকল কালের সঙ্গীতের মধ্যে সকল গণ্ডীর বহির্ভূত সর্ব্ববিধ সীমার অতীত এক একত্বকে অক্ষুন্নপ্রভাবে বিরাজমান থাকিতে দেখা যায়। তাহার নিকটে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিয়া, অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন প্রকার ভেদাভেদ দাঁড়াইতে পারে না। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ এই সত্য সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সঙ্গীতকে অনাদ্যনন্ত ব্রহ্ম হইতে বিনিঃসৃত এক অনন্ত শব্দলহরী বুঝাইবার জন্য উহাকে "নাদব্রহ্ম"রূপে বিঘোষিত করিয়াছেন।

ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে কি সাহিত্য কি কলাবিদ্যা, কি দর্শন কি বিজ্ঞান, সকল বিভাগেই জগতের জ্ঞানবৃদ্ধিসাধনে ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণে বহুমূল্য রত্নরাজি দান করিয়াছেন। পাশ্চাত্যবাসীগণ সর্ব্বপ্রথম এদেশে যখন পদার্পণ করেন, তাঁহারা স্বভাবতই ভারতের অন্তর্নিহিত রত্নরাজির কোনই সন্ধান পান নাই। তাঁহারা উহার বহির্দ্দেশে মাত্রই বিচরণ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন; কাজেই ভারতভূমির নিকট বিশ্বজগৎ যে অপূর্ব্ব দান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মূল্য তাঁহারা কিছু মাত্র বুঝিতে পারেন নাই। ইহার কারণে তাঁহারা ভারতবাসীকে অর্দ্ধ অসভ্য ভাবিয়া মনে করিতেন যে, উহাদের বিজ্ঞান বা দর্শন, সাহিত্য বা শিল্প কিছুই নাই। অবশেষে যখন জার্ম্মনীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে এবং সার উইলিয়াম জোন্স, H. H. Wilson প্রভৃতি কতিপয় উদারহৃদয় ইংরাজমনীষীগণের প্রশংসনীয় অধ্যবসায় ও উদ্যমের ফলে সেই সকল রত্নভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বসমক্ষে উন্মুক্ত হইয়া গেল, তখন পাশ্চাত্যবাসীদিগের দৃষ্টি ঐ সকল রত্নসমূহ হইতে বিনিঃসৃত আলোকের ঝরণার কণেকের জন্য ঝলসিয়া গেল।

জগতের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতিসাধনে ভারতবর্ষ যে সকল বিষয় দান করিয়াছে, তন্মধ্যে বোধ হয় সঙ্গীত অগ্রণীর উপযুক্ত সম্মুখস্থ আসন পাইবার অধিকারী। বিশ্বজগত জুড়িয়া সঙ্গীতকে ধর্ম্মের সহচর বলিয়া সাধারণত ধরা হয়। একথা ভারতবর্ষের পক্ষে অধিকতর প্রযুক্ত হইতে পারে, বলা বাহুল্য। ইহা জানা কথা যে, অধ্যাত্মভাব ধর্ম্মমাত্রেরই মূল উৎস। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষমূলার ঠিকই বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রকৃতি ও নানা অবস্থার কারণে অধ্যাত্মভাব এদেশে যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন আর কোন দেশে হয় নাই। এই অধ্যাত্মভাবের প্রবণতা ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উহা রাগরাগিণীর ভিতর দিয়া সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রাগরাগিণী যদিও ভারতীয় সঙ্গীতে সমধিক উন্নত আকারে প্রকাশ পায়, তথাপি আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বিশ্বজগতেরই সঙ্গীতে, যতই কেন অনুন্নত আকারে হউক না উহার অস্তিত্ব দেখা যায়।

ভারতের ঋষিরা সঙ্গীতকে এই অসার সংসারের উপরে উঠিবার এবং ভগবানের সিংহাসনতলে পৌঁছিবার অনন্যশ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপে দৃষ্টি করিতেন। "গানাৎ পরতরং নহি" অর্থাৎ গান অপেক্ষা আর কিছুই নাই, এই উক্তি হইতেই তাঁহাদের ঐ ভাবটী সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে।

ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলে অথবা তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে উহার এই আধ্যাত্মিক দিকটী মনে রাখিতে হইবে, ভুলিলে চলিবে না। ভারতীয় সঙ্গীতকে অনেক সময়ই ভারতীয় অন্যান্য শিল্পকলার ন্যায় মূলত আদর্শোন্নত, রহস্যাবৃত, সঙ্কেতব্যক্ত ও সর্ব্বাতিশয়ী বলা হইয়া থাকে, ইহা খুবই সঙ্গত। সঙ্গীতের আধ্যাত্মিকতা ভারতবাসীর প্রাণে বৈদিক কাল অবধি এ পর্য্যন্ত এমনই

• "পঞ্চপুষ্প"—ভাদ্র, ১৩৩৮।

গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহার ছাপ ভারতের সর্ব্ববিধ সঙ্গীতে, এমন-কি রামপ্রসাদী, কীর্ত্তন ও বাউল প্রভৃতি দেশজ সঙ্গীতেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। ভারতে এত প্রকার দেশজ সঙ্গীত প্রচলিত আছে যে, সে সমুদয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা এবং তাহাদের প্রকৃতি অন্তরে ধারণ করিতে পারা আমাদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রকার দেশজ সঙ্গীতশ্রেণীতে পার্থিব প্রেমব্যঞ্জক অনেক গান দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল শ্রেণীরই দেশজ সঙ্গীতের অধিকাংশ গানই ভগবৎপ্রেমমূলক বা ভক্তিমূলী।

ভগবানের দয়ায় আমরা এই আধ্যাত্মিকতাসমাচ্ছন্ন ভারতীয় সঙ্গীতরত্নের উত্তরাধিকারী হইয়া ধন্য হইয়াছি। ভারতের প্রাচীন ঋষিমুনিদিগের প্রকাশিত এই রত্নের সমুজ্জ্বল রশ্মি যুগযুগান্তরের ঘন তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী গৌরব অনুভব করিবার অধিকারী সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।
আজ কর রে জীবনের ফল লাভ।
হৃদয়-থাল-ভার, ভক্তি-পুষ্প-হার প্রভু চরণে ছাওরে ছাও।
নব-নব-রাগ-রচিত বন্দনমালা, গাঁথি গাঁথি দে উপহার।
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি প্রচার সকল সংসার॥

কথা ও সুর—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন।

০ ৪ । ১´ ০ ২ ।° ০
মগা II { মগা মা । পা -মপা I পদা -া । -াপ পপা । -া -া । (-দমা পগা) } ।
স০ বে০, মি লে ০ ০ গা ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ "স০"

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। পমা -াপ । -গা ঋা । -গা -মা I পমা -াপ । -গা ঋা । -াস সা । -া সঋা ।
তাঁহা ০ ০ র ০ ০ মহি ০ ০ ০ ০ মা ০ আ

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। -াস সা । -া সা I সঋা -ণ্া । -দ্া সা । -ঋা -া । ঋমা মাপ । -গা ঋা । -গা -মা I
০ জ ০ ক র০ ০ ০ রে ০ ০ জীব নে ০ র ০ ০

১´ ০ ২ ০
I গপা মাপ । -গা ঋা । -া সা । -া মগা II
ফ ল, লা ০ ০ ০ ভ ০ "স০"

• এই গানটিতে অন্তরা গাহিবার পর আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া যে স্থলে থামিয়া সঞ্চারী আরম্ভ করিতে হইবে, সেই স্থলের শিরোদেশে এক-দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া গেল।

"জীবনসন্ধ্যা"

একতালা—ইমন পূরবী

জীবনের সন্ধ্যা এল আঁধারের ছায়া ফেলে।
দিবস ঘুমায়ে গেল দীনবন্ধু অবহেলে।
জেনেও পড়েছি ওহে কতবার পাপমোহে
তুমি না মুছালে বল কে মুছাবে আঁখিজলে॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—ডাঃ সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

২´ ৩ ০ ১
II র্সা -া না। ধপপা -া -া। গরা গরা সরা। গা -া -া I
জী ০ ব নে০ ০ ০ র স ০ ন্ধ্যা এ০ ল ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা হ্মা ধা। পা হ্মপা গা। গা -া রা। সা -া -া I
আঁ ধা রে র ০ ছা য়া ০ ফে লে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা গা পহ্মা। ধপা ধধা র্সা। -া নধা না। ধপপা গা -া I
দি ব স০ ০০ ঘুমা য়ে ০ গে০ ০ ল০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা হ্মা ধপা। পা -া গা। রগা -া রা। সা -া -া II
দী ন ব০ ন্ধু ০ অ ব ০ হে লে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
{I গা গা পহ্মা। ধপা ধধা র্সা। র্রর্সর্সা -া র্সা। র্সা -া -া I
জে নে ও০ ০০ পড়ে ছি ০০০ ০ ও হে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা না। -া ধা ধা। না ধনর্সা নধনা। ধপপা হ্মা গা I}
ক ত বা ০ র পা প মো০০ ০০০ হে০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা পা পা। পা পা হ্মপা। ধনর্সাঃ নঃ ধপা। হ্মা গহ্মা গা I
তু মি না মু ছা লে০ ০০০ ০ ব ০ ০ ল

২´ ৩ ০ ১
I গা হ্মা ধা। পা হ্মপা গরা। রগা -া রা। সা -া -া IIII
কে মু ছা বে ০ আঁ০ খি ০ জ লে ০ ০

———

THE

BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(4)

39. Keshub Chunder's Missionary work in the Mofussil.

On receipt of this dignified and decisive reply Keshub Chunder and his party despaired of again honestly and heartily co-operating with the *Samaj*. The step they had taken in thus provoking the resentment of the *Samaj* was not without unpleasant consequences to themselves. They soon found they were deserted and despised in the fullest sense of the words. Under these circumstances, Keshub Chunder, finding no support and sympathy in Calcutta, began in the company of some of his friends and disciples to travel from place to place in the Mofussil, preaching the tenets of the Brahmic religion, as professed by himself and his followers. These labours were attended with success in spite of the annoyances, persecutions and revilings with which they were assailed by the entire community. In the meantime Keshub Chunder had visited Madras, Bombay, and shortly afterwards the Panjab.

40. His lecture—"Christ, Europe and Asia.

When a year had thus been spent and devoted to missionary efforts, Keshub Chunder returned to Calcutta, and, in April of 1865, delivered a lecture in the theatre hall of the Medical College, entitled "Christ, Europe and Asia," in which he dwelt with great eloquence and earnestness on the life and perfections of Christ.

This speech at that time drew special attention to Keshub, and led the Christian public to believe that he was prepared to embrace Christianity—a conjecture which proved erroneous. The Brahmas too, with whom he had quarrelled evinced much pleasure at the prospect of his turning a Christian, and reviled him for his inconsistency and apostacy. Lord Lawrence, Governor-General, who was at that time at Simla, was also so much pleased with the liberal views displayed in this speech that he desired an interview with Keshub.

41. His lecture on "Great Men."

The illusions and misconceptions which this memorable speech gave rise to were, however, quickly dissipated by another speech, entitled "Great Men," delivered a short time after. In this speech, although avowing his admiration and veneration for the great men of every age, and especially for the perfect character of Christ, Keshub undeceived the public by stating that he was prepared to go so far, but no further. This seeming retrogression of the opinion so plainly and boldly set forth in his former speech of "Christ, Europe and Asia," excited the distrust and animosity of the whole native community. The Brahmas did not lose the opportunity of loading him with accusations, and calling him a "Christian, a Vaishnava, Chaitanyaite, and sometimes a Christian Vairagi or Vaishnava Christian."

42. Proposal to establish the "Brahmo Samaj of India."—1866 November, (1788 *Saka.*)

As some time had now elapsed since Keshub Chunder, in company with his disciples, had severed his connection with the *Samaj*, and no steps had hitherto been taken for consolidating and bringing together in one body the receding party, Keshub Chunder determind to convene a meeting for the purpose of taking into consideration the best means of cementing his party into a compact religious association. This meeting was held in November 1866 (Saka, Kartik 1788) at the Metropolitan College-House in Chitpore Road. The meeting was numerously attended. It was opened by divine service, which included some hymns, and the recital of scriptural texts extracted from the writings of Christians, Hindus, Mahomedans, Parsees, and Chinese. This extraordinary innovation was introduced to show the universal and catholic character of the proposed Church, and to invite men of all creeds and nationalities to join it. At this meeting

the following resolutions were put to the vote and unanimously carried :—

1. To establish an Association under the title of the "*Brahma Samaj of India*," for the admission of all Brahmas, and the wide propagation of the religion.

2. That this Association be bound to preserve the purity and universality of its religion.

3. That people of both sexes, believing in the fundamental principles of Brahmaism, shall be admissible as members.

4. That mottos and maxims agreeing with the principles of Brahmaism be gleaned and published from the religious writings of all nations.

5. That a vote of thanks be given to Devendranath Thakur, for the unflagging zeal he has ever exhibited, and the indefatigable labour he has undergone for promoting the progress of the religion.

From the inauguration of this religious Association dates the distinction which exists between the two *Samajes*, the one under Devendranath Thakur being called "*Adi Samaj*," or Original Church, and the one under Keshub Chunder, the "*Samaj of India*."

Thus we see, 40 years after the foundation of the *Samaj* by Ram Mohun Roy, the rise of another *Samaj* for the propagation of the same religious principles to which the Raja had devoted the best part of his life.

43. Short History of the Schism.

As the cause which led to the foundation of the *Samaj* of India have hitherto, in other words, been very incorrectly or meagrely stated, it is necessary to devote a few pages to their investigation. As stated before, the "popularly asserted" cause which gave rise to the dispute and separation of Keshub was the wearing of the "*poita*" or sacred thread by the ministers of the *Samaj*, to which Keshub objected as a relic of idolatry and Hinduism. In other words, the cause of the schism was Keshub's zeal for radical reform. To clearly understand, however, the true causes of the rupture, it will be necessary to go back a little in this history. Keshub Chunder, as we have seen, was led to join the *Samaj* through reading some of the writings of Rajnarain Bose. His joining the *Samaj* was an act of his own free will. No persuasion or coercion was used to hasten his conversion to Brahmaism. After his conversion, he conformed to all the tenets and doctrines of the religion, acquiesced to all the rules and institutes of the Church, laboured with zeal and energy in the promotion of its welfare, joined in a warm friendship with many members of the *Samaj*, and gave unhesitating obedience to the requisitions of the different offices he had held for a period of six years in the *Samaj*. He had been a missionary, then was made Secretary, and finally created Minister, in all of which capacities he had faithfully discharged his duties, and had nought to complain of. As a missionary, he had preached the doctrines of the *Samaj* ; as a Secretary, the management of the *Samaj* was in his hands ; as a minister, the devotional services of the Church were under his control.

44. Difference in Views regarding the *Poita* Or the Sacred Thread.

The wearing of the *poita* was in vogue when Keshub Chunder first joined the *Samaj*, and, during the many years he was connected with the *Samaj*, he did not object to divine service being conducted by thread-wearing Brahmas ; but when it was suddenly discovered that such a state of things was incompatible with a true and pure worship of God, arguments were not wanting to explain this change of opinion.

It was adduced that since the chief minister of the *Samaj*, Devendranath Thakur, had renounced the *poita*, it clearly showed that he was not prepared to tolerate its retention by his followers. This argument, however, does not hold good. Devendranath was not willing to make the throwing away of the *poita* a condition of Brahmaship, as he reckons the renunciation of idolatry only as an essential point for that purpose, and not that of social usages, and is of opinion that as the *poita* could be put on in an unidolatrous manner, it was merely a mark of distinction of caste. It is urged by Keshub and his party that

the relinquishing of the *poita* was essential to testify their renunciation of idolatry and Hinduism. But, if this really was the case, why has not the renunciation of the *poita* been universal among the ministers of the *Samaj of India, and all its branches in the mofussil?* Besides, that Keshub Chunder himself tolerates idolatrous rites is evident from the manner in which he married his daughter to the Maharaja of Kuch Behar, of which more anon.

Hindus of the most advanced opinions and education declare that it is an absolute impossibility for a Brahman to remove this insignia of caste from off his shoulders, so long as he is desirous of remaining with his own family, and retaining his nationality. It does not, however, come within the province of this book to discuss the absolute necessity for a Brahman to wear the sacred thread, as long as he wishes to continue a Hindu, or the needlessness of his renouncing it on embracing Brahmaism. Suffice it, however, to recall this fact that the founder of the modern Brahma religion, Raja Ram Mohun Roy, though he himself renounced all caste perjudices by going to England, still retained his sacred thread to his last moments, and went with it to the grave.

The *poita* question was really the excuse instead of the cause of the schism. Keshub's argument about the *poita* question comes to this :—that headless Brahmas were to be made ministers. Now Keshub Chunder well knew that some of his party were the only threadless Brahmas in the *Samaj*, cosequently his men were sure to succeed to the ministership of the *Samaj*.

45. Devendranath's effort at compromise—the real cause of the rupture.

As stated before, Devendranath Thakur had at first acquiesced in the demand made by Keshub Chunder to replace the *poita*-wearing Brahma ministers at the *Samaj* by the ministers who had ceased wearing the *poita*. But the old *poita*-wearing Brahmas were soon replaced, and allowed to act along with the non*poita*-wearing Brahmas. Devendranath hereby tried to harmonise the conservative and the progressive elements of the *Samaj*. This measure, together with the dismissal of Keshub from the secretaryship of the *Samaj*, were really the causes of the rupture.

46. The Civil Marriage Act of 1872 (A.D.)

To return to our narrative. A short time after the meeting at which it was determined to establish a separate *Samaj*, entitled the "*Samaj of India,*" Keshub Chunder, with some of his disciples, proceeded to Simla on a visit to Lord Lawrence, then Viceroy of India, by whom they were received with great kindness and entertained for several months. While on this visit Keshub Chunder took the opportunity of suggesting to His Lordship the necessity of promulgating an Act to legalize Brahma marriages. This Act was finally passed by the Legislative Council in 1872, much to the joy of Keshub and his party.

Although the *Samaj of India* was a *fait accompli*, as yet no church had been erected in which divine service could be held. To obviate this drawback Keshub held divine service in his own house at Kolutola till the church called the Brahma Mandir was built. At the same time Keshub and most of his followers attended every Wednesday the service of the *Adi-Brahma Samaj*. Devendranath Thakur, who then conducted divine service himself, instructed them in all the spiritual knowledge he had acquired by a long course of devotional practice. He also sometimes called at Keshub's house and taught him the best modes of divine communion and divine worship.

জীবে দয়া।

(জনৈক শিক্ষক)

ইহা বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই যে, পৃথিবীতে মানুষের ন্যায় জীবজন্তুরও একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে, জগতের বিভিন্ন অংশে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়, তেমনি জগতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জীবজন্তুরও অস্তিত্ব দেখা যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ভগবানের মঙ্গল বিধানে জগতে মানুষ

থাকারও যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি জীবজন্তু থাকাও দরকার।

এখন আমাদের মনে সহজেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জগতে জীবজন্তুর কি প্রয়োজন? আমরা অবশ্য দেখিতে পাই যে, মানুষ জগতের নানাবিধ উন্নতিজনক কর্ম্মসাধনে নিরত। তাহারই ফলে আমরা দেখি যে, আদিম মানবের সমকালীন সমাজের অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতেছি যে, জগতের উন্নতিসাধনের জন্যই বোধ হয় মানুষের অস্তিত্ব ও পরিপুষ্টি দরকার। কিন্তু এই উন্নতিসাধনে জীবজন্তুর প্রয়োজন আছে কি না? সেই পুরাতন কাল—মানবের আদিমতম কাল অবধি বহুকাল যাবৎ মানবের একটি সংস্কার এই ছিল যে, কেবল মানবেরই ব্যবহার ও উদরপরিতৃপ্তির জন্যই বিধাতা কর্ত্তৃক জীবজন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভাবের উক্তি আমরা বাইবেলের পুরাতন বিধানেও দেখিতে পাই।

কিন্তু ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পাই যে, মানবজন্মের বহু সহস্র লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও জীবজন্তু সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তাহাদের অধিকাংশই মানবের কোন প্রয়োজনসাধনে আসে নাই এবং আসিবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না।

সেই সকল জীবজন্তুর বিষয় যখন আমরা পাঠ করি, তখন আমরা অবাক হইয়া যাই এবং স্তম্ভিতহৃদয়ে তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করি। তাহারা কত আশ্চর্য্য কৌশলে তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত, তাহাদের শাবকগণকে কিরূপ প্রগাঢ়রূপে ভাল বাসিত, তাহাদের শরীর কিরূপ দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ছিল। এই সকল ভাবিলে মস্তক স্বতই বিধাতার চরণে নত হইয়া পড়ে।

যাহাই হউক, এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যেগুলিকে আজ বহু শতাব্দী ধরিয়া মানুষ নিজের ব্যবহারে লাগাইতেছে। সেই সকল জন্তুর মধ্যে ঘোড়া, গরু, বল্গাহরিণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যেগুলি মানুষের অত্যন্ত প্রিয়পাত্ররূপে গণ্য হয়। বিড়াল, কুকুর, বানর প্রভৃতি অনেকগুলি গৃহপালিত জন্তু ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। আবার এমনও কতকগুলি জীবজন্তু আছে, যেগুলির মাংস খাইয়া মানুষ স্বীয় উদর পূর্ত্তি করে। বিভিন্নজাতীয় মৎস্য, ছাগল, ভেড়া, মুর্গী, হাঁস প্রভৃতি জীবগুলি এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইহা সত্ত্বেও আমরা বলিব যে, জীবজন্তুর প্রতি ন্যায়ব্যবহার ও সদয় দৃষ্টি মানুষের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। মানুষের বেলায় আমরা খুবই জোরের সঙ্গে বলি যে, পরস্পরের প্রতি ন্যায়বিচার কর্ত্তব্য এবং ন্যায়ব্যবহার পাইবার অধিকার প্রত্যেক মানবেরই আছে। আমাদের পিতামাতা, অভিভাবক বা শিক্ষাগুরু আমাদের প্রতি যতটুকু দেওয়া উচিত ততটুকু মনোযোগ যদি না দেন, তবে আমরা অন্তরে বড়ই ব্যথা পাই। কেবল এই প্রকার ন্যায়ব্যবহার কেন, আমরা তাঁহাদের নিকটে সদয় হৃদয়ের সহানুভূতিও প্রত্যাশা করি। যখন কোনও বালক রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে, তখন সে পিতামাতার নিকটে একটুখানি সহানুভূতি পাইবার জন্য কত না উৎসুকনেত্রে চাহিয়া থাকে। সেই প্রকার যখন সে কোন কারণে আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তখনও সে পিতামাতার নিকটে একটুখানি বাহবা, একটুখানি প্রশংসা পাইবার জন্য কত না লালায়িত হয়। ইহা দেখা যায় যে, জীবজন্তুরাও মানুষের নিকট ঠিক এই রকম ন্যায়ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রত্যাশা করে। সুপ্রসিদ্ধ আফ্রিকাপর্য্যটক ডাঃ লিভিংষ্টোনের ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সিংহের পদতলে একটা বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল। সে সেই ক্ষতে ঔষধ লাগাইবার জন্য লিভিংষ্টোনের করুণদৃষ্টিপ্রার্থী হইয়াছিল।

অনেক বালক জীবজন্তু বিশেষতঃ পাখী ধরিতে বড়ই আনন্দ পায়। তাহাদিগকে নিজ নিজ শাবকাদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা খুবই অকর্ত্তব্য। একবার আমি এক স্থানে ভ্রমণে গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে এক শিকারী ছিল। মাঠে দেখি অনেকগুলি সারসজাতীয় "গেঁদালা" নামক এক শ্রেণীর পক্ষী আহারের সন্ধানে বসিয়াছিল। শিকারী বলিল "হুকুম যদি দেন তবে একটী গেঁদালা মারি—ইহার মাংস অতি সুমিষ্ট"। আমার মনশ্চক্ষে তখনই এই ছবি আসিল যে, গেঁদালাটী মারা পড়িবে, তাহার অনেকগুলি শাবক হয় তো আহার পাইবার জন্য উহার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিবে এবং ঐ পক্ষীটী ফিরিয়া না গেলে শাবকগুলি আহারের অভাবে মৃত্যুমুখে পড়িবে। আমি কিছুতেই গেঁদালা মারিবার আদেশ দিলাম না। এইরূপ কোন জীবজন্তুর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিবার সময় আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাহাদেরও শরীরে আঘাত লাগিলে তাহারাও মর্ম্মবেদনা পায়। যদি কখনও আমরা কোন জীবজন্তু পুষি তবে ইহা জানা কথা যে, তাহাদিগকে অকারণ কষ্ট না দিয়া অন্নজল প্রভৃতির দ্বারা সযত্নে তাহাদিগকে লালনপালন করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য পালন হয়। ভারতের ঋষিমুনিরা সকল জীবজন্তুর মধ্যে প্রাণ ও মনে সমধর্ম্মিত্ব অনুভব

করিয়া জীবে দয়া ও অহিংসাকেই পরম ধর্মরূপে প্রচার করিয়াছেন।

গৃহপালিত জীবজন্তুদিগকে পোষণ করিতে গেলে সহজ অবস্থায় তাহাদের আহারবিহার কিরূপ, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহারা ছাড়া-অবস্থায় যে ভাবে থাকিতে ভালবাসে, প্রথম প্রথম তাহাদিগকে সেইভাবে রাখা এবং তাহাদের সহিত সেইভাবে ব্যবহার করা উচিত। আমাদের দেখা উচিত, যেন আমাদের ব্যবহারে তাহারা অকারণ কিছুমাত্র কষ্ট না পায়। কোন বালককে বালিকার উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরাইলে অথবা পুতুলের উপযুক্ত ছাতা তাহার হাতে দিয়া রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে বলিলে তাহার যেমন বিষম অস্বস্তি হয়, পশুপক্ষীদিগকেও তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ জীবনযাত্রা হইতে কৃত্রিম আবেষ্টনে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাদেরও সেইরূপ বিষম অস্বস্তি হয়। এই কারণে যতদূর সম্ভব তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রাকৃতিক অবস্থার অনুরূপ করিয়া তাহারই মধ্যে তাহাদিগকে পোষণ করা কর্ত্তব্য। জীবজন্তু পুষিবার সময় আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সকল জীবজন্তুই গোড়ায় বন্য ছিল; কোন জীবজন্তুই গৃহপালিত ছিল না। অনেক জীবজন্তুর উষ্ণপ্রধান দেশের বনজঙ্গলে এবং অনেক জীবজন্তুর শীতপ্রধান দেশে জন্ম হয়। ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া চিড়িয়াখানা বা পশুশালার রক্ষকগণ বিভিন্ন দেশের জীবজন্তুর জন্য বিভিন্নপ্রকার ব্যবস্থা করেন; শীতপ্রধান ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের জন্তুদিগের জন্য বরফ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন এবং উষ্ণপ্রধান দেশে জাত জন্তুদিগকে শীতপ্রধান দেশে লইয়া গেলে তাহাদের জন্য "গরম ঘর" (hot house) প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কুকুরের বিষয় ধরা যাক্—কুকুর নেকড়ে বাঘ বা তরক্ষুজাতীয় একপ্রকার প্রাণী হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সকলেই জানে নেকড়ে বাঘ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে ভালবাসে। সেই সকল আদিম নেকড়েবাঘ খাদ্যের সন্ধানে দলবদ্ধ হইয়া বহুক্রোশ চলিয়া যাইত। বর্ত্তমানকালের নেকড়ে বাঘও এইরূপই করিয়া থাকে। জীবতত্ত্ব পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই কারণেই কুকুর সমাজপ্রিয়, একলা থাকিতে ভালবাসে না। তাহাদিগকে ভাল রাখিতে গেলে ছুটাছুটি করিবার ও নানাবিধ উপায়ে অঙ্গচালনার যথেষ্ট অবসর দিতে হইবে। এই বিষয়টী উপলব্ধি করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কুকুরকে শিকলে বাঁধিয়া এককোণে অনেকক্ষণ ফেলিয়া রাখিলে তাহার প্রতি কতদূর অন্যায় ও অবিচার করা হয়। যদি বা কোন কুকুরকে এইরূপে বাঁধিয়া রাখা নিতান্ত দরকার হয়, তবু অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে সে দুদণ্ড হাত-পা ছড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে পারে এবং চেঁচামেচি করিয়া খোলাপ্রাণে ডাকিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। কুকুর প্রভৃতিকে বাঁধিয়া রাখিবার সময় আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যদি আমাদিগকে কেহ অন্ধকার কারাগারে পুরিয়া রাখে—নিকটে কথা কহিবার মত কোন লোকজন নাই, কাছে আহার জল প্রভৃতি কিছুই নাই, করিবার উপযুক্ত কোন কর্ম্ম নাই, তবে আমাদের মনের ভাব কিরূপ বিশ্রী হয় এবং শরীরের অবস্থা কিরূপ সঙ্গীন হয়—সর্ব্বদাই দেহের আড়ষ্ট ভাব দূর করিবার জন্য গা-হাত-পা ছড়াইবার কিরূপ চেষ্টা হয়; আমরা কিরূপ খিটখিটে হই এবং আমাদের হৃদয়ে বিপ্লবাত্মক ভাব কিরূপ ঘনাইয়া আসে।

অনেকে খরগোস পুষিতে ও পাখী পুষিতে ভালবাসেন। ইঁহারা এই সকল পশুপক্ষীদিগকে ছোট ছোট খাঁচার ভিতরে ভরিয়া রাখেন। ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ছাড়া-অবস্থায় খরগোস পক্ষী প্রভৃতি পশুপক্ষীগণ আনন্দ-উৎফুল্লপ্রাণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলাধুলা করিতে কিরূপ ভালবাসে। খরগোসেরা কাঁচা কচি অনেক রকম শাকসবজী খাইতে বড় ভালবাসে। পাখীরাও তেমনি মাঠে গিয়া কচি কচি ধান ছোলা প্রভৃতি শস্য খাইতে খুবই ভালবাসে। এই সমস্ত আমুদে জীবজন্তুদিগকে খাঁচার ভিতর জোর করিয়া বন্ধ করিয়া রাখা এবং তাহাদের সম্মুখে আহার্য্যের নামে কতকটা শস্যাদি ধরিয়া দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত বলা যায় না। আমাদিগকে যদি একটা আলমারিতে বন্ধ রাখিয়া কিছুদিনের উপযুক্ত খাদ্য সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়, তখন আমাদের মনের অবস্থা কি রকম হইবে?

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অন্নবস্ত্র প্রভৃতির জন্য আমরা যেমন পিতামাতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকি, আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুসকলও সেইরূপ আমাদেরই উপর তাহাদের অন্নজল প্রভৃতির জন্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জীবজন্তুগণ প্রতিদিনই তাজা জলের অভাব অনুভব করে। আমাদিগকে যে দিন মলিন পাত্রে টকো দুধ দেওয়া হয়, কিংবা শুকনো ধুলাকাদায় ভরা ও মাছি-বসা খাবার দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের মনের অবস্থা যে রকম হয়, মলিন পাত্রে কাদাঘোলা জল দিলে বা বাসী খাবার

দিলে তাহাদেরও মনের অবস্থা কতকটা সেই রকম হয় —আমরাও দেখিয়াছি যে তাহারা এই রকম খাবার অনেক সময় ফেলিয়া দেয় এবং এই প্রকার জল স্পর্শও করে না।

অনেকেই জানে যে ঘোড়াকে সদয় ব্যবহারে কি রকম বশীভূত করা যায়। বালকেরা তাহাদের পাঠ্য অনেক গ্রন্থে আরব্য ঘোড়ার কথা পড়িয়াছে নিঃসন্দেহ। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এক সৈনিককে তাহার আরবা ঘোড়া কিরূপে মুখে ধরিয়া স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, ঘোটক-বিষয়ক প্রায় সকল গ্রন্থেই ইহা উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। ঘোড়ার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে উহা কিরূপ বিগড়াইয়া যায় এবং কোন প্রকার শাসন মানিতে চাহে না, তাহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার অশ্বপালকদিগের নিষ্ঠুর হৃদয়ের পরিচয় মাত্র। অনেক ছেলে ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসে বটে কিন্তু ঠিকমত চালাইতে না জানিয়া লাগাম বড়ই জোরে টানিয়া ধরে এবং তাহার ফলে ঘোড়া না চলিলে অন্যায়রূপে তাহার পৃষ্ঠে বড়ই বেশী চাবুক মারিতে থাকে। বালকদিগকে এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহারের অনিষ্টকারিতা ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া প্রত্যেক অভি-ভাবকের কর্ত্তব্য। কেবল মানুষ নহে, সকল জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে তাহারাও যে সহজে বশীভূত হয় এবং তাহাদের নিকটে অনেক কাজ সহজে পাওয়া যায়, এ বিষয় বালকদিগের মনে শিক্ষাগুরুদের ভালরূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে একটি চলিত প্রবাদ আছে যে, অহিংসাযোগে সিদ্ধ যোগীমুনিগণের নিকট হিংস্র ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণও স্বীয় হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বশীভূত হইয়া থাকে। ঘোড়া সদয় ব্যবহার কিরূপ বুঝিতে পারে এক ইংরাজ লেখক তাঁহার গ্রন্থে তাহার একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া-ছেন। একটি ঘোড়াকে এক পাহাড়ের উপর বোঝাই-পূর্ণ একটী গাড়ী টানিতে দেওয়া হইয়াছিল। ঘোড়াটী কিছুদূর গিয়া আর টানিতে না পারায় থামিয়া গেল। এই ঘোড়ার মনিব ঘোড়াটীকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি ঘোড়াটীর পিঠ চাপড়াইয়া এবং তাহাকে অনেক আদরের কথা বলিয়া সেই পাহাড়ের উপরে উঠিবার জন্য আর একটিবার চেষ্টা করিতে বলিলেন। ঐ ঘোড়াটী মনিবের কথাগুলি যেন বেশ বুঝিতে পারিল। তখন সে তাহার সমস্ত বল দিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সেই বোঝাই গাড়ী পাহাড়ের শিখরদেশে টানিয়া উঠাইল এবং তাহার ফলে সে প্রাণত্যাগ করিল। বলা বাহুল্য, মনিব তখন অন্তরে ঘোড়াকে স্বহস্তে হত্যা করিবার বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

পশুপক্ষী পুষিতে গেলে যতদূর সম্ভব তাহাদের ভাষা ও মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। তাহাদের মনের ভাব, তাহাদের দুঃখ ও সুখ, হর্ষ ও বিষাদ বুঝিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা বাল্যকাল অবধি শিখিয়া আসিয়াছি যে পশু-পক্ষীরা "বোবা"—কারণ তাহারা মানুষের মত কথা বলিতে পারে না; কিন্তু একথা ঠিক নয়, তাহাদের ভাষা আছে এবং তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে। আমরা তাহাদের মনের ভাব ও ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করি না বলিয়াই আমরা উহা বুঝিতে পারি না। আমরা বাল্যকালে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, এক ইংরাজপর্য্যটক একটী লৌহপিঞ্জর নির্ম্মাণ করিয়া আফ্রিকার এক ভীষণ জঙ্গলে উহা লইয়া গিয়া নানাবিধ পশুপক্ষীর ভাষা বুঝিবার জন্য আপনি উহার মধ্যে কয়েকমাস বাস করিয়াছিলেন। পশুপক্ষীর ভাষা ও ভাব বুঝিতে গেলে এইরূপ সহৃদয়ভাবে ও ধৈর্য্য সহকারে ঐ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহারা তাহাদের মনের ভাব বুঝাইবার জন্য কত বিভিন্নভাবে চীৎকার করে এবং মাথা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কত রকমে সঞ্চালিত করে, তাহা বলা যায় না। আমরা সে সকলের দিকে একটুও মনযোগ দিই না, সুতরাং তাহদের মনের ভাবও বুঝিতে পারি না।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এক সাধু পুরুষ সেন্ট ফ্রান্সিস যে অরণ্যে বাস করিতেন, সেই অরণ্যের পশুপক্ষী-দিগকে তাঁহার "ভাইভগ্নী" বলিয়া অভিহিত করিতেন। কথিত আছে, বনের পক্ষীরা তাঁহার নিকট বসিয়া নানাবিধ গান গাহিত। জীবজন্তুদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে খুবই শীঘ্র তাহারা উহা বুঝিতে পারে। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ পশুপক্ষী-দিগের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রকাশ করিবার ফলে কাঠ-বিড়াল প্রভৃতি জন্তু ও চড়াই প্রভৃতি পক্ষীগণ নির্ভয়ে তাঁহার দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করিত এবং তিনি উহাতে বড়ই আনন্দ পাইতেন। সেদিন শুনিলাম যে বিহারদেশীয় এক সুপ্রসিদ্ধ জমীদার এক সাধু পুরুষের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সাধু তাঁহাকে অন্যান্য উপ-দেশের মধ্যে এই উপদেশ বিশেষভাবে দিয়াছিলেন যে, তিনি যতদিন অহিংসাভাব হৃদয়ে পোষণ করিবেন, ততদিন তিনি শত শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে প্রবেশ করিলেও ব্যাঘ্রাদি কোন হিংস্র জন্তু তাঁহাকে মুহুর্ত্তের জন্যও স্পর্শ করিবে না। এই গল্পটী সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু যে সন্ন্যাসীপুরুষের নিকট ইহা

শুনিয়াছিলাম, যিনি আমাকে উক্ত গুহা ও [illegible] এবং সম্মুখে একটী সুবৃহৎ ব্যাঘ্র উপবিষ্ট এই প্রকার একটী ফটোচিত্র আমাকে দেখাইয়াছিলেন। অহিংসার ফলে সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি অতীব ক্রূর ও হিংস্রক জন্তুদিগকে বশীভূত করিবার অনেক গল্প ও কথা আমাদের দেশে, বিশেষত সাধুসন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে ইহা জানা কথা। আমাদের যোগশাস্ত্রে অহিংসা দ্বারা হিংসা জয় করা সত্য বলিয়া কথিত আছে।

শিবিরপ্রত্যাগতদিগের জন্য প্রার্থনা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন শ্রেণীর বঙ্গসেনা গঠিত হইয়াছিল। তাহাদিগের অনেকগুলি বিদেশে গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতকৃত্যতা দেখাইয়া আসিয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই সকল সেনামণ্ডলীর অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছে। যেগুলি অবশিষ্ট আছে, তাহাদিগকে সময়ে সময়ে নগরের বাহিরে গিয়া শিবিরবাসী হইয়া কুচ্‌কাওয়াজ করিতে হয়। ইংরাজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে এইরূপ শিবিরবাসী সেনামণ্ডলী, শিবির হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাহাদিগের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার একটী সুমঙ্গল রীতি প্রচলিত দেখা যায়। সেই রীতি অনুসরণ করিয়া আমাদিগের দেশবাসী শিবিরপ্রত্যাগত সেনামণ্ডলীদিগের জন্য একটি প্রার্থনার আদর্শ নিম্নে দিলাম]।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! আমাদের যে সকল বন্ধুবান্ধব দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য সেনামণ্ডলীভুক্ত হইয়া কুচ্‌-কাওয়াজের জন্য বিদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তুমি নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে আমাদিগের মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছ, এইজন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতাভরে বার বার নমস্কার করি।

মুক্ত গগনের চন্দ্রাতপের নিম্নে শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথসমূহে ইহাঁদিগকে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতে হইত; গভীর নিশীথে একমাত্র চন্দ্রমার স্নিগ্ধজ্যোতিই দীপস্বরূপ হইয়া ইহাঁদিগকে পথপ্রদর্শনে সহায়তা করিত। ইহাঁরা আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া সুদূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; সেখানে তুমিই রক্ষক হইয়া ইহাঁদিগকে নানাপ্রকার বিপদাপত্তি হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছ। তোমারই প্রসাদে ইহাঁরা সেই অজানা স্থানেও অন্ন-জলের সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রভাতে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে যখন ইহাঁদিগকে জাগ্রত করিবার জন্য ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত এবং শিঙ্গাসকল নিনাদিত হইত, তখন ইহাঁরা ত্বরিতবেগে শয্যাত্যাগ করিয়া নানাবিধ ব্যায়ামের সাহায্যে শরীরের দৃঢ়তা সাধন করিতেন; তৎপরে ইহাঁরা সমস্ত দিবস ধরিয়া কুচ্‌-কাওয়াজের পর আকাশে সন্ধ্যাতারা প্রকাশ পাইলে শিবিরে ফিরিয়া আসিতেন। এই সকল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ইহাঁরা যে অক্ষতশরীরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তোমার চরণে কৃতজ্ঞতানিবেদনের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। ইহাঁদের অন্তর হইতে দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কুভাব উৎপাটিত করিয়া দাও। ইহাঁদিগকে দেশের কল্যাণকামনায় পরিপুষ্ট কর এবং দয়া মৈত্রী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাধুভাবে পরিবর্দ্ধিত কর। ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-কলহ যেন স্থান না পায়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত ইহাঁদিগের সখ্যবন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দাও।

তুমি যে ইহাঁদের এবং আমাদের সকলের মধ্যে সাধুবৃত্তিসকল অর্জ্জনের উপায়স্বরূপে বুদ্ধি ও বল, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছ, তজ্জন্য আমরা তোমাকে ভক্তিভরে বারবার নমস্কার করি।

হে ভগবান! আমরা তোমার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যাঁহারা দেশের আহ্বানে শিক্ষাশিবিরে বা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যেখানেই যান না কেন, তাঁহাদের যেন উপযুক্ত আহারের এবং সুস্বাদু জলের অভাব না হয়, দেহের উপর অস্ত্রাঘাত হইলে তাঁহাদের চিকিৎসায় যেন ত্রুটী না হয়। তুমি তাঁহাদের রক্ষক হইয়া তাঁহাদিগকে সকল বিপদ আপদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও। তাঁহাদের উপর তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিও; যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের জীবন, কি বাহিরে কি গৃহে এমনভাবে পরিচালিত করেন যে, তাঁহাদের সেই জীবন দেখিয়া উত্তরবর্ত্তী লোকেরা গৌরব সহকারে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারেন। দেশরক্ষাব্রতে ব্রতী হইয়া, আমরা যেন সকল অবস্থাতেই ও সকল সময়েই, কি জীবনে, কি মরণে, তোমারই প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হই।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।

(স্বামী সদানন্দ)

ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুদ্দীপ্ত করিতে হইলে সকল শাখায় সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। যখন ব্রাহ্মসমাজ নবীন উদ্যমে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল, সে সময়ে দেশে ধর্ম্মের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। নানাপ্রকার সংকীর্ণতা, কুসংস্কারাদি আসিয়া দেশের ধর্ম্মজীবনকে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আজ ভারতের সকল ধর্ম্মসমাজ মধ্যেই এক নবযুগের অভ্যুত্থান হইয়াছে। সকল ধর্ম্মসমাজই আপন আপন ধর্ম্ম হইতে কুপ্রথা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা প্রভৃতি বহিষ্কৃত করিয়া সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নবযুগের আলোকে সকল সম্প্রদায়ই অল্লাধিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এখন আমাদিগকে পূর্ব্বকার কার্য্য-প্রণালীরও সময়োচিত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছে।

একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, আমাদের মধ্যে দলাদলি এবং গোঁড়ামিই ব্রাহ্মসমাজের মহা অনিষ্ট করিয়াছে। এই দলাদলির ভাব যতদিন না দূরীভূত হইবে, ততদিন সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না; বরং দিন দিন এই কঠিন ব্যাধি যক্ষ্মারোগের ন্যায় সমাজকে ক্ষীণ, মলিন ও হীনপ্রভ করিয়া ফেলিবে। তাহার পর যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিবে।

ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষীগণের মধ্যে অনেকেই ইহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এখনও এই বিষম ব্যাধির চিকিৎসার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত হইতেছে না। ইহার নেতাগণ অভ্যাসের দাসত্ব বশতঃ এই দলাদলির প্রভাব এখনও অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। এই দলাদলির ভাব যে কতদূর তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। নেতাগণের এই অবস্থা দেখিয়া মফঃস্বলের অনেক ব্রাহ্ম মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকল উদ্যম, সকল উৎসাহ নিরাশার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। অনেক কর্ম্মবীর বিশেষতঃ উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক ক্ষুব্ধ ও নিস্তেজ হইয়া নীরবে মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে, যতদিন এই সকল সঙ্কীর্ণহৃদয় নেতাগণ বিদ্যমান থাকিবেন, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেকে আদিব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া আপনাদিগের দোষক্ষালনে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আদিসমাজ যে অভাবনীয় উদারতা দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সমবেত ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি কার্য্যে আদিসমাজের নীরব হস্ত প্রসারিত ছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। যে যে মুখ্য কারণ দর্শাইয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি স্বতন্ত্র সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রায় সকলগুলিই এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। তথাপি এখনও যে আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অন্যান্য শাখার নেতাগণের মতের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। তার পর যে কোন কারণেই হউক না কেন, নববিধানসমাজ ও সাধারণব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, তাহা এখনও অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। গত শতবার্ষিক উৎসবের সময় ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের পুনরুত্থানের চেষ্টা যে বাধাসঙ্কুল হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

প্রকৃতপক্ষে এখনও তিনটি সমাজ যেন তিনটি পৃথক্ জাতিতে পরিণত রহিয়াছে। ইহার ভবিষ্যৎ ফল যে কি হইবে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক হিতৈষীরই চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। সমাজের আভ্যন্তরীণ কার্য্য-প্রণালীতে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সেজন্য দলাদলির ভাব পোষণ করা যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। দলাদলির আবরণ পরিয়া আমরা না হয় কোনক্রমে আমাদের জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব; কিন্তু এই ভাব স্থায়ী হইতে দিলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অবস্থা যে কি হইবে, তাহা ভাবিবার কি এখনও সময় আসে নাই?

আমি এই একটী প্রস্তাব করিতেছি যে, তিন সমাজের বিশিষ্ট সভ্যগণকে লইয়া একটী সঙ্ঘ গঠিত করা হউক। এই সঙ্ঘের দ্বারা সকল সমাজের মধ্যে মৈত্রীভাব আনয়ন করিয়া যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ নবজীবন লাভ করে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে কিছু চেষ্টাও করা হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, তিন সমাজের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন হইলে সমবেত কার্য্য করিবার পথ পরিষ্কার হইতে পারে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, তিন সমাজের মধ্যে আচার্য্যের অদল-বদল করা। আদিব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য সমাজের আচার্য্যদিগকে বেদীগ্রহণে আহ্বান করিয়া এবিষয়ে পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। আশা করি, এই মিলনের চেষ্টাকে সফল করিতে তিন সমাজ সমবেতভাবে সচেষ্ট হইবে।

আপনাপন সমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও যে এক-যোগে কার্য্য করিতে পারা যায়, তাহা খৃষ্টীয় সম্প্রদায় আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের মধ্যেও অনেক সম্প্রদায় আপনাপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও একযোগে কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে ব্রাহ্মসমাজ কেন পারিবে না?

অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, গত শতবার্ষিক উৎসবের সময় তিন সমাজের এই প্রকার মিলন সাধিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কয়েকজনের সহানুভূতির অভাবে সে আশা ফলবতী হয় নাই। সম্মিলিত উৎসবাদিতে একত্র মিলিত হইলেও অনেকের মন হইতে অমিলের ভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই।

যাহা হউক, এখন অবধি যাহাতে সকল সমাজের মধ্যে আন্তরিক মৈত্রীভাব আনয়ন করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে এসম্বন্ধে একটু বিশেষ চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, আমার এই অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

দেবমন্দিরে প্রবেশনিষেধ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিয়া আসিতেছি যে, ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্য বলিয়া অনেক জাতিকে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ইহার ন্যায় বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ উপস্থিত করিবার কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। মহাত্মা গান্ধি এই অস্পৃশ্যতা দূর করিবার চেষ্টায় মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাদের নমস্য। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিলাম, কটকজেলার অন্তর্গত জগৎসিংপুর থানার অধীনস্থ বাউনপুর গ্রামে কুম্ভকারদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া তথাকার দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তরে কুম্ভকারেরাও ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতিদিগকে তাহাদের প্রস্তুত হাঁড়ি প্রভৃতি বিক্রয় করিবে না বলিয়া সত্যাগ্রহ করিয়াছে। কবে এই পরস্পরবিদ্বেষের ভাব দূরীভূত হইবে, তাহা মঙ্গলময় বিধাতাই বলিতে পারেন। কিন্তু ইহা ঠিক কথা যে, এই প্রকার জাতিবিদ্বেষ দূরীভূত না হইলে আমরা যতই কেন স্বাধীনতা পাই না, দেশের সুশৃঙ্খলা ও শান্তি আনয়ন করা নিতান্তই দুরূহ হইবে।

কিরূপ সামান্য কারণে এই জাতিবিদ্বেষ ভীষণ-ভাব ধারণ করিতে পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত একবার আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। বনিতো নামক একটি গ্রাম জগন্নাথ-ক্ষেত্রের বিশ ক্রোশের অন্তর্ভুক্ত। তথায় পশ্চিমেশ্বর মহাদেব নামক একটি বহুদিনের পুরাতন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই পশ্চিমেশ্বর জগন্নাথদেবের অংশ বলিয়া পূজিত হন। উক্ত গ্রামে বাউরী নামক এক জাতিকে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় শূদ্রাধম বলিয়া ধরা হয়। বায়ুসঞ্চালিত বস্ত্র দ্বারা বা প্রত্যক্ষ দেহ-সংযোগে উহাদের সহিত উচ্চতর কোন জাতির সংস্পর্শ ঘটিলে সদ্য সদ্য জাতিচ্যুতি ঘটে। একবার তথায় দুই জ্ঞাতিভ্রাতার মধ্যে বিবাদ ঘটিয়াছিল। উভয়েই পরস্পরকে জব্দ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে এক-দিন এক ভারবাহক বাঁকে করিয়া এক ভ্রাতার জল লইয়া যাইতেছিল। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, অপর ভ্রাতার দলস্থ লোক রটাইয়া দিল যে, ঐ জলের কলসে এক বাউরীর বস্ত্রের খুঁট লাগায় ঐ জল অস্পৃশ্য হইয়াছিল। কিন্তু উহা ভ্রমক্রমে বিরোধীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হওয়ায় তাহার জাতিচ্যুতি ঘটিয়াছে। এইবার দলাদলি খুব পাকিয়া উঠিল। সমস্ত গ্রামটী দুই দলে বিভক্ত হইল। চাষ-আবাদ প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় কার্য্যই বন্ধ হইয়া রহিল। এই সংবাদ শুনিয়া আমি তথায় গিয়া পড়িলাম।

উক্ত গ্রামটী আমাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। আমি কয়েকজন কর্ম্মকুশল ও আমার মতসমর্থক কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া গেলাম। আমি করুণাদ্র হৃদয়ে পশ্চিমেশ্বর মহাদেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তারস্বরে "ওঁ পিতা নোঽসি" প্রভৃতি বেদমন্ত্রে ভগবানের অর্চনা করিয়া উভয় দলের নেতৃবৃন্দকে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই পশ্চিমেশ্বর মহাদেবের ক্ষেত্র জগন্নাথদেবের বিশ-ক্রোশী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত কিনা?"

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। জগন্নাথদেবের পুণ্যক্ষেত্রে জাতিভেদ মানা পাপ কিনা?

উত্তর। হাঁ, পাপ।

এইরূপ প্রশ্নোত্তরের পর তাহাদিগকে দলাদলি ভাঙ্গিবার অনুরোধ করিলে দলাদলি সহজেই ভাঙ্গিয়া গেল। অস্পৃশ্যতা কিরূপ শূন্যগর্ভ ভিত্তির উপর দণ্ডায়-মান, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি এই বিষয়টীর উল্লেখ করিলাম।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আর একটি কথা সর্ব্বদাই আমার মনে হয়। এদেশের চলতি কথা এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তার

মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উদর হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য ইহার শাস্ত্রোক্ত ভিত্তি আছে। শাস্ত্রীয় উক্তি পড়িলেই বুঝা যায় যে, উহা অক্ষরশঃ ধরিবার জন্য উক্ত হয় নাই। বলিতে গেলে চতুর্ব্বর্ণের কার্য্যবিভাগ অর্থাৎ কার্য্য-বিভাগের ফলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের যথাযুক্ত উৎপত্তি বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রে উহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই কারণে যে শূদ্রদিগের স্পৃষ্ট অন্ন অস্পৃশ্য ও অখাদ্য হইবে, এমন কথা কোথাও উক্ত হইয়াছে বলিয়া জানি না। গুণকর্ম্ম-বিভাগ অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য রক্ষা করিবার কথা যাহা ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা আমাদের মত সম্পূর্ণ সমর্থন করে। মনুসংহিতার একস্থানে শূদ্রদত্ত অন্ন সাধারণতঃ অখাদ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই শ্লোক যদি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও ধরা না যায়, তথাপি ইহা বলিলে কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবে না যে, সেই সময়ের অবস্থাবিবেচনায় মনুসংহিতা ঐ কথা বলিয়াছেন। সে সময়ে সম্ভবতঃ আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে বিষম বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। খাদ্যদ্রব্যে শূদ্র বা অনার্য্যগণ কে কখন্ অন্নে বিষ প্রদান প্রভৃতি নানা উপায়ে আর্য্য-গণের অনিষ্ট করে এই আশঙ্কায় যে-সে শূদ্রের হস্ত হইতে অন্নগ্রহণ নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শূদ্রদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) যাহারা আর্য্যদিগের অনুগত বা সৎশূদ্র, এবং (২) যাহারা অননুগত। এই অননুগত শূদ্রদিগের সম্বন্ধেই স্মৃতিগ্রন্থে নিষেধবিধি জারি করা হইয়াছে। যদি সকল শূদ্রই সত্য সত্য অনা-চরণীয় হইত, তবে কোন সময়েই—এমন কি, মৃত্যুসঙ্কটেও চণ্ডালের অন্নভক্ষণের বিধান মনুসংহিতার ন্যায় সর্ব্বমান্য স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত হইত না।

ভাবিয়া দেখিলে অস্পৃশ্যতার অসারতা সহজেই বুঝা যাইবে। ভগবানেরই চার অঙ্গ হইতে যদি চার বর্ণের উৎপত্তি হইয়াই থাকে, তবে কে কাহাকে অস্পৃশ্য বলিতে পারে? ভগবানের মুখও যেমন পবিত্র, তাঁহার বাহুও তেমনি পবিত্র; তাঁহার বাহুও যেমন পবিত্র, তাঁহার উদরও তেমনি পবিত্র; তাঁহার উদরও যেমন পবিত্র, তাঁহার পদও তেমনি পবিত্র। কাজেই জিজ্ঞাস্য এই যে, কাহার এমন অধিকার আছে যে, ভগবানের যে কোন অঙ্গ হইতে উৎপন্ন কোন জাতিকে অস্পৃশ্যবোধে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে? অধিকার না থাকিলেও ভারতবাসী এই পাপ করিয়া আসিতেছে বলিয়া ভারতের কিরূপ অবনতি ও সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই ছুঁৎমার্গ দেশ হইতে যত শীঘ্র বিতাড়িত হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

নিম্নজাতিসমূহকে অন্যান্য ব্যবহারস্থলে যদি বা অস্পৃশ্য ধরা যায়, তথাপি দেবতার মন্দিরে তাহাদিগের প্রবেশনিষেধ অপেক্ষা অন্যায়, অসঙ্গত ও দ্রোহাকর্ষক আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার ফলে ঐ সকল অস্পৃশ্য জাতিদিগের অন্তরে স্ব-স্ব সমাজ পরিত্যাগের কথা জাগিয়া উঠে এবং কাজেই তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমাজবন্ধনও শিথিল হইবার উপক্রম হয়। যতদিন ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িক ভাব দেশবাসীর মনে বদ্ধমূল থাকিবে, ততদিন এই ছুঁৎমার্গ বিদূরিত হওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার, সকল ধর্ম্মের যাহা সার, সেই সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক ভাব এবং তৎসঙ্গে ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি অনাচার-কদাচারসমূহও যে অচিরে অন্তর্হিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রন্থপরিচয়।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদ্ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

স্বাধীনতার পথ—শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রণীত। ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত বার্ট্রাণ্ড রাসেলএর Roads to Freedom গ্রন্থের সার সংকলন বলিয়া লেখক অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে আমরা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিতে পারি। বস্তুতঃ ইহা socialism তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সার বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাঁহারা বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিবিষয়ে আলোচনা করিতে-ছেন, তাঁহাদিগের ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। ইহাতে তাঁহারা জানিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় পাইবেন। গ্রন্থকার তাঁহার নিবেদনে সাম্যবাদের যে অর্থ করিয়াছেন 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ শক্তি-বিকাশে পূর্ণ অবসর ও সুযোগলাভ করিবে', এই অর্থের সহিত আমরা সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি; কিন্তু যে সাম্যবাদে 'মুড়ি-মিছরির দর এক করা হয়' অর্থাৎ উচ্চনীচভেদ সম্পূর্ণ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়, সে সাম্যবাদের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারি না। বোধ হয় "বিপ্লবী রুশিয়া"ও এই অর্থে সাম্যবাদের পক্ষপাতী নয়। কারণ সেখানেও দেখা যায় যে, শ্রমিকগণের উপযুক্ততা অনু-সারে বেতনাদির উচ্চনীচ হার নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে। আমরা গ্রন্থোক্ত মতের সহিত সম্পূর্ণ একমত না হইতে পারিলেও রাষ্ট্রনীতিতে নিমগ্ন দেশবাসী মাত্রকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিপ্লবী রুশিয়া—শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত ও শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র বর্দ্ধণ কর্ত্তৃক ১৯৩১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

আজ কয়েক বৎসর হইল শ্রীমান্ সৌম্যেন্দ্রনাথ শ্রমিকদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক প্রকার বলিতে গেলে আপনাকে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি সেই অবধি আজ কয়েক বৎসর যাবৎ জার্ম্মাণী এবং রুশিয়ার শ্রমিকগণের সহিত বাস করিয়া তথাকার বর্ত্তমান রাষ্ট্রপরিচালনার যে সকল তত্ত্ব সাক্ষাৎভাবে অবগত হইয়াছেন, তাহারই কয়েকটী আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থে তাঁহার দরিদ্র শ্রমিকদিগের প্রতি প্রীতি পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। গ্রন্থে পাঁচটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ঐ পাঁচটী বিষয় পড়িলে বর্ত্তমান রুষিয়ার ভিতরকার প্রকৃত ছবি চক্ষের সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। গ্রন্থকারের পরিপাটি লিখনভঙ্গী এই চিত্রাঙ্কনে খুবই সহায়তা করিয়াছে। বর্ত্তমান রুশিয়া সম্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ আমরা পাঠ করিয়াছি, তাহা হইতে আমরা এটুকু দেখি যে, তাহাদের অধিকাংশ রচয়িতাই ভারতের প্রাচীন সমাজগঠনের তত্ত্ব আলোচনা করিবার অভাবে দাসমনোভাবের জালে পড়িয়া নবতর সোভিয়েটবাদের চাক্‌চিক্যে আত্মসংবরণে অক্ষম হইতেছেন।

ভারতের অবিকৃত প্রাচীন সমাজগঠনে Capitalism ও Communism এই উভয়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। আমরা যতই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের কম্যুনিজম ও সোভিয়েটবাদ আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদের দৃঢ়প্রতীতি হইতেছে যে, ইহারা সকলেই পরিণামে দেশকালঅবস্থা অনুসারে যথাযুক্ত পরিবর্ত্তন সহকারে মানববৃত্তিসমূহের স্বাভাবিক সমন্বয়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতের ঐ প্রাচীন সমাজ গঠনধারার অভিমুখে অগ্রসর হইবে। মনুষ্যসমাজ যেমন কেবল ধনী, জ্ঞানী, প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে লইয়াই চলিতে পারে না, সেইরূপ কেবল শ্রমিক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে লইয়াও চলিতে পারে না। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও মঙ্গল। ভারতের কর্ম্মগত বর্ণাশ্রমের ভিতরেই এই সামঞ্জস্য সুন্দর পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে সোভিয়েট রাশিয়ার যে প্রকার শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা দেখিতেছি, বলিতে গেলে, তাহা কেন্দ্রীভূত আকারে গুরুগৃহে বাসমূলক ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে দৃষ্ট হইবে। যাঁহারা নবতর রুশিয়ার প্রকৃত ছবি দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং তাহার বর্ত্তমান রাতিনীতির সহিত ভারতের রীতিনীতির তুলনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রীমান্ সৌম্যেন্দ্রনাথের "বিপ্লবী রুশিয়া" এবং শ্রীযুক্ত নলিনী গুপ্ত মহাশয়ের "বলশেভিকী" এই দুইখানি গ্রন্থ মিলাইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "বিপ্লবী রুশিয়া"র শিক্ষারীতিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রুষিয়ার বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকাশ্যে অপরিণতবুদ্ধ ছাত্রগণের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেও বস্তুতঃ সমস্ত রুশিয়া জাতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিশ্বাসরোধপূর্ব্বক বধসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহার ফল কখনই ভাল হইতে পারে না। ইহার পরিণামে আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আর একটী ভীষণ বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

ব্রহ্মবিদ্যা—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী বিবৃত। প্রাপ্তিস্থান ৯বি, রামতনু বসু লেন।

গ্রন্থকার কঠোপনিষদের যম-নাচিকেতসংবাদকে সোঽহংবাদের ভিতর দিয়া দৃষ্টি করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রয়াস নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। গ্রন্থের ভিতর তর্কসাপেক্ষ অনেক বিষয় এবং সংস্কৃত ঔপনিষদ মন্ত্রের অধিক প্রক্ষেপ না থাকিলে গ্রন্থখানি অধিকতর সুখপাঠ্য হইত বলিয়া মনে হয়। যাই হউক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের এই গ্রন্থ যে বিশেষ সহায়তা করিবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

ভারতের সাম্যবাদ—শ্রীসতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান খাদি প্রতিষ্ঠান। ১৫, কলেজ স্কোয়ার।

এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়া দুঃখে অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। গ্রন্থকার এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝা যায় গ্রন্থকার কার্য্যে ও ব্যবহারে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ নীতির একান্ত অনুবর্ত্তী। তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মমূলক সমাজনীতির ভিতর দিয়া কৃষি ও চরকারূপ দুই যন্ত্রের সাহায্যে সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রনীতিতে পৌঁছিতে চাহেন। বর্ণাশ্রমকে তিনি জাতিগত করিতে চাহেন বা গীতোক্তভাবে গুণকর্ম্মবিভাগজনিত করিতে ইচ্ছা করেন? সাম্যবাদ অর্থে তিনি ঠিক কিরূপ নীতি প্রচার করিতে চাহেন, গ্রন্থে তাহার সামান্য আভাস পাইলেও তাহার সম্পূর্ণ অবয়ব আমরা ঠিক ধরিতে পারিলাম না; এই দুইটী বিষয় তিনি আর একটু বিষদভাবে বুঝাইলে ভাল হয়। আমাদের বিবেচনায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে জাতিগত গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখিলে বর্ত্তমান যুগে ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য

করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কিম্বা জাতি নিজের আসন কিছুতেই অটুট রাখিতে পারিবে না। সাধারণতঃ কোন জাতীয় ব্যবসায় বংশানুক্রমে নামিয়া আসিলে তাহার উৎকর্ষসাধন অধিকতর সম্ভব বটে; কিন্তু যদি সেই বংশের কোন ব্যক্তির অন্য কোন কর্ম্মে মাথা খুলিয়া যায়, তবে তাহাকে জাতিগত বর্ণধর্ম্মের কারণে বলপূর্ব্বক তাহার বংশগত ব্যবসায়ে ধরিয়া রাখা বোধ হয় কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। গ্রন্থকার গীতোক্ত স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আমরা তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। মোটামুটি বলিতে গেলে আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমতে বলিতে পারি যে, ভারতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপর (অবশ্য গুণকর্ম্মবিভাগজ হইলে) যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত, সেই সাম্যবাদ যে কোন দেশ, যে কোন জাতি অবলম্বন করিবে, সেই দেশ ও সেই জাতির মধ্যেই শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কৃষি ও চরকার ন্যায় ভারতে স্বাবলম্বন আনিবার শ্রেষ্ঠতর পন্থা যে দ্বিতীয় নাই, এবিষয়েও আমাদের মতদ্বৈধ নাই। ক্ষি. না. ঠা.

রামপ্রসাদ—ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান চাতরা শ্রীরামপুর। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভক্ত রামপ্রসাদ-চরিত্র বাঙ্গালীর পরম শ্রদ্ধার বস্তু। তাঁহার জীবনকথা লইয়া এই নাটকখানি রচিত। নাটকের অনেকস্থান গিরিশচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ভক্তিরসের প্রাচুর্য্যে রচনা স্থানে স্থানে বেশ সরস ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। কিছু কিছু ছন্দপতন আছে। এই নাটকের রামপ্রসাদ ও ভজহরি পরজন্মে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, এই অভিনব সংবাদটী নাট্যকার কোথা হইতে পাইলেন জানি না। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ভক্ত রামপ্রসাদ" পড়িয়া গ্রন্থকার এই নাটক লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের গুণে নাটকখানি প্রায় সর্ব্বত্রই সুখপাঠ্য হইয়াছে। যো. চ. চৌ.

কিশোরী—সচিত্র বার্ষিকী। শ্রীসুধাদেবী বি-এ, বি, টি, এল, টি, ডি, সম্পাদিত। মূল্য ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

গ্রন্থখানি সুন্দর বাঁধা, সুন্দর কাগজ ও সুন্দর ছাপা। ইহাকে আমরা পত্রিকার আসনে না বসাইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের আসন দিতে প্রস্তুত। গ্রন্থখানি কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্তই হইয়াছে। তাহাদিগের কৌতূহল তৃপ্ত করিবার অনেক জিনিষ ইহাতে আছে। কবিতাগুলিও সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি মনোগ্রাহী চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাতে রাণী রাসমণির কয়েকটী জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি আমাদের বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। তন্মধ্যে তিনি তীর্থযাত্রার জন্য আয়োজন করিয়া যেই শুনিলেন যে বঙ্গে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে; তখনই তিনি তাঁহার তীর্থযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া তজ্জন্য সংগৃহীত অর্থ দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য দান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই ঘটনাটী কেবল বর্ত্তমান কালের জন্য নহে, সর্ব্বকালেই উল্লেখযোগ্য বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। কেবল "নক্ষত্র" প্রবন্ধে গুটিকয়েক Expression যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা না দিলেই ভাল হইত। কিশোর-কিশোরীগণ এই গ্রন্থে তাঁহাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাইবেন।

জলছবি—শ্রীহিরণ্ময় সেন প্রণীত। ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। লেখকের ভাষার উপর কিছু দখল আছে বটে কিন্তু যে ভাবের উপর তিনি গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, আমরা সেই ভাবের কিছুতে সমর্থন করিতে পারি না। গ্রন্থের নায়িকা বর্ত্তমান কালের উপযোগী সেমিজ, জ্যাকেট ও সাড়ী প্রভৃতি পরিচ্ছদ যতদিন পরিধান করিত ততদিন তাহার চরিত্র কলুষিত ছিল; আর যখনই সে ঐরূপ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া শুধু সাড়ীর উপরেই নির্ভর করিল, তখনি তাহার চরিত্র কলুষমুক্ত হইল। এইরূপ ধারণা আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। গ্রন্থকার উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া গ্রন্থ লিখিলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ক্ষি. না. ঠা.

ভাগবত-ধর্ম্ম—দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীশ্যামাদাপ্রসাদ মল্লিক বি-এ ভাগবতরত্ন বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান সরকার বিশ্বাস এণ্ড কোং, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ আমরা পাই নাই। কিন্তু তজ্জন্য দ্বিতীয় ভাগের রসগ্রহণে কোন বাধা হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্তার সহিত সমুদয় স্থলে আমরা একমত না হইলেও গ্রন্থটী পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের এই পুস্তক বিশেষরূপ সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থপাঠে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। [illegible] ফলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি [illegible] প্রত্যেককে আমরা এই গ্রন্থপাঠের অনুরোধ করি।

ইহাতে পাঠক দেখিবেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষ্যও কত সুন্দর—আদর্শও কত উচ্চ।

ক্ষে. না, ঠা.

য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা।—শ্রীমোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত "য়েরোড়ার অনুভব" হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৷৷৹ আট আনা। ডবল ক্রাউন আকারের ৩৴৹+১৪৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

গান্ধীসাহিত্যের পবিত্র ভাবধারাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে বহমান করিয়া এবং উহা স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেশমাতৃকার প্রিয় সন্তান শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইঁহার "প্রতিষ্ঠানগ্রন্থাবলী"র মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর প্রায় সকল পুস্তকেরই বঙ্গানুবাদ স্থান পাইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদ এত সুন্দর হইয়াছে যে, মহাত্মাজীর নিজের লেখাই পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। গ্রন্থখানির নামই ইহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক হিসাবে রাজদ্রোহ অপরাধে ১৯২২ সালে মহাত্মাজীর যখন সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাবাস হয়, তখন তাঁহাকে প্রায় দুই বৎসর "য়েরোড়া" জেলে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। মহাত্মাজীর অমূল্য জীবনের এই দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান পাইয়াছে। তেরটী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে মহাত্মাজী তাঁহার স্বভাবসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সহিত বর্ত্তমান কারাগারের দোষগুণের আলোচনা করিয়া ইহার ভাবী-সংস্কারের ইঙ্গিত করিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে কারাগৃহে অবস্থানকালে সরকারের সহিত সত্যাগ্রহীর কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। "আমার পড়া" শীর্ষক তিনটী পরিচ্ছেদ আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। যে সকল মনীষীবৃন্দ দেশের শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহারা যদি তাঁহাদের অধ্যয়নকালের এমনি এক-একটী সুন্দর বিবৃতি প্রদান করেন, তবে উহা গ্রন্থারণ্যে দেশবাসীর দিগ্দর্শনশলাকার কার্য্য করিবে। মহাভারতাদি গ্রন্থের সহিত গিবনের ইতিহাসের তুলনায়, হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনায় তিনি আমাদিগকে অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে মহাত্মাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং "পরিশিষ্টে" জেলকর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হইয়াছিল, তাহা স্থান পাইয়াছে। উপসংহারে এই কথাটী বক্তব্য যে, "য়েরোড়া" নামটী ইংরাজী উচ্চারণের মধ্যস্থতায় আমাদের নিকট "বারবেদা" নামে পরিচিত।

স্নেহের দাবী।—শ্রীনিধিরাজ হালদার প্রণীত। মূল্য—১৷৹ আনা।

১৬ পেজী ডবল ক্রাউন আকারের ১৬০ পৃষ্ঠার একখানি নাতিদীর্ঘ সামাজিক উপন্যাস। ব্যর্থ প্রেমের হতাশায় বিবাহবিমুখ বিশ্বেশ্বর বৃদ্ধা পিসীমাতার মৃত্যুশয্যায় তাঁহার স্নেহের দাবী হিসাবে অকালে লোকান্তরিত বন্ধু নিখিলের পালিতা ভগিনী রাণীকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটীকে কেন্দ্র করিয়া নবীন লেখক বিবিধ ভাবে ভাষায় ও ভঙ্গিমায় এই আলেখ্যখানি অঙ্কন করিয়াছেন। গ্রন্থে "কাঁচা হাতের ছাপ" দেখা গেলেও নবীন গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম প্রশংসনীয়।

মৃচ্ছকটিক।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান ১২৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড।

সংস্কৃতসাহিত্যে "মৃচ্ছকটিকম্" কবিপ্রবর রাজা শূদ্রক-বিরচিত একখানি খ্যাতনামা নাট্যগ্রন্থ। ইহাই বোধ হয় সংস্কৃত ভাষার একমাত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সামাজিক নাটক। মহাকবি ভাস খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে "চারুদত্ত" নামে একখানি চতুরঙ্ক ক্ষুদ্র নাটক লিখিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্ত্তী যুগে কবিপ্রবর রাজা শূদ্রকের অমর লেখনীসম্পাতে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "মৃচ্ছকটিকম্" নামে খ্যাত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি কবিপ্রবর রাজা শূদ্রকের পদাঙ্কানুসরণে খাঁটি অনুবাদ না হইলেও উহারই সুন্দর বঙ্গীয় ভাবানুবাদ। বঙ্গীয় পাঠকের রুচির অনুসরণে মূলের রস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লেখক ইহাতে যে গীতযোজন ও স্থানে স্থানে দৃশ্যসংরচন করিয়াছেন, তাহাতে ইহার উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে এবং সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে তাঁহার এই স্বাধীনতা অবলম্বনে সত্যই তিনি রাজা শূদ্রকের পদাঙ্কানুসারীই হইয়াছেন। আজকাল ইংরাজী নাট্যরূপের অনুকরণেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নাটক রচিত হইয়া থাকে। ঘটনাবাহুল্যই ইংরাজী নাটকের মারফাতে বাঙ্গলা নাটকেও স্থান পায়; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার নাট্যরূপ ভিন্ন প্রকৃতির—অন্তর্গূঢ় রসধারাই তাহার প্রাণ। কেবল এই 'মৃচ্ছকটিক' ও মহাকবি ভাসরচিত নাটকগুলিতেই ইংরাজী নাটকের মত ঘটনাবাহুল্যের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের মারফতে প্রাচীন ভারতের যে তপঃপূত পুণ্যচিত্র অঙ্কনে আমরা অভ্যস্ত, তাহার সহিত সমসাময়িক কবি-অঙ্কিত এই সুন্দর আলেখ্যখানির কোথায় কতটুকু যোগাযোগ তাহার আলোচনা ও গবেষণায় নানা রহস্যের উদ্ঘাটন হইবার সম্ভাবনা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত। মূল গুজরাটি হইতে শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত কৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য ১৲ টাকা। ডবল-ক্রাউন আকারে ৮০+৪৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মহাত্মা গান্ধী যারবেদা-জেলে বসিয়া এই দক্ষিণ "আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের" ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; সতীশ বাবুও আলিপুর-জেলে বসিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। মহাত্মাকে যাহা মহাত্মা করিয়াছে, সেই সত্যাগ্রহের উৎপত্তি, পরিণতি ও প্রয়োগের অপূর্ব্ব ইতিহাস ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের যথাযুক্ত অধিকারলাভের জন্য দীর্ঘ কালব্যাপী অহিংস সংগ্রামের সুন্দর ইতিহাস। সত্য শাশ্বত বলিয়া যাহা তিনি একদিন দক্ষিণ-আফ্রিকার কর্ম্মক্ষেত্রে লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহাই ভারতের বৃহত্তর-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন। সত্যাগ্রহ বস্তুটা কি, তাহার প্রকৃত পরিচয় অনেকেরই জানা নাই। এই গ্রন্থে তাহার নির্দ্দেশ মিলিবে। সত্যাগ্রহ ইউরোপে আবিষ্কৃত "প্যাসিভ্ রেজিষ্ট্যান্স" নহে, কিন্তু ইহা বহুযুগ পূর্ব্বে পশুবলের বিরুদ্ধে ভারতের ধর্ম্মপূত অন্তর হইতে আবিষ্কৃত একটী মহান্ সত্য। এই সত্য "ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজো-বলং বল" এই বজ্র বাণীতেই সুব্যক্ত হইয়াছে। মহাত্মার জীবনে ভারতের এই অতীত অবদানই সত্যাগ্রহ-মূর্ত্তিতে বিকশিত। ইহা যে শক্তিমান্ প্রতিপক্ষকে বিরক্ত বা জব্দ করিবার জন্য গৃহীত হয় না, পরন্তু অসীম কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া স্বীয় অন্তরের প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অবলম্বিত হয়, এই গ্রন্থে মহাত্মাজী তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

সু. চ. চৌ.।

খাদ্যতত্ত্ব—ঢাকা গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক বিধুভূষণ পাল এল, এম, এস প্রণীত। ডবল ক্রাউন আকারের ॥+১৮৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

আমাদের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যহীনতার যত প্রকার কারণ আছে, তাহাদের মধ্যে খাদ্যবিষয়ক অনভিজ্ঞতাই প্রধান কারণরূপে গণ্য হইতে পারে। ক্ষুধা পায়, তাই আমরা খাই; কিন্তু আহারের উদ্দেশ্য যে কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি বা রসনার পরিতৃপ্তি নয়—শারীরিক ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধনও বটে, সেকথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কিরূপ খাদ্য কাহার পক্ষে কোন্ অবস্থায় কতখানি আবশ্যক, সে বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান নাই বলিলে হয়; ফলে অনেক সময় পুষ্টির পরিবর্ত্তে ক্ষয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেহকে সুস্থ ও সবল রাখিতে চাহিলে খাদ্যবিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয় প্রত্যেকেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। অথচ আমাদের দেশে এবিষয়ের গুরুত্বের অনুপাতে যথাযুক্ত আলোচনার অভাব দৃষ্ট হয়। বহুকাল গত হইল ডাক্তার চুনিলাল বসু মহাশয় "খাদ্য"নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তদবধি এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় এবিষয়ে আর কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তার বিধুভূষণ পাল মহাশয়ের খাদ্য-বিষয়ক অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু তথ্যে পূর্ণ আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, পরিপাক ক্রিয়ায় তাহা শরীরস্থ নানাবিধ প্রভাবে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া কতক আমাদের অঙ্গীভূত হয়, আর কতক দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। মানবশিশুর জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সকল সময়ের খাদ্যবিধি ইহাতে আধুনিক আহারবিজ্ঞান অনুসারে আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকটি যাহাতে কেবল সাধারণেরই উপযোগী না হইয়া চিকিৎসাবিদ্যার্থীগণেরও সহায়ক হয়, লেখক সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। এই কারণে গ্রন্থখানি ন্যূনাধিক বৈজ্ঞানিক ভাবে ও ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আশা করি, বঙ্গদেশে ইহার সমাদর হইবে।

জ্ঞা. না. ব.।

সংবাদ।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।—গত ৩০শে কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে উপাসনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। সুরেশচন্দ্রের উদ্বোধন ও স্বাধ্যায়ান্তে শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত একটী সুন্দর উপদেশ বিবৃত করেন। অপরাহ্নে সার্দ্ধ তিন ঘটিকার পর শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সমবেত সুগম্ভীর কণ্ঠে "পারায়ণ" অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বেহালা উৎসবের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়। সুগায়ক শ্রীমাণিকলাল দে মহাশয় সদলবলে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিয়া সমবেত উপাসকগণের অন্তরে আনন্দ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ ও পণ্ডিত প্রবর শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়-দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া বেদীগ্রহণ করেন। হেমেন্দ্রবিজয় বাবু কবিত্বময় উদ্বোধনে সমবেত উপাসকগণকে প্রবুদ্ধ করিলেন। সর্ব্বশেষে সুরেশচন্দ্র "বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম" বিষয়ে একটী উপদেশ বিবৃত করেন। সমাজমন্দিরটী সন্ধ্যায় শ্যাম পত্রপুষ্পলতায় ও শোভন দীপমালায় সুন্দর সুসজ্জিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে চিন্তামণি বাবু উপস্থিত জনবৃন্দকে জলযোগ করাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮৷৷৹ ঘটিকায় স্যর ৺আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা তাঁহার শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী পি-এইচ ডি মহাশয়ের নবকুমারের জাতকর্ম্ম তদীয় ৯নং সানি পার্কের বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান নবকুমারকে নিত্য আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলুন।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ—গত ১৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০৷৷৹ ঘটিকায় সাধু ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অন্যতম জামাতা ৺অভয়কুমার মজুমদারের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি, বার-এট-ল মহাশয় কর্ত্তৃক ৩৯নং আণ্টনিবাগানের তদীয় ভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

শোকসংবাদ।

মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—গত ১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় স্বনামধন্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই, এম-এ, ডি-লিট মহাশয় তাঁহার পটলডাঙ্গাস্থ বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম অষ্টসপ্ততি বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। নৈহাটী গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যবংশে ইহাঁর জন্ম। ইহারই অদূরে কাঁটালপাড়া বঙ্কিমজন্মভূমি। হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যজীবনেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রভায় আকৃষ্ট হইয়া সাহিত্যিক জীবন বরণ করেন। সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই ভাষাত্রয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি যুগপৎ বঙ্গভাষা বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর কল্যাণের কারণ হইয়াছিল। সাহিত্য-রচনায়, ইতিহাসসংগ্রহে, পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারে ও বিদ্যা-বিতরণে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও তিনি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ফরাসী, জার্ম্মান, তিব্বতীয়, পালি প্রভৃতি ভাষায়ও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। ইহাঁর মৃত্যুতে বাঙ্গালার তথা ভারতের বিদ্বৎসমাজের যে অঙ্গ-হানি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। ইহাঁর শোকার্ত্ত পুত্রপরিজন ও আত্মীয়বন্ধুদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

দানপ্রাপ্তি।

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী পি-এইচ-ডি তদীয় নবকুমারের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে উহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

শতাধিকদ্বিতীয় সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

আগামী ১১ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি সাদরে প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

ততংগহ

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C. 462.

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৬১

১৮৫৩ শক পৌষ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা. আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩২। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০১। লওয়া আর দেওয়া।

মা! আজ যে তুমি আর সকলকে ছাড়িয়া আমার কাছে আসিয়া বসিয়াছ, আমার প্রাণে যে কি ভাব উথলিয়া উঠিতেছে, তাহা তোমাকে জানাইয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। জোয়ার আসিলে যেমন নদীবক্ষ স্ফীত হইয়া কাহাকেও ধরিবার জন্য ছুটিয়া যায়, আমার প্রাণও তেমনি আজ তোমার ভালবাসা পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতেছে। যে গান গাহিয়া তুমি আমায় কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইতে, আজ সেই গান আমার প্রাণের দুই কূল ছাপাইয়া উথলিয়া উঠিতেছে। তুমি কাছে আছ, আমার ভয়ভাবনাও সমস্তই দূরে চলিয়া গিয়াছে। সুনীল গগনের প্রশান্ত মূর্ত্তির মধ্যেও যেমন শান্তি লাভ করি, সেই আকাশ যখন প্রবল ঝড়ের বজ্রগর্জ্জনে খণ্ডবিখণ্ড হইবার উপক্রম করে, তাহারও মধ্যে সেই রকমই শান্তি লাভ করি। তোমায় নিকটে পাইলে আমার কাছে সরবও নীরব হইয়া যায়, আর নীরবও সরব ভাব ধারণ করে। ফুলেরা যখন তাহাদের কচিমুখে হাসিতে থাকে, তখন সত্যই সে হাসিতে তোমারই হাসি দেখিতে পাই, আর প্রাণের মধ্যে যে শান্তি লাভ করি, সে শান্তির তুলনা খুঁজিয়া পাই না। প্রভাতে পাখীদের কলগানে তোমার যে সুন্দর আহ্বান শুনিতে পাই, সত্যই সে স্বরের সঙ্গে অন্য কোন স্বরেরই তুলনা হয় না। আমি আর থাকিতে পারিতেছি না; আমার সংসারে থাকিবার প্রবৃত্তির পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এখন চাই, তুমি আমার দেহমন পরিশুদ্ধ করিয়া লও আর আমাকে তোমার কাছে ডাকিয়া লও। যে শান্তির আস্বাদ পাইবার অধিকার এখনই আমাকে দিতেছ, সেই শান্তির সুগভীর সাগরে আমি আপনাকে চিরতরে ডুবাইয়া রাখিতে চাই। জননী! আমি আজ সুখের অমিতে দুঃখের অশ্রুর গঙ্গা করিতে চাই; শান্তির অশ্রু আজ তোমার চরণে নিবেদন করিতে চাই। তুমিই আমার সকলই গ্রহণ করিয়া আমাকে তোমায় দাও। আমি যেমন তোমাকে আমায় দিতেছি, তুমিও তেমনি আমাকে তোমায় দিয়া আমার মনপ্রাণ ভরিয়া দাও। তোমার এই দীনদুঃখী সন্তানকে সহায়-সম্বলে পূর্ণ করিয়া দাও। আমার অশ্রু মুছিয়া যাক।

১০২। স্মৃতির আনন্দ।

মা! তোমার কোলে কবে সেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—সেইদিন তুমি কি রকম আদরের সঙ্গে আমাকে তোমার বুকের ভিতর জাপটাইয়া ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দিয়াছিলে—তাহার অস্ফুট স্মৃতি আজও আমার প্রাণকে সময়ে সময়ে আকুল ব্যাকুল করিয়া তোলে। আর কি তুমি তেমন করিয়া আমায় কোলে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন দিবে না? তোমার আলিঙ্গনের স্মৃতি প্রাণের ভিতর যখনই জাগিয়া উঠে, তখনই আবার সেইরকম আলিঙ্গন পাইবার জন্য বুকের ভিতর ধকধকি বাজিতে থাকে। তোমার আলিঙ্গন না পাইলে সে ধকধকি কিসে নির্ব্বাপিত হইবে তাহা জানি না। সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়, তোমার কোলে আর একবার নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই রকম আদর ও আলিঙ্গন আর একবার লাভ করি। তোমার ভালবাসার আস্বাদ একবার পাইয়াছি বলিয়া যেই তাহার এতটুকু অভাব কল্পনা করি, অমনি জ্বালায় ও যন্ত্রণায় কত না ছটফট করি; কিন্তু সেই জ্বালাযন্ত্রণাও যে কত মিষ্ট তাহা বলা যায় না। তাই সেই জ্বালাযন্ত্রণা অনুভব করিবার জন্যই দিকে দিকে ছুটিয়া বেড়াই। তখন মনে হয়, সেই দুঃখকষ্টের রাত্রি কবে প্রভাত হবে; অথচ প্রভাত যে শীঘ্র হয়, তাহাও প্রাণ যেন সত্য-সত্য চাহিতে সাহস করে না; কারণ যতক্ষণ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, ততক্ষণই তো অন্তত স্মৃতিতে তুমি সর্ব্বদাই কাছেই থাক। ভয় হয়, দুঃখনিশা প্রভাত হইলে পাছে তুমি আমা হইতে দূরে সরিয়া যাও; পাছে তুমি আমাকে একটী স্নেহচুম্বন দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া কোথাও চলিয়া যাও। জননী! তুমি দূরে যাইও না। তোমার কোলের কাছে আমাকে দুদণ্ড বসিতে দাও; আমি আবোলতাবোল ভাষায় কত কি বলিয়া চলিব, আর তুমি সেই অপূর্ব্ব ভাষায় মুগ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে আমাকে একটুখানি আদর করিও এবং স্নেহচুম্বনে আমাকে ভরিয়া দিও।

১০৩। চিরমিলন।

মা! জন্ম যখন দিয়াছ, তখন আর বিদায়ের কথা বলিতে পারিবে না। তুমি জন্ম দিয়া তোমার সঙ্গে আমার, মাতার সঙ্গে সন্তানের যে যোগ-বন্ধনের অধিকার দিয়াছ, সে যোগের বিচ্ছেদের কথা আমি কিছুতেই শুনিতে পারি না। আমার সমস্ত প্রাণ একই গান অধিকার করিয়া আছে—তাহা মিলনের গান। জন্ম যখন দিয়াছিলে, তখন সূর্য্যচন্দ্র গ্রহতারা সকলেই আমাকে ঐ গানেরই মন্ত্র আমার কানে দিয়া গিয়াছিল। আজ যখন এলোকে আমার কাজ সারা হইতে চলিয়াছে, তখন দেখি, সকলেই এক একে আমাকে ছাড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাতে তো বিচ্ছেদের এতটুকু ভয়ও আসিতেছে না, আর তাহার জ্বালাযন্ত্রণাও এতটুকু আমার প্রাণে লাগিতেছে না। তুমি আমার সঙ্গে আছ, তাই সমস্ত মিলনের বাতাস আমাকে ঘিরিয়া আছে। রাত্রির যে অন্ধকার আমাকে ঘিরিতে চলিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া দিব্য আলোকের সমুজ্জ্বল-প্রভা উঁকিঝুঁকি মারিতেছে; আমি তাহা দেখিতেছি, আর আমার ভয়ভাবনা সকলই বিদূরিত হইতেছে। মৃত্যুর নামে অনেকেই আমাকে ভয় দেখাইতে চায়। তাহারা আমাকে বুঝাইতে চায় যে, মৃত্যুতেই নাকি তোমার সঙ্গে আমার চির-বিচ্ছেদ ঘটিবে। প্রথম প্রথম যখন তাহাদের কথাগুলি শুনিতাম, তখন মনে হইত, সেই সমস্ত কথার মধ্যে কত জ্ঞান কত প্রেম ছাইয়া আছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে চিরমিলনের রহস্য যেদিন আমার প্রাণে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সেইদিন অবধি তাহাদের ঐ সমস্ত কথা নিতান্তই শূন্যগর্ভ, নিতান্তই ফাঁকা কথা বলিয়া বুঝিয়াছি; সেইদিন অবধি আমার প্রাণের সমস্ত দ্বন্দ্ববিবাদ, সকল সংশয়সন্দেহ ঘুচিয়া গিয়াছে। সেইদিন অবধি আমি মিলনের সাগরে অবগাহন করিয়া আমার অন্তরের সমস্ত কলুষ ধুইয়া ফেলিয়াছি; সেইদিন অবধি মিলনের বাতাসে তুষ্টিপুষ্টি সকলই লাভ করিয়াছি; সেইদিন অবধি মিলনের সুগন্ধে আমার মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে—আমার বাক্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মন এখন বাহিরের কোনও কথায় সাড়া দিতে পারে না—একমাত্র অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে তোমার ডাকেরই উত্তরে সাড়া দিতে চায়। চারিদিক অন্ধকার হইয়া থাক,

চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া যাক, তুমিই আমাকে সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের ভিতর, সেই সুগম্ভীর সাড়াহীন নিস্তব্ধতার ভিতর তোমার কোলে লইয়া নিরবধি তোমার অমৃতধারার স্তন্য পান করাও—আমি একটুখানি শান্তি লাভ করি, আমার সংসারের পাপতাপের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা নির্ব্বাপিত হউক।

১০৩। আত্মনিবেদন।

মা! এত প্রলোভনের বিষয় আমার চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়া আমাকে লোভ দেখাইবার উদ্দেশ্য কি, তাহা তো বুঝিতে পারি না। দিনে নিশীথে সুমধুর বাতাস, সূর্য্যের আলো, চাঁদের কিরণ, সমস্তই যেন আমাকে সেবা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। সময়ে সময়ে তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে, তাহাদের খেলা দেখিতে দেখিতে তোমাকে কখন্ কোন্ সূত্রে হঠাৎ একটু ভুলিয়া যাই; ক্ষণেক পরেই আবার যখন তোমায় মনে পড়ে, তখন চমকাইয়া উঠি। ভুলিয়া গিয়াছিলাম মনে করিয়াই আমার দুই গাল বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে থাকে। অশ্রুধারার এক এক ফোঁটা পড়ে আর একএকটী মুক্তাকণায় পরিণত হয়। তোমাকে ভুলিয়া যাওয়ার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে সেই মুক্তাকণাগুলিই কুড়াইয়া লইয়া তাহা দ্বারা তোমার চরণপূজা করিয়া আমার প্রাণে শান্তি আনয়ন করিব। তোমার চরণপূজা না করা অবধি আমার প্রাণে শান্তি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, ক্ষুধাতৃষ্ণা সকলই হারাইয়াছি। আমার চারিদিকে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। তুমি যখন কাছে থাক, যখন তোমাকে সর্ব্বদাই নিকটে দেখিতে পাই, তখন সেই আনন্দের হাসিতে আমারও অন্তরে আনন্দের উৎস খুলিয়া যায়। কিন্তু সেই হাসিতে যখন ডুবিয়া যাই, তখন তুমি সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাও, আর আমার অন্তরে সেই আনন্দের উৎসও সহসা শুকাইয়া যায়, হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে থাকে—তখন চারিদিকে সত্যই বিষাদের ঘন অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অন্ধকারও আমার ভাল, সেই হৃৎস্পন্দনও আমার ভাল। সেই স্পন্দনের উত্তরেই সাড়া পাই যে, তুমি আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেছ; তোমার জ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকার প্রভাতের মধুর আলোকে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। মা! আর আমাকে প্রলোভনের বিষয়ে ঘিরিয়া রাখিও না—আমি শুধুই, আমি শুধুই তোমার কাছে থাকিতে চাই, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ফিরিতে চাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও দীক্ষাব্রত।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিবস ৭ই পৌষ।

অদ্য শুভ ৭ই পৌষ। এই শুভ ৭ই পৌষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অন্যান্য কুড়ি জন সঙ্গীগণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই জীবিত নাই—সকলেই পরলোকে। তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে পরলোকগমন করিয়াছেন। আর অল্পসংখ্যক লোকই বোধ হয় ইহলোকে জীবিত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে খুবই অল্পসংখ্যক ব্যতীত কেহ যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত সম্পূর্ণরূপে পালনপূর্ব্বক উদ্‌যাপন করিয়াছেন, তাহা শুনিতে পাই না।

২। ৭ই পৌষ পবিত্র কেন?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রত সম্পূর্ণ উদ্‌যাপন করিয়া দীক্ষাদিবসকে পূর্ণ মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। মহর্ষি দেখাইলেন যে, দীক্ষার অর্থ কেবল কতকগুলি অর্থহীন মন্ত্র মুখস্থ আওড়ান নহে, কিন্তু দীক্ষামন্ত্রের অর্থ হৃদ্‌গত করিয়া তাহা সাধ্যমত জীবনে প্রতিপালন করিবার চেষ্টা—এক কথায় এইরূপ মন্ত্রের সাহায্যে নিজের জীবনকে সংগঠিত করা; ইহাতেই দীক্ষার গুরুত্ব, এবং এই গুরুত্বের কারণে দীক্ষাদিবসের পবিত্রতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনের দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। এই কারণে ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই নিকট ৭ই পৌষ বড়ই পবিত্র বলিয়া গৃহীত হয়।

পবিত্র ১১ই মাঘে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অসাম্প্রদায়িকভাবের ব্রহ্মোপাসনার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ঐ দিবস যেমন জগতের সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও উৎসবের কারণ হইয়া উঠিয়াছে,

* গত ৭ই পৌষ আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত।

[illegible] ৭ই পৌষ দিবসে দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের দ্বারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মোপাসকদিগের সংসারের সকল ক্ষেত্রে ও জীবনের সকল বিভাগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরমেশ্বরের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করাইলেন ও তাঁহার বিজয় বার্তা ঘোষণা করিলেন। বলিয়া ঐ দিবসও জগদীশ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই নিকট একটি পুণ্যদিবসরূপে গৃহীত হইয়াছে ও হইতে থাকিবে।

৩। দীক্ষাব্রতের গুরুত্ব।

এই দীক্ষাব্রতের গুরুত্ব ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। কেবল স্মৃতিদিবস-স্বরূপে বা উৎসবের দৃষ্টিতে এই দিবসকে দেখিলে চলিবে না; দীক্ষার গুরুত্ব ও পবিত্রতা দীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া উহাতে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে হইবে এবং ভগবানের সহিত আপনাকে একাত্মযোগে যুক্ত করিতে হইবে, তবেই এই ৭ই পৌষে উৎসব অনুষ্ঠানের সার্থকতা হইবে।

৪। দীক্ষাপ্রবর্তন বিষয়ে মহর্ষির উক্তি।

এই দীক্ষা প্রবর্তন সম্বন্ধে মহর্ষি বলেন, "যখন সমাজে লোকের সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনার জন্য আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে— কাহাকে আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে তখন তাহার প্রত্যেক সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই।......যখন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম হওয়া স্থির হইল, তখন এই মনে ছিল যে যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, যত্নশীল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম পালন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হইল যে, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে অনেকে ঔদাস্য করিতেন ও পরাঙ্মুখ হইতেন"।

৫। দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রয়োজনীয়তা।

দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্তিত সেই আদিম দীক্ষাপ্রণালীর অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান দীক্ষাপ্রণালী সমুদ্ভূত হইয়াছে। সম্ভবত পূর্বাপর প্রচলিত বিবাহ সম্বন্ধীয় পণপত্র প্রভৃতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দীক্ষাকালেও একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাকে উহার অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল। এরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা দীক্ষা-গ্রহণের একটা বাহ্যচিহ্ন মাত্র স্বীকার করি। অন্তরে প্রতিজ্ঞাপালনের তীব্র ও গভীর আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে শত [illegible] প্রতিজ্ঞাপত্র যে সামাজিক ছিন্নপত্ররূপে গৃহীত হইবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য নয়। কিন্তু অন্তরে প্রতিজ্ঞাপালনের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ থাকিলে প্রকাশ্যে এইরূপ প্রতিজ্ঞাগ্রহণ ও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা প্রতিজ্ঞাগ্রহীতাকে ব্রতপালনে প্রভূত সহায়তা করে এবং বিপথে পদার্পণ হইতে সহজে রক্ষা করে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে সুরাপাননিবারণী সভার প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিবার ফলে অনেক ব্যক্তি সুরাপায়ী-দিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। প্রকাশ্য প্রতিজ্ঞাগ্রহণের বলবিধান সম্বন্ধে আমরা মহাত্মা গান্ধীর উক্তি হইতেও যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

৬। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাপ্রণালী সরল ও সহজ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত দীক্ষাপ্রণালী অতি সরল ও সহজ। ইহার জন্য বাহ্যাড়ম্বরের কোন প্রকার ঘনঘটা আবশ্যক নাই, অথবা কুলগুরু প্রভৃতি ব্যক্তিবিশেষেরও অপেক্ষা নাই; প্রত্যেক মানবই ভগবানের সন্তান এবং তিনি প্রত্যেক মানবেরই পিতামাতা। প্রত্যেক সন্তান যেমন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলেই কোন বাধাবিঘ্ন না মানিয়া তাহার পিতামাতার নিকটে সহজে উপস্থিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক মানবসন্তানও আকাঙ্ক্ষা জাগিলে যাহাতে পরম পিতামাতা পরমেশ্বরের নিকট সরল ও সহজ পথ ধরিয়া উপস্থিত হইতে পারে তাহারই উপযুক্ত পথনির্দেশক করিয়া এই দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে।

৭। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাপ্রণালীতে সাম্প্রদায়িকতার অভাব।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্বেও সুবিস্তৃত সকল ধর্মসমাজেরই মধ্যেই নিজ নিজ ধর্মমতের অনুযায়ী দীক্ষা লইবার প্রথা যে প্রচলিত ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কোন-না-কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ বা ব্যবহার করা সেই সকল প্রণালীর অঙ্গীভূত ছিল দেখা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত দীক্ষাপ্রণালীর মধ্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণের বা ব্যবহারের অবসর আসে নাই এবং আসিতে পারেও না।

৮। দীক্ষামন্ত্র গোপনীয় রাখার কুফল।

ব্রাহ্মসমাজের এই দীক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা গোপনীয়—ইহার মন্ত্রও গুপ্তমন্ত্র নহে এবং ইহার প্রকৃত ইষ্টদেবতা যিনি, তিনি অকিঞ্চনগুরু এবং প্রত্যেক মানবসন্তানেরই অন্তরে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। যতদূর বোঝা যায়, আমাদের দেশে তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব অবধি দীক্ষা লওয়ায় কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। বর্তমানে এদেশে তান্ত্রিক দীক্ষারই সমধিক প্রাবল্য ও প্রাধান্য দেখা যায়। আজকাল কি [illegible]

তান্ত্রিক, কি বৈষ্ণব, প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের সর্ব্ববিধ দীক্ষাপ্রণালীতেই দীক্ষামন্ত্র ও ইষ্টদেবতার নাম গোপন রাখিবার অনুশাসন দেওয়া হয়—মনে হয়, এই সকল গোপন রাখাই দীক্ষাদাতা কুলগুরুদিগের সমস্ত অনুশাসনের মুখ্য ভাব। এইপ্রকার গোপন রাখিবার অনুশাসনের ফলে দীক্ষার্থীর হৃদয় যে অজ্ঞানের কিরূপ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার পথে অগ্রসর হয় এবং সে কিরূপ কঠোর মানসিক পরাধীনতার দাসখতে স্বাক্ষর করে, তাহা সহজে বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ অনুশাসনের ফলে অযথা গুরুবাদ ও তদনুষঙ্গী শতবিধ অনাচার এই প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজগাত্রে এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজ আজ শতবর্ষ চেষ্টার ফলেও সেগুলি সমূলে উৎপাটিত করিয়া সমাজদেহে উপযুক্ত নববল সঞ্চার করিতে পারিতেছেন না।

৯। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষায় গোপনীয় কিছুই নাই।

ব্রাহ্মসমাজ যে দেবতাকে অন্তরে ধারণ করিয়াছে সে দেবতার নামও যেমন গোপনীয় হইতে পারে না, তাঁহার পূজার মন্ত্রও সেইরূপ গুপ্তমন্ত্র হইতে পারে না। ইহা উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মসমাজ স্বভাবতই প্রচলিত দীক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বপ্রথম দীক্ষার ভাব সুস্পষ্ট বুঝাইয়া প্রকাশ্যভাবে দীক্ষাগ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ইহা বুঝাইয়া দিলেন, ইষ্টদেবতা যিনি, কতকগুলি শব্দের অর্থবোধ না করিয়া সেগুলির আবৃত্তিমাত্রই তাঁহাকে পাইবার পথ নহে। অন্তরের দেবতা যিনি, একমাত্র কুলগুরু ও তাঁহার মুখনিঃসৃত শব্দের উপর, বুঝি বা না বুঝি, অটল বিশ্বাস তাঁহার নিকট পৌঁছিবার প্রশস্ত পথ নহে। ব্রাহ্মসমাজ বুঝাইলেন বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানবের অন্তরে মঙ্গলময় পরম দেবতারূপে যিনি চির বিরাজিত, যিনি পাপী-তাপী, সাধু-অসাধু বিশ্বজগতের একটি মানবকেও পরিত্যাগ করেন নাই, প্রত্যুত প্রেমপূর্ণ আহ্বানে প্রত্যেক মানবকেই নিজের অভিমুখে নিত্যই আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার নিকটে সরল পথে পৌঁছিবার জন্য যে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, তাহার মন্ত্রে গোপনীয় কোন কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানবসন্তান কোন কিছুর অভাব বা কোন কিছুর প্রয়োজন বোধ করিলে অথবা কোন কারণে প্রাণে তীব্র আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে যেমন সহজেই পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইতে পারে, সেইরূপ বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানব প্রত্যেকের ইষ্টদেবতা বিশ্বপিতা ও অখিলমাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সহজেই উপস্থিত হইতে পারে—তাহাতে একটুকু বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ভগবানের চরণে উপস্থিত হইবার জন্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই, মনীষার প্রয়োজন নাই—চাই কেবল প্রাণের গভীর ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পিতামাতার নাম গোপন রাখিবার অথবা পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য সরল পথ ধরিবার নিষেধবিধানে কে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারে? সেইরূপ আমরা ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, যে দীক্ষাপ্রণালী প্রাণের ইষ্টদেবতার নাম অথবা তাঁহার নিকটে পৌঁছিবার সরল পথনির্দ্দেশক মন্ত্র গুপ্ত রাখিবার অনুশাসন দেয়, সেই দীক্ষাপ্রণালী নিশ্চয়ই অমৃতসিক্ত নহে।

১০। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাপ্রণালীর উদারতম ভিত্তি।

ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রহ্মদীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার জন্য যেমন বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ অভ্রান্ত গুরুরও কোনও অপেক্ষা নাই। দীক্ষার্থীর প্রাণে তাঁহাকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং অকিঞ্চন-গুরুরূপে দীক্ষার্থীর হৃদয়ে আবির্ভূত হন; এবং তাহার অন্তরে স্বহস্তে জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া সরলপথে নিজের অভিমুখে তাহাকে পরিচালিত করেন। ব্রাহ্মসমাজ যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন, তাহা কেবল তোমার বা আমার জন্য নহে কিন্তু বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানবেরই জন্যে। সেই কারণে সেই সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মসমাজ যে দীক্ষাপ্রণালী ও তাহার মন্ত্র জনসমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই দীক্ষাপ্রণালী ও মন্ত্র স্বভাবতই উদারতম ভিত্তির উপর সংগঠিত—সেই দীক্ষাপ্রণালীর মধ্যে গোপনীয় কোন কিছুই নাই, অথবা তাহার মন্ত্র গুপ্তমন্ত্র নহে এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষা আসিলেই দীক্ষার্থী যে কোন উপযুক্ত সাধক ও জ্ঞানী সাধু-পুরুষের নিকট উক্ত মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারেন।

১১। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষামন্ত্রের মূলভাব।

সেই দীক্ষামন্ত্রের মূল অবলম্বন মাত্র দুইটী—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দীক্ষার্থীকে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার আত্মা যেমন তাঁহার দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া কিন্তু তাহা হইতে পৃথক্‌স্বরূপে অবস্থিত করে, সেইরূপ সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তা অনন্তস্বরূপ অদ্বিতীয় ও অপ্রতিম পরমাত্মা এই বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে এবং প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে কিন্তু পৃথক্‌স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের করুণাময়ী মাতা ও স্নেহময় মঙ্গলবিধাতা পিতা। তাঁহার ও জীবাত্মার মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই। তাঁহাকে পাইতে চাহিলে সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে প্রীতি করিতে

সোহিনী—সুর ফাঁকতাল।

কারণ আদি সব শক্তি মূল পরমেশ্বর
অন্তর অন্তরে তব বাণী দাও হে।
শুভাকর আদি নাথ গুণসাগর অরূপ
চরণ ধরি তব শুভমতি দাও হে।
তব করুণা বিতরিছে সুরঞ্জ
চন্দ্র তারা পবন আদি অনুখন হে
অকিঞ্চন আমি তব প্রসাদ দেব
যাচি সদা মলিন দুখীজন হে।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্যা শ্রীবাণী দেবী।

১´ ২ ৩ ॥ ১´ ২ ৩
ধা মা ধা II র্সা -া -া না | ধা ধা | মা -া -া মা I মা -া -া মা | গা গা | ঋা -া সা সা I
কা র ণ আ • • দি স ব শ • • ক্তি মূ • • ল প র মে • শ্ব র

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা -া গা গা | মা -া | ধা ধা মা ধা I না র্সা র্সা র্সা | ধর্না -া | -া ধা মা ধা II
ভ • জ ন অ • ন্ত রে ত ব বা ণী দা ও হে • • "কা র ণ"

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
{I মা ধা না র্সা | র্ঋা -া | র্সা র্সা -া র্সা I র্সা র্সা র্সা -া | র্সা র্সা | র্সা না ধা না I}
শু ভা ক র আ • দি না • থ গু ণ সা • গ র অ রূ • প

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -া র্গা র্গা | র্ঋা র্ঋা | র্সা না র্সা র্সা I র্সা না র্সা র্সা | ধর্না -া | -া ধর্না মা ধা II
চ • র ণ ধ রি ত ব শু ভ ম তি দা ও হে • • "কা র ণ"

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা -া মা -া | মা মা | মা -া গা -া I মা ধা ধা মা | -া মা | গা -া ঋা সা I
ত • ব • ক রু ণা • বি • ত • রি • • ছে সু • র ঞ্জ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা গা গা মা | ধা ধা | মা ধা ধা না I র্সা র্সা না না | র্সা র্সা | ধর্না -া ধা -া |
চ • ন্দ্র তা • রা প ব ন আ • দি অ নু খ ন হে • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
{I মা -া ধা -া | না -া | র্সা র্সা র্সা -া I না না র্সা র্সা | -া র্সা | র্ঋা না র্সা -া I}
অ • কি • ঞ্চ • ন আ মি • ত ব প্র সা • দ দে • ব •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -া র্গা র্গা | র্ঋা -া | র্সর্ঋা না র্সা র্সা I র্সা না র্সা র্সা | র্ঋা না | র্সা ধা মা ধা IIII
যা • চি স দা • ম • • লি ন দু খী জ ন হে • • "কা র ণ"

পূরবী—ব্রহ্মতাল।*

ডুবিল প্রাণ মন মম সুন্দর প্রভু হেরি তোমা প্রাণে॥
ভুলি সব, হৃদয় যখন পূরে তোমারি মধু নামে
ধ্বনিত করে নীলাম্বর যবে বাঁশরী তব মধু তানে।

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী॥

১´ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ০
II গা -া ‖ পা হ্মা । গা -া । ঋা -া । সা সা । সা সা । সা -া । সা ঋা । সা ন্‌া ‖
ডু ০ বি ল প্রা ০ ণ ০ ম ন ম ম সু ০ ন্দ র প্র ভু

৭ ৮ ৯ ১০ ০
‖ সা গা । গা গা । পা হ্মা । ধহ্মা -া ‖ গমা -া II
হে রি তো মা প্রা ০ ণে ০ ০ ০

১´ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬
I গা গা । হ্মা ধা । পা র্সা ‖ র্সা -া । নর্সা র্সা ‖ র্সা না । র্সা র্সা । র্ঋা র্সা ‖
ভু লি স ব ০ হৃ দ ০ ০ য় য ০ খ ন পূ রে

০ ৭ ৮ ৯ ১০ ০
‖ না ধনা । ধা পা ‖ পা পা । পা হ্মা । ধহ্মা -া । গমা -া II
তো ০ মা রি ম ধু না ০ মে ০ ০ ০

১´ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬
I গা -া ‖ হ্মা ধা । র্সা র্সা । র্সা -া । র্সা না । র্সা র্সা । র্সা র্সা । না র্ঋা ‖
ধ্ব ০ নি ত ক রে নী ০ লা ০ ম্ব র য বে বাঁ ০

০ ৭ ৮ ৯ ১০ ০
‖ র্সা র্সা ‖ না ধ্‌না । ধা পা । পা পা । ধহ্মা -া । গা হ্মা IIII
শ রী ত ০ ব ০ ম ধু তা ০ নে ০

* ব্রহ্মতাল প্রাচীন তালগুলির অন্যতম। ইহার সুললিত ছন্দ সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইহা একরূপ লুপ্তপ্রায় বলিলেও হয়। যে সকল গুণী সঙ্গীতজ্ঞ ইহার পুনরুদ্ধারকল্পে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এই প্রচেষ্টার জন্য তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। তঃ সং

"চরণে"

বাহার—কাওয়ালি

চরণে শরণ দাও হে।

দীন শিশু আমি, মাতা পিতা মম তুমি—

চিরসাথী প্রাণের প্রাণ।

হৃদয়ের ব্যথা যত

কর তুমি বিদূরিত—

পারি না বহিতে।

বর্ম্মচর্ম্ম তুমি ভয় বিপদ মাঝে—

তব চরণ ছাড়ি প্রভু কোথা যাই—নাহি ঠাঁই—

হে নাথ।

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

৩ ১´ ২

ণণা পা মা II {পধপা -মপা মজ্ঞা -মজ্ঞমা I ণা -া -ধা -ণা | -পধা -নর্সনা না র্সা |

চর ণে শ্‌ র•• •• ণ• ••দা ও • • • •• •••হে •

০ ০ ৩ ১´

| (-ণধা ণণা পা মা) } | -ণধা নাঃ নঃ র্সা | -াঃ র্সঃ র্রর্সা -া I -া ণা -ণা পমপা |

•• চর ণে শ্‌ •• দী ন শি • শু আমি • • মা • তা•পি

২ ০ ৩ ১´

| মজ্ঞা -া -া মমা | রাঃ -সঃ সা -া | -া ননা না র্সা I -া ণপা র্সা -া |

তা • • মম তু • মি • • চির সা থী • প্রা• ণে র্

২ ০

| -া -ণধা -ণা পা | -া ণণা পা মা II

• প্রা• • ণ • "চর ণে শ্‌"

১´ ২ ০ ৩

II মা -া মা -া | ণা -ধা -না না | র্সা র্সা র্সা র্সা | -া -া র্সা র্সা I

হৃ • দ • য়ে • • রি ব্য থা য ত • • ক র

১´ ২ ০ ৩

I র্সা র্সা র্সা র্সা | -না র্রা র্সা -া | -ণধা -া ধঃ ধধা | ণপা -ধমা পা পা I

তু মি বি দূ • রি ত • • • • পা রিনা ব• •• হি তে

১´ ২ ০ ৩

I র্সা -া র্সা ণা | -া পা মা পা | মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | মা রা -া সা I

ব • র্ম্ম চ • র্ম্ম তু মি ভ য় বি প দ মা • ঝে

১´ ২ ০ ৩

I -া সসা মমা মা | -া পা ণপা ননা | র্সা -া -া র্সর্সা | র্মা -াঃ র্রঃ র্সা I

• তব চর ণ • ছা •• ড়িপ্র ভু • • কোথা যাই • না হি

১´ ২ ০

I ণপা -া -া র্সা | -া -া ণধা -ণপা | -া ণণা পা মা II II

ঠাঁই • • হে • • না• •• থ "চর ণে শ্‌"

মিলনের বাণী।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারতে মহামিলনের সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিক হইতেই মিলনের জাগরণবাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। বজ্রাগ্নির মধ্য হইতে সুমঙ্গল চক্রহস্তে বজ্রদেবতা যেমন আবির্ভূত হন, সেইরূপ শতবিধ দারুণ দুঃখবিপদের আকুল ক্রন্দনধ্বনি ভেদ করিয়া মিলনের সেই জাগরণ-বাণী গর্জ্জিয়া উঠিয়া আমাদের প্রাণে আসিয়া পৌছিতেছে। দুঃখবিপদের ঘন তমসাচ্ছন্ন মেঘজাল ভেদ করিয়া ভগবানের অমোঘ করুণামূর্ত্তিতে মিলনের অরুণরশ্মি দেশের প্রাণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

যে ব্রাহ্মসমাজ মিলনের অমৃতময় বীজসকল বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথম দেশের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মসমাজই আজ মিলনের পথে সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের জীবনে শতাব্দীর অধিককাল অতীত হইয়া গেল। এখনও কি আমাদের অন্তরে মিলনের সুবিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে না? যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের কালোপযোগী অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন যে, আমরা যদি বিচ্ছিন্ন থাকিবার পরিবর্ত্তে পরস্পর মিলিত হইয়া শুভকর্ম্মসাধনে অগ্রণী হই, তবে ব্রাহ্মসমাজ এক আশ্চর্য্য নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। ইহার বিপরীতে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে কার্য্য করিতে থাকিলে আমাদের বল যে কিরূপ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে, আমরা জনসমাজে কিরূপ পশ্চাৎ হইতে অধিকতর পশ্চাতের আসন গ্রহণ করিতে থাকিব, তাহা আমরা দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। অনেক রোগে রোগী যেমন দিনের পর দিন যতই হীনবল হইতে থাকে, ততই সে আপনাকে আপনি বুঝাইতে থাকে যে, সে স্বাস্থ্যের অভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে—আমাদেরও অবস্থা অনেকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। বিরোধ-বিচ্ছেদের ফলে আমরা আপনাদিগের বল যতই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া তুলিতেছি, ততই আমরা তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছি; ততই আমরা আপনাদিগকে স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া এই ভ্রান্তসংস্কারে আবদ্ধ রাখিতে চাই যে, আমরা দেশে ও সমাজে উন্নততম আসন অধিকারের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছি, অথবা অধিকার করিয়া বসিয়া আছি—কেহই আমাদিগকে সে আসন হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। ভুল সম্পূর্ণ ভুল। বলক্ষয় হইতে হইতে যখন প্রাণের অভাব হইবে তখন ব্রাহ্মসমাজকে তাহার উন্নত আসন হইতে বিচ্যুত তো হইতে হইবেই, তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিবারও ক্ষমতা কাহারও থাকিবে কিনা সন্দেহ।

আমাদের ব্যক্তিগত শত মতভেদ প্রকৃত মিলনের পথে অন্তরায় হইয়া কিছুতেই দাঁড়াইতে পারে না, অন্তত দাঁড়ান উচিত নয়। ইহা অতীব সত্য কথা যে, খৃষ্টীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় যখন গুরুতর মতভেদ সত্ত্বেও এক সাধারণ ভিত্তিতে মিলিতে পারিতেছেন, হিন্দুজাতির শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং শত সহস্র উপসম্প্রদায় শতবিধ মতভেদ সত্ত্বেও আবশ্যক হইলেই মিলনের প্রশস্ত ভূমির উপর দাঁড়াইতে পারেন, তখন এই বিগতবিবাদ পরমেশ্বরের উপাসকগণ কেনই বা আত্মপরনির্ব্বিশেষে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে জনসমাজকে প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতে পারিবেন না? আমরা কেনই বা মতদ্বন্দ্ব ও ভেদাভেদ ভুলিয়া প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের পতাকাতলে অকুণ্ঠচিত্তে দাঁড়াইতে পারিব না? সত্য কথা বলিতে কি, পিতার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার, স্বামীর সহিত স্ত্রীর সকল বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন মিলনের সম্ভাবনা দেখা যায় না। তখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী ব্রহ্মোপাসকগণের পরস্পরের সর্ব্বতোমুখী মিলনের আশা পোষণ করা কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না।

শত মতভেদ সত্ত্বেও—শত মতভেদ লইয়াই আমাদিগকে প্রীতির বন্ধনে মিলিত হইতে হইবে। একসঙ্গে মিলিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে চলিতে হইবে, একই মূলভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উপদেশ অনুশাসন দিতে হইবে এবং আমাদিগকে পরস্পরের সুখে সুখী ও পরস্পরের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম স্মৃতিসভায় ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু মিলনসাধনের যে মহামন্ত্র বিঘোষিত করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমার অন্তরে জলদক্ষরে লিখিত আছে। সেই মহামন্ত্রটী এই—Unity in essentials, diversity in non-essential and charity in all অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মূলভাবে এক হওয়া চাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর বিষয়ে মতভেদ যাহা হইতে পারে হউক এবং মতের যতই কেন বিভিন্নতা হউক না, সে সমস্তই উদারদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, যথাযুক্ত সম্মান দিতে হইবে—ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না।

ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া উদারতম ভিত্তির উপর একটী ধর্ম্মসমাজ সংগঠিত করিবার সুমহান কল্পনা

* শতাধিক-দ্বিতীয় ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ভবা মাঘ বিবৃত।

যাঁহার হৃদয় হইতে আশ্চর্য্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে স্বাধীনতা ও মৈত্রীর এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তিনি ব্রহ্মনামের পতাকা দেশে প্রোথিত করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়ে বা আত্মীয়স্বজনের ভ্রুকুটি-প্রদর্শনে কিছুমাত্র ভীত হন নাই এবং স্বকার্য্যসাধনে পশ্চাৎপদ হন নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহার লক্ষ্যসাধনের পথে, তাঁহার মহান উদ্দেশ্য ব্রাহ্মসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথে তিনি একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন—তিলেকের জন্যও ফিরিয়া দেখিলেন না যে, কে নিন্দা করিল বা কে প্রশংসা করিল; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেমন নিজেরও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তেমনি অপরেরও স্বাধীনতায় তিনি কখনই হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন নাই। অপরকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তিনি তাহাদের বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভর করিতেন এবং তাহাদিগকে নানা প্রমাণাদি প্রদর্শনে বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেন; কিন্তু অপরাপর ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ন্যায় ছল বল কৌশল ও কূটনীতি প্রয়োগের কথা তাঁহার অন্তরে আদৌ স্থান পায় নাই। সেই কারণেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৈত্রীকে তাঁহার ব্যবহারের নিয়ামক করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারই ফলে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের যাহা সার তাহাও যেমন লইতে পারিয়াছিলেন, মহম্মদীয় ধর্ম্মের যাহা সার তাহাও যেমন আত্মস্থ করিতে পারিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার তাহাও তিনি তেমনই আত্মস্থ করিয়া তাহারই উপর সুমহান সত্য ধর্ম্মকে দাঁড় করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মৈত্রীকে তিনি ব্যবহারের নিয়ামক করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার লিখিত সমস্ত তর্ক-বিতর্কের ভিতর বিপক্ষের প্রতি কিছুমাত্র কটূক্তি বা অশিষ্ট-ভাষাপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাজা রামমোহন রায়ের তিরোভাবের পর ব্রাহ্মসমাজের ভার ভগবান যাঁহার স্কন্ধে সংন্যস্ত করিয়া দিলেন, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও স্বাধীনতা ও মৈত্রী এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যের উপর অবস্থিতি করিয়াছিল। ব্রহ্মকে তিনি যখন অন্তরে প্রত্যক্ষ করিলেন, তাঁহাকে জীবনের সকল কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে বন্ধুবিচ্ছেদ বা আত্মীয়স্বজনের সহিত বিরোধ—কোন বিভীষিকাই বাধারূপে দাঁড়াইতে পারিল না। তিনি সকল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া জীবনের সকল বিভাগে সকল অনুষ্ঠানে সর্ব্বোচ্চ আসনে ভগবানকে বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, যে সকল কার্য্যে ভগবানের সহিত সংসারের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে, সেই সকল কার্য্যে অকুতোভয়ে সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের অনুচর হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু যে সকল বিষয়ে সেরূপ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে না, কুলপ্রথা প্রভৃতি সেই সকল বিষয়ে পরিপার্শ্বের সহিত যথাসম্ভব মৈত্রীস্থাপন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। এইপ্রকার সামঞ্জস্যসাধনের কারণেই তিনি একদিকে নবতর দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহের মূলে রাখিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেমন অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, সেইরূপ গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহকে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বসমূহকে দেশের প্রচলিত ধারার সহিত অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া পরস্পরকে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে স্বাধীনতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিয়াই তিনি নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিতে পারিলেন যে, ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার প্রত্যেক মানবেরই আছে—কাহাকেও সেই অধিকার হইতে কেহই বিচ্যুত করিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রের তাৎপর্য্যে এই মহাবাণী ঘোষিত করিয়া তিনি যেমন আত্মার স্বাধীনতা সুপ্রচারিত করিলেন, সেইরূপ তিনি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে যে "উপহার" দিয়াছেন, সেই "উপহারে" "মৈত্রীই যেন তোমাদের ব্যবহারের নিয়ামক হয়" এই সুগম্ভীর মন্ত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া স্বীয় অন্তরে মৈত্রীভাবের সাধনার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মৈত্রীভাবের সর্ব্বপ্রধান জলন্ত সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ইহাতে বহু সম্প্রদায়ের বহুবিধ সমালোচনা প্রকাশ করিতে হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার প্রকাশ অবধি এই উননব্বই বৎসরের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বা কোন ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা বা অবজ্ঞাসূচক একটী শব্দও প্রযুক্ত হয় নাই।

তিনি দেশের তদানীন্তন প্রচলিত ধর্ম্মমতসমূহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও দেশের ধর্ম্মধারার সহিত যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন এবং কোন ধর্ম্ম বা উপধর্ম্মকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। তিনি চাহিতেন যে, তিনি যেমন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক করিয়াছেন, সেইরূপ অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়গণও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বিদ্রূপবাণ প্রভৃতি নিক্ষেপ করিবার পরিবর্ত্তে এবং ছলে-বলে-কৌশলে ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে স্ব-সম্প্রদায়ে আনিবার পরিবর্ত্তে পরস্পরের প্রতি সদয় ও উদার ব্যবহারে যত্নবান হউন। ইহার বিপরীতে সেকালে ডফ্ প্রমুখ মিশনারীগণ রাজা রামমোহন রায়ের প্রবত

সাকারবাদের কথা ভুলিয়া গিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অযথা বিষম অন্যায় নিন্দাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া এবং নানা উপায়ে হিন্দু সন্তানদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলঘাতক ঐরূপ প্রণালীর বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালিত করিয়াছিলেন। এইজন্য সেকালের বিরোধজনিত ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ কেহ কেহ তাঁহার প্রতি খৃষ্টবিদ্বেষের কথা আরোপ করিয়াছেন। এই উক্তি নিতান্তই ভ্রমসমাকুল। হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় বাইবেল কোরাণ প্রভৃতির প্রতি তিনি যথেষ্টই শ্রদ্ধাবান ছিলেন, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

স্বাধীনতার সহিত মৈত্রীভাব কিরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে, কিরূপ অঙ্গাঙ্গী আকারে, কিরূপ আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যের সহিত তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত মতভেদের কারণে সমাজঘটিত বিচ্ছেদ সংঘটিত হইবার পরেও কেশবচন্দ্রের পরলোক-গমন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন সখ্যবন্ধন রক্ষা করাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিরোধবিবাদের কাল সুদূরে অতীত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধবিবাদের কোনই কারণ উপস্থিত নাই; বরঞ্চ আমরা সকলেই ভগবানের মিলন-পতাকা স্কন্ধে বহন করিয়া মিলন-পথের পথিক হইবার জন্য, প্রেম-পথের যাত্রী হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছি। সময় আসিয়াছে, যখন পরস্পরের সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি উদার দৃষ্টিতে ক্ষমা করিয়া পরস্পরের সদ্ভাব ও সাধু ভাবের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত উদার মত সকল অবলম্বন করিয়া স্বাধীনতা ও মৈত্রীর সামঞ্জস্য-সাধন করিতে হইবে। এইভাবে অগ্রসর হইলেই বর্ত্তমান যুগে ভারতে মিলনের প্রথম পথপ্রদর্শক ব্রাহ্ম-সমাজেরই জয়জয়কার হইবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রপ্রমুখ ব্রাহ্মদিগের লিখিত পত্রের প্রত্যুত্তরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মিলনের জন্য যে উপদেশ-বাণী দিয়াছিলেন, আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যে তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া কেবল ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে নহে, কিন্তু ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্যান্য প্রাচীনপন্থী হিন্দুসম্প্রদায়দিগেরও সহিত ব্রাহ্মসমাজের মহামিলন সাধনে যত্নবান্ হই। তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম এই—'দেশের প্রাচীন ধারার সহিত বিচ্ছেদ সংঘটিত করা এবং যে হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের উৎপত্তি, সেই হিন্দুসমাজের প্রাচীনপন্থী সম্প্রদায়-সমূহের ব্রহ্মোপাসক সাধুপুরুষদিগকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বা কর্ত্তব্য হইতে পারে না'। তাঁহার মিলনবাণী কি প্রাচীনপন্থী কি নবীনপন্থী কি হিন্দুসমাজ কি ব্রাহ্মসমাজ, সকলেরই পক্ষে প্রযুজ্য। তিনি বলেন—"তোমরা উভয় পক্ষই সদ্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধন কর; তাঁহাদের বল তোমাদের নূতন বলে মিলিত হইয়া তাহাকে আরো পোষণ করুক, এবং তোমাদের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত করুক, ইহাই আমার অভি-লাষ। তোমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে, এবং তাঁহারাও তোমাদের সাহায্য অভাবে আরো মৃদুগতি হইবেন ... ... তোমরা যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ধাবমান হইতেছ, ইঁহাদেরও তাহাই লক্ষ্য। কেবল উপায় অবলম্বন বিষয়ে তোমাদের পরস্পরের মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মিলনবাণী যদি গৃহীত হইত তবে ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন অবধি শতাব্দীর মধ্যে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মানন্দের বিচ্ছেদ অবধি ন্যূনাধিক ৬০ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ মৃদুগতি হইবার পরিবর্ত্তে কিরূপ বিক্রমের সহিত সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারিত, তাহা কল্পনা করিলেও আমা-দের হৃদয় মন আনন্দে ভরিয়া উঠে।

এক্ষণে আমাদের পরস্পরের মধ্যে অথবা জননী-সমান বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সহিত আমাদের বিরোধ-বিবাদ করিবার এতটুকু অবসর নাই। শত মতভেদ সত্ত্বেও আমাদের পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে হইবে। যদি আমরা আপনাদিগকে মৃত্যু ও বিনাশ হইতে বাঁচাইতে চাই, যদি আমরা আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন করিতে ইচ্ছা করি, যদি আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন পূর্ব্বক জগতের মহাসভায় উন্নত আসন অধিকার করিবার দাবী করিতে উদ্যুক্ত হই, তবে বলা বাহুল্য যে, আমাদের মিলিত ভাবেই পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া এই উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা বুঝিয়াছি যে আমাদের মিলনের অভাবই সকল দুঃখসঙ্কটের কারণ। আমরা জানিয়াছি যে আমাদের মধ্যে মিলনের অভাবই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা ও অবনতির মূল নিদান। চিকিৎসকেরা বলেন যে, রোগের নির্ণয় হইলে অর্দ্ধেক আরোগ্যলাভ হয়, কারণ রোগের কারণ ও অবস্থা বুঝিলে ঔষধ সুনির্ব্বাচিত হইতে পারে। আমরা আমাদের বর্ত্তমান বলহীনতা প্রতি পদেই অনুভব করিতেছি এবং তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ যে আমাদের পরস্পরের পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান ও বিভিন্ন পরস্পরের সুখে দুঃখে

সহানুভূতি ও সমবেদনার অভাব, তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। রোগকে চাপা দিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলে আরোগ্যলাভ ত হয়ই না, প্রত্যুত রোগীকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। ব্রাহ্মসমাজে ভীষণ দৌর্ব্বল্য-রোগ প্রবেশ করিয়াছে। এই রোগের কারণও আমরা বুঝিয়াছি, এবং বুঝিয়াছি যে রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া পরস্পরের মিলনসাধন—মিলনই দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্তিলাভের এবং জীবনের পথে অগ্রসর হইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় জানিয়া সকল দেশে সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ যদি স্বীয় রোগ হইতে আরোগ্যলাভের পথে অগ্রসর হইবার অমোঘ উপায় মিলনসাধনকে গ্রহণ না করেন, তবে ব্রাহ্মসমাজের বিনাশ ও মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই মিলনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে পরস্পরের স্বাধীন মতামতের প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক জনহিতকর কার্য্যসমূহে পরস্পরের স্কন্ধে স্কন্ধ দিয়া সমগ্র জনসমাজের সহিত মিলিতভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। এইভাব অন্তর হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে হইবে যে, আমার সম্প্রদায়ই একমাত্র ভাল কাজ করিতে পারে, অপর কোন সম্প্রদায়ই সেইরূপ কার্য্য করিবার অধিকারী নয়। যতদূর সম্ভব প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেকে ভাবে ও চিন্তায় মিলিতভাবে অগ্রসর হইয়াই সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে বিজয়ী করিতে হইবে। এইভাবের সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকের বিজয়বার্ত্তা জগতের চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতে থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন হইতে শতাধিক বৎসর অতীত হইবার পর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদিষ্ট সৎপরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক এবং তাঁহাদের পদানুসরণে একত্র মিলিত হইয়া সকল কর্ম্ম সাধন করিতে থাকিলে অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকলেই মুগ্ধনয়নে তাহাকে দেখিতে থাকিবে এবং মঙ্গলময় প্রেমস্বরূপ ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ ব্রাহ্মসমাজের মস্তকে শতধারে বর্ষিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজ তখন অপূর্ব্ব নবতর শ্রী ধারণ করিবে এবং সুপ্তোত্থিত সিংহবিক্রমে নববলে জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

আজ মাঘোৎসবের প্রারম্ভে আমার এই যে আশা ও প্রার্থনা ভগবানের চরণে এবং ভক্তজনগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, ভগবান অন্তর হইতে নিঃসৃত এই আশা ও প্রার্থনা সফল করুন।

নর-দেবতা।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এই চলমান জগতে যা-কিছু চলছে, তারই সঙ্গে আমাদের মনের এবং প্রাণের চলাকে মেলাতে হ'ল তারই নাম জীবযাত্রা।

নিজের দৈহিক মানসিক চলার মূলে মানুষ যে-চালনাকে অনুভব করেচে তাকে মানুষ বলে শক্তি। তারই দৃষ্টান্তে সে স্থির করেচে জাগতিক সমস্ত চলাফেরার মূলে তেমনি একটি চালনাশক্তি আছে। এই শক্তির প্রকৃতি কি তাও সে নিজের প্রকৃতি থেকে বুঝে নিয়েচে। একটি মাত্র শক্তিকে সে নিজের মধ্যে অব্যবহিত ভাবে একান্তভাবে জানে, সে হচ্চে ইচ্ছাশক্তি। জগতের গোড়াকার শক্তিকেও সে ইচ্ছাশক্তি ব'লে ধরে নিয়েছিল।

কর্ম্ম ব্যাপারটা চোখে পড়ে, ইচ্ছাটা থাকে অলক্ষ্যে। এই অদৃশ্য ইচ্ছা শান্ত থাকলে কর্ম্ম শান্ত থাকে, ইচ্ছা প্রয়োজনের অনুকূল হ'লে কর্ম্ম অনুকূল, প্রতিকূল হ'লে কর্ম্ম বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। এইজন্য যে-ইচ্ছা নিজের বাইরে অন্যের মধ্যে, তাকে ভয়, লোভ বা প্রেমের দ্বারা বশ ক'রে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে হয়।

জাগতিক ক্রিয়া যে ইচ্ছার চালনায় ঘটে ব'লে মানুষ স্থির করেচে তাকে নিজের আনুকূল্যে আনবার বিবিধ প্রক্রিয়ায় মানুষের পূজা আরম্ভ। জগতের শক্তিকে নিজের শক্তির সহায় করবার এই সাধনাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রথম সোপান ব'লে ধরা যেতে পারে।

মানুষ নিজের মধ্যে একটা বৈপরীত্য দেখেচে। দেখেচে যে তার কর্ম্ম স্থূল কিন্তু কর্ম্মের উদ্ভব যে ইচ্ছা সেটা ইন্দ্রিয়বোধের অতীত। রূপধারী তার দেহ কিন্তু দেহের গভীরে যে প্রাণ তা অরূপ। চারিদিকের বস্তু তার প্রত্যক্ষ কিন্তু যে মনের কাছে সেই বস্তু গোচর হচ্চে সে নিজে অগোচর।

এর থেকে মানুষের এই প্রত্যয় জন্মেচে বাস্তব ব'লে যা-কিছু সে দেখচে জানচে সেই দেখা-জানার মধ্যেই তা চরম নয়, এমন কিছুকে সে আশ্রয় করে আছে যা দেখা-জানার মূলে। মানুষ নিজেকে যদি একান্ত বাইরে থেকেই দেখে তবে দেখতে পাবে পরে পরে কতকগুলি কর্ম্ম ও ছবি। মানুষ পদার্থের বাস্তব প্রমাণ এর বেশি আর কিছু নেই। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্ম ও ছবির চেয়েও নিঃসংশয় ও অব্যবহিতভাবে এমন একটি সত্যকে সে জানে, যে সত্য তার সমস্ত কর্ম্মকে ও প্রত্যক্ষ প্রকাশকে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে তুলেচে। এই হচ্চে তার আত্মোপলব্ধি।

এই যে নিজের মধ্যে ঐক্যোপলব্ধি, এই উপলব্ধিকে মানুষ আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেচে। এমন কথা বলেচে, যে মানুষ নিজের মধ্যে সকলকে ও সকলের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। যে ঐক্যতত্ত্ব তার নিজেকে অখণ্ড করেচে সেই তত্ত্বই অন্যের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করেচে।

বস্তুকে বিশ্লেষণ ক'রে তার উপাদানবাহুল্য দেখা যায় কিন্তু সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তা এক, তা সৃষ্টির মূল রহস্য। বস্তুকে সন্ধান করতে করতে তার মূলে গিয়ে পাওয়া যায় একটি বিদ্যুতমণ্ডল, সেই মণ্ডলের কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বৈদ্যুতাণু ও সেই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরচে ঋণাত্মক বৈদ্যুতাণু। এই আবিষ্কারটি পরম বিস্ময়কর কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়কর এদের সম্বন্ধসূত্র। এই সম্বন্ধের বিচিত্র লীলা অনুসারে বৈদ্যুতকণার নৃত্য ভিন্ন ভিন্ন ধাতুরূপ ধারণ করচে। আবার সেই মূল ধাতুগুলি একটি নিরবচ্ছিন্ন বিরাট সম্বন্ধযোগে জগতটাকে সংঘটিত করেচে। এই ক্রিয়াশীল সম্বন্ধই বিচিত্রতাকে সৃষ্টি করে, আবার সেই বিচিত্রতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে তাকে একের যোগে যুক্ত করে থাকে।

এই কথাটিই আছে ঈশোপনিষদে—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। বিচিত্র ক্রিয়াশীল জগতকে এক সত্য অধিকার ক'রে আছেন। নিজের আত্মায় আমরা এই সত্যেরই আভাস পাই। এই আত্মা আমার সম্পর্কীয় অসংখ্য নানাকে অধিকার ক'রে এক। তারই যোগে আমার সমস্তকিছু সম্বন্ধযুক্ত। এই পরম রহস্যময় সম্বন্ধকে যাঁরা যত ব্যাপক ক'রে উপলব্ধি করেচেন সত্যকে তাঁরা তত বড় ক'রে জেনেচেন।

যে সত্যকে আমরা কেবল শক্তিরূপে জানি, প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই আপন শক্তির সঙ্গে তার যোগসাধন করি। আমরা চাই অন্ন। কিন্তু এইখানেই ত শেষ হ'ল না, আরও একটা মস্ত চাওয়া বাকী রইল। বিনা প্রয়োজনে মানুষ চায় আনন্দ,—এই আনন্দের পূর্ণতা পায় যার কাছে, সে শক্তি নয় সে ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির সঙ্গে আপন ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণ মিলনেই অহৈতুক তৃপ্তি।

ডাক্তারের কাছে যখন যাই তখন ডাক্তারকে দেখি শক্তিরূপে, আরোগ্যশক্তি। তার কাছে প্রয়োজনসিদ্ধির দাবি। কিন্তু বন্ধুত্বের টানে সেই ডাক্তারের কাছে যখন যাই তখন তাকে দেখি ব্যক্তিরূপে। তখন তার মধ্যে আত্মা আপন আত্মীয় সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধ অনির্ব্বচনীয়, এই সম্বন্ধ সকল সৃষ্টির মূলে। এই সম্বন্ধের অন্তরতম উপলব্ধিকেই বলে প্রেম। এর কাছে সকল প্রয়োজন গৌণ হয়ে পড়ে। তখনই বলা সহজ হয়, "মা গৃধঃ", লোভ ক'রো না।

কেন না, এই অন্তরতম সত্য-সম্বন্ধের যে সম্ভোগ, সে ত্যাগের দ্বারা, আপনাকে দিয়ে। যেখানে শক্তির দরবার সেখানে লোভের দাবি, যেখানে প্রেমের আহ্বান সেখানে আপনাকে দেবার ঔৎসুক্য। না দিতে পারলে মিলনের মাঝখানে নিজেই আড়াল হয়ে দাঁড়াই। যতক্ষণ ব্যক্তিস্বরূপে না আসি ততক্ষণ অর্থের মূল্য পরিমাণে। তাকে মাপা যায়, গণা যায়, ভাঙা যায়। ব্যক্তিস্বরূপে এসে পৌঁছলে তার ঐশ্বর্য্য আনন্দে প্রেমে। লোভ আশ্রয় করে অর্থকে, আনন্দ আশ্রয় করে পরমার্থকে, যাকে ইংরাজীতে বলে Value।

অর্থ নিয়ে আছে বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ রাজা, বিশেষ ধনী। পরমার্থ আছে বিশ্ব-ব্যক্তির অধিকারে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে। বীণা যন্ত্রটা আছে অর্থের কোঠায়। তাকে নিয়ে দরদস্তর, কাড়াকাড়ি, মামলা-মকদ্দমা চলে। কিন্তু গীতমাধুর্য্য আছে পরমার্থশ্রেণীতে; তার ভোগ নিয়ে সীমানার লড়াই নেই। অবারিত বিশ্বজনীনতাতেই তার সম্মান। বীণার অধিকার নিয়ে যেখানে আমার অহঙ্কার সেখানে আমি ব্যক্তিবিশেষ—সঙ্গীতের রস নিয়ে আমার যে আনন্দ সেই আনন্দ আমার অন্তরঙ্গ বিশ্বমানবের; সে আনন্দ সকল কালের, সকল জনের। মাথা গণতি হিসাবে প্রত্যেক মানুষই যে তাতে সুখ পায় তা নয়, কিন্তু সেই সুখেরই সদাব্রত তার, কোনো বিশেষ মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তবে সেটা শিক্ষার অভাব, বোধের জড়তা, বিকৃত অভ্যাস প্রভৃতি কোনো আকস্মিক অপূর্ণতা বশত।

নিখিল পুরুষের ব্যক্তিরূপকে যদি নিজের ব্যক্তিরূপের মধ্যে নিবিড় প্রেমে উপলব্ধি করি, তা'হলেই বাহিরের ব্যক্তি-বিশেষের ধনে যে লোভ তার বন্ধন কাটে। সংসারে তার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। ত্যাগী যাঁরা তাঁরা আত্মীয় সম্বন্ধকে বিরাটের মধ্যে পেয়েচেন বলেই ত্যাগী। তাঁরাই মৈত্রেয়ীর মত সহজে বলতে পারেন—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই কথাটাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

ঈশ আছেন চলমান জগতের সমস্তকিছুকে অধিকার ক'রে, অতএব ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, কারও ধনে লোভ করবে না।

এই পরিব্যাপক পরম সত্য সম্বন্ধে ঈশোপনিষৎ বলেচেন, তাঁকে যারা একান্ত সীমাবদ্ধভাবে দেখে তাদের মন তমসাবৃত হয়। কিন্তু যারা তাঁকে একান্ত অসীম-

ভাবে দেখে তাদের অন্ধকার আরও বেশী। যারা সীমাকে অসীমকে মিলিয়ে দেখে তারাই সত্যকে জানে। অর্থাৎ এই পরমপুরুষ বিশেষের মধ্যেও এবং বিশেষকে অতিক্রম করেও। বিশেষকে একেবারে না-ক'রে দিয়ে যে-অসীম সে সম্পূর্ণ অন্ধকার ছাড়া কিছুই নয়।

মানুষের সত্তাও দেখি দুই কোটিকে স্পর্শ ক'রে আছে। একদিকে তার স্বভাব, আর একদিকে বিশ্বভাব। স্বভাবে সে পশুর স্বজাতীয়; প্রাণরক্ষা ও বংশরক্ষার উপযোগী প্রবৃত্তি দ্বারাই সীমাবদ্ধ; এখানে তার অঞ্জলি আছে গ্রহণ করবার অভিমুখে। বিশ্বভাবকে নিয়ে তার মানবধর্ম্ম, এখানে সর্ব্বমানবের সত্য সে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করে, যে-মানব ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে অধিষ্ঠিত। এখানে তার অঞ্জলি দানের দিকে। এখানে তার সাধনা এই যে, সম্পূর্ণ ভাল হ'তে হবে, শোভন হ'তে হবে, অর্থাৎ তার স্বভাবকে উৎসর্গ করতে হবে বিশ্বভাবের কাছে; প্রাণকে নিবেদন করতে হবে অমৃতের জন্যে; যথার্থ পাওয়া পাবে ব'লে ত্যাগ করতে হবে, যথার্থ বাঁচা বাঁচবে ব'লে মরতে হবে।

যাকে আমরা ভাল বলি সে জিনিষটি বিশেষ মানুষের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। অর্থে এই ভাল নয়,' এই ভালো পরমার্থে—এই ভালর সম্বন্ধ সকল মানুষকে নিয়ে। এর জন্যে প্রার্থনা রাজার কাছে নয়, ধনীর কাছে নয়, পরমপুরুষের কাছে। তাঁহাকেই বলি "যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।" যা ভাল তাই আমাদের দাও। তাই ঋষি বলেছেন, "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" যে দেবতা বিশ্বের আদিতে অন্তে, (অর্থাৎ নিখিলকে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে আছেন) তিনিই আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

অন্য জীবজন্তুর প্রয়োজনবুদ্ধি আছে—কেবল মানুষেরই শুভবুদ্ধি। তার কারণ, মানুষই অন্য সত্তার উপলব্ধির সঙ্গে যে-পরিমাণে এক ক'রে দেখে সেই পরিমাণেই সে মহামানুষ মহাত্মার পরিচয় দেয়। ধনী হতে হবে এ ইচ্ছা মানুষের বিষয়বুদ্ধিতে, ভাল হ'তে হবে এই ইচ্ছা তার ধর্ম্মবুদ্ধিতে। অর্থাৎ এইটেতেই তার সত্য মানবপ্রকৃতি প্রকাশ পায়। পূর্ব্বেই শাস্ত্রবাক্যে বলা হয়েছে, যে-মানুষ অন্যের মধ্যে নিজেকে ও নিজের মধ্যে অন্যকে জানে সে-ই সত্যকে জানে।

এমন আশ্চর্য্য কথা কেবল মানুষই বলতে পেরেছে, অন্য কোন প্রাণী পারে নি। এবং এই আশ্চর্য্য কথাটির পরেই তার ধর্ম্মসাধনার প্রতিষ্ঠা। সকলকে নিয়ে মানুষ, এইটিকে অভিব্যক্ত করবার জন্যেই তার যত কিছু ধর্ম্মমত।

ধর্ম্মের সাহায্যে মানুষ মুক্তিকামনা করেছে। কিসের থেকে মুক্তি? যা অসত্য তার থেকে। কি অসত্য? অন্য জন্তুর মত নিজের সত্তাকে আর-সব থেকে পৃথক জানার বুদ্ধি অসত্য। বিরাট পুরুষের মধ্যে মানুষ সত্য। সেই জন্যেই মানুষকে পূর্ণতা চাইতে হবে ভালর মধ্যে, সুন্দরের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে—অর্থাৎ অন্তরতম বিশ্ববোধের মধ্যে। যে সব প্রবৃত্তিকে রিপু বলা যায় তারা পশুধর্ম্ম থেকে মানবধর্ম্মে মানুষকে মুক্তি দেবার বিরুদ্ধে শত্রুতা করে।

মানুষ এই আশ্চর্য্য কথা বলেছে ঐ এবং সে এই দুইটিকে নিয়ে তার পরম ঐক্যের ক্ষেত্র।

এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোঽস্য পরমো লোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

ইনি এর পরমা গতি, ইনি এর পরমা সম্পৎ, ইনি এর পরমা আশ্রয়, ইনি এর পরম আনন্দ। পশুর পক্ষে এ আছে, সে নেই, তাই পরমের কোন অর্থ নেই। তার গতি, তার সম্পদ, তার আশ্রয়, তার আনন্দ, তার স্বভাবের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যেই। মানুষের যা পরম তা মহান্ পুরুষকে নিয়ে। সেখানে তার গতি কোনো সুযোগকে নিয়ে নয়,' তা'র সম্পদ্ অর্থকে নিয়ে নয়, তা'র আনন্দ ভোগসুখ নিয়ে নয়। এখানে তার আনন্দ সেই গভীর সম্বন্ধকে নিয়ে যে-সম্বন্ধে সকলের যোগে সে সত্য। মানুষের অমরত্ব নিয়ে অনেক মত অনেক তর্ক। উপনিষৎ কাল-গণনামূলক অমরতার কথা বলছেন না। উপনিষৎ বলেন, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি—যাঁরা এঁকে জানেন তাঁরা অমৃত হ'ন। কে তিনি?

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ—

তিনি সেই দেবতা যাঁর কর্ম্ম সকলকে নিয়ে, সকলের আত্মায় যিনি মহাত্মা, সর্ব্বদা যিনি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ—মৃত্যুভয় দুঃখ দেবে না আত্মা যদি সেই বেদনীয় পুরুষকে আত্মীয় জানে। স্বতন্ত্র আমিই মরে, কিন্তু সকলকে নিয়ে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে যোগে আমার মৃত্যু নেই। ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা, ত্যাগের দ্বারা সর্ব্বব্যাপী পুরুষের মধ্যে আনন্দ পাও, লোভ যাবে কেটে; তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, সর্ব্বব্যাপী পুরুষের মধ্যে আপনাকে জানো, মৃত্যুভয় যাবে দূরে। সীমাকে নিয়ে লোভ,

ভূমাকে নিয়ে আনন্দ, সীমার মধ্যে মৃত্যু, ভূমার মধ্যে অমৃত। ভোগকে সত্য করো ভোগকে বর্জ্জন না করে, সীমাকে বর্জ্জন করে। আনন্দভোগই ব্যক্তিস্বরূপের (পার্সোনালিটির) চরম ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে পরমের অভিমুখে না নিয়ে গিয়ে সঙ্কীর্ণের মধ্যে অবরুদ্ধ করলেই যত মারামারি কাটাকাটি। সত্য ইচ্ছাতেই শান্তি। সত্য ইচ্ছা সেই পরম পুরুষের ইচ্ছা যাঁর ইচ্ছা সকলকে নিয়ে। তাঁর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা করার সাধনাকেই বলি ধর্ম্ম-সাধনা। ভালো হওয়া তাকেই বলে। এই ভালোর ইচ্ছা মানবের ধর্ম্ম।

নিজের জীবনে পরিপূর্ণ পুরুষের সাধনাই নানা নামে নানা ধর্ম্মরূপে স্বীকৃত। যিশু বলেচেন, আমি মানুষের পুত্র, পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে আপন পুত্রত্ববোধ তিনি একান্ত ভাবে অনুভব করেচেন, তাই বলতে পেরেচেন দীনতম মানুষকে অন্ন যে দেয় সে আমাকেই দেয়।

এতক্ষণ এই বলবার চেষ্টা করেছি যে, যে-পূর্ণপুরুষ "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ," তিনি বিশেষভাবে মানবিক, তাঁর মধ্যে মানব-সম্বন্ধের চরমোৎকর্ষ। তাই তাঁকে বলি :"পিতৃতমঃ পিতৃণাং," তাঁকে বলি "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" তিনিই বন্ধু, তিনিই পিতা, তিনিই বিধাতা।

সূর্য্যে আগুনে বাতাসে যে জাগতিক ক্রিয়া তার মধ্যে ভালমন্দর আদর্শ নেই, তার মধ্যে মানব-সম্বন্ধের তৃপ্তি নেই। তার সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, ব্যবহারের সম্বন্ধ; কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধ, সেবার সম্বন্ধ নয়। অর্থাৎ সেখানে আমাদের অর্থ, কিন্তু পরমার্থ নয়।

একসময়ে জাগতিক শক্তির কাছ থেকে অন্ন, ধন ও শত্রুপরাভবের প্রত্যাশা করেছিলুম; বিজ্ঞানের কাছে আজও সেই প্রত্যাশা করে থাকি। কিন্তু যখন থেকে প্রেয়ের উপরে শ্রেয়কে বড় করেচি, অর্থের উপরে পরমার্থকে, তখন থেকে যাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি মানবিক। তাঁর সঙ্গে ব্যবহারের যোগ নয়, ভালোবাসার যোগ। সংসারযাত্রার সিদ্ধিলাভ জাগতিক নিয়মে, আত্মার চরিতার্থতালাভ পরমাত্মার প্রেমে। বৈষয়িক অভাব, সাংসারিক ব্যর্থতা দ্বারা তার ন্যূনতা ঘটে না—সেই প্রেমের পূর্ণতা প্রেমেরই মধ্যে।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" পরমাত্মাকে ভালবেসে উপাসনা করতে হবে, যিনি তাঁকে ভালবেসে উপাসনা করেন তাঁর প্রিয় মরণধর্ম্মী হন না। নির্গুণ সত্তা বলে যদি কোনো পদার্থ থাকা সম্ভব হয় তবে তার প্রতি প্রেমের কোনো অর্থ নেই। মানবিক গুণের পরমতা যাঁর গুণে, মানুষ তাঁকেই এমন প্রেম দিতে পারে যা সকল প্রেমের উপরে।

এই প্রেমের সত্য প্রমাণ কোথায়? ভাবুকতায় নয়, বিশ্বকর্ম্মে। সাধকের সংজ্ঞা এই—"আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্।" পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ; কিন্তু সেই আনন্দ ক্রিয়াবান, ভাবরসে অন্তর্বিলীন নিষ্ক্রিয়তা নয়।

"সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্, তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।" ভগবান সর্ব্বব্যাপী, অতএব তিনি সর্ব্বগত কল্যাণ। তাঁকে প্রিয় ব'লে যে উপাসনা করবে সেই পরম প্রিয়ের সঙ্গে তার যোগ হবে সকলের কল্যাণ কর্ম্মে।

পরমপুরুষকে কেন মানবিক বলচি এই কথাটাকে স্পষ্ট করা চাই। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখতে পাই, এই দেহ অসংখ্য পৃথক জীবকোষের সমবায়। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনক্রিয়া, আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের মধ্যে তাদের ব্যবধান যথেষ্ট। শুধু দেশের ব্যবধান নয়, কালেরও ব্যবধান। যে-সব জীবকোষ অতীত, আর যারা এখনও আসেনি, এই দেহ তাদের মধ্যেকার সেতু। বস্তুত এই দেহের অধিকাংশই বর্ত্তমানে নেই।

এই জীবকোষগুলি একদিকে স্বতন্ত্র, অন্যদিকে সমগ্র দেহের সম্পর্কে বিশ্বতন্ত্র। সমস্ত দেহের সম্বন্ধেই তারা সত্য, একান্ত পার্থক্যে তারা নিরর্থক, সমস্ত দেহের কাছে সম্পূর্ণ আত্মদানের দ্বারা তারা সার্থক।

কল্পনা করা যাক্ এই সমস্ত জীবকোষের একটা সাধনা আছে। সে সাধনা কি হ'তে পারে? দেহাত্মবোধের সাধনা। মনে করা যেতে পারে সমগ্র দেহ ব'লে একটা কিছু আছে এ বোধ তাদের অধিকাংশেরই নেই। যদি মনে করা যায় তাদের মধ্যে কেউ সমগ্র দেহের অনুভূতি নিশ্চিতরূপে পেয়েচে, তাহ'লে সন্দেহ নেই যে সেই অনুভবে তার অবরুদ্ধ চৈতন্য একটি বিরাট সত্যের মধ্যে মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তির আনন্দ সমগ্র দেহের কর্ম্মকে আপন কর্ম্মরূপে সচেষ্টভাবে গ্রহণ করে। সমগ্র দেহে তার আনন্দ, সমগ্র দেহের কর্ম্মে সে ক্রিয়াবান।

এমনি করেই মহামানবের চেতনা যাঁর কাছে বাধাহীন, তিনি জানেন মানুষে মানুষে যে ব্যবধান আছে সে ব্যবধানটি একটি সক্রিয় অদৃশ্য সম্বন্ধের দ্বারা অধিকৃত। এই সম্বন্ধের স্বভাব হচ্চে আনন্দ, অর্থাৎ প্রেম। সম্বন্ধের পূর্ণতাতেই আনন্দ, তাকেই বলে প্রেম। তাই উপনিষৎ বলেন, "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" আকাশ, যাকে শূন্য মনে করি, তা যদি আনন্দময় সম্বন্ধের দ্বারা বিরাজিত না থাকত, তাহ'লে কেই-বা প্রাণচেষ্টা করত। বাইরে

থেকে মনে হয় পৃথক্ প্রাণচেষ্টা, সেটা সম্ভবপর হয়েচে একটি সর্ব্বব্যাপী সত্যসম্বন্ধের যোগে।

এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব মানুষের মধ্যে শক্তিমান হয়েচে ব'লেই মানুষের দ্বারা সমাজসৃষ্টি সম্ভব হ'ল। সমাজে মানুষের প্রয়োজন সাধন হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রয়োজন-সম্বন্ধের চেয়ে সত্যতর আনন্দের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধটি যদি সমাজে কাজ না করে তবে কেবল স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা কোন সমাজ বেশী দিন টেঁকে না। দশের প্রয়োজনের চরমে নিজের প্রয়োজন, সমাজের ব্যাখ্যায় মানুষ এমন কথা ব'ল্তে পারে না। তা যদি বল্ত তাহ'লে দশের প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে নিজের মৃত্যু বা চরম ক্ষতি স্বীকার করত না। সমাজে প্রয়োজনসিদ্ধির স্থান আছে, কিন্তু সেটা বাহিরের এবং তা নিয়ে বিরোধ বেধে ওঠে। এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে, ধনিকে কর্ম্মিকে লাগে হানাহানি। এই ক্ষেত্রে সমাজ নিজের ধর্ম্মকে আঘাত করে ব'লেই আত্মঘাতী হয়। তখন সে "মা গৃধ" এই বাণীকে উচ্চারণ করতে পারে না, কেননা, যে বিরাট পুরুষের আসন সমস্ত সমাজকে ব্যাপ্ত করে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ তাঁর উপলব্ধিকে খণ্ডিত করে। সমাজ মরে এই রাস্তায়।

সমাজে আর একটি বাহ্যিকতা আছে, তারও আতিশয্যে বিপদ। সে হচ্চে আচার। প্রেমে সত্যের উপলব্ধি পূর্ণ হয় তাই মিলন সেখানেই, শান্তি সেখানে। আচার সত্যের চেয়ে প্রবল হ'য়ে উঠে সর্ব্বব্যাপী যে ভগবান সর্ব্বগত শিব তাঁকে অতিক্রম ক'রে নিজেকে দাম্ভিকতার সঙ্গে প্রচার করে, সমাজেরই দোহাই দিয়ে সমাজের নিত্য ধর্ম্মকে খর্ব্ব করতে থাকে। তখন আচারীতে আচারীতে সর্ব্বনাশ বাধে। বিষয়ের অভিমান যেমন, আচারের অভিমানও তেমনি। বৈষয়িকতা সর্ব্বজনীনতার বিরুদ্ধ, আচারিকতাও তাই। আচার সাম্প্রদায়িক অহংবুদ্ধিকে প্রবল করে, এই অহং-এর তাপ ব্যক্তিগত অহং-এর চেয়ে বেশী বই কম নয়। একথা মনে রাখা চাই যে, সেই সকল প্রবৃত্তিতে আমরা পরস্পরকে নিষ্ঠুর ক'রে মারি যারা বিশ্বমানবের বোধকে বাধা দেয়। সাধারণতঃ ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বাধা পদে পদে। এই কারণে বড় বড় নামের আড়ালে মানুষ মানুষকে যেমন সাংঘাতিক পীড়া দেয় এমন আর কিছুতে নয়। মানুষের যিনি দেবতা তাঁর বোধ বাধাগ্রস্ত হ'লে মানুষকে মারবার জন্যে ঠকাবার জন্যে ধার্ম্মিক নরনারীরা মানৎ দিয়ে থাকে।

দেবতাকে মানুষ ডেকেচে, পিতানোঽসি, তুমি আমাদের পিতা। পিতা নামের মধ্যে মানবের বোধ প্রকাশ পায় একথা মানতেই হবে। 'পিতা নো বোধি—প্রার্থনা এই যে, তুমি পিতা এই বোধটি সত্য হওয়ার সঙ্গে সকল মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার বোধ স্বীকার করতে হবে। মানুষ-মারা লড়াই করতে যাবার পূর্ব্বে একথা বলার মতো কপটতা ও অপরাধ আর নেই—যে তুমি আমাদের পিতা। এতে মানবের পিতাকে দানব বলাই হয়। আমরা যেন জিতি এ দাবি আমাদের দলের লোকের কাছে, আমরা যেন মিলি এ প্রার্থনা তাঁর কাছে যিনি সর্ব্বগতঃ শিবঃ। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের পরস্পরকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।*

দেবমন্দিরে অশ্লীলতা।

(স্বামী ক্ষেমানন্দ)

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে যে অশ্লীল চিত্র আছে, কংগ্রেস পক্ষের কোন কোন সদ্বিবেচক ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি ও প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা যে কতদূর সঙ্গত কার্য্য, তাহা একমুখে বলিয়া উঠা যায় না। আমরাও একবার কয়েকটী বালকবালিকা সঙ্গে লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে সেইস্থলে ঐ প্রকার অতীব অশ্লীল চিত্রের অস্তিত্ব আমাদের জানা ছিল না। আমি তো উহা দেখিয়া স্তম্ভিত। সুখের বিষয়, সঙ্গী বালক-বালিকাদের ঐরূপ চিত্র উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। বলা বাহুল্য, ঐ সকল চিত্র উহাদের দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্ব্বেই আমি মন্দির হইতে উহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলাম।

শুনিয়াছি কোন সুপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি তাঁহার এক নাতিকে সঙ্গে লইয়া পুরীর মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি নাকি ঐ সকল চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাতির নিকটে উহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেছিলেন! সৌভাগ্যের বিষয়, নাতির বয়স তখন চার কি পাঁচ বৎসর হইয়াছিল। আমরা জানি না, নাতির মনে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অথবা চিত্রগুলির অশ্লীলতা, কোনটী অধিকতর মুদ্রিত হইয়াছিল।

দেবালয়গুলি এইরূপে অশ্লীলতার কেন্দ্ররূপে দাঁড়াইয়া দেশের চতুর্দ্দিকে হলাহল বিকীর্ণ করিবার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে, পুরীর রাজা যিনি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সংরক্ষক, ঐ সকল চিত্রগুলির উপর সামান্য একটু চুণকাম করিয়া বা পরদা ফেলিয়া দর্শকদিগের চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার ব্যবস্থা

* প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩০৮।

করিবেন। কিন্তু আমাদের মতে ইহা লোকের মন-ভোলান একটা কথামাত্র। পুরীর রাজা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি যে, তিনি আর্টের দোহাই দিয়া বা অন্য কোন কিছুর দোহাই দিয়া যেন এই ভীষণ অশ্লীল চিত্রগুলির সংরক্ষণে প্রবৃত্ত না হন। ঐ সকল তীব্র বিষের উৎস ও মনুষ্যত্বের বিলোপসাধক চিত্রগুলি নির্ম্মমভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেবমন্দিরে পবিত্রতার সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত করুন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, নিতান্তই অন্ধবিশ্বাসী ব্যতীত দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে এ বিষয়ে সমর্থন করিবেন।

এই সকল চিত্র দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, ভারতবর্ষ এক সময়ে অবনতির যে চরম সীমায় নামিয়া গিয়াছিল, ঐ সকল চিত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহারই নীরব কিন্তু জলন্ত সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। যে সকল চিত্র দেখিয়া দেশবিদেশের মানব মাত্রেরই মস্তক লজ্জায় ও ঘৃণায় অবনত হইয়া আসে, সেই সকল চিত্র দেশের ঘোর দুর্দ্দিনের সাক্ষ্য দিবার জন্য সঞ্চিত রাখিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

দেবালয়গুলিকে যে অশ্লীলতার কেন্দ্র ও উহার বিষবীজ ছড়াইবার প্রধান সহায় বলিয়া আসিলাম, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। কেবল পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির কেন, কাশীধামে নেপালী শিবালয়েও ঠিক ঐরূপ অশ্লীল চিত্রাবলীর বিচিত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়। একদিন আমি আমার একটী অল্পবয়স্ক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া কাশীর বিভিন্ন স্থান ও দেবমন্দির-দর্শনে বাহির হইয়া ঐ নেপালী দেবালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঐ আত্মীয়টী যখন আমাকে ঐ সকল চিত্র দেখাইতে লাগিল, তখন আমি অন্তরে লজ্জায় ও ঘৃণায় মরিয়া যাইতে-ছিলাম। পাছে ঐ আত্মীয়টীর মনে অতিমাত্রায় কুভাব-সকল জাগিয়া উঠে, সেই কারণে আমি উপরোক্ত প্রবীণ ব্যক্তির কথা মনে করিয়া ঐ সকল চিত্রগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে লাগিলাম এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, ঐগুলি তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন "মুদ্রার" চিত্র মাত্র। এইরূপে দুই একটী কথা বলিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।

এই সকল চিত্রের, অশ্লীলতা কথা দ্বারা, ব্যাখ্যা দ্বারা যতই কেন ঢাকিবার চেষ্টা করা হউক না, উহা কিছুতেই ঢাকা যায় না। দীর্ঘ রাত্রির পর রাত্রি অশ্লীল উপন্যাস পড়িয়া কাটাইলে তাহাদের অশ্লীল ভাব যেমন হৃদয়ে অঙ্কিত না হইয়া যায় না, সেইরূপ এই সকল চিত্রও ক্ষণেকের মধ্যে দর্শকদিগের মনে অশ্লীল ভাবসকল না অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারে না। দেবতাদিগের উপর যদি দেবতা বলিয়া যথার্থ আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা রাখিতে চাই এবং সেই ভক্তিশ্রদ্ধা যদি স্ত্রীপুত্র-কন্যাদিগের অন্তরে জাগাইয়া তুলিতে চাই, তবে আর্টের দোহাই দিও না, প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের কথা তুলিও না, ঐ সকল অতীব দোষাবহ অশ্লীল চিত্রসকল সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য সমবেতভাবে যত্নবান ও সচেষ্ট হও। অশ্লীল ভাবের উৎস এই চিত্রগুলি নির্ম্মূল না করিলে দেশের মধ্যে পবিত্রতা আনয়ন করা এবং তদনুসঙ্গে উন্নতি ও মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করা বড়ই দুরূহ হইবে। সমবেতভাবে এক-হৃদয়ে হিন্দুজাতি এ বিষয়ে অগ্রসর হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সকল আপত্তিই খণ্ডিত হইবে।

ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানগুলি যে কতবিধ পাপের উৎসে পরিণত হইয়াছে, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। উৎকল ও দক্ষিণাত্যের দেবালয়গুলির সংশ্লিষ্ট "দেবদাসী"র কথা কে না অবগত আছেন? মথুরা-বৃন্দাবনে "সেবাদাসী"রই বা কথা কোন্ হিন্দু না অবগত আছেন? বলা বাহুল্য যে, এই সকল দেবদাসী ও সেবা-দাসী ব্যভিচারমূলক শতবিধ পাপের স্রোত ধর্ম্মের নামে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর বহাইয়া দিতেছে এবং তাহার ফলে দেশবাসীকে সহস্রবিধ রোগে শোকে জরাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ইহার এতটুকু অতিরঞ্জিত উক্তি নহে। এই সকল দারুণ কুপ্রথা থাকিতে দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের পথ মুক্ত করিবার আশা সুদূরপরাহত। ভিতরের এ দুর্ব্বিষহ পরাধীনতা থাকিতে, রোগে শোকে দেহমন ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিলে বাহিরের স্বাধীনতা লাভ করিবার আশা করিবে কে? প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে গেলে আমাদের অন্তরে বাহিরে, আমাদের আহারে বিহারে, আমাদের ধ্যানে ও জ্ঞানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা চাই—ব্রহ্মকে পাইবার অনুকূল যাহা কিছু তাহাই অন্তরে ধারণ করিতে হইবে, এবং তাহার প্রতিকূল যাহা কিছু, হৃদয়ের সমস্ত বলের সহিত তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার ধ্বংসসাধনে দৃঢ়সংকল্প হইতে হইবে।

কোথায় পুরী, কোথায় দাক্ষিণাত্য, কোথায় বা কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, আর কোথায় বা কামাখ্যা—এই কামাখ্যাতে যাও, সেখানেও একটি অতীব লজ্জাবহ অশ্লীল প্রথা প্রচলিত আছে। শুনিয়াছি, তথায় কুমারী-পূজার নামে অতীব অশ্লীল অনুষ্ঠানসকল অনুষ্ঠিত হয়। তদ্ব্যতীত অম্বুবাচীর সময়ে যে অনুষ্ঠান প্রচলিত দেখা যায়, তাহার সবিস্তার উল্লেখ করিয়া আমার লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না। সেই অনুষ্ঠানের সাক্ষী-স্বরূপে এক টুকরা রঞ্জিত বস্ত্র আনিয়া গৃহে রাখিলে

সমস্তই মঙ্গল হইবে, এইরূপ প্রলোভন ও আশা পাইবার কারণে যাত্রীগণ অম্লানবদনে সেই লজ্জাকর প্রথা সহ্য করেন—তাহার বিরুদ্ধে এতটুকুও আপত্তি উত্থাপন করেন না।

যতদিন দেশবাসী সত্যধর্ম্মকে অন্তরে বরণ করিয়া না লইবে এবং বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাকে মঙ্গলসাধক মনে করিয়া অজ্ঞানের অন্ধ-কারাগারে আপনাকে আবদ্ধ রাখিবে, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ অপ্রতিম পরমাত্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া আপনাকে যতদিন উন্নতি ও মঙ্গলের সুপ্রশস্ত পথে দাঁড় না করাইবে, ততদিন আমাদের শ্রেয় দেখিতে পাই না। অন্তরের পরাধীনতার দাসখত যদি আমরা পূর্ব্ব হইতেই স্বাক্ষর করিয়া দিই, তবে বাহিরের পরাধীনতার জন্য কাহাকেও অপরাধী সাব্যস্ত করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না।

শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব।*

(স্বামী ভূমানন্দ)

শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, নির্ব্বিবাদে একই গ্রন্থে পরস্পর-বিরোধী মতবাদ-সকল স্থান লাভ করায় একদিকে যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অপর দিকে 'নানা মুনির নানা মতের' সহিত পরিচিত হইয়া হিন্দু জাতির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরও হ্রাস হইয়াছে। যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইতে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় হইতে শ্রদ্ধা জাগ্রত হইয়া মানবকে মিথ্যার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইবার প্রেরণা প্রদান করিয়া থাকে, সেই শ্রদ্ধা হারাইয়াছে বলিয়াই হিন্দু জাতির দুর্দ্দিনের অবসান কিছুতেই হইতে পারিতেছে না। হিন্দু জাতির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যাহাতে জাগ্রত হয় তৎজন্য এই প্রবন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সৃষ্টিবর্ণনা উদ্ধৃত করা হইল।

এই সকল সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত অসত্য তাহা পাঠকগণের সুবিচারের উপর নির্ভর করিবার জন্য উপনিষদসকলের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের অনৈক্য দর্শন করিয়া আচার্য্য শঙ্কর যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। "নির্গুণ নিষ্ক্রিয় দ্বৈতহীন সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ও জড় প্রকৃতির সহযোগে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অপর দিকে পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল ভূতের যোগে জীবজগতের উদ্ভব।" এই কষ্টিপাথর পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিয়া আমরা প্রথমে হরিবংশের সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকগণ বিচার করিয়া স্থির করুন, ইহার মধ্যে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মতই বা মিথ্যা।

হরিবংশে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা :—

(ক) * * * মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতসমূহ জন্মিয়াছে। আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূত হইতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ স্থূল ভূত আবির্ভূত হইয়াছে। [প্রথম অধ্যায়]

(খ) অনন্তর ঈশ্বর অগ্রে বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, অবক্র, ইন্দ্রধনু, খেচরসমুদয় ও পর্য্যান্যের সৃষ্টি করিলেন এবং যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত ঋক, যজু ও সামবেদের আবিষ্কার করিলেন। মুখ হইতে দেবগণ, বক্ষ হইতে পিতৃগণ উৎপাদন করিলেন, উপস্থেন্দ্রিয় হইতে মনুষ্যগণ, জঘন হইতে অসুরগণ এবং সাধ্য দেবগণের উদ্ভব হইল। [প্রথম অধ্যায়]।

(গ) * * তিনি আত্মদেহকে দ্বিধা করিয়া একাংশে পুরুষ ও অপরাংশে নারী হইলেন, সেই নারীতে তিনি বিবিধ প্রজা সৃজন করিলেন। [প্রথম অধ্যায়]

হরিবংশের প্রথম অধ্যায়ের যে তিনরকম সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ধৃত হইল, ইহার এক মতের সহিত অপরাপর মতের কোন ঐক্য দৃষ্ট হইবে না। এবং উক্ত তিন মতের কোন মতই বলেন নাই যে, ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে।

কিন্তু এই 'হরিবংশে' অন্যত্র লেখা আছে—

(ঘ) ক্ষত্রিয় গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাহার পুত্র শৌনক নিজ সন্তানগণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

[উনবিংশ অধ্যায়]

(ঙ) ব্রহ্মা—দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু ও অঙ্গিরা এই দশ পুত্র সৃজন করিলেন। [যন্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।]

(চ) * * শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবরূপে সংসারে বিচরণ করেন। * * বিপ্রগণ একমাত্র পরব্রহ্মকে বহু-প্রকার বলিয়া থাকেন। * * বিধাতা স্বয়ংই স্ত্রী ও পুরুষ বিগ্রহ ধারণ করিলেন।

[নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়]

বাহুল্যভয়ে অন্য মত সকল আর উদ্ধৃত করা হইল না। এখন পাঠকের কর্ত্তব্য আচার্য্য শঙ্করের মীমাংসারূপ সৃষ্টিতত্ত্বের কষ্টিপাথরে উপরোক্ত মতসকল যাচাই করিয়া দেখা। তার পর যে মত সত্য বলিয়া ধার্য্য হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া অপর মিথ্যা মতগুলিকে পরিত্যাগ করা।

* মতামতের জন্য লেখক দায়ী। তঃ সঃ

এতদিন মিথ্যা মতবাদকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া হিন্দু হিন্দুর প্রতি যে অবিচার করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তও সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে। এবং মনে রাখিতে হইবে,—এ দুর্দ্দিনে 'হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না করিলে কে করিবে?'

বিষ্ণুপুরাণে—সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা :—

(ক) "হে মৈত্রেয়! সনাতন বিষ্ণু এই প্রকাণ্ড জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা। তিনিই সর্ব্বভূতে আত্মরূপে বিরাজমান আছেন। তিনি পরমাত্মাস্বরূপ। তিনি অজ, অক্ষয়, অব্যয় নিত্য পরব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীত প্রলয়কালে দিবস বা রাত্রি, আকাশ বা ভূমি, কিম্বা অন্য কোন পদার্থই ছিল না। তৎকালে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি ও পুরুষ ও ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। নিরুপাধি বিষ্ণুর প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় কাল নামে আর একটী রূপ আছে। প্রকৃতি ও পুরুষ ঐ কালের সহিত সৃষ্টিকালে যোজিত ও প্রলয়কালে বিয়োজিত হন। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়প্রবাহের আদি বা অন্ত নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন মহা-প্রলয়কালে প্রকৃতি ও পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করেন। অনন্তর সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে পরব্রহ্ম স্বীয় ইচ্ছানুসারে জগতের উপাদন-কারণ-স্বরূপ প্রকৃতিতে ও নিমিত্ত-কারণ-স্বরূপ পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টিকে উন্মুখ করিয়াছেন। প্রথমে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকার মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে যথাক্রমে বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। ভূতাদি ও তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ, শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপ, রূপ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে রস, রস হইতে জল, জল হইতে গন্ধ এবং গন্ধ হইতে পদার্থ সৃষ্ট হইল।"

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

(খ) "প্রলয়কালে নীর অর্থাৎ জল বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ বাসস্থান হয়, এই জন্য বিষ্ণুর নাম নারায়ণ। এই বরাহকল্পে ভগবান্ বরাহরূপ অবলম্বন করিয়া জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পঞ্চম অধ্যায়,—ব্রহ্মা হইতে প্রথমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র উৎপন্ন হইল। পরে তিনি বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদগণের এবং পশুপক্ষ্যাদি তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি করিয়া সত্ত্বগুণপ্রধান ঊর্দ্ধস্রোত দেবগণকে সৃজন করিলেন। তৎপরে তিনি অর্ব্বাক্‌স্রোত মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিলেন। মনুষ্যেরা রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য-নিবন্ধন সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত ও সাত্তিশয় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা কুমারগণের (সনকাদির) সৃষ্টি করিলেন।"

"পরে ব্রহ্মার দেহ হইতে অসুরগণের উৎপত্তি হয়। তৎপরে তিনি ঘোরদর্শন শ্মশ্রুধারী ক্ষুধাতুর প্রাণিগণের সৃষ্টি করিলেন। তাহারা সৃষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া ব্রহ্মাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইল। তাহারা রক্ষ, এবং যাহারা ভক্ষণ করিতে স্বীকৃত হইল, তাহারা যক্ষ নামে অভিহিত হইল। উহাদের বিকটাকার অবলোকনে তিনি অত্যন্ত ক্রোধাসক্ত হওয়াতে তাঁহার কেশপাশ বিশীর্ণ ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সর্পরূপে পরিণত হইল। ব্রহ্মার মস্তক হইতে কেশ সর্পিত অর্থাৎ বিগলিত হওয়াতে সর্প, এবং তাহা একেবারে মস্তক হইতে হীন হইল না বলিয়া, অহি নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি কোপযুক্ত ক্রোধনস্বভাব ঘোরদর্শন কপিলবর্ণ মাংসাশী পিশাচগণের সৃষ্টি করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সৃষ্টি করেন। গো অর্থাৎ গীত (বাক্যামৃত) অধন অর্থাৎ পান করিতে করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহারা গন্ধর্ব্ব নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মার বক্ষস্থল হইতে মেষ, মুখ হইতে ছাগ, উদর ও পার্শ্ব হইতে গো, পদদ্বয় হইতে অশ্ব * * কৃষ্ণসার প্রভৃতি পশুজাতি এবং রোম হইতে ফল, মূল ও ঔষধিসমূহ উৎপন্ন হইল।" [চতুর্থ অধ্যায়]

(গ) "ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। এই চারি বর্ণই যজ্ঞাধিকারী। যজ্ঞ সম্পাদনার্থই ইহারা সৃষ্ট হইয়াছেন।" [ষষ্ঠ অধ্যায়]

(ঘ) "ক্ষত্রিয় গৃৎসমদের পৌত্র শৌনক নিজ পুত্রগণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছিলেন। শৌনক চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তক "

[বিষ্ণুপুরাণ, ১৮ অধ্যায়]

মন্তব্য অনাবশ্যক। বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে পারিলেই যাহা কিছু সত্য-মিথ্যা আছে, তাহা নিশ্চিত ধরা পড়িবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণনা :—

জৈমিনি প্রশ্ন করিলেন,—"কি প্রকারে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি হইল? * * কি প্রকারে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ এবং ভূতাদির উৎপত্তি হয় * *?" ইত্যাদি। উত্তরে সৃষ্টির দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইবার পরে মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "এই নানা বীর্য্যবান সাতটি পদার্থ যৎকালে পৃথক্‌ভাবে থাকে তৎকালে প্রজাসৃজনে সমর্থ হয় না। ইহারা যৎকালে পরস্পর মিলিয়া পরস্পরকে অবলম্বনপূর্ব্বক সম্যক্‌প্রকারে

একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং যৎকালে পুরুষের অধিষ্ঠান ও প্রকৃতির অনুগ্রহ লাভ করে, তৎকালে মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত ঐ সকলে অণ্ড সমুৎপাদন করে। ঐ অণ্ড জলবিম্বের ন্যায় জলে আশ্রয় পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মহামতে! সলিলস্থ ঐ অণ্ড ভূতগণ হইতে বৃহৎ। ব্রহ্মা বিশ্বের ক্ষেত্রজ্ঞও সেই প্রাকৃত অণ্ডে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। তিনিই প্রথম-শরীরী এবং পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। তিনিই ভূতসমূহের আদি-কর্ত্তা ব্রহ্মা। তিনিই এই সকলের অগ্রে বিরাজিত হইয়া থাকেন। * * সুরাসুর-মানুষপূর্ণ অখিল জগৎ সেই অণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। * * এই প্রকৃতিই ক্ষেত্র ও ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত। * * এই প্রকারেই ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রাকৃত সৃষ্টি অবুদ্ধি সহকারে প্রথমে বিদ্যুল্লতার ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছে॥"

[পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—৫৯—৭৩ শ্লোক]।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—* * "দেবযোনি অষ্টবিধ সৃষ্টি করিয়া স্বদেহ হইতে অন্য পশুপক্ষী সকল উৎপন্ন করিলেন। মুখ হইতে ছাগ, বক্ষ হইতে পক্ষী, উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো * * প্রাদুর্ভূত হইয়াছে * *; অতঃপর স্থাবর, জঙ্গম, ভূতগণ, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ কিন্নর ইত্যাদি যাবতীয় শরীরী ও অশরীরী পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে॥"

[অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ২৫-৩০ শ্লোক]।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—* * "পিশাচ, উরগ, রাক্ষস * * মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সরীসৃপ * * অণ্ডজ প্রাণীগণ অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে॥"

[উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়—১৬ শ্লোক]।

"অনন্তর প্রভু ব্রহ্মা সেই পূর্ব্বসৃষ্ট আত্মসদৃশ পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু নাম দিয়া প্রজাপালক করিলেন। আর তপস্যা দ্বারা বিধুতপাপা সেই কামিনীকে শতরূপা নাম প্রদান করিলেন। সেই পুরুষ (মনু) হইতে শতরূপার দুইটি পুত্র হইল,—নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। ইঁহারা উভয়েই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা প্রসিদ্ধ॥"

[পঞ্চাশৎ অধ্যায় ১০—১৫ শ্লোক]।

পুরুষসূক্তের আলোচনায় দেখা যায় যে, খণ্ডিত পুরুষের মুখ প্রথমে ব্রাহ্মণ হইল; তার পরের সূক্তেই সেই মুখ হইতে, ইন্দ্র ও অগ্নি উৎপন্ন হইল। বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রজাপতির মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব হইয়াছে। মহাভারতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের মৌলিক উপলব্ধির ফলে লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ছাগ ও পার্শ্ব হইতে গো উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা :—

ব্রহ্মপুরাণের প্রথম অধ্যায়ে যত রকম সৃষ্টিতত্ত্ব রহিয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—(ক) ব্রহ্মাকেই সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। মহৎ হইতে অহংকারের উদ্ভব, সেই অহঙ্কার হইতেই ভূতসমূহের আবির্ভাব। সেই সকল ভূতসমূহ হইতে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ভূতজাতির উৎপত্তি। এইরূপে সনাতন সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

(খ) সেই ব্রহ্মা হইতে মহাতেজা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সপ্ত মানস-পুত্র আবির্ভূত হইলেন। * * এই সাতজন মানস-পুত্র হইতে প্রজাগণ (মনুষ্য) ও রুদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন।

(গ) প্রজাপতি যখন দেখিলেন,—সৃষ্টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না, তখন আত্মদেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধে পুরুষ ও অপর অর্দ্ধে নারী হইয়া নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন।

প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি সম্বন্ধে যে তিন মত রহিয়াছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের উদ্ভবের কথা উক্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম সৃষ্ট মানুষ মনু হইতে যে তিন পুত্র জন্মিয়াছিল, বংশপরিচয়ে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় সাংখ্যমতই বহু-স্থলে কথিত হইয়াছে। তবুও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের নাম ও জাতিধর্ম্ম এই গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু বংশগত জাতিবিভাগ যে এই গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত নহে, উদ্ধৃত বচন হইতেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের আরম্ভে প্রশ্ন হইয়াছে, শূদ্র কোন্ কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাহ্মণই বা কোন্ কোন্ কর্ম্মের ফলে শূদ্রত্ব লাভ করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত আছে,—* * "শুভকর্ম্ম সকল আচরণ করিলে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে।" অন্যত্র আছে,—"নীচকুলোদ্ভব শূদ্রও যথাবিধি সংস্কারযুক্ত আগম জ্ঞানসম্পন্ন হইলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। অসদ্‌বৃত্ত, বিবিধ সঙ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণও স্বীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করে।" পরে লেখা আছে,—"ব্রাহ্মণত্বলাভের প্রতি বংশসংস্কার, শ্রুতিজ্ঞান, সন্ততিচিন্তা এই সকল কিছুই কারণ নহে, একমাত্র চরিত্রই উহার কারণ। জগতে যত ব্রাহ্মণ দেখা যায়, সদাচারই তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্যের হেতু। সদাচারে অবস্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে।" অধ্যায়ের উপসংহারে আছে,—"শূদ্র যে প্রকারে দ্বিজ হইতে পারে, আর ব্রাহ্মণ যেরূপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই গুহ্য বিষয় তোমাকে কহিলাম।"

প্রশ্ন হইতে পারে,—এমন পরস্পরবিরোধী সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা কেমন করিয়া একই গ্রন্থ মধ্যে স্থানলাভ করিল?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,—(ক) প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থের নিজস্ব একটি করিয়া সৃষ্টিবর্ণনা ছিল।

(খ) পরে সেই গ্রন্থে বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ বর্ণনা যুক্ত করা হইয়াছে।

(গ) যাঁহারা যখন এইভাবে নূতন নূতন বিধিসকল যুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন পূর্ব্বজ শাস্ত্রকারগণের মর্য্যাদারক্ষার জন্য পূর্ব্বের কোন বিধান উচ্ছেদ না করিয়া নূতন নূতন মতসকল যুক্ত করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই এমন পরস্পরবিরোধী বিধানসকল একই গ্রন্থমধ্যে স্থানলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই হিসাবে মনুসংহিতাও যে একহাতে রচিত নহে, অতঃপর মনুসংহিতার আলোচনা হইতে তাহাও সম্যক প্রকাশ পাইবে :—

মনুসংহিতার সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা : —

১। প্রলয়কালে এই জগৎ এই প্রকারে প্রকৃতিতে লীন ছিল যে, উহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় ছিল না ॥ ১।৫ ॥

২। প্রলয়ান্তর বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বেচ্ছায় দেহধারী, সৃষ্টিকার্য্যে অমিতসামর্থ্যশালী ও প্রলয়-বিনাশক পরমাত্মা প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপে প্রকৃতিতে লীন আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত ও মহদাদি তত্ত্ব স্থূলরূপে বিকাশ করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন ॥১।৬॥

যিনি সকল লোক, বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, যিনি মনোমাত্র-গ্রাহ্য, অবয়বহীন, নিত্য ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা হয়েন, এবং যাঁহার ইয়ত্তা করা যায় না, তিনি স্বয়ংই মহদহঙ্কারাদি কার্য্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥১।৭॥

সেই পরমাত্মা প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে, কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ 'জল হউক' বলিয়া আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন ॥১।৮॥

অর্পিত বীজ সুবর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় সূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্ত একটী অণ্ড হইল। ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মাই শরীর পরিগ্রহ করিলেন ॥১।৯।

নরনামক পরমেশ্বরের দেহ হইতে জলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উহাকে নার বলা যায়; যেহেতু ঐ জলসকল প্রলয়কালে পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয়, এইজন্য পরমাত্মা নারায়ণ শব্দে কথিত হইয়াছেন ॥১।১০॥

যে পরমাত্মা সৃষ্ট বস্তুমাত্রেরই কারণ, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি তৎপদের প্রতিপাদ্য, এবং যিনি প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন বলিয়া অসৎশব্দেও কথিত হইয়াছেন, সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এই অণ্ডজাত পুরুষ লোকে ব্রহ্মা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন ॥১।১১॥

ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম পরিমাণে এক বৎসর কাল বাস করিয়া, অণ্ড দ্বিধা হউক মনে হইবা-মাত্র স্বয়ং সেই অণ্ডকে দুই খণ্ড করিলেন ॥১।১২॥

তিনি সেই দুই খণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবী করিলেন, এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্ট দিক্ ও চিরস্থায়ী সমুদ্র নামক জলাধার প্রস্তুত করিলেন ॥১।১৩॥

ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে পরমাত্মার স্বরূপ হইয়া মনের সৃষ্টি করিলেন, যে মন এক এক সময়ে এক এক প্রকার জ্ঞানের আধার বলিয়া সৎস্বরূপ, ও প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া অসৎস্বভাব। মনের সৃষ্টির পূর্ব্বে অভিমানের জনক ও স্বকার্য্যসাধনক্ষম অহং অর্থাৎ আমিত্ব-বোধক অহঙ্কারতত্ত্বেরও সৃষ্টি করিলেন ॥১।১৪॥

ব্রহ্মা অহঙ্কারতত্ত্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর হইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন, যে মহত্তত্ত্ব আত্মা হইতে উৎপন্ন আত্মশব্দে কথিত হইয়াছে। আর সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্ত অন্য পদার্থসকল সৃষ্টি করিলেন, এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের গ্রাহক শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাদ, হস্ত, গুহ্য, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিলেন ॥১।১৫॥

অসীম কার্য্যনির্ম্মাণে সমর্থ অহঙ্কার ও তন্মাত্র-পদ-বাচ্য পঞ্চভূত। অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত, তাহাতে তন্মাত্র ও অহঙ্কারের যোজনা করিয়া, মনুষ্য পশু পক্ষী স্থাবর প্রভৃতি সমুদয় ভূতের সৃষ্টি করিলেন ॥১।১৬॥

(এই সৃষ্টির ফলে সমান প্রসবাত্মিকা-জাতিই সৃষ্ট হইল।)

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর ভূলোকাদি প্রজাবৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন ॥১।৩১॥

যদিও দর্শনের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া উক্ত বিধানের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উদ্ভব একেবারেই মূল্যহীন হইয়া পড়ে; তবুও তর্কস্থলে এই মতকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও এক পুরুষ হইতে উদ্ভূত চারি পুত্র সমান জাতি ও জ্ঞাতিই হইবে। সুতরাং এই রূপক বা পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিধানে যে জাতিবিভাগ, তাহাতে একের অন্ন অপরে খাইলে তাহার জাতি যাইবে কিম্বা একের কন্যা অপরে বিবাহ করিলে সেই বিবাহের সন্তান অন্ত্যজ আখ্যা লাভ করিতে পারে, এমন কোন হেতু কিন্তু সংহিতায় দৃষ্ট হইবে না।

সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর আপন শরীরকে দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন। ঐ উভয়ের পরস্পরসংযোগে বিরাট্ নামক পুরুষ উৎপন্ন হইল ॥১।৩২॥

হে দ্বিজসত্তম! সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিলেন, আমি সেই মনু, আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অবগত হও ॥১।৩৩॥

অনন্তর আমি প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে বহু-কাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ প্রজাসৃজনে সমর্থ দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম ॥১।৩৪॥

আমি মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম ॥ ১।৩৫ ॥

এই মরীচ্যাদি দশ প্রজাপতি মহাতেজস্বী অপর সপ্ত মনুর সৃষ্টি করিলেন এবং যে দেবতাদিগকে ব্রহ্মা পূর্ব্বে সৃষ্টি করেন নাই, এমন দেবতা ও দেবতাদিগের বাসস্থান এবং কতিপয় মহর্ষির সৃষ্টি করিলেন ॥১।৩৬॥

ইহাঁরা যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর অজগরাদি নাগ ও সর্প, গরুড়াদি পক্ষিগণ আজ্যপাদি নামক পিতৃগণকে পৃথক পৃথকরূপে সৃষ্টি করিলেন ॥১।৩৭॥

ইহাঁরা বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, বক্র ইন্দ্রধনু ও সরলাকার ইন্দ্রধনু, ভূগর্ভ হইতে উত্থিত ভীষণধ্বনি, ধূমকেতু, ধ্রুব, ও অগস্ত্যাদি নানা প্রকার জ্যোতিও সৃষ্টি করিলেন ॥১।৩৮

কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানা প্রকার পক্ষী, পশ্বাদি পশু, নানাপ্রকার মৃগ, মনুষ্য ও একপংক্তি দন্তবিশিষ্ট অশ্বাদি জন্তু এবং সিংহাদি জন্তুসকল সৃষ্টি করিলেন ॥১।৩৯

পাঠক, যদি গীতার কথা ভুলিয়া না থাকেন তবে দেখিবেন, ভগবান বলিতেছেন,—পূর্ব্বে সপ্ত মহর্ষি ও চারিজন মনু আমার মনোভাব হইতে উৎপন্ন হইল।

মনু বলিতেছেন,—'আমি মরীচি প্রভৃতি দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিলাম। ঐ সকল প্রজাপতি হইতে সাতজন মনু উৎপন্ন হইল।'

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে আছে,—ব্রহ্মার পৌত্র স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে সৃষ্টি কার্য্যে পরম কুশল ছয়জন মনু উৎপন্ন হয় ॥৬১॥

সেই মনুগণ স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বিবস্বৎ-সুত এই নামে বিখ্যাত ॥৬২॥

মনুসংহিতার এই পরিচয়ের পূর্ব্বে অপর একটি পরিচয় রহিয়াছে তাহা এই :—সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃজন করিয়াছিলেন, হে মহর্ষিগণ, আমাকেই সৃষ্ট সন্তান সৃষ্টির কারণ মনু বলিয়া জ্ঞাত হও ॥৩৩॥

আমি প্রজাসৃষ্টি অভিলাষে দুশ্চরণীয় কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছি ॥৩৪॥ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ এই দশজন স্ব-স্ব নামনির্দ্দিষ্ট প্রজাপতি ॥৩৫॥

একই গ্রন্থে এই প্রকার অভিনব মতবাদ থাকা সত্বেও স্বাধ্যায়ীগণ কেন যে এতৎসম্বন্ধে কিছু বলেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। এই সকল স্মৃতিশাস্ত্র যাঁহারা পাঠ করেন. তাঁহারাই বা কেমন করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে ইহা পাঠ করেন এবং সময়ে সময়ে এই সকল গ্রন্থেরই গৌরবই বা কেমন করিয়া ঘোষণা করেন? আশ্চর্য্য!

পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত স্বীয় অহোরাত্রের অবসানে প্রতিবুদ্ধ হয়েন এবং প্রতিবুদ্ধ হইয়াই ভূলোকাদি সৃষ্টি করিবার জন্য মনকে নিয়োগ করেন। ব্রহ্মার এইপ্রকার নিয়োগের নাম মনঃসৃষ্টি ॥১।৭৪॥

পরমাত্মা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে পর সেই ইচ্ছায় প্রেরিত মহত্তত্ব হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। মন্বাদি আকাশের গুণ শব্দ বলিয়াছেন ॥৭৫॥

বিকৃতভাবাপন্ন আকাশ হইতে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধবহ প্রবল পবিত্র বায়ু সমুদিত হয়। মন্বাদি উহার স্পর্শগুণ বলিয়াছেন ॥১।৭৬॥

বিকৃতভাবাপন্ন বায়ু হইতে তমোনাশক, সকল বস্তুর প্রকাশক, দীপ্তিমান্ তেজ উৎপন্ন হয়; ঐ তেজের গুণ রূপ ॥১।৭৭॥

তেজ বিকৃতভাবাপন্ন হইলে বিকারজনক তেজ হইতে জল জন্মে, জলের গুণ রস। জল হইতে গন্ধ-গুণসম্পন্না পৃথিবী উৎপন্ন হয়, মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্টির প্রথমে পঞ্চভূতের উৎপত্তিক্রম এইরূপ ॥১।৭৮॥

গ্রন্থপরিচয়।

RIGHT RESOLUTIONS,

BY

SWAMI PARAMANANDA.

Vedanta Centre, 32 Fenway, Boston, Mass,

Ananda Ashrama, LaCrescenta,

California.

This *Brochure* is by Swami Paramananda of American fame. As an erudite scholar and a deep religious thinker the name of Swami Paramananda has travelled beyond the confines of his country. The Swami is as well-known in the East as in the West, and is a striking figure in American literary and religious circles. He is already the author of more than a score of religious works ranging over a variety of topics such as *Vedantic* Idealism, *Yoga* and Christian Mysticism &c &c. He is at once at home in both occidental and oriental systems of philosophy &c. &c. therefore, well-fitted to be an ideal interpreter of Easterm thought to Western minds. We must congratulate him on his latest contribution to the spiritual literature of the world. We must judge a work of this kind on its merits, not by its bulk or size. "Right Resolutions" is a small *Brochure* indeed but it is worth its weight in gold. A perusal of this booklet is sure to do one good.

If one is tempted to utter a falsehood he should, says the author, guard his tougue and repent to himself—

Truth is mightier than untruth,
Truth is my strength,
Truth is my safeguard,
Truth is ever triumphant,
I am armed with truth.

We can safely recommend the book to the public.

সংবাদ।

রবীন্দ্রজয়ন্তী।—পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে গত বড়দিনের অবকাশে কলিকাতায় এক সপ্তাহ ধরিয়া মহা সমারোহে জয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার বিভিন্নমুখী অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে; এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পর পর গান্ধী-রবীন্দ্র-মালব্যজয়ন্তীঅনুষ্ঠান হেতু ইহা অনুমিত হয় যে, দেশবাসী আজ মহৎপূজায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। ইহা অতি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ—গত ১০ই পৌষ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় ৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তদীয় মধ্যম পুত্র শ্রীমান লোকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তাঁহাদের শিবপুরের ভাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১১ই পৌষ রবিবার পূর্ব্বাহ্ন সার্দ্ধ দশ ঘটিকায় পূজনীয়া ৺নীপময়ী দেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তদীয় মধ্যম পুত্র আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার যোড়াসাঁকোর বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৪শে পৌষ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন সার্দ্ধ ৯ ঘটিকায় পূজ্যপাদ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার বালিগঞ্জের বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীইন্দিরা দেবী কয়েকটী সঙ্গীত করিয়া সভার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ—গত ২৭শে পৌষ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ১০॥০ ঘটিকায় ৺অনিলনাথ মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ তদীয় ভাগিনেয় শ্রীমান্ হৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক তাঁহার যোড়াসাঁকোর বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

নামকরণ—গত ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে সাধু ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দৌহিত্র ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি, বার-এট্-ল মহাশয়ের নবকুমারের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। নবকুমারের নামকরণ হইয়াছে শ্রীঋতেন্দ্রকুমার মজুমদার। ভগবান নিত্য ইহাকে আশিষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

শোকসংবাদ।

৺অনিলনাথ মুখোপাধ্যায়।—গত ২৪শে পৌষ শনিবার রাত্রে পূজ্যপাদ ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈবাহিক-পুত্র অনিলনাথ মুখোপাধ্যায় স্বীয় ইটালীস্থ বাসভবনে রক্তের চাপবৃদ্ধি-পীড়ায় অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত দানগুলি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত	১৮৫২ শকের	... ২৲
" " "	১৮৫৩ "	... ২৲
শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু	১৮৫৩ শকের	... ১৲

ওঁতৎসৎ

Tattwabodhini Patrika Reg. No C. 462

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মাঘোৎসব-সংখ্যা।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে 'পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁ তৎসৎ

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৬২ | ১৮৫৩ শক মাঘ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

মাঘোৎসব-সংখ্যা।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩২। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২

ওঁ তৎসৎ

স্বাগতম্

এস বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসক আমরা একত্র মিলিত হই; অন্যোন্য সাহচর্য্যে পরস্পরকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে তুলিয়া ধরি; আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে, প্রত্যেক ভাবে ও চিন্তায় অপ্রতিম পরব্রহ্মের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখি।

স্বস্তি হউক   শান্তি হউক   মঙ্গল হউক

আদিব্রাহ্মসমাজ
১০২তম মাঘোৎসব   শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্বোধন*।

(শ্রী চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দেশ-বিদেশের বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করিয়া এবং প্রচলিত ধর্ম্মের উপরে সত্যের যে আচ্ছাদন পড়িয়াছিল, পুস্তক হইতে নানা পুস্তিকা-প্রচারে তাহা প্রতিপন্ন করিয়া এই পুণ্য মাঘের একাদশ দিবসে এই আদিব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং একেশ্বরবাদের বাণী জনসমাজের ভিতরে আরও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাই এই মাঘ মাস আমাদের নিকট এত প্রিয়, এত পবিত্র। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে কোন জাতিই আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। রাজা তাহা পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। এক শতাব্দীর অধিক অতীত হইয়া গেল আজও আমরা রাজার এই বিরাট দানের প্রকৃত মূল্য অবধারণ করিতে পারি নাই। এখনও আমরা তাঁহার আদর্শে অন্তর্দ্দেশকে বিগঠিত করিয়া তুলিতে পারি নাই। বর্ষচক্রের বিবর্তনে চান্দ্র গণনায় এই মাঘ মাসেই এবার রমজান মাসের সংক্রমণ। এই মাসে ধর্ম্মবীর হজরৎ মহম্মদ একেশ্বরবাদের বাণী আরব-দেশে প্রকাশ্যভাবে প্রথম ঘোষণা করিয়াছিলেন; তাই বুঝি এই মাস মুসলমান মাত্রেরই নিকট এত পবিত্র। এতই নিষ্ঠার সহিত,

* ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

এতই আন্তরিকতার সহিত সমস্ত দিন নিরম্বু উপবাসে থাকিয়া রোজা রাখিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় তাহারা পূর্ণ একমাসকাল অতিবাহিত করে এবং এইরূপে এই স্মরণীয় রমজান মাসের মর্য্যাদা রক্ষা করে। আমাদের মধ্যেও জাগরণ চাই—ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রেমে ভক্তিতে বিশ্বাসে সকলকে জাগিতে হইবে। ধর্ম্মেতে চিরজাগ্রত থাকাতেই আমাদের হিন্দুর হিন্দুত্ব। আমরা যদি ব্যক্তিগত ও দেশগত কল্যাণ চাই, উপনিষদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে হৃদয়ে বরণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে বিবিধ দায়ীত্বের ভার লইয়া ধরাপৃষ্ঠে আমাদের আগমন। নিরবচ্ছিন্ন শরীরের পুষ্টিসাধনে বা অপরাবিদ্যার আলোচনায় আমাদের সেই দায়ীত্বের ভার বিমোচিত হইবে না। আমাদিগের বিবেক বুদ্ধিকে স্ফূর্ত্তিদান করিতে হইবে—জ্ঞানে ও প্রেমে ভগবানকে সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে হইবে। ঈশ্বর যে আমাদের চিরসুহৃদ চিরবন্ধু চিরনেতা—তাঁহার সিংহাসন যে কেবলমাত্র দেবালয়ে নহে কিন্তু সকল স্থানে সকল কালে সুপ্রতিষ্ঠিত, হৃদয়ের গুহাগহ্বর যে তাঁহার প্রিয় নিকেতন—একথা মুখের কথায় নহে, কেবল মতবাদে নহে, কিন্তু এই সরল ধারণা যেদিন ভিতরে আনিতে পারিবে, সেই দিন হইতে দায়ীত্বমোচনের অবসর ঘটিবে।

আজ উৎসবমুখে আমরা আসিয়াছি আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, হৃদয়কে প্রসারিত করিবার জন্য, সেই পরমারাধ্য পরম দেবতাকে অন্তরের ভিতরে জাগ্রত জীবন্তভাবে অনুভব করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাভক্তির বিমল পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্য। আজ আমাদের মধ্য হইতে সকল দ্বন্দ্ব বিদূরিত হউক, হৃদয় সরস ও মধুময় হউক। আমাদের বাক্যে বীর্য্য অবতীর্ণ হউক, সকলের ভিতরে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা জাগ্রত হউক; এবং সেই পরম মাতার বাহুবেষ্টনের ভিতরে যে আমরা সকলে অবস্থান করিতেছি, এ চেতনা আবির্ভূত হউক, কৃতজ্ঞতাভরে মস্তক অবনত করিয়া মন্ত্রে ও সঙ্গীতে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

আর না—হাসিখেলা আর না।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চারিদিকে যে প্রকার উত্তেজনা ও উদ্বেজনা চলিতেছে, ইহা দেখিয়া আর হাসিখেলায় মন দিতে ইচ্ছা হয় না। এখন প্রাণের ভিতর এই কথা আঘাত দিতে থাকে—আর না—আর না—বৃথা কাজে আর মন দিও না—খেলা করিবার আর সময় নাই। শীঘ্রই সম্মুখে গুরুতর কার্য্যরাশি উপস্থিত হইবে বলিয়া আভাস পাওয়া যাইতেছে। এ সময়ে যদি আপনাদিগকে দেহে মনে ও আত্মাতে সেই কার্য্যের ভার লইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারি, তবেই আমাদিগের অভিষ্টসিদ্ধি হইবে, আমরা রক্ষা পাইব।

নির্ভয় হও। ভগবানের মাভৈঃ-ভেরীর সুমঙ্গল রবে দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত হইয়া উঠিতেছে। উৎসাহ-অনলে অন্তর প্রদীপ্ত করিয়া তোল। সত্যস্বরূপকে দৃঢ়তার সহিত অন্তরে ধারণ কর। বীরপদক্ষেপে তাঁহারই নির্দ্দেশিত সত্যের পথে চলিয়া চল—অগ্রসর হও—থামিয়া যাইও না—পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না।

নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ, বিরোধবিবাদ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরিত্যাগ কর। বারো রাজপুত তের চুল্লী, ছত্রিশ জাতির ভেদ, ব্রাহ্মণ-পঞ্চমের অস্পৃশ্যতা—এই সকল জাতীয় অপবাদের কথা আর যেন আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরেরা ইতিকথা ব্যতীত অন্য কোন আকারে প্রত্যক্ষ না করে। এই সকল ভেদাভেদ বিদূরিত করিয়া একবার ভারতের তেত্রিশ কোটী সন্তান মিলিত হইয়া দেশের কাজে, ভগবানের কাজে জীবন উৎসর্গ কর। দেখিতে চাই—কে আমাদিগকে প্রতিরুদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে দেশের এক অংশ, মাত্র পুরুষসমাজ আজ জাগিয়া উঠিয়াছে,তাহাই প্রতিরুদ্ধ করিবার চেষ্টায় সমাজমধ্যে কি অস্থিরতা ও বিক্ষোভ প্রকাশ পাইতেছে। সমগ্র দেশের নরনারী যখন একসঙ্গে চলিবে ফিরিবে, একপ্রাণে কথা বলিবে, সে জাগরণের গতিকে প্রতিরুদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও আছে কি না সন্দেহ।

যাঁহারা এই জাগরণের পথে অগ্রণী হইবেন, তাঁহারা অগ্রে আসুন। নিজের নাম-যশলাভের জন্য নহে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, কিন্তু দেশের দেহ মন ও আত্মা, জাতির জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি, সর্ব্ববিষয়ে মুক্তি প্রদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অগ্রে আসুন—সকলের অগ্রে দেশের ও মানবসমাজের মুক্তিপতাকা বহন করিয়া চলুন। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিব। আমরাও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া আলস্যে মাথা রাখিয়া কাল কাটাইব না। আমরাও মুক্তির সিঙ্গা বাজাইয়া নিদ্রামগ্ন নরনারীকে জাগাইয়া তুলিব—জাগরণের ভেরীরবে গগনভুবন স্পন্দিত করিয়া তুলিব। দলে দলে মুক্তিবাহিনী প্রস্তুত করিতে থাকিব। বিশ্বপতি আমাদের সেনাপতি হইয়া সুপথ

* ৬ই মাঘ সায়ংকালে আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

দেখাইয়া চলিবেন। আমাদের গতি রুদ্ধ করে কাহার সাধ্য?

মিলনের অভাবেই আমাদের সকল কর্ম্মই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু শত মতভেদ সত্ত্বেও আমরা বিশ্বপিতা অখিলমাতার সন্তান, আমরা একই অমৃতপুরুষের সন্তান, এই অমৃতময় ভাব লইয়া যদি দেশের ও মানবসমাজের মঙ্গলসাধনে অগ্রসর হই, ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্যসাধনে কায়মনে নিযুক্ত হই, তবে তাহা হইতে কেহই আমাদিগকে ফিরাইতে পারিবে না।

মিলনের অভাব যেমন আমাদের কর্ম্ম পণ্ড করিবার একটী প্রধান কারণ, সেইরূপ আর একটী প্রধান কারণ হইতেছে—আমাদের কথায় ও কাজে এক না হওয়া। কথায় ও কাজে আমাদের অভিন্ন হইতে হইবে। অন্তর হইতে কপটতা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব তাহাই অন্তরে ধারণ করিতে হইবে, এবং তাহাই প্রকাশ্যে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে হইবে এবং নির্ভীক হৃদয়ে সেই সত্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সংসারের সুখসম্পদের কথা মন হইতে দূর করিয়া দিয়া সত্যের পথে চলিতে হইবে। আমরা নিজেদের সুখসম্পদ বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় মুহ্যমান হইয়া পড়ি; পাছে আমাদের বিলাসের উপর এতটুকু আঘাত পড়ে, সেই বিভীষিকায় অস্থির হইয়া পড়ি। তখন সত্যের পথ আমরা ভুলিয়া যাই, আমাদের প্রকৃত শ্রেয়ের পথ আমাদের মনে থাকে না। তখন আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতা আসিয়া পড়ে। এই বিভিন্নতার কারণে, আমাদের জীবনে সত্য ও মিথ্যার সংগ্রামে, শ্রেয় ও প্রেয়ের সংগ্রামে আমরা প্রেয়ের পশ্চাতে ধাবিত হই, মিথ্যাকে ধরিয়া মিথ্যার উপরে সংসারকে দাঁড় করাইতে চাই। তাই না, সহসা একদিন দেখি, সেই প্রেয়, সেই মিথ্যা আমাদের শত্রুগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাদিগকে ঘাটে ঘাটে কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। মিথ্যার সহিত কুটুম্বিতা কাটিয়া দাও। সত্যের সঙ্গে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হও। আলস-বিলাসকে পদতলে বিদলিত কর। প্রাণের ভয় বিদূরিত হইবে, মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। কথায় ও কাজে এক হও। তোমার সম্মুখে, কেহই অর্গলরূপে দাঁড়াইতে পারিবে না। তোমাকে কেহই বাধা দিতে অগ্রসর হইতে সাহস করিবে না। তোমার দীপ্ত নয়নের দিব্য জ্যোতিতে তোমার বিরোধী পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। বিশ্বজগত তোমার নিকটে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইবে। রাজসূয় যজ্ঞের বিশ্বজিৎ অশ্ব যেমন সমগ্র বিশ্ব জয় করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, তুমিও সেইরূপ বিশ্বজয়ে বাহির হইয়া বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরিবে, ইহা সুনিশ্চিত।

ব্রহ্মোপাসনা যদি সার্থক করিতে চাও, তবে সাধু মহাপুরুষদিগের, রাজা রামমোহন রায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রহ্মসাধকদিগের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ নয়নের সম্মুখে রাখিয়া কথায় ও কাজে এক হওয়ার ব্রত, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া মৈত্রীসাধনের ব্রত; এবং ভগবানকে প্রীতিপূর্ব্বক সমুদয় হৃদয়-মন তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া দেশের ও মানবসমাজের হিতকর কার্য্যসাধনের ব্রত গ্রহণ কর; এবং একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা ঐ সকল ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক ভগবানের চরণ-স্পর্শলাভের অধিকারী হও।

সংসারে ব্রহ্মসাধন।*

(সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণীদেবী)

১। অপ্রতিম পরব্রহ্মকে লাভ কর।

যে অপ্রতিম পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আমাদের আজকার এই উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন, হে অমৃতের পুত্রগণ! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—উত্থান কর, জাগ্রত হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের সন্নিধানে গিয়া সেই পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ কর। আজ এই মাঘোৎসবের পুণ্যপ্রভাতে ঋষিদিগের উচ্চারিত জাগরণ-মন্ত্রের দ্বারা অপ্রতিম পরমাত্মার পূজা করিবার জন্য আপনাদিগকে আমি তারস্বরে আহ্বান করিতেছি। যে নিত্য জাগ্রত মঙ্গলময় বিধাতা নিয়তই আমাদের মঙ্গলবিধান করিতেছেন এবং আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদআপদ হইতে নিয়তই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে মাত্র বুদ্ধিতে জানিলে চলিবে না, তাঁহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। শ্রদ্ধাভক্তির ভিতর দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে হইবে।

২। সংসারে ব্রহ্মসাধন সহজ পথ।

নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ে আমাদের দেশে এই একটি ভাব চলিয়া আসিতেছে যে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে সমস্ত সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে, পিতামাতা, স্বামীস্ত্রী, পুত্র-

* ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ভিতর যে সত্য নাই, তাহা নহে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটী বৃহত্তর সত্য আছে, যাহা সাধনা করিবার জন্য আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিশেষভাবে উপদেশ লাভ করি। সেই বৃহত্তর সত্য এই যে, যেমন দুঃখবিপদের কশাঘাতের ভিতর দিয়া ভগবানকে জানিতে হইবে, সেইরূপ সুখসম্পদের করুণারও ভিতর দিয়াও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অরণ্যপর্ব্বতের নীরবতার ভিতরেও যেমন তাঁহাকে আত্মা দ্বারা স্পর্শ করিবে, সেইরূপ গৃহসংসারের সজন কোলাহল-কলরবের ভিতরেও তাঁহারই করুণামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সংসারধর্ম্ম বজায় রাখিয়া পরমাত্মার সহিত আত্মসমাধানের উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ ঝোঁক দিয়া থাকেন। ভগবান যখন আমাদিগকে পিতামাতা ভাইভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত গৃহসংসার দিয়াছেন, তখন সেই গৃহসংসারের ভিতরে থাকিয়াই তাঁহাকে লাভ করা তাঁহার অভিপ্রেত ও প্রকৃতিসিদ্ধ, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, ভগবান আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস যেমন সহজ করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ গৃহসংসারে থাকিয়াও তাঁহাকে লাভ করাও প্রত্যেক মানবের অন্তরে সহজ সত্যরূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন; তাই এই সহজ সত্য ছাড়িয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে প্রবেশ করিবার অথবা অযথা তর্কবিতর্কের গহন অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোনই প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

৩। সীমাবদ্ধ হওয়াই দুঃখের কারণ।

ভগবানই একমাত্র পূর্ণস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। আমরা তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত এক একটী সীমাবদ্ধ বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। সুতরাং শরতের নির্ম্মল আকাশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বর্ষার প্রারম্ভে যেমন মসীমর্ণ ঘনমেঘজাল সুনীল আকাশমণ্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ দুঃখবিপদের ঘন মেঘজাল যে আমাদের অন্তরকে সময়ে সময়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, পাপতাপের জালাযন্ত্রণার অসহ্য উত্তাপে সময়ে সময়ে আমরা যে মুহ্যমান হইয়া পড়িব, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। সীমাবদ্ধ হইবার কারণেই, আমরা পূর্ণস্বরূপ ভগবান নহি বলিয়াই, এইরূপ দুঃখবিপদ পাপতাপের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। একথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা যে, আমরা কেন সীমাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। এই প্রশ্নের উপর শতবিধ কূট তর্কবিতর্ক উপস্থিত করিতে পারিলেও উহার শেষ সিদ্ধান্তে মানব কোনকালে উপস্থিত হইতে পারিবে বলিয়া মনে করি না। একমাত্র ভগবানই এই প্রশ্নের শেষ পরিসমাপ্তি।

৪। মঙ্গলময় সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে।

সংসারে দুঃখবিপদ আছে বলিয়া মঙ্গলময় বিধাতার করুণার কথা ও মঙ্গলভাব ভুলিলে চলিবে না। মাতৃগর্ভে অবস্থান অবধি আমরণ যাঁহার করুণা প্রতিপদে উপভোগ করিবার অবসর পাই, যাঁহার মঙ্গল হস্তের লিখন প্রতি পত্রে, প্রতি পুষ্পে, বায়ুর প্রতি হিল্লোলে, স্রোতস্বতীর প্রতি জলবিন্দুতে দৃষ্ট হয়, সময়ে সময়ে দুঃখবিপদের তাড়নায় বা পাপতাপের যন্ত্রণায় তাঁহার স্নেহময় মঙ্গলময় ভাব ভুলিলে চলিবে না। প্রত্যক্ষ কর, সমস্ত দুঃখবিপদের মধ্যে তিনি তোমার সম্মুখে পিতৃমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। তোমার দৃষ্টিকে অন্তরে ফিরাইয়া উপলব্ধি কর, সমস্ত পাপতাপ জালাযন্ত্রণার মধ্যে তিনি করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিয়া তোমার মনে প্রাণে নিত্যই শান্তিবারি সেচন করিতেছেন। ইহা স্থির জেন যে, সেই পরম পিতা-মাতা পরমেশ্বর দুঃখবিপদ পাপতাপ সমস্তই তোমার মঙ্গলসাধনেরই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। দুঃখবিপদই বল বা সুখসম্পদই বল, এসমস্তই তাঁহারই স্নেহের দানস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—কিছুই অবজ্ঞা বা উপেক্ষার বিষয় নহে। ইহা সুনিশ্চিত যে, এই বিশ্বজগত যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই যখন তোমাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অনুপম সুন্দর জগতে তোমার আসিবার মূলকারণ যখন তিনিই, তখন তিনি কখনই তোমার প্রকৃত বিনাশের কারণ হইতে পারেন না—তিনি তোমা হইতে দূরে থাকিতে পারেন না, মুহূর্ত্তেরও জন্য তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সংসারের সকলেই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি তুমি তাঁহার অনিমেষ মঙ্গলদৃষ্টি হইতে বিচ্যুত থাকিতে পারিবে না। অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে গিয়া আলোচনা কর—করিলেই দেখিতে পাইবে যে, অতীতে তুমি কতবার বিপদসাগরে ডুবিতে ডুবিতে বা পাপ-তাপের দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইতে কাতর প্রাণে সেই বিপদকাণ্ডারী ও পাপ-নিসূদন ভগবানকে যখনই রক্ষা করিবার জন্য ডাকিয়াছ, তখনই তিনি তোমার বিপদজাল মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া এবং তোমার পাপদগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি সেচন করিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। লক্ষ-কোটী যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জগতের লক্ষ-কোটী জীব তাঁহারই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া আনন্দসাগরে অবগাহন করিয়াছে ও করিতেছে এবং তাঁহারই জ্ঞানের ও তেজের কণামাত্র

লাভ করিয়া অথণ্ডের উন্নতি ও মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও হইবেছে। ইহাই তো আমাদিগকে তাঁহার পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে তিনি যেমন অন্নপান দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আজীবন তিনি আমাদিগকে তাঁহার অক্ষয় প্রেমের রক্ষাকবচে নিত্যই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী প্রেমধারায় আমাদের দেহ মন ও আত্মা হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহারই অমৃতরস পান করিয়া এবং তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাতে আমরা আপনার উপর নির্ভর করিতে পারিলেও তিনি কখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না—করিতে পারেন না।

৫। সংশয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপাসনায় নিরত হও।

চক্ষের সম্মুখে সামান্য কুটাকাঠি আসিয়া আড়াল করিলে যেমন সমস্ত বিশ্বজগত অন্তরালে পড়িয়া যায়, সংসারের ছোটখাট ক্ষণিক সুখদুঃখকে মনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া ঈশ্বরকে সেই প্রকার অন্তরালে ফেলিতে দিও না। সংসারের সকল কর্ম্মেই, জগতের প্রত্যেক ঘটনাতেই তাঁহার মঙ্গল হস্ত প্রত্যক্ষ কর—প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার চরণে সমুদয় হৃদয়মন অর্পণ কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়াই নিজের ও পরিবারের, দেশের ও জগতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলসাধক কার্য্যসমূহে আত্মনিয়োগ কর।

৬। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনই তাঁহার উপাসনার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ।

তাঁহার উপাসনার জন্য বাহ্যাড়ম্বরের ঘনঘটার প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার বাহিরের উপকরণের অপেক্ষা নাই। অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং তাঁহার ইচ্ছার অনুসরণে শুভকর্ম্ম সম্পাদনই তাঁহার উপাসনার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সত্যটী স্পষ্টতম ভাষায় সুব্যক্ত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্ররূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে উপাসনার মূলতত্ত্ব এমন সংক্ষেপ আকারে আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

৭। তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নাই।

তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নাই। সমস্ত অমঙ্গলের ভিতরেই তাঁহার মঙ্গল হস্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। প্রতি নিমেষের প্রতি ঘটনায়, গাছের প্রতি পত্রে, কুসুমের সুগন্ধে ও আমাদের অন্তরের সদ্ভাবসমূহে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সেই বিশ্বপতি ও বিশ্বনিয়ন্তা পরমপুরুষকে জানিবার অধিকারে তাঁহার মঙ্গলভাবের পরিচয় অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত দেখা যায়।

৮। তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু নাই।

তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু ও বিনাশ বলিয়া কোন কিছুই নাই। তিনি প্রাণস্বরূপ। তিনি সমস্ত প্রাণের মূলাধার। তাই আমরা কি বাহিরের প্রকৃতিরাজ্যে, কি আমাদের অন্তরের অধ্যাত্মরাজ্যে—কোথাও প্রকৃত মৃত্যু বা বিনাশ দেখিতে পাই না। বহিঃপ্রকৃতিতে যেমন মৃত্যু বা বিনাশের নামে পরিবর্ত্তনেরই চিরন্তন লীলাখেলা দেখিতে পাই—সেইরূপ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিতেও পদে পদে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর নামে পরিবর্ত্তনেরই বিচিত্র লীলার পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই পরিবর্ত্তনসূত্রেই মানবজীবনের পশুত্ব ঘুচিয়া যায় এবং মানুষ আপনাকে দেবতার পদে উন্নীত করিতে সক্ষম হয়। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে এই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

৯। তাঁহাতে আত্মসমর্পণই রক্ষার উপায়।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যদি কখনও দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকি, যদি কখনও অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনি, যদি কখনও মৃত্যু বা বিনাশের অভিমুখে ধাবিত হই, তবে সেই দুঃখবিনাশন কলুষহরণ পরমেশ্বরের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেই আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা পাইব—আমাদের সকল দুঃখতাপ, সমুদয় জ্বালাযন্ত্রণা মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং আমাদের অন্তরে শান্তিসুধা শতধারে বর্ষিত হইবে। তাঁহার আদেশপালনেই আমাদের সুখ, আমাদের জীবন। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণেই আমাদের দুঃখ, আমাদের মৃত্যু। তিনি আমাদের অন্তরে তাঁহার আদেশপালনের শুভবুদ্ধি নিয়তই প্রেরণ করিতেছেন। সেই শুভবুদ্ধির অনুশাসন অবহেলা করিবার জন্যই আমরা দুঃখ লাভ করি, এবং মঙ্গলময়ের প্রতি সংশয় পোষণ করিতে থাকি। এই সংশয় দূর করিয়া দাও। ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়া তাঁহারই প্রেরিত শুভ-

বুদ্ধি যে পথ প্রদর্শন করিবে, সেই পথ ধরিয়া চল—কণ্টকের আঘাতে তোমাকে জীর্ণশীর্ণ হইতে হইবে না, বিষদিগ্ধ বায়ুতে তোমাকে কঙ্কালসার হইতে হইবে না। যাঁহার জ্ঞানের, যাঁহার বলের কণামাত্র লাভ করিয়া সাধু-মহাত্মাগণ সংসারের দুঃখবিপদ দূরীকরণে আশ্চর্য্য বল ধারণ করেন, ইহা বলা বাহুল্য যে, সকল জ্ঞানের উৎস, সকল বলের উৎস সেই পরম পুরুষের চরণস্পর্শ লাভ করিলে তোমার দুঃখবিপদ শোকতাপ সকলই বিদূরিত হইবে। আজ এই উৎসবের পুণ্য প্রভাতে সেই আত্মদা বলদা পরমেশ্বরের চরণ-বন্দনা করিয়া এস, জীবনকে ধন্য করি।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! হে উৎসবদেবতা! এই মহোৎসবে আমাদের মস্তকে তোমার আশীর্ব্বাদ শতধারে বর্ষণ কর, যাহাতে আমরা আমাদের শরীর মন আত্মাকে বুদ্ধি ও বলে, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিয়া তুলিতে পারি; যাহাতে আমরা কি অর্থে ও মানে, কি যশে ও কীর্ত্তিতে, কি জ্ঞানে ও ধর্ম্মে, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আসন অধিকার করিতে পারি। আমাদিগকে এমন শক্তিসামর্থ্য প্রদান কর, যাহাতে আমরা অসহায়ের সহায়, এবং দুর্ব্বলের বল হইতে পারি; অনাথ ও আতুর যাহারা তাহাদের অভাব মোচন করিয়া তাহাদের শরীরে বল এবং মনে সুখশান্তি বিধান করিতে পারি। বিপদ আপদ যখন আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে, আমরা যখন রোগশোকের অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়া শক্তিহীন অবস্থায় নিপতিত হই, তখন হে দুঃখবিনাশন ভগবান তুমিই আমাদিগের বর্ম্মদুর্গ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিও; আমাদের দুঃখবিপদ, আমাদের রোগশোক সমস্তই বিদূরিত করিয়া আমাদের প্রাণে শান্তিবারি ঢালিয়া দিও। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, জননীরূপে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছ, ইহা অন্তরে বুঝিবার শক্তি ও বুদ্ধি আমাদিগকে প্রদান কর। আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি—তুমি আমাদের কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাক।

সুখ আসিলে তাহাও যেমন তোমার দান বলিয়া গ্রহণ করি, দুঃখ আসিলে তাহাও যেন তোমার দান বলিয়া মস্তক পাতিয়া লই, দুঃখের ভারে আমরা যেন আপনাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ হইতে না দেই। তোমার প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যেন সর্ব্বদাই জনহিতকর কার্য্যে নিরত থাকি; স্বার্থের বশীভূত হইয়া কোনপ্রকার অমঙ্গল চিন্তাকে অন্তরে যেন স্থান না দেই বা কোন প্রকার অমঙ্গল কার্য্যে যেন হস্তক্ষেপ না করি। আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকে যেন সর্ব্বদাই বিমল ও পরিশুদ্ধ রাখি। প্রতিদিন প্রভাতে আমরা যেন আমাদের জীবন তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া দিই এবং তোমার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মূর্ত্তি অন্তরে রাখিয়া, সেই পথে চলিতে অভ্যাস করি। হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর! আমাদের মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর, যাহাতে তোমার প্রতি আমাদের আস্থা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে, যাহাতে তোমার প্রতি আমাদের সকল আশাভরসা অবিচলিতভাবে রক্ষা করিতে পারি এবং আমাদের ছোটবড় সকল কার্য্যে ও সকল অবস্থাতে তোমার সহিত অনন্যভাবে একাত্মযোগে যুক্ত থাকিতে পারি। আমাদের এই প্রার্থনা তুমি সর্ব্বতোভাবে সফল কর।

ওঁতৎসৎ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদারতা।*

(শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ, বি-এল)

অন্তহীন নীল আকাশ সমভাবে চিরবিরাজমান শ্যামলা ধরিত্রীর ঊর্দ্ধে। দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এই আকাশের বুকে ফুটে উঠে'। বনপ্রান্তর গিরিদরী নদীসমুদ্র আলোকিত করে। রাত্রে সংখ্যাতীত গ্রহনক্ষত্র সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রমা কৌমুদী-প্রবাহে ভাসিয়ে দেয় কত বল্লী-বিতান, কুসুমকুঞ্জ, সুপ্তপল্লীর নিস্তব্ধকুটীর। এই আকাশের বক্ষ ভেদ করে বর্ষার বারিধারা নেমে আসে কৃষকের শস্যক্ষেত্রে—ঊষর মরুর বুকে শ্যামলিমার ছবি ফুটিয়ে তোলে। মাঝে মাঝে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করে বজ্রনিনাদ ধ্বনিত হয় বটে, কিন্তু সে যেন পুত্রের মঙ্গলের জন্য পিতামাতার স্নেহশাসনের মতই মঙ্গলপ্রসূ—যা' ক্ষুদ্রদৃষ্টি মানব ঠিক বুঝতে পারে না। এই অসীম আকাশ দিন দিন ধরিত্রীর মঙ্গলসাধন করে চলেছে, দিন দিন ধরণীকে প্রেমের বন্ধনে বেঁধেছে। আকাশ ও ধরণী—এই উভয়ের মধ্যে মিলনগ্রন্থী রচিত হয়েছে সৃষ্টির প্রথম গরিমাময় প্রভাতে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবন পর্য্যালোচনা করলে আমরা তাঁর মধ্যে আকাশের এই উদার প্রেম-ভাব সম্যক্ পরিস্ফুট দেখতে পাই। বাল্যে এই আকাশের ভিতর দিয়ে ভগবানের অনন্তস্বরূপ তাঁর প্রাণে প্রতিভাত হয়েছিল; সংখ্যাহীন গ্রহ-তারকা, অগণিত সৌরমণ্ডল যে অনন্ত আকাশে ভ্রাম্যমাণ, সেই আকাশের রচয়িতা, সেই আকাশের স্রষ্টা কখনো সসীম হতে পারেন না—এই যে অসীমত্বের উপলব্ধি, ইহা

---

* গত ৬ই মাঘ আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

মহর্ষির প্রাণকে আকাশের মতই উদার মহান্ ও শাশ্বত সাম্যভাবে পরিপূর্ণ করেছিল।

আকাশ যেমন কারোর উপর কৃপা বিতরণে কার্পণ্য করে না, ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে চাঁদের জ্যোৎস্না, সূর্য্যের কিরণ, তারার আলো, বর্ষার বারিধারা বিতরণ করে, মহর্ষিও সেইরূপ সমভাবে সকলকে গ্রহণ করেছেন, সকল ধর্মের প্রতি, সকল উপাসকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে গেছেন।

ভূতলে মানবপ্রাণে বৈরাগ্যের উদ্বোধক শ্মশান। রাজাপ্রজা, ধনিনিধন, পাণ্ডিতমূর্খ, মানি-লাঞ্ছিত, পুরুষ-নারী, ব্রাহ্মণশূদ্র সকলেরই চরম পরিণতি এখানে। যিনি যত বড়ই হোন, বা যিনি যত ক্ষুদ্রই হোন মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শে একদিন সকলেরই এই সাম্যাবস্থায় উপস্থিত হতে হবে। তাই কবি বলেছেন—

"বীরত্বের গর্ব্ব আর প্রভুত্ব বৈভব,
সম্পদ্-সৌন্দর্য্য সব যাহা করে দান,
অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর হয় মুখাপেক্ষী সব –
গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান॥"

এই মৃত্যুর কঠোর ছায়া বুদ্ধদেবকে নির্ব্বাণের পথে টেনে নিয়েছিল। পিতামহীর মৃত্যুকালে এই শ্মশানপ্রান্তে মহর্ষি সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মানন্দের অরূপ মাধুরী উপলব্ধি করেন। শ্মশানের ভীষণ-গম্ভীর বৈরাগ্যোদ্যোতক মূর্ত্তির সঙ্গে আকাশ ও ধরণীর অপূর্ব্ব সমবায়ে মহর্ষির প্রাণের বীণায় বেজে উঠেছিল, আধ্যাত্মিক জগতের এক অতীন্দ্রিয় রাগিণী, যার প্রতি মূর্চ্ছনায় ক্ষরিত হয়েছিল অমৃতের ধারা; আর সেই অমৃতের সন্ধানে আত্মহারা মহর্ষি ধন-জন-সুখৈশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষকর ধূলিমুষ্টির মত তুচ্ছ মনে করে সাধনে ব্রতী হয়ে পড়েন।

শ্মশান-প্রান্তের অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি মহর্ষির জীবনকে প্রশান্ত সাম্যভাবে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। জাগিয়ে তুলেছিল তাঁর প্রাণে শাশ্বতী সত্যনিষ্ঠা, মহা সমুদ্রের মত উদারতা, যার বলে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের পথহারা পথিককে স্বীয় মহতী স্নেহচ্ছায়ায় টেনে নিয়ে সন্তাপের তপ্ত বায়ু-প্রবাহ থেকে রক্ষা করেছেন।

যেদিন মহর্ষিকে তাঁর আত্মীয়স্বজন সকলে কৌশলে পৈত্রিক ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেদিন মহর্ষির জীবনের এক স্মরণীয় দিন— একদিকে সত্য ও দারিদ্র্য, অপরদিকে কৌশল বা মিথ্যা ও অগাধ ঐশ্বর্য্য শ্রীবৎস রাজার সম্মুখে শনি ও লক্ষ্মীর মত মহর্ষির মানসজগতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সত্যব্রত সত্যসন্ধ মহর্ষি ঐশ্বর্য্যের লোভে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। পুণ্যশ্লোক ভীষ্মের মত সত্যের পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দুঃখ-দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষাত্রবীর প্রতাপসিংহের মত কেবলমাত্র সামান্য মাদুরের উপর সমগ্র পরিবারের শয্যা রচনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

যেদিন কিশোরবয়স্ক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সত্যের প্রেরণায় যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করে হিন্দুসমাজের তাৎকালিক প্রচলিত রীতিবিগর্হিত কার্য্য করেন, অথচ পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করে যজ্ঞোপবীত গ্রহণে অসম্মত হন, তখন হিন্দুসমাজ তাঁকে পরিত্যাগ করলেও, মহর্ষির স্নেহাঙ্কলে তিনি আশ্রয় ও শান্তি লাভ করেছিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও প্রথম জীবনে মহর্ষির স্নেহ-চ্ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে তাঁহার মহতী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করেছিলেন। পাখী যেমন পক্ষপুট বিস্তার করে স্বীয় শাবককে সকল বিঘ্নবিপদের হাত হইতে রক্ষা করে মহর্ষিও আশ্রিতজনকে সমস্ত পারিবারিক ও সাংসারিক অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে তেমনিভাবে স্বীয় মহতী উদারতার প্রভাবে রক্ষা করে গেছেন। তাঁদের হাত ধরে পরব্রহ্মের সাধন-পথে টেনে নিয়ে পথ চলেছেন।

মহর্ষির চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব তিনি বিশ্ব-জগতকে বহির্ভাগ থেকে না দেখে, তার মূল উৎপত্তিস্থলে গিয়ে দেখ্তেন। মানুষের যা কিছু ভেদ, বৈষম্য, বিবাদ, কলহ, দ্বেষ—সবই বহির্ভাগে পুঞ্জীভূত, যেমন আমরা মানবদেহের বর্ণ, গঠন, উচ্চতা প্রভৃতির দিক্ দিয়ে বৈষম্য দেখি, তেমনি যদি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিশ্লেষণ করি, দেখ্‌ব—সব দেহই রক্ত-মাংস-শিরা-উপশিরার সমষ্টি মাত্র; আরও গভীর স্তরে অবতরণ করলে সকলের আণবিক সমতাও পরিদৃষ্ট হবে। তখন যে সমস্ত পার্থক্য আমাদের পুরোভাগে বিশাল শরীর ধারণ করে দেখা দিয়েছিল, সবই তিরোহিত হবে। মহর্ষিও মানবকে দেখতেন—সকলেই "অমৃতস্য পুত্রাঃ"— সবই অমৃতের সন্তান, পরব্রহ্মের স্নেহের দুলাল—বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে ভেদ-বৈষম্য হেতু রুচির পরিবর্ত্তনে বিভিন্ন পথে চলিতেছে; কিন্তু সকলেই ত পরমপিতার সন্তান—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে তিনি বিশ্বমানবকে "ভাই" বলে আলিঙ্গন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যখন নীচে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে সুদূর শ্যামল শস্যক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন এটা রামের জমি, ওটা শ্যামের জমি, দূরবর্ত্তীটা হরির জমি— এইরূপ আলিবিভাগবিশিষ্ট হয়ে জমিগুলি দেখা দেয়; কিন্তু যখন পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করি,

তখন দেখি—ক্ষুদ্রতার সঙ্কীর্ণতার মানদণ্ড পরিমিতিতায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে; দিগন্ত হতে দিগন্ত পর্য্যন্ত পরি-ব্যাপ্ত শ্যামলিমা নয়ন-মন মুগ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে; মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা যে বিভিন্নতার রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল, তার স্থানে যেন কোন কুহকী ঐন্দ্রজালিক একখানা নীল চাদর পেতে রেখেছে।

সাধনার পবিত্র প্রেমে উদ্বুদ্ধহৃদয় মহর্ষি সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করে অনেক উচ্চ স্তরে আরোহণ করত মানব সমাজের বৈষম্য-বিভিন্নতা ভুলে গিয়ে-ছিলেন। তিনি দেখতেন—বিভিন্ন সম্প্রদায় দেশ-কালের পার্থক্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরব্রহ্মের চরণতলে ছুটে চলেছে, যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলধারা ভিন্ন ভিন্ন নগর-গ্রাম-জনপদের ভিতর দিয়ে একই মহা-সাগরের দিকে ছুটে যায়। কোন কোন নদী যেমন ক্ষীণ জলধারা সাগরে নিয়ে পৌঁছাতে পারে না, পথি-মধ্যে হয় ত মরুবালুকার অভ্যন্তরে লীন হয়ে যায়, কিন্তু বৃহৎ বেগবান্ জলপ্রবাহ যদি সেই ক্ষীণধারাকে পথিমধ্যে দেখতে পায়, তবে যেমন তাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে সাগরে পৌঁছে দেয়, মহর্ষির বিশাল হৃদয়ও তেমনি ক্ষীয়মান জীবনীশক্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়কে প্রকৃত পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে—সার্ব্বজনীনতার দিক দিয়ে সকলকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করেছে।

মহর্ষির আর একটি বৈশিষ্ট্য 'মধুকরবৃত্তি'। অবশ্য এ বিষয়ে রাজা রামমোহন পথপ্রদর্শক, আর মহর্ষি তাঁহারই অনুসৃত নীতির পরিপূরক। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মধুকর শ্রুতিসুখকর গুঞ্জনরবে মনপ্রাণ মুগ্ধ করে, পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণ করে, পুষ্পের অভ্যন্তরে যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ মধু বর্ত্তমান, তাই আহরণ করে; অন্য কিছুই গ্রহণ করে না; মহর্ষিও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যা কিছু সত্য বা সার বস্তু দেখেছেন, তাই নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন, স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিপোষক যেখানে যা পেয়েছেন, তাতেই নিজের হৃদয়-সাজি পূর্ণ করেছেন, মানস-উদ্যান সুসজ্জিত করেছেন।

এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে তিনি সুফি সম্প্রদায়ের রচনাবলী আলোচনা করেছেন; সিংহলে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় নিরত ছিলেন, খৃষ্টধর্ম্মের পুস্তকাবলীও তিনি অধ্যয়ন করতেন।

সদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ পুস্তকে দেখতে পাই, বিজয়কৃষ্ণ-গোস্বামী মহর্ষির রোগশয্যায় পার্কষ্ট্রীটের বাড়ীতে দেখা করতে গিয়ে দেখেছিলেন—রোগশয্যায়, আত্মযন্ত্রণা উপেক্ষা করে, মহর্ষি শান্তগম্ভীর-কণ্ঠে, হাফেজের মর্ম্ম-স্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করছেন, আর, তাঁর চক্ষু দিয়ে প্রেমাশ্রু নির্গত হচ্ছে।

রামকৃষ্ণকথামৃতে দেখি, রামকৃষ্ণ পরমহংস যখন মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করতে আসেন, তখন তিনি পরমহংসদেবকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্তোষের জন্য মহর্ষি উপনিষদের কোন কোন অংশ পাঠ করে ব্যাখ্যাও করেছিলেন।

মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মহর্ষির মতবাদের পূর্ণবিকাশ। প্রায় শতাব্দী ধরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে; কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে উক্ত পত্রিকায় কোন রকম সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমূলক কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি, বা কোন অসাধু ভাষা প্রয়োগ করা হয় নি, সমভাবে সকলকে ধর্ম্মবিষয়ে গন্তব্যপথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছে; উদারতম সার্ব্বজনীন একেশ্বরবাদের আলোচনাই জগতের মঙ্গলপ্রসূ বলে ইহাতে প্রচারিত হয়ে আসছে।

উপনিষদ্-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজা রামমোহ-নের একেশ্বরবাদ সাম্প্রদায়িকতার অনেক ঊর্দ্ধে অব-স্থিত। নিখিল বিশ্বের সঙ্গে প্রেমময় সম্বন্ধ স্থাপনই তাহার কার্য্য, হৃদয়ের মালিন্য-কালিমা দূরীভূত করে "ভাই" বলে সকলকে আলিঙ্গন করাই এর বিশেষত্ব। মহর্ষিও একেশ্বরবাদের সার্ব্বজনীনতা স্বীয় জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে গেছেন। সামাজিক আচার-ব্যবহারের ভেদ-বৈষম্যে কাহাকেও অবহেলা করা ত দূরে থাক, বরং বাহ্য বৈষম্যের অন্তরালে যে অভ্যন্তর-গত সাম্য রয়েছে, তাই দেখে তিনি সকলকে সমভাবে গ্রহণ করেছেন।

এই ভাবের বাহ্যবিকাশে আমরা দেখতে পাই—তিনি নিজে যদিও কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ করতেন না, কিন্তু কোন দিন কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন-ধারীকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নি। সাম্প্রদায়িক চিহ্নধারী বা সাম্প্রদায়িক-চিহ্নত্যাগী নির্ব্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ই রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য তাঁহার নিকট আহ্বান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য কয়েক-জন ব্রহ্মোপাসক সমাজের উপাসনা কার্য্য থেকে সাম্প্রদায়িক চিহ্নধারীকে বর্জ্জন করার জন্য মহর্ষিকে অনুরোধ করেন, আর তাঁদের অনুরোধ রক্ষা না হলে তারা ভিন্ন সমাজ গঠন করবেন বলে পত্র লেখেন, তখনও আত্মনিন্দায় অবিচলিত মহর্ষি তাঁদের পত্রের উত্তরে যে অবিচলিত ধৈর্য্য, অপরিসীম উদারতা, অলোকসামান্য প্রেমপরায়ণতা ও আত্মসংযম প্রকাশ করেছিলেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহর্ষিকে স্বীয় মতানুযায়ী করতে অসমর্থ হয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন, কিন্তু মহর্ষি কোন দিন তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নি, বরং নিজে কেশবচন্দ্রের গৃহে ও নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গমন করে কি ভাবে উপাসনাকার্য্য পরিচালনা করলে সমাজের উন্নতি হবে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ দান করেছেন। কোন দিন কেশবচন্দ্রের কোন ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ মহর্ষি উপেক্ষা করেন নি; চিরদিন সমভাবে স্নেহচ্ছায়া বিতরণ করে গেছেন।

সত্যধর্ম্মের প্রচারে কৃতসঙ্কল্প মহর্ষি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন, যাহাতে জগদ্বাসী ক্রমে ক্রমে ভারতের জ্ঞানালোক লাভ করে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের অনুবাদ দেখে স্বীয় প্রাণে ঋগ্বেদ অনুবাদের প্রেরণা লাভ করেছিলেন, একথা তিনি স্বীয় পুস্তকে স্বীকার করেছেন।

মহর্ষির প্ররোচনায় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে বিলাতে Comparative study of Religion বা তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়; তাহার পূর্ব্বে ঐরূপ কোন সমিতি ইংলণ্ডে ছিল না।

বাস্তবিক মহর্ষির মহতী প্রতিভা, উদারতম ধর্ম্মমত, অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা, সার্ব্বজনীন প্রেমপরায়ণতা, আশ্রিতবাৎসল্য প্রভৃতি গুণাবলীর যতই আলোচনা করি, ততই মহর্ষির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়; ততই মনে হয় মহর্ষির মত আদর্শ মহাপুরুষকে দেশকালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীঅভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নয়। মহর্ষি শুধু ব্রাহ্মসমাজের নন—তিনি পৃথিবীর যে কোন জাতির, যে কোন সমাজের, যে কোন দেশের ব্রহ্মোপাসকসম্প্রদায়ের আদর্শস্থানীয়; তিনি শুধু অতীতের নন; যে কোন কালে—বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের কোলে যখনই মানবের সত্যনিষ্ঠা উদারতা সার্ব্বজনীনতার আদর্শ পুরোভাগে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন মনে হবে—তখনই মহর্ষির পুণ্য-মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে ফুটে উঠবে। হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ই মহর্ষিকে নিজের ব'লে গৌরব করতে পারে; বঙ্গদেশ মহর্ষিকে অঙ্কে ধারণ করে ধন্য হয়েছে; হয়ত এমন দিন আসবে, যেদিন সমগ্র পৃথিবী মহর্ষির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করবে।

আজ মহর্ষির তিরোভাব-দিবস। সত্যব্রত ভীষ্মের মত সত্য রক্ষায় অটল অচল মহর্ষি রবির উত্তরায়ণ-সংক্রমণে পুণ্য মাঘমাসে চিরসমুজ্জ্বল ব্রহ্মলোকে গমন করেছেন। আজ তাঁর পুণ্যস্মৃতি সমবেত উপাসকমণ্ডলীর হৃদয়ের বীণায় সাম্যবাদের নবীন সুর ঝঙ্কৃত করুক। আকাশের অসীম ছায়াপথের তারার আলোকে, বনান্তচারী সান্ধ্যসমীরের পরিমলসুরভিত প্রবাহে, সুরতরঙ্গিণীর অশ্রান্ত কলঝঙ্কারে, নৈশবিহগের পক্ষপুটসঞ্চালনের মধ্যে, প্রান্তর-বক্ষ বৃক্ষশীর্ষে অবস্থিত আলোকলতার পাতায় পাতায় খদ্যোতিকার নৃত্যচ্ছন্দে, সীমাহীন শব্দহীন মহালোকের বিজন নেপথ্য থেকে মহর্ষির উদারভাব, সত্যব্রতের পুণ্য আদর্শ মর্ত্ত্যের ধূলিমলিন আশাবাসনায় উদ্বেলতরঙ্গায় ব্রহ্মোপাসকের প্রাণের গভীর স্তরে ফল্গুধারার মত নেমে আসুক, মহর্ষির জীবনব্যাপী সাধনা জয়যুক্ত হোক।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

(৩রা মাঘে গীত)

বেদগান (সানুবাদ)।

(সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী)

মিশ্র ভৈরবী—তাল ফেরতা—একতালা ও তেওরা।

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়
আবিরাবীর্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥

অসৎ হতে দেব তুমি সত্যে লয়ে যাও মোরে।
আঁধারেতে দেব তুমি দেখাও হে জ্যোতি মোরে।
মৃত্যু হতে দেব তুমি পারে লয়ে যাও মোরে।
স্বপ্রকাশ প্রকাশ হও, চরণে তব শরণ দাও।
দেব হয়ে দাক্ষিণমুখ করি' দূর যতেক দুখ
রক্ষা কর রুদ্র মোরে রক্ষা কর নিত্য মোরে ॥

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গুর্জ্জরী টোরী—তেওরা।

ধন্য দিননাথ তারক অযুত মালা
কণ্ঠ শোভিত ক'রে বিরাজিত;
সত্যরূপে অনন্ত বিরাজিত—অন্ত তোমার—অন্ত কোথা?
তুমি আদি পুরাণ সব পাপহারী
প্রাণ-অবারি—শঙ্কর দীনের হর হে ব্যথা।
ধরি চরণ, কৃপা করি' পাপ তাপ সব বিদূরি' হে,
রহিও চিতে সদা ॥

(১১ই মাঘে গীত)

বেদগান (সানুবাদ) ।

ভৈরবী—পটতাল।

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

অগ্নির অগ্নি হয়ে বিরাজেন সদা যিনি ।'
জলেতে স্নেহরূপে আছেন পশিয়া যিনি ॥
ওষধি বনস্পতি সবার দেবতা যিনি।
তাঁহারে ভক্তিভরে নমি—নমি—সদা নমি ॥

আলাইয়া—ধামার।

তাঁরি দেখ ভুবনে মোহন ভাব
মহিমা বিচিত্র সবে হে—
হর্ষে গাও, গাও, গাও, গাও।
শোন গগন অঙ্গনে বীণা বাজে তাঁহারি
জীবের প্রাণদায়ী।
প্রাণনাথ তিনি বন্ধু সখা তিনি
তিনি আছেন ভুবন তিন ভরি'—
তবু তুমি বন্ধু কেন বিষাদে মগ্ন পরাণ ?

ভৈরবী—সুরফাঁক্তা।

ওঙ্কার মহাদেব শঙ্কর তোমা
হেরিয়া মম পুরিল প্রাণের আশ।
নিয়তই ধরিছে ধ্যান
সুরনর তব রূপ মোহন
লভিয়া দরশন যায় ত্রাস।
হর দুঃখ দৈন্য নাশহে সব শঙ্কা।
চিত্ত তোমা সদা চাহে সুন্দরপ্রকাশ।
দীনহীন সেবকে রাখ হে পদপ্রান্তে—
তুমি মোর হে এক আনন্দনিবাস।

আশা—ঠুংরি।

তোমা সম প্রেমময় কে শুভদায়ী
আজি নব নব ভাবে ভাই বন্ধু মিলে সবে
বন্দনা গীত তব গাই।
আনন্দ সঙ্গীত হইয়া ধ্বনিত
গগন প্রাঙ্গণছায়
তারি সাথে একতানে গাহিবারে শত গানে
প্রাণ-মন হেন সদা চায়।
হৃদয়ে হৃদয়ে আজি নাম তব উঠে বাজি
সুখবায়ু বহে সব ঠাঁয়।
শান্তিসাগর তুমি আনন্দ-আকর তুমি
মন সদা তোমা পানে ধায়।

তোমারে না পাই যদি আর নাহি কোন গতি
মুক্তির নাহিক উপায়।
তোমারি চরণ দাও লইনু শরণ তায়,
রেখো প্রভু, রেখো তব পায়।
আশীষ দাও শিরে ঘরে যেন যাই ফিরে
তোমারি হেরি মুখভায়।
সংসার মাঝে ছোট বড় কাজে
মোদের হইও সহায়।

সায়ংকাল।

(৬ই মাঘে গীত)

বেদগান।

কল্যাণ—তেওরা।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু।
মা মা হিংসীঃ ॥
বিশ্বানি দেব সবিতর্ দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চঃ, নমঃ শঙ্করায় চ
ময়স্করায় চ, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

ইমন্—মধ্যমান।

হে প্রাণের দেবতা
তোমারি চরণে প্রাণ যেতে চায়।
অনেক পেয়েছি দুখ আঘাতে ভেঙ্গেছে বুক ;
লহ লহ তুলে তোমারি কোলে।

বাহার—কাওয়ালি।

চরণে শরণ দাও হে।
দীন শিশু আমি মাতা পিতা মম তুমি
চিরসাথী প্রাণের প্রাণ।
হৃদয়েরি ব্যথা যত কর তুমি বিদুরিত
পারি না বহিতে।
বর্ম্মদুর্গ তুমি ভয় বিপদ মাঝে
তব চরণ ছাড়ি প্রভু কোথা যাই—নাহি ঠাঁই
হে নাথ।

(রামপ্রসাদী সুর)

(মন) দেখ্ রে চেয়ে কে জেগে আছে।
গগন ভুবন চিত্ত-কমল
সকল ঠেঁয়ে যে যে আছে।
ঘুমিয়ে যবে রইবি সুখে
ঘরের ভিতর রইবি ঢুকে
ভুল না করে জানিস্ রে ঠিক
মা তোর সদাই গায়ের কাছে।

দুখেরি বান আসবে যবে
মরবি দুখের ঘায়ে যবে
চোখ খুলে তুই দেখলে মায়ের
দেখবি রে হাত সবার মাঝে।
মিছা ভয় তুই করিস্ নোকো
তাঁ হ'তে দূর ফিরিস্ নেকো
শোন্ ওরে তুই প্রাণের মাঝে
ঐ বিজয়ডঙ্কা তাঁরি বাজে॥

(১০ই মাঘে গীত)

বেদগান (অনুবাদ)।

কল্যাণ—তেওরা।

ওঁ পিতা তুমি জ্ঞানদাতা হে। নমি তোমা—
ছেড়োনাকো মোরে।
যতেক দেব হে পিতা দুরিত মোর করি' দূর
আশীষ তব বরিষ।
নমি দেব শম্ভব শুভদাতা হে,
নমি দেব শঙ্কর শুভাকর হে,
নমি দেব শিব শিবতর তোমায় হে॥

ইমন্—চৌতাল।

তোমারি নামে জাগিল প্রাণ
তুমি মোর শান্তিসাধনধন
সকল দিশি নাম ধ্বনিছে তব নিরন্তর।
চন্দ্র সুরজ গ্রহ তারাগণ শতেক ছন্দে
গাহে ধ্বনিয়া গগনে—শোনে অবাক যত দেবনর।
দীননাথ দীনবন্ধু দিবানিশি
তোমা ডাকে সেবক—তুমি হে সন্তাপহরণ।
দাও মোরে শুভ সম্পদ দুঃখবিনাশন—
জগন্নাথ জগজ্জীবন জগততারণ॥

ভক্তলীলা।*

(ডাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রদ্ধেয়া মাতৃগণ এবং শ্রদ্ধেয় উপাসকমণ্ডলী! আমরা যদি অণুতত্ত্ব আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, একটী অণু আর একটী তাহার স্বজাতীয় অণুকে আকর্ষণ করে; এই আকর্ষণে মিলন সংঘটিত হয়। এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য অণুর একত্র মিলনে একটী নূতন দ্বীপ, নূতন পাহাড়, নূতন দেশ রচিত হয়। ধর্ম্মজগতেও এইরূপ আকর্ষণ আছে। একটী সাধুজীবন আর একটী জীবনকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। এই মিলনের ভিতর দিয়াই নূতন আত্মিক জগৎ গঠিত হয়। প্রাচীনকালে যে সকল সাধু-জীবন, যে সকল ভক্তচরিত্র পৃথিবীতে লীলা করিয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সৎসাহস ও দৃঢ়সংকল্প আমাদের চরিত্র গঠন করিতেছে; আমাদের মধ্যে তাঁহারা নবজন্ম গ্রহণ করিয়া যুগ-যুগান্তরের আবরণ ভেদ করিয়া নূতন স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাহার একটী দৃষ্টান্ত আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

বর্ত্তমান পাটনা সহরের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান আছে। তাহার নাম রাজগিরি, রাজগৃহ শব্দের অপভ্রংশ। এখানে মগধের বঙ্গরাজন্যবর্গের রাজধানী ছিল। স্থানটী বেশ সুন্দর। ছোট ছোট পাহাড় আছে, উপত্যকা আছে, প্রস্রবণও আছে। স্থানটী সাধন-ভজনের অনুকূল দেখিয়া শাক্যমুনি সশিষ্য এইস্থানে তপস্যা করিতেন। একদা শ্রীবুদ্ধদেব সশিষ্য যখন তপস্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অলৌকিক সাধনার কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল। রাজগৃহের সন্নিকটে মহারাজ জেতের রাজধানী ছিল। তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া শ্রীবুদ্ধদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে আসিলেন। যেস্থানে বুদ্ধদেবের সহিত মহারাজ জেতের কথোপকথন হইয়াছিল, সেস্থানটী এখন জেতবন নামে প্রসিদ্ধ।

মহারাজ জেতের কৌতূহল হইবার কারণ এই যে, বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর রাজার সন্তান—তিনি কেমন করিয়া ভিক্ষার দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করেন; ধূলি তাঁহার শয্যা, বৃক্ষতল তাঁহার গৃহ, কখন রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ হইতেছেন, কখন শীতের প্রকোপে কম্পান্বিত দেহে কাল কাটাইতেছেন। ইহা দেখিবার জন্য তিনি রাজ-গৃহে আগমন করিলেন। দেখিলেন—বুদ্ধদেব সশিষ্য ধ্যানমগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, দেহ স্থির ও অচঞ্চল। মুখ হইতে যেন এক আলৌকিক জ্যোতি তাঁহার গৌরবর্ণ মুখকান্তিতে খেলা করিতেছে। শিষ্যদিগের মুখ হইতে স্বর্ণছটার ন্যায় উজ্জ্বলরশ্মি ঝরিয়া পড়িতেছে। মহারাজ জেত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নির্নিমেষ নয়নে শ্রীবুদ্ধদেবের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। গভীর অন্ধকারে একটী প্রদীপ যেমন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইরূপ বুদ্ধদেবের ধ্যানদীপ্ত মূর্ত্তিটী জেতকে আকৃষ্ট করিল। মহারাজার ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

প্রতীক্ষা করিতেলাগিলেন—কখন্ ধ্যান ভঙ্গ হইবে। দিনের পর দিন চলিয়া গেল। ধ্যান ভঙ্গ হইলে মহারাজ জেত করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—ভগবান বুদ্ধ! আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন। শ্রীবুদ্ধদেব সচকিতনেত্রে

* গত ১০ই মাঘ আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

একবার মহারাজ জেতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন যে, রাজবেশে দণ্ডায়মান এক সুপুরুষ ধর্ম্মার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বলিলেন,—মহারাজ অপেক্ষা করুন—এখনও সময় হয় নাই। তিনি নিরাশ অন্তরে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেন আমার প্রার্থনা বুদ্ধদেব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনেক চিন্তার পর এই স্থির হইল যে, বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী, আমি রাজা—বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী। সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্যেশ্বর রাজাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন কিরূপে? অতএব আমার সন্ন্যাস গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মহারাজ জেত অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিলেন, প্রজাবর্গকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলেন, রাজমহিষীর নিকট পরিচারিকা প্রেরণ করিলেন; কাশী, কাঞ্চী, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মপুত্র-প্রদেশ, উৎকল, মিথিলা, পঞ্চনদপ্রদেশ, কান্যকুব্জ, মথুরা, হস্তিনাপুর—ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। যখন তাঁহারা সকলে রাজধানীতে সমবেত হইলেন, তখন মুণ্ডিতমস্তক, পীতবস্ত্রধারী মহারাজ সসম্ভ্রমে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে অমাত্য-বর্গ, হে ব্রাহ্মণগণ, হে প্রজাবৃন্দ, হে রাজমহিষী! তোমরা সকলে সাক্ষী হও; আজ হইতে আমি এ রাজ্যপাট ত্যাগ করিলাম, আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীবুদ্ধ-দেবের শরণাগত হইলাম। আমি নির্ব্বাণধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় অন্বেষণ করিব। অমাত্যবর্গ স্তম্ভিত হইলেন, প্রজাগণ হাহাকার করিয়া উঠিল, রাজ-মহিষী অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্থিরনেত্রে রাজার দিকে তাকাইয়া রহিলেন,—একটী কথাও বলিলেন না। মহারাজ জেত বীরের ন্যায় নিজ সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য শ্রীবুদ্ধ-দেবের নিকট গমন করিলেন এবং দেখিলেন—শ্রীবুদ্ধদেব সমাধিমগ্ন, দেহ স্থির, নিশ্চল চক্ষু নিমীলিত; শিষ্যগণও ধ্যানমগ্ন। নবীন ভিক্ষু করযোড়ে দিনের পর দিন ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে নিবেদন করিলেন। ভগবান বুদ্ধ! আমি রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। অতএব আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে সন্ন্যাসী! অপেক্ষা করুন। একি! এখনও অপেক্ষা! নিরাশায় মহারাজ জেতের মুখ মলিন হইল। নিদারুণ আঘাতে মনের সন্ধি চূর্ণ হইল, চারিদিক গভীর অন্ধকারে পূর্ণ। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর-কিরণ অমাবস্যার গভীর আঁধারে পরিণত হইল। রাজা ক্ষোভে ও মনস্তাপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি বটে, সন্ন্যাসী হইয়াছি একথাও সত্য, কিন্তু আমার একমাত্র পুত্র আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে না, একথা ত আমি কাহাকেও জানিতে দিই নাই। শ্রীবুদ্ধ অন্তর্দর্শী; বোধ হয় একথা জানিতে পারিয়া আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। যেরূপেই হউক আমি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবই।

তিনি পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, ব্রাহ্মণশ্রমণ অমাত্যবর্গ প্রজাবৃন্দ রাজমহিষী যুব-রাজ সকলকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। একটী বিশেষদিনে সকলে যখন সমবেত হইল, তখন মহারাজ জেত নিবেদন করিলেন, তোমরা সকলে সাক্ষী হও। আমি আমার এই বিশালরাজ্য আজ হইতে বৌদ্ধসঙ্ঘকে দান করিলাম। আমার হীরকখচিত রত্নসিংহাসন ও আমার রাজপরিচ্ছদের মণিমুক্তা আভরণ—আমি সমস্তই বৌদ্ধসঙ্ঘকে দান করিলাম। এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যের মধ্যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইল। কেহ রোদন করিতেছে, কেহ হাহাকার করিতেছে, কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, কেহ উদাসহৃদয়ে ঊর্দ্ধনেত্রে তাকাইয়া আছে, মহারাজ জেত সেদিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। শ্রীবুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আবার উৎফুল্ল হইয়া নিবেদন করিলেন—হে ভগবান বুদ্ধ! আমি রাজ্য, ধন, স্বর্ণসিংহাসন রাজ-কোষের প্রভূত অর্থ—সমুদায় সঙ্ঘকে দান করিয়াছি; অতএব কৃপা করিয়া আমাকে ধর্ম্মে দীক্ষা দান করুন। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন; হে ধর্ম্মার্থী অপেক্ষা করুন। জেতের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। নিরাশ অন্তরে তিনি এক গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন, শিষ্যত্বে গ্রহণ না করিবার কারণ কি? মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয় আমি ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আমার রাজমহিষীকে ত ত্যাগ করি নাই। সেইজন্য আমি শ্রীবুদ্ধের শিষ্যত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলাম।

তিনি পুনরায় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং প্রজাবৃন্দকে ও অমাত্যবর্গকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, আমি আজ হইতে রাজমহিষীকে ত্যাগ করিলাম। এই সংবাদ রাজ্যে মুহূর্ত্তে প্রচারিত হইল। সর্ব্বত্র মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। সূর্য্য কালমেঘে সাতদিন ঢাকা পড়িল। ধরিত্রীবক্ষে মুহুর্মুহুঃ ভূকম্প হইতে লাগিল, যেন শোকে ভয়ে অধীর হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। পক্ষীগণ কুলায়ে নীরব হইয়া

বসিয়া রহিল। প্রজাগণ মহারাজকে ধিক্কার দিতে লাগিল। কিন্তু রাজমহিষী সান্ত্বনা দিলেন, বলিলেন—মহারাজ, আমাকে আপনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না—আপনার আত্মার সহিত আমার আত্মা মিলিত। আপনি আমার একার্দ্ধ, আমি অপরার্দ্ধ। যদি ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন, তবে একার্দ্ধ দান করিলে দান অসম্পূর্ণ হইবে। আর যদি পূর্ণ দান করেন, আমি আপনার সহিত অবিচ্ছিন্ন-যোগে যুক্ত থাকিবই। আমার শরীরই আমি নই। এই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন। প্রজাবর্গ ধৈর্য্য ধারণ করিল। জেত প্রমত্ত মাতঙ্গাদির মত মহোল্লাসে শ্রীবুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। করযোড়ে নিবেদন করিলেন, হে প্রভু! আমি আমার রাজমহিষীকেও ত্যাগ করিয়াছি। শ্রীবুদ্ধ বলিলেন, অপেক্ষা করুন।

এখনও অপেক্ষা! আমার আর কি আছে! বৃদ্ধা মাতা আছেন, একমাত্র পুত্র আছে, মহারাজ তাঁহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া যখন ত্যাগের চরম সীমায় উপনীত হইলেন, তখন শ্রীবুদ্ধদেব বলিলেন,—মহারাজ জেত, আপনি সকলই পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু একটী বস্তু ত্যাগ করেন নাই—সেটী কি? সেটী "আমি"। আমিত্ব ত্যাগ না করিলে নির্ব্বাণলাভ হয় না। যে আত্মায় "আমি" বিরাজ করে—আমিত্বে যে আত্মা পূর্ণ, সেখানে ভগবানের স্থান হয় না। অবশেষে মহারাজ জেত তপস্যা দ্বারা আমিত্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীবুদ্ধদেবের শিষ্যত্বের পবিত্র অধিকার লাভ করিলেন।

বন্ধুগণ! উৎসবের মহাপ্রস্তুতি এই আমিত্বত্যাগ। সকল বস্তু হইতে আত্মাকে শূন্য কর; দেখিবে, সেখানে ব্রহ্ম বিরাজ করিবেন—তোমার শূন্য আত্মা পূর্ণ হইবে। ব্রহ্মকৃপাই আমাদিগের সম্বল। এই কৃপার ভিখারী হইয়া প্রার্থনা করুন, তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ললিত—সুরফাঁক্তা।

পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ।
হের পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ।
গগন মগন নন্দন আলোক উল্লাসে, লোকে লোকে উঠে প্রাণতরঙ্গ।
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান;।
জাগ জাগ চল মঙ্গল পথে, যাত্রীদলে মিলি লহ বিশ্বের সঙ্গ॥

স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ ২ ৩ । ১´ ২ ৩
II সা -ঋা মা মা | মা মা | মা মা -া -া I মা মা মা মা | মগা -পমা | মা -া -পগা -া I
পা ন্ থ, এ খ ন কে ন • • অ ল সি ত অং • • গ • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I গা -মা গা ঋা | -া সন্া | সা ঋা -া -া I সা -ঋা পা মা | গা -া | -ঋা -া সা -া II
হে • র, পু • ষ্পং ব নে • • জা • গে বি হ • • • ঙ্গ •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II {পা পা মা পা | দা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা I র্সা -র্ঋা র্সর্ঋা -র্গর্ঋা | র্ঋা র্ঋর্সা | র্সা -র্সা ণা -দা} II
গ গ ন, ম গ ন ন ন্, দ ন আ • লো • • ক, উ ল্লা • সে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা -দা দা দা। -র্ঋর্সা র্সা। র্সনা -র্সা ণা -দা I পা -া পা পমা। পা -ণা। দা -পা -মা -গা II
লো ॰ কে লো ॰ ॰ কে উ ॰ ॰ ঠে ॰ প্রা ॰ ণ, ত ॰ র ॰ ঙ্গ ॰ ॰ ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II সা -ঋা ঋা ঋসা। সা সা। সা -ঋা ঋা -া I ঋা মা মা -া। -া -গগা। -া -া -া -া I
রু ॰ দ্ধ, হৃ ॰ দ য় ক ॰ ক্ষে ॰ তি মি রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I গা -মা গা ঋা। -া সন্া। সা ঋা -া -া I সা ঋা গপা মা। গা -া। -ঋা -া সা -া I
কে ॰ ন, আ ॰ অ ॰ সু খ ॰ ॰ দুঃ ॰ খে, শ য়া ॰ ॰ ॰ ন ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I {পা -দা মা পা। -দপা দা। র্সা র্সা -া -া I র্সর্ঋা -র্গা র্ঋা র্ঋা। র্সা নর্সা। ণা -া -দা -পা} I
জা ॰ গ, জা ॰ ॰ গ চ ল ॰ ॰ ম ॰ ॰ ঙ্গ ল প ॰ থে ॰ ॰ ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা -দা র্ঋা র্সা। র্সা -া। ণা র্সণা ণদা দা I পা -া পা পমা। পা -ণা। দা -পা মা -গা IIII
যা ॰ ত্রী, দ লে ॰ মি লি ॰ ল ॰ হ বি ॰ শ্বে র ॰ স ॰ ঙ্গ ॰ ॰ ॰

আশাবরী—ঝাঁপতাল।

মনোমোহন গহন যামিনী শেষে
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি দিলে শুভ প্রাতে সুপ্ত এ আঁখি শুভ্র আলোক লাগায়ে।
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল, আঁধার গেল মিলায়ে;
শান্তিসরসী মাঝে চিত্তকমল ফুটিল আনন্দ বায়ে॥

স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ॰ ১ ২´ ৩
II ঋা মা। পা -া র্সণা। ণা -দা। দা দা পা I মা -া। পা পদা মপা।
ম নো মো ॰ হ ॰ ন ॰ গ হ ন যা ॰ মি নী ॰ ॰

॰ ১ ২´ ৩ ॰ ১
। মজ্ঞা -া। ঋা -সা -া I ণ্সা -া। দ্া -া ণ্া। সা -ঋা। মা -া পা I
শে ॰ ষে ॰ ॰ দি ॰ ॰ লে ॰, আ মা ॰ রে ॰, জা

২´ ৩ ॰ ১
I জ্ঞমা -া। -জ্ঞা -ঋ -া। -ঋা -া। সা -ণ্া -া II
গা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ য়ে ॰ ॰

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {মা পা | ণদা -ণর্সা ণা | র্সা র্সা | র্সা -া র্সা I র্সা -া | র্সঋা র্জ্ঞা ঋা |
যে দি ন বি ০০ লে শু ভ প্রা ০ ন্তে সু প্ তো ০ এ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| র্সা ণর্সা | ণা -দা -পা} I পা -দা | দা -ঋর্সা র্সা | র্সঋা -ণা | দা -া পমা I
আঁ ০০ খি ০ ০ শু ০ ভ্র ০০, আ লো০ ০ ক ০, গা০

২´ ৩ ০ ১
I পা -ণা | -দা -দা -পা | -মা -জ্ঞা | -জ্ঞা -ঋা সা II
গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II সা -া | দা -া দা | দা দপা | পা -া পা I পমা -পা | পণা -দা দা |
মি ০ থ্যা ০, স্ব প ন০ রা ০ জি কো০ ০ থা০ ০ মি

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| পা -মা | পা মজ্ঞা -াম I সা -া | সা -দা পা | মপা -জ্ঞা | ঋা -া সা I
লা ০ ই ল ০ আঁ ০ ধা ০ র গে০ ০ ল ০, মি

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ঋা মা | -পণা -দা -পা | -মা -জ্ঞা | -জ্ঞা -ঋা সা I {মা -পা | ণদা -ণর্সা ণা |
লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে শা ন্ তি ০০, স

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| র্সা র্সা | র্সা -া র্সা I র্সা -া | র্সঋা -র্জ্ঞা ঋা | র্সা -ণর্সা | ণা -দা -পা} I
র সী মা ০ ঝে চি ০ ত্ত০ ০, ক ম ০০ ল ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা -দা | দা -ঋর্সা র্সা | র্সঋা -ণা | দা -া পমা I পা -ণা | -দা -দা পা |
ফু ০ টি ০০ ল আ০ ০ ন ন্ দ০ বা ০ ০ ০ ০

০ ১
| -মা জ্ঞা | -জ্ঞা -ঋা সা II II
০ ০ ০ ০ রে

ভৈরবী—সুরফাঁক্তা।

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহা সুন্দর, জীবননাথ।
শোকে দুখে তোমার বাণী জাগরণ দিবে আনি, নাশিবে দারুণ অবসাদ।
চিত্তমন অর্পিনু তব পদপ্রান্তে, শুভ্র শান্তি শতদল পুণ্য মধু পানে,
চাহি আছে সেবক তব সুদৃষ্টিপাতে কবে হবে এ দুখ-রাত প্রভাত॥

স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ ০ ২ ৩ II ১´ ২
II সা -া -র্সা -াণ | ণা -দা | দণা দা পা মা I পা -ণা দা -াপ | মজ্ঞা -া |
আ ০ ০ ০ ন ন্ দ, তু মি ০ স্বা ০ মী ০ ম ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´
| মা জ্ঞা ঋা সা I ঋা সা দ্‌া ণ্‌া | সা -ঋা | জ্ঞা -া মা মা I পা -ণা দা পা |
স ন, তু মি তু মি হে, ম হা ॰ সু ন্ দ র জী ॰ ব ন

২ ৩
| মা -পা | -জ্ঞমা -জ্ঞা -ঋা সা II
না ॰ ॰॰ ॰ ॰ থ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II{দা দা দা ণা | ণা র্সা | র্সা র্সা -া র্সা I দা র্জ্ঞর্ঋা র্জ্ঞর্ঋা র্জ্ঞা | র্মা র্মা | -া -া -া -দা I
শো কে দুঃ খে তো মা রি, বা ॰ ণী জা গ ॰ র ॰ ণ দি বে ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ২ ৩ ১´
I পা -দা -ণা -র্সা | র্ঋা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্সা -র্ঋণা র্সা -া} I দা -র্সণা র্সা র্সা |
আ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰॰ নি ॰ না ॰॰ দি বে

২ ৩ ১´ ২ ৩
| র্সা -র্ঋর্সা | ণা র্সণা দা পমা I পা -ণা -দা -পা | -মা -পা | -জ্ঞমা -জ্ঞা -ঋা সা II
দা ॰॰ রু ণ॰, অ ব॰ সা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ দ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II সা সা সা ঋা | জ্ঞা -া | মা মা -া -া I মা মা মা মা | জ্ঞা -ঋা | জ্ঞা -া -া -া I
চি ত ম ন অ ॰ র্পি ণু ॰ ॰ ত ব প দ প্রা ন্ তে ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দ্‌া -া ণ্‌া জ্ঞা | -া মা | জ্ঞা ঋা সা সা I পা -ণা দা পা | মা -পা | জ্ঞমা -জ্ঞা -ঋা সা I
শু ॰ ভ্র, শা ন্ তি শ ত দ ল পু ॰ ণ্য, ম ধু ॰ পা॰ ॰ ॰ নে

১´ ২ ৩ ১´ ২
I{দা -দা মা দা | -ণদা ণা | র্সা -া র্সা র্সা I দা র্জ্ঞর্ঋা র্জ্ঞর্ঋা র্জ্ঞা | -া র্মর্জ্ঞা |
চা ॰ হি, আ ॰॰ ছে সে ॰ ব ক ত ব ॰ সু ॰ দৃ ॰ ষ্টি ॰

৩ ১´ ২ ৩
| র্জ্ঞা -র্ঋা -র্সা -া} I দা র্ঋা র্সা ণা | -র্সণা ণা | দা -া পা মা I
পা ॰ তে ॰ ক ॰ বে, হ ॰॰ বে এ ॰ দুঃ খ

১´ ২ ৩
I পা -ণা দা পা | মা -পা | -জ্ঞমা -জ্ঞা -ঋা সা II II
রা ॰ ত্রি, প্র ভা ॰ ॰॰ ॰ ॰ ত

বিকাশ চেষ্টা।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

ব্রহ্মাণ্ডরচনার সেই আদিমতম যুগ হইতে এক বিশাল প্রকাশ-চেষ্টা সৃষ্টির ভিতরে অদম্যভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। অবিশ্রান্ত সে প্রচেষ্টা, তাহার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। অন্ধকারে যখন অন্ধকার প্রচ্ছন্ন ছিল, দিগন্তব্যাপী নীহারিকা যখন চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন হইতেই বিকাশের সূচনা। অদ্যাপিও এই শোভনতম বিশ্বে সেই প্রচেষ্টার অবসান হয় নাই। যতকাল এই জগতের পরমাণু থাকিবে, তত-কাল ধরিয়া এই বিকাশাত্মক ভাব কার্য্য করিতে থাকিবে। যখন চারিদিক ধূমায়মান, সৃষ্টির স্পন্দন যে দিন প্রথম জাগিয়া উঠিল, তখন সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে বিকাশ-ফলে উত্তাপ আবির্ভূত হইল। সেই উত্তাপের কতক অংশ জলে পরিণত হইল। সেই বিশ্বব্যাপী জলের ভিতর হইতে এই সুকঠিন পৃথিবী বাহির হইয়া পড়িল। ক্রমে আকাশকে লক্ষ্য করিয়া অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক জলস্থলে এই ধরণীকে বিভক্ত করিয়া দিল। আকাশে কত জ্যোতিষ্কমণ্ডল দূরদূরান্তরের অগণ্য সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ বা শীতলতালাভে, কেহ বা এখনও জ্বলন্ত-ভাবে মহাগগনে আপন আপন কক্ষপথ খুঁজিয়া লইল। ক্রমে ধরণীর গাত্রে অসংখ্য ফুল-ফলবৃক্ষ সঞ্জাত হইল। পৃথিবীর সঙ্গে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সুনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। এ সমস্তই সেই মহাশক্তিসম্পন্ন জগৎস্রষ্টার অনুপম কৌশল। তিনি তাবতের ভিতরে থাকিয়া সকলকে শক্তিবিধান করিতেছেন—বিকাশের মন্ত্রে সকলকে দীক্ষাদান করিতেছেন; সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—আরও বিকশিত হও।

বীজের ভিতর হইতে অঙ্কুর উদগত হইতেছে। অঙ্কুর হইতে ক্রমে কাণ্ডের রচনা। কাণ্ডের চারিপার্শ্বে শাখা-প্রশাখার বিকাশ, আবার সেই কাণ্ড হইতে বৃক্ষের পরিণতি। এক বিকাশ-চেষ্টা ওষধি-বনস্পতির জন্মতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের মৃত্যুদিন অবধি কার্য্য করিতেছে। এই বিকাশই জগতের প্রাণ, এই বিকাশেই জগতের অপূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি।

জ্ঞানের রাজ্যে এই বিকাশের কার্য্য যাহা চলিতেছে, একবার তাহা আলোচনা করিয়া দেখ। কোথায় সেই সুপ্রাচীন যুগে সুগায়তন বৃক্ষের মূলে অগ্নি প্রদান করিয়া বা কুঠার আঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া, পরে অগ্নিপ্রদাহে এবং প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠারের সাহায্যে তাহার বক্ষ খোদিত করিয়া ক্ষুদ্র ভেলা-নির্ম্মাণে নদীপথে বিচরণ,—আর বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানের বিকাশফলে মহাসাগরের বক্ষ-বিক্ষোভকারী দিগন্তগামী অর্ণবপোতের রচনা! লোকমুখে সময়সাপেক্ষ সংবাদপ্রেরণের স্থলে আজকালকার দিনের তড়িত-যোগে মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষবার সংবাদপ্রেরণের ব্যবস্থা। নিরবচ্ছিন্ন পদচারণার স্থলে বর্ত্তমান কালের বাষ্পীয় শকট বা খপোতযোগে দূরদূরান্তর গমনের সহজ ব্যবস্থা। নানা যন্ত্রযোগে নিত্যব্যবহার্য্য বিবিধ সামগ্রীর গঠন আজকালকার দিনে হস্তজাত শিল্পকে অবসর দান করিতে বসিয়াছে। জ্ঞানের এই অকুণ্ঠিত বিকাশের ফলে জড়ের জড়ত্ব-বোধের ধারণা তিরোহিত হইয়া যাইতেছে।

উদ্ভিদের ভিতরে প্রাণন-ক্রিয়া মনুষ্যদেহের মত শিরা উপশিরা ও স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া যে কার্য্য করে, তাহার পরিচয় পাইয়া স্তব্ধ হইয়া যাইতেছি। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গে আমাদের এই ধরণীর যে প্রাণের যোগ রহিয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইতেছি। একবার মানবসমাজের আদিম অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, জ্ঞানের বিকাশ জগতে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে! মানবের হস্তে নগর-গ্রামের অনুপম শোভা-সৌন্দর্য্য কি সুন্দরভাবে ভাস্বর হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের সুতান বাদ্যযন্ত্র পুরাকালের একতন্ত্রী বা ত্রিতন্ত্রী যন্ত্র নহে। রাগরাগিণীসমন্বিত বর্ত্তমানের হৃদয়োন্মাদী সঙ্গীত, পুরাকালের সহজ সঙ্গীত নহে। বর্ত্তমানের সুশোভন বেশভূষা, অতীতের বল্কল-আচ্ছাদন নহে। চারিদিকে জ্ঞানের উন্মেষ—বিকাশের নিরুপম স্ফূর্ত্তি। এই বিকাশকে রুদ্ধ করিবার বৃথা প্রয়াস পাইলে চলিবে না। এই বিকাশই যে জগতের স্বাভাবিক গতি। ইহাকে বলপূর্ব্বক প্রতিরুদ্ধ করিতে যাও, জ্ঞানের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, আমা-দিগকে আবার বর্ব্বর অবস্থায় ফিরিতে হইবে।

কেবল কি জড়জগতে?—উদ্ভিদরাজ্যে, জীবরাজ্যে ও জ্ঞানের রাজ্যে এই বিকাশের কার্য্য চলিতেছে। আধ্যাত্মিক-রাজ্যে এই বিকাশের পদধ্বনি আমাদের কর্ণে কি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় নাই? একবার ধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস উদঘাটিত করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে প্রেত-পূজা, বৃক্ষপূজা, জড়পূজা, মেঘ বজ্র বিদ্যুতের লীলাময় বিভীষিকার পূজা, অগ্নিসূর্য্যের ভাস্বর মহিমার পূজার ভিতর দিয়া কেমন সোপানপরম্পরায় নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মজ্ঞান

* ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

বিকশিত হইবার সুযোগলাভ করিয়াছে। স্তরে স্তরে অধ্যাত্মতত্ব কেমন শোভন মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তুমি তাহাকে ক্রমিক ধর্ম্মসংস্কার বলিতে পার, আমি তাহাকে নামান্তর দিয়া বলিব বিকাশ।

জ্ঞানের রশ্মি যখন সুস্নিগ্ধ আলোক বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, প্রেমভক্তি যখন মলয়ানিলের ন্যায় চামর ব্যজন করিতে থাকে, জনসেবা ও ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত কর্ম্মের ভাব যখন ভাসিয়া উঠে, বৈরাগ্যের ভাব যখন স্ফূর্ত্তিলাভের চেতনা প্রাপ্ত হয়, যখন সময়ের আহ্বান সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, তখনই সর্ব্ববিধ তমসাচ্ছাদন বিদূরিত করিয়া সার্ব্বজনীন সমুচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের আগমনপথ প্রশস্ত হইয়া যায়।

১০২ বৎসর অতীত হইতে চলিল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্মক্ষেত্রে এই বিকাশের নবতর বাণী শ্রবণ করিয়া এই পুণ্যদিনে ব্রাহ্মসমাজের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, আমাদের সম্মুখে গতি-মুক্তির পথ অনাবৃত করিয়াছিলেন, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারই জন্য আমাদের এই আনন্দকোলাহল এই উৎসবক্ষেত্রকে আজ মন্ত্রে ও সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছে। আমরা প্রাচীন ভাবকে সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাকে সমাধিস্থ করিবার জন্য আজ এখানে আসি নাই। প্রাচীনত্বের সহিত জ্ঞানোন্নত বর্ত্তমানের মধুর যোগ স্থাপন করিয়া, সত্যের নিকষে উপনিষদের মন্ত্রকে পরীক্ষা করিয়া, তাহারই অবলম্বনে ব্রহ্মপূজার আয়োজন করিয়াছি। যাহা কিছু সত্যের বিরোধী, বিশ্বপ্রেমের বিরোধী, প্রকৃত মনুষ্যত্বের ও হৃদয়ের বিরোধী, তাহা আমাদের নহে। সকল ধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু অবলম্বনীয়, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তৎসমস্তই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার সঙ্গে ত্যাগের ভাব, নিষ্ঠার ভাব, বৈরাগ্যের ভাব, পবিত্রতার ভাব—যাহা এই ভারতীয় সাধনার অস্থিমজ্জাগত, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।

ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে জ্ঞানে, প্রেমে, ঔদার্য্যে, সত্যে বিকশিত হইবার প্রেরণা দান করিতেছেন। সে বাণীর প্রতি বিমুখ হইলে চলিবে না। স্মরণে রাখিতে হইবে যে, আপনাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য ধরাপৃষ্ঠে আমাদের আগমন। প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় আপনাকে বিকশিত করিয়া যেদিন আমরা আপনাকে তাঁহার পদপ্রান্তে অর্পিতে পারিব, সেই দিনেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল নিজে ফুটিলে চলিবে না, প্রস্ফুটিত হইবার এই আশা আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা যদি আমরা জনসমাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারি, তবেই আমাদেরও এবং এই ব্রাহ্মসমাজেরও এই মাঘোৎসবের পরম সফলতা।

হে সমাগত সাধুসজ্জনগণ! জ্ঞান ও প্রেমভক্তির মিলনে যে বিকাশ আজ পুণ্যদিনে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে, সত্য দেশকালে বদ্ধ নহে। বিকাশ কোন এক যুগে বা দেশে আবির্ভূত হইয়া চিরনীরবতা লাভ করে না। নির্ব্বিকারচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখ, ধর্ম্মের সহিত তোমার জ্ঞানের যোগ রক্ষিত হইতেছে কি না। শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লইয়া প্রচলিত বিশ্বাসকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছ; কিন্তু স্থির জানিও, এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও বিকাশের একটা দিক্। নববিধ মতের, নববিধ ধারণার অবলম্বন-পথে বিভীষিকা থাকিতে পারে, একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু জ্ঞান যখন তাহার প্রহরী, প্রেমভক্তি যখন তাহার নিত্যসঙ্গী, বেদ-উপনিষদ যখন তাহার পথপ্রদর্শক, সত্য যখন তাহার মূলে—ভয়শূন্য হও। সত্যে প্রেমে ভক্তিতে দীক্ষিত হইয়া তোমার জীবনে বিকাশের পথকে প্রমুক্ত করিয়া দাও, এবং ধর্ম্মের বিমল আনন্দ উপভোগ কর।

হে পরমাত্মন্! সত্যের আহ্বানে, জ্ঞানের আহ্বানে, সুপ্রাচীন শাস্ত্রের আহ্বানে—সর্ব্বোপরি তোমার আহ্বানে আজ আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। তুমি যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার সত্য বিকাশ ও বিকীরণ করিতেছ। বিরাট যাঁহাদের হৃদয়, উদার যাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারাই তোমার প্রেরিত সত্য সৎসাহসের সহিত সমগ্র হৃদয়ের সহিত সাদরে বরণ করিয়া লন এবং সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহা প্রচার করিয়া যান। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরবর্ত্তীগণ তোমারই মুখে সত্যের অমোঘবাণী বর্ত্তমান যুগে শ্রবণ করিয়া আপ্তকাম হইয়াছিলেন এবং যাহাতে আমাদের জীবন ধন্য হয়, তাহার জন্য এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রাহ্মসমাজে রাজা রামমোহন রায়, উত্তরকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, কতশত সাধু-মহাত্মা সেই দীপে ব্যাকুলতার সহিত আপনাদের জীবনপ্রদীপ জ্বালাইয়া ভারতের দূরদূরান্তরে সেই পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, অনেকে এখনও করিতেছেন। এই মহানগরীর ও নগরোপান্তের নানা স্থানে ও পুণ্য ভারতের নগরে নগরে সত্যের ও বিকাশের জীবন্তবাণীতে তোমারই মঙ্গল নাম আজ

চারিদিক স্পন্দিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে এবং সমস্ত নরনারীর অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে, সকলের অন্তরকে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। ইহার অদম্য প্রভাব সকলকে চিরদিনের জন্য প্রবুদ্ধ করিয়া তুলুক। এই সাময়িক ব্যাকুলতা আমাদের জীবনে নিবিড় হইয়া উঠুক। অদ্যকার উচ্চারিত ব্রহ্মমন্ত্র জীবনপথের চিরসম্বল হউক। অদ্যকার হৃদয়ভেদী সঙ্গীতের ঝঙ্কার প্রাণের বীণাকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলুক এবং আমাদিগকে তোমার পদাবনত ভক্ত ও সেবক করিয়া লউক।

হে ভগবন্! তুমি তোমার সত্যের পতাকা, ধর্ম্মের পতাকা বহন করিবার গুরুভার আমাদের দুর্ব্বল স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছ। কৃপা করিয়া বহিবার শক্তি দান কর। বিবেক-বৈরাগ্যকে জীবনের সহচর করিয়া দাও। তুমি যে আমাদের চিরসাথী, চিরনেতা, চিরনির্ভর—এ বোধ আমাদের অন্তরে আরও সুদৃঢ় কর। আমাদের সকলকে ধর্ম্মেতে কর্ম্মেতে প্রেম-ভক্তিতে ও উদারতায় আরও সমুজ্জ্বল কর জগতের উপরে শান্তি ও কল্যাণ বিতরণ কর। বিচ্ছিন্ন ভারতকে একই অখণ্ড ধর্ম্মের সূত্রে গ্রথিত কর। একই বিকাশের পথে, একই সত্যের পথে সমস্ত ধরণীকে আনয়ন কর। সত্যের বিরোধী সম্প্রদায়গত সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন অপসারিত কর। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' চিহ্নিত এই পতাকার নিম্নে সকলকে আনয়ন কর। ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহসৌহার্দ্দে সকলকে মিলিত কর। জগৎব্যাপী এক বিশাল অখণ্ড পরিবার গঠন কর। সত্যের পথে, প্রকৃত কল্যাণের পথে, চরম সার্থকতার পথে চলিবার শক্তি দান কর। সকলকে চির উদ্বুদ্ধ কর। অদ্যকার এই উৎসবের বাণী আমাদের মোহনিদ্রা বিদূরিত করুক, সর্ব্ববিধ জড়তা নির্ব্বাসিত হউক, নবপ্রাণ ও ব্রহ্মজ্যোতি আজ সকলের ভিতরে অবতীর্ণ হউক, যেন এই উৎসব-দিবসে তোমাকে প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করি ও তোমার যশোগানে চির-কৃতকৃতার্থতা লাভ করিয়া নিজ নিজ জীবনকে ধন্য করি।

শতাধিক-দ্বিতীয় মাঘোৎসব।

ভগবানের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে এবারকার মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল বলিয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বাগ্রে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি।

উৎসবের প্রারম্ভে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাদ চাহিয়া পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি যে পত্র দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

কল্যাণীয়েষু

মাঘোৎসবের দৈনিক বিবরণের যে তালিকা পাঠিয়েছ পড়ে খুসি হয়েচি। আশা করি নির্ব্বিঘ্নে কাজ সম্পন্ন হচ্চে। আমি অসুস্থ ইতি ২২ জানুয়ারি ১৯৩২।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের পরমহিতৈষী স্বামী সদানন্দ তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার অভাব আমরা প্রতিপদেই অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা উৎসবসম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর তিনি যেভাবে উৎসব-সম্পাদন বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়া আসিতেছিলেন, এবারেও আমরা সেইভাবেই উৎসবসম্পাদনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল, ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার পরস্পরের মধ্যে এবং অন্যান্য একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্মসমাজের যথাসম্ভব মিলনসাধন ও মিলিতভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া। ঐ সাধু সংকল্পকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া এবারও আমরা উৎসবসম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিলাম।

উৎসব যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহার উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল—শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ ডি, বার-এট-ল, শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ, এবং সহযোগী সম্পাদক শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপদে)। চিন্তামণি বাবু এই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারই বাটীতে এই সমিতির কয়েকবার অধিবেশন হয়। আলোচনা হইয়া যে কার্য্যতালিকা স্থির হইল, তাহা নিম্নোক্ত পত্রের আকারে ১লা মাঘের মধ্যেই কলিকাতা ও উপনগরস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক ও নিয়মিত উপাসকদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল এবং পরে যথাযুক্ত সময়ে সর্ব্বসাধারণ্যে বিতরিত হইয়াছিল।

ওঁ

আদিব্রাহ্মসমাজ।

৫৫, আপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

শতাধিক-দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

করুণাময় ভগবানের প্রসাদে ব্রাহ্মসমাজ এক শতাব্দী অতিক্রম করিয়া নব শতাব্দীর দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। এই দ্বিতীয় বৎসরের মাঘোৎসব পরম্পরের সাহচর্য্যে নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারে সম্পন্ন করা হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভক্তজনগণের ও বন্ধুবান্ধবের সমাগমে ও সহৃদয়তার উপরেই উৎসবের সাফল্য নির্ভর করে। সর্ব্বসাধারণের উৎসবে যোগদান সাদরে প্রার্থনীয়।

আদিব্রাহ্মসমাজ ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা। ১লা মাঘ ১৩৩৮ সাল ১০২ ব্রাহ্মাব্দ।	বিনীত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ম্মাধ্যক্ষ

কার্য্যতালিকা।*

৩রা মাঘ, রবিবার (১৭ই জানুয়ারী)—প্রাতে ৮ ঘটিকায়, নবশতাব্দীর দ্বিতীয় ব্রহ্মোৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর "মিলনের বাণী" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

৬ইমাঘ, বুধবার (২০শে জানুয়ারী)—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাব উপলক্ষে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিবেন।

৭ই মাঘ, বৃহস্পতিবার (২১শে জানুয়ারী)—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আর্য্য-সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ সরল হিন্দীতে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

৮ই মাঘ, শুক্রবার (২২শে জানুয়ারী)—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ব্রাহ্মণসমাজের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ "উপাসনায় ভক্তিবাদ" বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

৯ই মাঘ, শনিবার (২৩শে জানুয়ারী)—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে, প্রমুখ মহাশয়গণ ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন করিবেন।

১০ই মাঘ, রবিবার (২৪শে জানুয়ারী)—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভক্তলীলা" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

পরদিন ১১ই মাঘ, সোমবার (২৫শে জানুয়ারী)—প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকায় বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস, সি, বি-এল "সংসারে ব্রহ্মসাধন" বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন।

উপাসনায় কয়দিনই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতের বিশেষ ব্যবস্থা হইবে।

* প্রয়োজনমত অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করা হইলে সংবাদপত্রের সাহায্যে তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানান হইবে।

প্রতিদিনের কার্য্যতালিকা তৎপূর্ব্বেই ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিভিন্ন দৈনিক সংবাদ-পত্রের সাহায্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। কর্ম্মপ্রণালী স্থিরীকরণে ডাঃ যতীন্দ্রকুমার ও পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

৩রা মাঘ অবধি উৎসব আরম্ভ হইল। ঐ দিবস মাঘ মাসের প্রথম রবিবার এবং মাসিক সমাজের দিন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতি মাসের প্রথম রবিবার প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ মাসিক ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাই মাসিক সমাজ উপলক্ষ্য করিয়াই গত ৩রা মাঘ উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দিবস শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উৎসবের প্রথম উদ্বোধনরূপে যাহা বলেন, তাহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। স্বাধ্যায়ান্তে আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "মিলনের বাণী" বিবৃত হইয়াছিল। ঐ উপদেশে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ ও উপদেশ অনুসরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলনসাধনের উপর বিশেষ জোরের সহিত ঝোঁক দিয়াছেন। এবিষয়ে আমরা সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাব দিবস। ঐ দিন তদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ঐ দিবস শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদারতা"বিষয়ক একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পরদিবস ৭ই মাঘ কলিকাতা আর্য্যসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও উপাসনাদি-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল "ভগবদুপাসনা"। ইনি ভবিষ্যতে সময়ে সময়ে আদিব্রাহ্মসমাজে উপাসনা নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইহাঁর সাহায্যে এই প্রকারে হিন্দী ভাষীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তত্ত্বসকল প্রবেশলাভ করিলে দেশের সুমহান মঙ্গল সাধিত হইবে ভাবিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি।

৮ই মাঘ প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণসমাজের অন্যতম ধর্ম্মবক্তা দার্শনিকপ্রবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী "উপাসনার ভক্তিবাদ" বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণসমাজের সহিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজের মিলনের অন্ততঃ একটী পথ যে উন্মুক্ত হইল, ইহাতে আমাদের বড়ই আনন্দ হইতেছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই মিলন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকুক। পরদিন ৯ই মাঘ সায়ংকালে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে ও তাঁহার সঙ্গী শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল প্রমুখ মহোদয়গণ দ্বারা ব্রহ্মসংকীর্ত্তন সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত কীর্ত্তন শুনিয়া সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরদিন ১০ই মাঘ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য সুবক্তা ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে তিনি মহারাজ জেতের সন্ন্যাসগ্রহণ অবলম্বনে "ভক্তলীলা" বিষয়ক একটী মনোগ্রাহী উপদেশ দিয়াছিলেন। উহাও স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

পরদিন আমাদের প্রিয় ১১ই মাঘ। ঐ দিবস প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকায় উৎসব আরম্ভ হইল। ঐ সময় মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে উপাসনামণ্ডপ মুখরিত হইবার পর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথারীতি বেদী গ্রহণ করিলেন। চিন্তামণি বাবু তাঁহার ভাবোদাত্তস্বরে উপাসকবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করিবার পর যথারীতি স্বাধ্যায়ান্তে সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী কর্ত্তৃক লিখিত "সংসারে ধর্ম্মসাধন" বিষয়ে উপদেশ বিবৃত হইয়াছিল। ঐ উপদেশ এই সংখ্যায় যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং সকল ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত মিলনসাধনের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজ কিরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সহায়তা পাইলে আমরা মিলনের পথকে গম্ভীরতর ও প্রশস্ততর করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইব। এবারকার উৎসবে নবনিযুক্ত সুগায়ক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অনধিক একমাস কালের মধ্যে তাঁহারা ন্যূনাধিক চল্লিশটী নূতন গান যে ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মেলনক্ষেত্র* ।

(রায়বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল)

যোগ্যতর ব্যক্তিগণ থাকিতে আমাকেই এই সুধীজন-সভার সভাপতিরূপে মনোনীত করায়, বোধ হইতেছে, আমার বৃদ্ধ বয়সই এক্ষেত্রে গুণ বলিয়া গণ্য। যদি তাহাই হয়, তবে সে গুণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ভাবিয়াই আমি অবনত মস্তকে অযোগ্যের প্রতি এই সম্মান সবিনয়ে শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি।

এখন, সভাপতির আসন হইতে মুখবন্ধচ্ছলে স্বল্প কথায় আমি এই সভার মুখ খুলিয়া দিতেছি মাত্র। আমার নিবেদন এই যে, আপনারা ইহাকে "অভিভাষণ" না ভাবিয়া সাদর সম্ভাষণ বলিয়াই গ্রহণ করিবেন।

আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যে কত বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। "Comparative Religion" নামক একখানি পুস্তকে দেখিয়াছি, তাহাতে স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়াও অন্যূন ৬০ প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। উঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকটীর অন্তর্বিভাগ ধরিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের সংখ্যা যে কি হয়, তাহা গণনা করিয়া প্রকাশ অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। এক ভারতবর্ষেই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের অন্তর্বিভাগ সংক্ষেপে সংগ্রহ করিতে গিয়াও স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়কে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছিল।

এই সব বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় যদি শুধু নিজ নিজ মত প্রচার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহাতে মানবজগতের লাভ বৈ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজের মতকে এমন প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছেন, যেন সেই মত ভিন্ন অন্য কোন মতের মধ্যে সত্য থাকিতে পারে না। এইরূপ মনোভাব লইয়া পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচার উপলক্ষ্যে মানুষে মানুষে যে কি বিষম অমানুষিক বাদ-বিসম্বাদ, মারামারি রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে, জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

ক্রমে শিক্ষার প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন সর্ব্বত্রই ঐ ভাব কমিয়া আসিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখন বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতগণ পরধর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বকার মত খড়্গহস্ত নহেন; এখন তাঁহারা ক্রমেই বুঝিতেছেন যে, ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা মানব-মনের একটা সাধারণ ধর্ম্ম। যেদিন মানব এই পরিদৃশ্যমান্ মহান্ সৃষ্টির দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহার কর্ত্তা কে, কিরূপ এবং কোথায় —এ জিজ্ঞাসা তাহার মনকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টনের প্রভাবে যে সব ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবৃক্ষ শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া সেই সেই জাতির আকাঙ্ক্ষা-অনুযায়ী আনন্দরূপ অমৃতফল প্রদান করিয়া আসিতেছে, সৃষ্টির আদি-কারণজিজ্ঞাসাই তাহাদের মূল; এবং সেই আদি কারণের সহিত আমাদের অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির যে যোগ আছে, সেই যোগের অনুভূতিই সকল ধর্ম্ম-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই আদি কারণ প্রকৃতপক্ষে মায়াপরিচ্ছিন্ন মানব-মনের পক্ষে অজ্ঞেয় হইলেও, ঐ mysteryই সকল ধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বন।

বৈজ্ঞানিক যুগে যখন এ জগতের অনেক mystery ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, তখন ধর্ম্মপন্থীরা ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি বা ধর্ম্মের mysteryও ভাঙ্গিয়া যায়। এই ভয়েই ইউরোপে কিছুকাল Religion ও science পরস্পর পরস্পরকে ভয়ঙ্কর বিষনয়নে দেখিয়াছিল। এখন উভয় পক্ষেই সে ভ্রম ঘুচিয়াছে—বিজ্ঞান বুঝিয়াছে তাহার যতকিছু গবেষণা ও আবিষ্কার, তাহা এই relative জগতের relative সত্য মাত্র; absolute সত্যের সন্ধান তাহার ক্ষমতার অতীত। কারণ, মানুষ নিজেও relative ও তাহার বুদ্ধি ও চিন্তা সবই relation দ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

বিজ্ঞান দেখিতেছে যে জ্ঞানের পরিধি যতই বাড়িতেছে, অজ্ঞানের ধারণা ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞান দেখিতেছে, যাহা জানা গেল, তাহা অতি সামান্য; যাহা জানিবার উপায় নাই,—অন্ত নাই, মন্ত নাই,—তাহাই বিরাট। বিজ্ঞান দেখিয়াছে, সমষ্টির জ্ঞানে Nebulous mass পর্য্যন্ত তাহার সীমা; এবং ব্যষ্টির জ্ঞানে Proton ও Electron তাহার শেষ; এবং জীবতত্ত্বর জ্ঞানেও জীবকোষের পশ্চাতে বৈজ্ঞানিকের যাইবার সাধ্য নাই।"

এককথায় জড়বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, আধ্যাত্মবিজ্ঞানের অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বের সেইখানে আরম্ভ। এই

* গত ১২ই মাঘ সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণনগর কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়-প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোকের উদ্যোগে কৃষ্ণনগরস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক সম্মিলন-সভায় সভাপতির সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যাহা জ্ঞেয় বস্তু, তাহা এই দেহ-পরিচ্ছিন্ন মানব-মনের পক্ষে একেবারেই অজ্ঞেয় ;—সেই সত্য, নিত্য অবিকারী, অবিনশ্বর সত্তার অস্তিত্ব মাত্র বোধ ছাড়া, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে জানা (to know in the sense of knowing) বলিতে পারা যায়, তাহা একেবারেই অসম্ভব। তবু মানবমন সেই অজ্ঞেয়ের জিজ্ঞাসায় অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছায় ক্ষান্ত নহে। জ্ঞানাতীতকে জানিবার উপায় নাই ; তবু তাহার জন্য সকল ধর্ম্মের ভিতর হইতে আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। ধর্ম্ম-সাধনায় অসংখ্য বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে অসংখ্য স্তব-স্তুতির মধ্যে ঐ আর্ত্তনাদ খাদের সুরের মত গম্ভীরভাবে ধ্বনিত হইয়া থাকে, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞের কাছে একথা অবিদিত নহে। Max Mullerএর কথায় বলিতে গেলে—"We can hear in all religions a growning of the spirit, a struggle to conceive the inconceivable, to utter the unutterable, a longing after the infinite, a love of God."

সকল ধর্ম্মেরই এই একই অবস্থা ; সুতরাং ভ্রাতৃভাবে, বন্ধুভাবে, মানবাত্মার সমান দুঃখে, সেই অজানার সন্ধানে ধাবিত হইবার সমান উৎসাহে আমরা সকলেই সমধর্ম্মী অর্থাৎ সমান অবস্থাপন্ন। অজ্ঞেয়ের সহিত মানবাত্মার যে নিত্য যোগ বর্ত্তমান, তাহারই অনুভূতি সাধনের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিয়া, নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত সেই আদি কারণকে, সেই Eternal Absolute Inscrutableকে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ দিয়া, আমরা ভুলিয়া যাই যে, সেই একই আমাদের সকলেরই লক্ষ্য। আমরা ভুলিয়া যাই, All roads lead to Rome এই প্রবাদের মত অধ্যাত্ম-রাজ্যেও সকল পন্থাই সেই এক অজ্ঞেয়-মুখী।

সকল পথিকের যখন ঐ একই দশা, তখন ক্ষণেকের জন্য এই পান্থ-নিবাসে একত্রিত আমরা পথের তর্ক-বিতর্কে নিজ নিজ পথের গুণগান এবং পরানুসৃত পথের নিন্দা করিয়া কেন মানবতাকে ক্ষুণ্ণ করি ? বরং এই সংসার-দুঃখে সমান কাতর এবং আধ্যাত্ম-দুঃখে সমান আর্ত্ত সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া দুনিয়ার দুঃখ হ্রাস করা, মত অপেক্ষা মানুষকে বড় জ্ঞান করিয়া মানবতার সম্মান করা—সংসার-পান্থ-নিবাসে ইহাই শ্রেয় ও প্রেয়ঃ।

আজি বহু কথায় বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্ভাবিত সম্মিলন-ভূমির দিকে ইঙ্গিতমাত্র করিয়া এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিতেছি। এখন বক্তা মহোদয়গণ নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সভার উদ্দেশ্য সফল করুন।

নানাকথা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, গত ৯ই মাঘের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু-পত্রে অগ্রহায়ণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী হইতে "দেবমন্দিরে প্রবেশনিষেধ" প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এবিষয়ে যতই অধিক আন্দোলন ও আলোচনা হয় এবং তাহার ফলে ঐ প্রকার অন্যায় ও অসঙ্গত বিধিবিধান যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। উক্ত অগ্রহায়ণ-সংখ্যা হইতে গত ১৬ই মাঘের হিন্দু-পত্রে অনৈক শিক্ষক লিখিত "জীবে দয়া" প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে হিন্দুসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক মনে করি। তত্ত্ববোধিনীর ঐ সংখ্যায় স্বামী ক্ষেমানন্দ লিখিত "দেবমন্দিরে অশ্লীলতা" প্রবন্ধটী অনেক দিক হইতে সমর্থন লাভ করিতেছে। গত ২৩শে মাঘ তারিখের সময়-পত্রে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইয়াছে। পুরীধামের মহারাজা বাহাদুরের নিকট লেখকের ইঙ্গিত সমর্থন পাইলেই আমরা সুখী হইব।

মিলনের বাণী :—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, গত পৌষ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত "মিলনের বাণী" সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বর্ত্তমানে মিলনের যুগ। এই যুগে দেশের মধ্যে মিলনের সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত করিবার পক্ষে যিনি যতটুকু সহায়তা করিবেন, তিনি ততটুকু ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন নিঃসন্দেহ। "মিলনের বাণী" গত ২১শে মাঘ তারিখের শিক্ষাসমাচারে উদ্ধৃত করিয়া উহার সম্পাদক মহাশয় তৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

বর্ত্তমান সংখ্যায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'মিলনের বাণী' বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মিলনবাণীতে জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ সমদর্শী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আন্তরিক সরলতা ও উদারতা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একের অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ, কোন অবস্থাতেই সমর্থন যোগ্য নয়। আমাদের ইহপরকালের যত কিছু অকল্যাণ, বিভিন্ন ধর্ম্ম-সমাজের বিরোধ বা মিলনাভাব হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে ও হইতেছে। বহুদর্শী সম্পাদকমহাশয় ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াই বোধ হয় তত্ত্ববোধিনীর মারফতে "মিলনের বাণী" প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা এই অবশ্যপাঠ্য পত্রের প্রবন্ধটীর অধিকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। মনোভাব

বশতঃ সম্পূর্ণ প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতে না পারায় দুঃখ বোধ হইতেছে।"

ঘোড়দৌড়।—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ১৬ই মাঘের হিন্দুপত্রে ঘোড়দৌড়ের অপকারিতা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরাও এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। বলিতে কি, ঘোড়দৌড়-খেলা ও আইন-সঙ্গত জুয়াখেলা উভয়েই এক বলিয়া জনসাধারণ ধরিয়া লয়। একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে যে, আলিপুরের জনৈক উকিল বাজীতে হারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এরূপ আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত ঝটিতি মনে আসে না সত্য, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বাজীতে অনেক টাকা লোকসান করিবার ফলে বহু পরিবার উৎসন্ন-দশার পথে অগ্রসর হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার মোহমদিরা আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। লেখক একদিন খিদিরপুর হইতে ট্রামগাড়িতে আসিতেছিলেন। একটি হিন্দুস্থানী বালক—অনধিক ১০।১১ বৎসরের—ঘোড়-দৌড়ের মাঠ হইতে সেই গাড়ীতে উঠিল। সে দৈবক্রমে ১ টাকায় ১০্ টাকা লাভ করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে সে পাগলের ন্যায় বড়বাজার পর্য্যন্ত সারা পথই লাফাইয়া লাফাইয়া বলিতে লাগিল, 'একরূপেয়া যে দশরূপেয়া মিলা'। বলা বাহুল্য যে, যদি বালকটী লোকসান সহ্য করিত তাহা হইলে সেইরূপ উল্টা-দিকেও উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিত। আমরা জানি, তথাকথিত শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেও ঘোড়-দৌড়ে যাওয়া ও বাজীখেলা একটা ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়াইতেছে। যাঁহাদের উপর গৃহে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব সংন্যস্ত, সেই মহিলাগণও যদি এ প্রকার জুয়াখেলার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে আমাদের বাঁচিবার আশা কোথায়? নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল, এই নীতি অনুসরণ করিয়া আমরাও কলিকাতা কর্পোরে-শনকে বোম্বে কর্পোরেশনের পথ অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিতে অনুরোধ করি, যাহাতে ঘোড়ার মালিক এবং কলিকাতা টার্ফ ক্লাবের মেম্বর ব্যতীত অন্য কাহারও ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলায় যোগ দেওয়া অবৈধ ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা হয়।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস—আমরা সংবাদ-পত্রে দেখিয়া সুখী হইলাম যে, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এম-এ মহাশয় আরোগ্যলাভের পথে অগ্রসর হইতেছেন।

মহর্ষির স্মৃতিবার্ষিকী—গত ৬ই মাঘ মহর্ষির স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে কটকে একটী মহতী সভার অধি-বেশন হইয়াছিল। তাহাতে মিঃ টি, আর ফুকন এম-এ ও অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বায়োস্কোপ-দর্শনে হতাশ্বাস—গত ২২শে মাঘ তারিখের হিতবাদীতে জনৈক পল্লীবাসী সবাক বায়ো-স্কোপ দেখিতে আসিয়া টিকিট না পাওয়ায় করুণ ক্রন্দন করিয়াছেন দেখিলাম। দেখিয়া দুঃখ, লজ্জা ও আমোদ সকলই উপভোগ করিলাম। দুঃখের কারণ এই যে, এই দুর্দ্দিনে আমরা জানি, অনেক যুবক পিতামাতার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থে পাঠ্যপুস্তকাদি ক্রয় বা শরীররক্ষার উপযোগী খাদ্য ক্রয় না করিয়া বায়োস্কোপ দেখিতে অম্লানবদনে সেই অর্থ ব্যয় করে। যুবকদিগের এইরূপ উদ্দাম প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু হিতবাদী যাঁহার করুণ ক্রন্দনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি যুবকসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তিনিও যে এই বৃথা ব্যয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতেই আমাদের দুঃখ। তিনি সেই অর্থ গৃহের ও পরিবারের মঙ্গলার্থে ব্যয় করিলে তাঁহার সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্তত একটুকুও বর্দ্ধিত হইত, তাহা নিঃসংশয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ঠিকই বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কালে বাজে খরচ করিবার একটুকুও অবসর আমাদের নাই। লজ্জার কারণ এই যে, উক্ত পল্লীবাসী তাঁহার হতাশ্বাসের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া করুণ ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মনে পড়ে আজ কয়েক বৎসর হইল, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ধুতি-চাদর পরিয়া গ্রেণ্ড থিয়েটারে গিয়া প্রবেশের অধি-কার পান নাই; কারণ ধুতি-চাদর উক্ত থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অসভ্য বা নগ্নবেশ বলিয়া গৃহীত হইত। তিনি এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া উক্ত থিয়েটারের অবিচার ও অত্যাচার মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ের ক্রন্দনে দিক্‌বিদিক বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের এই চিরদুর্দ্দিনে থিয়েটার-বায়োস্কোপে একটী কপর্দ্দকও ব্যয় করা ভারতবাসীর পক্ষে আমরা পাপ বলিয়া মনে করি। কিন্তু যখন কেহ তথায় প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইয়া শিশুর ন্যায় আশাহত হৃদয়ে ক্রন্দন করে, তখন লজ্জায় আমাদের মস্তক নত হয় এবং আমরা ঘৃণার হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের ক্রন্দনে জনসাধারণের হৃদয় নিশ্চয়ই করুণার্দ্র হইয়া উঠে না, কিন্তু আমোদের রসে পূর্ণ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতশিক্ষা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর).

১। ভোটের সাহায্যে নির্ব্বাচন।

আমাদের দাসমনোভাবের কারণে বিজাতীয় আদর্শের অনুকরণে আমরা যে সকল অনিষ্টকর বিষয় এদেশে প্রবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতশিক্ষাকে অবশ্যপাঠ্য হইতে নির্ব্বাসন তাহাদের অন্যতম। আজকাল কি ধর্ম্মসমাজ, কি রাষ্ট্রনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ সকল ক্ষেত্রেই অধিকাংশ স্থলে কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাচিত হন ভোটসংগ্রহের সাহায্যে। ভোটবিষয়ক বিদেশীয় অসঙ্গত অনুকরণের ফলে কি হাস্যকর ব্যাপার ঘটিতে পারে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহার বিশেষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ইহা বোধ হয় অবিদিত নাই যে, সুপ্রসিদ্ধ ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এক সময়ে একমাত্র ভোটের সাহায্যে ঈশ্বর আছেন কি না, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন! ইহা জানা কথা যে, এই ভোটসংগ্রহ লইয়া প্রতিদ্বন্দীদিগের ও তাঁহাদের নিজ নিজ দলের মধ্যে বিষম বাদবিতণ্ডা বিবাদ-বিসম্বাদ ও হাতাহাতি মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, এই নির্ব্বাচন-ঘটিত বিবাদের পরিণামে বন্ধুগণের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এই ভোটভিত্তি নির্ব্বাচনের ঠিকই নাম করিয়াছিলেন—স্বর্গ হইতে ধরায় নিক্ষিপ্ত সুবর্ণগোলক।

২। উহার পরিণাম।

ভোটভিত্তি নির্ব্বাচনের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া আমরা জানি, অনেক জ্ঞানী, গুণী কিন্তু শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি নির্ব্বাচনের প্রার্থী হইয়া সম্মুখে দাঁড়ান না। যাঁহাদের দেহে বল আছে এবং সময় সুযোগ ও অবসর আছে, তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। যাঁহারা বড় বেশী হাঁকডাক করিতে পারেন, হৈ-চৈ করিতে পারেন এবং ঢাকঢোল পিটাইয়া আত্মপ্রশংসায় গগনভুবন মুখরিত করিতে পারেন, অধিকাংশ স্থলে তাঁহারাই ভোটদাতাদিগের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রদত্ত অধিকসংখ্যক ভোট সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেন। বলা বাহুল্য, এই কারণে অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন ও প্রবীণ জ্ঞানী ও গুণীগণ তরুণদিগের নিকট হইতে ধাক্কা খাইয়া নীরবে বসিয়া থাকেন এবং নবযৌবনে প্রদীপ্ত উদ্যমশীল কিন্তু অভিজ্ঞতায় নিতান্তই অর্ব্বাচীন তরুণসম্প্রদায়ই কর্ত্তাকর্ত্তা হন। অনেক স্থলেই এই তরুণসম্প্রদায়ের প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা খুবই কম দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের সন্তোষবিধানের জন্য অনেক প্রবীণ ও প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণও নিজেদের আন্তরিক মতের বিরুদ্ধেও তাঁহাদের মতে সায় দিতে বাধ্য হন।

৩। আমরা সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্যের পক্ষপাতী।

বিশ্ববিদ্যালয়েও ইহার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখি না। নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ মতের প্রাবল্যের ফলেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য হইবে কি না, এই প্রশ্ন উঠিতে পারিয়াছে। বলা বাহুল্য, আমরা সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করিবার পক্ষপাতী। গত জ্যৈষ্ঠসংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবীণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এ বিষয়ে যে সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহা সকলকেই মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৪। উন্নতির জন্য প্রাচীনের সহিত যোগরক্ষা আবশ্যক।

সুপ্রসিদ্ধ মোক্ষমুলার প্রভৃতি একাধিক দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতপ্রবর সত্যকথাই বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ধারার সহিত যোগ অক্ষুণ্ণ না রাখিলে এবং প্রাচীন ধারার ভিত্তির উপরে উন্নতির সোপান সংরচিত না করিলে দেশের উন্নতি ও মঙ্গল সুদূরপরাহত। একথাও ঠিক যে, অন্তত এদেশে সংস্কৃতশিক্ষা প্রকারান্তরে উঠাইয়া দিবার সহায়তা করিলে প্রাচীন ধারার সহিত সেই যোগ কিছুতেই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিবে না।

৫। স্বেচ্ছাপাঠ্যের অর্থ নির্ব্বাসন।

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মনোবৃত্তি কিছুমাত্র অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন যে, সংস্কৃতশিক্ষাকে স্বেচ্ছাপাঠ্য করিলে শতকরা একজন ছাত্রও তাহার দিকে ঝুঁকিবে কি না বলা যায় না। শুধু সংস্কৃত কেন, যে কোন স্বেচ্ছাপাঠ্য বিষয় সামান্য দুরূহ বোধ হইলেই পরীক্ষার্থীগণ তাহা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক হইয়া উঠে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বাবধি ভূগোল শিক্ষাকে স্বেচ্ছাপাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে শুনিয়াছি। তাহার ফলে ছাত্রগণের অনেকে ভূগোল পড়া ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছে। একদিন আমার নিকট প্রবেশিকার একটী ছাত্র সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল গ্লাসগো কোথায়? Scotlandএর এতবড় সহরের বিষয়ে অজ্ঞতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে, ভূগোল-শিক্ষা অবশ্যপাঠ্য হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ায় সে উহা

ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি এই ঘটনাটি পরলোকগত মনীষী স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলাতে তিনি ভূগোলশিক্ষাকে অবশ্যপাঠ্য করিবার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জানি না, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ঐ ইচ্ছা সফল করিতে পারিয়াছেন কি না। যখন সহজ ভূগোল পড়া স্বেচ্ছাপাঠ্য হইবার ফলে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে বসিয়াছে, তখন ইহা শুনিলে কেহই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না যে, তদপেক্ষা কঠিনতর সংস্কৃত শিক্ষা স্বেচ্ছাপাঠ্য হইলে ছাত্রগণের কেহই উহা স্পর্শও করিবে না।

৬। শিক্ষার দুই দিক—অর্থসাধন ও আত্মোন্নতিসাধন।

এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, যাঁহারা সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করিবার বিরোধী, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই মনোভাব এই যে, বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে ছাত্রেরা যতটুকু সময় সংস্কৃত অধ্যয়নে নিয়োগ করিবে, সেই সময়টুকু বিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যার আলোচনায় নিয়োগ করিলে দেশের সমধিক মঙ্গল হইবে। বিজ্ঞানকে অবশ্যপাঠ্য করিবার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করিলেও সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার কর্ত্তব্যতা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। শিক্ষার দুইটী দিক আছে—একটী অর্থসাধক, অপরটী আত্মোন্নতিসাধক। দেহ মন আত্মা যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সংযুক্ত তেমনি শিক্ষারও এই দুইটী দিক অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। পুরাকালে ভারতে এই দুইটী দিকই সামঞ্জস্যের সহিত একই সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহারই ফলে আমরা একদিকে বেদ-উপনিষদ প্রতিপাদ্য জগতের অন্যত্র দুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বসকল যেমন লাভ করিয়াছি, সেইরূপ অপরদিকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেও কত অপূর্ব্ব জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত দেখিতে পাই। দুর্ভাগ্যক্রমে নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ে সংস্কৃতভাষায় লিখিত বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক ভারত হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা ভগবানের বড়ই কৃপা যে, সংস্কৃতভাষায় লিখিত অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকাদি ও অধ্যাত্মতত্ত্বসকল ভারতে কেবল স্থায়িত্বলাভ করে নাই, প্রত্যুত বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। "কেবলমাত্র ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোচনাই সংস্কৃত ভাষায় করা হইয়াছে তাহা নহে, সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিদ্যা বিশদরূপে সংস্কৃতশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় কোনও ভাষায় ঐরূপ বিশদ ও বহুব্যাপী ভাবে অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা হয় নাই ... ... ভারতের যাহা কিছু নিজস্ব, তাহা ঐ সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই আছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণ, ঊনবিংশসংহিতা, ষড়দর্শন, বেদ, বেদাঙ্গ সকলই সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞতা থাকিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই সকল প্রাচীন শাস্ত্রই একমাত্র ভারতের গৌরব ও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন।"

৭। উচ্চতম অধ্যাত্মতত্ত্বের জন্য সংস্কৃতভাষার সাহায্যগ্রহণ অনিবার্য্য।

যাই হোক, বর্ত্তমান কালে অবস্থানুসারে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বিজ্ঞানসম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করিতে গেলে আমাদিগকে বিদেশীয় ভাষার সাহায্যগ্রহণ করিতেই হইবে। আর ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আত্মোন্নতিসাধক উচ্চতম অধ্যাত্মতত্ত্বসকল আয়ত্ত করিতে গেলে সংস্কৃতভাষার সাহায্যগ্রহণ অনিবার্য্য। এইরূপে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান উভয়কে হস্তগত করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী—ফলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব উদ্ভিন্ন হইয়া জগতে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিবে।

৮। বিজ্ঞানের ন্যায় সংস্কৃতও অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত কেন?

ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, বিজ্ঞান অর্থসাধক হইবার কারণে তাহা যদি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অবশ্যপাঠ্যরূপে গ্রহণ করিতে হয়—ছাত্রদিগের বিজ্ঞানের মূলভাব বসাইয়া দিবার জন্য, একটা ভাল grounding দিবার জন্য যদি উহা অবশ্যপাঠ্য করিতে হয়, তবে আমরাও ঠিক ঐ প্রকার যুক্তি ধরিয়াই বলিব যে, যে ভাষা যায়া আত্মোন্নতিসাধনে সহায়ক অধ্যাত্মতত্ত্বসকল উত্তরকালে সহজে আয়ত্ত হইতে পারিবে, যে ভাষার সাহায্যে অতুলনীয় সাহিত্যাদির উপায়ে হৃদয় মন আকাশের ন্যায় বিস্ফারিত হইতে পারিবে, যে ভাষার সহায্যে ভারতের সমুন্নত যুগের ইতিহাস আমরা অধিগত করিয়া আমাদের প্রকৃত উন্নতির পথ দেখিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিব এবং ভারতের অনুপম বৈশিষ্ট্য আমাদের জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারিব, সেই ভাষাও প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমরা চাই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের মধ্যে বিজ্ঞানেরও পত্তনভূমি যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইবে, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষারও সুদৃঢ় পত্তনভূমি বাল্যাবধি গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থসাধন ও আত্মোন্নতিসাধন, এই

দুইটীর কোন একটীকে বাদ দিলে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না।

৯। বাল্যকালে পত্তনভূমি প্রস্তুত করা আবশ্যক।

সংস্কৃত শিক্ষাকে ছাত্রদিগের পক্ষে একটা গুরুভার বোঝা মনে করিবার কোনই সঙ্গত কারণ দেখি না। আমি সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী অবধি ছাত্র ছিলাম। যেরূপ ধাপে ধাপে আমাদিগকে ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতির সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজী শিক্ষা যতটুকু গুরুভার বোঝা মনে হইত, সংস্কৃত শিক্ষা তদপেক্ষা বড় বেশী গুরুভার মনে হইত না।

আমার পরলোকগত পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাঁহাকে পরম শ্রদ্ধাভাজন ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিতেন The Educationist of the day—তাঁহার এই মত ছিল যে, বাল্যকালে যে বিদ্যা শিক্ষা করা যাইবে, তাহা সহজেই আয়ত্ত হইবে এবং সেই কারণে বাল্যকালেই যথাসম্ভব বিভিন্ন বিদ্যাশিক্ষা দিয়া পত্তন-ভূমি গড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই মতের অনুসরণে তিনি তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে রোগে শয্যাগত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একদিকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন-বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদান করিতেন, এবং অপরদিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার অতিরিক্ত ফরাসী ল্যাটিন ও গ্রীকভাষা শিক্ষা দিতেন। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, তাঁহার এরূপ শিক্ষাদানের ফল মন্দ তো হয়ই নাই, বরঞ্চ সর্ব্বাংশে ভালই হইয়াছে।

১০। অকারণ ব্যাকরণ-বিভীষিকা।

সংস্কৃত শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান বাধা বোধ হয় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ন্যায় দুর্বোধ্য ব্যাকরণ পড়িতে হইবে, এইরূপ কল্পনা। এরূপ কল্পনার কোনই কারণ নাই। যতদূর জানি, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ব্যতীত অন্য কোথাও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ বা পাণীনি ব্যাকরণ বা তদনুরূপ অন্য কোন ব্যাকরণ পড়ান হয় না;—সর্ব্বত্রই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ব্যাকরণ-কৌমুদী" বা তদনুরূপ কোন ব্যাকরণ পড়ান হয়। ঐরূপ ব্যাকরণ নিম্নশ্রেণী অবধি প্রবেশিকার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়েক অংশে বিভক্ত করিয়া ধাপে ধাপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে সংস্কৃত ভাষায় যে বেশ একটু ব্যুৎপত্তি লাভ হইবে, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। যতদূর বুঝিতে পারি, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল হইতেই ব্যাকরণ-বিভীষিকা জন্মলাভ করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে ও শিক্ষার্থীদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে। কিন্তু এরূপ বিভীষিকার কোন কারণ দেখা যায় না।

১১। সংস্কৃত পরিত্যজ্য ভাবিবার কারণ নাই।

সংস্কৃত শিক্ষাকে ছাত্রদিগের পক্ষে গুরুতর ভার, সুতরাং পরিত্যাজ্য মনে করিলে সেই একই যুক্তিবলে প্রবেশিকার পরবর্ত্তী পরীক্ষাসমূহের জন্য বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক যে সকল কঠিন পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই সকলও বর্জ্জনীয় বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু আমাদের মতে কোন বিষয় বা পুস্তক সামান্য কঠিন বা দুর্ব্বোধ্য হইলেই পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ নীতি শিক্ষার মূলোচ্ছেদক সুতরাং গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ পুস্তকাদির সাহায্যে ছাত্রগণ যে নিজ নিজ অভীষ্ট শিক্ষাবিষয়ে ভাল পত্তনভূমি লাভ করে, তাহা বলা বাহুল্য। ইহা বলিতেই হইবে যে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগকে অর্থসাধক বিজ্ঞান এবং আত্মোন্নতি-সাধক সংস্কৃত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পত্তনভূমি প্রস্তুত করা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও তদধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তব্য।

১২। সংস্কৃতশিক্ষা পরিত্যক্ত হইলে পরিণাম কি?

(ক) বিদেশের নিকট জ্ঞানশিক্ষার ঝুলি ধারণ।

স্বেচ্ছাপাঠ্য নির্দ্দেশ করিবার ফলে সংস্কৃত শিক্ষা এদেশ হইতে যে অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা তাহা আমরা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। সংস্কৃত শিক্ষা অন্তর্হিত হইলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর থাকিবে কি না সন্দেহ। যে কয়েকজন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন ও অনুসন্ধিৎসু হইবেন, তাঁহাদের অধিকাংশ প্রমাণাদি সংগ্রহের জন্য বিদেশীয় অনুবাদকদিগের নিকট ভিক্ষার ঝুলি উপস্থিত করিতে বাধ্য হইবেন এবং তাঁহাদের বিতরিত জ্ঞানকণা প্রাপ্ত হইলেও অভ্রান্ত বেদবাক্যরূপে গৃহীত হইবার সমধিক সম্ভাবনা, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

(খ) ধর্ম্মবিলোপের সম্ভাবনা।

সংস্কৃতশিক্ষা অন্তর্হিত হইলে হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম সকলও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য। হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানই বলিতে গেলে সংস্কৃত-লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের উপর দণ্ডায়মান এবং মন্ত্রাদির উপর সংগ্রথিত। ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্ত বিলুপ্ত হইলে ভারতের অবস্থা যে কিরূপ ভীষণ হইবে, তাহা কল্পনাতেও আনা দুরূহ। এখনও ভারতবাসীর উদ্দাম প্রবৃত্তিকে যেটুকু সংযমের বশে আনিতে পারা যাইতেছে, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ পিতৃপিতামহ হইতে আগত ধর্ম্মসাধনার অভ্যাস। এই ধর্ম্মভাবের লাগাম ছাড়িয়া দাও—কে ভারতবাসীকে বিনাশের কোন দিকে টানিয়া লইয়া চলিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

(গ) ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন বাঙ্গালা বুঝিতে গেলে সংস্কৃত জানা চাই। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার সহিত ফরাসীর বা নব্য যুগের অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষার যে সম্বন্ধ, সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার তদপেক্ষা অনেক বেশী ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, যে কোন ভাষাতত্ত্ববিদ ইহা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কেবল বাঙ্গালা বলি কেন, আর্য্যাবর্ত্তের ও মহারাষ্ট্র দেশের ভাষাসমূহ সম্বন্ধেও বোধ হয় এই কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষাকে বিদেশীয় ভাষার সহিত এক ও অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া উহার অবশ্য-পাঠ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, অন্তত ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষাকে বিদেশীয় ভাষার সহিত এক ও অভিন্ন আসন প্রদান করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। এই কারণে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বিদ্যালয়সমূহে classical ভাষাসমূহের সংরক্ষণ বা নির্ব্বাসনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতের বিদ্যালয়সমূহের classical ভাষাসমূহের সংরক্ষণ বা নির্ব্বাসন বিচার করিলে চলিবে না। একটু মনোনিবেশসহকারে আলোচনা করিলেই বোঝা যাইবে যে, ভাষায় সর্ব্বথা প্রকাশ করিতে না পারিলেও, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড ও ভারতের মধ্যে প্রভেদ গুরুতর।

(ঘ) সংস্কৃত শিক্ষা জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তারে অনুকূল।

কাহারও কাহারও মতে সংস্কৃত শিক্ষা জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তারের প্রতিকূল। আমাদের নিকট এ মত সমীচীন বোধ হয় না। উহার বিপরীতে সংস্কৃত শিক্ষার পত্তনভূমি সংগঠিত হইলে তাহা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ আনুকূল্যই করিবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

১৩। অবশ্য পাঠ্যতার পক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন sentimentality নহে।

বর্ত্তমান কালে কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃত শিক্ষার স্বেচ্ছাপাঠ্যতার প্রতিবাদকে নিরর্থক sentimentality বা ভাবপ্রবণতার ফল মনে করেন। তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সংস্কৃত শিক্ষাকে অবশ্যপাঠ্য করিবার বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদকেও sentimentalityর ফল বলিয়া ধরিব না কেন? যাই হোক, তাঁহাদিগকে আমরা ধীরভাবে বলিতে চাই যে, তাঁহাদের স্বেচ্ছাপাঠ্য করিবার স্বপক্ষে উক্তি যেমন আমরা sentimentalityর ফল মনে করি না, সেইরূপ তাঁহারা যেন অবশ্য পাঠ্য করিবার স্বপক্ষে আমাদেরও উক্তি sentimentalityর ফল না মনে করেন। আর যদি বা তাহাই হয়, তাহাতেও আমাদের লজ্জা বা ক্ষোভের কোনই কারণ দেখি না। ইহা জানা কথা যে, অনেক-ক্ষেত্রে sentiment জগতের গতিবিধি পরিচালিত করে—sentiment rules the world. যে ভাষার সহিত আমাদের জীবনের অনেক বিভাগ অস্থিমজ্জায় বিজড়িত হইয়া আছে, তাহার নির্ব্বাসন-দণ্ডের সম্ভাবনা আসিলে আমাদের প্রাণ যে ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সেই ভাষা রক্ষাকল্পে যদি আমরা বদ্ধপরিকর না হই, তবে তাহাতেও আমাদের অত্যন্ত মূর্খতারই পরিচয় প্রকাশ পাইবে।

১৪। অনুবাদ প্রভৃতি পাইলেও অনেকক্ষেত্রে মূলভাষার সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক।

এ বিষয়ে অবশ্যই স্বীকার করিতে আমরা কোন দ্বিধা করি না যে ইংরাজী ভাষার ন্যায় সংস্কৃত ভাষাতেও এমন অনেক বিষয় ও গ্রন্থ আছে যেগুলি আধুনিক বঙ্গভাষা প্রভৃতি দেশপ্রচলিত ভাষার মধ্য দিয়া অনুবাদ প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। পিতৃদেব যে আমাদিগকে আট বৎসর বয়সের সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সে সময় অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা ডাঃ কানাইলাল দের রসায়ন বিজ্ঞান এবং এক সুচিকিৎসক লিখিত অস্থিবিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা জানি যে

এখনও অনেক সুলেখকের লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু ইহাও আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক কালের এমন বিশেষ বিশেষ বিষয় বা গ্রন্থাদি থাকিতে দেখা যায়, সেগুলির প্রকৃত মর্ম্ম অনুবাদ প্রভৃতির সাহায্যে কিছুতেই হৃদ্গত হইতে পারে না—তাহা বুঝিতে গেলে মূল ভাষায় সেই সেই বিষয় বা গ্রন্থ আলোচনা করিতে হয়।

১৫। অনুবাদসমিতির প্রয়োজন।

দেশপ্রচলিত ভাষায় মধ্য দিয়া যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে গেলেও একটি অনুবাদসমিতি বা Translation Bureau স্থাপন করা আবশ্যক এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদিগকে সেই সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া উচিত। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির বোধ হয় জানা আছে যে, জর্ম্মণীর Frederick the Greatএর উৎসাহে বিভিন্ন দেশের সদ্গ্রন্থরাজি অনুবাদিত হইয়া জার্ম্মান্ ভাষায় প্রকাশিত হওয়া অবধি জার্ম্মণী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ফ্রান্সের নিকট অধীনতা ও ঋণগ্রহণ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তদবধি জার্ম্মাণ জাতি যে অপূর্ব্ব সমৃদ্ধিসম্পদের পথে কিরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রতাপবান জাপানও জার্ম্মণীর এই নীতি অনুসরণ করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে অল্পদিনের মধ্যেই আশ্চর্য্যরূপে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং সাহিত্যাদি বিষয়ে স্বদেশকে স্বাধীনতা-মণ্ডিত করিতে পারিয়াছে। জার্ম্মণী এবং জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়াই উহাদের পক্ষে এরূপ অসাধ্যসাধন সম্ভব হইয়াছে। আমরা পরাধীন জাতি হইলেও সাহিত্যাদি বিষয়ে প্রসার ও মুক্তিলাভের ইচ্ছুক হইলে এইরূপ একটি অনুবাদসমিতি স্থাপন করা বোধ হয় একান্ত আবশ্যক।

উপসংহার।

আমরা যথাসম্ভব সকল দিক হইতে দেখিয়া আসিলাম যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত শিক্ষাকে অবশ্য-পাঠ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা নিতান্তই ভ্রান্তবুদ্ধির কার্য্য হইবে। কি ধর্ম্ম, কি সমাজনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি সকল দিক হইতেই আমরা দেখি যে, বিজ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতির সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাকেও প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর জন্য অবশ্যপাঠ্যভুক্ত না করিলে দেশের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে ঘোরতর অমঙ্গল সাধিত হইবে। এই সঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে, টোল প্রভৃতি, যেখানে ব্যাকরণ-শিক্ষার জন্যই ব্যাকরণ অধীত হয়, সেই সকল স্থান ব্যতীত কোন বিদ্যালয়ে—এমন কি, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলেও হৃদয়বিদারক মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ন্যায় গ্রন্থকে অবশ্যপাঠ্য রাখিয়া ছাত্রগণকে যেন বিভীষিকাগ্রস্ত করা না হয়।

প্রার্থনা।

(শ্রীসুব্রতনাথ চট্টোপাধ্যায়)

বুঝিনা জানিনা নাথ,
এ তোমার কেমন ধারা,
অসম্ভব সম্ভবে জীবনপটে,
হয়ে যাই জ্ঞানহারা।
মোর সাধ্য নাই—
জানিনা কোথা হতে পাই,
উঠে ভাবরাশি চিত্তগগনে
উদাস মন মোর,
ঝরায় আঁখি লোর—,
তোমারে দেখি নাই,
তোমার কথা শুনি কানে,
তাই দিবানিশি,
নির্জ্জনে একা বসি,
মহা কুতূহল জাগে মম প্রাণে,
কেমনে মোর চিত্ত ভরে উঠে,
এক অজানা গানে।
ধন্য আমি, ধন্য মোর প্রাণ,
কে যেন আমারে,
লয়ে যায় পারে,
যেথা, মোর চিত্ত করে তাঁরে ধ্যান।
ঐ গিরি-প্রস্রবণে
নদী উপবনে,
তিনি বিরাজমান।
যেথায় মানুষ ঐ সঙ্কীর্ণতার মূর্ত্তিগড়ে,
গণ্ডীর মাঝে তারে ঘেরে,
সেথায় মানুষ করে, তারে অপমান,
তিনি শুধু লভেন সেই স্থান,
যেখানে মানুষ, মুক্তির মাঝে
তাহার সকল কাজে,
করিতে চায় তাহার সন্ধান।
পারে না, বহিতে, এ হেন দাসত্বপনা,
এমন করে,
মোর স্বাধীন চিত্ত,
দেহের বন্ধন মাঝে,
যেন হাঁপায়ে মরে,
হে নাথ, সীমায় আবদ্ধ করে রেখেছ,
দেহটারে,
পারনি ত করিতে বন্দী মনরূপ উদাস
পাখীরে,

তাই মোর স্বাধীন চিত্ত,
তার আপন পক্ষ মেলে,
উড়িয়া যে চলে ;
মোর দেহ ত তারে,
ধরিয়া রাখিতে নারে,
কখন সমুদ্র গরজন,
জাগায় শিহরণ,
লয়ে যায় তারে অসীম পারাবারে,
যেথা, রাজে বনানীর শীতল ছায়া,
মোর মন লভে সেথা আপন কায়া ;
তাই বা দেখ কেমন করে,
জুড়াই মনের বাসনা অপার
সংসারের শতেক শৃঙ্খল রাখে তারে
বদ্ধ করে।

পত্রিকা-পরিচয়।

সঙ্গীতবিজ্ঞানপ্রবেশিকা :— অগ্রহায়ণসংখ্যা ১৩৩৮ সাল। প্রাপ্তিস্থান ৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট।

প্রথম প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী-লিখিত সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতগায়ক উজীর খাঁ সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রবন্ধটী উপযুক্ত হস্তেই লিখিত হইয়াছে। উজীর খাঁর বংশতালিকা হইতে দেখা যায় যে, তিনি ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব ছিলেন ; পরে তাঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ আকবর বাদসাহের সময় তানসেনের সহিত যুক্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই কারণে উজীর খাঁর হৃদয়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের হিন্দুভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বীরেন্দ্র বাবু আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি উজীর খাঁর জীবন ও সঙ্গীত সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবেন। আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বীরেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় প্রবন্ধ "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আকবর সাহের দরবারে তিনি যে দীপক রাগ গাহিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির উপর তাহার কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছিল, বলিতে গেলে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে, রাগ-রাগিণী প্রকৃতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী সে বিষয়ে ইতি-পূর্ব্বে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে, তানসেন-দীপকরাগসম্বন্ধীয় ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণাদি আছে। আমরা আগামীসংখ্যায় সেই সকল প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে ইচ্ছা করি। এই সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইলে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস বেহালা কিরূপে ধরিয়া শিক্ষা করিতে হইবে তাহা এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে বিলাতের ন্যায় ভারতেরও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ বেহালা শিক্ষায় প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি উপযুক্ত লোকের হস্তে পড়িলে বেহালা "কথা কইতে পারে"। তাই এই প্রবন্ধ কালের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে করি। নগেনবাবু এই শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ করিলে সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। বেহালা-শিক্ষাসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা বড়ই crued ভাবে লিখিত। নগেন বাবু বেহালা শব্দের পরিবর্ত্তে বাহুলীন শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। শব্দটী সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি আমরা বেহালা শব্দ ব্যবহারেরই পক্ষপাতী। বেহালা-শব্দটী এত অধিক প্রচলিত যে, আমরা তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন শব্দব্যবহারের প্রয়োজন দেখি না। তবে "অধিকন্তু ন দোষায়" এই নীতি অনুসারে বাহুলীন শব্দটীও বজায় রাখিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ধানশীরাগ ও যশকুশী তালে একটি গীত দিয়াছেন। আমরা পদাবলীসংগ্রহে এইরূপ অপ্রচলিত রাগ ও তালের অনেক গান দেখিতে পাই। কিন্তু ঐ সকল রাগ ও তাল অপ্রচলিত থাকিবার কারণে সেই সকল গান গাওয়া অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের ব্রজবাসী মহাশয়ের নিকট অনুরোধ এই যে, যে সকল পদাবলী বিভিন্ন রাগে ও তালে গাহিবার রীতি আছে, সেগুলি যেন স্বরলিপি সহ প্রকাশ করেন ; তবেই সেগুলির মিষ্টতা উপলব্ধ হইয়া বহুল প্রচারিত হইবে নিঃসন্দেহ।

এই সূত্রে আমরা প্রবেশিকার সম্পাদক মহাশয়কেও অনুরোধ করি যে, তিনি যেন তানসেন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদদিগের ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা প্রভৃতি সকলজাতীয় সঙ্গীতই স্বরলিপি সহ একটু বেশীপরিমাণে প্রকাশ করেন এবং এই উপায়ে যেন উহাদিগের স্থায়িত্ব দান করেন।

"ঠুংরী" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সান্যাল ঠুংরী তাল সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। আমরা রসজ্ঞ সঙ্গীতপিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই এই প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রকৃতই ঠুংরী খুব লঘু তাল হইলেও সুগায়ক

ওস্তাদদিগের দ্বারা ঐ তালসহকারে গীত গানগুলি শ্রোতৃবর্গকে যে কোন্ অরূপ রসসাগরে ডুবাইয়া দেয়, তাহা যিনি প্রত্যক্ষ শুনিয়াছেন তদ্ব্যতীত আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে আমরা লেখকের সহিত একমত যে, ঠুংরী লঘুতাল হইলেও আদৌ উপেক্ষার বস্তু নহে।

এই সংখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ ও গীতসূত্রকার লেখক ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গীতবেত্তা সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপীয় স্বরলিপির ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইউরোপীয় স্বরলিপি-জ্ঞানের অভাবে আমরা দেখিয়াছি, অনেক স্থলে ইউরোপীয় ভাল ভাল রচনা ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেকের পক্ষে বাজান সম্ভব হয় না। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস, নীরেন বাবুর প্রকাশিত ইউরোপীয় স্বরলিপি-পদ্ধতি সেই অভাব দূর করিবে।

গ্রন্থপরিচয়।

কলিকাতায় চলাফেরা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। পৃষ্ঠা ১৩৮+৵০ মূল্য বারো আনা। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

পুস্তকখানিতে ঠাকুর মহাশয় কলিকাতায় যান-বাহনের ক্রম-বিকাশের একটা চিত্র পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রাচীন কালের যানবাহন ও রাস্তার চিত্র এবং বর্ত্তমানের সমুন্নত বৈজ্ঞানিক যুগের যানবাহন ও রাস্তার ছবি পাশাপাশি দেখাইয়াছেন, যাহাতে পাঠক সহজেই তুলনায় সমালোচনা করিতে পারে, যাহাতে পাঠক সহজে উপলব্ধি করিতে পারে, কোনটি সুখের—প্রাচীন না আধুনিক অবস্থা।

তারপর তিনি দেখাইয়াছেন—কেমন করিয়া বিশ্বব্যাপী উন্নতির ঢেউ আসিয়া মানবকে অচেতন অবস্থা হইতে সচেতন করিয়া তোলে, কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সকলকেই বিশ্বের সঙ্গে 'তেলেনা প্রাজ্ঞা বা' সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে,—নতুবা নিস্তার নাই, ধ্বংস অনিবার্য্য।

পুস্তকখানিতে আর একটি দেখিবার বিষয় এই যে, মানুষ কিছুতেই সহজে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নবীনতার উপাসক হইতে পারে না, কিন্তু পরিশেষে প্রয়োজনের ধাক্কা যখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়, তখনই মানব নবীনকে জীবনের মুক্তি-পথের অগ্রদূতরূপে বরণ করিয়া লয়।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি কিরূপে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির পথ খুলিয়া যায়, মাড়োয়ারীগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

নূতন ও পুরাতনের সংযোগ-সাধকরূপে আমরা এই গ্রন্থকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

সুবর্ণবণিক সমাচার জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮।

ক্ষিতীন্দ্র বাবু প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তিনি এই পুস্তকে "সেকাল আর একালের" কলিকাতার অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। "সেকাল" বলিতে হয় ত অনেকের মনে হইবে প্রাচীন কালের কথা—অন্ততঃ ১০০ বৎসর পূর্ব্বের বিবৃতি। তাহা নহে। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহারই আভাষ এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষা সরল। ক্ষিতীন্দ্র বাবু এই পুস্তক করিয়া ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের গবেষণার পথ অনেকটা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

এদেশের কথা—২০শে মাঘ, ১৩৩৭।

শোকসংবাদ।

ডাক্তার ৺প্রসন্নকুমার রায়—গত ৮ই মাঘ শুক্রবার খ্যাতনামা ডাঃ পি, কে, রায় তাঁহার হাজারিবাগের বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৮২ বৎসর হইয়াছিল। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক বিদেশে গিয়া জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশে ফিরিয়া দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ডাঃ পি, কে, রায় তাঁহাদের অন্যতম। ইনি প্রধানত শিক্ষাদান কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম ভারতীয় "এডুকেশন্যাল সার্ব্বিসে" প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের পদেও ইনি একবার কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ইনি চিরদিন সমাজসংস্কার কার্য্যে উৎসাহী ছিলেন। ইঁহার পত্নী ও কন্যাগণকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

GOVERNMENT OF BENGAL.

POLITICAL DEPARTMENT.

Political.

CIRCULAR.

No. 951 P.S.

Calcutta, the 27th January, 1932.

In a previous communique it has been explained that the publication of matter which assists the activities of the Working Committee of Congress, or other committees or associations which have been declared unlawful, is an offence under section 17 (1) of the Indian Criminal Law Amendment Act, 1908. It was also explained that action might be taken under the Emergency Powers Ordinance, 1932, under which Government has power to regulate the press to prevent the furtherance of the civil disobedience movement. It is now desirable to amplify the above explanations and to issue more detailed instructions for the guidance of all concerned.

2. Section 68 of the Emergency Powers Ordinance, 1932, applies the provisions of the Indian Press (Emergency Powers) Act, 1931, to the printing and publication of objectionable matter of any of the kinds described in section 63 of the Ordinance. Security can therefore be demanded as provided in the Act, and will be liable to forfeiture on any repetition of the offence.

3. Section 4 (1) of the Emergency Powers Ordinance, 1932—powers under which have been conferred on District Magistrates and the Commissioner of Police, Calcutta—enables the local Government or any officer empowered under that section to take action against those, concerned in the production of any newspaper if the matter published appears to be in furtherance of a movement prejudicial to the public safety. It is within the power of the Government or the officer acting under this section to require the editor, publisher and printer to refrain from publishing objectionable matter. It is also within the power of Government or the officer acting under this section to require the above persons to publish, in such manner as may be directed, correct reports of political events and notices or advertisements which counteract incorrect reports or notices or advertisements which have the effect of furthering the civil disobedience movement. In serious cases, orders may be passed for the suspension of publication of an offending newspaper. Any disobedience of such an order is liable to a penalty not exceeding 2 years' imprisonment and a fine under section 21 of the Ordinance.

4. The following are instances of the class of matter the publication of which would be considered by Government to require action under one or more of the provisions of law quoted above :—

(1) Congress propaganda of any kind, including messages from persons arrested.

(2) Any messages issuing or purporting to issue from persons confined in jail.

(3) Any immoderate criticisms of Government or Government officials.

(4) Any exaggertated reports of political events. This includes the extravagant use of headlines and the setting up or the placing in juxtaposition of news items in such a manner as to further the civil disobedience movement by giving an exaggerated impression of excitement in the country.

(5) Any notices or advertisements of meetings, processions or other activities intended to promote civil disobedience.

(6) Any photographs of persons taking part in Congress activities or of any incidents relating to such activities.

5. The above illustrations are not exhaustive but are intended to give some guidance to those concerned as to the kind of matter which might expose them to penalties. At the same time Government wish it to be understood that they have no desire to interfere with honest journalism and have no wish to penalise occasional and unintional inclusion of undesirable matter in a paper which in ordinarily well-conducted.

By order of the Governor in Council,

Additional Deputy Secretary to the Government fo Bengal.

ওঁতৎসৎ

Tattwab odhini Patrika

Reg. No. C. 462

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

সংখ্যা ১০৬৩ — ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ — ১৮৫৩ শক ফাল্গুন

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৷৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ববোধিনীর আকার পরিবর্ত্তন।

গ্রাহক ও পাঠকদিগের প্রতি নিবেদন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আগামী ১লা বৈশাখ ৯০ বৎসরে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার বর্ত্তমান ফুলস্কেপ আকারের কারণে বাঁধাইয়া রাখিবার অসুবিধা উল্লেখ করিয়া অনেক হিতৈষী বন্ধু আমাদিগের নিকট আকার পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এই কারণে আমরা ইহার আকার পরিবর্ত্তন করিয়া রয়েল আট পেজী (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার) আকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে একবার আমরা এবিষয়ে গ্রাহক-দিগের নিকট মতামত চাহিয়াছিলাম। তদুত্তরে পরিবর্ত্তন করা ও না-করা উভয় দিকেই মোটামুটি সমসংখ্যক মত পাইয়াছিলাম। এই গুরুতর পরিবর্ত্তনে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে এবারেও আর একবার গ্রাহক ও পাঠকদিগের এ বিষয়ে মতামত জানিতে ইচ্ছা করি। এই নিবেদনের উত্তরে মতামত পাইলে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিব এবং পরিবর্ত্তন করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইলে তাহা পরবর্ত্তী (৯১তম) বৎসরে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারিবে। আশা করি, এই গুরুতর বিষয়ে গ্রাহক ও পাঠকগণ তাঁহাদের মতামত জানাইতে ও সৎপরামর্শ দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।
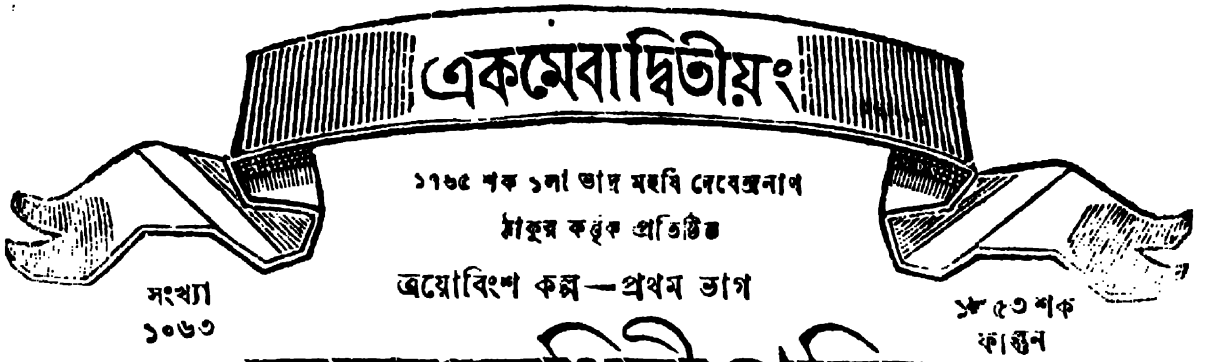
ওঁতৎসৎ

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩২। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০৫। ব্রহ্মমুহূর্ত্তে।

মা! রাত্রি যখন গভীর, আনন্দের কোলাহল হরষের হাসি যখন সম্পূর্ণ নীরব হইবে, তখনই তুমি আমাকে জাগাইয়া তুলিও। তখনই তোমাতে আমাতে প্রাণের গভীর কথা হইবে। তখনই আমি তোমার কাছে জ্ঞানশিক্ষা করিব; তখনই তুমি আমাকে স্নেহের শতচুম্বনে ভরিয়া দিবে, আর আমি তোমারই কাছে প্রেমের ভাষা শিক্ষা করিব। সেই গভীর রাত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিব, আর বুঝিব তুমি কেমন করিয়া এই বিশ্ব রচনা কর। এই রকম কোন এক রাত্রে তুমি আমাকেও সৃষ্টি করিয়াছিলে; তাই বুঝি, এই রকম রাত্রি আমার বড় ভাল লাগে। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলে বলিয়াই বুঝি রাত্রি এত সুন্দর হইয়াছে। নিশীথের এই নিঝুম নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না—সমস্ত নিঃশব্দ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কি জানি প্রাণের কি এক আকুল প্রার্থনা কাঁদিয়া উঠিয়া সমস্ত আকাশকে রণিত করিয়া তুলিতেছে। তারা হইতে তারায় তোমার যে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত, আমার প্রাণ দুই বাহু বাড়াইয়া সেই স্রোত ধরিবার জন্য ছুটিয়া চলিতেছে। তোমার নামেই আমার সমস্ত প্রাণ স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। ঘুমের আবেশ আমার চক্ষে এতটুকু নাই—জাগরণের সোনার কাঠির স্পর্শে আমার প্রাণ তোমার চরণপূজায় নবতর অধিকার পাইয়াছে। আমাকে শিক্ষা দাও, শক্তি দাও, যাহাতে তোমার এই সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যরচনায় আমিও আমার অক্ষম হাতে সাহায্য করিতে পারি। তুমি তোমার বাঁশী বাজাইবে, আমি তালে তালে নৃত্য করিতে থাকিব; আর তাহারই তালে তালে তোমার এই শোভনসুন্দর সৃষ্টি বিকশিত হইতে থাকিবে। তাহারই তালে তালে প্রাণসাগরে নব নব হিল্লোল উঠিবে। তাহারই তালে তালে আকাশ ও পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্য এবং গ্রহতারকা সকলে মিলিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিবে এবং নব নব জগতের জন্ম দান করিবে। আমি—আমি নির্ব্বাক হইয়া তাহা দেখিব এবং তোমারই রূপসাগরে ডুবিয়া মরিব।

১০৬। সংশয় ও সমাধান।

মা! আমার প্রাণে কতই প্রশ্ন সাগরতরঙ্গের মত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে আর মিলাইয়া

যাইতেছে। আজ ঠিক করিয়াছি, তোমাকে সেই সকল প্রশ্নের কতকগুলি জিজ্ঞাসা করিব—উত্তর পাই বা না পাই, উত্তর যা পাইব, তাহাও বুঝি বা নাই বুঝি। এই সুনীল আকাশে তুমি নিস্তব্ধ নিশীথে এতগুলি প্রদীপ হীরকের তেলে জ্বালাইয়া রাখিয়া জাগিয়া বসিয়া থাক কেন? যাহারা জাগিয়া থাকে, তাহারা তোমার ঐ সমস্ত প্রদীপের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই দরকার মনে করে না। বাকী যাহারা ঘুমাইয়া থাকে, তাহাদের তো কথাই নাই। তোমার ঐ প্রদীপগুলি তো বৃথাই জ্বলে—কাহার জন্য? তুমি চারিদিকে ফুল ফুটাইয়া রাখ। দিনের বেলায় তাহারা হাসির ছটায় দিকবিদিক আলোকিত করিয়া তুলে; সন্ধ্যাবেলায় তাহারা নববধূর ন্যায় সলজ্জবেশে আপনাদিগকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। দিনের বেলাতেই বা কে সেই হাসির সঙ্গে নিজের হাসি মিলাইতে যায়, আর সন্ধ্যাবেলাতেই বা কে সেই সলজ্জভাবের আরক্ত আভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে যায়?—তবে কেন, মা! এত ফুল ফুটাইয়া জাগিয়া বসিয়া থাক কেন? জীবের প্রাণে এত প্রেম উৎসারিত হয় কেন? তাহাদের উৎসই বা কোথায়? মানুষ এই প্রেমের জন্য এত পাগল কেন? প্রেমরস যতই পান করে, ততই তাহার জন্য পিপাসা আরও বাড়িয়াই যায়। প্রেমের সন্ধানে ঘুরিয়া ফিরিয়াও যাহারা তাহা পায় না, তাহাদের হতাশ প্রাণের দিকে চাহিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাক কি প্রকারে? আমার সর্ব্বশেষ প্রশ্ন এই যে, আমার মত অধম সন্তানকে এই সংসারে পাঠাইয়া তোমার কি লাভ হইল? আমার পক্ষে ভালই হইয়াছে—আমি তোমার চরণপূজার অধিকার পাইয়াছি; কিন্তু তোমার তাহাতে কি লাভ? এই সংসারের সুখদুঃখের ঝড়ঝঞ্টিকা খাওয়াইয়াই বা তোমার কি লাভ হয়? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য এক একবার আমার প্রাণ বড়ই ছটফট করিতে থাকে। উত্তর দাও বা নাই দাও, তুমি একবার আমাকে তোমার ঐ কোলে তুলিয়া আদর কর। কে যেন আমার প্রাণে বলিয়া দিতেছে, তোমার একটুখানি আদর পাইলেই আমার সকল প্রশ্নের সমাধান হইবে, সকল সংশয় দূর হইবে, হৃদয়ের গ্রন্থিই খুলিয়া যাইবে।

১০৭। চরণধূলি।

মা! তুমি যে পথ দিয়া চল, তাহার প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে বড়ই পবিত্র। ইচ্ছা হয়, প্রতি ধূলিকণা অঙ্গে মাখিয়া তোমারই চরণতলে পড়িয়া থাকি। সেই প্রতি ধূলিকণার স্পর্শে সমস্ত প্রাণটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। প্রতি ধূলিকণা আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র সুগন্ধ পুষ্পের আকার ধারণ করে, আর আমার সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধে ভরিয়া দেয়। তোমার যে স্নেহপ্রেম আমাদের অন্তরে ঢালিয়া দিয়াছ, তাহার প্রতি বিন্দু আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইয়া সমস্ত বিশ্বজগত ছাইয়া ফেলে এবং পরিণামে তোমারই চরণে গিয়া আশ্রয় পায়। জননী! তুমি ছাড়া আমার আর কোনই আশ্রয়স্থল নাই। একে একে সকলেই তো আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে—কিন্তু তুমিই আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া তোমার মাতৃস্নেহে আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছ; বিপদ ও মৃত্যু আমা হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, কিন্তু তুমি পার্শ্বে থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছ দেখিয়া ঝড়ের একটী ঢেউও আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; এত কঠোর বর্ষা সমস্ত ভাসাইয়া দিল, কিন্তু এক বিন্দু জলও আমার গায়ে লাগিল না! তোমার জন্য আমার প্রাণে যে আগুন দিবানিশি জ্বলিতেছে, সেই আগুন বর্ষার জল আর ঝড়ের বাতাস সমস্তই শুকাইয়া উড়াইয়া দিতেছে। আমি তোমারই দীনদুঃখী সন্তান—আমার দুঃখদৈন্য দেখিয়া কেহই তো কাছে আসে না; একমাত্র তুমিই আমার এই আঁধার ঘরে আসিয়া সকলের অজানতই এই ঘর যে আলোকে আলোকে ভরিয়া দিয়াছ। যাহার কেহ নাই, তুমিই তাহার সহায়, তোমার স্নেহই তাহার সর্ব্বস্ব। তোমার চরণধূলিতে আমার এই অন্ধকার গৃহ পবিত্র হইয়াছে, দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে পরিণত হইয়াছে।

ধর্ম্মধারা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। একই সত্যের বিভিন্ন নাম।

ভারতীয় আর্য্য ঋষিদিগের সত্যনিষ্ঠা আশ্চর্য্য—তাঁহারা সত্যের অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সত্যকে পরিস্ফুট আকারে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা সকল সত্যের মূল ভগবানকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বহিঃপ্রকৃতিকে সেই আদি সত্যেরই বিভিন্ন-মূর্ত্তিতে বিকাশরূপে অনুভব করিলেন এবং সেই সত্য ঘোষণা করিলেন—একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি—একই সত্যকে বিপ্রগণ নানা নামে অভিহিত করেন। তাঁহারা যাগ-যজ্ঞাদিতে রত থাকিতেন সত্য, কিন্তু ভগবানকে কেন্দ্রে রাখিয়াই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন।

২। ব্রহ্ম কেন্দ্রে।

জগতে সকল বিষয়েই একটা উত্থানপতনের ধারা বহে দেখা যায়। আর্য্যঋষিদের মধ্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শাস্ত্রসকল একটু নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমরা যে সময় অবধি আর্য্য সভ্যতার আদিম অবস্থা বুঝিতে পারি, সেই বৈদিক কালের প্রথম সময় পর্য্যন্ত যাগযজ্ঞের বহু আড়ম্বর প্রচলিত ছিল। তাহার পর এক সময় আসিল, যখন যাগযজ্ঞের ঘনঘটা অন্তর্হিত না হইলেও এক প্রবল ঋষিসম্প্রদায় ঐরূপ যাগযজ্ঞের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিলেন এবং একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মনামের জয়গান করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার বীজ প্রোথিত করিলেন। এইরূপে একবার যাগযজ্ঞ আর একবার ব্রহ্মনামের মহিমাপ্রচার, বহুকাল যাবৎ উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ববিবাদ, উভয়ের মধ্যে উত্থানপতনের লীলা চলিতে লাগিল। কিন্তু সেই উত্থানপতনের লীলা মোটের উপর ব্রহ্মকে কেন্দ্রে রাখিয়াই চলিয়াছিল।

৩। ভারতে আর্য্য উপনিবেশ।

ব্রহ্মকে কেন্দ্রে রাখিয়া ঐ সকল লীলা সংঘটিত হইবার কারণ এই যে, চতুর্ব্বেদ সংগৃহীত হইয়া যথাযথভাবে বিভক্ত হইবার বহু পূর্ব্বাবধি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ এবং যে সকল ঋষিদের নাম আমরা শাস্ত্রে পাই, তাঁহাদেরও পূর্ব্বপুরুষ আদিমতম ঋষিগণ অন্তর্দৃষ্টিবলে প্রকৃতির অন্তর হইতে যে আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের সন্ধান কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সময়ের গুণে ও স্থানমাহাত্ম্যে সেই জ্ঞান তাঁহাদের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইবার পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছিল মনে হয়। আর্য্যজাতির আদিমতম বসতি যে ভারতের উত্তরাঞ্চলে কোন এক স্থানে ছিল, ইহা বলিতে গেলে একপ্রকার সর্ব্ববাদসম্মত। কালক্রমে তাঁহারা যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন দলে জগতের বিভিন্ন অংশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এক বা একাধিক দল যে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও একপ্রকার সর্ব্ববাদসম্মত বলিতে পারি। যাঁহারা ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কারণেই হৌক, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদিগের ভাবধারা—তাঁহাদের সকল কর্ম্মকে ব্রহ্মকেন্দ্রক করিবার মূলভাবকে শুধু অব্যাহত রাখেন নাই, প্রত্যুত উহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক-পূর্ব্বযুগের ভাষাও ভারতে চলিয়া আসিয়া অন্যান্য দেশে বিক্ষিপ্ত দল অপেক্ষা ভারতে সমাগত আর্য্যদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

৪। যাগযজ্ঞ ও উপনিষৎ।

আর্য্য ঋষিরা ভারতে আসিবার পূর্ব্বে যে পার্ব্বত্য-দেশে বাস করিতেন, সেখানে তাঁহারা যে কি কষ্টে দিন যাপন করিতেন, তাহা অনুমেয় কিন্তু সম্পূর্ণ বর্ণনার অতীত। তাঁহারা যখন ভারতে নামিয়া আসিয়া সূর্য্য-কিরণে সমুজ্জ্বল, শস্যশ্যামল, ওষধি-বনস্পতিতে পরিপূর্ণ সুরধুনীবিধৌত ভূখণ্ড দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা যে কি সুখ লাভ করিলেন, কি সোয়াস্তি অনুভব করিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝানো কঠিন। তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে এক আশ্চর্য্য ও সর্ব্বাংশে নূতনতর দৃশ্য—এক বিশাল বিরাট vista খুলিয়া গেল। তাঁহাদের সমস্ত হৃদয় ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তাঁহাদের মস্তক তাঁহার চরণে অবনত হইয়া পড়িল। তাঁহাদের অন্তর হইতে কত শত নবনব গীত সমুত্থিত হইল। তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা ভগবানের নামে শতবিধ প্রকারে যাগযজ্ঞের ভিতর দিয়া দানধ্যানের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাই ক্রমে যখন বৃহদাকার ধারণ করিল, তখন ভগবান সেই সমস্ত যাগযজ্ঞের ভিতর অন্তর্নিগূঢ় কেন্দ্ররূপে অবস্থিতি করিলেও তাঁহার পূজার্চ্চনা প্রকৃতপক্ষে গৌণ হইয়া পড়িল, যাগযজ্ঞই মুখ্যস্থান অধিকার করিল। এখন তাহার অপরিহার্য্য ফলে নানা কদাচার অনাচার সমাজে প্রবেশ করিল। সেই সকল অনাচার কদাচার সমাজের জ্ঞানীগুণী লোকদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা তখন যাগযজ্ঞের নিন্দা করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ভাবধারা অনেক অংশে ফিরাইয়া আনিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের সকল কর্ম্মে হয়তো

যাগযজ্ঞকে বাদ দেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মকে মুখ্য আসন প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রকার সংঘর্ষের ফলেই সম্ভবত আমরা উপনিষৎসমূহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

৫। শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব।

বহুকাল যাবৎ এই প্রকার যাগযজ্ঞমূলক আচার-ব্যবহারের সহিত মুখ্যভাবে ব্রহ্মোপাসনার দ্বন্দ্ববিবাদ চলিয়াছিল। একবার যাগযজ্ঞের দিকে জনসাধারণ ঝুঁকিয়া পড়িল, একবার বা ধর্ম্মসংস্কারকের যুক্তিবলে যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জনসাধারণ ব্রহ্মোপাসনাকেই মুক্তির উপায় বুঝিয়া তাহাই অবলম্বন করিবার পথে ধাবিত হইল। তাই এদেশে শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে কত—কতবার সংগ্রাম চলিয়াছিল। ইহারই ফলে আমরা ভারতভূমিতে বহু ধর্ম্মসংস্কার হইতে দেখি, যাহার জন্য ইহা পুণ্যভূমি বলিয়া উক্ত হয়। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতের জনসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছিল যে, যাগযজ্ঞ বল আর যাহা কিছু বল, ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কোন কিছুই দাঁড়াইতেই পারে না। ভারতের আর্য্যেরা স্থির করিয়া লইলেন যে, ব্রহ্মই সমস্ত প্রকৃতির মূল কারণ। এই বিষয়ই আরও গভীররূপে আলোচনা করিয়া তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে, প্রকৃতির যিনি মূল কারণ, তিনিই আমাদের আত্মারও আত্মা—আত্মাও সেই মূল কারণে অধিশ্রিত হইয়া আছে।

৬। ঔপনিষদ আখ্যায়িকা।

আর্য্যদিগের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা সম্বন্ধে তলবকার উপনিষদে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। সেই আখ্যায়িকা বলে যে, কোন এক সময়ে (সম্ভবত কোন এক যুদ্ধে) দেবতাদিগের বিজয়লাভ হইল। বলা বাহুল্য যে, ভগবানের ইচ্ছাতেই দেবপ্রসাদের ফলেই এই বিজয়লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে দেবতাদের হৃদয়ে অহঙ্কার আবির্ভূত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন না যে, তাঁহাদের বিজয়ের মূলে মঙ্গলবিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা—তাঁহাদের বিজয়ের কারণ দেবপ্রসাদ; তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদেরই বলবীর্য্যের প্রভাবে, নিজেদেরই অপ্রতিহত প্রতাপে এই বিজয়লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্ম তাঁহাদের এই অহঙ্কার জানিতে পারিয়া দেবতাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবতারা এই অলৌকিক মহাপুরুষকে ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে দেখেন নাই; কাজেই তাঁহারা কৌতূহল প্রকাশপূর্ব্বক পরস্পরের দিকে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। তখন ঐ নবাগত দেবতার স্বরূপ জানিবার জন্য দেবতারা সকলে মিলিয়া অগ্নিকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। ব্রহ্ম শক্তিপরীক্ষায় অগ্নিকে পরাস্ত করিলেন। অগ্নি চলিয়া আসিলেন। শক্তিপরীক্ষায় বায়ুও পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন সকলে দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মের নিকট পাঠাইলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া "উমা হৈমবতী"কে দেখিয়া ব্রহ্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। উমা বলিলেন—ইনি ব্রহ্ম।

৭। ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা পাই যে, ভারতের শস্যশ্যামল সমতলভূমিতে আসিবার বহু পূর্ব্বে বহু-দেবোপাসক ও ব্রহ্মোপাসক, আর্য্যদিগের মধ্যে এই দুই সম্প্রদায় সমুত্থিত হইয়াছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদও বড় অল্প হয় নাই। পরিশেষে ব্রহ্মোপাসনার পরিণামে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাইয়া সকলেই ব্রহ্মোপাসনারই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবোপাসকগণ বুঝিলেন যে, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছাই তাঁহাদের বিজয়লাভের মূলে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা বুঝিলেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল, জগতে যাহা কিছু আছে, সকলেরই অন্তরে ভগবান অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ভগবানই অগ্নিতে অগ্নি হইয়া, বায়ুতে বায়ু হইয়া এবং জলেতে স্নেহরূপে আছেন বলিয়াই প্রকৃতির যাহা কিছু সকলই যথানিয়মে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। "ব্রহ্মই সকল সত্তার মূলাধার, সকল শক্তির মূল প্রবর্ত্তক, সকল আত্মার পরমাত্মা"। ব্রহ্মের শরণাগত যিনিই হইবেন, তাঁহারই অন্তরে নিরাশা নিরানন্দ বিদূরিত হইয়া আশা ও আনন্দ, নবতর বলবীর্য্য ও তেজের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা বুঝিলেন যে, ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা। এই ব্রহ্মবিদ্যার কেন্দ্র হইল ওঁকার। এই ওঁকারকে প্রাণের ভিতর আয়ত্ত করিতে পারিলে আমাদের জীবনের সকল বিভাগেই বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

৮। বৈদিক যুগের শেষে ব্রহ্মবিদ্যার প্রাধান্য।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আর্য্যেরা যখন ভারতভূমিতে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে ঐ ওঙ্কারকেন্দ্রক ব্রহ্মবিদ্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া ভগবানের দানসকল অযাচিতভাবে পাইতে লাগিলেন। শস্যসম্ভারে ধনরত্নে তাঁহাদের গৃহসকল সহজেই পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের অধিকাংশ আবার ক্রিয়াবহুল দেবোপাসনাতেই নিরত হইয়া পড়িলেন, বাহিরের আড়ম্বর ও কোলাহল কলরবে মাখানো যাগযজ্ঞাদিতে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু দুখের বিষয় এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত

যাগযজ্ঞ, সকল কর্ম্ম, সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে ব্রহ্মকে রাখিতে বিস্মৃত হন নাই। ভারতে আসিবার পর যাগযজ্ঞের প্রভাব বড়ই বেশী হইয়া পড়িল। বৈদিক যুগের আদিমকালে ইহাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ বৈদিক যুগের শেষে ঋষিরা যাগযজ্ঞের মায়ামোহ ভেদ করিয়া আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে নবতরভাবে ধারণ করিয়া উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া সমস্ত জগতের নমস্য হইলেন।

৯। অন্তর্ব্বিবাদ।

এই প্রকারে এই ভারতভূমিতেই ধর্ম্মবিষয়ক দ্বন্দ্ব-বিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিবাদ উপস্থিত হইল। একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিপ্লব ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সকলেই অবগত আছেন যে, ভারতে আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যতদূর দেখা যায়, তাহাতে দেখি যে, বৈশ্যগণ নির্ব্বিবাদ ছিলেন, নির্ব্বিরোধে ব্যবসাবাণিজ্যে রত থাকিয়া দেশের সমৃদ্ধিবর্দ্ধনে এবং দেশ ও সমাজের মঙ্গলসাধনে আত্মনিয়োগ করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও রাষ্ট্রনৈতিক, সর্ব্বপ্রকারের বিরোধবিবাদের অন্ত ছিল না। ব্রাহ্মণগণের নিজেদের মধ্যে বিবাদের জলন্ত সাক্ষী বৈশম্পায়নের সঙ্গে তাঁহার প্রিয় শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির বিবাদ, যাহার ফলে যজুর্ব্বেদ শুক্ল ও কৃষ্ণ, এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এই বিবাদের ফলে অবশ্য আমাদের লাভই হইয়াছে—বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমরা তাহার অতিরিক্ত অনেক নূতন বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিবাদের জলন্ত সাক্ষী বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সংগ্রাম, যাহার ফলে world-peaceএর বা শান্তিমন্ত্রের বীজমন্ত্র—ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং—লাভ করিয়াছি; যাহার ফলে আমাদের গৌরবের মহান আকর গায়ত্রীমন্ত্র বিশ্বামিত্রের নিকট অমূল্য দানস্বরূপে লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদের ফলেই আমরা দেখি যে, পরশুরাম আর্য্য-অনার্য্য ভারতবাসী মাত্রকেই দেখাইলেন যে, প্রয়োজন হইলে নিম্নশ্রেণী হইতে এবং সম্ভবত অনার্য্য শূদ্রদিগের ভিতর হইতেও ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

১০। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ্য।

কেবল যে ব্রাহ্মণদের নিজেদের মধ্যে অথবা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদমূলক বিপ্লবসমূহ ভারতের জনসমাজকে আলোড়িত ও বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা নহে, ক্ষত্রিয়দেরও পরস্পরের মধ্যে সময়ে সময়ে প্রচণ্ড দলাদলি প্রবল বিবাদ উপস্থিত হইত। সমগ্র রামায়ণ ও সমগ্র মহাভারত এবিষয়ে জলন্ত সাক্ষ্যপ্রদান করে। রাম-রাবণের যুদ্ধ আর কিছুই নহে—রাবণের রাজ্যে ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত অনাচার ও কদাচার, কতকটা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিকৃত আচার-ব্যবহারের মতো, প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত আচারমূলক অসদ্ধর্ম্মের স্থানে আর্য্যসভ্যতার ফলস্বরূপ সদ্ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনই রামচন্দ্রের রাবণের বিরুদ্ধে অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধও মূলত ধর্ম্মসংক্রান্ত যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। গীতা নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে সুনীতিমূল হিসাবে একেশ্বরবাদমূলক ভাগবত ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা, অপরদিকে "বেদবাদরত"দিগের প্রচলিত যাগযজ্ঞাদির দ্বারা জনসাধারণের মন ভুলাইবার চেষ্টা, এই উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ মহাভারতের সময়ে সঞ্জাত হইয়াছিল। ক্রমে তাহারই অনুষঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক বিরোধের দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার ফলে ভারতবর্ষ উন্নতির শিখরদেশ হইতে অবনতির পাতালপুরীতে নামিয়া গেল, এবং কালক্রমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবার কবুলতিতে স্বাক্ষর করিতে ভারতবাসী কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্যের অপভ্রংশের, ব্রাহ্মণ্যের নামে অযথা অহঙ্কার-অভিমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে তো দাঁড়ানই নাই, বরঞ্চ তাহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া শত্রুমিত্র আর্য্য ও অনার্য্য সকলেরই অনন্য-পূর্ব্ব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে লজ্জাসরম বিসর্জ্জন দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের চরণ ধৌত করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যামূলক প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যকে বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণই ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি উহাতে যে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই বলে আজও আমরা—ভারতবাসী আমরা ধর্ম্মজগতে মাথা তুলিয়া চলিতে পারিতেছি।

১১। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল কোথায়?

মহাভারতের অন্তভাগ পড়িলে বেশ বোঝা যায় যে, এই কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধের পরিণামে এক মহাবৈরাগ্যের ভাব ভারতের সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। দশ অক্ষৌহিণী এবং সাত অক্ষৌহিণীর পরস্পরের হত্যাসাধক সংগ্রামের ফলে বোধ হয় সে সময়ে গৃহে

গৃহে, প্রত্যেক পরিবারে মৃত্যু স্বীয় ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। অপরদিকে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া অনেকগুলি রাজার জন্মদান করিল। স্বভাবতই তাঁহারা ছলেবলে-কৌশলে পরস্পরের রাজ্য হরণ করিয়া নিজ নিজ রাজ্যের বিভূতিসাধনে সচেষ্ট থাকিতেন। তাহার ফলে রাজন্যবর্গের মধ্যে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য প্রজাগণের সন্তোষবিধানার্থ যাগযজ্ঞ বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্রমে প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের একপ্রকার অনাস্থা আসিয়া পড়িল। শতবিধ দুর্নীতিমূলক অনাচার ও কদাচারসকল সমাজের গভীর অন্তস্তলে শিকড় নামাইয়া সমাজকে মৃত্যুমুখে টানিয়া চলিতে লাগিল। ধর্ম্মপিপাসু সাধুগণ জনসমাজ হইতে একপ্রকার বিতাড়িত হইয়া হিমালয়ের পাদদেশে বা গহন কাননসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মনে হয়, এই সময়েই, এখন হইতে ন্যূনাধিক আড়াই হাজার বৎসর নহে, কিন্তু ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলবীজসকল প্রোথিত হইয়াছিল। সেই সময় অবধি তথাগত বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের মধ্যে যে কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত সমাজবিপ্লব, কত ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, সে সমুদয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ আজও ইতিহাস নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিতে পারে নাই। কিন্তু ইতিহাস ঐ মধ্যবর্ত্তী সময়ের যেটুকু পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছে, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, ঐ সময়ে নানাবিধ বিপ্লবের বড় একটা অভাব ঘটে নাই। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, ঐ সময়ের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়াও অনেক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছিল।

১২। বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট দান।

তথাগত বুদ্ধদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে সময়ে ঐ প্রকার বিপ্লবসমূহের পরিণামে ভারতভূমি অবনতির একটা গভীর স্তরে নামিয়া গিয়াছিল। জনসাধারণ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব যত বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, সত্যের উপর যতদূর দাঁড়াইতে পারুক আর নাই পারুক, তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞের বৃথা আড়ম্বরের মোহজালে তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন এবং কতকগুলি চিরাগত সংস্কৃত ভাষাগত সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বাঁধিবুলি দ্বারা তাহাদিগকে বিমূঢ় বা hypnotised করিয়া রাখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই বিমোহনের বাঁধ বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম ভাঙ্গিয়া দিয়া সত্যকে, ধর্ম্মকে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশ্য কোন গ্রন্থে ইহার সাক্ষ্য না পাইলেও আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁহার পূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া খণ্ড খণ্ড আকারে এই বিষয়ে আন্দোলন আলোড়ন চলিয়াছিল—বুদ্ধদেবে সেই সমস্ত আন্দোলন সংহত আকারে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। মার্কিন পণ্ডিতপ্রবর এমার্সনের মতে যে ফুলটী ফুটিয়া উঠে, আমরা যে ফুলটীকে যে আকারে দেখি, সেই ফুলটীর প্রত্যেক পাঁপড়ি, প্রত্যেক রেণু, প্রত্যেক অণু-পরমাণু ঐ আকার ধারণ করিলে তবেই সমগ্র ফুলটী ঐ আকারে বিকশিত হইয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়। সেইরূপ আমাদের এই অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে, তদানীন্তন সমগ্র জনসমাজের অন্তরে সত্যধর্ম্ম প্রভৃতির তত্ত্ববিষয়ে সহজ ভাষায় সহজ ভাবে জ্ঞানলাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বুদ্ধদেবের ভিতর দিয়া সংহত আকারে প্রকটিত হইয়া উঠিল—তিনি সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া প্রচলিত ভাষায় সঙ্ঘভাবে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য ভাঙ্গিয়া মানবের প্রাণের ভাষার সাহায্যে মানবের প্রাণে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করা—ইহাই ভগবান বুদ্ধদেবের এক অপূর্ব্ব দান। তাঁহার পূর্ব্বে ধর্ম্মবিষয়ে সংস্কৃতবর্জ্জনের সম্ভবপরতা কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে নাই।

১৩। বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় মহাদান—অহিংসা।

তাঁহার দ্বিতীয় অমোঘ দান হইতেছে অহিংসাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে যাগযজ্ঞের উপলক্ষ্যে নানাবিধ জীবজন্তুর, এমন কি মানুষেরও বলি দেওয়া প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি তো কথায় কথায় সম্পন্ন হইত, আবশ্যক বোধ হইলে নরমেধও বাদ যাইত না। এই সকল "মেধ" বৈদিককালেও প্রচলিত বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। অনেক স্থলে ইহার এমন ভাবে উল্লেখ দেখা যায় যে, মনে হয় যেন, উহার ধারা বৈদিক কালেরও বহু পূর্ব্ব অবধি প্রচলিত থাকিয়া বৈদিক কালেও নামিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বৈদিক কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল "মেধ" প্রত্যক্ষভাবে জীব-মনুষ্যের বধসাধন দ্বারা সম্পন্ন হইত কি না সন্দেহ—আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে করি যে, "মেধ" শব্দে ঐ সকল জীব ও মানুষের পূজাই উপলক্ষিত হইত। যাই হোক, বুদ্ধদেবের সময়ে আর ঐ প্রকার পূজা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু চারিদিকে যাগযজ্ঞের নামে শত শত জীবজন্তু দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদত্ত হইত।

১৪। বৌদ্ধভাব বলিবিরোধী কেন?

এই প্রকার যে বেশ বর্ত্তমান কালেও নামিয়া

আসিয়াছে, তাহা হইতেই ইহার প্রাচীন ভীষণ ভাব কতকটা উপলব্ধি হইতে পারে। ছোটনাগপুরের রাজার নিকট শুনিয়াছি যে, দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন তাঁহার রাজধানীতে পাহাড়ের উপরিস্থিত রাজমন্দিরে ১০০ মহিষ এবং ১০০০ ছাগ বলি দেওয়া হয়। বলি দিবার প্রণালী শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়—মুসলমানদিগের হালাল করিবার প্রথার সঙ্গে তাহার কোনই পার্থক্য দেখা যায় না; মহিষকে এমনভাবে হাত-পা বাঁধিয়া দাঁড়করানো হয় যে, সে কিছুতেই তাহার ঘাতকদিগকে কোনরূপে আঘাত করিতে না পারে। তখন প্রধান ঘাতক প্রথমে একটী আঘাত করিবামাত্র চারিদিক হইতে অন্যান্য ঘাতকেরা তাহাকে আঘাত করিতে থাকে। অবশেষে যখন সে আঘাতের বেদনায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন সেই পাহাড়ের উপর হইতে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়—সে পাহাড়ের পাদদেশে পড়িয়া মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করে। এইরূপে একটী একটী করিয়া ১০০টী মহিষ বলি দেওয়া হয়। ছাগবলির তো কথাই নাই—একএকটীকে ধরা হয় আর ঘাড়ে খাঁড়ার কোপ দেওয়া হয়—সেই এক কোপে মরিল কি বাঁচিল তাহা দেখিবার কোন অবসরই থাকে না, কোপ দিয়াই তাহাকে ঠেলিয়া সেই পাহাড়ের উপর হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়—মৃত্যু আসিয়া তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান করে! কি ভীষণ চিত্র! এই একটী চিত্রের কথা ভাবিলেই তো মাথা ঘুরিয়া যায়, আর যখন দিকে দিকে, গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে এইভাবে জীবহত্যার স্রোত চলিতেছিল, তখন তাহা দেখিয়া বুদ্ধদেবের করুণাসিক্ত হৃদয় যে দুঃখে শোকে বিদীর্ণ হইবে, তিনি যে বৈদিক প্রথার নামে প্রচলিত হিংসার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া অহিংসাধর্ম্মের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িবেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এখানেও আমার মনে হয় যে, সেই সময়ে জীববলির ভীষণতা দেখিয়া জনসাধারণের মতিগতি তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল; জনসাধারণের সেই বিদ্রোহী ভাবই বুদ্ধদেবের ভিতর দিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ

ওঁঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব।*

(রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায় বিদ্যার্ণব এম-এ)

সকল উপনিষদেই ওঙ্কারের উল্লেখ আছে; বিশেষভাবে প্রশ্ন, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, মাণ্ডুক্য ও কঠোপনিষদে ইহার তত্ত্ববিষয়ে বর্ণনা আছে।

* মতামতের জন্য লেখক দায়ী।

প্রশ্নোপনিষদে—

এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।
তস্মাৎ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি।

৫ম প্রঃ।২।

তিনি (পিপ্পলাদ ঋষি) সত্যকামকে বলিলেন, এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি এই ওঙ্কাররূপ আয়তন (আলম্বন, উপায়) দ্বারা পর ও অপর ব্রহ্ম, এই দুয়ের একক প্রাপ্ত হয়েন।

ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি।৭।

তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়া থাকেন ঋক্‌সকলের দ্বারা এই লোক (মনুষ্যলোক), যজুঃসকলের দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং সামসকলের দ্বারা সেই লোক (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হয়, যাহা জ্ঞানীগণ জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই (ব্রহ্মলোক) ওঙ্কার-সাধন দ্বারাই প্রাপ্ত হয়েন। এমন কি, যিনি শান্ত (প্রপঞ্চাতীত), অজর, অমর ও অভয় তাঁহাকেও জ্ঞানী ব্যক্তি (সেই সাধন দ্বারাই লাভ করেন)।

তৈত্তিরীয়—

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্।১।৮
ওঁ এই শব্দ ব্রহ্ম। এই সমুদয়ই ওঁ।

ছান্দোগ্য প্রথমাধ্যায়ে—

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।
ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্।১।

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ। অপামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্য বাগ্‌রসো বাচ ঋগ্‌রস ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ।২।

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যঃ।৩

কতমা কতমর্ক্, কতমৎ কতমৎ সাম, কতমঃ কতম উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি।৪।

বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ
তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ।৫।
তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে।৬।

ছা ১।১।১

ওঁ এই অক্ষররূপী উদ্গীথের উপাসনা করিবেক।
ওঁশব্দপূর্ব্বক সামগান করা হয়।

পৃথিবী এই সমুদয় ভূতের রস (উদ্ভব, স্থিতি ও লয়ের হেতু)।

জল পৃথিবীর রস (জলে পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত)।

ওষধিসকল জলের রস (জলের পরিণাম), পুরুষ ওষধির রস (পুরুষ-দেহ অন্নের পরিণাম হেতু), বাক্ পুরুষের রস, বাক্যের রস ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস উদ্গীথ * ।২

এই যে অক্ষররূপী উদ্গীথাখ্য ওঙ্কার, ইহা রস-সমূহের মধ্যে রসতম, শ্রেষ্ঠ পরমাত্মস্থানীয় ।৩।

কোন্-কোন্‌টী ঋক্, কোন্-কোন্‌টী সাম, কোন্-কোন্‌টী উদ্গীথ বলা হইতেছে ।৪।

বাকই ঋক্, প্রাণই সাম, ওম্ এই অক্ষরই উদ্গীথ। বাক্ ও প্রাণ, ঋক্ ও সাম এই দুই-দুইটী যুগ্ম ।৫।

এই দুই-দুইটী যুগ্ম ওঁ এই অক্ষরে সৃষ্ট হয় ।৬।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে—

ওঁমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্
ভূতং ভবদ্‌ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ।১।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ।২।

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-মুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ।৫।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ।৬।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং (নোভয়তঃপ্রজ্ঞং)
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্।

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম-প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ।৭।

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি ।৮।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তে-রাদিমত্ত্বাদ্বাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ । ৯

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়-ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিঃ সমানশ্চ ভবতি নাস্যা-ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি য এবং বেদ ।১০।

* উদ্গাতা যে সামগান করেন, তাহাতে সবসমেত সাতটী ভাগ আছে,—(১) প্রস্তাব, (২) উদ্গীথ, (৩) প্রতিহার, (৪) উপদ্রব (৫) নিধন, (৬) হিংকার, (৭) প্রণব।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতের-পীতের্ব্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ । ১১ ।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ।১২।

১। ওঁ এই অক্ষরই সকল। ইহার ব্যাখ্যান এই যে, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই সমুদয়ই ওঙ্কার। যাহা কিছু তিন কালের অতীত, তাহাও ওঙ্কার।

২। এই সমুদয়ই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আত্মা। এই আত্মা চতুষ্পাদ।

৩। (আত্মার) প্রথম পাদ বৈশ্বানর। ইনি জাগরিতস্থান বহিঃপ্রজ্ঞ (বহির্বিষয়ের অবভাসক) সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখ স্থূলভুক্।

৪। (আত্মার) দ্বিতীয় পাদ তৈজস। ইনি স্বপ্ন-স্থান অন্তঃপ্রজ্ঞ সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতিমুখ সূক্ষ্মবিষয়ভুক্।

৫। (আত্মার) তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞ। ইনি সুষুপ্তি-স্থান। সুপ্ত ব্যক্তি যে স্থলে কামনার বিষয় কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না, তাহা সুষুপ্ত। সুষুপ্তস্থান একীভূত, প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দময়—এইজন্য ইনি আনন্দ-ভুক্। চেতনা ইহার মুখ।

৬। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি সমুদয়ের উৎপত্তিস্থান এবং ভূতসকলের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ।

৭। যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ (অর্থাৎ জাগ্রৎস্বপ্নের অন্তরালাবস্থাযুক্ত) প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞ নহেন, তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, লক্ষণরহিত, অচিন্ত্য, অব্যপ-দেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত। ইহাকেই (জ্ঞানীগণ) চতুর্থ বলিয়া জানেন। তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

৮। সেই এই আত্মা ওঙ্কার। ওঙ্কারের অক্ষর ও মাত্রা অবলম্বনে পাদ ও মাত্রা। অকার উকার ও মকার পাদ ও মাত্রা।

৯। জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা অকার। তিনি আপ্তি অর্থাৎ ব্যাপ্তি বা আদিমত্ত্ব-বশতঃ প্রথম মাত্রা অকার। যিনি এরূপ জানেন, তিনি সমুদয় কাম্যবস্তু লাভ করেন এবং আদি হয়েন।

ভাবার্থ—

অকার দ্বারা যেমন সমুদয় বাক্য ব্যাপ্ত আছে, বৈশ্বানর কর্ত্তৃকও তেমনি সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত আছে; আর অকার যেমন সমুদয় বর্ণের আদি, বৈশ্বানরও তেমন পাদসমূহের আদি। এই সাধারণত্ব বশতঃ বৈশ্বানর ও অকারের একত্বসাধন হইতেছে।

১০। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উকার। তিনি উৎকর্ষ বা মধ্যবর্ত্তিত্ববশতঃ দ্বিতীয় মাত্রা উকার। (এখানে অকার হইতে উকারকে উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। তাহা যাহাই হউক, মধ্যবর্ত্তিত্ব এইজন্য বলা হইয়াছে যে, উকার যেমন অকার ও মকারের মধ্যস্থ, তেমনি তৈজস বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যস্থ। এই সাধারণত্ব জন্য তৈজস ও উকারের একত্ব স্থাপিত হইতেছে।)

যিনি এরূপ জানেন, তিনি বিজ্ঞানপ্রবাহের উৎকর্ষ সাধন করেন এবং ইহার ফলে (শত্রু মিত্র সকলের নিকট) সমান হন এবং তাঁহার বংশে অব্রহ্মবিৎ জন্মে না।

১১। যিনি সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ, তিনি মিতত্ব বা একীভূতত্ব বশতঃ তৃতীয় মাত্রা মকার। যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সকলের পরিমাণ করেন ও এক হন।

ভাবার্থ—সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস বাহ্য-জগৎ ও মনোজগৎ প্রাজ্ঞে প্রবেশ করেন এবং জাগ্রতা-বস্থায় তাহা হইতে বহির্গত হয়েন। আধার দ্বারা কোন এক বস্তুর পরিমাণ করিতে হইলে যেমন সেই বস্তুটীকে একবার আধারে প্রবেশ করাইয়া তাহা হইতে পুনরায় বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে প্রবেশ ও তথা হইতে নির্গমন করাতে প্রাজ্ঞ যেন এতদুভয়ের পরিমাণ করিতেছেন। তদ্রূপ ওঙ্কারের উচ্চারণান্তে অকার ও উকার মকারে প্রবেশ করে, উচ্চারণারম্ভে পুনরায় বহির্গত হয়। সুতরাং এতদুভয় স্থানেই পরিমাণক্রিয়ার সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। আর একটী সাদৃশ্য এই, বৈশ্বানর ও তৈজস সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞে একীভূত হয়েন, তেমনি ওঙ্কার-উচ্চারণান্তে অকার ও উকার যেন মকারে একীভূত হয়। এইজন্য প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব।

১২। মাত্রাশূন্য, চতুর্থ, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চাতীত, শিব ও অদ্বৈত। এইরূপ ওঙ্কারই আত্মা। যিনি এরূপ জানেন তিনি পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন।

মর্ম্মার্থ—

১। যাহা ব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত তাহা লইয়াই ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল। এতদতিরিক্ত যাহা ব্রহ্মের ভিতর অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা তিন কালের অতীত।

২। ব্রহ্ম এই আত্মা—ইহা বলিতে বুঝাইতেছে যে, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞানাতীত, মাত্র তটস্থ লক্ষণ দ্বারা পরোক্ষ বস্তুরূপে তিনি আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন। যখন আত্মা হইয়া প্রকাশ পান, তখন তিনি অপরোক্ষ সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হন।

৩। বৈশ্বানর ব্রহ্মের বিশ্বরূপ—বহিঃপ্রজ্ঞ দৃক্‌শক্তি, যিনি জাগরিত অবস্থায় আপনাকে ছাড়া বাহিরের বিষয়-সকল জানিতেছেন। দ্যুলোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী ও আহবনীয় অগ্নি এই সাতটী তাঁহার অঙ্গ; এবং এই সাতটী লইয়া বিরাট রূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই উনিশটী মুখ দ্বারা তিনি স্থূল বিষয়সকল ভোগ করিয়া থাকেন।

৪। তৈজস বিষয়শূন্য প্রকাশমাত্র। তিনি অন্তঃ-প্রজ্ঞ বলার তাৎপর্য্য এই যে, বাসনাকারে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত দ্যুলোক প্রভৃতি সাতটী সূক্ষ্ম অঙ্গকে বিষয় করিয়া সূক্ষ্মজ্ঞানাকারে ভাসমান পূর্ব্বোল্লিখিত একোন-বিংশতি মুখ দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ ভোগ করেন।

তিনি বৈশ্বানর, তিনি তৈজস এবং তিনিই প্রাজ্ঞ। প্রজ্ঞা বলিতে স্বরূপভূত চিচ্ছক্তিকে বুঝায়। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যশক্তি (বিষয়) দৃক্‌শক্তি (বিষয়ীর) অতিরিক্ত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু সুষুপ্তিতে ইহারা বিষয়ীর সঙ্গে এক হইয়া যায়। তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞকে এইজন্য একীভূত বলা হইয়াছে। বিষয়-সমূহের জ্ঞান প্রজ্ঞান। এই অবস্থায় এই সকল জ্ঞান আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া আর অনুভূত হয় না। ইহারা যেন অবিভক্ত ভাব গ্রহণ করিয়া জমাট একস্বরূপ ধারণ করে, এইজন্য ইহা প্রজ্ঞানঘন। প্রজ্ঞানঘন অবস্থায় একমাত্র আনন্দেরই অনুভূতি থাকে। তাই দেখা যায়, যখন সুষুপ্তি অবস্থা (গভীর নিদ্রা) হইতে কেহ জাগরিত হয়, বলিয়া উঠে—আহা, কি আরামেই নিদ্রা গিয়া-ছিলাম—কি সুখ! সুষুপ্তির এই যে স্মৃতি, ইহা আনন্দানু-ভূতের জ্ঞাপক; এই নিমিত্ত প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময়। এই আনন্দই সমুদয়ের মূল (আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে); সমুদয়ের মূল হওয়াতে আনন্দকে স্রষ্টার স্বরূপ বলা হয়। সুষুপ্তাবস্থায় জীব পরমাত্মাতে প্রবেশ লাভ করিলে পর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু জীবাত্মা চিচ্ছক্তির অংশ (অণুচৈতন্য) হওয়ায় তাহার চেতনা সকল সময়েই বিদ্যমান থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধ জ্ঞান তিরোহিত হওয়ার পর যে আনন্দ অবশেষ থাকে, সেই আনন্দে আনন্দময় হইয়া সে আনন্দের ভোক্তা হয়। চেতনাযোগে আনন্দসম্ভোগ হয় বলিয়া চেতনাকে মুখ বলা হইয়াছে। জীবের এইরূপে যে আনন্দের সম্ভোগ হয়, সেই আনন্দ প্রাজ্ঞের স্বরূপ। *

৬। প্রাজ্ঞকে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের প্রসবিতা, ভূতসকলের উৎপত্তি ও নিরোধস্থল—এই

* যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ।
২য় মুণ্ডক—১ম খণ্ড, ১ম শ্লোক।

সকল বিশেষণে বিশেষিত করায় এই অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে যে, যিনি সৃষ্টির আরম্ভে জীবকে লইয়া জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি প্রাজ্ঞ। জীব ও জগতে তিনি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান।

৭। যাহা চতুর্থপাদ—তাহা অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞও নহেন। উভয়প্রজ্ঞ দ্বারা যিনি জাগ্রত ও স্বপ্ন এই উভয়ের অন্তরালস্থ বিষয়জ্ঞ, তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছে। এই তিনের সঙ্গেই জীব ও জগতের সম্বন্ধ আছে।

তিনি প্রজ্ঞানঘন নন, সুষুপ্তাবস্থায় জীব প্রজ্ঞানঘন অবস্থায় স্থিতি করেন। তিনি প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন। প্রজ্ঞ বলিতে পরা প্রকৃতি, অপ্রজ্ঞ বলিতে অপরা প্রকৃতি বুঝায়। এই সকলের অতীত যাহা, তাহা তুরীয়। এই তুরীয় শব্দ সর্ব্বাতীত ব্রহ্মের জ্ঞাপক। প্রজ্ঞা ব্রহ্মের নিত্যস্বরূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা অব্যক্ত থাকে মাত্র। সৃষ্টির আরম্ভে "অহং ব্রহ্মাস্মি" "আমি ব্রহ্ম" কর্তৃত্ববাচক যে আমি, এইরূপে তিনি প্রকাশ পান। এই কর্তৃত্ব ব্রহ্মে নিত্য সিদ্ধ, এবং প্রাজ্ঞের যে আনন্দময়ত্ব তুরীয়ে তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ইহা চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহে, ইহার কোন লক্ষণ নাই, যাহা দ্বারা ইহাকে চিন্তার বিষয় করিতে পারা যায়; ইহা চিন্তার অবিষয় ও বাক্যের অগোচর। কিন্তু স্বপ্নজাগ্রদাদি সকল অবস্থার মধ্যে সেই একই আত্মা, এই যে প্রত্যয় নিরন্তর বিদ্যমান থাকে, সেই প্রত্যয়ই ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ; সুতরাং তিনি একাত্মপ্রত্যয়সার। পুনশ্চ রূপ-রসাদি বিষয়প্রপঞ্চ লইয়াই এই জগৎ—তাঁহাতে এই সকলের নিবৃত্তি হইয়াছে, তাই তিনি জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ-বর্জ্জিত। বিকার জগতের ধর্ম্ম। জগতের সঙ্গে সম্বন্ধবর্জ্জিত বলিয়া তিনি অবিকারী; সুতরাং শান্ত শিব ও অদ্বৈত। এই যে চতুর্থ, তিনি আত্মা এবং তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

৮। এই যে সমুদয় জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত আত্মা, সেই এই আত্মা ওঙ্কার।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে বলা হইয়াছে "ওমিতি ব্রহ্ম। ওঁ ইতি ইদং সর্ব্বম্।" মাণ্ডুক্য উপনিষদে ব্রহ্মের চতুষ্পাদের দ্বারা এই তত্ত্বটীই বিশদভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, এবং স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া আরোহণক্রমে যিনি সর্ব্বাতীত অব্যবহার্য্য অব্যপদেশ্য অচিন্ত্যপরং, তাঁহাতে আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে।

বৈশ্বানর—জাগ্রত অবস্থায় বহির্জ্জগৎ, তৈজস—স্বপ্নাবস্থায় মানস জগৎ, প্রাজ্ঞ—সুষুপ্ত্যবস্থায় স্বয়ং জীবের আনন্দানুভব। এই তিন অবস্থায় যে আত্মপ্রত্যয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইতে ব্রহ্মানুসন্ধান উপস্থিত হয়; এবং যথাক্রমে পরিশেষে এই অবস্থাত্রয়ের অতীত, যাহাকে তুরীয় বলা হইয়াছে, তাহা প্রকাশ পায়। প্রথমোক্ত তিন পর্য্যায়ে যে দর্শন, তাহা পরোক্ষদর্শন। তুরীয় সাক্ষাৎদর্শন।

বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও কৌষীতকি উপনিষদে এই তত্ত্বটীর ব্যাখ্যা আছে।

বৃহদারণ্যকের গল্পটী এই :—

বিদেহাধিপতি জনক যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া বলিলেন—;

হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমাকে উপদেশ দিন; যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্ আপনি দূরপথ গমনের ইচ্ছা করিলে যেমন রথ ও নৌকা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনি এই সকল উপনিষদ অবলম্বনে মুক্তাত্মা হইয়াছেন।

আপনি পূজাস্পদ, আপনি সমৃদ্ধ, আপনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, উপনিষদযোগে সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন। বলুন, এই দেহবিয়োগে আপনি কোথায় গমন করিবেন? জনক বলিলেন—আমি জানি না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন কোথায় যাইবেন, বলিতেছি—

"এই দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ বিদ্যমান, ইঁহার নাম ইন্ধ। এই সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ইন্ধকে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলা হয়। পরোক্ষ ভালবাসেন, প্রত্যক্ষ দ্বেষ করেন।

এই বাম চক্ষুতে সেই পুরুষ ইন্ধ বিরাজমান্। বিরাট্ ইঁহার পত্নী। এই হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ, সেই আকাশ এই দুইয়ের স্তবস্থান। এই হৃদয়ে যে রক্তপিণ্ড, ইহা এই দুইয়ের ভোজ্য। এই হৃদয়ের মধ্যে যাহা জালের মত আছে, উহা এই দুইয়ের আবরণ-বস্ত্র। এই হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধদিকে যে নাড়ী প্রসারিত হইয়াছে, এই নাড়ীই এই দুইয়ের সঞ্চরণপথ। একটী কেশের সহস্রভাগের একভাগ পরিমিত সূক্ষ্ম হিতা নামক নাড়ীগুলি হৃদয় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সকল নাড়ী দ্বারা সঞ্চরণশীল আহার্য্যসকল ইতস্ততঃ দেহে বিচরণ করে। সেই জন্য এই তৈজস আত্মা এই শারীরপুরুষ (বৈশ্বানর) অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আহারের ভোক্তা।

অক্ষিগত আত্মা বিশ্ব, হৃদগত আত্মা তৈজস, প্রাণগত আত্মা প্রাজ্ঞ। বিশ্ব তৈজস প্রাপ্তির পর প্রাজ্ঞসহ একীভূত সেই সাধকের পূর্ব্বদিক পূর্ব্ব প্রাণসমূহ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণপ্রাণসমূহ, পশ্চিম দিক্ পশ্চিম প্রাণসমূহ, উত্তর দিক্ উত্তর প্রাণসমূহ, ঊর্দ্ধদিক্ ঊর্দ্ধপ্রাণসমূহ, অধোদিক্ অধঃপ্রাণসমূহ, সকল দিক্ সকলপ্রাণসমূহ। সেই সর্ব্বাত্মা এই পর্য্যন্ত নন, এই পর্য্যন্ত নন। ইনি অগ্রাহ্য, এজন্য কাহারও দ্বারা গৃহীত হন না; অশীর্য,

এজন্য কাহারো কর্ত্তৃক বিভক্ত হন না; অসঙ্গ, সুতরাং কাহারও কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হন না। বন্ধনরহিত, এজন্য ব্যথিত হন না। ইহার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে জনক, তুমি অভয় প্রাপ্ত হইবে।

অক্ষিগত আত্মা বিশ্ব বাহ্য জগতের স্রষ্টা। প্রাণগত আত্মা প্রাজ্ঞ—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্য্যামী—দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর অন্তর্য্যামী। প্রাজ্ঞের প্রেরণা অনুভূতির বিষয় হয়। উত্তরদক্ষিণ পূর্ব্বপশ্চিম ঊর্দ্ধ-অধঃ দ্বারা প্রাজ্ঞের সর্ব্বদিগ্‌দেশব্যাপিত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু এখানেই তাঁহার সীমা হইল না। সেই সর্ব্বাত্মা এই পর্য্যন্ত নন এই পর্য্যন্ত নন। ইহাতে বলা হইতেছে, যাহা অদ্যাপি অব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতেও তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বাতীত তুরীয় বিজ্ঞাপিত হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রায়, সাধক যখন সর্ব্বগত ও সর্ব্বাতীত এই উভয়ের জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়—তখন তাহার অভয়প্রাপ্তি হয়।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতার প্রাচীন কাহিনী।

(১—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

১২৫৪ সাল :—ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভা।

(৪ জুন ১৮৪৭। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪)

গত ১ জুন মঙ্গলবার রাত্রে মেডিকেল কালেজের থিয়েটরে মৃত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নামের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ব্যূহের সাম্বৎসরিক নিয়মিত সভা হইয়াছিল, শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সভার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিলে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কারের ঘরের শিক্ষক শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মৃত মহাত্মা হেয়ার সাহেবের অসাধারণ বদান্যতা ও অন্যান্য মহদ্গুণ বিষয়ে বঙ্গভাষায় এক অত্যুত্তম রচনা পাঠ করেন, তাহা শ্রবণ করত সভাস্থ সকল লোকেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ সভাপতি শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অত্যন্ত সন্তোষপূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন যে তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাধারণের হিতজনক ও অবশ্য-কর্ত্তব্য বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, এবং তিনি সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলেন যে, কালেজের অন্যান্য বিদ্বান্ পণ্ডিত মহাশয়েরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হউন।

তদনন্তর শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পোষকতায় ধার্য্য হইল :যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পঠিত পত্র কমিটিতে প্রদান করিবেন, এবং কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহা মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক সাধারণকে দিবেন।

পরে রেবরেণ্ড সভাপতি মহাশয় পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করত বলিলেন যে সকলে বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন যে হেয়ার সাহেবের প্রাইজ কমিটির মূলধন হইতে একশত টাকা উদ্বর্ত্ত হওয়াতে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার উন্নতি জন্য এরূপ ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অল্পবয়সে বিবাহের ফল বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তম প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে ঐ টাকা পারিতোষিকরূপে প্রদান করা যাইবেক, এবং ঐ কমিটির মূলধন ক্রমে বৃদ্ধি হইলে তাহার উৎপন্ন হইতে পারিতোষিক দান দ্বারা বঙ্গভাষা রচনা বিষয়ে বিদ্যার্থিগণকে উৎসাহী করিবেন, রেবরেণ্ড মহাশয়ের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাস্থ মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, তদনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

কার ঠাকুর কোম্পানী।

(৪ এপ্রিল ১৮৪৮। ২০ চৈত্র ১২৫৪)

আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে মিস্তরার্স কার ঠাকুর কোম্পানীর অংশিগণ এক সরক্যুলর পত্র দ্বারা মহাজনদিগ্যে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত জানুয়ারি মাসে তাঁহারা চলিত কার্য্য রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজনদিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া পাওনা সকল পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেনা রাখিবেন না, কিন্তু গত ১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুরা হৌসের ঋণ প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাজনদিগ্যে আহ্বান করণে বাধ্য হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকালীন আমারদিগের বিশেষ দুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাকুর কোম্পানীরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা অতি সুনিয়মে বাণিজ্য কার্য্য করিতেন, অধুনা ঋণ পরিশোধ করণে অক্ষম হইলেন, ইহার পর অন্যান্য হৌসের ভাগ্যে কি হয় তাহা কিছুই বলা যায় না।

১২৫৫ সাল :—১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ।

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ।—

বৈশাখ :—এজুকেসন্ কৌন্সেলের অধ্যক্ষেরা হিন্দু-কালেজে সংগীত বিদ্যার অনুশীলন রহিত করেন।... ছাপা যন্ত্রের প্রধান উপকারী পরম কারুণিক দেশহিতৈষী বন্ধু ৺বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় ১৯ বৈশাখ শনিবার দিবসে বিসূচিকা রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

জ্যৈষ্ঠ :—কুমারহট্টের খাসবাটী পল্লীতে এক বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে।...কের্‌র সাহেবের নামে বিখ্যাত বিদ্যালয় নূতন বাটীতে স্থাপিত হয়।...ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটির ষষ্ঠদশ গণিত রিপোর্ট পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহাতে মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্যতার ভাবব্যাপার লিখিত হইয়াছে, যে বৎসর ঐ সোসাইটি স্থাপিত হয় সেই বৎসর উক্ত বাবু চাঁদার পুস্তকে ১০০ টাকা স্বাক্ষর করেন, পরে বার্ষিক ১০০ টাকা দান করেন, পরন্তু আবার এককালীন ২০০০ তঙ্কা দেন, তৎপরে ৫০০ টাকা এবং ১৮৩৮ সালে একেবারে লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করেন, তাহার বৃদ্ধি হইতে অনেক অক্ষম লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

পৌষ :—সদর আদালতের জজেরা খাসআপীল ঘটিত মোকদ্দমার উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সরদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন। পরন্তু রাজনারায়ণ দত্ত [মাইকেল মধুসূদনের পিতা] প্রভৃতি কয়েকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত করিলেন।

ছাতুবাবুর পুত্র গিরিশচন্দ্র দেব।

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

বাবু গিরিশচন্দ্র দেব।

আমরা গত ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার যামিনী যামার্দ্ধ সময়ে এক অমূল্য তুল্যরহিত বন্ধুরত্ন বিহীন হইয়াছি। এই প্রভাকর পত্রের প্রধান আনুকূল্যকারি বহুগুণধারী সিমুলিয়াবাসী বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের প্রিয় পুত্র বাবু গিরিশচন্দ্র দেব উক্ত দিবস সাংঘাতিক জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া এতন্নিখিল সংসার পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন।...তিনি আপন পিতৃব্য ও পিতার নিকটে প্রতিমাসে প্রচুরার্থ প্রাপ্ত হইতেন, তদ্ভিন্ন পরিবর্ত্ত কোম্পানীর হৌসে মুচ্ছদ্দির কর্ম্মে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তথাচ...তদ্ সৎকর্ম্মে তত্তাবৎ ব্যয় করত আবার ঋণী হইতেন।...

আমারদিগের মৃত বন্ধুর সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজের অধীনে কতিপয় বিপ্রনন্দন কাশীধামে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার দানে অনেক পাঠশালা ও সভা এবং প্রকাশ্য বিষয়ের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল, বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার যদ্রূপ যত্ন ছিল, তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণনা হইতে পারে না,...।

অন্তঃকরণে সতত্তই বোধ হয়, গিরিশবাবু অবনী পরিত্যাগ করেন নাই, যেন বেলগেছিয়ার মনোহর বাগানে অথবা পাণিহাটীর গঙ্গাতীরস্থ সুচারু নূতন উদ্যানে গমন করিয়াছেন এখনি আসিয়া আমারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।......

স্বর্গবাসী গুণরাশি ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের দুই পুত্র, প্রথম আশুতোষ তুল্য বাবু আশুতোষ দেব, দ্বিতীয় স্বধর্ম্ম তৎপর বাবু প্রমথনাথ দেব, উক্ত উভয় ভ্রাতার মধ্যে গিরিশবাবু একাকী কেবল দেব বাবুদিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী এবং বংশধর ছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মুদ্রার স্বত্বাধিকারী হইতেন। ... ... বাবু ২৪ বৎসর বয়সে অদৃশ্য হইলেন, এতৎ সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে প্রবীণের ন্যায় অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, ...। সংগীত বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল, তাঁহার মরণে ঐ বিদ্যা সহগামিনী হইয়াছে, অর্থাৎ কলিকাতার একেবারে তাহার পাঠ উঠিয়াছে, আমোদ উল্লাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। বাবু সেতার বাজনায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন, ...। তাঁহার সকল স্বরূপ গুণ লিখিয়া শেষ হইতে পারে না। তিনি প্রতিদিবস প্রাতে অনেকগুলিন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্রলোককে চারি আনা, আট আনা ও একটাকা দান করিতেন, আপন ব্যয়ে বাটীতে এক ঔষধালয় স্থাপন করিয়া সাধারণকে ঔষধ বিতরণ করিতেন, ...।

ধর্ম্মসভার ভগ্নদশা।

(১৩ মে ১৮৪৮। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

ধর্ম্মসভা তথা চন্দ্রিকা সম্পাদক। অবগতি হইল, গত রবিবার বৈকালে কলুটোলার ধর্ম্মসভার গৃহে ধর্ম্মসভার এক অতিরেক সভা হইয়াছিল, ঐ সভাতে আমারদিগের প্রধান সহযোগী চন্দ্রিকার অভিনব সম্পাদক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষণ সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, উক্ত বাবু পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হয়েন ইহা অস্মদাদির বিশেষ প্রার্থনা বটে, কিন্তু স্থিররূপে বিবেচনা

করিলে প্রকাশ্য পত্রের সম্পাদকদিগের ধর্ম্মঘটিত কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বদ্ধ হওয়া উচিত হয় না, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় অতি প্রকাশ্য তাহার সহিত গুরুতর সম্বন্ধ রাখা আরো অধিক দোষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষেরা সকল বিষয়েই স্বাধীন ও সকল বিষয়ের বিচারক স্বরূপ,... । আমারদিগের সহযোগী যখন ধর্ম্মসভার সম্পাদক হইলেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় এবং লেখনীকে যাবজ্জীবনের জন্য উক্ত সভার নিকট বিক্রীত করিতে হইল, তদ্বিষয়ে স্বাধীনরূপে আর স্বাভিমত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, ধর্ম্মসভার কার্য্যঘটিত রাশি রাশি দোষকে গোপন করিয়া বিপরীতার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক,... ।

ধর্ম্মসভা, এই শব্দ শুনিতে অতি উত্তম, কারণ ধর্ম্ম শব্দ অতিশয় জাঁকজমকে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার ভিতরের মর্ম্ম অন্বেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না, কেননা :এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট করিয়াছে, সতীরীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত যৎকালীন ঐ সভার সৃষ্টি হয়, তৎকালীন দেশের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, ধর্ম্মবিষয়ের গোলযোগে অনেকের মনে নানা প্রকার ভাবের আন্দোলন হয়, হিন্দুগণ ভিন্ন ভিন্ন দলাক্রান্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ কলহে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় সকলেরি আত্মপর হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়াছিল, সে সময়ে প্রতিযোগীপক্ষের উন্নতির উচ্ছেদ করণের মানসে অনেক ধনাঢ্য এবং দলপতিবর্গ পরস্পর স্থিরপ্রতিজ্ঞায় দলবদ্ধ করত একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা স্থাপিতা করেন, কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য ইচ্ছা, সত্যের কি নির্ম্মল প্রভিভা, দলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে অভিপ্রায়ে সভা করিয়া দেবানলে দগ্ধ হইলেন, সে ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, "ধর্ম্ম" আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাঁহারদিগের মর্ম্মভেদ ও শর্ম্মচ্ছেদ করিলেন, অর্থাৎ মৃত মহাত্মা লার্ড উইলিএম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আপীল করেন, সেই আপীলের মোকদ্দমায় পরাজয় হইলেন, চাঁদার দ্বারা যে প্রচুরার্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা, ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়, জলে ফেলিলে বরং ভুড়ভুড়ি কাটিত, তাহা না হইয়া কেবল ধর্ম্মসভার ব্যথায় ব্যথী ব্যথী সাহেবের উদরায় স্বাহা হইল, মূল আশা ভঙ্গ হইলে স্থূলবুদ্ধি সভ্যেরা আর কি করেন, কিছুই ভাবিয়া পান না, সভায় কাঁদুনি করিয়া ছাঁদুনী ও বাঁধুনী মাত্র সার হইল, মনসার কাঁদুনী কত গাহিবেন, পরিশেষে বড় বড় চাঁইমহাশয়েরা বুদ্ধির খেই হইতে এক দলাদলির সূত্র তুলিয়া বসিলেন, সেই দলাদলিতে কিছুদিন গলাগলি ভাব হইয়া পরিশেষ চলাচলি আরম্ভ হইল, তাহাতেই একেবারে সৎকার্য্যের সৎকার্য্য হইল, আর পূর্ব্ববৎ প্রণয়ের সন্ধি রহিল না, দলপতিরা দলচক্রে পড়িয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া বসিলেন, মহামতি সভাপতি সভার গৃহে এক হাড়িকাঠ দগ্ধ করিলেন, তাহাতে প্রতিদিন শত শত ব্রহ্মবলি হইতে লাগিল, "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" ধনীদিগের নিকট কোন কর্ম্ম উপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ বিদায় পাওয়া যাঁহারদিগের উপ-জীবিকা হইয়াছে, তাঁহারদিগের উপার্জ্জনের পথে কণ্টক পতিত হইল, যে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সেবক, সেই শূদ্রেরাই পরম পূজনীয় ভূদেবদিগের প্রায়শ্চিত্ত করাইতে লাগিলেন, তৎকালীন চন্দ্রিকা পত্রে এক একদিন দলঘটিত যে যে বিষয় প্রকটিত হইত তাহা পাঠ করিয়া আমরা হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইতাম। যথা।

"মহামহিম শ্রীযুত—ঃঃ—দেব,
দত্ত, রাজা বাহাদুর, দলপতি মহাশয়
ধার্ম্মিক বরেষু।

আমারদিগের এবাটীর সকলে শারীরিক ভাল আছেন, তাহাতে ভাবিত নহিবেন, যাতায়াতে তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক, গত পরশ্ব দিবসে আমারদিগের ওবাটীর বড় মহাশয়ের পিশের শালার মামার মেসোর দাদার খুড়ার জামায়ের ভেয়ের মামাশ্বশুর গঙ্গাস্নানে গমন কালীন সিংহ বাবুদিগের বাটীর সংলগ্ন এক পুরাতন প্রাচীরের একখানা পতিত পাটকেল স্পর্শ করিয়াছেন, অতএব সভার রীতিমতে তাঁহাকে দল হইতে পরিত্যাগ করা উচিত হয় ইত্যাদি"।

এই প্রকার লোকের গ্লানিজনক গ্লানিসূচক বিষয় দ্বারা কিছুদিন ধর্ম্মসভার কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল, পরিশেষ এক নীলকমলি হেঙ্গামা উঠাতেই একদিনে সমুদায় ধাই ফুটকাট হইয়া গেল, রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত, বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, বাবু দেবনারায়ণ দেব, এবং বাবু জয়নারায়ণ মিত্র প্রভৃতি দলপতি মহাশয়েরা একত্র হইয়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরকে পরিত্যাগ করত সিমুলায় স্বতন্ত্ররূপে এক ধর্ম্মসভা করিলেন, ঐ সময়ে দেব বাহাদুর একাকী কেবল স্বদল সহিত কলুটোলায় ধর্ম্মসভায় রহিলেন, অপর সকল দলপতি সংযোজিত রূপে নূতন সভার সভ্য হইলেন, কিন্তু চমৎকার দেখুন, তাঁহারদিগেরও সেই সংযোগ পরে মিথ্যা হইল, অর্থাৎ তাঁহারদিগের ঘরে ঘরে এমত বিচ্ছেদ হইল যে পরস্পর বাক্যালাপ রহিল না, যজ্ঞসূত্র গ্রহণাভিলাষী গুণরাশি কল্কি অভিমানী আন্দুলের রাজা বাহাদুর এক বিবাহ সূত্রে শিশুপালের ন্যায় সভ্রান্ত হইয়া সিমুলিয়ার সভা ত্যাগ করত নিজ গ্রামে এক কলসের ধর্ম্মসভা স্থাপিতা করিলেন, সেই

কমলের বুকে মধ্যে মধ্যে দুই একটা ফুল ফুটিয়া অমনি অমনি ঝরিয়া পড়ে, ফলের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় না, তদন্তর এক "একবারের" ঢেউ উঠিয়া বিবাদের জলের স্রোতে প্রায় সকল সংহার করিয়া বসিল, রাজপরিবারের সহিত দেব বাবুদিগের বিচ্ছেদ হইল, সেই বিচ্ছেদেই সভার উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হইবেক, কারণ রাজদলের সহিত ঘোষ বাবু এবং মিত্র বাবু প্রভৃতি কতিপয় দলপতি একত্র হইয়া সিংহ বাবুদিগের দলের সহিত মিলিত হইলেন, এইরূপে ঘরে ঘরে ধর্ম্মসভা যেমন রাজপুর অঞ্চলে বাটোয়ারার গঙ্গা, অর্থাৎ দত্তের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা, বসুর গঙ্গা ইত্যাদি, সেইরূপ অধুনা অমুকের ধর্ম্মসভা কমলার ধর্ম্মসভা বলিয়া পরিচয় হইয়াছে।

সত্যযুগে ধর্ম্মের চারি পদ ছিল, ত্রেতাযুগে এক পদ ভগ্ন হইয়া তিন পদ হয়, পরে দ্বাপরে আর এক পদ ভগ্ন হইয়া দুই পদ থাকে, এই কলিযুগে কেবল এক পদ মাত্র আছে, তাহাতে তাঁহার চলিবার শক্তি নাই, অতএব এসময়ে সেই এক ঠ্যাং ধরিয়া টানাটানি করাতে কেবল তাঁহার প্রাণে ক্লেশ দেওয়া হয়। আমারদিগের রাজকৃষ্ণ বাবু চন্দ্রিকার সম্পাদকত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ সোপানে উত্থিত হইয়াছেন, সুতরাং এখন দলাদলি চক্রে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না, কেননা ইহাতে স্বাধীনতাকে একেবারে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করা হইবেক, সংপ্রতি চন্দ্রিকা পত্রে উত্তম২ বিষয় সকল লিখিত হইতেছে কিন্তু ধর্ম্মসভার নিয়মে দলাদলি ঢুকিলে আর তদ্রূপ থাকিবেক না, পরে জাতিমারণ, হুঁকামারণ, মানহরণ, বিদূষণ, প্রতিজ্ঞারক্ষণ, গোবরভক্ষণ ইত্যাদি বিষয় দ্বারা এক একদিনের চন্দ্রিকা পূর্ণ করিতে হইবে, অধুনা ঐ সভা একদোলে সভা হইয়াছে, মধ্যে দেশহিতার্থী বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ের বদান্যতায় কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সংপ্রতি তিনি সে শ্রী হরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ আপন হস্তে টাকা লইয়া উপায়হীন ভদ্র পরিবারকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছেন, ইহাতে সভার শোভা আর কি রহিল, কেবল এক নামের অভিমান মাত্র রহিয়াছে, অতএব জিজ্ঞাসা করি এমত মিথ্যা অভিমানের কার্য্যশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্মে কলঙ্ক প্রদান করা কি উত্তম বিবেচনা হইতেছে?

জোড়াসাঁকোর সিংহপরিবার।

(১৭ মে ১৮৪৮। বুধবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

৺বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ।

আমরা অসীম খেদসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যোড়াসাঁকো নিবাসী ধনরাশি ধার্ম্মিকবর ৺বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় গত রবিবার বৈকালে শ্রীশ্রী৺ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীরে শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, নবকৃষ্ণ বাবু নবীন বাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন। জগদীশ্বর যে সকল মহদ্গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সমস্ত গুণ তাঁহার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছিল। নবকৃষ্ণ বাবু বৈষয়িক ব্যাপারে বিলিপ্ত হইয়াও সতত পণ্ডিত মণ্ডিত সভামধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালাপে সুখী হইতেন, সকল প্রকার বিদ্যায় ও ভাষায় তাঁহার বিশেষ সংস্কার ছিল,...। তিনি বিপক্ষদিগের বিপক্ষতা ও নিন্দাকে নিরতই ক্ষমা করিতেন, তাঁহার আস্য ক্ষণকালের জন্য হাস্যহীন হয় নাই, এবং অন্যের কোনরূপ ভঙ্গিমাদ্বারা কেহই ক্রোধের চিহ্ন দেখিতে পান নাই, মৃত মহাত্মা বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয় যৎকালীন রামকৃষ্ণপুরের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে বিবাহ করেন, তৎকালীন ধর্ম্মসভা সংক্রান্ত কলিকাতাস্থ এবং অপরাপর স্থানের দলপতি ও বহুৎ ধনশালি জনেরা সিংহ বাবুদিগের বিরুদ্ধে বিধিমতে বিপক্ষতা করণে সাধ্যের ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু নবীন বাবুর কি অসাধারণ বুদ্ধি, তিনি ঐ শৈল সম বিপক্ষকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া স্বীয় যুক্তি ও কৌশল শক্তিক্রমে উল্লেখিত বৃহৎ২ বিপক্ষদিগকে এককালীন হতগর্ব্ব করত সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হইয়াছিলেন।...

নবীন বাবু এতন্নগরের এক প্রাচীন ধনি পরিবারের অধ্যক্ষ ছিলেন,...অধুনা প্রার্থনা করি সদাত্মা বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় পরিবার সহিত দীর্ঘজীবি হইয়া বংশের নির্ম্মল সম্মান রক্ষা করুন।

বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসভা।

(২৫ জুলাই ১৮৪৮। ১১ শ্রাবণ ১২৫৫)

আমরা সংবাদপত্র দ্বারা অবগত হইয়া অতিশয় সন্তোষ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি মহারাজা মহাতপচন্দ্র বাহাদুর স্বীয় রাজধানী মধ্যে এক ব্রাহ্মসভা সংস্থাপন করিয়াছেন, প্রায় মাসাবধি হইল তাহার কার্য্য চলিতেছে, প্রতি রবিবারে অধীরাজ বাহাদুর আত্মীয়জনগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত সভারোহণ করিয়া থাকেন, এবং তথায় বহুলোকেরও সমাগম হয়, তত্ত্ববোধিনী সভার বিজ্ঞবর পণ্ডিত শ্রীযুত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় ঐ সভায় বেদ পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, ব্রাহ্ম বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী, তাঁহার দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার বিস্তর উপকার হইয়াছে, বর্দ্ধমানের রাজসভায় তাঁহার সংযোগ হওয়াতে আমারদিগের নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে যে অধীরাজ বাহাদুরের মনোগত অভিলাষ অবশ্য সিদ্ধ হইবেক, যাহা হউক এই

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা ও বেদের মর্ম্ম প্রচার নিমিত্ত সভা সকল অবাধে সংস্থাপিত হওয়াতে আমরা যেরূপ আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইতেছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না,... ।

ডেবিড হেয়ার পুরস্কার।

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। ৭ আশ্বিন ১৭৭০)

ডেবিড হেয়ার সাহেবের স্মরণীয় মূলধনের উপস্বত্ব হইতে কমিটির মেম্বর মহাশয়েরা পুনর্ব্বার ৭৫৲ টাকা ব্যয় করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে কোন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তম গ্রন্থ অর্থাৎ প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকেই উক্ত টাকা প্রদত্ত হইবেক, ঐ গ্রন্থ ইংরাজী ১৮৪৯ সালের ১ মে তারিখে কমিটির সেক্রেটারী বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের নিকট পাঠাইতে হইবেক, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার পরীক্ষা করিবেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

সিন্ধু ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!
যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে, সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!
যদি কোন দিন তোমার আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!

স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I I {ধা ধা। পধা -ণর্সা র্সা। র্সধা -র্সণা। পা -া ধা I মা পা। পা -ধা পা।
য দি এ০ ০০ আ মা০ ০ র ০ ০ হৃ দ য় ০, দু

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। মপা -ধপা। মজ্ঞা -া -া I সা -া। রা -া রা। রা -জ্ঞা। মা -পা মা I
য়া০ ০০ র ০ ০ ব ন্ ধ ০, র হে ০ গো ০, ক

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা -া। -মা -া -রা। -জ্ঞা -া। -সা -া -া} I {মা পা। মা -ধা ধা।
ভু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ দ্বা র ভে ০ ঙে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| ণা -া | পধা -া -া I ণা ধা | ণা -া র্সা | র্সধা র্সণা | পা -া -ধা}I
তু ০ মি০ ০ ০ এ স ঘো ০ র প্রা০ ০ ণে ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা পা | পা -া পা | পা -ধা | মপা -মণা -া I পা জ্ঞা | -া -া -রা |
ফি রি য়া ০ যে য়ো ০ না০ ০ ০ ০ প্র ভু ০ ০ ০

০ ১
| -জ্ঞা -া | -সরা -া -া II
০ ০ ০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {মা পা | না -া না | না -া | না -া -পা I না না | র্সা -া র্রা |
য দি কো ০ ন দি ০ ন ০ ০ এ বী ণা ০ র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| না -া | র্সা -া -ধা I ণা ণা | ধা -া ধা | ণা -া | পা -ধা -া I
তা ০ রে ০ ০ ভ ব প্রি ০ য় না ০ ম ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ণা -র্রা | র্সা -ণা ণা | ণধা -পধা | পা -া -ধা} I মা পা | পা -া পা |
না ০ হি ০, বং কা০ ০০ রে ০ ০ দ য়া ক ০ রে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| ণা -া | পা -া -ধা I মা পা | পা -না না | না -র্সা | র্সা -া -মা I
ত ০ বু ০ ০ র হি য়ো ০, দাঁ ড়া ০ রে ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা পা | পা -া পা | পা -ধা | মপা -মণা -া I পা জ্ঞা | -া -া -রা |
ফি রি য়া ০, যে য়ো ০ না০ ০ ০ ০ প্র ভু ০ ০ ০

০ ১
| -জ্ঞা -া | -সরা -া -া II
০ ০ ০০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
II সা সা | রা -া রা | রা -া | রা -া -জ্ঞা I মা মা | পা -া পা | পা -া |
য দি কো ০ ন দি ০ ন ০ ০ তো মা র ০, আ মা ০

১ ২´ ৩ ০ ১
| পধা -পধা -মা I মা -া | মা -া মগা | মা -া | পধা -মা -মা I
নে০ ০০ ০ স্ব প ভি ০, আ০ মা ০ য় ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I রা মা। রজ্ঞা -মপা পা। মরা -ঋজ্ঞা। রা -া -া I রা -া। রা -ধা ধা।
চে ত না • • •, মা মা• • নে • • ব • হ্ম •, যে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। ণা -াধ। পধা -া -া I ণা ধা। ণা -া র্সা। র্সধা -র্সণাধ। পা -া -ধা I
ম • নে• • • জা গা রো, • আ মা• • রে • •

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা পা। পা -া পা। পা -ধা। মপা -মগা -াধ I পা ঋজ্ঞা। -া -া -রা।
ফি রি রা •, যে যো • না• •• • প্র ভু • • •

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। -ঋজ্ঞা -াঋ। -সরা -া -া I {মা পা। না -া না। না -া। না -া -পা I
• • •• • • য দি কো • ন দি • ন • •

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I না না। র্সা -া র্রা। না -া। র্সা -া -ধা I ণা ণা। ধা -া ধা।
তো মা র •, আ স • নে • • আ র কা • হা

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। ণা -াধ। পা -ধা -া I ণা ধা। ণা -র্রা র্সা। র্সধা -র্সণাধ। পা -া -ধা } I
রে • ও • • ব সা ই •, ব ন্ড• • নে • •

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I মা পা। পা -া পা। ণা -াধ। পা -া -ধা I মা পা। পা -না না।
চি র দি • ন সে • র • • হে, রা জা •, আ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। না র্সা। র্সা -া -মা I মা পা। পা -া পা। পা -ধা। মপা -মগা -াধ I
মা • র • • ফি রি রা •, যে যো • না• • • •

২´ ৩ ০ ১
I পা ঋজ্ঞা। -া -া -রা। -ঋজ্ঞা -াঋ। -সরা -া -া II II
প্র ভু • • • • • •• • •

THE

BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(5)

48. The first whole-day Brahmotsava at Keshub's house—1867 A.D. November (1789 *Saka*, Agrahayana.)

About this time was celebrated for the first time the Brahma festival known by the name of Brahmotsava, literally meaning—"Rejoicing in the Lord." It took place about the end of November 1867 (Agrahayana, 1789 Saka) at Keshub Chundor's house. The following account of it is given in the *Indian Mirror* of the 1st July 1868, by P. C. Mozoomdar, in an article entitled "The Origin and advantages of the Brahmotsava":—"These special festivals usually commence at sunrise and last till late at night, and comprise, besides regular morning and evening services, intermediate ones for meditation, singing of hymns, the reading of religious texts, and conversation on spicial religious difficulties. Those Brahmas who desire to know what it is to *see* and *feel* God (we speak with the humble reverence of sinners) should come and attend one of the Brahmotsavas. The humility, the hope, the prayerfulness, reverence, love, faith and joy that flow in celestial currents at such times catch men's souls by a kind of holy contagion."

49. Introduction of *Nagar Sankirtan*—January 1870 A. D.

Miss Collet, in her sketch of the *Samaj*, gives a fuller description of this interesting festival, which we also append, as it may help to give a better idea of the devotional enthusiasm of Keshub's party. "The grace of the Heavenly Father, for which they had so long waited and watched, cried and contended, was now near at hand. Very dimly and vaguely at first, more distinctly and definitely afterwards, this was understood, continued and sincere repentance, heartfelt dependance, fervent supplication, constant and devout meditation, fastings and vigils followed. From weekly meetings daily meetings of devotion were held, songs expressive of the most lowly humility, most vivid faith and dependance, were sung in choral rapture, giving rise to that new hymnal service of the Brahmas called by the name of Brahma Sankirtan. Now for the first time in connection with the *Brahma Samaj* was witnessed the rare spectacle of sinful men, bitterly conscious of their sins, praying and listening with living sincerity for their soul's salvation. Could such prayers and precepts fail? New strength, new hopes and joys, new harmony and light were obtaind from their new method of spiritual exercise. The past was greatly explained, the present was received with thanks-giving, the future was anticipated. With gratitude and lowliness of spirit did they rejoice, constantly praying all day without food and drink, singing their merciful Father's praise. And those who bitterly wept erewhile, who were so full of darkness, unholiness and untruths that hope had nearly left their hearts; if such forlorn sinners find the direct dispensation of God to give them salvation and peace, have they not cause for grateful rejoicing? Thus originated the Brahmotsava, the festival of the Brahmas. In the last few anniversary festivals, large bodies of Brahmas have gone out, threading the streets and lanes of the native quarter of Calcutta, singing missionary hymns to win their Hindu countrymen to the service of the one true God. This practice was first begun in January 1870 at the earnest instigation of Keshub Chunder Sen, who, after preaching a stirring sermon on the subject, headed the band of singers the same day."*

50. *Bhakti movement.*

The first noteworthy phase in the religious development of the *Samaj* of

* It should be mentioned here that street singing did not originate from Keshub Chunder. It originated with Chaitanya, the celebrated Vaishnava reformer of Bengal more then 300 years ago, and is still practised daily in the streets throughout Bengal by mendicants of that order, as also in their Nagar Kirtans.

India was what has been called the *Bhakti* movement. When Keshub and his followers abandoned the *Samaj* in 1863, they had but few prospects. On the one hand they had removed their church; on the other hand they were repulsed by their relatives and friends; difficulties and persecutions beset them on every side. In this state of distress they put their trust in the goodness of God to deliver them out of their troubles. This is what is meant by the term *bhakti*, which may be translated Divine love, loving faith in God, fervent devotion, and so forth, a doctrine somewhat similar to that preached in the New Testament.

51. Three Phases of the movement—Prayer, Sankirtan and Brahmotsava.

This internal faith of the new Brahmas developed itself successively with three outward forms of devotion. The first was prayer, the efficacy of which is thus described by Miss Collet: "Through the medium of prayer, through heartfelt communion with God, the spirits of these troubled and anxious men gained new life and strength, and this communion grew and developed so as to tansform the whole tone of their minds, and to elevate and enlarge the character of Brahmaism in a remarkable manner." The second was Sankirtan, or the use of songs of a religious nature, expressive of the most lowly humility, most vivid faith and dependance, which were rapturously sung in chorus, and gave rise to the introduction ever afterwards of a hymnal service. The third was *Brahmotsava*, which has already been described.

52. *Bhakti and Rationality.*

In considering whether the *bhakti* movement and its developements are consequences of Brahmaism, we find on examination that *bhakti* or blind faith is a doctrine quite unknown in the *jnan kanda*, or, rationalistic doctrines of the Vedanta. It is an element of the Vaishnava religion, and was first preached by Krishna to Arjuna, in order to convert him to a blind belief in his divinity. It was then revived in the beginning of the sixteenth century by Chaitanya, a pseudo prophet, at Nuddea, in Bengal, to impress on the minds of his followers a belief in his divinity.

53. The movement borrowed from Vaishnavism.

The doctrine of *bhakti* is contradistinguished from that of *jnana*, knowledge or rationality, treated of in Hindu philosophy as the only way to truth and to God. But *bhakti* or faith includes an assent which we give to a proposition advanced by another, the truth of which we do not perceive from our own reason and experience. It includes a judgment or rather an assent of the mind which is not so much prompted by intrinsic evidence as the authority or testimony of some other who reveals or relates it. The Bengali reformer maintained the pre-eminence of faith over *jnana*, knowledge, and *sraddha*, or veneration, over rational belief. He taught that all men are capable of participating in the sentiments of faith without knowledge or act of piety. His faith had developed itself into five forms, such as *Sakhya*, *Madhura*, &c., which we need not dwell upon here. He preached his new doctrines in the streets and villages of Nuddea, accompanied with *Sankirtans*, which gave the idea of walking through the streets of Calcutta singing to Keshub and his followers. The words faith, prayer, *Sankirtan* and *brahmotsava*, now in use among Keshub's followers, are evidently borrowed from the *bhakti*, *bhajan*, *sankirtan* and *mahotsava* of the Vashnavas of lower Bengal, and, far form being preached by Brahmas of ancient times, are utterly unknown to the people in every other province of India.

54. *Faith vs. Reason.*

Faith is defined by Coleridge to be the fidelity, the fealty of the finite will and understanding to reason. Faith is but another word for trust and confidence. Rationality is more necessary for the well-being of man than mere faith. For, says the truly catholic Brahma, "without knowledge religion is apt to degenerate into a blind, irrational and unregulated faith. It does in that case degenerate into fanaticism

on the one hand and superstition on the other. We owe the correct notions of the God-head, which form one of the chief glories of Brahma-dharma in contradistinction to other religions, to *jnana*, or knowledge, and it is ingratitude to represent it as totally harsh and dry. As flesh and blood only without bones cannot form a human body, so faith only, unaccompanied by knowledge, cannot form a true Brahmic state of the mind. We must show reasons for our faith when called upon to do so, and it requires knowledge to do so properly."*

55. Aim of the Adi Samaj—*Harmonising Jnan with Bhakti.*

In the beginning of the Brahma movement at the time of Raja Ram Mohun Roy sole stress was laid upon *jnana*, as there now is a tendency to lay too much stress upon *bhakti* or blind faith. Raja Ram Mohun Roy, in his "Tuhfat-ul-Muahhidin," protests against the *Momenin* or faithful, a title which Mussalmans assume to themselves for their *iman*, or blind faith in the *ipse dixit* of their prophets without sufficient *shahadat* or testimony or evidence. Granting, however, the necessity of faith as opening the fountains of pious feelings in our hearts, we should yet, says the *Adi Brahma*, remember that "Brahma dharma requires a harmonious combination of the two. Even purely secular knowledge should not be despised, considering its intimate connections with, and bearings upon, religion."†

56. Prayer as in the Hindu Sastras stretched to its utmost limit by Keshub Chander under influence of Christianity.

Let us now take into consideration the doctrine of prayer, the first result of faith, which we find from the beginning to be the sole hope and support of Keshub Chunder and his party. The word prayer (*prarthana*), is almost unknown in Hindu devotion, and its uselessness is derived by many Hindu philosophers and some Brahmas from the grounds of the immutability of divine decrees and the omniscience of God. Hindu devotion (*aradhana*) among the Brahmas of ancient India consisted of *jnana*, knowledge, *dhyana*, meditation, *bhajan*, adoration, *sadhyaya*, service, *bandana*, praise, *japs*, doxologies, *tap*, austerities, and some other ceremonies. Prayer however must be acknowledged to have been in use from the earliest times, both among *karmis* and *jnanis*, as we find in the Rigveda hymns and Upanishads, though it is not mentioned by name in Hindu liturgies, and was adopted by the new school of Brahmas that sprung up immediately after the death of Raja Ram Mohun Roy. Keshub has, however, under the influence of Christian ideas stretched the doctrine of prayer to its utmost length supplicating the deity not only for his aid in the paths of spiritual advancement, but for the expression of his will in the most trivial concerns of life, and for the attainment of success therein.

57. *Keshub-worship.*

We have now to consider another movement, which was no doubt a further development of the *Bhakti* movement. We allude to Keshub-worship or personal adoration of Keshub as a new deity or incarnation.

58. How far Keshub responsible for this ?

This subject has attracted, as well it may, universal attention, and opinions are very evenly balanced as to the culpability or innocence of Keshub Chunder in allowing so base a form of idolatry to be practised by his followers. At the time of its perpetration, so universal was the indignation against Keshub that it threatened to overthrow all his schemes for the reformation of his countrymen. The few histories which exist on the *Brahma Samaj* are not unanimous in their opinions on the subject. Miss Collet disposes of this important point in a few words, by expressing her opinion that it was an "unfounded calumny" and a "worn-out absurdity," and required no further elucidation. She further states that

* See Brahmic Questions of the Day.
† See Do Do

Keshub Chunder frequently expressed his disapproval and dislike of the practice of personal adoration of himself by his followers.

This statement is, however, distinctly contradicted in *Brahma Dharmer Uchcha Adarsa*, giving a detail of Keshub's conduct in this affair, where it is mentioned that Keshub tamely received these honors from a party at Moughyr on his return from Simla to Calcutta, without preventing or putting a stop to the practice, which led the people to believe that he was anxious to aspire to the honor of an incarnation. The *Itivritta* has treated the subject at great length, and has set forth the accusations made against Keshub, but has exculpated him from all blame.

There can be no denying that such a practice, as "personal adoration of and prostration before Keshub" was in vogue among certain of the followers of the *Samaj* of India. But the cardinal point at issue is whether Keshub Chunder objected to the idolatrous practice, and exerted his authority as leader and Secretary to the *Samaj* of India to put an immediate stop to it? Let us briefly investigate the question.

হিন্দুসমাজসম্মিলন।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)

গত ৩০শে মাঘ ও ১লা ফাল্গুন শনি ও রবিবার হিন্দুসমাজসম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন এবার ক্যানিং টাউনে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সম্মিলনে যোগদানের জন্য আহূত হইয়া আদিব্রাহ্মসমাজ ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্র-কুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি, বার-এট-ল এবং পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্যানিং কলিকাতা হইতে ২৯ মাইল দক্ষিণে সুবিস্তৃত মাতলা নদীর তীরে ই, বি, রেলপথের দক্ষিণ বিভাগের অন্যতম শাখা লাইনের শেষ ষ্টেশন। ইহা "পোর্ট ক্যানীং ল্যাণ্ড একুইজিসন কোম্পানী"র সুবিস্তৃত জমীদারীর সদর বিভাগ। এখানে তাঁহাদের দ্বিতল আফিস ও কুঠী বাড়ী প্রভৃতি অবস্থিত। ইহা ব্যতীত চারিধারে ধানজমির মাঠ ভিন্ন অন্য লোকের বসতি বড় নাই। এখানে একমাত্র ধান্য ব্যতীত অপর কোন দ্রব্য জন্মে না। সুতারং কলিকাতা ও সোনারপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ আমদানী করিতে হয়। প্রায় ৭০ বৎসর হইতে চলিল উক্ত কোম্পানী সুন্দরবন অঞ্চলের জমি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাট্টা লইয়া উহা ভেড়ী বাঁধাদির দ্বারা সুরক্ষিত করতঃ জঙ্গল কাটাইয়া প্রজা বসবাস করাইয়া আসিতেছেন।

এই প্রজাসকল প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণী হইতে পরিপুষ্ট। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্থে ও বিদ্যায় উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদেরই অন্যতম বয়োবৃদ্ধ রায় শ্রীধরণীধর সর্দ্দার মহাশয়ের যত্নে ও আনুকূল্যে ক্যানিংএর বারোয়ারীতলায় হিন্দুসমাজ-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ৩০শে মাঘ শনিবার বেলা দ্বাদশ ঘটিকার সময় ক্যানিং ষ্টেশন হইতে সভাপতি উদারভাবাপন্ন ময়মনসিংহের মহারাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর মহোদয়কে বরণ ও পুষ্পাভরণ-ভূষিত করিয়া মঙ্গল শঙ্খধ্বনি ও আনন্দসহকারে শোভা-যাত্রা পূর্ব্বক আমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর গোলকুঠী নামে প্রসিদ্ধ বৃহৎ দ্বিতল প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

বেলা চারি ঘটিকায় সম্মিলনের অধিবেশন প্রধান মণ্ডপ বারোয়ারীতলায় আরব্ধ হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আলাপ ও আলোচনা দ্বারা পরস্পরের ভাববিনিময় ও পরিচয়-লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে স্পষ্টই অনুভূত হইয়াছিল যে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার পন্থানুসরণ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি হিন্দুসমাজের যে কল্যাণজনক সংস্কার-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই সেই কর্ম্মভার হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় আপন আপন স্কন্ধে বহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

উপাসনামণ্ডপে সভারম্ভের পূর্ব্বে যে সার্ব্বজনীন ভগবদুপাসনা হইয়াছিল, উহার স্তোত্র মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে গৃহীত হইলেও আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-পদ্ধতিরই যে অনুসরণ, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা স্বামী সত্যানন্দ ও তাঁহার সহকারীগণকে ইঙ্গিত করিতে চাই যে, উক্ত "নমস্তে সতে তে" স্তোত্রের সহিত আদিব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে যজুর্ব্বেদ হইতে গৃহীত "ওঁ পিতা নাহসি" এই সহজ অর্চ্চনামন্ত্রটীও ব্যবহৃত হইলে অধিকতর মনোগ্রাহী হইত মনে হয়।

সুপ্রাচীন হিন্দুসমাজ সেই আদিকালে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠিত হইয়া-

ছিল। আজ সেই ভিত্তি ভগ্ন হইলেও এখনও উহার কাঠামো খাড়া রহিয়াছে। ইহা যে কিরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতি নিজ নিজ সমাজমধ্যে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ এবংবিধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা সহজেই দৃষ্ট হইতে পারে। ইহা মানব-সমাজমাত্রেরই প্রকৃতিসিদ্ধ। যে গুণকর্ম্মের বৈচিত্র্যের ফলে সমাজমধ্যে উচ্চনীচ শ্রেণীভেদ অবশ্যম্ভাবী, তাহা কখনও অমঙ্গলজনক হইতে পারে না। হিন্দুসমাজে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহাদিগকে উচ্চে উঠাইয়া লওয়া ঋষিপ্রদিষ্ট অনুশাসনের অনুগত এবং তাহাই সমীচীন মার্গ। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য-মহোদয়ও জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুসাধারণকে বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এবং তাহাদিগকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের পথে অগ্রসর হইবার উপদেশ দিয়া শ্রেয়স্কর পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ এই বিষয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কতদূর সুসঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। আমরা যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, বর্ত্তমানে অবলম্বিত পদ্ধতি কেবল বাহ্যিক বিষয় লইয়াই অনুসৃত হইতেছে, উহাতে গুণকর্ম্মের উৎকর্ষসাধনের প্রতি বিশেষ কোনই দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানে জন্মগত হিসাবে যাহারা উচ্চ জাতি বলিয়া গৃহীত হন, তাঁহাদের মধ্যে গুণকর্ম্মের যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। সেই সকল জাতি যদি আপনাদের অধিকৃত উচ্চ আসন সংরক্ষিত দেখিতে চান, তবে তাঁহাদেরও নিজেদের মধ্যে গুণকর্ম্মের উন্নতি-সাধন অপরিহার্য্য।

কেবল বাহ্যিক আকারে প্রকারে সমাজসংস্কারের চেষ্টা করিলে বোধ হয়, স্থায়ী সুফল পাইবার সম্ভাবনা অল্প। অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না, অন্ততঃ এই ভারতভূমিতে সমাজসংস্কারকে বেদ-বেদান্তপ্রতিপাদ্য উদারতম ও অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড় করাইতে পারিলে তবেই উহা স্থায়ী সুফল লাভ করিতে পারে। নতুবা কেবল বাহ্যিক সমাজসংস্কারের প্রতি ঝোঁক দিলে সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও বিরোধ-বিবাদের আধিক্যের সম্ভাবনা, ইহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

বঙ্গদেশে ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্ব্বে সমাজসংস্কারের যে বীজ প্রোথিত করিয়াছিলেন, হিন্দুমিশনের শুদ্ধি-পদ্ধতি, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন প্রভৃতি কার্য্যে তাহাই বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হইতেছে দেখিতেছি। ইহা ব্যতীত শুদ্ধির বিস্তৃতি ও প্রসারের ফলে Hindu cultureএর বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ অবশ্যম্ভাবী এই কারণে হিন্দু মিশনের কার্য্যের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাদের দ্বারা এই প্রকারে সমাজসংস্কার সাধিত হইতে থাকিলে পরিণামে ইহা ধর্ম্মের ভিত্তির উপর না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না—কারণ আমরা হিন্দু এবং আমাদের প্রাণ ধর্ম্মগত।

ভেদ ও অভেদবুদ্ধি।*

(স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি)

[আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সাধুসন্ন্যাসী মহলেও সমাদৃত হইতেছে। লেখক পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী ভোলানন্দ গিরির অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগের মনোভাব কতকটা বুঝা যাইবে, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রবন্ধ আমরা সাদরে পত্রস্থ করিলাম। বলা বাহুল্য যে, আমরা প্রবন্ধের সহিত সর্ব্বত্র একমত হইতে পারি নাই। লেখক গীতোক্ত সমত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার যে ত্রিগুণাতীত ভাব লইতে চাহেন তাহা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। তিনি গীতা হইতে এবিষয়ে যে ২১টী স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ অর্থে অর্থাৎ চঞ্চল চিত্তকে সংযত করিয়া স্থৈর্য্যের উপর দাঁড় করাইবার অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। আমাদের মতে সীমাবদ্ধ হইবার কারণে মানবসন্তান যতই কেন উন্নত হউন না, কিছুতেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অতীত ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে পারেন না। যদি বা কেহ পারেন, তাহাও সোনার পাথর বাটীর ন্যায় আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বুদ্ধিভেদের অকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন বোধ হয় না। তাহা যদি হইত, তবে বিক্ষুব্ধচিত্ত কর্ম্মসঙ্গী অর্জ্জুনের বুদ্ধিভেদ ও অম্লান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছিল, বলা যায় না। অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ অকর্ত্তব্য স্বীকার করিলে জগতের উন্নতি সাধন অসম্ভব হইবে। প্রবন্ধপাঠে আমাদের প্রাণে যে দুই একটী কথা উঠিল তাহা সরল-চিত্তে প্রকাশ করিলাম বলিয়া আশা করি, স্বামীজী কোন ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।] তঃ সং

আজকাল ভেদ বিদূরিত করিবার যে ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে কয়টী কথা মনে উদিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। এ বিষয়ে সুধীগণ প্রকৃত সত্য নির্ণয়ার্থ স্ব-স্ব চিন্তাশক্তি নিয়োজিত করিলে সুখের হইবে।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তিনগুণের বৈষম্যে সৃষ্টি এবং সমতায় অব্যক্তাবস্থা সাংখ্যাদি-দর্শনসম্মত। ঋগ্বেদেও দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে নাসদাসীৎ ইত্যাদি মন্ত্রে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে তম বা প্রকৃতি-

---

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী। তঃ সং

সমাগমে বিরাট পুরুষের সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। একের সহিত তমের সংস্পর্শে যেমন বৈষম্যের সৃষ্টি ঘটে, তেমনি প্রকৃতির বিকার-জন্য মহদাদির উৎপত্তিতে বৈষম্যই ঘটে।

বর্ত্তমান যুগে একই ইলেকট্রনের কাঁপ, চাপ ও তাপের বৈষম্যে হীরা কয়লা সুবর্ণ রজতাদি ভাবোৎপত্তিও বৈষম্য বা ভেদসঞ্জাত। এ হেন অঘটন-ঘটনপটীয়সী প্রবলপ্রতাপশালিনী প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া সমতার আলাপন আলাপনমাত্রেই পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে এতই বৈষম্য যে, তাহা ধারণা করা সহজসাধ্য নহে। বৃক্ষ, লতা, ধাতু, অধাতু, সূক্ষ্ম অন্তঃকরণ-বৃত্তি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার সর্ব্বত্রই বৈষম্য। সকলের বৃত্তিভেদ থাকিতে অভেদ বা সাম্য-প্রচার একদা অসম্ভব। তাই সব সমাজে মিশনরী, মিলিটরী, মার্চ্চেণ্ট ও লেবার শ্রেণী পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষার তারতম্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। স্বল্পবুদ্ধিগণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবেই। পরিচালক ও পরিচালিতের ভেদ অনিবার্য্য। তমোবহুল কুম্ভকর্ণ, রজোবহুল রাবণ হইতে পারে না। তেমনি রাবণ সত্ত্ব-প্রধান বিভীষণ হইতে পারে না। তাহাদের খাদ্যাদিতে এবং আচারব্যবহারেও পার্থক্য থাকিতে বাধ্য। রাবণের মদ্যাদি খাদ্য সত্ত্বগুণাবলম্বীর খাদ্য হইতে পারে না।

দ্রব্যগুণের ক্রিয়া দেহাদিতে প্রকাশ পাইবেই। তাই সত্ত্বগুণের বিকাশ জন্য যিনি প্রস্তুত হইবেন, রজ-স্তমোগুণান্বিতের সংস্রব তাঁহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। রজস্তমোগুণীর আহার্য্য, আচার ও ব্যবহার ত্যাগ না করিয়া সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধি করিতে যিনি প্রয়াসী হইবেন, তাঁহার সে প্রয়াস যে ব্যর্থ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। তবে যিনি সত্ত্বগুণ লাভানন্তর আরও সাধনপথে অগ্রসর হন, তিনি ত্রিগুণাতীতে তমর পরপারে বা ত্রিফলা-ধারিণী প্রকৃতির শিরে দাঁড়াইয়া সমতার বংশীবাদন করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

যতক্ষণ সমাজসংসার, ততক্ষণ ত্রিগুণাধীন—ভেদবর্জ্জন কথার কথা। যখন ত্রিগুণাতীতে তখন অভেদই অভেদ। স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদত্রয়ের সেখানে স্থান নাই। "সমত্বং যোগ উচ্যতে" "সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে" "শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" এই সমাজসংসারে ভেদবর্জ্জনের অসম্ভবতা অবলোকনেই ভগবান "ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" ইত্যাদি বলিয়াছেন। গুণভেদে বুদ্ধিভেদ, বুদ্ধিভেদে কর্ম্মভেদ, কর্ম্মভেদে আচার-ব্যবহার ভেদ হইয়া জাতিবর্ণভেদের সৃষ্টি করে। এজন্য সমতার প্রচারের পূর্ব্বে প্রচারক স্বয়ং ত্রিগুণাতীত সাম্যে স্থিতবান হইবেন। "আপনি আচরি কর্ম্ম জীবেরে শিখায়" বাক্য প্রতিপালন করিলে কথঞ্চিৎ মঙ্গল হইলে হইতে পারে। সমবুদ্ধি চিত্তে জাগান ও সমত্বমূলক আচার ব্যবহারে সর্ব্বত্র একাকার জন্য প্রচেষ্টা করা সমীচীন কিনা, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত শিক্ষা।

শিক্ষা মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে কতকগুলি শক্তি নিহিত থাকে। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার কতকটা অভিব্যক্তি বা স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষকে যদি বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সেই অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি সম্যক্ ভাবে বিকশিত করিয়া তোলা সম্ভবে না। বাল্যকালই শিক্ষার উপযুক্ত সময়। বালক যখন বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার কোন্ দিকে ঝোঁক অধিক, তাহা বেশ বুঝা যায়। যাঁহারা শিক্ষা বিভাগে মনোযোগের সহিত কাজ করিতেছেন, তাঁহা-রাই অবগত আছেন যে, শৈশবে ছাত্রদিগের এই মনের ঝোঁক বেশ ধরা পড়ে।

একই সমাজের ব্যক্তিভেদে যেমন তাহার শক্তির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ একই মানব-জাতির অন্তর্নিহিত জাতিভেদে সেইরূপ প্রকৃতির তারতম্য লক্ষিত হয়। য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখ—দেখিতে পাইবে যে, জাতি হিসাবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতিগত তারতম্য অত্যন্ত অধিক। সহসা আমরা তাহা ধরিতে পারি না সত্য,—কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে উহা লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজে ধরা পড়ে। একজন জার্ম্মাণের, একজন ফরাসীর এবং একজন ইংরাজের জাতিগত চরিত্রের পার্থক্য যে অনেক আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার এবং সামাজিক ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যকে পরিহার করিয়া চলা সম্ভবে না। শিক্ষার ব্যবস্থাতেও এই জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা যদি করা না হয়,—অন্যের অনুকরণে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজাতীয় ভাবে পরিকল্পিত হয়,—তাহা হইলে সেই শিক্ষার ফলে এক একটা জাতির যে জাতীয়তা নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহা-দের প্রতিভা মনীষা প্রভৃতি লোপ পায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য লঙ্ঘন করিয়া যে শিক্ষার ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে বিজাতীয় শিক্ষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জাতিগত মেজাজ বা ধাতুপ্রকৃতি (Temperament) যে কৌলিক অবদানপরম্পরার এবং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শক্তির বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে, প্রত্যেক জাতির পূর্ব্বজগণের অবদান-পরম্পরা তাহাদের প্রকৃতিতে যে ভাব অত্যন্ত গভীর-ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহা সহজে মুছিয়া ফেলা যায় না। উহা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। যে জাতি যত অধিক দিন কোন একটা বিশিষ্ট সভ্যতার ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া আসিতেছে, সেই জাতি ততই একটা জাতীয়-ভাবে গঠিত হইয়া উঠে। তাহার জাতীয়তার ছাপ তাহার চরিত্রে বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য তাহাদের অতীত অবদানপরম্পরা জানা তাহাদের

পক্ষে অতিশয় আবশ্যক। একজন গভীর চিন্তাশীল ইংরাজ দার্শনিক লিখিয়াছেন—

The problem of heridity is that on which medical and social work must alike rest. An examination of this subject shows that the individual cannot be modified by this environment, and therefore the all-important question to consider is the national power of the individual, and to determine what relation the environment has to the type or types existing under it. Temperament is, therefore, the fundamental basis of the sociologist.

অতএব ব্যক্তিগত স্বাভাবিক শক্তির এবং নৈসর্গিক আবেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত মানবমণ্ডলীর সহিত সেই নৈসর্গিক আবেষ্টনের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক অবধারণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অতএব মেজাজ (জাতীয় ও ব্যক্তিগত) সমাজবিজ্ঞানবাদীর কার্য্যের মূলভিত্তি।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অতীত সাধনার যে শক্তি বীজাকারে আমাদের ধাতুপ্রকৃতিতে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাই আমাদের কৌলিকতা। উহা আমাদের স্কন্ধে এরূপভাবে ভর করিয়া আছে যে, আমরা ইচ্ছা করিলেও উহা আমাদের স্কন্ধ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব না। আজকাল কেহ কেহ অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে চাহেন। সেই অতীতে যে আমাদের অস্তিত্বের মূল নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না।

আমাদের অতীত ভাষা সংস্কৃত। ভারতে যত ভাষা আছে,—তাহার প্রায় সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষাতেই আমাদের অতীত পুরুষপরম্পরায় অবদানপরম্পরা এবং কীর্ত্তিকলাপ লিখিত আছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয় জানিতে হইলে তাহা সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই জানিতে হইবে। অন্যথা তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই। এমন কি তাঁহারা যেখানে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন,—সেখানেই বা কি ভাবে তাঁহাদের সেই প্রমাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও আমাদের জানা উচিত। সংস্কৃত ভাষাই আমাদের সেই অতীতের সহিত পরিচিত করিবার একমাত্র সম্বল। সুতরাং আমাদের সেই ভাষার সহিত পরিচিত হইবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাদের এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সংস্কৃত ভাষাকে তাঁহাদের পাঠ্যতালিকা হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা আপাততঃ ঐ ভাষা শিক্ষাকে ছাত্রদিগের ইচ্ছাধীন করিয়া দিয়াছেন (?) ইংরাজ জাতি তাঁহাদের শিক্ষাতালিকা হইতে ল্যাটিন বা গ্রীকভাষা বাদ দিতে পারেন,—কারণ, তাহা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের ভাষা নহে। ইংরাজ রোমক বা গ্রীকদিগের বংশধর নহেন। তাঁহাদের কৌলিক অবদান ল্যাটিন বা গ্রীকভাষায় লিপিবদ্ধ নাই। সুতরাং তাঁহারা সেই প্রাচীন ভাষা অনায়াসেই বর্জ্জন করিতে পারেন। অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষাকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ভাষা বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের অতি প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালার যে সম্বন্ধ, অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষার সহিত তাঁহাদের ইংরাজী ভাষার সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। সুতরাং ইংরাজ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা স্বেচ্ছাধীন করিতেছেন বলিয়া আমাদিগকেও যে তাহা করিতে হইবে, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে।*

শোকসংবাদ।

রায়বাহাদুর ৺মনোরঞ্জন মল্লিক।—

ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র রায় বাহাদুর ৺মনোরঞ্জন মল্লিক মহাশয় গত ২০শে মাঘ বুধবার মধ্যাহ্নে তাঁহার ভবানীপুরের বাসভবনে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে বার্দ্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। "কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রিবিউনালের" প্রারম্ভ হইতে তিনি উহার সরকারপক্ষের উকিলের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আমৃত্যু বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া প্রভূত যশ ও অর্থলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও সদালাপী ছিলেন। দুই বৎসর গত হইল, আমরা আমাদের পরম বন্ধু শিতিকণ্ঠ বাবুকে হারাইয়াছি। এত শীঘ্র তাঁহার পুত্রকেও যে হারাইতে হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। পিতার মৃত্যুর পরে মনোরঞ্জন বাবুই ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একরূপ কর্ণধার হইয়াছিলেন। এখন তাঁহারও মৃত্যুতে ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। মনোরঞ্জন বাবুর পুত্র পরিজনদিগকে তাঁহাদের এই প্রগাঢ় শোকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

৺স্বর্ণলতা রায়চৌধুরী।—

কটকের "Star of Utkal" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ৺ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্যা পত্নী ৺স্বর্ণলতা রায়-চৌধুরী মহাশয়া গত ১৪ই ফাল্গুন শনিবার তাঁহার কটকের বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি আসামের খ্যাতনামা রায়বাহাদুর ৺গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। আসামবাসিনীগণের মধ্যে ইনিই প্রথমে উচ্চশিক্ষালাভের খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। আসামী ভাষায় গ্রন্থরচনায় খ্যাতিও তিনি যথেষ্ট অর্জ্জন করেন। ভারতীয় সংবাদপত্র পরিচালনার ব্যাপারে তিনি অগ্রণীগণের মধ্যে অন্যতমের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন বিদুষী ও কর্ম্মনিপুণা মহিলাকে হারাইয়া দেশ সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা ইঁহার শোক-সন্তপ্ত সুযোগ্য পুত্রকন্যাদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

---

* বসুমতী ২৬শে বৈশাখ ১৩৩০।

ওঁতৎসৎ

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩১৮। শক ১৮৩৩। খৃঃ ১৯১২। সম্বৎ ১৯৬৮। কলিগতাব্দ ৫০১২

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০৮। আঁধারে আলো।

মা! সময়ে সময়ে তুমি কেন কি কর, কিছুই বুঝিতে পারি না। তখন প্রাণের ভিতর কেমন এক সংশয় আসে, তুমি আমাকে ভালবাস কিনা, স্নেহ কর কিনা। সেই সময়ে ইচ্ছা করে মন-প্রাণ সমস্তই উপাড়িয়া ফেলিয়া তোমার চরণে দিয়া দেখাই যে তোমাকে পাইবার জন্য, তোমার চরণে একটুখানি বসিবার অধিকার পাইবার জন্য, আমার প্রাণের ভিতর কি রকম রক্তারক্তি হইতেছে। তুমি চকিতে আস, আর চকিতের মত দেখা দিয়া চকিতে চলিয়া যাও—কেন? আমার প্রাণে এমন কঠিন আঘাত দিয়া তোমার কি লাভ হয় তাহা বলিতে পারি না। তোমার ঐ একটুখানি দেখা পাইয়া, ঐ একটুখানি আদর পাইয়াই তোমার আরও দেখা পাইবার জন্য, আরও স্নেহ-প্রেম পাইবার জন্য আমি যে পাগল হইয়া গিয়াছি—দিনরাত্রি যে কখন আসে আর কখন যায়, কিছুই জানিতে পারি না। আমার গানের উৎস থামিয়া গিয়াছে, আমার বাক্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, আমার প্রাণের খেলা থামিয়া গিয়াছে। জননী! তোমার সেই অপরূপ রূপের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি দিনরাত্রি আমার নয়নের সম্মুখে ভাসিতেছে। আমি আমার চারিদিকে তোমারই মূর্ত্তি দেখিতেছি; তোমার ঐ মুখের সুমিষ্ট হাসিই আমাকে সংসারের দুঃখসাগরেও শান্তিতরীতে ভাসাইয়া রাখিয়াছে। আহারনিদ্রা সকলই ছাড়িয়াছি, পাছে এক মুহূর্ত্তেরও জন্য তোমার সেই মূর্ত্তি দৃষ্টিবহির্ভূত হয়। সূর্য্যের পশ্চাতে তোমারই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখি; চাঁদের পশ্চাতে তোমারই স্নেহের সুধামাখা মূর্ত্তি দেখি। লোকদের কর্ম্মের পশ্চাতে তোমারই আনন্দমাখা মূর্ত্তি দেখি। চারিদিকে সর্ব্বদা তোমারই চরণধ্বনি শুনিতে পাই—সর্ব্বদাই মনে হয়, তুমি নীরব চরণে আমার এই আঁধার ঘরে আসিতেছ। দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে—সকল দিক হইতেই তোমারই আহ্বানবাণী আসিয়া কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তোমার চরণ ধরিয়া মিনতি করি—আমার এই আঁধার ঘরে আসিয়া যদি বারেকের জন্যও দেখাই দাও, তবে আর আমাকে ছাড়িয়া গিয়া আমার ঘরটাকে ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে দিও না।

১০৯। জন্মে যোগ।

মা! যে দিন আমি তোমার কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেদিন তুমি কি গানই গাহিয়াছিলে? সেদিন আমার প্রাণ হর্ষে আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন চক্ষুর সম্মুখে আনন্দের শ্যামল সুন্দর ছবি কতই না ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সেই শরতের প্রভাতে আমারই মুখে একটুকু হাসি আনিবার জন্য কনকতপন গগনপটে কি সুন্দর চিত্রই না আঁকিয়া দিয়াছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের আনন্দনির্ঝরসকল শতধারে উৎসারিত হইয়া আমার মস্তক অবধি সর্ব্বাঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া আমার মনে প্রাণে নববল, দেহে নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। তুমি তোমার স্তন্যদানে আমাকে তোমার বীর্য্যে তোমার তেজে শক্তিময় করিয়া তুলিয়াছিলে। সেদিন তুমি আমার সর্ব্বাঙ্গে যে সুগন্ধ মাখাইয়া দিয়াছিলে, তাহার সুবাসে সমস্ত গৃহ আমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমাকে নবাগত অতিথির আদর অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য যাঁহাদিগকে তুমি আহ্বান করিয়াছিলে, আমার দেহের সুবাস তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তোমার যে অনিমেষ মঙ্গল-দৃষ্টি আমাকে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই দিন—সেই জন্মিবার দিনই তোমার সেই দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টিকে একযোগে বাঁধিয়া দিয়াছিলে; সে বাঁধন আজ পর্য্যন্ত খোলে নাই, আর কখনও খুলিবে না। সেইদিন তুমি যে গান গাহিয়া আমার চক্ষে নিদ্রা আনিয়া দিয়াছিলে, সেই গান নিদ্রার ছলে প্রাণের ভিতর মহা জাগরণই আনিয়া দিয়াছিল—সমস্ত জীবন তোমারই চরণের অভিমুখে ফুটিয়া উঠিল। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, জীবনকোরকের এক-একটী পাতা ততই বিকশিত হইতে লাগিল। জননী! আমার আর কোনই সম্বল নাই; সেই পাতাগুলি যেমন পাইয়াছি, ভালই হোক আর মন্দই হোক, তাহাই তোমার চরণে নিবেদন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি, জীবনে শান্তি পাইয়াছি। সেইদিন—সেই জন্মিবার দিন তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া তোমার বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া যে স্নেহের অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছিলে, তাহারই স্মৃতি অনন্ত জীবনের পথে আমাকে নিত্য অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিবে। আমাকে জন্মিতে দেখিয়া তুমি আনন্দের যে হাসি হাসিয়াছিলে, তাহাই আমার ভবসাগর পারের তরণী হইয়া তোমার চরণের কূলে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইবে। আমি তোমার কাছে আর কি ভিক্ষা করিব? তুমি তোমাকে আমায় দাও আর নাই দাও, আমাকে তোমার সঙ্গে এমন একযোগে বাঁধিয়া লও, যেন সে বন্ধনের গ্রন্থি সারাজীবনে না খুলিয়া যায়। তোমার কোলেতে আমাকে তুলিয়া লও; তোমার বক্ষে আমাকে জাপটাইয়া ধর। তোমার ভিতরে আমার নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলিতে দাও। তোমাতে আমি আর আমাতে তুমি—তুমি আর আমি, আমি আর তুমি—জননী আমার! মা আমার! তোমাতেই ডুবিয়া যাই—নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

ধর্ম্মধারা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৫। বুদ্ধদেব ঈশ্বরে অনাস্থাবান্ ছিলেন না।

তথাগত বুদ্ধদেব সে সময়ের ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অন্তরে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলেন। তাই তিনি জনগণকে অধর্ম্ম্য আচারব্যবহার হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ উপদেশদান ও প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে, অধর্ম্মের পথে চলাই মানবের সকল দুঃখ ও সকল ক্লেশের মূল; তাই তিনি সেই দুঃখ ও ক্লেশের মূল অধর্ম্মকেই সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বৈদিক ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ যে ঈশ্বরের নামে অধর্ম্মের ভীষণ স্রোত তদানীন্তন সমাজে প্রবাহিত হইয়াছিল, বুদ্ধদেব সেই ঈশ্বরের নাম প্রত্যক্ষভাবে প্রচার করিয়া নবতরভাবে গণ্ডগোল আনিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাই তাঁহাকে ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে কেহ কোন প্রত্যক্ষ প্রশ্ন বা leading question করিলে তিনি নীরব থাকিতেন।

কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে আমরা নাস্তিক বা ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আস্থাহীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। সহজ দেশীয় চলিত ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ করিয়া, অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তিনি তাঁহার হৃদয়ের যে তেজস্বিতা, যে নির্ভীকতা, যে অসমসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, সত্যই যদি তাঁহার ঈশ্বর প্রভৃতিতে বিশ্বাস না থাকিত, তবে তিনি তাহা প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে তাহা ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

১৬। উহার নিদর্শন।

ভগবান বুদ্ধদেব কঠোর সাধনের বলে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলায় তত্ত্ব আবিষ্কারসূত্রে সমস্ত কার্য্যকারণের মূল কারণ পরব্রহ্মের ও আত্মা প্রভৃতির সন্ধান যে পান নাই, তাহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। প্রত্যুত, তেবিজ্জসূত্রে উল্লিখিত বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজের সহিত বুদ্ধদেবের কথোপকথন পাঠ করিলে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, অশ্রদ্ধাবান হওয়া দূরে থাক, বুদ্ধদেব ভগবানে পরম ভক্তিমানই ছিলেন। বশিষ্ঠের সহিত কথোপকথনে ভগবান বুদ্ধদেব বশিষ্ঠের মুখ হইতে ব্রহ্মের উপনিষদুক্ত স্বরূপই প্রকাশ করাইয়া লইলেন—মনুষ্যের ন্যায় ব্রহ্মের ধনসম্পত্তি বা স্ত্রীপুত্র-পরিবার নাই; ব্রহ্ম কাম-ক্রোধে বিচলিত হন না; তিনি দ্বেষ-হিংসার, মদমাৎসর্য্যের ও আলস্যের অতীত; এবং তিনি সংযমী অর্থাৎ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ও পবিত্রস্বরূপ। তাঁহার সমসাময়িক অধিকাংশ ব্রাহ্মণ যে কিরূপ ষড়রিপুর বশীভূত ছিল, তাহা বশিষ্ঠের সহিত কথোপকথনে প্রকাশ পায়। ভগবানের নামে, ধর্ম্মের নামে ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের অধর্ম্ম্য আচরণ, তাহাদের আচারব্যবহার বুদ্ধদেবের এতই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের প্রশ্নসমূহের উত্তরে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেন যে, ঐ সকল প্রশ্নোত্তরের খেলায় সময় কাটাইবার অবসর তাঁহার নাই এবং তাহাতে সময় কাটাইবার জন্য কাহাকেও উপদেশও দিতে পারেন না; তৎপরিবর্ত্তে তিনি প্রত্যেককে দুঃখনিবৃত্তির অষ্টাঙ্গিক পথ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ মঙ্গলসাধনের পথে অগ্রসর হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। বুদ্ধদেব সত্য সত্য নিরীশ্বর কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলে হিন্দুদিগের মধ্যে অন্যতর অবতাররূপে পূজিত হইতে পারিতেন না।

১৭। বুদ্ধদেব সমগ্র জগতের দীপ্তদীপ।

বুদ্ধদেবের ন্যায় ভক্তিবীর ও কর্ম্মবীর কেহ পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি স্যার এড্‌উইন আর্ণল্ডের পদানুসরণে খ্রীষ্টীয়গণ বুদ্ধদেবকে The Light of Asia বা মাত্র এশিয়া ভূখণ্ডের দীপ্তদীপ বলিয়া উল্লেখ করেন; এবং যীশুখৃষ্টকে The Light of the World বা সমগ্র জগতের দীপ্তদীপ বলিয়া উল্লেখ করেন। এই দুইজন ধর্ম্মবীরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে বা অশ্রেষ্ঠ, তাহার বিচার এস্থলে করিতে চাহি না, আমার পক্ষে তাহা করাও ধৃষ্টতা হইবে। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, ভগবান তথাগত বুদ্ধদেব শুধু এশিয়া নহে, কিন্তু সমগ্র ভূখণ্ডেরই পথপ্রদর্শক দীপ্তদীপরূপে জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছেন এবং চিরকাল থাকিবেন।

১৮। বুদ্ধদেবের কর্ম্মবাণী।

প্রাচ্য ভূখণ্ডের ইহা গৌরবের কথা যে, এই প্রাচ্য ভূখণ্ডেই বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতের ইহা গৌরবের কথা, হিন্দু জাতির ইহা গৌরবের কথা যে, বুদ্ধদেব এই ভারতভূমিতে হিন্দুজাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুসভ্যতার মধ্যে লালিতপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই ভারতভূমিতে তথাগতত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বপ্রথম এই ভারতভূমিতেই তাঁহার কর্ম্মবাণীর বিজয়বিষাণ বাজাইয়া সমগ্র জগতের প্রাণে সাড়া জাগাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা তো জানা কথা যে, প্রত্যেক মহাপুরুষই একএকটী বিশেষ বাণী লইয়া অবতীর্ণ হন। সেই বাণীই তাঁহার সমস্ত জীবনে যেন মিশিয়া যায়; সেই বাণীই তাঁহার জীবনের প্রতি কার্য্যের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতে চায়। যে মহাপুরুষের আবির্ভাবকালে যে অন্যায়ভাব, যে অসদাচার অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া উঠে, প্রকৃতির নিয়মবশেই সেই অন্যায় ভাবের, সেই অসদাচারের বিরুদ্ধে মানবহৃদয় বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। শতসহস্র মানব হৃদয়ের সেই বিদ্রোহী ভাব যখন জাগিয়া উঠিয়া মানবসমাজকে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিয়া তোলে, তখনই সেই বিদ্রোহী ভাব সংহত হইয়া এক মহাপুরুষের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়, এবং সেই বিদ্রোহের অগ্নিই সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে তাঁহার বাণীরূপে নির্গত হয়। ইতিহাস যে সকল সময় উহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে তাহা নয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের কর্ম্মবাণী নিনাদিত হইবার কারণেই আমাদের অনুমান হয় যে, তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে, জানি না ঠিক কি কারণে, ঘোর আলস্য এবং তাহার নিত্য সহচর অনুচর হিংসা, নিষ্ঠুরতা, কদাচার প্রভৃতি অসদ্ধর্ম্মের শতবিধ অঙ্গ দেশের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সমাজ যখন অসদ্ধর্ম্মের এই সকল অত্যাচার অসহ্য বোধ করিতে লাগিল, তখনই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সমাজের প্রতি

unit যখন আলস্য পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মের অভিমুখীন হইবার জন্য অন্তরে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, তখনই সেই আগ্রহ পুঞ্জীভূত হইয়া সংহত আকারে বুদ্ধদেব প্রচারিত কর্ম্মবাণীর ধারায় সমাজের তপ্ত দেহে শান্তি আনয়ন করিল।

১৯। বুদ্ধদেব আত্মতত্ত্ব বিষয়ে নীরব কেন?

বুদ্ধদেব যাহা প্রচার করিলেন, তাহার মূল কথা এই—"ঠিক মতে ভাবনা করিতে, ঠিক কথা বলিতে, এবং ঠিক পথে চলিতে শিক্ষা কর, ক্লেশের মূল অন্বেষণ কর, এবং উহার মূলোচ্ছেদ করিবার বিহিত উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহা অবলম্বন করিয়া ঐকান্তিক দুঃখ হইতে নিবৃত্তি লাভ পূর্ব্বক নির্ব্বাণমুক্তি লাভে কৃতার্থ হও।" ইহা ব্যতীত অধ্যাত্মতত্ত্ব বলিয়া পরিচিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তিনি নীরব থাকিলেন। বুদ্ধদেবের প্রতি বশিষ্ঠের প্রশ্নগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে কূটতর্ক এবং সেই কূটতর্ক লইয়া বৃথা বাদবিসম্বাদ সে সময়ে দেশের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৃথা বাদবিতণ্ডার হাত হইতে নিজেও রক্ষা পাইবার জন্য এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণকেও রক্ষা করিবার জন্য অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রকাশ্য আলোচনা হইতে তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত হইলেন। যে দ্বন্দ্ববিবাদের ভয়ে বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা দেশ হইতে ধর্ম্মনামীয় যাহা কিছু সমস্তই নির্ব্বাসিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; যে বিরোধ আসিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠাপত্রে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব-বোধে বন্ধ হইয়া গেল, সেই দ্বন্দ্বকলহ, বিরোধবিবাদ আসিবার আশঙ্কাতেই শান্তির অবতার কারুণ্যরসের সাক্ষাৎমূর্ত্তি, আত্মনির্ভরের আধার তথাগত বুদ্ধদেব আত্মতত্ত্ব লইয়া তর্কবিতর্ক করা মোটেই পছন্দ করিলেন না।

২০। বুদ্ধ পূজা।

কর্ম্মবাদী বুদ্ধদেব আত্মনির্ভরের উপর জনসাধারণকে অতিরিক্ত আস্থাশীল করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, তাঁহার বিশুদ্ধ কর্ম্মবাদ প্রচারের ফলে জনসমাজ হইতে পূর্ব্বের আলস্য, হিংসা, মিথ্যা প্রভৃতি অসদ্ধর্ম্মের অনেক অংশ অনেকটা দূরিত হইল সত্য; কিন্তু সর্ব্বদর্শী ভগবান তাঁহাকে ডাকিবার যে ইচ্ছা, তাঁহাকে ডাকিবার ও পূজা করিবার যে প্রবল আকাংক্ষা মানবহৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সে ইচ্ছা, সে আকাংক্ষা এই কর্ম্মবাদের ফলে কিছুমাত্র সফলতা লাভ করিতে পারিল না। অথচ তাহা নির্ব্বাপিত করিবার শক্তিসামর্থ্যও কাহারও নাই। তাই বুদ্ধদেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব যেমন যেমন অন্তর্হিত হইতে লাগিল, তাঁহার শিষ্যদিগেরও অন্তরে ক্রমে ক্রমে সেই স্বাভাবিক আকাংক্ষা ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিল। ঐ প্রাণের সহজ আকাংক্ষা চরিতার্থ করিতেও হইবে, অথচ বুদ্ধদেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা হইতে দূরে থাকিতেও হইবে; কাজেই বুদ্ধশিষ্যেরা নানা উপায়ে আপনাদিগের মন ভুলাইয়া ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া বুদ্ধদেবেরই মূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক তাহারই পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্যানী বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ, আদি বুদ্ধ প্রভৃতি শতবিধ বুদ্ধের আকৃতি গঠিত হইয়া বৌদ্ধদিগের পূজা পাইতে লাগিল। শুধু বুদ্ধশিষ্য কেন, বুদ্ধমূর্ত্তিসকল বুদ্ধশিষ্যদের বাহিরেও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তদানীন্তন শিব প্রভৃতি অন্যান্য প্রচলিত দেবতাদিগের মূর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল এবং বৌদ্ধদিগের পূজিত ধর্ম্ম প্রভৃতিও জনসাধারণের পূজার পাত্র হইয়া উঠিল। ইহারই ফলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চারিদিকে বুদ্ধদেব এবং তাঁহার লীলা ও উপদেশাদি চিত্রে চিত্রিত ও প্রস্তরে খোদিত হইয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিবার আকাংক্ষার এবং বিশেষভাবে বৌদ্ধদিগের ভক্তির পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। ইহারই ফলে অজন্তা গুহা প্রভৃতি স্থানের অনুপম কারুকার্য্যে ঐ অনন্যপূর্ব্ব ভক্তিই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতবাসীর পূজা আহরণ করিতেছে।

২১। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের জীবব্রহ্মের ঐক্যবাদ।

এইরূপে বুদ্ধশিষ্যদিগের অতিপ্রাকৃতের সহিত যোগসাধনের আকাংক্ষা কিয়ৎপরিমাণে পরিতৃপ্ত হইলেও সম্যক চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিল না। এই আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন এক সময় আসিল, যখন ইহা সমগ্র জনসমাজের প্রাণ ভেদ করিয়া বাহির হইতে চাহিল; ইহার চরিতার্থতাসাধনের জন্য অপেক্ষা করা, কালবিলম্ব লোকের আর সহ্য হইল না। তখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য আপনার ভিতরে জনসমাজের ঐ আকাংক্ষাটিকে সংহত আকারে নবতরভাবে গড়িয়া লইয়া প্রকাশ করিলেন। বেদান্তদর্শন প্রকটিত হইল। ভগবানের নাম আবার দেশময় ধ্বনিত হইতে লাগিল; জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন হউক না কেন, আপাতত জনসাধারণের সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত কিন্তু সৃষ্টির অতীত পরব্রহ্মকে শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিবার প্রাণের আকাংক্ষা চরিতার্থতালাভের পথে অগ্রসর হইতে পারিল; ইহাতেই জনসমাজের সুখ হইল, জনসাধারণ একটা মহাশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং হউন, অথবা

তাঁহার শিষ্যগণই হউন, বৌদ্ধদর্শন সাংখ্যদর্শন এবং আবিস্তৃত বৈদিকশাস্ত্রসমূহের মত, এই সকলকে এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে মিলিত করিয়া তাহার উপরে ব্রহ্মনাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে বৈদিক মতেরই নবতর ও শেষ আকার বা last phase বলিয়া বেদান্ত দর্শনের নামে উহা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মনে হয়, ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার দর্শনপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ন্যায় শঙ্করাচার্য্যের দেশীয় প্রচলিত ভাষাকে স্বমতের বাহনরূপে গ্রহণ করিবার কথা শোনা যায় না। এই কারণে দেখা যায় যে, প্রথম প্রথম পণ্ডিতেরাই তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন, এবং উহাই পরে চুয়াইয়া চুয়াইয়া দেশময় বিস্তৃত হইল এবং জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। যেমন বুদ্ধদেব তাঁহার কর্ম্মবাণী প্রচারকালে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ দূরে সরাইয়া রাখিবার ফলে তাঁহার কর্ম্মবাদ নিরীশ্বর বলিয়াই বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইল, সেইরূপ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার বাণীপ্রচার কালে উপনিষদের "সোঽহং" প্রভৃতি কয়েকটী বচনের উপর অতিমাত্রায় ঝোঁক দিবার ফলে তাঁহার মতবাদ জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক বলিয়াই প্রচারিত হইল। প্রকৃতপক্ষে আমার মতে কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভক্তিবাদ প্রচার করাই শঙ্করাচার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ঘটনাচক্রে তাঁহার মত "মায়াবাদ"কে বলিতে গেলে নিছক জ্ঞান, যুক্তি ও তর্কের উপরেই দাঁড় করাইতে হইল, এবং ঈশ্বরকে বাদ দিলে, বৌদ্ধমতের পরিণাম এবং মায়াবাদের পরিণাম এমন পরস্পরে জড়াজড়ি হইয়া পড়িল যে, কিছুকাল যাইতে না যাইতে, সাধারণের ধারণা হইল যে, মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত এবং উহার পরিণাম ফল ভয়াবহ।

২২। মূর্ত্তিপূজার সূত্রপাত।

যতদূর বুঝা যায়, বুদ্ধমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা হইতেই মূর্ত্তিপূজার বীজ এদেশে প্রোথিত হইল। এই মূর্ত্তিপূজার বীজ প্রোথিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবনতিরও বীজ স্বভাবতই রোপিত হইল। স্বভাবতই লোকদিগের মনে ক্রমশঃ এই ভাব স্থায়িত্ব লাভ করিতে লাগিল যে, দোষ করি, পাপ করি, সে সমস্তই ঐ মূর্ত্তিপূজার ফলে ক্ষালিত হইবে। অপরদিকে, মায়াবাদ অতিরিক্ত প্রচারিত হইবার ফলে অদৃষ্টবাদ আসিয়া দেখা দিল, জনসাধারণ কর্ত্তব্যের দায়িত্বজ্ঞান চক্ষের অন্তরালে রক্ষা করিতে শিক্ষা করিতে লাগিল; লোকেরা সকলই মায়া, সকলই অদৃষ্টের দোষ, এই প্রকার স্তোকবাক্যে নিজেদের মনকে ভুলাইয়া রাখিয়া পাপের পঙ্কে অসদাচারে ডুবিতে লাগিল। এই প্রকারে বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ, বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা প্রভৃতি, মায়াবাদ অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি শঙ্করপ্রচারিত মত ও তদনুবর্ত্তী শিষ্যানুশিষ্যদিগের নব নব মতবাদসকল মিলিত হইয়া দেশকে অধোগতির দিকে টানিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। যখন দেশ অনেক নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে, এবং ঐ সকল মতবাদের পরিণাম-ফল যখন দেশের হিতৈষী ব্যক্তিগণের নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখনই শাঙ্কর মতবাদ ব্রহ্মের নামে আচ্ছাদিত হইলেও তাঁহারা উহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া পরিত্যাজ্য ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

২৩। ভক্তিভাবের অভিব্যক্তি।

শাঙ্কর মতবাদের, মায়াবাদের বিরুদ্ধে তখন দ্বৈতবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। জনসাধারণ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না, সেশ্বর বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদেও পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। তাহারা এমন মতবাদ চাহিতে লাগিল, যাহাতে মানুষকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে শিখাইতে পারে, যাহাতে মানুষ ভগবানকে দুটো প্রাণের কথা বলিয়া তৃপ্তিবোধ করিতে পারে। দ্বৈতবাদমূলক নানাবিধ দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। মায়াবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জনসমাজের মনপ্রাণ ভগবানের সঙ্গে যোগসাধনের উদ্দেশ্যে এতই আকুল হইতে লাগিল যে, তাহারা দ্বৈতমূলক মতবাদ, দ্বৈতভাবের কথা, ভগবানের নিকট প্রার্থনার সপক্ষ বাণীসকল আরও—আরও—আরও চাহিতে লাগিল। তখন রামানুজ প্রভৃতির দর্শনমত সকল সমুদিত হইয়া ভক্তিমার্গের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। হিমালয় হইতে নির্ঝরিণী যেমন ক্ষুদ্র আকারে বিনির্গত হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে করিতে সুপ্রশস্ত নদীর আকারে প্রবহমান হইয়া চতুঃপার্শ্ব শ্যামলতায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভক্তিবাণীও সূক্ষ্ম আকারে বহির্গত হইয়া ক্রমশ বলসঞ্চয়ে বর্দ্ধিত হইতে হইতে চৈতন্যদেবের সময়ে বন্যার আকারে সমগ্র ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিল।

২৪। দেশজ ভাষায় ভক্তিতত্ত্বের প্রচার।

বৌদ্ধদর্শন যেমন নিছক কর্ম্মসাধনের উপর অতিমাত্রায় ঝোঁক দিয়াছিল, শঙ্করের বেদান্তদর্শন বা মায়াবাদ যেমন অতিমাত্রায় জ্ঞানসাধনের উপর ঝোঁক দিয়াছিল, চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ সেইরূপ অতিমাত্রায় ভক্তিসাধনের উপর ঝোঁক দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ অভ্যুত্থানের সময় দেশজ ভাষারই ভিতর দিয়া

ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য চলিয়াছিল; মায়াবাদের অভ্যুত্থানের সময় সংস্কৃত ভাষারই ভিতর দিয়া ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা চলিয়াছিল; চৈতন্যদেবের সময়ে দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার সামান্য সাহায্য লইলেও আবার দেশজ ভাষারই ভিতর দিয়া ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ চেষ্টা চলিয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক। জ্ঞানের স্রোতকে সংযত করা, বাঁধের মধ্যে গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখা সহজ। কিন্তু ভক্তির বন্যা যখন নামে, তাহার প্রবল বেগকে ভাষার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব—সে বন্যা কেবল ভাষার কেন, সর্ব্ববিধ গণ্ডীরই সীমা ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করে।

২৫। অযথা ভক্তিবাদের ফল।

কর্ম্মের গণ্ডী ও জ্ঞানের গণ্ডী ভেদ করিয়া যে অহেতুকী ভক্তিবাদ প্রচারিত হইল, তাহার ফলে একদিকে জনসমাজ সরস হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু অনেক-স্থলে অসংযত সরসতার কারণে বহুবিধ আগাছা প্রভৃতিরও সৃষ্টি হইয়া চলিল। তখন বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ-ভক্তির সঙ্গে চৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত ভক্তিবাদ মিশ্রিত হইয়া যে অসঙ্গত গুরুবাদ প্রভৃতির জন্মদান করিল, আজও তাহার স্রোত নিতান্ত ক্ষীণ হয় নাই। চৈতন্য-দেবের ভক্তিবাদ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদসমূহের অন্যায় বাঁধনসকল কাটিয়া দিতে সক্ষম হইলেও পরিণামে নিজের স্থান সোয়াস্তিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে নানা প্রকারের গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লইল। মায়া-বাদ প্রকাশ্যে গৃহীত না হইলেও, এমন কি পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইলেও তাহার মূলভাব বৈষ্ণবদিগের অযথা গুরুবাদ নরপূজা প্রভৃতি মতসমূহের প্রতিষ্ঠাপ্রদানে, স্থায়িত্বপ্রদানে বড় অল্প সাহায্য করে নাই। মায়াবাদের মূল উৎস জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সহজেই বৈষ্ণবদিগেরও অন্তরে প্রত্যয় জন্মাইতে লাগিল যে, গুরুই ঈশ্বর, গুরুই ত্রাণকর্ত্তা—ভগবানই গুরুর আকারে অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র।

২৬। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান।

অসঙ্গত ভক্তিবাদের পরিণামে অযথা গুরুবাদ প্রভৃতি আসিবার কারণে ভারতের উপরে পরাধীনতা তাহার করাল ছায়া বিস্তার করিল। ইতিপূর্ব্বে ভারতবাসীরা যবনদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা যেটুকু বাকী ছিল, অতিরিক্ত ভক্তিবাদের প্লাবনে তাহাও বিলুপ্ত হইবার পথে বসিল। এই আধ্যাত্মিক পরাধীনতা অল্পে অল্পে জনসাধারণের অন্তরে বিঁধিতে লাগিল—পীড়া দিতে লাগিল। ইহা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা অনেক দিক হইতেই চলিতে লাগিল, কিন্তু নেতার অভাবে সম্ভবপর হইতেছিল না। অবশেষে সেই গুরুবাদ প্রভৃতি মতসকল শতবিধ অসদাচারের ভিতর দিয়া বড় কদর্য্য মূর্ত্তিতে বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন ইউরোপীয়দিগের সহিত সংঘর্ষের ফলেই হোক অথবা যে কোন কারণেই হোক, স্বাধীনতার আকাংক্ষা ভারতবাসী জনসাধারণের প্রাণে খুবই নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সেই আদিমতম কাল অবধি আজ পর্য্যন্ত যে কোন ভাবধারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সকলের কেন্দ্রে ঈশ্বরকে রাখিতে, তাহা প্রকাশ্যভাবেই হউক বা ফল্গুধারার ন্যায় অন্তর্নিগূঢ় ভাবেই হোক, ভারতবাসী ভুলে নাই। বর্ত্তমান যুগেরও আদিম অংশে ঐ যে স্বাধীনতার আকাংক্ষায় জনসাধারণের চিত্ত আলোড়িত হইয়াছিল, উহারও কেন্দ্রে ঈশ্বরকে রাখিয়া ভারতবাসী স্বাধীনতালাভের পথ অনুসন্ধান করিতে-ছিলেন। তাই এই আকাংক্ষা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া এবং তাঁহার সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। রামমোহন রায় ইংরাজদিগের সহিত সমরে নামিয়া সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যুক্ত হন নাই, কিন্তু দেশবাসীকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতালাভেরই পথ প্রদর্শন করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ গুরুবাদ, ঐ মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া তাহার স্থলে ভগবানের বিশুদ্ধ পূজা প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে আমাদের কোন প্রকার পরাধীনতাই ঘুচিবে না। তাই ব্রহ্মোপাসনা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তিনি ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপনেই প্রাণপাত করিলেন।

২৭। ব্রাহ্মসমাজের আদিমভাব উপাসকমণ্ডলী গঠন।

রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসকদিগের একটী মণ্ডলী গঠিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ব্রাহ্ম বলিয়া বংশগত এক নবতর জাতি সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি কখনও কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নানা উপায়ে ঐ মণ্ডলীই সংগঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পর ঐ বিষয়েই যত্নবান ছিলেন। ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মো-পাসনার মূলমন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—পরব্রহ্মে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন।

২৮। ব্রাহ্মসমাজের সমন্বয়সাধন।

কালমাহাত্ম্যে এবং ঘটনাচক্রে রাজা রামমোহন অবধি অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যসকল ও উপা-সনাপদ্ধতি প্রভৃতি কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় অথবা কেবল

মাত্র দেশজ ভাষায় নির্ব্বাহিত না হইয়া সুবিধামত, প্রয়োজন মত সংস্কৃত বা দেশজ ভাষায় সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে; কেবল তাহাই নহে, আবশ্যক হইলে ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষাতেও উহা সম্পন্ন হইবার পক্ষে ব্রাহ্মসমাজ কোনও আপত্তি করেন না বা বাধা প্রদান করেন না। কেবল ভাষায় নহে, কিন্তু ধর্ম্মভাবেও ব্রাহ্মসমাজ সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, বিগতবিবাদ পরমেশ্বরের উপাসকগণের কোন বিষয়ে কোন প্রকার অযথা বিরোধ আনয়ন করা সঙ্গত নহে। তাই রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধনিবন্ধাদিতে ভক্তিমূলক দ্বৈতবাদ এবং জ্ঞানমূলক অদ্বৈতবাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অসাম্প্রদায়িক শাশ্বত ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত জাতীয় ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যদি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের মধ্যযুগে অতিরিক্ত বিদেশীয় ভাবধারা প্রবেশ করাইয়া জাতীয় ভাবের সহিত একটা বড় রকমের বিচ্ছেদ আনয়ন না করিতেন, তবে ভারতের মুখশ্রী অন্যতর দেখিতাম নিঃসন্দেহ; তবে ব্রাহ্মসমাজের বিজয় বৈজয়ন্তী ভারতের গৃহে গৃহে প্রকাশ্যে মুক্তগগনে উড্ডীন হইতে দেখিতাম, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। তবে প্রত্যেক পল্লী হইতে ব্রহ্মনামের জয়গান বাহির হইয়া আকাশের পরতে পরতে ধ্বনিত হইত। ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে প্রাণের মধ্যে বরণ করিয়া লইলে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই আমাদের হস্তগত হইত।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

পূর্ণ ষড়জ—একতালা।

একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে
আনন্দবসন্ত সমাগমে
বিকশিত প্রীতিকুসুম হে
আনন্দ বসন্তসমাগমে পুলকিত চিত্ত-কাননে।
জীবন লতা অবনতা তব চরণে।
হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে
আনন্দ বসন্ত সমাগমে কিরণ মগন গগনে।

স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণীদেবী।

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{ননা II না র্সা না। পা -া পা। মা পা মা। জ্ঞা রা সন্া I সরা গা -া। মা -া গা।
একি লা ০ ০ ব ০ ণ্যে পূ ০ র্ণ প্রা ০ ণ০ প্রা ০ ০ ণে ০ শ

০ ১ ‖ ২´ ৩ ০ ১
। মা -া -া। -া -া -া I মা -া -া। মা জ্ঞা রা। জ্ঞা -া -া। জ্ঞা রা সা I
হে ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ন ০ ন্দ ব ০ ০ স ০ ন্ত

২´ ৩ ০ ১ [-া]
I রা -া -া। রা সা ন্া। সা -া -া। -া -া ননা} I
স ০ ০ মা ০ গ মে ০ ০ ০ ০ একি

২´ ৩ ০ ১ ২´
{I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা। র্সর্জ্ঞা -া -া। র্রা -া র্রা। র্সা র্সা না I র্সা -া -া।
বি ক শি ত ০ ০ প্রী ০ তি কু সু ম হে ০ ০

৩ ০ ১
[মা -া -া পা -া -া মা -া জ্ঞা] ২´ ৩ ০
। -া -া -া । -া -া -া । নর্সা র্রজ্ঞা র্মা (I র্মা -া -া । র্মা র্জ্ঞা র্রা । র্জ্ঞা -া -া ।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ আ ০ ০ ন ০ ন্দ ব ০ ০

১ ২´ ৩ ০ ১
। র্জ্ঞা র্রা র্সা I র্রা -া -া । র্রা র্সা না । র্সা -া -া । -া নর্সা র্রজ্ঞা I)}
স ০ ন্ন ম ০ ০ মা ০ গ মে ০ ০ ০ ০০ ০০

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা মা । মা পা পা । না না না । -া -া ননা II
পু ল কি ত চি ত্ত কা ন নে ০ ০ "একি"

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{I মা -া পা । মা জ্ঞা রা । মজ্ঞা -া -া । রা সা রা I সা ন্‌া সা । সা জ্ঞা রা ।
জী ০ ০ ব ন ম তা ০ ০ ঋ ব ন্ন তা ০ ০ ত ব চ

০ ১
। জ্ঞা রা জ্ঞা । মা -া -া I}
র ০ ০ ণে ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা । র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা । র্রা -া র্রা । র্সা -া না I র্সা -া -া । -া -া -া ।
হ র ষ গী ০ ত উ ০ চ্ছ্ সি ০ ত হে ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। নর্সা র্রজ্ঞা র্মা । -া -া -া I র্মা -া -া । র্মা র্জ্ঞা র্রা । র্জ্ঞা -া -া । র্জ্ঞা র্রা র্সা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ন ০ ন্দ ব ০ ০ স ০ ন্ন

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্রা -া -া । র্রা র্সা না । র্সা -া -া । -া নর্সা র্রজ্ঞা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা । র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা ।
ম ০ ০ মা ০ গ মে ০ ০ ০ ০০ ০০ হ র ষ গী ০ ত

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্রা -া র্রা । র্সা -া না I র্সা -া -া । না -া -া । পা -া -া । মা -া জ্ঞা I
উ ০ চ্ছ্ সি ০ ত হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । মা পা পা । না না না । -া -া ননা II II
কি র ণ ম গ ন গ গ নে ০ ০ "একি"

ভৈরবী—একতালা।*

সংসার যবে মন কেড়ে লয় জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায় গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষম সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন, ভক্তিবিহীন তান।
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে,
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান॥

স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২´ ৩ ০ ১
দ্া ণ্া II স্া সা সা। সা সঋা ণ্া। সজ্ঞা রা রজ্ঞা। মজ্ঞজ্ঞা -া দ্া I
স ং সা র, য বে, ম ০ ন কে ০ ড়ে ল ০ ০ ০ ০ ০ য়

২ ৩ ০ ১ ॥ ২´
I দ্া ণ্া সা। জ্ঞা ঋা ঋা। সা -া -া। -া -া -া I ণ্া সা দা। দা পা -জ্ঞা।
জা গে না য খ ন প্রা ০ ০ ০ ০ ণ্ ত খ নো হে না থ্

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। জ্ঞা মপদণা দা। পা মা -া I মা ক্ষা ক্ষা। মা জ্ঞা রা। রজ্ঞা -মজ্ঞজ্ঞা -া। -া দ্া ণ্া II
প্র ণ০ ০ ০ মি তো মা য়্ গা হি, ব সে, ত ব গা ০ ০ ০ ০ ০ ন্ "স ং"

২´ ৩ ০ ১ ২
II { মা -দা দা। দা দা দণা। ণা র্সা র্সা। র্সা র্সা দা I দা -র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা।
অ ন্ ত র, যা মী০ ক্ষ ম সে আ মা র্ শূ ০ না০

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
। র্ঋর্সা র্সা র্সা। ণা র্সা র্ঋর্সা। র্সণা ণা -দা } I দা -া দা। দা দা দা। দা পদণা দা।
ম০ নে র বৃ থা, উ০ প০ হা র্ পু ০ ষ্প বি হী ন পূ জা০ ০ আ

১ ২´ ৩ ০ ১
। দা পা মা I মা -ক্ষা ক্ষা। মা জ্ঞা রা। রজ্ঞা -মজ্ঞজ্ঞা -া। -া দ্া ণ্া II
য়ো জ ন ভ ০ ক্তি বি হী ন তা০ ০ ০ ০ ০ ন্ "স ং"

২´ ৩ ০ ১ ২´
II দ্া ণ্া সা। সা সা দ্া। দ্া -জ্ঞা জ্ঞঋা। ঋা -া সা I সা দা পা।
ডা কি, ত ব, না ম্ শু ০ ষ্ক০ ক ণ্ ঠে আ শা, ক

---

* ভৈরবীতে কোমল ঋ-ই লাগে; কিন্তু কোন কোন গায়ক মাধুর্য্যের জন্য কোন কোন স্থলে শুদ্ধ রি-ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৩ ০ ১ ২´ ৩
| পা পমা পা | দা -া -াপ | মা -া -া I পা ণা ণা | দা পা মা |
রি, প্রা০ ণ প ০ ০ ণে ০ ০ নি বি ড় প্রে মে র

০ ১ ২´ ৩
| জ্ঞরা জ্ঞরা জ্ঞরা | জ্ঞরা জ্ঞরা মজ্ঞা I দ্া ণ্া সা | জ্ঞা ঋা ঋা |
স০ র০ স০ ব০ র০ ষা য দি, নে মে, আ সে

০ ১ ২´ ৩ ১
| ঋা সা -া | -া -া -া I {মা দা দা | দা দা দণা | ণা র্সা র্সা |
ম নে ০ ০ ০ ০ স হ সা এ ক দা০ আ প না

১ ২´ ৩ ০ ১
| র্সা র্সা র্সা I ণা র্সা র্ঋা | র্ঋা র্ঋা র্সা | ণা র্সর্ঋা র্সণা | ণদা দপা পা} I
হ ই তে ভ রি, দি বে, তু মি তো মা০ র০ অ০ মৃ০ তে

২´ ৩ ০ ১ ২´
I সা দা দা | দা দা -া | দা পদণা দা | দা পা মা I মা -জ্ঞা জ্ঞা |
এ ই, ভ র সা য়্ ক রি০ ০ প দ ত লে শূ ০ ন্য

৩ ০ ১
| মা জ্ঞা রা | রজ্ঞা -মজ্ঞজ্ঞা -া | -া দ্া -ণ্ II II
হৃ দ য় দা০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্ "স ং"

ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব।

(২)

(রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায় বিদ্যার্ণব এম-এ)

ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার-নারদসংবাদ—যাহা ভূমাতত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ, আর একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। আখ্যানটী এই—

নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে ভগবন্ আমাকে শিক্ষা দিন্। সনৎকুমার বলিলেন, তুমি কি জান তাহা আমাকে বল, তাহার পর যদি অতিরিক্ত থাকে বলিব।

নারদ বলিলেন,—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ব-বেদ, ইতিহাস-পুরাণ নামক পঞ্চম বেদ, বেদের বেদ (ব্যাকরণ), শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দৈব-উৎপাতবিজ্ঞান, নিধিশাস্ত্র (কালতত্ত্ব), তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (গন্ধর্ব্ববিদ্যা)—আমি এই সমুদয় অবগত আছি, কিন্তু এই প্রকার বিদ্বান্ হইয়াও আমি কেবল মন্ত্রবিৎ—আত্মবিৎ নহি। ভগবৎসদৃশ লোকের নিকট শুনিয়াছি, আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয়। আমি শোকমগ্ন, ভগবান্ আমাকে শোকের পরপার লইয়া যাউন।

সনৎকুমার বলিলেন,—তুমি যাহা কিছু শিখিয়াছ, তাহা নাম (অর্থাৎ বাক্য) মাত্র। নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিলে নামের যতদূর গতি, ততদূর পর্য্যন্তই লাভ হয়। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, নাম অপেক্ষা কি কিছু শ্রেষ্ঠ আছে?

সনৎকুমার বলিলেন, হাঁ,—তাহা বাক্। কারণ, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে—ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য-

অসত্য, সাধু অসাধু, প্রীতিকর বিষয় অপ্রীতিকর বিষয়, এ সমুদয়কে বাক্ বিজ্ঞাপিত করে।

কিন্তু বাকেরও উপর আছে, তাহা মন। যেহেতু, হস্তের মুষ্টি যেমন দুইটী আমলক ফলকে ধারণ করে, মন তেমনি বাক্ ও নামকে ধারণ করিয়া থাকে। আগে মন স্থির করে, তাহার পর বাক্যের কার্য্য আরম্ভ হয়; সুতরাং মন বাক্যের ধারক, বাক্যকে আশ্রয় করিয়া নাম।

কিন্তু মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে, তাহা সঙ্কল্প। প্রথমে মন সঙ্কল্প করে, পরে চিন্তা করে, তাহার পর বাগিন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে, তাহার পর ইহাকে নাম-উচ্চারণে প্রেরণ করে। সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ। কারণ মানুষ প্রথমে অনুভব করে, তাহার পর সঙ্কল্প করে, তাহার পর মনন করে, মনন বাগিন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করে, তৎপর তাহাকে নাম উচ্চারণ করিতে প্রেরণ করে। চিত্তেই সঙ্কল্পাদি সকলের গতি, সুতরাং চিত্তই ইহাদের আত্মা ও প্রতিষ্ঠা।

চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। নিরন্তর সঙ্কল্পের অভ্যুদয় হেতু চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল। চঞ্চলতা বশতঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে চিত্তে মহত্ত্বের সঞ্চার হইতে পারে না, সেইজন্য এই চঞ্চলতার নির্ব্বাসন প্রয়োজন, ইহা ধ্যান-সাপেক্ষ। ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান বলিতে শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে জ্ঞান বুঝায়--কোন একটা কিছুকে অবলম্বন না করিয়া ধ্যান হইতে পারে না। বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে হয়। ঋষি বলিতেছেন, ঋগ্বেদাদি বেদসকল ও অন্যান্য যত কিছু বিদ্যা এবং যাহা কিছু ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, শুভ অশুভ, অন্ন রস, ইহলোক পরলোক ইত্যাদি এই সমুদয়ই বিজ্ঞান দ্বারা জানা যায়।

বিজ্ঞান অপেক্ষাও বল শ্রেষ্ঠ। একজন বলবান্ ব্যক্তি শত বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকেও কম্পিত করিতে পারে। বলবান্ ব্যক্তি উদ্যমশীল হইতে পারে। উদ্যমশীল হইয়া গুরুর পরিচর্য্যা করিতে পারে ও তাঁহার সমীপে উপবেশন করিয়া দর্শন, শ্রবণ, মনন করিতে পারে, বুঝিতে পারে, কর্ম্ম করিতে পারে। এমন কি, বল-বশতঃ ঐ পৃথিবী অবস্থান করিতেছে। বিজ্ঞান অপেক্ষা বলকে শ্রেষ্ঠ বলায়, বস্তুত মানসিক বল ভিন্ন বিজ্ঞান-বান্ ব্যক্তিরও কার্য্যসফলতার সম্ভাবনা বিরল।

অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সেইজন্য কেহ যদি দশ-রাত্রি (অর্থাৎ দশ দিন ও দশ রাত্রি) সমানে অন্নগ্রহণ না করে, সে যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলেও সে দেখিতে পারে না, শুনিতে পারে না, মনন করিতে পারে না, বুঝিতে পারে না, কর্ম্ম করিতে পারে না, কিন্তু অন্নগ্রহণ করিলে সবই পারে।

জল অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যখন সুবৃষ্টি না হয়, তখন অন্ন অল্প উৎপন্ন হইবে ভাবিয়া প্রাণসকলের কষ্ট উপস্থিত হয়। আর যখন সুবৃষ্টি হয়, অন্ন প্রচুর হইবে ভাবিয়া প্রাণসকল আনন্দিত হয়। যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান এ সকলই জলের মূর্ত্তি। জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য এই তেজ বায়ুর গতি অবরুদ্ধ করিয়া যে সময়ে আকাশকে উত্তপ্ত করে (এতদ্বায়ুমুপগৃহ্যাকাশ-মভিতপতি), তখন লোকে বলে বায়ু স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে গাত্রদাহ উপস্থিত, বৃষ্টি হইবে। (পাঠান্তরে "উপগৃহ্য"স্থানে "আগৃহ্য" আছে এই পাঠে অর্থ তেজ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া আকাশকে উত্তপ্ত করে; কিন্তু বৃষ্টিবর্ষণের পূর্ব্বে বায়ু স্তম্ভিত হইয়া গাত্রদাহ উপস্থিত করে, ইহাই সচরাচর দৃষ্ট হয়)।

তেজ প্রথমে এই অবস্থা দেখাইয়া পরে বারিবর্ষণ করে। আর এই তেজই ঊর্দ্ধগামী ও বক্রগামী বিদ্যুৎ দ্বারা ঘোর শব্দ করিতে থাকে,—লোকে বলে বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে, গর্জ্জন হইতেছে, বর্ষণ হইবে। তেজই সেই পূর্ব্ব লক্ষণ দেখাইয়া পরে জল উৎপন্ন করে। তেজ অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য আকাশেই সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র বিদ্যুৎ অগ্নি স্থিতি করে। আহ্বান শ্রবণ ইত্যাদি আকাশযোগেই সম্পন্ন হয়, আকাশেই স্থিতি, আকাশেই আমোদ, আকাশেই বিষাদ, আকাশেই জন্ম।

আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যদি বহু-জনও থাকে, (আকাশকে আশ্রয় করিয়াই স্মৃতি) যদি তাহাদের স্মরণ না থাকে, তাহাদের কেহ কাহাকেও চিনে না, কেহ কাহাকেও জানে না, কেহ কাহাকেও শুনে না। নামরূপ যাহা কিছু নিরন্ত আকাশে প্রকাশ পাইতেছে। একমাত্র স্মরণের সাহায্যেই তাহাদিগকে জানিতে পারা যায়। স্মরণ না থাকিলে ইহারা থাকিয়াও নহে—সুতরাং আকাশ অপেক্ষা স্মরণ শ্রেষ্ঠ।

স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ। আশাই সমুদয় উদ্দী-পনার মূল। আশা দ্বারা প্রণোদিত স্মৃতি মন্ত্রাধ্যয়ন করে, (পুরুষ মন্ত্রসকল স্মরণ রাখে) কার্য্য করে, পশু-পুত্র ইচ্ছা করে, ইহলোক পরলোক ইচ্ছা করে।

আশার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকিলে বিষয়সকল অচিরেই স্মরণ পথের বাহির হইয়া যায়—আশার উপর নির্ভর করিয়া যেন স্মরণ জাগ্রত থাকে। আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ। আশা উদ্যম প্রভৃতি সকলই প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে। রথচক্রের অরসমূহ যেমন রথের নাভিতে নিহিত থাকে, তেমন সমুদয়ই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত

আছে। সুতরাং যিনি প্রাণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলেন, তিনি সত্যাবলম্বে সেই কথা বলিতেছেন। যখন মানুষ বিশেষরূপে জানে, তখনই সত্য বলে। সুতরাং সত্য বিজ্ঞানসাপেক্ষ, কিন্তু মনন ব্যতীত কোন কিছুই বিশেষরূপে জানা যাইতে পারে না, এবং শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে, তাহার মননও চলে না—শ্রদ্ধা আবার নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে।

শ্রুতি বলিতেছেন—

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।

মানুষ যখন গুরুতে নিষ্ঠাবান্ হয়, তখনই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাকে, নিষ্ঠাবান্ না হইলে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে না। এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।

নিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, যাহাতে ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। কর্ম্ম সুখসাপেক্ষ; সুখলাভেচ্ছাই মানুষকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে, কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সুখ। সুতরাং সুখই সকল উদ্যমের মূল উৎস, সুখের স্বরূপ হইল ভূমা।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"

যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শুনা যায়, অন্য কিছু জানা যায়, তাহা অল্প। ভূমা যাহা তাহাই অমৃত, অল্প যাহা তাহাই মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল। ভূমা সর্ব্বময়, আপনার মহিমাতে আপনি অবস্থিত। ভূমাতত্ত্ববিৎ সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন।

পূর্ব্বে যে আনন্দের কথা বলা হইয়াছে, সেই আনন্দ ও এই সুখ একই বস্তু।

যে পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। মনন ব্যতীত কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না; আবার যাহাকে মননের বিষয় করিতে হইবে, তাহার উপর যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে তদুপরি মনোনিবেশ হইতে পারে না। শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ, নিষ্ঠা ভিন্ন শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। নিষ্ঠা উৎপন্ন করিতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা প্রয়োজন এবং তাহা কর্ম্মসাপেক্ষ। কর্ম্মের মূল উৎস সুখান্বেষণ। ভূমাই সুখস্বরূপ।

পরিমিত বিষয়ে সুখ পরিমিত, সুতরাং তাহা অকিঞ্চিৎ; তাই বলিয়াছেন "নাল্পে সুখমস্তি"।

ওঙ্কার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা তত্ত্বের দিক হইতে। শ্রুতি ইহার আর একটি প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সাধনার দিক।

কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিয়াছেন,

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ
ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

বেদ যে স্বরূপের কীর্ত্তন করে, সমুদয় তপস্যাতে যাঁহার মনন হয়, এবং যাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য সংযমিগণ ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিয়া থাকেন, ওঁ এই মন্ত্রটী সেই স্বরূপ।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।

এই যে অক্ষরটী ইহা সর্ব্বগত ব্রহ্ম, ইহাই সর্ব্বাতীত ব্রহ্মও বটে। ইহাকে জানিয়া যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়।

তাহার পরই বলা হইয়াছে—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।

(ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য) এই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এই অবলম্বন উচ্চতম, (সাধক) এই অবলম্বনকে জানিয়া ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হয়েন। এখানে ওঁ এই মন্ত্রটীকে ব্রহ্মলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় এবং ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক বলা হইয়াছে।

তাহার পর শ্রুতি যমের মুখ দিয়া নচিকেতাকে বলিতেছেন,

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ওঁ এই অক্ষরটী সর্ব্বগত ব্রহ্ম, সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম, ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক, এবং ব্রহ্মলাভের শ্রেষ্ঠ আলম্বনও বটে—কিন্তু তাহার উপলব্ধি সাধনসাপেক্ষ। এই সাধনের বিশেষ সঙ্কেত রহিয়াছে। সেই সঙ্কেত অবগত হইতে হইতে হইলে আচার্য্যের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন; তাই যম নচিকেতাকে বলিতেছেন,

সেই পরমতত্ত্ব উপদেশচ্ছলে যতদূর বলা সম্ভব তোমাকে বলা হইল। এইক্ষণ তুমি ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট গিয়া সেই সাধনতত্ত্ব অবগত হও।

কঠোপনিষদ্ শ্রুতিতে ওঁ এই পদটীকে একদিকে বেদ যে স্বরূপের কীর্ত্তন করেন সেই স্বরূপ বলা হইয়াছে, অপর দিকে ইহাকে ব্রহ্মলাভের উপায়ও বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, শ্রুতি ওঁ-শব্দকে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনের ভাষামাত্র মনে করেন না।

ওঁ একটী প্রসিদ্ধ মন্ত্র। শাস্ত্র মন্ত্রের এই লক্ষণ বলেন,

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধো মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ॥

যাহার মনন হইতে বিশ্ববিজ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হয়, সেই অর্থে প্রথম ভাগ "মন্" এবং সংসারবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি হয় এই অর্থে শেষ ভাগ "ত্র" এবং এতদুভয়ের সমষ্টিতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের আমন্ত্রণ যাহা হইতে হয়, তাহার নাম মন্ত্র।

এখানে বিশ্ববিজ্ঞানের অর্থ বিশ্বসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা হইতে ব্রহ্মাণ্ডসত্তা যে পৃথক্ নহে, সেই জ্ঞান বুঝায়।

পাতঞ্জল-দর্শনে সূত্রকার যোগীদিগের সমাধিলাভ সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে ঈশ্বরের নাম করিয়াছেন এবং প্রণব বা ওঙ্কারকে তাহার বাচক বলিয়াছেন। আলোচনার বিষয় ছিল, কি প্রকার যোগীদিগের সমাধি ও সমাধিফল (কৈবল্যলাভ) আসন্নতম হয়। তিনি শ্রদ্ধা বীর্য্যাদি সহকারে সাধনশীল যোগীদিগকে মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র-ভেদে নয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, অধিমাত্র তীব্র সংবেগশালীর সমাধি আসন্নতম হয়।

সংবেগ অর্থে সাধনকার্য্যে বৈরাগ্যমূলক কুশলতা বুঝায়; কতকটা, দূরত্ব হিসাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কার্য্যকারিতার ন্যায়। শূন্য হইতে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট কোন পদার্থের গতি এই শক্তির প্রভাবে যেরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়া যতই পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই তাহার বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; সেইরূপ তীব্র-সংবেগী যোগী বৈরাগ্যাদি সংস্কারযুক্ত হইয়া সাধনকার্য্যে ক্রমশঃ অধিকতর দ্রুতগতিতে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তীব্র-সংবেগী যোগীরা আবার মাত্রার তারতম্যানুসারে মৃদুতীব্র-সংবেগী, মধ্যতীব্র-সংবেগী ও অতিমাত্রতীব্র-সংবেগী নামে অভিহিত এবং যথাক্রমে তাঁহাদের সমাধি ও সমাধিফল, আসন্ন, আসন্নতর ও আসন্নতম হইয়া থাকে।

ইহা যে অত্যন্ত আয়াস ও যত্নসাপেক্ষ, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, আসন্নতম সমাধিলাভের অন্য উপায় আছে কিনা—(কিমেতস্মাদেবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি, অথাস্য লাভো ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিদুপায়ো ন বেতি)

ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিলেন,

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।

ঈশ্বর-শব্দের দর্শনশাস্ত্রে এই প্রথম প্রয়োগ। ঈশ্বরপ্রণিধান বলিতে ঈশ্বরে পরা ভক্তি বুঝায়। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করতঃ তাহাতে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকা এই ভক্তির স্বরূপ। এই অবস্থাই বলা যাইতে পারে।

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। "কামতোঽকামতো বাপি যৎকরোমি শুভাশুভম্। তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তং করোম্যহম্॥"

এই ঈশ্বর বদ্ধ নহেন। তিনি পুরুষবিশেষ। কৈবল্যলাভ হইয়াছে, এমন পুরুষ অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলকেই ত্রিবিধ বন্ধন ছেদন করিয়া ঐ অবস্থায় উপনীত হইতে হইয়াছে। ঈশ্বরে কোনরূপ বন্ধন ভূতকালে ছিল না, বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না,—তাই তিনি পুরুষবিশেষ। তাঁহার ঐশ্বর্য্য সাম্য ও অতিশয়শূন্য অর্থাৎ যে পুরুষে ঐশ্বর্য্যের কাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়াছে, যাহার অপেক্ষা মহৎ ঐশ্বর্য্য আর নাই, তিনিই ঈশ্বর। তিনি প্রধানতত্ত্বও নহেন, পুরুষতত্ত্বও নহেন, পরন্তু প্রধান-পুরুষাতিশয়িত; এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ তাঁহাতে নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

তাঁহার বাচক প্রণব বা ওঁ শব্দ। এখানে বাচ্য ও বাচক সম্বন্ধ উক্ত হইল। ঈশ্বর বাচ্য, প্রণব বা ওঁ বাচক। বাচ্য-শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বর যে জ্ঞেয় তাহা বুঝাইতেছে। এই জ্ঞেয়ে উপনীত হইবার (ইহাকে জানিবার) আলম্বন (সেতু, ভেলা) হইল প্রণব।

তিনি পুরুষবিশেষ। অবিদ্যাদি ক্লেশ, কুশলাকুশল (পাপপুণ্য) কর্ম্ম, কর্ম্মের ফলরূপ বিপাক এবং বিপাকের অনুরূপ আশয় (বাসনা)—এই সকল দ্বারা সম্পূর্ণরূপ অস্পৃষ্ট, সুতরাং তিনি সাধারণ পুরুষ (জীব) হইতে স্বতন্ত্র। কর্ম্ম হইতে যখন বিপাক উপজাত হয়, সেই বিপাকের অনুরূপ বাসনাসকল মনে বর্ত্তমান থাকিয়া সাধারণ পুরুষ বা জীবে ব্যপদিষ্ট হয়, তাহাতে পুরুষ সেই ফলের ভোক্তাস্বরূপ হন। যথা জয় বা পরাজয় যোদ্ধৃ সৈনিকসকলে বর্ত্তমান থাকিয়া সৈন্যস্বামী বা সেনানায়কে তাহা যেরূপ ব্যপদিষ্ট হয়। ঈশ্বর এই সকল ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মবিপাক ও আশয় হইতে সদামুক্ত; কিন্তু তিনিও প্রধান-পুরুষনির্ম্মিত এবং এই জগতের (phenomenal world) স্রষ্টা ও প্রকাশক।

সাংখ্য ও পাতঞ্জলের পরিণামবাদ (Evolution); ইঁহাদিগের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান ও পৃথক্ পৃথক্ সত্তায় অবস্থিত। প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বমূলক, পুরুষ সংখ্যায় অনন্ত। বেদান্ত-দর্শন বিবর্ত্তবাদমূলক (Illusion)। ইহার মতে এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, একমাত্র অবিদ্যাই ইহার কারণ, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। এই বিশ্ব ব্রহ্মেরই একাংশ। ব্রহ্ম বিশ্ব

হইতে অতীতরূপেও আছেন; তখন তিনি অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় এবং ইহাই তাঁহার স্বরূপ।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্ম" এই সকল বাক্যে ব্রহ্মের বিশ্বাতীত স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ, নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ, বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে চেতন ও অচেতনকেও বিশ্বের অন্তরাত্মারূপে এবং সর্ব্বাত্মকরূপে ব্রহ্মের উপাসনার বিধান করা হইয়াছে।

কলিকাতার প্রাচীন কাহিনী।

(শ্রীহরিহর শেঠ)

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

ইনি একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন। ইনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে শুঁড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র, প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র মোগল বাদসাহের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বংশানুক্রমে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রলাল ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে চিকিৎসা-বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী করিবার জন্য বিলাতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহার পিতা সম্মত হইলেন না এবং মেডিক্যাল কলেজ হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। তৎপরে তিনি আইন শিক্ষা করেন। ২২ বৎসর বয়সে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন এবং দশ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এবং তৎপরে "রহস্য সন্দর্ভ" নামক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৫৫-৫৮ সালে তিনি ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের পরিচালক নিযুক্ত হন। কলিকাতা করপোরেশন্ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সরকার কর্ত্তৃক একজন কমিশনর নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ১৮৮১ * খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সভাপতি হইয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পার্শি, হিন্দি, উর্দ্দু, উড়িয়া ভিন্ন গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষাও জানিতেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার মত পণ্ডিত এবং বহুভাষাবিৎ বাঙ্গালী আর কেহ ছিলেন না। তিনি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর অব্ ল, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রায়বাহাদুর, পরবৎসর সি-আই-ই এবং পরে রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি মাসিক ৫০০৲ টাকা বিশেষ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ৮নং মাণিকতলা রোডে তাঁহার বাসভবন ছিল।

* ১৮৫৩ (?) তৎ সং।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের সন্তান। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে মাতামহাশ্রমে ইঁহার জন্ম হয়। দরিদ্রতা নিবন্ধন ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। প্রথম টালক্ কোম্পানীর নীলামঘরে দশ টাকা বেতনে কার্য্য গ্রহণ করেন, তৎপরে পঁচিশ টাকা বেতনে মিলিটারী অডিটার জেনারেল অফিসে প্রবেশ করিয়া শেষে চারিশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন হয়। হরিশ্চন্দ্রের ইংরাজি ভাষার উপর দখল যথেষ্ট ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দুপেট্রিয়ট নামক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে কখন উহার ১৫০ জনের অধিক গ্রাহক হইত না। কিন্তু এই পত্রিকার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। তিনি দরিদ্রদের জন্য সর্ব্বদা লেখনী পরিচালন করিতেন। ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সাধারণের চাঁদায় ১০৫০০৲ টাকায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ ভবনে তাঁহার নামে একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণের উজ্জ্বল আদর্শ স্যার গুরুদাস ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম্-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। হিন্দু আইনের অভিজ্ঞতা জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এল উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদেও তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ছোটলাটের কাউন্সিলের সদস্য ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন এবং এই বৎসরই "নাইট্" উপাধি ভূষিত হন। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার হন এবং

১৮৯২তে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত ইণ্ডিয়ান ইউনিভারসিটি কমিশনের কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত পরিচালন করেন। পাশ্চাত্য বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও তিনি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতজ্ঞ ও অন্তরে বাহিরে খাঁটি হিন্দু ছিলেন। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সরলচিত্ত, বিনয়ী, পণ্ডিত, সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ বাঙ্গালী অধুনা দুর্লভ।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর।

ইনি মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বৃদ্ধ পিতামহ ছিলেন। এই বংশের পঞ্চানন ঠাকুর সপ্তদশ শতাব্দীতে কলিকাতার জঙ্গল কাটাইয়া বাস স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র জয়রাম প্রথম পাথুরিয়াঘাটায় আইসেন। দর্পনারায়ণ চন্দননগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অধীনে দেওয়ানী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

হরচন্দ্র ঘোষ।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বেহালার ঘোষ বংশে ইঁহার জন্ম হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের পর লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে গভর্ণর জেনারেলের দেওয়ানের পদ দিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। তৎপরে তিনি নূতন সৃষ্ট মুনসেফের পদে একশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এক বৎসরের মধ্যে বাঁকুড়ার সদর আমিনের পদে উন্নীত হন এবং ছয় বৎসর তথায় থাকিয়া হুগলিতে বদলি হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দুই বৎসর পরে ছোট আদালতের বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী জজ। তিনি একজন উচ্চ নীতির আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাঁকুড়া ও বেহালায় দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বেথুন স্কুল কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি টাউনহলে একটি শোকসভা হয়। ছোট আদালতের সম্মুখের বারাণ্ডায় তাঁহার একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

প্যারীচরণ সরকার।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। প্রথমে হেয়ার স্কুল পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইনি শিক্ষালাভ করেন। সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হন। হুগলী ব্রাঞ্চ ও বারাসাত স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ইনি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। পরিশেষে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনিই এ কলেজের ইংরাজী ভাষার প্রথম অধ্যাপক। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন গেজেট পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার সম্পাদক হন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি চোরবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় সুরাপাননিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইংরাজিতে Well-wisher এবং বাঙ্গালায় "হিতসাধক" বলিয়া দুইখানি পত্রিকা প্রচার করেন। তিনি তাঁহার সময়ের প্রায় সকল জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একটি অন্নছত্র খুলিয়া বহু লোককে অন্নদান করেন। তাঁহার লিখিত ইংরাজি শিক্ষা বিষয়ক বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকগুলি আজিও সর্ব্বত্র সমাদৃত।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

১৮২৯ সালের ২৭শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কাশীনাথ ঘোষ মহাশয় একজন দাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। গিরীশচন্দ্র প্রথম ১৫৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মিলিটারি অডিটার জেনারেল অফিসে বদলি হন এবং বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৫০৲ টাকা হয়। এই স্থানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন এবং ইহা ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। গিরীশচন্দ্র তাঁহার কার্য্যকুশলতার জন্য শেষে ৩৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন। তখন তিনি রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাঁহার প্রসিদ্ধির কারণ ইহা নহে। সংবাদপত্রসেবক ও বক্তারূপেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম তিনি কৈলাসচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত Literary Chronicleএ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ চন্দ্রের সহিত একত্র The Bengal Recorder নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করেন। ইহা মাত্র দুই বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে The Hindoo Patriot প্রকাশ করিয়া ১৮৫৫ পর্য্যন্ত—হরিশ্চন্দ্র উহার ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা সম্পাদন করেন। পুনরায় তাঁহার মৃত্যুর পর বন্ধুর মাতা ও পত্নীর জন্য কিছুদিন পেট্রীয়টের

ভার লইয়াছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ১৮৬৯এ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অতি দক্ষতা ও স্বাধীনতার সহিত উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ডালহাউসি ইনষ্টিটিউট, বেথুন সোসাইটী, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রভৃতি যে সকল সমিতির তিনি সভ্য ছিলেন, তথায় অনেক ভাল ভাল বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজ হলে রামদুলাল দে সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাই পরে বর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া রামদুলাল দের জীবনীরূপে প্রকাশ করেন। জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তিনি বেলুড়ে বাস করিয়াছিলেন। তথায় একটী সামান্য বাঙ্গলা পাঠশালাকে তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনররূপেও যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছিলেন।

রামতনু লাহিড়ী।

সমাজ সংস্কারকরূপে যে সকল মহাত্মা এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে হেয়ার সাহেব প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির স্কুল, যাহা পরে হেয়ার স্কুল নামে অভিহিত হয় তথায় অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন। পরে হিন্দু স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব ইহার চরিত্রে যথেষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এবং তাহারই ফলে তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রসিক কৃষ্ণমল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন এবং বর্দ্ধমান, বারাসত, উত্তরপাড়া, বরিশাল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপরে কতিপয় বৎসর কৃষ্ণনগরে বাস করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। এই স্থানে বাস কালীন বহু জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ মিত্র।

হুগলী জেলার একটী সামান্য পল্লীতে এক সামান্য গৃহস্থের ঘরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী কলেজে তাঁহার প্রথম শিক্ষা লাভ হয় এবং তিনি জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়া সসম্মানে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতে প্রবেশ করেন। তিনি শীঘ্রই তাৎকালীন আদালতের দুইজন নেতৃস্থানীয় উকিল রমাপ্রসাদ রায় এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রথমোক্ত ব্যক্তিই প্রথম বাঙ্গালী হাইকোর্টের বিচারপতি মনোনীত হন। দ্বারকানাথ প্রথমে ইহার জুনিয়ররূপে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস্ পিকক্ (Sir Barnes Peacock) তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তিনি ৪১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

মহারাজা রমানাথ ঠাকুর।

শেরবোর্ণ স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া তিনি বাটীতে সংস্কৃত ফার্সি ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া প্রথম তিনি এলেকজাণ্ডার কোম্পানীর আফিসে কার্য্য গ্রহণ করেন। তৎপরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় তথায় কোষাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। পরে এই ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাইলে তিনি একজন লিকুইডেটারের কার্য্য করেন।

তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া The Reformer নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি জমিদার সভার সভ্যরূপে অনেক কাজ করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম তাহার সহকারী সভাপতি এবং পরে প্রায় দশ বৎসর সভাপতির কার্য্য করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যের পদ প্রাপ্ত হন এবং রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সংস্রবে কার্য্য করায় C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হন। বেলগেছিয়ায় দেশীয় সম্প্রদায় রাজপুত্রকে যে অভ্যর্থনা করেন সেই অভ্যর্থনা সমিতির তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে যুবরাজ তাঁহাকে একটী সুন্দর অঙ্গুরীয়ক উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, হিন্দু কলেজের একজন গবর্ণর, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনর ও দেশীয় হাসপাতালের একজন গবর্ণর ছিলেন। দেশের সকল সৎকার্য্যে তাঁহার সাধ্যমত দান ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। (ক্রমশঃ)

হিন্দুসমাজ-সংস্কার।

(ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ,
পি. এইচ. ডি. বার-এট-ল)

হিন্দুসমাজসম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনটী এইবার চব্বিশ পরগণাস্থিত ক্যানিং টাউনে হয়। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে হিন্দুসমাজের সংস্কার-সাধন—জাতিভেদ প্রভৃতি যে সকল কুপ্রথা হিন্দু-জাতিকে শত সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া অন্তঃসারশূন্য ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা দূর করিয়া ইহাতে নব প্রাণ সঞ্চার করা। এক কথায়, সমগ্র হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন ও মিলনপ্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমানে মিলনের যুগ। জগতের সর্ব্বত্রই মিলনের এক সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—সর্ব্বত্রই মিলনবাণী ঘোষিত হইতেছে। এই সময় কি আমাদের পিছাইয়া থাকা উচিত? মিলনই যে সকল শক্তির মূল এবং মিলনেই যে মুক্তি, একথা আজ জগৎ উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে। তাই ত জগতের জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, মিলনের এক মহা উদ্যম সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু এই মিলনবাণী ভারতের পক্ষে কিছু নূতন নহে। এক্ষণে ভারতের এই পবিত্র ভূমিতে ভেদ-মন্ত্রের ফলে যে অনাচার দৃষ্ট হইতেছে, হিন্দুর শাস্ত্র প্রভৃতি আলোচনা করিলে তাহার সারবত্তা কোথাও দৃষ্ট হয় না। বহুযুগ যাবৎ পরাধীন থাকায় হিন্দুজাতির উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র আবর্ত্তে সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং নানারূপ কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়া শতবিধ ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দুজাতির সকল প্রতিষ্ঠানই এক *সনাতন ধর্ম্মভিত্তিরই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অজ্ঞানোত্থিত* কুসংস্কার যেদিন তাহা বিচলিত করিয়াছে, সেইদিন হইতেই হিন্দুজাতি ও সমাজের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনে এক সনাতন ধর্ম্মের প্রয়োগেই হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, কিন্তু পাপের আবর্ত্তে পড়িয়া আজ তাহা কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! মানবের কতকগুলি ক্ষুদ্র কুসংস্কার এক্ষণে সনাতন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, স্বাস্থ্য হারাইয়া হিন্দুসমাজ এক্ষণে ঘোর ব্যাধিতে জর্জ্জরিত।

এই সকল আবর্জ্জনা দূর করিতে ভগবানের বিধানে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব হয়। আজ এক শতাব্দী পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হিন্দুর এই সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধারকল্পে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ভারতের পক্ষে এক নবযুগের সৃষ্টিসাধন করিয়াছে। ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সমাজসংস্কারের বৃক্ষটী তিনিই এই যুগে প্রথম পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তাহার প্রধান ফলস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজের সকল জাতির মধ্যে মিলনপ্রচেষ্টা। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজকে নানাভাবে নির্য্যাতিত হইতে হইলেও তাহার ফল শুভই হইয়াছে—যাঁহারা নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া ব্রাহ্ম হইতে বিভিন্ন মনে করিতেন আজ তাঁহারাই যে এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রচেষ্টার সাফল্যের প্রধান পরিচায়ক।

হিন্দুসমাজের এই প্রকার সংস্কার বিষয়ে বাংলাদেশে এক্ষণে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামী সত্যানন্দপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মিশন অন্যতম। যে ভাবে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও ইহাতে পরোক্ষভাবে বা অপরোক্ষভাবে যোগদান করিতেছেন বা সহানুভূতি দেখাইতেছেন, তাহা পরম আনন্দের বিষয় এবং ভারতের পক্ষেও কল্যাণকর। হিন্দু মিশনের উদ্যোগে প্রতি বৎসর অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি বর্জ্জন করিবার জন্য হিন্দু-সমাজের নানা জাতির সম্মেলনটী এক নবযুগের সূচনা করিতেছে। যে ভেদপ্রথার জন্য হিন্দুজাতি আজ এত দুর্ব্বল ও লোকচক্ষে হীন হইয়া পড়িয়াছে, সেই কালিমা দূর করিবার জন্য আমাদিগকে দৃঢ়সংবদ্ধ হইতে হইবে এবং শুধু কথায় নহে—প্রধানতঃ কাজেও তাহা করিতে হইবে। যে প্রথা হিন্দুজাতিকে ধ্বংসের দিকে লইয়া গিয়াছে, তাহার উচ্ছেদসাধনই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার জন্য বহু সংস্কার আবশ্যক। এই সকল সংস্কার দ্বারা যদি আমরা আমাদের সমাজকে পুনরায় সবল করিতে ও ইহার সকল কালিমা মোচন করিতে *না পারি, তাহা হইলে কি প্রকারে* আমরা জগতের জনসমাজে নিজদিগকে উপস্থিত করিতে পারিব? যে সকল বিষয়ে আমরা মনে করিতেছি যে অপরে আমাদের উপর অন্যায় করিতেছে, তাহার প্রতীকার কি প্রকারে দাবী করিতে পারিব? নিজেদের শত গলদ থাকিতে কিরূপে অপরের গলদ দেখাইতে পারিব?

কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশের এক বিশিষ্ট নেতা বিলাতে গিয়া এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ইংরাজরা যে আমাদের উপর নানারূপ অন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে বলিতেছিলেন। তখন সভা হইতে একজন ইংরাজ শ্রোতা উঠিয়া গিয়া বক্তা মহাশয়কে বলেন যে, পূর্ব্বে নিজ জাতির উপর ন্যায়বিচার করুন, তার পর আমাদের অন্যায় আচরণের কথা বলিবেন। বক্তা মহাশয় আমাদের বলিয়াছিলেন যে, ঐ কথাগুলি শুনিয়া তিনি প্রায় নির্ব্বাক্ হইয়া

গিয়াছিলেন। আমি যখন বিলাতে ছিলাম তখনও দেখিয়াছি যে, একবার এক বড় সভা করিয়া আমাদের দেশের কয়েকটী বিশিষ্ট নেতা যখন ঐরূপ ইংরাজরাজের ভারতে নানারূপ অন্যায় আচরণের কথা বলিতেছিলেন, তখন সভা হইতে কেহ কেহ উঠিয়া বক্তা মহাশয়কে আমাদের দেশে যে সব অত্যন্ত ঘৃণিত অনাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঐ সকল বিষয়ে তাঁহারা কি বলিতে চাহেন; তখন বাস্তবিক আমাদেরও মস্তক যেন লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িতেছিল। আমাদের জাতির এই সকল অনাচারের বিষয় দেখি, অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে এবং সত্যই সেইজন্য আমরা অপরের চক্ষে এত হীন। নিজে দোষশূন্য না হইলে কি করিয়া পরের দোষ দেখান শোভা পায়? দোষ সকলের আছে সত্য, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেও যে সকল অনাচার অত্যাচার আমাদের সমাজের বক্ষে এখনও বিদ্যমান, সে কথা ভাবিলে অন্য সভ্য জাতির কথা ত দূরে থাক্‌, আমাদের মধ্যেও যাঁহাদের অন্তরে সামান্যও ধর্ম্মভাব আছে, তাহাদেরও অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া যায় না। হিন্দুর জাতিভেদ-প্রথাটাই এই সকল অনাচার অত্যাচারের অন্যতম প্রধান কারণ। ইহা আমাদের সমাজদেহে এক বিষাক্ত ক্ষতের ন্যায়। ইহা যে সকল অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, তাহা কাহার না জানা আছে? কিন্তু বহুযুগ-সঞ্চিত ঘন তমসার অন্তরালে এক শুভলক্ষণের উদয় হইয়াছে। হিন্দুরা নিজেদের দোষ যে কেবল বুঝিতে শিখিয়াছে তাহা নহে, তাহা এক্ষণে দূর করিবার জন্যও উদ্যমশীল। ভগবান আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন ও শক্তি দিন যেন আমরা মানুষকে মানুষ বলিয়া সম্মান করিতে শিখি; তাহা হইলে আমরাও অপরের নিকট মানুষ বলিয়া গণ্য হইব।

THE

BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(6)

59. *Evidences of Keshub Worship.*

The first intimation of such a practice being in vogue among certain of the followers of the *Samaj* of India was that given by two missionaries of their own party, by a letter published in the *Indian Daily News*. The publication of this letter was actuated by feelings of disgust at so idolatrous a practice being permitted. Those missionaries had witnessed the prostration to and adoration of Keshub while on his tour to Simla by one of his disciples. This letter, fully attested by the signature of the two missionaries, rapidly gained credence, and the more so when we come to consider that it was put forth by missionaries of the *Samaj* of India. The matter caused a great commotion among the Hindu community, and Keshub's opponents were not slow in attacking him on all points. To add to the ferment raised by this letter it was publicly given out, about the same time, by Jodunath Chakerbutty, one of the missionaries mentioned above that Keshub Chunder's colleague, Protap Chunder Mozoomdar, had preached in the following strain to his congregation: "Brethren, should you wish to be saved, come to his (Keshub's) feet and take shelter under them; there is no other way." In a letter from Protap Chunder Mozoomdar to the address of Keshub Chunder on his way to Simla, the latter was styled the "Saviour of Sinners." This behaviour of Protap Chunder recalls to our minds the insinuation of the disciples of Chaitanya and other reformers about the divine nature of their leaders, though the leaders themselves made no pretensions whatever to divine powers.

Another fact has to be recorded. While on his way to Simla, Keshub received the following prayer from a certain disciple: "Daya Maya Prabhu! (O merciful Lord) leave me not alone; save me before you depart. O Gurudeva (god of a spiritual teacher)! Remember this *adham sishya* (vile disciple), when you are on the hills, and do as you will for his salvation. Pradhan! Lord! I am a great sinner; how shall I approach the throne of holiness? I feel myself incapable to pray to the Most High. Do, I beseech you, pray to your father for me!" In this prayer we find Keshub Chunder was distinctly believed to be a mediator between God and

man, and that divine mercy was expected to come through his mediation alone.*

60. Keshub's attitude towords the worship.

And how did Keshub Chunder receive this prayer? Was he startled at this strange mode of address? Did he reprove his disciple for his error? Did he take immediate steps for the removal from the minds of his converts of the wrong impression raised of his powers by preaching, or any other method? We are constrained to say that we have failed to find any proofs that he did. On the contrary it is widely known that on some of his disciples protesting against his connivance at such practices, he said, "I do not wish to obstruct the stream of *Bhakti*." This is not all. We again find him tamely accepting another prayer, made on behalf of the Brahmas of the *Samaj* of India, wherein he has been raised to the dignity of a deity, and far above that of a mediator, as the following extract will show:—†"If you have once allowed me to fling myself at your feet, you should for ever give me that right. It is the faith of my heart that from the feet of such a one as yourself I shall attain salvation." Again: "The dust of your feet, and of such a one as yourself, is the only hope and consolation of this great sinner. Ever shall I place and worship your feet on my hand, and you shall pray to thy father on my behalf."

These instances will serve to show how hero, or rather Keshub-worship was fast gaining ground among the Brahmas of the *Samaj* of India of those days, and how little was done to put to a stop to it.

61. The origin of Keshub-worship to be found in his lecture on *Great Men*.

Whence this idea of hero-worship first emanated it is difficult to discover, though people are not backward to declare that Keshub's followers took the cue from his own writings. For this statement there appears some grounds, for a reference to Keshub's much applauded lecture of "*Great Men*" will find him speaking in the following strain: "What is there on earth so noble as man? The human body is indeed the living tabernacle of the living God. There is but one temple in the universe it has been beautifully said, and that is the body of man. Nothing is better than that high form. Bending before man is a reverence done to this revelation in the flesh. We touch heaven when we lay our hands on the human body."

In some other parts of the said lecture he has inculcated the doctrine of the incarnation of great men in general. In other places he has called prophets and religious instructors "God-men," and has attributed a divine nature to Chaitanya, Nanak and others. The expression of such opinions naturally would lead one to think that Keshub Chunder believed all great men or religious teachers to be incarnations of God and worthy of our homage. Proofs are not wanting to show that Keshub-worship was not confined to the person of Keshub himself. Other instances have been recorded in the *Brahma dharmer uchcha adarsa* as having occurred about the same time. Some results of the Keshub-worship movement are worth noticing. It led among Keshub's followers to a belief in the doctrine of Divine Injunction, as revealed through spiritual teachers, and entire trust and reliance on spiritual guides.

62. The *Brahmo Samaj of India* was opened on August 22, 1868.

On the 23rd January 1868, (Saka 11th Magh 1719), the day on which the 38th anniversary festival of the founding of the *Adi Samaj* was celebrated, the foundation-stone of the *Samaj* of India church was laid on a piece of ground at Jhamapukur in Calcutta. The money for the erection of this building was collected from among Keshub's followers. On this occasion the party walked in procession to the site from

* *Brahma Dharmer Uchcha Adarsa*, or High Ideal of Brahmoism by Rajnarain Bose.

† This prayer was published in the *Hindu Patriot.*

Keshub's house, singing and playing music all the way. The church was first formally opened for divine service on the 22nd day of the following month of August, when a Brahmotsava was performed with special solemnity. On this occasion twenty-one youths were initiated in the Brahmic faith.

63. Missionary work of the Brahmo Samaj of India.

We thus see after a series of years Keshub Chunder's efforts crowned with success. The foundation of the church of the *Samaj* of India led to much missionary enterprise. Protap Chunder Mozoomdar. Gour Gobind Roy, and Amritalal Bose were selected as proper instruments for the propagation of the Brahmic religion throughout India. The Deccan was selected as a proper field, and in consequence of some eloquent lectures delivered by Protap Chunder in the city of Madras, a *Samaj* was established in that city by such of its citizens as were impressed with the doctrines preached. Aghor Nath Gupta, another missionary, traversed with much difficulty the inaccessible forests of Assam, and preached with success among its rude and superstitious people.

Keshub Chunder had now even his fondest and most ambitious view to fulfil. His church, for which he had laboured and suffered so long, was now established upon a firm footing. His relations with the venerable and pious Devendranath Thakur and the *Adi Samaj* were of the most friendly kind; his disciples imbued with his own religious fervour were disseminating the Brahmic religion far and wide; and a splendid field of universal reform appeared open before him.

64. Keshub's visit to England— 1870 A.D.

Under these favourable circumstances, like the great founder of the *Samaj*, he contemplated a visit to England, partly with a view of acquiring a better knowledge of European civilisation and progress, but especially "to excite the interest of the English public in the political, social, and religious welfare of the men and women of India." A proclamation to this effect was put forth, and the approbation of the contemplated step by Keshub's followers was shown by the subscriptions raised among them to cover the expenses of the journey. Keshub Chunder accordingly set sail and safely reached England in the beginning of 1870, where he was enthusiastically received.

65. Its effect on Keshub.

It would be impossible to enter here into a detailed account of Keshub Chunder's visit to England. Suffice it however to say that it was a success, and that Keshub added greatly to his reputation for eloquence. He was received well by all parties, who were astonished to hear the many and important changes in the religion, manner, and customs of the Hindus which the *Samaj* had effected. From this intercourse with men of talent and enlarged views, Keshub greatly profited, and this was immediately apparent on his return to India.

66. *Indian Reform Association.*

Miss Collect says: "On Keshub's return to India he immediately began to put in practice some of the hints he had gathered in England, and started what he called the 'Indian Reform Association,' a body of which the nucleus was taken from his own church, but which was declared to be open to men of all classes, races, and creed, who would join to promote the social and moral reformation of the natives of India. This catholic design has happily succeeded in enlisting a wide amount of sympathy, and the Association contains Hindus, Mahomedans, Parsees, and Anglo-Saxons among its members, though of course the majority of them are enlightened Hindus. The Association is divided into five sections, *viz.*—(1) Female Improvement; (2) Education; (3) Cheap Literature; (4) Temperance; (5) Charity. In each of these departments good work has been done during the last few years. Space forbids any full epitome of details, but some mention must be made of the work undertaken by the first section, which

aims to meet the most difficult and important of all the needs of Indian society, the improvement of women.

67. The Female Normal and Adult School opened—February 1871 A.D.

The section commenced by opening a Female Normal and Adult School for the information of adult ladies who wished either to be instructed themselves, or to be trained for teaching others. This school was opened in February 1871, and in the following year a girls' school was attached to it. The attainments of the ladies have been tested by monthly and yearly examinations; those in vernacular studies by high class Hindu teachers and Government Inspectors; those in English by experienced English governesses resident in India, and the results have been highly satisfactory, so much so that the school after eight months' exsistence obtained the privilege of a grant-in-aid from the Bengal Government, which in its turn has enabled the manager to improve the education given. The pupils of the Female Normal School have also shown activity by establishing a little society among themselves for their own improvement, which meets every Friday afternoon, under the presidency of Keshub Chunder Sen, when papers are read and discussions held on questions interesting to the female intelligence of of India. An excellent Bengali journal, the *Bamabodhini Patrika*, devoted to the interests of women, started in 1864, has since August 1871 been placed under the management of the Female Improvement Section of the Association.* It is read by hundreds of native women, and many of them contribute to its pages, both in prose and verse. The Indian Reform Association held its first public anniversary in April 1872, an occasion which happily illustrated the catholic nature of the society. The Bishop of Calcutta, Dr. Milman, moved the first resolution; he was followed by the head of the Scottish Dissenters in India, Dr. Murray Mitchel, an energetic Native Christian clergyman, two Hindu gentlemen of high standing, and two Brahmas, viz. P. C. Mozoomdar, and Keshub Chunder Sen. The latter, as President of the Association, closing the meeting with a short speech.

* It has lately been withdrawn from the said management.

68. Devendranath assists in the erection of the Brahmo Samaj of India.

It will thus be seen that Keshub Chunder was not idle in taking measures for the improvement of his countrymen. Keshub chunder had now been separated for seven years from *Adi Samaj*, and the *Samaj* of India church had just been built and consecrated, when Devendranath Thakur, the chief of the *Adi Samaj* returned from a sojourn in the Himalayas. Devendranath had always accorded his support and countenance to Keshub, and hailed the establishment of a second Mandir as indicative of Brahma vitality and the spread of the religion. What he had protested and used his authority against was Keshub Chunder's attempt to overthrow his power in the *Samaj* on the pretence of introducing radical and progressive reforms, which Devendra full well knew could not be made in a day. This misunderstanding was however soon forgotten, and Devendra generously assisted Keshub in the erection of a new church, through many of Keshub's religious views were opposed to his own.

69. The proposal of re uniting the two Samajes.

After his return from the Himalayas the two chief ministers often met, and often worshipped in each other's respective churches. While thus cordially associating with and assisting one another, the question of reuniting the two churches was discussed, and it was proposed that a written agreement should be signed by both, in which they were to pledge themselves to co-operate in the cause of Brahmic propagandism. A draft of the proposed agreement was drawn up by Keshub Chunder, and sent to Devendranath Thakur. Tho terms of the ageeement drawn up by Keshub Chunder were as follows:—

"As the division which has taken place of late years between the Brahmas is found, though productive of some good to the general cause, to have created a sad apathy to the true spirit of religion among them, it is deemed necessary to adopt a measure which may tend to obviate this growing evil, and establish a fellow feeling between them. The distinct characters of the religious principle and modes of social reform of the old and new churches are well known to all, from the fact of their acting independently of each other for so long a time. Now, should both parties, being acquainted with this, have the magnanimity, in disregard of minor points of difference, to co-operate with each other in bringing about these ends, they will no doubt, it is believed, prove of great service to the church. It is for this end that we make this treaty between ourselves, and solicit every Brahma in India to join us in this purpose. Hereby a compromise is made of the differences of opinions hitherto existing in the opinions of the two parties, as follows :—

1st.—The Brahmas must worship no other being but God, nor place their belief in any man as the only means of their salvation.

2ndly.—The vitality of Brahmaism is to be considered as solely consisting in our immediate communion with God, and in the conviction that the mediation of any person is entirely opposed to it.

3rdly.—Worship of the only one God forms the principal article of Brahmic faith, and the chief ground of their mutual agreement. Let this worship, therefore, continue to remain as the main bond of the Brahmic paternity in all places.

4thly.—Social reform must not be so binding on a Brahma as his forsaking of idolatry and all kinds of sins.

5thly.—The *Adi Samaj* is employed in the propagation of the Brahmic religion, conforming, however, in their social customs, as far as practicable according to the dictates of conscience, to those of orthodox Hindus, while the *Samaj* of India has been attempting to disseminate the principles of Brahmaism among all nations, and to conduct all social rites according to strict Brahmic institutes. Both parties now join themselves in one common religious cause, but reserve to themselves respective independence in all such matters."

সাধনায় সিদ্ধি।

(শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ)

মানুষ মাত্রেই ভগবানের অংশ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শ্রীভগবান নিত্য বিদ্যমান। সকল মানুষের মধ্যেই এমন একটি শক্তি নিহিত আছে, যাহা দ্বারা জগতে এমন কোন কাজ নাই, যাহা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু সেই যে অসম্ভবকে সম্ভব করিবার বিপুল শক্তি, যাহা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় থেকে ক্রমে ক্রমে লুপ্তপ্রায় হ'তে চ'লেছে, সর্ব্বপ্রথমে চাই আমাদের সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলা, তার পরিচর্য্যা করা ও ক্রমে ক্রমে তার উৎকর্ষসাধনে সচেষ্ট হওয়া। এর জন্য আমাদের কি করতে হবে? এর জন্য 'সাধনা' চাই—একমাত্র সাধনার দ্বারাই আমরা সেই লুপ্ত শক্তির উদ্ধার করতে পারি। সেই শক্তিকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তার উন্নতিকল্পে তার সেবায় ধীরে ধীরে আত্মমন নিয়োজিত করতে পারি, তাহলে কালে সেই শক্তি আমাদের দেহে মনে এমনি প্রভাব এনে দেবে যে, আমরা সম্মুখের শতবাধাকে অতিক্রম ক'রে সকল কাজে সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হব।

আজ যে আমরা দুর্ব্বল, পঙ্গু, শীর্ণ হয়ে পড়েছি—কিসের জন্য? শুধু শক্তির অপচয় ঘটিয়ে মনের মধ্যে আমরা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিয়ে তার শুশ্রূষা করে দিন দিন তাকে এমনি সতেজ করে তুলেছি যে, সে এখন আমাদের নিয়ে একটা বীভৎস কৌতুকের খেলা সুরু করে দিয়েছে। প্রতিমুহূর্ত্তে সে আমাদের কণ্ঠরোধ করছে, আমাদের নিশ্বাস বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে; আর যেমনি আমরা আর্ত্তস্বরে কাতর ক্রন্দন করে উঠছি একটু বাঁচবার জন্য, অমনি সে তার হাত সরিয়ে নিয়ে বিকট অট্টহাসি হেসে সরে দাঁড়াচ্ছে। একেবারে সে মারছে না, কিন্তু পলে পলে তিলে তিলে সে টেনে নিয়ে চলেছে আমাদের মরণের পথে খেয়ালের খেলায় মেতে। এই খেলাই সে খেলতে সুরু করে দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, আর খেলে চলবেও সারাজীবন তার এই পৈশাচিক খেলা।

আমাদের সকলের এখন প্রধান ও প্রথম কাজ, মনের সেই সর্বনাশা দুর্বলতাকে হত্যা করে তার আসনে সবলতার প্রতিষ্ঠা করা, তার পূজো করা ও তার উৎকর্ষসাধনে ব্রতী হওয়া। এর মূলে আমাদের দরকার ইচ্ছা, একাগ্রতা ও সংযম। দুর্বলতাপ্রসূত মনের যে গ্লানি, তাকে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিয়ে শুধু সবল সুন্দর জীবনগ্রহণে প্রবৃত্ত হতে হবে; শক্তির উপাসক হয়ে আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে; তাহলেই আমরা যে কোন কাজই হোক্ না কেন, হোক্ সে দেশের, হোক্ জগতের, হোক্ সে সারা ব্রহ্মাণ্ডের, আমরা নির্ভয়ে নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হয়ে যেতে পারবো এবং সাফল্যের বিজয়তিলকে ললাট অঙ্কিত করতে পারবো।

জাতির কল্যাণ ও উন্নতির মূলে জাতির ঐকান্তিক ইচ্ছাই প্রধান সহায়। এই ইচ্ছাকে বলবতী করে তুলতে পারলে তার পাওয়ার পথে বিঘ্ন কিছুই থাকে না। ঐকান্তিক ইচ্ছাই মানুষকে সকল কর্মে সফলতা প্রদান করতে সক্ষম হয়। পাওয়ার আশাকে ফলবতী করতে হলে পাওয়ার ইচ্ছাকে বলবতী করতে হবে। দৃঢ়তার ভিত্তিতে তাকে এমনিভাবে স্থাপিত করতে হবে, যে শত ঝঞ্ঝাতেও সে কাঁপবে না, শত আঘাতেও টলবে না, শত প্রলোভনের ভারেও সে নুইবে না—হিমাদ্রিসম অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকবে।

এই যে ইচ্ছা, মানুষ একমাত্র যার দ্বারা সকল কাজে সফলতা আনয়ন করতে পারে, সেই ইচ্ছাকে দৃঢ়, সফল ও সবল করে তোলবার প্রথম ও প্রধান উপায়—আত্মশক্তি সঞ্চয় করা, তার উন্নতিকল্পে ব্রতী হওয়া। এ করতে হলে গোড়াতেই বলেছি দরকার আমাদের সাধনা। জগতে সাধনা ব্যতীত কোন কাজই সুসিদ্ধ হয় না। আমরা যদি প্রত্যেকে আত্মশক্তি সঞ্চয়ের জন্য সাধনায় লিপ্ত হই, তাহলে আজ যে কাজ আমাদের কাছে কঠিন অসম্ভব বলে ঠেকছে, তাই একদিন এমনি সহজ ও সরল হ'য়ে উঠবে যে, আমরা অনায়াসেই তা সম্পাদন করতে সক্ষম হব। পরের কিছু নিয়ে কেহ কখন বড় হয় না, হ'তে পারে না—নিজস্ব কিছু থাকা চাই; ধার করা জিনিষ নিয়ে বা ফাঁকি দিয়ে যেমন কেহ কখন বড় হতে পারে না, বহিদৃষ্টিতে বড় বলে মনে হ'লেও সে যেমন চিরকালই ছোট থেকে যায়, তেমনি পরের শক্তি নিয়েও শক্তিশালী হওয়া চলে না। শক্তিশালী হতে হলে চাই আত্মশক্তি, নিজস্ব ধন। পরের আজ্ঞার অপেক্ষা সে রাখে না; পরের মুখাপেক্ষী হয়ে সে বসে থাকে না; কর্তব্যের ডাকে সে একলাই বেরিয়ে পড়তে পারে; তুচ্ছ বিপদের ভয় তাকে ঘরে আটক রাখতে পারে না, চোখ রাঙিয়ে দাবিয়ে রাখতে পারে না তাকে যার করা শক্তির দুরপ্রভাব। আজ থেকে যদি আমরা মনের দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও সংযমের সহিত আত্মশক্তি সঞ্চয়ের সাধনায় মন নিবিষ্ট করি, তাহলে দেশের কাজ, দশের কাজ ও জগতের কল্যাণসাধনের পক্ষে আর আমাদের কোন বাধাই থাকবে না। আমরা সকল বাধাকে অতিক্রম করে আমাদের চাওয়াকে পাওয়ার দ্বারা পূর্ণ করে নিতে পারব।

কৃষ্ণনগর-ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

যে পরম মঙ্গলময়ের শুভেচ্ছায় আমাদের শতাধিক দ্বিতীয় মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইল, সর্বাগ্রে তাঁহারই উদ্দেশে আমাদের সভক্তি প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বিগত দুই বৎসর উপযুক্ত উদ্যোক্তার অভাবে কৃষ্ণনগরে মাঘোৎব সম্পন্ন করা যায় নাই। ভগবানের কৃপায় এইবার কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সেন ও সরকারী কর্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দিগকে আমাদের মধ্যে পাইয়া মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে মনস্থ করি। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণও যথেষ্ট উৎসাহ দেন ও আনুকুল্য করেন। ভগবানের আশীর্বাদে নিম্নলিখিত প্রণালীতে শতাধিক দ্বিতীয় মাঘোৎসব কৃষ্ণনগরে সুসম্পন্ন হয়।

১০ই মাঘ রবিবার, পূর্বাহ্ণ এবং অপরাহ্ণে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং উপাসনান্তে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের "প্রার্থনা" ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করেন এবং উপদেশ দেন।

১১ই মাঘ সোমবার পূর্বাহ্ণে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপাসনা করেন এবং উপাসনান্তে ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করেন ও উপদেশ দেন। অপরাহ্ণে মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে নগরকীর্তন বাহির হয়। স্থানীয় হরিসভার কতিপয় সভ্য খোলকরতালাদি সহ কীর্তনে যোগদান করিয়া কীর্তনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন; উপাসনায় এবং কীর্তনে আশাতিরিক্ত লোকসমাগম হইয়াছিল। ইঁহাদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১২ই মাঘ মঙ্গলবার, স্থানীয় কলেজ-হলে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের সম্মেলন সভা আহূত হইয়াছিল। জাস্টিস্,

বর্ষীয়ান্, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রায় শ্রীদীননাথ সান্যাল বাহাদুর কৃপা করিয়া উক্ত অধিবেশনের সভাপতিত্বের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ ও ধন্য করিয়াছেন। সভারম্ভে সাহিত্যিক সভাপতির সুসংযত লেখনী-প্রসূত ধর্ম্মের মর্ম্মকথাপূর্ণ একটি উদ্বোধনী পঠিত হইলে * কৃষ্ণনগরের জেলা জজ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মোদক আই, সি, এস, মহোদয় অতি প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় "মানবসেবাই ঈশ্বরসেবার প্রতীক" সর্ব্বধর্ম্মের এই শ্রেষ্ঠ বাণীর পোষকতায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মের বাণী, খৃষ্টধর্ম্মের গূঢ় রহস্য, হিন্দুধর্ম্মের অনন্যসাধারণ প্রগতিসূচক প্রবন্ধাবলী নিম্নোক্ত ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে পঠিত হয়—

১। খাঁ বাহাদুর মৌলভী আজিজুল হক্
২। Mr. B. W. Beau
৩। Rev. T. N. Biswas
৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখার্জ্জি
৫। শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী পণ্ডিত
৬। " বিনায়ক সান্যাল
৭। " অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য
৮। " বেচারাম লাহিড়ী

উপসংহারে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে কিছু বলেন।

ঐশী সাধনার মূল কথা, ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সমাচার, সর্ব্বজীবের কাম্য সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনসম্পদরাজি বিভিন্ন ধর্ম্মসাধনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন মার্গাবলম্বনে পরিস্থিতি লাভ করিলেও সকল ধর্ম্মের একমাত্র অবলম্ব্য গতি যে একই, তাহা সকল প্রবন্ধলেখক ও বক্তৃমণ্ডলী তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়া অতি সৌষ্ঠবের সহিত প্রতিপন্ন করায় আমাদের সম্মেলনও অতীব সৌষ্ঠবযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে সার্দ্ধ তিন ঘটিকাব্যাপী সুদীর্ঘ ধর্ম্মালোচনার পর সভাপতি মহাশয়ের শেষোক্তি ও রীত্যনুসারে ধন্যবাদদানের পর অধিক রাত্রে সভাভঙ্গ হইয়াছিল।

সর্ব্বশেষে আমাদের কর্ত্তব্য, যে সকল ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ এই শুভ অনুষ্ঠানে আমাদিগের সহায়তা করিয়া অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বশম্বদ
শ্রীপ্রমথনাথ দাস।
সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজ কৃষ্ণনগর।

* শুক্ল সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। তঃ সঃ

মেদিনীপুর-ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

আমরা গত ২২শে ফেব্রুয়ারীর মেদিনীপুর হিতৈষী পত্রে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের ৮৬তম উৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজ ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় ৺শিবচন্দ্র দেব ও ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম দিন শ্রীযুক্তা সারদা মঞ্জরী দত্ত উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুক্তা নলিনী সিন্‌হা বি-এ প্রভৃতি মহিলাগণ মনোগ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাস এম-এ, বি-এল, কীর্ত্তনাদির দ্বারা উপাসকমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং রমেশবাবু "ব্রাহ্মসমাজে পাপীর নবজীবনলাভ" বিষয়ে কথকতা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও জেলাবোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়ের যত্নে ও উদ্যমে উৎসবটী সুসম্পন্ন হইয়াছে। এজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

নানাকথা।

রাজেন্দ্রমল্লিক হাঁসপাতাল—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমাদের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের স্মৃতিকল্পে তাঁহার জন্মভূমি সিঙ্গুর গ্রামে একটী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত হাঁসপাতালে পুরুষ ও স্ত্রীলোক রোগী এবং সংক্রামক রোগী সকলের পৃথক পৃথক থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাননীয়া লেডী জ্যাক্‌সন উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এরূপ পূর্ণাবয়ব হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা বোধ হয় এই প্রথম। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং সেই শরীরের স্বাস্থ্য সম্পাদন উদ্দেশ্যে মল্লিক মহাশয় এই হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত সিঙ্গুর গ্রামের শত শত অধিবাসীগণের বংশানুক্রমে কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন। তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী— আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়া সুখী হইলাম, ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ আনন্দমোহন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী মুদ্রা বিজ্ঞানে নবতম গবেষণার

জন্য ভারতীয় মুদ্রাবিজ্ঞানসমিতি হইতে Nelson Weight পদক লাভ করিয়াছেন। চিন্তা করিতে বড়ই আনন্দ হয় যে, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে এদেশবাসী গবেষণা প্রভৃতি দ্বারা নবতর সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়া জগতের মহাসভায় স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়াছেন। যাঁহারা জগতকে নবতর সত্য-সকল দান করিতেছেন কেবল তাঁহারাই যে ইহা দ্বারা উপকৃত হন তাহা নহে; কিন্তু ইহার ফলে এদেশবাসী জনসাধারণের মস্তক হইতে পরাধীনতা ও দাসমনোভাবের বোঝা অনেক পরিমাণে নামিয়া যায়। মার্শম্যান প্রভৃতি তথাকথিত বিদেশীয় ঐতিহাসিকদিগের ইতিহাস পড়িয়া আমরা দুই তিন পুরুষ ধরিয়া আপনাদিগকে হেয় বোধ করিতাম ও দাসমনোভাবের খতে স্বাক্ষর করিয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু তেজস্বী ৺অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় স্বাধীন গবেষণা দ্বারা সেই সকল মিথ্যা ঐতিহাসিকতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়া আমাদিগকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ও স্বাধীনতার মঙ্গলবায়ু গ্রহণ করিবার অবসর প্রদান করিলেন। সেই প্রকার বিজ্ঞান-বিভাগে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, সার সি. ভি. রমন্ প্রভৃতি; দর্শনবিভাগে সার রাধাকৃষ্ণন্, ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি; সাহিত্যবিভাগে ৺বঙ্কিমচন্দ্র, পূজ্যপাদ রবীন্দ্র-নাথ প্রভৃতি স্বাধীনতার নবতর পথসমূহ উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে অল্পকালের মধ্যে যে কিরূপ মুক্তি দান করিয়াছেন, তাহা ধীরভাবে চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুরেন্দ্রবাবু মুদ্রাবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে নবতর সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ফলে আমাদের দাসমনো-ভাবের আর একটী সূত্র কাটিয়া গেল। এই কারণে আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি।

রামমোহন রায় স্মৃতিমন্দির—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, মহারাজা সার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সভাপতিত্বে তাঁহার প্রাসাদে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানে স্মৃতিমন্দির সম্বন্ধীয় সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত কয়েকজন সভ্যের মুখে শুনিলাম যে, মহারাজা বাহাদুর উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান খানাকুল কৃষ্ণনগরে যে একটী উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হইতে পারিয়াছে, ইহার জন্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় বিশেষ প্রশংসা পাইবার যোগ্য এবং দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী। তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা না হইলে এই প্রতিষ্ঠানটী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত কি না সন্দেহ। তথায় একটী বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আবার স্বামী তাঁহাদের জন্য দ্বিজেন্দ্রবাবুর পত্নী ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

একেশ্বরবাদী হিন্দুসমাজ।

(আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত)

ওঁ

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু— বেজুড়া

মহাত্মন্! ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। প্রচারব্রত উত্তমরূপ চলিতেছে। সভ্যসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ক্ষিতীন্দ্রসেবাশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা চলিয়াছে। কতিপয় সুশিক্ষিত যুবক একেশ্বর-বাদী হিন্দুসমাজ নামকরণ করিয়া একটী নূতন সমাজ গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা জন্মগত জাতিভেদপ্রথা, অবতার-বাদ, গুরুবাদ, পুরোহিতবাদ মান্য করেন না। গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ বর্ণভেদপ্রথা মান্য করেন। তাঁহারা বলেন, "জড় পদার্থের প্রতি আসক্তি, ধাতু-কাষ্ঠ-মৃত্তিকা-প্রস্তরনির্ম্মিত দেবদেবী প্রভৃতির পূজা পরিহারপূর্ব্বক আমরণ পরমেশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রাখিয়া তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই প্রত্যেক মানবের পরম ধর্ম্ম।

শ্রীহট্টবাসী সুজন ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহাশয়ের শ্বশুরালয় বেজুড়াগ্রামে। তাঁহার শ্বশুরের নাম স্বর্গীয় হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বেজুড়ার এই ভট্টাচার্য্য-বংশ সিদ্ধ মহাপুরুষ রমাকান্ত বিশারদ মহাশয়ের সন্তান। মুসলমান-শাসকেরা বিশারদ মহাশয়ের অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিপুল ভূসম্পত্তি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া রঘুনন্দন-পর্ব্বতস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া যোগসাধন করিয়াছিলেন। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগে তিনি পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত তারাকিশোর চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহাশয় সন্তদাস নাম ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-ধামে মহান্ত হইয়াছেন। এই মহান্তমহারাজ তাঁহার শ্যালক শ্রীযুক্ত আশুতোষ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের কেন্দ্রস্বরূপ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মুসলমান ও খ্রীষ্টান সন্তান যদি হিন্দু আদর্শ গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুসমাজের সভ্য হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে

তাহাদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য"? ইহার উত্তরে মহারাজ বলিলেন—"কর্ত্তব্য"। ইতি

প্রণত:

প্রসন্ন

(শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার শাস্ত্রী)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

আদিব্রাহ্মসমাজের এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার হিতৈষী বন্ধুগন শুনিয়া সুখী হইবেন যে, তত্ত্ববোধিনী উননব্বই বৎসর অতিক্রম করিয়া ভগবানের কৃপায় আগামী ১লা বৈশাখে নবতিতম বৎসরে পদার্পণ করিবে। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই পত্রিকা একনিষ্ঠভাবে সত্য-ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, সুনীতি, বিজ্ঞান ও সৎসাহিত্য প্রচারের দ্বারা বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রাণপণ যত্ন করিয়া আসিতেছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি যে, এই পত্রিকা উহার প্রবন্ধাদি গুণে শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদরলাভ করিতেছে। আমরা নিম্নে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

(১) গত মাঘোৎসব উপলক্ষে বন্ধুবর ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেব সংক্রান্ত একটি আখ্যায়িকা লইয়া যে "ভক্তলীলা" বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই ভাল লাগিয়াছে। গত ১১ই চৈত্র তারিখের শিক্ষাসমাচারে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) গত ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণীদেবী লিখিত "সংসারে ব্রহ্মসাধন" বিষয়ক উপদেশটী সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। অন্যতর সুপ্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র জন্মভূমির গত কার্ত্তিক-সংখ্যায় উপদেশটী উদ্ধৃত করিয়া সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার সুবিধা করিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সংসারে ব্রহ্মসাধন ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মকথা। এই সত্য দেশে বহুল প্রচারিত হইলে উন্নতি ও মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

(৩) খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অন্যতর মুখপত্র "প্রচার"পত্রের সম্পাদক রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দত্ত মহাশয় যাহা আমাদিগকে লিখিয়াছেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

Your তত্ত্ববোধিনী keeps my memory always fresh about you. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা is an excellent paper, rather the excellent paper ever published in Bengal. The contents of each number of it are pure, holy and inspring and they draw the ধর্ম্মপিপাসু into the presence of the Most Holy. Your prayers which come out of the depth of you heart are simply inspring, when I read them I feel absorbed in the spirit of the loving father. I am very thankful to you for your heart-searching thoughts and elevating doctrines.

(৪) গত অগ্রহায়ণের শিক্ষাসমাচার বলেন—সাহিত্যমণ্ডলে ধর্ম্মনীতিমূলক পত্রিকা বড় নাই। প্রকৃত পক্ষেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি সংখ্যা আধ্যাত্মিক-তত্ত্বে পূর্ণ থাকে। এই দেশে ধর্ম্মমূলক পত্রিকার যে আদর আছে, তাহা তত্ত্ববোধিনীর কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ সহস্র সংখ্যা-প্রকাশে প্রমাণ হইতেছে। এই পত্রিকায় কিরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা ডাঃ শ্রীবাণীদেবী সঙ্গীতভারতীর "ভারতীয় সঙ্গীতে আধ্যাত্মিক ভাব" প্রবন্ধপাঠেই পাঠকবর্গ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সংবাদ।

বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা—আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৬ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আর্য্যসমাজের অন্যতম প্রচারক সুপণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজে বেদীগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি সরল ও সুবোধ্য হিন্দীভাষায় সুললিতভাবে ব্রহ্মোপাসনার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে আর্য্যসমাজের প্রচারকের দ্বারা নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থার ইচ্ছা আছে, যাহাতে উভয় সমাজ যথাসম্ভব মিলনের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

দানপ্রাপ্তি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পরলোকগত ডাক্তার বনোয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তদীয় বিধবা-পত্নী শ্রীপ্রমদা চৌধুরাণী মহাশয়া আদিব্রাহ্মসমাজে ২৫৲ দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।